গ্রীক ও হিন্দু,

প্রবন্ধ।

—:*:—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

"কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।"—ঋষিবাক্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

কলিকাতা,

ঘোষ কোং কর্ত্তৃক বাদুড়বাগান, রামকৃষ্ণ দাসের লেন,

১২।১ নং ভবনে, রত্ন প্রেশে, মুদ্রিত।
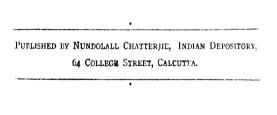
"জয় জগদীশ হরে।"

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।"

এই প্রবন্ধ

৺পিতৃদেব ও ৺মাতৃদেবীর

পবিত্র স্মৃতিতে

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র।

গ্রীক ও হিন্দু।

প্রস্তাবনা।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

কার্য্যমাত্রের উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যমাত্রের হেতু আছে, এবং হেতুর আবার সার্থকতা আছে। কার্য্যানুষ্ঠানে যথায় এই চতুর্ব্বিধ ক্রমের সুসিদ্ধি, তথায়ই কার্য্যের পূর্ণতা, এবং সেই কার্য্যই যথার্থতঃ সুফল-ফলবান্ হইয়া থাকে। নতুবা কার্য্য কার্য্যমধ্যে গণ্য নহে; তাহা গন্তব্য পথে গতিপণ্ডমাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে গতিপণ্ডই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ লোক প্রতিকৃতি-প্রতারিত, এই গতিপণ্ডকেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ ভাবিয়া, চিত্তকে প্রবোধদানে জীবন-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

মনুষ্য-শক্তি-সাধ্য যাবতীয় কার্য্য দ্বিবিধ প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক ইচ্ছাতীতে, অপর ইচ্ছাধীনে; অথবা এক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতায়, অপর মানবীয় বা মনুষ্যের স্বকৃত নিয়মের বশবর্ত্তিতায়। মানবীয় নিয়ম মনুষ্যের স্বেচ্ছাসম্ভূত, অতএব উহা স্বাধীন; কিন্তু স্বাধীন হইলেও, উহা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্কশয়নশায়ী। সুতরাং যতক্ষণ মনুষ্যকৃত নিয়মের কার্য্য প্রকৃতি-অনুকূলে, ততক্ষণ উহা সাত্ত্বিক এবং সুফলপ্রদ; কিন্তু যখন আবার প্রকৃতি-প্রতিকূলে, তখনই উহা অসাত্ত্বিক এবং অফলপ্রদ হইয়া থাকে। ফলতঃ, মনুষ্য সেই বিশ্ব-পরিচালিকা মহাশক্তিরাশির মধ্যে, স্ফাটিকত্বে পরিণত স্বতন্ত্র

শক্তিখণ্ড স্বরূপ; সুতরাং মহাশক্তি হইতে পৃথক্ বটে অথচ পৃথক্ নহে, সেইরূপ আবার অপৃথক্ বটে অথচ অপৃথক্ নহে। প্রাকৃতিক নিয়ম অদৃষ্ট নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে।

এই উভয়বিধ কর্ম্মসূত্র বাহিয়া আমাদিগের জীবন-গতি। অতএব আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কার্য্যপ্রবৃত্ত হইতে হইলে, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং হেতুভূত সার্থকতালাভার্থে, সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিবিধ বিষয়ের অবধারণা কর্ত্তব্য। প্রথমে, প্রাকৃতিক নিয়ম কি রূপে সেই প্রবর্ত্তিত কার্য্যের উপকরণ ও উপায়সমূহের সঙ্কুলান করিতেছে: দ্বিতীয়ে, আমরা কিরূপ হইলে, এবং কিরূপে সেই উপকরণরাশি ও উপায়সমূহ ব্যবহার করিতে পারিলে, প্রকৃতি অনুকূলা হওয়াতে, অনুষ্ঠানের সফলতা জন্য স্বার্থকতালাভে যথাসম্ভব সমর্থ হইতে পারি। যে কোন বিষয় হউক, অগ্রে তাহার প্রাকৃতিক তত্ত্ব অবধারণ এবং সেই তত্ত্ব গ্রহণ ও ভক্তিভাবে অবলম্বন ব্যতীত, বিষয়ের যদৃচ্ছা অনুষ্ঠান করিলে, মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্পই। এই অবধারণা অন্তে, স্বেচ্ছা এবং আত্ম-কর্ম্মশক্তিকে সাত্ত্বিক করিয়া, সেই তত্ত্বের অনুসরণে কার্য্য করিলে, পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধ ক্রমেরই সুসিদ্ধি সাধন হইয়া থাকে; এবং কার্য্যকারকও তখন কার্য্য-পূর্ণতা-নীত আনন্দে আনন্দবান্ হইতে সক্ষম হয়েন।

অদ্য আমরা আমাদিগের জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অনুষ্ঠান হেতু সমাগত একটী গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা এই,—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতীয় সংমিলনে,পাশ্চাত্য সহ আমাদিগের গুণবিনিময়ে, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিগত এবং জাতিগত, উভয়তঃ উন্নয়ন-কৃতি সাধন। পাশ্চাত্য-প্রতিরূপ আধুনিক ইউরোপীয়গণ; এবং প্রাচ্য-প্রতিরূপ আধুনিক ভারতসন্তান। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রীক; প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ প্রাচীন হিন্দু।

ভিত্তিভূমির প্রাকৃতিক ভাবাভাব অবধারিত হইলে, তদুত্তর দেহ এবং তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাবাভাব অবধারণা সহজ হইয়া আইসে।

ফলতঃ, উত্তর দেহ ও তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদা ভিত্তিরই সর্ব্বতোভাবে স্বভাবানুসরণ করিয়া থাকে; স্থূল দৃষ্টিতে পার্থক্য যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তাহা, কেবল দেশান্তর ও কালান্তর হেতু, উভয়ের মধ্যে রূপান্তর ভেদমাত্র, আন্তরিক প্রকৃতিভেদ নহে। অতএব এক্ষণে এই প্রবন্ধে সেই ভিত্তিভূমিদ্বয়ের প্রকৃতি যথাযথ অবধারণ করা প্রয়োজন। তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে পারে যে, কাহার প্রকৃতিতে কোন্‌টা দূষণীয়; কোন্ প্রকৃতি হইতেই বা কি কি গ্রহণীয়; এবং উভয়ের মধ্যে আবার কি কি ভাবে ও কোথায় সংযোগ সাধন হইলে, সুতানলয়ের সিদ্ধিসাধন সম্ভব হইতে পারে।

আমি এই প্রবন্ধভাগে, গ্রীক এবং হিন্দু একবংশজ হইলেও, কালে কি কি প্রাকৃতিক কারণযোগে তাহারা কিরূপ বিভিন্ন চরিতাদি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপরিহার্য্যভাবে সেই চরিতাদি কতদূর তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বসিয়া, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যের কতদূর রূপান্তর সাধন করিয়াছে, তাহার তত্ত্বতঃ আলোচনায় তদুভয় জাতির প্রকৃতি অবধারণ করিব; এবং উপসংহারভাগে, সঙ্ক্ষেপতঃ, আমরা কিরূপ উদ্যোগযুক্ত, কতদূর শিক্ষিত ও সাত্ত্বিকপ্রকৃতি হইলে, অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশক্তির প্রকৃত প্রয়োগ দ্বারা, কি প্রাচীন কি আধুনিক, যে কোন জাতি সহ কথিত গুণবিনিময়সাধনে, অথবা এই সংসারক্ষেত্রে যে কোন যথার্থ কার্য্যে পারগ হইতে পারি, তাহার নিরূপণে চেষ্টা পাইব।

যে কোন বিষয়ের উপর পূর্ণ দর্শনলাভ, এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-শক্তিতে প্রদত্ত হয় নাই। একদেশদর্শনই মনুষ্য-শক্তির প্রধানতঃ সম্বল; তাহারও আবার উত্তম অধম আদি উচ্চেতর ভেদ আছে। এমন স্থলে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধে আমার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আর কোন কথা বিস্তৃতরূপে বলিতে যাওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র। অতঃপর ইহাতে অকৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা আমার; কৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা অনন্ত কার্য্যমূলে প্রযুক্ত হইয়া, অনন্ত কার্য্যফল প্রসবে রত হউক।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম প্রস্তাব।

পিতৃভূমি।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া দুই বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কাহার? ফলের দোষ কি? কার্য্যকারণ-সংযোগে তাহাদের যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল; অতএব নিয়তি প্রবলা। কৃত-আয়োজনের যে উপার্জ্জিত ফল, তদুৎপাদিকা শক্তির নাম নিয়তি। ইহার অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। অথবা, নিয়তি এই বিশ্ববিরাটশীর্ষে নিয়ত দেবীরূপে দ্যোতনশীলা; অনমিত, অচলিত, অটলিত, নিত্য স্বস্বভাবে প্রভাময়ী; শ্মশানহৃদয় ও স্বর্গসোপান, দোষ ও গুণ, উভয়নির্ব্বিশেষে অখণ্ডনীয়া কর্ম্মৈকফলদা। যৎকর্ত্তৃক যে ভাবে ও যেরূপে কার্য্যকারণপ্রয়োগবিধানে অর্চ্চিত হয়েন, ইনি তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন। অতএব উপস্থিত শুভাশুভের কারণ অর্চ্চনাপ্রণালীকে বলিতে হইবে, নিয়তি নহেন। বৃক্ষস্থ ফল জড়বস্তু, সে অর্চ্চনার উপর স্বেচ্ছাবিহীন, সুতরাং বলিতে হইবে সে অপরের ইচ্ছায় চালিত। কিন্তু কে সে 'অপর' এবং কেনই বা সে ফলের ভাগ্যবিধায়ক অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং ফলেরই বা তাহার সহিত সম্বন্ধ কি? আর মনুষ্য—তাহারাত অজড় ও জ্ঞানময়; তাহারা স্বয়ং, না তাহারাও অপরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে? কে ইহার মীমাংসা করিবে?

এ জগতে বহুবিধ মহামহোপাধ্যায়গণ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, এবং এ বিষয়ের যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি মীমাংসা করিয়া, স্বীয় স্বীয় মীমাংসাকে অবশ্যগ্রহণীয় সত্যজ্ঞানে, তাহা মানবগণকে গ্রহণজন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে, বিবিধ জ্ঞান ও

ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে, সেই সকল মীমাংসা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; তদীয় শিষ্যগণ, সে সকলকে স্বয়ং ঈশ্বরকৃত মীমাংসাজ্ঞানে, আজি পর্য্যন্ত এ জগতে প্রচার করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু এক্ষণে গণনার অতীত অতি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, এত মীমাংসার মধ্যে একটি মীমাংসাও, আজি পর্য্যন্ত জনসমাজ, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গ্রহণোত্তরে, তাহাতেই আবহমান কাল শান্ত রহিতে, এবং তজ্জন্য নবানুসন্ধানকার্য্যে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না। কেমন করিয়াই বা পারিবে? অনন্ত আবর্ত্তনশীল কালচক্রের নেমি বাহিয়া যাহাদের স্থিতি, তাহাদের ত সেরূপ নিবৃত্ত হইয়া থাকিবার কথা নহে! কাল স্ববেগে বেগবান্, এবং নিরন্তর স্বীয় প্রবাহায়তনগত সমস্ত পদার্থকে তাড়না করিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। কালতাড়নায় এরূপ ছুটিত হওয়াই পদার্থত্বের পরিচয়, অন্যথা বিলোপোন্মুখ অপদার্থতা;—কাল সহ গতিসমত্ব রক্ষার নাম উন্নতি, তদন্যতরে অবনতি। আমরা দেখিতেছি, যে কোন কৃতমীমাংসাবিশেষ অচল; কিন্তু মানবীয় প্রকৃতি এবং ধারণাশক্তি সচল, সুতরাং কিরূপে তাহা শান্ত রহিয়া নবানুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত থাকিবে! কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও মনে ভাবিও না যে, মীমাংসাপ্রচারকগণ মিথ্যাবাদী, অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক আপন আপন মিথ্যাধর্ম্ম এবং মতাদি প্রচার দ্বারা লোকমণ্ডলীর উপর ভ্রান্তিকৌতুক এবং জুয়াচুরী চালাইয়া গিয়াছেন; তাহা নহে। তাঁহারাও স্ব স্ব জ্ঞান-সীমান্তমধ্যে যথাসম্ভব সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগেরও প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, মত, মীমাংসাদি, প্রকৃত ঈশ্বরকৃত মীমাংসা প্রচারই বটে; তবে কিনা তাহা তাঁহাদের সেই জ্ঞানসীমান্ত-মধ্যে এবং সেই সময়ের জন্য, এবং সেই দেশ ও পাত্রের উপযোগিভাবে। উত্তরগতিশীল তোমার আমার জীবনপ্রবাহে এখন আর তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতেছে না বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহাকেই এক সময়ে সোপানস্বরূপ অবলম্বন করাতে তোমার আমার জীবনপ্রবাহ এতদূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; এবং এইরূপ প্রবাহিত হইয়া যাইতেও থাকিবে।

প্রাচীন মীমাংসাসমূহের মধ্যে যেগুলি বিলুপ্ত না হইয়া আজি পর্য্যন্ত কোন না কোন এক লোকমণ্ডলী দ্বারা অল্পাধিক যেমনই হউক অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রে বাইবেল শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে; যেহেতু উহার অনুসরণকারিগণ অধুনাতন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ও বিভবশালী বলিয়া পরিগণিত। বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাময়; তাহার কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক, যা কিছু সুখ দুঃখ ও শুভাশুভ ইত্যাদি, সে সমস্ত তাহার নিজ ইচ্ছা-চালনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এমন কি, সমগ্র জগৎপ্রকৃতির বিকৃতিসাধন পর্য্যন্ত, তাহাদের ইচ্ছাদোষে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং ইতর জীবে পর্য্যন্ত সেই এক মানবীয় ইচ্ছাদোষেই নানা বিকৃতি ঘটিয়াছে।—খৃষ্টীয় মতে এক আদি পিতা আদম ও আদি মাতা ইবের দোষেই, এরূপ সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বদেশীন বিকৃতির ঘটনা! কিন্তু এ কথায় আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকা যায় না;—ভাল, ঊর্দ্ধসংখ্যায়, তাহাদের সঙ্গদোষে, তাহাদের সমসাময়িক পদার্থ ও জীবে না হয় বিকৃতি ঘটুক; কিন্তু উত্তরসৃষ্ট জীব ও উত্তরসৃষ্ট মনুষ্য-আত্মা যাহারা, যাহারা খৃষ্টীয় মতে প্রতি জন্মকালে প্রত্যেকে নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা কখন্-কৃত এবং কি দোষের জন্য এরূপ বিকৃতিরাশির মধ্যে বিকৃত জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়? পুনশ্চ, দুর্ব্বল জীবের এরূপ বিকৃতিরাশির মধ্যে সৃষ্ট হওয়া, অথবা বিকৃতির মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে না পারা, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টাই বা অনুযোগযোগ্য বিষয় অধিক? যাহা হউক, এখানে বলিতে হইতেছে যে, খৃষ্টীয়মণ্ডলে এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর আজি পর্য্যন্ত কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

এক্ষণে আমাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ উক্ত আছে, তাহা দেখা যাউক। ঐ সকল শাস্ত্র, যদিও এক্ষণে বিশেষ কোন ক্ষমতাবান্ ও বিভবশালী লোকমণ্ডলীর দ্বারা অনুসৃত নহে বটে, কিন্তু যাহাদের দ্বারা

অনুসৃত, তাহারা যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ ও অধিক ধর্ম্মভীরু জাতি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে,কর্ম্মসূত্র মানবীয় ভাগ্যের পরিচালক; কিন্তু এ কর্ম্মসূত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধীন ইচ্ছা প্রবলা এবং সেই স্বাধীন ইচ্ছা হইতে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি। অতএব বাইবেল ও শ্রুতি, উভয় শাস্ত্রের মতেই, বলিতে হইবে যে, মানব যথেচ্ছা আয়োজন করিয়া যথেচ্ছা ফললাভ করিতে সমর্থ হয়; অথবা দৃষ্টাদৃষ্ট ফললাভ কেবল একমাত্র যথেচ্ছা আয়োজন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে, স্বেচ্ছাবাদ, বাইবেল এবং শ্রুতি, উভয়ে ঘোষিত হইলেও, তদুভয়োক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। বাইবেলে পুনর্জ্জন্মবাদ নাই, সুতরাং উহার মতে এক জন্মের স্বেচ্ছা বা বাসনাই তাবৎ সুখ দুঃখের কারণ। কিন্তু শ্রুতি পুনর্জ্জন্মবাদ ঘোষণা করিয়া থাকেন, এবং সেই পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব, মানবীয় তাবৎ সুখ দুঃখাদিরূপ বৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ইহ জন্মের বাসনা বা স্বেচ্ছাত আছেই; অধিকন্তু জন্মান্তরীণ বাসনা ও ক্রিয়া সকল, অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া, মানবের শুভাশুভ বিধান করিয়া থাকে। জন্মান্তরীণ জ্ঞান, সংস্কার-রূপে এবং বাসনা ও ক্রিয়া সকল, কর্ম্মসূত্ররূপে পরিণত হয়। সংস্কার হইতে স্বভাব, এবং কর্ম্মসূত্রনির্ম্মায়ক জন্মান্তরীণ বাসনাভাগ হইতে কর্ম্মবিশেষের প্রতি চিত্তানতি, এবং কর্ম্মসূত্রনির্ম্মায়ক জন্মান্তরীণ ক্রিয়াভাগ হইতে ইচ্ছার অনপেক্ষভাবে কর্ম্মবিশেষে প্রবৃত্তি, এই সকল ঘটনা হইয়া থাকে;—এই তিনের আবার সমষ্টিভাব যাহা, তাহাকে, শ্রুতি এবং শ্রুতি-অনুসারিণী দর্শন সকল, 'অদৃষ্ট' এই সাধারণ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহ জন্মের স্বেচ্ছা ও বাসনা জন্য ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলকে, পুরুষকার এবং তদতীত আর সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলকে, অদৃষ্টের কার্য্য বলা যায়। যে কেহ আত্মজীবনের প্রতি অনুধ্যান করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে, অনেক সময়ে অনেক

কার্য্য যদিও আমরা স্বেচ্ছাবশে করি বটে; কিন্তু আবার অনেক সময়ে ঘটনাচক্রে এমনও অনেক কার্য্য করণার্থে আসিয়া জুটে, যাহাতে স্বেচ্ছাশক্তির কোনই হাত ও পথ দেখা যায় না। ফলতঃ, পুরুষকারযোগে যে ফললাভ, তাহা ইচ্ছাধীনে এবং অদৃষ্টযোগে যাহা, তাহাই ইচ্ছাতীতে ঘটনা হইয়া থাকে। শ্রুতির মতে, বাইবেলের ন্যায়, জীব সকলের আত্মা নিত্য নূতন সৃষ্ট হয় না; আত্মা নিত্য, অনাদি, অবিনাশী এবং অব্যয়; বিশ্বপতি পরামাত্মারই উহারা অংশ কলাস্বরূপ। যে কর্ম্মসূত্রবশে সেই সকল আত্মার জীবত্ব ও জন্মপরম্পরা সংঘটন, সেই কর্ম্মসূত্র তত্বতঃ সাদি, কিন্তু প্রবাহরূপে তাহা অনাদি।

'এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, এমন যেন কেহ মনে না করেন যে, শ্রুতি ও শ্রুত্যবলম্বী দর্শন সকলের মতামত এবং বিশেষতঃ তৎকর্ত্তৃক বর্ণিত অদৃষ্টবাদ, এ সকল যে কি পদার্থ, তাহা উপরের কয়েকটি কথা দ্বারা সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছি। শ্রুতির অদৃষ্টবাদ অতি গূঢ় ও অতি উজ্জ্বল তত্ব, তাহা দুই চারি কথায়, অথবা কেবল কথাতেও বুঝাইবার জিনিস নহে।

কেবল বাইবেল নহে, আরও অনেকানেক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রাদি আছে, যাহারা কি মানবীয়বিষয়ক, কি প্রাকৃতিক, কোন বৈষম্যেরই বিশেষ কোন সন্তোষপ্রদ কারণ দর্শাইতে পারে না; অথচ ইহাও বলিয়া থাকে যে, মানবের ইহ জন্মের স্বেচ্ছা তাহার সমস্ত শুভাশুভের কারণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল সেরূপ স্বেচ্ছা মানবের কতদূরই করিতে সক্ষম হয়? স্বেচ্ছায় মানুষের অনেক কার্য্যের উৎপাদন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সকল কার্য্যের নহে;—সৃষ্টির দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কয় জন লোক ইচ্ছাবশে বা ইচ্ছার পরিচালনে যথাভিলষিত অদৃষ্টপূর্ব্ব ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? বরং তদ্বিপরীতে কতই না লব্ধফল ইচ্ছার পরিচালনকে অতিক্রম করিয়া সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; অথবা বলিতে পার, মানব স্বয়ং তাহার কোন ইচ্ছাবশে মানব হইয়াছে

এবং কেনই বা সে মানব হয়;—আর যদি বল অন্যে তাহাকে মানব করিয়া পাঠাইয়াছে, তবে আবার জিজ্ঞাস্য, সেটা তাহার কোন্ ইচ্ছা জন্য? অথবা কে সে এমন অবিবেচক যে জানিয়া শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সুখদুঃখময় সংসারে তাহাকে মানব করিয়া পাঠায়? সত্য করিয়া বল দেখি, কেবল 'স্বেচ্ছার' আশ্রয়ে কি এতগুলি কথার উত্তর হইতে পারে? বোধ হয় না। তবে কি কথার এক সীমা ছাড়িয়া আর এক সীমা ধরিয়া বলিব যে, এ স্বেচ্ছা আকাশ-কুসুমবৎ অলিক কল্পনা-মাত্র? তাহা নহে। স্বেচ্ছারও অস্তিত্ব আছে; আছে বটে, কিন্তু সে সঙ্গে আরও একটা কথা দেখিতে হইবে যে, স্বেচ্ছা ত আছে বটে, কিন্তু তাহার বিকাশক্ষেত্র ও পরিচালনের উপকরণ সকল কোথায়?—বাহ্য-জগতে, অর্থাৎ নিজ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র মহাপ্রকৃতি সংসারে।

দেখা যায় যে, এই বাহ্যজগৎ কর্ম্মার্থে যখন যেরূপ উপকরণ সকল যোগাইতেছে, মানবীয় স্বেচ্ছা কেবল তদনুসারিণী হইয়া পদচালনা করিতে সক্ষম; তদতিরিক্ত গমনে অসমর্থ। ইহাও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে যে, সেই সকল উপকরণরাশি, কখনও বা স্বেচ্ছার বশীভূত হইয়া কার্য্য সকল উৎপাদন করিতেছে; কখনও বা আবার স্বেচ্ছাকে তাহাদের বশ্যতায় আনিয়া, স্বেচ্ছার স্বীয় মতবিপরীতে, তদ্দ্বারা কার্য্যান্তর সকল উৎপাদন করাইয়া লইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, স্বেচ্ছা কখনও বা বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে; কখন বা আবার বাহ্যজগতের প্রভাববলে রূপান্তরিত হইয়া, তৎপ্রদর্শিত পথে গমন করিতে বাধ্য হইতেছে। অতএব এখন ইহা দ্বারা কি এমন অনু-মিত হইতেছে না যে স্বেচ্ছা ব্যতীত, স্বেচ্ছাতীত আরও একটি কর্ম্মসূত্র সর্ব্বদা চরাচরপার্শ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছে?

কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে বাহ্যজগৎ, উপকরণ যোগাইবার ছলে, স্বেচ্ছাশক্তিকে উপশমিত ও রূপান্তরিত করিতেছে; যাহা সমস্ত চরাচরকে পরিচালন করিয়া ফিরিতেছে, তাহাকে স্বয়ংওত পরিচালিত হইতে দেখা যায়; তবে সে আবার, কাহার ইচ্ছাবশে চালিত

হয় এবং সে ইচ্ছার কর্ত্তা বা কে? এবং সে বাহ্যজগতের কর্ম্মসূত্র বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এতদুত্তরে সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্' এবম্ভূত প্রকৃতি বা প্রধান নামে আখ্যাত যিনি, তিনিই এই বাহ্যজগতের কর্ম্মসূত্রস্বরূপা; অথবা এ বাহ্যজগৎ তাহারই নিরবছিন্ন ক্রিয়ানিদর্শনস্বরূপ। প্রধান, জীবত্ব এবং বাহ্যজগৎ, এ উভয়কে সমান পরিচালিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে প্রভেদ এই যে, বাহ্যজগৎ কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে; কিন্তু জীব প্রাকৃতিক নিয়ম ও আত্মকৃত নিয়ম (অর্থাৎ স্বীয় স্বেচ্ছাশক্তি), উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা, তাহা সাধারণতঃ বাহ্যজগতের দ্বার দিয়াই জীবের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। শ্রুতি অথবা আরও স্পষ্টতঃ শ্রুত্যবলম্বী দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত বলিয়া থাকেন যে, যেমন ব্যষ্টি জীবের জন্মান্তরীণ কামকর্ম্ম জন্য ব্যষ্টি কর্ম্মসূত্র ও ব্যষ্টি প্রকৃতির উৎপত্তি; তেমনি সমষ্টি জীবের তদ্রূপ কামকর্ম্ম জন্য সমষ্টি কর্ম্মসূত্র ও সমষ্টি অদৃষ্ট রূপ বাহ্যজগৎ সমন্বিত এই মহাপ্রকৃতির উদয় হইয়াছে; সেই সমষ্টি কর্ম্মসূত্র রূপ মহাকর্ম্মসূত্রই দৃষ্টাদৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ। তাহা হইতে বিষয় সকলের উদয়, বিলয় ও স্থিতি সাধন হয়। তদাদিষ্ট কর্ম্মপরিপাক হেতু কি ব্যক্তিবিশেষ, কি সম্প্রদায়বিশেষ, কি জাতিবিশেষ, কি জীবসৃষ্টি, কি চরাচর, কি জড়াজড়; সকলেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় ভাবে, উপযুক্ত দেহ, অবস্থা, সংসার, জনক জননী, সঙ্গী, কর্ম্মস্থলী এবং ইচ্ছাতীতে কর্ম্মবিশেষে লিপ্তভাব, ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, অদৃষ্টপ্রাপ্ত ফলাফল ও শুভাশুভাদি ভোগ করিয়া থাকে। তাহা দ্বারাই বাহ্যজগৎ পরিচালিত হয় এবং তাহারই প্রভাবে বাহ্যজগৎ জীবের স্বেচ্ছাশক্তির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে; এবং এই কারণ হেতু, মানবের স্বেচ্ছা বা পুরুষকার অন্যত্র স্বাধীনরূপে কার্য্যক্ষম হইলেও, যথায় যথায় এবং যখন যখনই এই মহাকর্ম্মসূত্রের ক্রীড়া, তথায় এবং তখনই উহাকে বিনত হইয়া চলিতে হয়। ইহাও এক্ষণে আর বলা বাহুল্যমাত্র যে, সেই

অদম্য সর্ব্বপরিচালক মহাকর্ম্মসূত্রবশেই, ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া দুই বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়; ইহারই ফলে মনুষ্যদ্বয় দুই বিভিন্ন পথে যায়; এবং আমাদের বর্ণিত জাতিদ্বয় যে দুই বিভিন্ন দেশে পতিত ও দুই বিভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই মত অনুসারে চলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, তাহাও সেই মহা অদৃষ্টসূত্রবশে। পুনশ্চ এ বেদান্ততত্ত্বটুকুও এ স্থলে জ্ঞাতব্য যে, ইহলোকে কি পারিবারিক, কি সাম্প্রদায়িক, কি জাতীয়, যা কিছু ঘনিষ্ঠতাপরম্পরা উৎপন্ন হয়; তাহা, তত্ত সম্পর্কীয়গণের কেবল জন্মান্তরীণ কর্ম্মসাদৃশ্য বা তাহাদের ব্যষ্টি অদৃষ্ট সকলের মধ্যে অনুরূপতা হেতু, ঘটনা হইয়া থাকে।—

"কর্ম্মোর্ম্মিণা বিষমবলনৈঃ ফেণবৎ পুঞ্জিতাস্ম।"

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক তত্ত্ব সকলের মধ্যে আর অধিক প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ,এখানে,অতিশয় সূক্ষ্ম ও কূট-তত্ত্ব সকলের অবতারণা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা সাধারণ-বোধ্য ও সহজে অনুভূত, তদনুসারে বিষয়ালোচন করাই অভিপ্রেত। ফলতঃ মনুষ্য স্বেচ্ছাবান্ এবং স্বেচ্ছাপথে স্বাধীন হইলেও, স্বাধীনতায় সে উন্মাদ ষণ্ড হইতে পায় নাই। স্রষ্টার ইচ্ছা যাহা, তাহার নিকটে মানবের পরাধীনতা পদে পদে। এইরূপে স্বাধীন ও পরাধীন ভাবের একত্র যুগপৎ সমাবেশ হওয়াতে, মানব কখন কখন আত্মস্বেচ্ছাবশে কাজ করে বটে; কিন্তু কখন বা আবার স্বেচ্ছার অতীতভাবেও তাহাকে কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় এবং কখন বা স্বেচ্ছাকে খাট ও রূপান্তরিত করিতে হয়। স্রষ্টার যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বা প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্ররূপে প্রকটিত। বাহ্যজগৎ ও বাহ্যজগৎ সহ মহাপ্রকৃতি সেই প্রাকৃতিক নিয়মের স্থূল দৃশ্য। মানব এক পক্ষে আত্মস্বেচ্ছাবশে কার্য্য করিয়া, আত্মকৃত শুভাশুভ উৎপাদন করে; অপর-পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতায় কার্য্য করিয়া, অদৃষ্টপ্রাপ্তবৎ প্রাকৃতিক শুভাশুভও ভোগ করিয়া থাকে। মানবীয় স্বেচ্ছা যে ঐশ্বরিক ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, ইহা সকলেই স্বীকার করে ও সকলেই

জানে। কিন্তু সে ইচ্ছা যে প্রাকৃতিক নিয়মরূপে প্রকটিত, ইহা অনেকে অনুভব করিতে না পারিয়া, মানবের একমাত্র ইহ জন্মের স্বেচ্ছাকে তাবৎ ভোগ্য শুভাশুভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মহাশক্তিরূপা এই মহাপ্রকৃতি স্বয়ং বিষ্ণুশক্তিস্বরূপা। সুতরাং মহাশক্তির যা কিছু নিয়ম, ক্রিয়া ও কর্ম্মসূত্র, সে সমস্তই জগৎকর্ত্তা বিষ্ণুচৈতন্যে আরোপিত হইতে পারে। মহাপ্রকৃতির যে নিয়ম ও ক্রিয়া,তাহাকেই প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াফলেই, স্বর্গে নক্ষত্রমণ্ডল, মর্ত্ত্যে পার্থিববস্তুনিকর, এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পরমাণুটি পর্য্যন্ত, সমস্ত চরাচর পরিচালিত হইয়া ফিরিতেছে। উহারই বশে জড়বস্তু ফল চালিত হইয়া দুই বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয় এবং অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও উহার বশে নানা পথে পরিচালিত হইয়া নানা দশায় গতাগতি করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা যতদূর দেখিতে পাই,তাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াফলে মানুষের পরিচালিত হওয়ার ভাগই অত্যন্ত অধিক; স্বেচ্ছা-পরিচালিত হওয়ার ভাগ তাহার তুলনায় অতি সামান্য।

এক্ষণে উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তদনুসারে বাহজগতের নিকট মানবীয় স্বেচ্ছার যে অধীনত্ব ও বিনতভাব তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে, প্রতীতি হইবে যে,মানবীয় কর্ম্মসূত্র প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের অঙ্কশয়নশায়ী: সুতরাং প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রই মূল,মানবীয় কর্ম্মসূত্র তাহার পরে। আমরা নিজ প্রয়োজনে নিজ কর্ম্মসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হই এবং তৎ-যোগে প্রাকৃতিক কর্ম্ম-সূত্রকেও অনুভব করিতে পারি। আবার প্রাকৃতিক প্রয়োজন যাহা, তদর্থে আমরা প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হই এবং তদ্দ্বারা আমাদের নিজ প্রয়োজনও উপশমিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির যে প্রয়োজন কি ও কেন এবং তাহার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ কতদূর, তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

অতঃপর ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব—ইচ্ছাতীতে ফললাভ; আর মানবীয় কর্ম্মসূত্র হইতে দৃষ্টপূর্ব্ব—ইচ্ছাধীনে ফললাভ হইয়া থাকে। নিয়তি এ উভয় উৎস-উৎপন্ন আয়োজনেরই যথাযোগ্য ফলদায়িনী হইয়া থাকেন।

আমি কেন এখানে এবং এরূপ, তুমি কেন সেখানে এবং সেরূপ; অথবা এ জাতি কেন এ দেশে ও এরূপ প্রকৃতির, সে জাতি কেন সেখানে ও সেরূপ প্রকৃতির; ইহা প্রকৃতির নিজ প্রয়োজনে, প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। কি ব্যক্তিবিশেষ, কি জাতিবিশেষ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বশেই, স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি ও কর্ম্মস্থলী প্রাপ্ত হয় এবং তদুত্তরে নিজ ও প্রাকৃতিক উভয় কর্ম্মসূত্রবশে এ সংসারে কর্ম্মরাশি উৎপাদন করিয়া, স্বীয় অস্তিত্বের সার্থকতাসম্পাদনে প্রয়াস পায়। আমাদের বর্ণিত জাতিদ্বয়ের স্ব স্ব প্রকৃতি সহ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রপ্রাপ্তির পক্ষেও, উহাই একমাত্র প্রাকৃতিক বা অদৃষ্ট কারণ বলিয়া জানিবে। এইরূপে জাতীয় জীবনবিশেষের যে যথাযোগ্য স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সংস্থাপন, ইহা কেবল তত্ত্বতঃ অনুভবের বিষয়। অতোত্তরে, কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে যে জাতীয় জীবন-প্রবাহ, তাহা তত্ত্ব সহযোগে ইতিহাস ও বিজ্ঞান আদি অবলম্বনে আলোচিত হইতে পারে।

যাহাকে প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া, এই সকল নামে উপরে আখ্যাত করা গেল; সেই উপরেই আভাসিত হইয়াছে যে, তাহার নিগূঢ় মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উক্ত কর্ম্মসূত্র বস্তুতঃ নিয়ন্তৃ-নিযুক্ত নিয়ম এবং প্রকৃতি স্বয়ং তাহার বাহ্য প্রচারমাত্র। যেহেতু উদ্দেশ্য হইতে নিয়মের উদ্ভব; অতএব নিয়মরূপী কর্ম্মসূত্র, সেই উদ্দেশ্য অনুরূপ কার্য্যসাধন জন্যই গতিশীল হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কোন পরম উদ্দেশ্য, এই বৈরাজ-রূপ মহাপ্রকৃতির সর্ব্বত্র বাহ্যাভ্যন্তরপরিচালিতভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এখন বলা বাহুল্য যে, কেবল ব্যক্তিগত মানবজীবন নহে, সমগ্র মানবীয় জীবন-সমষ্টিও, অখণ্ডিত একত্বভাবে, নিয়ন্তৃ-সম্ভব

কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, কথিত কর্ম্মসূত্রবশে যথানির্দ্দিষ্ট পথে অবিরত গতিশীল হইয়া ছুটিয়াছে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ভাবযুক্ত বিভিন্ন দিক্ বা অংশ সমূহের ক্রম-পূর্ণতা সাধন করিয়া, সম্পূর্ণ পূর্ণতামুখে আনয়ন করিবার নিমিত্ত; মানবীয় জীবনসমষ্টি তত্তৎ অংশসংখ্যা অনুসারে, খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীবনসমষ্টির উক্ত খণ্ডসমূহের প্রতিখণ্ড, এক একটি বিভিন্ন জাতীয় জীবন। যেমন জাতীয় জীবন যাহারা অনুসরণ করে বা করিতে বাধ্য, তাহাদের যে সমষ্টি তাহাকে তন্নামযুক্ত জাতি বলা যায়। এই জাতিসমূহের মধ্যে যে যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র তাহাদের যাহাকে যেমন পরিচালনা করিয়া লইয়া ফিরে, তাহারা তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়া, অন্য হইতে আপন পৃথকত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রস্থ আদিষ্ট কার্য্য হইতে যাহাতে বিচলিত হইয়া পলাইতে না পারে, কথিত কর্ম্মসূত্র তৎপক্ষে একরূপ নিগড় স্বরূপ। প্রকৃতি তাহার অনন্তবিশ্রুতস্বরে নিরন্তর এই ঘোষণা করিতেছে যে, তুমি যে কার্য্যক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়া জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ; সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীয় মানবীয় কর্ম্মসূত্র অর্থাৎ পুরুষকারের পরিচালনে, সেই কার্য্যক্ষেত্রের অনুসরণ কর, যেহেতু তজ্জন্যই তোমার উৎপত্তি। স্বীয় জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে স্বধর্ম্ম অবলম্বনেই, মঙ্গলের সম্পূর্ণত প্রাপ্তি স্থিরনিশ্চয় বলিয়া জানিবে। নতুবা যদি ব্যতিক্রমে বিধর্ম্মী হও, তবে ব্যতিক্রমের পরিমাণ অনুসারে ক্রমধ্বংসে ধ্বংস হইতে থাকিবে; ধ্বংস ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। অতএব কখনও তাহা করিও না, আত্মকর্ম্মক্ষেত্র ও স্বধর্ম্মবোধে প্রবুদ্ধ হও, হইয়া সেইরূপ আচরণ কর। আর্য্য হিন্দুসন্তান ঘুচিয়া, অযশস্কর 'চুনোগলি-সাঙ্কর্য্য' খ্যাত ফিরিঙ্গীসন্তান হইও না।

অতএব এ সংসারক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, প্রত্যেক জাতিরই নিয়ন্তা কর্ত্তৃক এক একটি কর্ম্ম নিয়োজিত আছে। এজন্য যতক্ষণ যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ তাহার কেহই

ফেলিবার পাত্র নহে; ফেলিবার সময় হইলে তোমাকে আমাকে তজ্জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না, তাহারা আপনা হইতেই যথাকর্ম্মসূত্রানুগত উত্তরাধিকারিবর্গকে স্থান দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। পুনশ্চ, কার্য্যফল যাহার এবং যাহার আজ্ঞায় কার্য্যের আরম্ভ, তাঁহার নিকট সকল কর্ম্মকারকই সমান যত্ন ও আদরের বিষয়ীভূত। এক্ষণে এই কথাগুলি মনে রাখিয়া জাতীয় জীবন সমালোচন করিলে, ইহাই আলোচ্য এবং ইহা কেবল দেখিতে হইবে যে, কোন্ জাতি কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল; কর্ম্মক্ষেত্রের প্রকৃতি হইতে যতদূর উপলব্ধি হয়, তদনুসারে তাহাদের প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য কি; এবং তাহারা সেই কার্য্যসমাধায় কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়া, কি পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে। কার্য্যকর্ত্তার আদিষ্ট কার্য্য সামান্য হইলেও, কার্য্যকারক যদি তাহা সুশৃঙ্খলে ও সাত্বিক ভাবে সমাধা করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্যকারককে অবশ্যই ধন্য বলিতে হইবে। কিন্তু যথায় অফলতা, ন্যস্ত কার্য্যের ভার তথায় উচ্চ হইলেও, কার্য্যকারক অধমের মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার পর কোন্ জাতি সাংসারিক গণনায় ছোট কোন জাতি বড়, ইহার কি আর স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে? ন্যস্ত কর্ম্মের সফলতাতে শ্রেষ্ঠতা এবং তদন্যতরে অপকৃষ্টতা। যাহা হউক, তথাপি বাঞ্ছারাম বলিতেছে যে, "লৌকিক ভাবেও একটা ছোট বড়র আলোচনা আছে। তুমি হয় ত তেমন স্থলে বলিবে যে, সেরূপ আলোচনায় যে মীমাংসা, তাহা কেবল পাগলের পক্ষে তুষ্টিকর হইয়া থাকে। কিন্তু আমি তদুত্তরে বলিব যে, মানুষের মধ্যে পাগলই বা কোন্টা নহে! মনুষ্য শরীরী হওয়ায়, কিয়দংশে সকলকেই পাগল বলিতে হইবে; অতএব সেই পাগলামির তৃপ্তি করিয়া, তৃপ্ত্যন্তে গাম্ভীর্য্য ও গুরুকর্ম্মানুসরণ তাহার মনে উদয় করাইবার নিমিত্ত, ওরূপ মীমাংসারও আবশ্যক হইয়া থাকে।" কাজেই এখন গরিব গ্রন্থকারকে, বাঞ্ছারামবাবুর কথার ছাঁচুনি কাটিবার নিমিত্ত, কিছু না কিছু বলিতে হইতেছে এবং তজ্জন্য এখন

কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, জাতীয় যে ছোট বড় ভাব, তাহা ন্যস্ত কার্য্যের লঘুত্ব ও গুরুত্ব লইয়া; যেমন একজন মনস্তত্ত্ববিৎ ও একজন শিল্পকার, সমাজের পক্ষে এ উভয় যদিও সমান আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব হেতু মনস্তত্ত্ববিদের আসন প্রথম, দ্বিতীয় আসন শিল্পকারের। জাতীয় ছোটত্ব বড়ত্ব বিভাগও তদ্রূপ। অতঃপর আমাদিগের প্রস্তাবিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে কে ছোট কে বড়, তাহা পাঠকেরা ঐরূপ আপনাপনি আলোচনা দ্বারা, স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। তৎপক্ষে আমাদিগের আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

গ্রীক এবং হিন্দু, এ উভয় জাতিও, নিয়ন্তার সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য, তন্নিয়োজিত দুইটি বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন ভার লইয়া, এ জগতে সমাগত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা একপিতৃসন্তান হইলেও এবং পৃথক্ হইবার প্রতিকূলে সহস্র উপায় অবলম্বন (যদি তাহা সম্ভব হয়) করিলেও, তথাপি কর্ম্মসূত্রবশে তাহাদিগকে পৃথকত্ব অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, সেই পৃথকত্ব দৃশ্যতঃ কিরূপে উপস্থিত এবং গঠিত হইয়াছিল।

একবংশত্ব সত্ত্বেও, হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থা ও প্রকৃতিগত বৈষম্য, কর্ম্মসূত্রের নিয়োজন ও কর্ম্মক্ষেত্র বশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে,—বাইবেলভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র, বা আদম ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মুসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃস্থান সেই,

"সপ্তর্ষিণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ। মূর্ত্তিমান্ সৌম্যরূপে সপ্ত ঋষি যথায় বাস করিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবিণী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থান দেবর্ষি-চরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং

যথায় চৈত্ররথকানন দেব-গন্ধর্ব্ব-বিলাস-যোগ্য প্রাকৃতিক-মাধুর্য্য পূর্ণভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ আমাদিগের পিতৃস্থান।[১] আমাদের পিতা বিধাতার মানসপুত্র স্বায়ম্ভুব, এবং মাতা বিধাতৃদুহিতা শতরূপা। কুলপতি সপ্ত-ঋষি, অদ্যাপি যাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গগনে জ্যোতির্বিস্তারে গগনকে শোভনতর করিতেছেন। রাজ্যেশ্বর প্রিয়-ব্রত, সকানন‍া সাগরাম্বরা সসপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর যাঁহার আধিপত্য। মধুস্রাবী একই ভাষা; যুগযুগান্ত গত হইয়াছে, তথাপি আজি পর্য্যন্ত ভাষাদ্বয়ে শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক একতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে এক স্থানে, এক পিতৃদেবতার বশবর্ত্তিতায়, এক-দেবতা-পূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দুগণ এক জাতি থাকিয়া এবং কে জানে কতকাল ধরিয়া, একই ভাবে ও একই বৃত্তিশালী হইয়া; আহার বিহার বিলাস

১। Prichard's Physical History of Mankind, Max Muller's Science of Language, Muir's Sanskrit Texts, Vol. II. এই সকল গ্রন্থ একবংশত্বের প্রমাণ স্থলে দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় ডল্‌ফিন্ হইতে বঙ্গীয় পুঁঠিমাছ পর্য্যন্ত আরও কত কত গ্রন্থের, এতদ্বিষয় প্রতিপাদন করিতে, উৎপত্তি হইয়াছে। আমার প্রবন্ধস্থিত কথা সত্য কি মিথ্যা তাহার মীমাংসায় যাঁহাদের সন্দেহ হইবে, আজীবন বসিয়া সেই সকল গ্রন্থ দেখিবার ভার তাঁহাদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। পদে পদে, বিশেষতঃ যে সকল কথা ও মীমাংসা সর্ব্বজনপরিচিত, তথায় রাশি রাশি কেতাবের নাম তুলিয়া প্রমাণ প্রয়োগের কি সত্য সত্যই আবশ্যক হইয়া থাকে? বিশেষতঃ যে দেশে স্কুলের বালকেরা পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের বচন উঠাইয়া প্রমাণ প্রয়োগে লজ্জিত হয় না, তথায় কি তদ্রূপ প্রমাণ প্রয়োগের বস্তুতঃ কোন মূল্য থাকিতে পারে? যাহা হউক, পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, আমার দ্বারা বঙ্গীয় পাণ্ডিত্যের অনুকরণে সর্ব্বদা প্রমাণ প্রয়োগের কার্য্য বড় একটা ঘটিয়া উঠিবে না; এবং ভরসা করি, ঘটিয়া উঠিবে না বলিয়া যে আমার কথায় তাঁহারা একেবারে অবিশ্বাস করিবেন, এমন নহে। যদি করেন, তবে হয় তাঁহারা মনে ভাবিয়া থাকেন আমি দাগী আশামি; নতুবা বলিতে হয়, সকলে যাহা জানে তাহা তাঁহারা জানেন না। নিতান্ত আবশ্যক স্থলে প্রমাণ প্রয়োগের ত্রুটি হইবে না।—লেখক।

বলা বাহুল্য যে, লেখকের এতটা ভূমিকা, কেবল সম্মানার্হ বঙ্গীয় পাণ্ডিত্যকে নিতান্তই ফাঁকি দিবার ফিকির! ছি! এতটা ফেরেব ভাল নহে।—বাঞ্ছারাম।

বিস্তার পূর্ব্বক কালযাপন করিতেন। ভিন্নতার নামমাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কোন সংযোগই চিরদিনের নহে! পিতা পুত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হইয়া থাকে, সুতরাং এ সংযোগও চিরদিন থাকিবার নহে। যে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপালন জন্য এতদিন ইহারা সংযোগবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল, এতদিনে তাহার সমাধা হইয়া আসিল। সংযোগে পালনযোগ্য ন্যস্ত-কার্য্য সমাধা হইলেই, একক হউক বা অপর নবসংযোগে হউক, নূতন আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বসংযোগ আর রক্ষা হইবার কথা নহে।

কালবশে ইহাদিগেরও সংমিলন ভাঙ্গিল। মহদুত্তেজক অভাবের বৃদ্ধি হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না; অথবা যে কোন কারণের উপস্থিতি জন্য বা যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া হউক, আবশ্যক বোধে, পার্থক্য অবলম্বন পূর্ব্বক, ইহারা সুখলালসায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া, যদৃচ্ছা যথাভিগমনে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রমণেই হলস্কন্ধে, ধনুর্ব্বাণহস্তে, বিশাল হিমাদ্রিচূড়া লঙ্ঘন করিয়া, পুণ্যসলিলা সরস্বতী এবং সপ্তসিন্ধুতটে অবতীর্ণ হইলেন। অন্য দিকে গ্রীকগণ বহুতর নদনদী পর্ব্বত বন ও দেশ অতিক্রম করিয়া, বহুরক্তপাতে, বহুকষ্টে ও বহুশ্রমে, বহুদূরভ্রমণান্তে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী হেলাসভূমিতে পদার্পণ করিলেন। স্ব স্ব উপনিবেশস্থলে পদার্পণমাত্রেই শান্তিলাভ, উভয়ের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। উভয়ে উভয় দেশে পদার্পণমাত্র দেখিলেন যে, তত্তৎস্থানের আদিম অধিবাসিগণ উভয়েরই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী, দৈত্যকুল; হেলাসে পিলাস্‌গী। উভয়েই স্বীয় স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করিয়া এবং দাসত্বপদে আনিয়া, আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। নানা ঘটনাযুক্ত ও নানা অবস্থাসঙ্কুল বিভিন্ন পথাতিক্রম জন্য উভয় জাতির মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ভিন্ন, ছাড়াছাড়ি হইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তি এবং প্রকৃতি এ দুয়ের একতাপক্ষে, এখনও উভয়জাতির মধ্যে বিশেষ ব্যত্যয় ঘটিয়া উঠে নাই

বলিতে হইবে। কিন্তু এ একতাটুকুও আর অধিককক্ষণ থাকে না। স্ব স্ব বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের প্রবেশ আরম্ভ হইল।

হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয় জাতি যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ব স্ব গন্তব্য এবং অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিল; সেই সময়ে, সেই দূরতম, স্মৃতির বহির্ভূত ইতিহাসের অনুদয় সময়ে, সমস্ত জগৎ ঘোর মূর্খতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পার্শ্বস্থ মানব সমস্ত তখন একরূপ পাশববৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বনে বনে, গিরিগহ্বরে, সমুদ্রবেলায়, ক্ষুব্ধ-চিত্তে আহারলালসায়, যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইত। মিসর এবং ফিনিকীয় সভ্যতার স্তিমিতালোক তখনও প্রজ্বলিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা, বোধ হয়, তত্তৎ দেশমধ্যে আবদ্ধ এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ-ভাবে সম্পর্কবিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক উভয়জাতিই, স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথে, সহচর, সহায় বা পরিচালক বন্ধু অথবা প্রতিকূল-ক্রিয়া-উৎপাদক শত্রু স্বরূপ, দ্বিতীয় কাহাকে প্রাপ্ত হয়েন নাই। স্ব স্ব দিকস্থ এই দীর্ঘ পথ বোধ হয় ইহাঁরা,একমাত্র ক্ষণিক নিরাশ্রমী জাতীয় সংস্রব ভিন্ন, একাকী অতিবাহন করিয়াছিলেন।

যে শৈশব, যৌবন ও জরা মানবীয় ব্যক্তিগত জীবনে, বা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সম্বন্ধে নিত্য নিরন্তর অভিনীত; মানবীয় জাতীয় জীবন, জ্ঞানজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধেও, অবিকল তাহাই। দেশ কাল পাত্র আদি পার্থক্যবোধক মায়া ভেদ করিলে, অনন্ত পূর্ণতাময় বিশ্বনিয়মের কি অপূর্ব্ব একতাই না লক্ষিত হয়। এখান হইতে সেখান, এ কাল হইতে সে কাল,এ কাজ হইতে সে কাজ; সকলেই প্রসারণ হইতে সঙ্কোচনে পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া, শেষে আসিয়া একতায় মিশিয়া বিশ্বরূপে পরিণতি পূর্ব্বক, কি পরিস্ফুট স্বরে দেশকালাদির নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে! সে যাহা হউক, মানবচিত্ত শৈশবে বিচারবিহীন, বিকারবিহীন, দুগ্ধমথিত সদ্যনবনীতবৎ নির্ম্মল, কোমল, টল্ টল্ করিতেছে; পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া

থাকে। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, শৈশব হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের জীবনে, জ্ঞানজীবনের উৎপত্তি বৃদ্ধি প্রসারণ ও পরিণাম আদি যে ভাবে ও যেরূপ প্রকরণে অভিনীত হইয়া থাকে; আদিমকাল হইতে উত্তরকালিক মানবীয় জাতীয় জীবনেও, জ্ঞানজীবন বিষয়ক অভিনয় তদ্রূপ। ব্যক্তিবিশেষের আশৈশব জীবনতত্ত্বে যে ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারিয়াছে; কি বিবর্ত্তবাদ, কি ক্রমোন্নতি, কি অপর যে কোন প্রকার বীক্ষণপ্রণালী, যদবলম্বনে হউক, জাতীয় জীবনতত্ত্বে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অতীব সহজ। শিশু অনন্ত গর্ভ হইতে নবাগত, সংসারচাতুরীতে অপরিচিত এবং বোধশূন্য; সুতরাং চক্ষু নলিন, নবীন, পূর্ব্বদর্শনশূন্য এবং অকপট। যে যে ভাবে নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে; চাতুরীশূন্য, সর্ব্ব বস্তুতে সমদর্শী, তাহার অকপট-চিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই, সেই নেত্র এবং চিত্ত সমক্ষে রোষ, ভয়, বিশ্বাস, মোহ প্রভৃতি, যাহা ইচ্ছা, তাহা উৎপাদনে সমর্থ হয়। এ সময়ে প্রবলতা সহকারে যে যে ভাবে সেই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, চিত্ত যথাদিষ্টবৎ মোহতাড়িত হইয়া সেই ভাবে আকর্ষিত এবং তদনুরূপ শিক্ষিত হইবে। যদিও চিত্তধর্ম্মে, গ্রীকজাতি এবং হিন্দুগণ উভয়েই, সেই প্রাচীন বা ইতিহাসের অনুদয় কালে, ধর্ম্মলালসা, বলবীর্য্য, সাহস ও বীরদর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে পরিপূরিত ছিল; তথাপি বুদ্ধি ও জ্ঞানপর্ব্বে, সে সকল গুণ, অপার উন্নতগামী গুণ-সংসারের গণনায়, অতি নিম্ন পর্য্যায়ে অবস্থান করিত বলিতে হইবে। যে যে গুণের উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিতায়তন হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে, সমাজ এবং সংসার যাহার কল্যাণে স্বর্গখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়, এবম্প্রকার গুণ ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ মানবীয় জ্ঞান-জীবন সম্বন্ধে তাহাদিগের এই শৈশবকাল। তাহা-দিগের জাতীয় জীবনেরও এই শৈশবকাল। জাতীয়চিত্তও, সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়তঃ, অনুরূপ শৈশবোচিত। এ সময়ের দর্শনস্থলীয়, প্রধানতঃ

ভৌতিকজগৎস্থ আধিভৌতিক ব্যাপার; আত্মিক জগৎ ও তদুৎপন্ন আধ্যাত্মিক ঘাত প্রতিঘাত আদি অতিশয় বিরল। যাহা হউক, যথা-রূপা বাহ্যজগৎ এ সময়ে যে ভাবে ও যে মূর্ত্তিতে, চিত্তকে আকর্ষণ করিবে; চিত্ত সেই ভাবে আকর্ষিত এবং তাহাতে পূর্ণ ও তাহাতে শিক্ষিত হইবে। এই আদি এবং নৈসর্গিক শিক্ষা, বর্ত্তমান এবং প্রায় সমগ্র ভাবী জীবনপ্রবাহেরও, পরিচালক স্বরূপ হইয়া থাকে; উহা যে কোন বিশেষ ভাবে হউক, একবার তদ্রূপ পরিচালকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, বহুযত্নেও আর তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। প্রধানতঃ ইহা হইতেই দৃশ্যমান জাতীয় প্রকৃতির উৎপত্তি হয়!

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। পুনরুক্তি বা অনাবশ্যক হইলেও, বলিতে ক্ষতি নাই। উপরে জাতীয় প্রকৃতির নির্ম্মাণবিষয়ে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি ও তদীয় আকর্ষণাদির যেরূপ আলোচনা করা গেল, তদ্দ্বারা যেন এরূপ কোন মতে বিবেচিত না হয় যে, একমাত্র নিসর্গ-প্রাণ বাহ্যজগৎ, মানবজীবনের গতিচাতুর্য্যসম্পাদন এবং তাহার ভাবী পরিণামভিত্তিস্থাপন পক্ষে বলবতী; অথবা, মানব-প্রকৃতি আত্ম-স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল এক বাহ্যজগতে লীন হইয়াছে। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি যাহা, তাহা সর্ব্বদাই বাহ্যজগৎ হইতে মানবের স্বাতন্ত্র্যভাব পরিজ্ঞাপন করিতেছে। বাহ্যজগৎ আমাদিগের সম্বন্ধে কেবল কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন এবং কর্ম্মভিত্তি নিরূপণ ও কর্ম্মার্থে উপ-করণাদি সম্প্রদান করিয়া থাকে; আমরা নিজ অন্তঃপ্রকৃতি যোগে সেই কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে সেই কর্ম্মভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া, সেই উপকরণ-রাশির সদ্ব্যবহারে ও স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালনে, কর্ম্মরাশির সমুৎপাদন করিয়া থাকি। সুতরাং এখন প্রতীত হইবে যে, আমাদের অন্তঃ-প্রকৃতি যাহা, তাহা সর্ব্বদা স্বাতন্ত্র্যভাবযুক্ত এবং কেবল আমাদের বহিঃপ্রকৃতি যাহা, তাহাই বাহ্যজগতে লীন হইয়া থাকে। এ স্থলে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা এই

প্রস্তাবমধ্যে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহ্যজগৎ, কোথাও বা মনুষ্য-প্রকৃতি, এরূপ একধরণের বহু শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি; কিন্তু প্রত্যেক শব্দ ঠিক কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? দার্শনিকের ন্যায় কোন বিশেষ শব্দকে বিশেষ অর্থদানে সেই শব্দের অর্থসঙ্কীর্ণতা সাধন করা, আমাদিগের কখনই রুচিকর নহে; বরং সর্ব্বান্তঃকরণে সেরূপ কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া থাকি। তথাপি দেখিতেছি, এই প্রস্তাবমধ্যে, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নিকটার্থবোধক বিবিধ শব্দের একত্র সংযোজন হেতু, ক্ষণিকের নিমিত্ত প্রত্যেকের অর্থ নির্ব্বাচন কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে। অতএব প্রকৃতি অর্থে, যাহার নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াফলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি: যাহা নিয়ন্তার পরবর্ত্তী ও আর সকলের আদি, যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞা-বশে কর্ম্মসূত্রের পরিচালন করিতেছে, যাহা সর্ব্বব্যাপিনী এবং যাহার আদি ও অন্ত কেবল নিয়ন্তায় সন্নিহিত, তাহাই এখানে প্রকৃতি পদে বাচ্য। তদ্ব্যতীত আর সমস্ত, অর্থাৎ যাহা পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তাহা বাহ্যজগৎ। মনুষ্য-প্রকৃতির অর্থ চলিত অর্থ, উহার আর বিশেষ অর্থবাচনের আবশ্যকতা নাই।

বাহ্যজগৎ এবং মানবপ্রকৃতি, এ উভয়ে স্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু এক্ষণে এই প্রবন্ধের পরিবোধার্থে, এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা ও অবধারণা আবশ্যক। বাহ্যজগৎ যাহা, তাহা প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র, অথবা অন্য কথায়, নিয়ন্তৃ-ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত; আর মনুষ্যপ্রকৃতি যাহা, তাহা সেই বাহ্যজগৎস্থ অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের অঙ্কশয়নশায়ী হইলেও, স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় অন্তর্জগৎ-পরিপোষণে এবং নিজ স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালনে সক্ষম। কিন্তু মানব-প্রকৃতি, স্বেচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কার্য্যকালে বিনা অবলম্বনে কার্য্য-সাধকতায় অক্ষম। অতএব অবলম্বন জন্য, কার্য্যকালে তাহা বাহ্য-জগতের মুখাপেক্ষী; তাহার সহিত সংযোগ এবং তাহার আশ্রয় ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, স্মৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা ইত্যাদি বৃত্তিনিচয় মনুষ্যপ্রকৃতির স্রষ্টৃ-প্রদত্ত

সম্পত্তি; বাহ্যজগৎ হইতে সে সকল প্রাপ্ত হয় নাই। চার্ব্বাক বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিষ্যগণ বলিতে পারে এবং বলিয়াও থাকে যে, আদিম কাল হইতে চেতন অচেতন এতদুভয়ের ক্রমান্বয় সঙ্ঘাতে, উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাহা যাহাদের হইয়া থাকে হউক, আমার হয় নাই; এবং যে ব্যক্তি সে কথা গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারই পক্ষে তাহা গ্রহীতব্য। আমার পক্ষে, যাহা সহজ বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, সহজে যাহা বিশ্বক্রিয়ার সহিত অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য-সাধক, যাহার সিদ্ধান্তে চিত্ত অপার অশান্তির স্থল হইয়া না দাঁড়ায়, এবং যদর্থে কুতর্কের অপ্রয়োজন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ এবং গ্রহণীয়। ঐ ঐ চেতনাচেতন সঙ্ঘাতে, ঐ ঐ বৃত্তি প্রবৃত্তি শক্ত্যাদি উৎপন্ন হয় না; তবে তদ্দ্বারা তাহারা জাগ্রত এবং বিকশিত হইয়া থাকে বটে। সে যাহা হউক, উপরি-উক্ত ঐ সকল বৃত্ত্যাদি মনুষ্য-প্রকৃতির আছে বটে; কিন্তু বাহ্যজগতের সহ সংস্রব বিরহে, ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর। উপমায় বলিতে গেলে, উহারা শাণিত অস্ত্রস্বরূপ, কর্ত্তন ও শোধনযোগ্য দ্রব্য পাইল যদি, তবেই নানাবিধ কার্য্যের উৎপাদন করিল এবং সেই কার্য্যে সেই ধার যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত করিলে, হয়ত ধারেরও বৃদ্ধি হইল; কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটিমাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে এবং অব্যবহারে মরিচা পড়ায়, হয়ত ধারের একবারে ধ্বংস হইয়া যায়। বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে পর, বৃত্ত্যাদি লইয়া করিব কি? আমার স্মৃতি আছে, কিন্তু কি স্মরণ করিব;—আমার স্মরণীয় বস্তু কোথায়? আমার মনীষা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব;—যে দৃষ্ট-বস্তুমার্গ অব-লম্বন ভিন্ন অদৃষ্টবস্তু অনুভবের সম্ভবতা শরীরধারীর পক্ষে অসাধ্য, সে বস্তু কোথায়? আমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু কাহার সহিত পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিব; তুলনীয় বস্তুর অভাব। আর আর বৃত্ত্যাদি সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ কথা বলা যাইতে পারে। এই সকল বৃত্ত্যাদি নিয়োগ বা অনিয়োগে, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ

ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা, সাধরণ মানবীয় কার্য্যসমূহেও, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ, বৃত্ত্যাদি সমস্ত, বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইলে, এবম্ভূত অকার্য্যকর হইয়া উঠে যে, মানব-প্রকৃতি, অস্তিত্ব সত্ত্বেও, অস্তিত্ব-বিহীনতা অপেক্ষা অধমভাব প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা অভিপ্রেত নহে; সে অভিপ্রায়ে প্রতি পদার্থের সার্থকতাই নিত্য নিয়ম।

অতএব মানবপ্রকৃতি, বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন, যে কোন কার্য্য-সাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা যাহা করি, যাহা বলি, বা আমরা যাহা ভাবি, সে সকলেরই ভাবাভাস অগ্রে আমরা বাহ্যজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি; নতুবা সেরূপ করিতে, সেরূপ বলিতে, সেরূপ ভাবিতে, বা কিছুই নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না। মানবচিত্তের সহ বাহ্যজগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির ভাসে প্রতিভাসিত হওয়া মাত্র; যদ্রূপ স্ফাটিকপাত্র, কোন বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প বা বস্তু বিশেষের নিকটস্থিত হইলে, সেই পুষ্প বা বস্তুর বর্ণে প্রতিভাসিত হইয়া সেই বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রতিভাস চিত্তমধ্যে ভাবরাশিরূপে পরিণত হইয়া, বৃত্তি সকলের স্ফুরণ ও চিত্তের প্রবাহময়ী কার্য্যভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ফলতঃ, আমাদিগের চিত্তের যে কিছু চিন্তা, কল্পনা ও ধারণাদি ক্রিয়া তাহা, বহির্জ্জগৎ হইতে প্রাপ্ত যে সকল ভাবাভাসসমষ্টি তাহারই, আবশ্যকোচিত ও দেশকালোচিত নূতন সাজে ও নব সংযোজনে, অন্তর্জগৎ যোগে প্রতিপ্রসবমাত্র। সে যাহা হউক, বাহ্যজগৎ কি সরল অথচ কৌশলময় সূক্ষ্মতর, কূটতর অদৃশ্য পন্থা দিয়া মানবচিত্ত সম্বন্ধে তাহার এই সুমহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে; আমরা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না এবং মনেও কখন এমন খট্‌কা হয় না যে, তলে তলে এতটা কাণ্ড হইয়া যাইতেছে!

ধীর শান্ত অনিল-বাহী বাসন্ত প্রদোষে মেঘতমসাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল দেখিয়া, আমার মন সহসা তমসাচ্ছন্ন হইয়া ম্লানভাবে এরূপ অভাবনীয়

চিন্তামগ্ন হইল কি জন্য? দেহপিঞ্জরে প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিতেছে, কি সকল কথা মনে হইতেছিল, হইতে হইতে নষ্টস্বপ্নবৎ আবার যেন তাহারা কে কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছে। কোথায় আকাশের দূর প্রান্তে মেঘমালা ঝুলিতেছে, আর কোথায় আমি এই দূর সংসার-কান্তার বা ভূমিকান্তারে পতিত রহিয়াছি; উভয়ে এই বিষম দূরত্বে অবস্থিত, তথাপি কেন উহা দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষিত এবং আকর্ষণহেতু চিত্তে নানা অভাবনীয় ভাবান্তর সকল আসিয়া উপস্থিত হইল;—ঐ মেঘের সহ আমার মনের কি সম্বন্ধ বলিতে পার যে, যাহাতে মনোমধ্যে ঐ ঐ ভাবান্তরের সম্ভব হইতে পারে? কোকিলের মধুর স্বরে শ্রবণের তৃপ্তি; পূর্ণচন্দ্রদর্শনে চিত্তের প্রফুল্লতা; নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপ নভঃস্থল দর্শনে মনোমধ্যে নিসর্গাতিক্রমকারী ভাবের উদয় ও ভাবসমূহের অনন্ত-প্রসারী তরঙ্গসঙ্কুল ঘাত প্রতিঘাত; দূরস্থ গীতবাদ্যধ্বনি শ্রবণে চিত্তের অস্থির-প্রসন্নতা; নির্জন বিশাল কান্তার দর্শনে দিশাহারা বিষণ্ণতা; নির্ঝরিণীপরিশোভিত গিরিগুহামধ্যস্থ কান্তার ভাগ হইতে বহুবিধ বিহঙ্গরবমিশ্রিত প্রতিধ্বনিতে মনোমধ্যে জন্মান্তরীণ ভাবের উদয়; এ সকল কি কারণে হইয়া থাকে? উর্দ্ধে বিদ্যুৎ-বজ্রাদি-যুক্ত নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল, নিম্নে স্বচ্ছন্দ-অন্ধকারময়ী রজনী; টিপ্ টিপ্ খদ্যোতমালা জ্বলিতেছে, বিদ্যুৎ-ঝলসে অন্ধকার আরও অধিকতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে; পতঙ্গের ঝিঁঝিঁরব, জলের তর তর ধ্বনি, ভেকের কলরব, বায়ুর শন্ শন্ শব্দ; এবম্ভূত সময়ে চিত্ত কেন চমকিত, সঙ্কুচিত এবং ভীত হইয়া, আত্মদার্ঢ্যতা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই সেই ভাবে লীন হইয়া থাকে? কোথায় মানবচিত্ত, আর কোথায় সেই সেই বস্তু; তথাপি, আবার জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে কেন আকর্ষিত উত্তেজিত এবং ভাবান্তরপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? কি কারণেই বা সেই ভাবান্তর ভাব, দৃশ্যাদৃশ্য ভাবে আমার ভাবী কার্য্যপ্রবাহের প্রসূতি স্বরূপ হয়? এ চৌম্বকীয় গুণ ইহাদের মধ্যে কে সংযোজিত করিয়া দিল? বলিতে পার কি? বল বল, বলিতে

পারিলে তোমাকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিব!—বাঞ্ছারাম, গেটের সেই নিসর্গ-আত্মার বাক্য স্মরণ হয় কি?

"'Tis thus at the roaring loom of time I ply,
And weave for God the Garment thou see'st Him by."

নিনাদ-আবর্ত্তময়ী কাল-তন্তমাঝে
করি নিত্য গতায়াত আমি এইরূপে,
করিয়া বয়ন বিভু-বসনবিভূতি,
দেখিতেছ তাঁকে তুমি উপলক্ষ্যি যাহে।

ইহাও সেই নিসর্গগৃহে কালতন্ত-বিসর্পিত ভূতেশের বসনাংশ বয়ন মাত্র। চুম্বকের চৌম্বকীয় গুণ যাহা হইতে, ইহাদের এই চৌম্বকীয় গুণও তথায় উৎপন্ন। যাঁহার আজ্ঞায় ফুল ফুটিতেছে, ফল পাকিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুরিতেছে, পরমাণু উড়িতেছে, আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, উহাও সেই বিশ্বকর্ম্মার কৌশল এবং কার্য্য। অথবা যাহারই হউক এবং আমরা তাহা বুঝিতে পারি বা না পারি, ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে, বাহ্যজগৎ ও মানবচিত্তের মধ্যে, সমধর্ম্মি-বস্তুসম্ভব একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ নিত্য অবস্থান করিতেছে; তাহা লুকাইবার নহে, হারাইবার নহে, অথবা ধ্বংস হইবারও নহে। অনন্তরূপা একত্বময়ী মহাশক্তির উহা, অবিরল এক-এবং-সর্ব্ব অভ্যন্তর-পরিচালিত শিরা ধমনী আদির সঞ্চরণক্রিয়া মাত্র! যে যে গুণ এবং পদার্থরাশির সমাবেশে বিশ্ব নির্ম্মিত এবং জগৎ নির্ম্মিত, মানবের আধিভৌতিক অংশও অবিকল সেই একইবিধ গুণপদার্থ সমাবেশে নির্ম্মিত হইয়াছে;—অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মানবদেহকে ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এখন দেখিবে সে বর্ণনা কেবল অলঙ্কারপূর্ণ অত্যুক্তি নহে, তাহা পূর্ণমাত্রায় সত্যপূর্ণ এবং সৎ। কেবল মনুষ্যদেহ নহে, কি জড় কি অজড়, যে কোন সামান্য বস্তুখণ্ডও, অবিকল সেই একইবিধ বিশ্বগুণ-পদার্থসমাবেশে নির্ম্মিত;—যাহাতে যাহাতে বিশ্ব রচিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ ও সামান্য মহৎ, সকল বস্তুই তাহাতে রচিত; পৃথক্ কেবল, রচিত পদার্থের

প্রকৃতি ও আয়তন অনুসারে, রচক গুণ ও পদার্থ সকলের পরিমাণ লইয়া। এ সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে অপর কোন এক পদার্থ সম্মিলিত হইতে না পারে; সুতরাং ইহা নিশ্চয় জানিও যে, মিলিত ও মেলকে সমপদার্থত্ব ভিন্ন, কথনও মিলনশক্তির সম্ভাবনা হইতে পারে না। দূর নিহারিকা ও নক্ষত্রসত্তা আকর্ষণ করিয়া যে আলোক-মালা আসিতেছে, তাহাও তোমার আমার দেহ এবং এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সংমিলিত হইয়া যাইতেছে; তাই জিজ্ঞাসা করি, সম্মিলনের অভাব কোথায় দেখাইতে পার বল দেখি? অতএব এ তত্ত্ব অনুসারে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্র বা মহৎ প্রতি পদার্থই এক একটি বিশ্বপ্রতিরূপ এবং এই নিমিত্ত, ব্যষ্টি সমষ্টি বিভাগ সত্ত্বেও, এই সমস্ত সৃষ্টি এক বিশাল বৈরাজ ও অদ্বৈত সংসারস্বরূপ। এই নিমিত্ত কোন এক স্থানে গুণ ও পদার্থ বিশেষে ঘাত প্রতিঘাত হইলে, নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রোত্থিত জলমণ্ডলবৎ ক্রম প্রসারণে তাহা সর্ব্বত্রগামী হইয়া; অথবা তাড়িতবেগবৎ চালকস্বরূপ সর্ব্বপদার্থে পরিচালিত হইয়া; সকলকেই বিক্ষোভিত বা এক আকর্ষণসূত্রে সকলকেই আকর্ষিত করিয়া, সর্ব্বত্র আকর্ষিতের স্বভাবভেদে অনুকূল বা প্রতিকূল বটে, কিন্তু সমজাতীয় ক্রিয়ার উৎ-পাদন করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্থূল এবং নিকট ক্রিয়া যাহা, তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি; দূর এবং সূক্ষ্ম যাহা, তাহা অনুভব করিতে পারি না; এবং যদিই বা কোন প্রকারে কখনও তাহা অনুভূতিতে আইসে, তখন হয়ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া, চপলতা সহকারে তাহার কারণনির্দ্দেশ লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকি। দেখ, পুত্রের বিয়োগ হইল; কিন্তু অতিদূরস্থিত পিতা মাতা সেই মুহূর্ত্তেই বিষম চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইল; সংবাদ নাই, পূর্ব্বাভাস নাই, অথচ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইল; কতজনে হয়ত এ ঘটনাকে আদৌ বিশ্বাসই করিতে চাহে না, কতজনে বা তাহার নানারূপ কারণ নির্দ্দেশ করিতে যায়। হিন্দু-মতে উক্ত সূক্ষ্ম আকর্ষণ ও যৌগিকতা, আকাশধর্ম্মে পরিচালিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এক্ষণে বক্তব্য এই যে, প্রতি বস্তুখণ্ড পূর্ণ

বিশ্ব প্রতিরূপ হইলেও, কথিত গুণ ও পদার্থতত্ত্বে পরিমাণের প্রভেদ হেতু বস্তু সকলে, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধে, বিজাতীয় ও সমজাতীয়, সমধর্ম্মী ও অসমধর্ম্মী, ইত্যাদি বিভাগের উদয় হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাতি ও ধর্ম্মাদির ভেদভাবহেতুই, বস্তু সকলের পরস্পর অন্বয়ে, গুণ ও পদার্থ ক্ষোভজাত ক্রিয়ায়,কোথাও অনুকূলতা কোথাও বা প্রতিকূলতা দৃষ্ট হয়। সমধর্ম্মী ও অসমধর্ম্মী পদার্থদ্বয়ের এক অপরের সম্বন্ধে আতিশয্য প্রাপ্ত হইলে,তাহাকে বিষ শব্দে অভিহিত করা গিয়া থাকে। সাপের বিষ মানুষের শরীরেও আছে, কিন্তু সাপে নিহিত বিষ পদার্থের আতিশয্য হেতুই, মানুষের পক্ষে তাহা বিষজন্য ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। আত্মিক ও ভৌতিক, উভয় বিষয়েই, প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যা যাহা, তাহা বিষেরই হরণ পূরণ সাধন মাত্র।

গুণসংসারের নৈসর্গিক উত্তেজনায় আকর্ষক পদার্থবিশেষে কোন প্রকার গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে তাহা,আকর্ষিত পদার্থ যেরূপ প্রকৃতির ও যদ্রূপধর্ম্মী, তাহাতে, তদ্রূপ ক্রিয়া উৎপাদনে, ভাব ভাবান্তর আদি উপস্থিত করিয়া থাকে। এজন্য তোমার মনে যেরূপ ভাব উপস্থিত, আমার মনে হয়ত ঠিক সেরূপ না হইতে পারে; আবার মানুষের মনে যেমন, পশুর মনে তাহা হইতে স্বতন্ত্র; অজড়ের উপর যেমন, জড়ের উপর তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্য একই উত্তেজনায়, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবোৎপত্তি; সুতরাং বিভিন্ন ক্রিয়াফল প্রসূত হইতে দেখা যায়। এখন হয়ত আরও সূক্ষ্ম তর্কে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার,—কেন বিভিন্ন পদার্থে, বিভিন্ন পরিমাণে গুণপদার্থের যোজনা? তদুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, উহা কর্ম্মসূত্রের কার্য্য। পুনশ্চ বক্তব্য, চিত্ত আমাদের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, উভয় প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ-রজ্জুস্বরূপ। ইউরোপীয়গণ চিত্তকে আত্মারই অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু হিন্দু দার্শনিকগণ অতি গূঢ় দর্শন সহকারে চিত্তকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চিত্ত আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এ উভয়ধর্ম্মী বলিয়াই, আমরা তদবলম্বনে আকার হইতে নিরাকার

ও নিরাকার হইতে আকার এবং আধ্যাত্মিক হইতে আধিভৌতিক ও আধিভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক, উভয়তঃ উভয় সংসারে প্রবেশ করিতে এবং উভয়তঃ উভয়ের সম্মিলন সাধিতে সক্ষম হই। আরও বক্তব্য—চিত্তে যে কোন বিষয় হইতে যেরূপ ভাবাভাব উপস্থিত হয়, আমাদের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এ উভয় প্রকৃতিও সেইরূপ উত্তেজিত ও গঠিত হইয়া থাকে।

অতঃপর প্রোক্ত জাগতিক চৌম্বকীয় গুণ বা আকর্ষণসূত্র, যতই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হউক, যতই কূটমার্গ দিয়া গমন করুক; এবং কূটমার্গ বাহন-কালীন বিভিন্ন ভাবের সহ সংস্রবে ও সেই ভাব সকলের আতিশয্যে যতই তাহার আত্মগোপিত হউক; আর আমরা তাহা দেখিতে পাই বা না পাই; কিন্তু যখন আয়োজন পূর্ণ হইবে এবং যখন উপযুক্ত কালের সুবিধা পাইবে, তখন তাহা তোমাতে গুণবিক্ষোভ উপস্থিত করিয়া, তোমার দ্বারা যথাসম্ভব কার্য্য করাইয়া লইবেই লইবে। উহা হইতেই মানবের ভাবময় ও বিষয়প্রাণ কার্য্য সকলের উদয় হয়। পুনশ্চ, উক্ত আকর্ষণসূত্র কোন এক ভাব বিশেষ উৎপাদন, অথবা আরও ঊর্দ্ধে সেই ভাবানুসারিণী কোন এক কার্য্য বিশেষ সম্পাদন করাইলেই যে তাহার কার্য্যকারিতা ক্ষান্ত হইল, তাহা নহে; প্রতি কার্য্যসূত্রেরই অনন্ত মুখে গতি, অনন্ত প্রবাহে অনন্ত কার্য্য করাইতে করাইতে অনন্ত মুখে চলিয়া যায়। এক কার্য্যের বিরতি বা পূর্ণতা, আর এক কার্য্যের আরম্ভ মাত্র এবং আজি যাহা কারণ, কালি তাহা কার্য্যরূপে কর্ম্মাভ্যন্তরে সমাবিষ্ট; তথাবিধ অবস্থায় পুনঃ প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রতিপ্রসবে উত্তর-কারণৈকরূপে পরিণত হইয়া, উত্তর কার্য্যের জনক স্বরূপ হয়। যে কোন কার্য্যসূত্র, এইরূপ নিত্য নব কার্য্যকারণভাবত্বে, অনন্ত মুখে অবিরত চলিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং এখন বলা বাহুল্য যে, উত্তরোত্তর কার্য্য ও কারণসমূহের উদয়ে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য ও কারণসমূহের ধ্বংস হইতেছে না; কেবল ক্রিয়া-সংসারস্থ কার্য্যকারণসমূহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হেতু, তাহা উত্তরোত্তর সার হইতে আরও সারত্বে, সূক্ষ্ম

হইতে আরও সূক্ষ্মতায় পরিণত হইয়া, উত্তর কার্য্যকারণ প্রবাহ সম্বন্ধে, ভূমিপ্রোথিত গৃহভিত্তির ন্যায়, ভিত্তিভাবে মূলদেশে প্রোথিত হইয়া অদর্শন হইতেছে মাত্র। যাহা হউক, ক্ষুদ্র হইতে মহৎ, দৃষ্টিপথে পতিত বাহ্যজগৎস্থ সমস্ত বিষয়েই, বাহ্যজগৎ উক্ত চৌম্বকীয় গুণ হেতু মানবচিত্তকে আকর্ষিত করিয়া; বিষয়ভেদে ভাবভেদ দ্বারা, চিত্তে ভাবান্তরসাধন ও চিত্তকে তদ্রূপ ভাবে ভাবযুক্ত করিতেছে।— লৌহ চুম্বকের ন্যায় পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হইতেছে না বটে, কিন্তু লৌহ চুম্বকের কার্য্যাপেক্ষাও গূঢ়ভাবে গুরুতর কার্য্যসমূহ, বাহ্যজগৎ বাহিরে এবং মানবচিত্ত অন্তরে থাকিলেও, এতদুভয়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে; এবং এইজন্যই বলিয়াছি,এতদুভয়ের সংযোগ, একের বিভাসে অপরের বিভাসিত হওয়া মাত্র। এ সংযোগ তোমার আমার বারণ বা রূপান্তর করিবার ক্ষমতা নাই। কর্ম্মসূত্রবশে উহা যথাসম্ভব সংঘটিত এবং কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে উহা আমাদের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে।

বাহ্যজগতের ভাব একরূপ নহে, বহুতর, অসংখ্য। ইহার মূর্ত্তিভেদে ভাবভেদ। দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে, ইহার যখন যে ভাববিশেষ মানবচিত্ত সহ সংস্রবে আইসে, তখন চিত্তে তদনুযায়ী ভাবোৎপাদন ও তদ্ধেতু তদ্বৎ কার্য্য প্রসবিত হয়। এই সংস্রব ও তদনুসারিণী উত্তেজনা যে কত গুরুতম ও কত গূঢ়ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ, ঐ সংস্রব ও উত্তেজনা কেবল চিত্তে সমাবিষ্ট হইয়া এবং তদতিরিক্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি দৃশ্যমান ক্রিয়ামাত্র করিয়াই যে ক্ষান্ত হয় না,তাহাও উপরে কাল-অন্বয়ে আলোচনা করিতে দেখাইয়াছি যে, উহার কার্য্যসূত্র উত্তরোত্তর কার্য্যকারণ আকারে অনন্তমুখে চলিয়া যায়। এক্ষণে বিষয়-অন্বয়ে আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইবে যে, সে পক্ষেও উহার কার্য্যায়তন কম নহে;—কোন এক বিষয় হইতে উৎপন্ন যে মনের ভাব,সেই ভাব হইতে যে যে বিষয়ক ক্রিয়াগুলি করিবার জন্য চিত্তে প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহাদের সমষ্টি ও সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে। কোন বস্তু

দর্শনে তোমার মন চকিতবৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল; সেই ভাবান্তর-প্রাপ্ত মনে তোমার যে যে বিভিন্ন বিষয়ক কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মিবে, জানিও সেই সমস্ত বিষয় ও কার্য্য এবং তাহাদের প্রসূতিস্বরূপ ভাবান্তরটি, সকলেই একজাতীয় পদার্থ। যে সকল কার্য্যে ইচ্ছা জন্মে, সেই সকল কার্য্য ইচ্ছাগত থাকুক বা কর্ম্মরূপে দৃশ্যমান হউক, তাহারা সেই প্রসূতির অবশ্যম্ভাবী সন্ততি। অতএব যে বস্তু হইতে ভাবান্তরের উৎপত্তি সেই বস্তু, ভাবান্তর, ভাবান্তর হইতে উদ্ভূত কার্য্য-ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, এবং সেই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতে যে যে বিষয়ক কার্য্য কৃত, ইহারা সকলেই একধর্ম্মী পদার্থ; একসূত্রে গ্রথিত এবং একই তাড়িত-বেগে বিকম্পিত; প্রভেদ কেবল এইমাত্র যে, কেহ উৎপন্ন ও কেহ উৎপাদক। পুনশ্চ, তোমার মন হইতে অপরাপর মনেতে যে ক্রিয়োৎক্ষেপণ ও তাহার ফল, তাহাও এতদ্রূপ সম্বন্ধ গণনায় গণিত করিয়া দেখিও।

ভাব সকলের আবার একধা অসীম সমাবেশও হয়। কোন এক ভাববিশিষ্ট মন, অন্যরূপ ভাববিশেষে আকর্ষিত বা সংযোজিত হইলে; মনের ক্রিয়াক্ষেত্রে যুগপৎ অন্য ভাবান্তর ও ভাবফলও প্রসবিত হয়। এক ভাবান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে, তথায় যে অন্য অন্য ভাবান্তর স্থান পায় না, তাহা নহে। ভাব-উৎপাদিকা বাহ্যজগতের মূর্ত্তি যেমন অসংখ্য ও অপারবৈচিত্রময়ী, বৈচিত্র-প্রকটনকারী কালও তেমনি নিত্য আবর্ত্তনশীল, আবার ভাবগ্রাহী মানবীয় চিত্ত-দর্পণও নিতান্ত সামান্য নহে। সুতরাং পর পর, উপরি উপরি, বা যুগপৎ একই সঙ্গে, বহুভাব সকলের উৎপত্তি ও সমাবেশ হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এবং ইহা হইতেই মানবচিত্ত বহুধা বৈচিত্রময় ও একধা বহুকার্য্যশীলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পুনশ্চ, সান্নিধ্যস্থিত বস্তুবিশেষ হইতে স্ফাটিক পাত্র যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহার উপর বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ সংযোগ হইলে যেমন সেই পূর্ব্ব-প্রাপ্ত বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; তেমনি বাহ্য-জগৎস্থ কোন এক ভাবের সহ সংযুক্ত মানবপ্রকৃতি, যদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বা

যে কোন প্রকারে অপর ভাববিশেষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎপরিমাণ অনুরূপ পূর্ব্বভাবের ও তদুৎপন্ন কার্য্যেরও ব্যতিক্রম ঘটনা হয়। ব্যতিক্রম মাত্রে ছন্ন ও অসংলগ্ন হইলেই হেয়; নতুবা, উহা যখন সূত্রগ্রথিত, সুসজ্জিত ও সামঞ্জস্যযুক্ত, তখন অন্য দিকে তদন্যথায় যে অধিক পরিমাণে হেয়র কারণ হইত, এখানে উহা সেই অধিক পরিমাণে বৈচিত্রময়ী শোভার কারণ হইয়া থাকে। যে কোন বর্ণময় জমীবিশেষে, যখন বহুবর্ণবিন্যাস জমীর সহ সহানুভূতি পূর্ব্বক কোন প্রতিকৃতির আকারে প্রতিফলিত হয়, তখনই তাহা চক্ষুতৃপ্তির কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু অতৃপ্তির কারণ হয় তখন, যখন সুসজ্জিত করণ ও চক্ষুতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বর্ণবিন্যাস সকল জমীর সহ সহানুভূতিবিহীন এবং নিজেরাও ছিন্ন ভিন্ন ও যদৃচ্ছাক্ষিপ্ত ভাবে প্রযোজিত। মানবচিত্তে ভাব ও ভাবান্তর সমাবেশ সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ। ভাব সকলের সংযোগবিহীন ছন্ন সমাবেশের ফল হইতেই, আমরা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষে যে স্বভাবের কার্য্য নিয়তঃ প্রত্যাশা করিয়া থাকি, মধ্যে মধ্যে তাহার অতৃপ্তিকর দূষণীয় ব্যতিক্রম দেখিতে পাই।

চিত্তমধ্যে ভাব সকলের গ্রহণোত্তরে, তাহাদিগকে সুসজ্জিত ভাবে সমাবেশকরণ ও তন্মূলক কার্য্য সকলের উৎপাদন, এ উভয়ই আত্মিক শক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আত্মিক শক্তিচালনায়, কি আপেক্ষিক অপকর্ষ কি উৎকর্ষ ভাব, উভয়ই কালসাপেক্ষ। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ভাবিও না যে, সেই শক্তিচালনায় সাত্বিক ভাব যাহা সেটাও কালসাপেক্ষ, তাহা নহে; উহা কালের অপেক্ষা রাখে না, কারণ সে অপেক্ষা রাখিলে, প্রতি কর্ম্মকারক আপন শ্রমসার্থকতার পরিমাণ ও তদুৎপন্ন শান্তি পাইবে কোথায়? আমরা ন্যস্ত কার্য্যে যথাজ্ঞান ও যথাবুদ্ধি সাত্বিক ভাবে শক্তিচালনা করিতে পারিলেই, দায় খালাসে শান্তির পাত্র হইতে সক্ষম হই। সে যাহা হউক, কেবল সুসজ্জিত করণ ও তাহা হইতে কার্য্যরূপ ফলাকর্ষণ ক্রিয়াই আত্মিক শক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; নতুবা যে সকল বস্তুর যোগে

চিত্ত প্রতিভাসিত ও ভাবযুক্ত হয়, তাহাদের আয়োজনের উপর তাহা অধিকার ও ক্ষমতাবিহীন। সুসজ্জিতকারিণী আত্মিক শক্তি, যথায় যেরূপ উপকরণ সংগ্রহ দেখিয়া থাকে, তথায় সেইরূপে ও তাহারই অনুগামিনী হয়। ফলতঃ যেখানে যেরূপ উপকরণ দেখা যায়, সেখানে যেরূপে সুসজ্জিত করিলে তাহাদিগকে ভাল বা মন্দ দেখায় অথবা ভাল বা মন্দ ফল হয়, তাহারই সাধন করা আত্মিক শক্তির কাজ।

কি ব্যক্তিবিশেষে, কি জাতিবিশেষে, সুসজ্জিতকারিণী আত্মিক শক্তির কালানুরূপ যথোপযুক্ত পরিচালনার অভাব হইলেই, তত্তৎ ব্যক্তি বা জাতি হেয় হইয়া থাকে; এবং কালের প্রতি তরঙ্গাঘাতে, মূলশূন্যবৎ একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া, শেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, উভয় জীবন পরিচালনে, কথিত আত্মিক শক্তিকে কালবিবর্ত্তিত উৎকর্ষানুরূপ চালনা করা একান্ত আবশ্যক। যে সকল বস্তুর ভাসে প্রতিভাসিত হওয়া, অর্থাৎ যাহাদের সংস্রবে কথিত চিত্ত-ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ার বিষয় উপরে বলিয়া আসিলাম; তাহার সহ অপরবিধ অর্থাৎ আত্মিক ভাবদাতা অন্তর্জগৎ সংমিলিত হইলে, যে অপূর্ব্ব গুরুচণ্ডালী যোগ উপস্থিত হয়, সেই যোগই ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। জাতি সম্বন্ধে উহারই প্রসাদাৎ জাতীয় প্রকৃতি; এবং সেই প্রকৃতিতে আত্মিক শক্তির কালানুরূপ পরিচালনে যে তারতম্যভাব, তাহাই উৎ-কর্ষ বা অপকর্ষ, সভ্যতা বা অসভ্যতা, উন্নতি বা অবনতি, ইহার এক-তররূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। অথবা উল্টাইয়া দেখিলে, সেই উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, সভ্যতা বা অসভ্যতা, ইহার যদেকতর, সেই আত্মিক শক্তির কতদূর যে চালনা করা হইয়া থাকে, তাহারই পরিমাণ মাত্র। পুনশ্চ ইহাও মনে থাকে যেন যে, আত্মিক শক্তি পরিচালনায় সফলতালাভ কালসাপেক্ষ; এবং কালসাপেক্ষ বলিয়াই, একই দিনে কোন ব্যক্তি বা জাতি একেবারে উন্নত ও সভ্য, অথবা একবারে অব-নত বা অসভ্য হইতে পারে না। অতঃপর বলা বাহুল্য যে, এক্ষণে

যিনি উপরে বর্ণিত সমগ্র তত্ত্ব অবগত হইয়া এবং কথিত বাহ্যজগৎ ও মানব-প্রকৃতির সহ সম্বন্ধ অবধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক কার্য্যে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, এতৎ জাতীয় জীবনদ্বয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন; তিনিই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট পটুতালাভে কৃতকার্য্য এবং মানব জীবনপ্রবাহের অদ্ভুত কৌশল জ্ঞাত হইয়া তাহাতে অপার আনন্দলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন।

বলিয়াছি যে, জাতিদ্বয়ের জ্ঞানজীবনের এই শৈশবকাল। চিত্ত তরল, কোন একটি বস্তুসংঘাতে, সহসা বিপুল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। সুতরাং এ সময়ে ইহারা বাহ্যজগতের যে যে ভাবের সহিত সংযোগে আসিয়াছে, তাহাতেই তরঙ্গায়িত হইয়া, উদ্বেলিত অন্তর্জগৎ সংযোগে অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই উভয় জাতি স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে পদার্পণ করিলে পর, বাহ্যজগৎ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া প্রত্যেকের ভাবী জীবনপ্রবাহ এবং তজ্জনিত শুভাশুভের কিরূপ ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল, তাহার প্রবোধার্থে আপাততঃ স্থূলতঃ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

হিন্দু এবং গ্রীকেরা স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমনহেতু পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে, মধ্য আসিয়ায়, যে স্থানকে উত্তরকুরুবর্ষ বলিত তথায়, একত্র মিলিয়া বাস করিতেন। এই উত্তরকুরুস্থ আর্য্যবংশ জনসংখ্যায় নিতান্ত সামান্য ছিল না; যেহেতু, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে দেখা যায় যে, স্কান্দিনেবীয়, টিউটন, রোমক, পারসিক প্রভৃতি অপরাপর বহুতর জাতি সমস্ত এই এক বংশ হইতে উৎপন্ন। দেশমধ্যে ক্রমে স্থান এবং আহার সঙ্কুলান না হওয়ায়, ইহারা ক্রমে ক্রমে একের পর আর স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুখলালসায় বহির্গত হইয়া নানাস্থানবাসী হইয়াছিল। এই দেশ আয়তনে সঙ্কীর্ণ; এবং আকৃতিতে ক্ষেত্র, মরু, পর্ব্বতাদিতে পর্য্যায়ক্রমে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এখানে বহু পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হইবার কথা নহে। কিন্তু যেটুকু স্থান অনুকূল, তাহা উৎকৃষ্ট; প্রকৃতিমূর্ত্তি না সামান্য না মহান্ অথচ তৃপ্তিকর;

নদী সকল সামান্যপ্রাণা ও স্বচ্ছসলিলা; জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং ভূমিও সুন্দরফলরসাদি প্রদান করিয়া থাকে। ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায় যে, এই স্থানকে আশ্রয় করিয়া, একাল ধরিয়া কতই না রাজ্য উদিত ও পতিত হইয়াছে। মৃগয়ামাত্র-উপজীবী অরণ্যচর তাতারবংশের যখন যে কেহ এই অনুকূল স্থানকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছে, তখনই সে এক অভিনব রাজ্যের অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমর্থ হইলেও কিন্তু পার্শ্বস্থিত ক্ষুধার্ত্ত অপরাপর জাতীয় বিদ্বেষের সংঘাত হেতু, কখনই কেহ তদ্রূপ রাজ্য স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারক হয় নাই। ঐতিহাসিক সময়ে উক্তরূপ যে অভিনয় হইতে দেখা গিয়াছে, ইতিহাসের অনুদয় সময় হইতেই সে অভিনয়ের আরম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দু এবং গ্রীকের আদি পুরুষেরাও, সেই অভিনয়সূত্রে, তথা হইতে বিতাড়িত হয়েন; এবং তাহাদের পূর্ব্বগত স্কান্দিনেবীয় ও রোমকেরাও নিঃসন্দেহ সেই একই কারণে বিতাড়িত হইয়া থাকিবে।

প্রকৃতির অননুগৃহীত যাহারা, তাহারাই অগ্রে বিতাড়িত হইয়া থাকে;—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সে নিয়ম অনুসারে দেখিতে গেলে, স্কান্দেনেবীয় প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রস্থিত জাতি সমস্ত হইতে গ্রীকগণ অধিক অনুগৃহীত; এবং সর্ব্বশেষে বহির্গত হইয়াছিলেন যাঁহারা, হিন্দুদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষগণ, তাঁহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অনুগৃহীত বলিতে হইবে। কাজেও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে বহির্গত জাতিগণ যখন নূতন স্থান ও নূতন অবস্থা বশে নূতন জীবন রচনা করিতে বাধ্য এবং ব্যাপৃত হইয়াছিল; তখন স্বস্থানস্থিত জাতিগণের সেইরূপ নূতন জীবনরচনাব্যাপারে অনাবশ্যকতা হেতু, স্বচ্ছন্দে যথাস্থিত আত্ম-অবস্থার উন্নতিকল্পে সময়াতিবাহন করিবার কথা; এবং ইহার ফলও যে প্রস্থিত ও স্বস্থানস্থিত জাতিদ্বয়ভেদে বিভিন্ন ও ইতর বিশেষ হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। সর্ব্বশেষে প্রস্থিত হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষগণ, স্বস্থানস্থিতিকালীন সেরূপে অধিক ফল

পাইয়াছিলেন বলিয়াই; তাহাদের উত্তর পুরুষ ভারতীয়গণের সভ্যতা, পূর্ব্বপ্রস্থিত ও যথাপ্রাপ্ত দেশে উপনিবেশিত রোমক ও গ্রীকাদির বহুল অগ্রে উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, যখন সেই একবংশজ টিউটন ও স্কান্দিনেবীয় আদি অন্যান্য জাতিরা অপর দেশে নীত হইয়া, এবং তখনও উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, বন্যজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; গ্রীক এবং তদপেক্ষা আরও দীর্ঘকাল স্বস্থানভোগী হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষেরা, তখনও স্বস্থানেই থাকিয়া আপন আপন অবস্থার উৎকর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে জাতি যেরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার মানসিক বৃত্তি যে সেই পরিমাণে সতেজ হইয়াছে, সেই উৎকর্ষ ভাবই তাহার পরিচায়ক স্বরূপ হয়। সুতরাং বাহ্যজগৎ হইতে ভাবগ্রহণে ও তাহার উপরে কার্য্য-করণে, মানসিক বৃত্তি সেই পরিমাণে পটুতা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু মানসিক বৃত্তির মধ্যে অনুভব ও কল্পনা অর্থাৎ চিত্তশক্তিই সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত ও সতেজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার পর কালে বুদ্ধি ও কালে যুক্তি-শক্তি তেজস্বিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাশক্তি,চিত্ত বুদ্ধি ও যুক্তি, এতত্রয়ের যেন পরিণাম স্বরূপ হওয়াতে, উহা সকলেরই সঙ্গে ও সর্ব্বাবস্থায় সহানুভূতিযুক্ত থাকে; এ নিমিত্ত কেবল চিত্তশক্তির সঙ্গেও শ্রদ্ধার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বরং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, চিত্তের সঙ্গে শ্রদ্ধার যতটা সমাবেশ, বুদ্ধি বা যুক্তি বা তদুভয় সমষ্টি, ইহার কাহারই সঙ্গে ততটা নহে। শ্রদ্ধার কার্য্য বিষয়বিশেষে বিশ্বাস স্থাপন। যখন স্থানভ্রষ্টতা ও অবস্থাচ্যুতি ও বিপৎপাত ইত্যাদি উৎপাৎ শূন্য সুখলালিত উদ্ভিন্ন-জ্ঞান শৈশবকাল, তখনই চিত্তশক্তি স্ফুরিত হয় ও আধিক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ উদ্ভিন্ন-জ্ঞান শৈশবের ন্যায়, মানবীয় কালের এই প্রথম উৎকর্ষযুক্ত অবস্থার উদয় সময়ে,চিত্তশক্তিরই আধিক্য হওয়ার কথা। হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষেরা গ্রীকদিগের অপেক্ষা পরে বহির্গত হওয়াতে, স্বীয় স্থানে ও অবস্থায় তাহাদের সুস্থতা বশতঃ, চিত্তশক্তির সেই আধিক্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

বলিতে হইবে ; এবং এরূপ কারণ হেতুই, যেমন ইহাদের সভ্যতা অগ্রে উদয় হইবার কথা বলিয়াছি, তেমনি কল্পনাপ্রসূত বিদ্যা-উদ্ভাবনে ও নিগূঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসস্থাপনে এবং তদনুশীলনেও, ইহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রে অনেক উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর এইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাব এবং এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া, ও গন্তব্য স্থানের নিমিত্ত এইরূপ যথাসম্ভব উপযুক্ত হইয়া, হিন্দুর পূর্ব্ব-পুরুষেরা উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সুখের আশায় বা দুঃখে তাপিত হইয়া, বহির্গত হইয়াছিলেন।

গ্রীকেরা পূর্ব্বে বহির্গত ও প্রস্থিত হইয়া গিয়াছে। যে যে কারণের তাড়নায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি সকল বিতাড়িত ; হিন্দুরাও বোধ করি এতদিন পরে সেই তাড়নায় অস্থির হইয়া বহির্গত হইলেন। গ্রীক এবং অন্যান্য জাতিরা পশ্চিম পথে গিয়াছে।[২] যে কারণে স্বদেশ ছাড়িতে হইল, আবার পাছে পূর্ব্বগত জ্ঞাতিবর্গের সংঘর্ষে সেই কারণ উপস্থিত হয়, বোধ করি, ইহারা সেই আশঙ্কা করিয়াই, দক্ষিণ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞাত ও অপরিচিত ভূমি ভারত-মুখে প্রধাবিত হইলেন। এইরূপে, হিন্দুরা স্বল্পপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সুখলালসায়, মনের সাহসে, অল্পশ্রমে, অনুরূপ স্বল্পপ্রাণ নদী পর্ব্বত কানন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, ভারতক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট হইলেন। হয়ত এখানে উপনিবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, যেখানে যাইতেছি, সেখানকার জাগতিক মূর্ত্তি মধুর ও আহারীয় দ্রব্য প্রচুর এবং দেশস্থলী উত্তরকুরুবর্ষের ন্যায় চিত্তের সামঞ্জস্যসাধক হইবে। কিন্তু আশার কি বিপরীত ফল ! তাঁহারা ভারতে পদার্পণমাত্রে দেখিলেন যে, ভারতীয় জাগতিক মূর্ত্তি অভূতপূর্ব্ব বিরাটভাববিশিষ্ট। যুগপৎ ভয়বাৎসল্যের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদক। উত্তরে বিশাল হিমাদ্রিগিরি ধবলমূর্ত্তি ধরিয়া শতশৃঙ্গে, বিরাটদেহ ও বিরাটবেশে, গগনভেদপূর্ব্বক নক্ষত্রমণ্ডল স্পর্শ

২। Prichard's Researches into Physical History of Mankind, Vol. III., 390—403 Vol. IV., 603 ইত্যাদি দেখ।

করিতে প্রবৃত্ত। তাহার পাদদেশে ও পার্শ্বে, সপ্তসিন্ধু বায়ুবিক্ষোভিত সাগরতরঙ্গ অনুকরণ করিয়া, বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে গ্রীষ্মমণ্ডলবিভূতিমণ্ডিত মরুস্থল। যে দিকে নয়ন প্রসারিত কর, নয়নপথ অতিক্রম করিয়া ভীমমূর্ত্তিধারিণী নিবিড় বনভূমি, উন্নতশির বৃক্ষাবলী গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভীষণস্বভাব শ্বাপদ-কুল রব তুলিয়া বনভূমি আন্দোলিত ও কম্পিত করিতেছে। উর্দ্ধে গগনসাগরে ঘোরদর্শন শকুন্তবর্গ সন্তরণ দিতেছে। নিম্নে বীভৎসমূর্ত্তি কুটিলগতি খলস্বভাব বিষধর সরীসৃপকুল, ধীরমন্থরগমনে, অতর্কিত-ভাবে তৃণশস্পে আচ্ছাদিত হইয়া, পদে পদে পদক্ষেপে আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ব্যোমমার্গে মেঘদল বিদ্যুদ্‌বজ্রঘোষে যদৃচ্ছা বিচরণপূর্ব্বক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিতেছে। পবনদেব রোষভরে পর্ব্বত-চূড়া মথিয়া, বৃক্ষকানন উৎপাটিয়া, আমূল-জগৎ-কম্পনে রত। উত্তর-কুরুস্থহিমানীমুক্ত হইয়া নিশানাথ এখানে যথার্থতঃই পীযূষবর্ষী সুধাংশু; এবং দিনদেব সহস্র রশ্মিতে বিভূষিত হইয়া, অচিন্তনীয়পুরুষ নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব জ্ঞাপন করিতে করিতে, উদয়গিরি সমারোহণ অতিক্রম-ণান্তে, বিষ্ণুপদে জগৎ উজ্জ্বলিত করিয়া, গয়শির অস্তশিখরে বিশ্রাম-বিলাসাভিলাষে ধাবমান হইতেছেন। নিশা নিবিড়; কখন বা নিবিড়-তম হইয়া কেবল খদ্যোতমালায়, কখন বা নীল উজ্জ্বল মণিখচিত চন্দ্রাতপতলে প্রদীপ্ত মণিসহস্রের স্তিমিতালোকে, প্রতিভাসিত হইতেছে। এ দিকে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া, অযাচিতভাবে ফলমূল প্রভৃতি আহারীয় ও আশ্রয়দানে, যেন সান্ত্বনা এবং অভয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। ফলতঃ বাহ্যজগৎ যেন এখানে আর্য্যগণকে রোষ ও ক্ষমামিশ্রিত বিকটভঙ্গিতে সদর্পে কহিতেছে, "দেখ এ তোমার করকানিহারপীড়িত সামান্যপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ নহে যে, যে কোন বিষয় সহজে আয়ত্ত করিতে চাহিবে। অনেক তেজে আসিয়াছিলে, কিন্তু আমার মূর্ত্তি দেখিলেত! আমার বিকট হাস্য একবার দেখিবে?—না, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে না। এখন দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, দর্প দূর কর,

আমার পায়ে নত হও, ভয়বিস্ময়ে নিয়ত আমাকে দর্শন ও আমার উপাসনা কর ; খাইতে দিতেছি খাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না ; কিন্তু দেখিও মাথা তুলিও না।” আর্য্যগণও মাথা তুলেন নাই।[৩]

আর্য্যগণ আহার পাইলেন বটে, কিন্তু গা মেলিতে পারিলেন না ; এরূপ ভয়ে ভয়ে আহারীয়প্রাপ্তিতে সুখ কোথায় ? সর্ব্বদাই জড়সড়, সর্ব্বদাই ভীত ; বুদ্ধিশুদ্ধি বাহিরে লুপ্ত হইয়া, কুর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ ভিতরে সংহৃতভাবে বড়ই আকুলিত করিতে লাগিল। চিত্তবৃত্তি বাহিরের প্রফুল্লতা হারাইয়া, তদভাবপূরণার্থে, অভ্যন্তরভাগে প্রগাঢ় চিন্তা সহ চিত্তস্তম্ভনকারী বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে রত হইতে চলিল। আর্য্যগণ অপরিচিত দেশে আসিয়া, যেন নিতান্তই অপরিচিতের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিহস্ত সর্ব্বত্রই বলবান্; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহাই আয়ত্ত এবং ধারণার অতীত ; অধিকন্তু ভীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। রাত্রি ইহাদিগের নিকট অদৃষ্টচর অনৈসর্গিক জীবকুলের বিহারকাল ;—ভূত, প্রেত, পিশাচকুল প্রভৃতি অপদেবতাগণের অট্টহাস ও কিলি কিলি রব থাকিয়া থাকিয়া যেন অতর্কিতে শ্রবণবিবরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। অরণ্য সকল ভীষণ শ্বাপদকুল ও ভীষণ দানবদেবাদির বাসস্থান ; নদী সকল যথার্থই সাগরের উপযুক্ত ললনা ; পর্ব্বত সকল উন্নতশিরে ভ্রুকুটীভীষণ রোষকষায়িত নয়ন বিস্ফারণ করিয়া রহিয়াছে ; দুর্জ্জয় পবন রুদ্রমূর্ত্তি, এক এক সাপটে সর্ব্ব-উচ্ছেদকারী সর্ব্বশক্তিমানত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ; ভূমিকম্প, উল্কাপাত, ঋতুচরগণের উন্মাদমূর্ত্তি, দিগ্বিকাশিনী তড়িল্লতা, ঘনঘোর বজ্রনির্ঘোষ, এ সকলে সামান্য মানবমন কেমন করিয়া সুস্থির থাকিবে ? চতুর্দ্দিকেই ভয়ের কারণ। বালকে এই এই বিষয়ে যেরূপ ভাবযুক্ত চিত্তবিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যদি তাহার কখন ধারণা ও পরিমাণ করিয়া থাক ; তাহা হইলে জ্ঞানজীবনস্থ এই

৩। উপরি-উক্ত কয়েক পংক্তি বোধ করি আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যসিংহদিগের বোমবেটে বাঙ্গালার অনুকরণে লিখিত হইয়াছে, ইতি।—বাঞ্ছারাম।

আর্য্যবালকেরও তাৎকালিক মনের অবস্থা তুমি অনেকাংশে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

জাগতিক মূর্ত্তির ভাবপ্রদর্শন এইরূপ। ইহার পরে আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৌরাত্ম্য—শ্বাপদকুলের এবং শ্বাপদকুল অপেক্ষা আরও ভীষণতর ভারতের আদিমনিবাসিগণের। এক দিকে গোত্র বাঁধিয়া গোরত্বাদি রক্ষা; অন্য দিকে ধনুর্ব্বাণহস্তে বীরত্ববিকাশে আদিমনিবাসী দৈত্য-বর্গের সম্মুখীন হইয়া, তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে বিব্রত হইতে হইল। যুগাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নিত্যকালিকামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল;—ভীষণা ভয়ঙ্করী, গলে নরমুণ্ডমালা, লোলরসনায় লোহিতধারা; রক্তে স্নাত, উন্মত্তা, সমুণ্ডখর্পরহস্তার বিষম তাণ্ডবে দস্যুগণ ত্রাসিত ও চমকিত। মনের বিকল অবস্থায়, যাহারা আসিয়া উত্তেজনা এবং শত্রুতাচরণ করে; তাহাদের উপর স্বভাবতঃ যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, সেরূপ ধ্বংসেপ্সু প্রখর উদ্দীপন আর কোথাও হয় না। বলা বাহুল্য যে, এই দৈত্যগণসহ সংগ্রামে আর্য্যেরা নিতান্তই নৃশংসভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং এই দৈত্যগণের উচ্ছেদবাসনাই বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাদের জপমালাস্বরূপ হইয়াছিল।[৪] বেদসংহিতা সকলে প্রায় অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত সূক্ত যে সকল দৈত্যবংশের উচ্ছেদ কামনা ও তাহার সংসাধন প্রার্থনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলেন যে, সে সকল দৈত্যবংশ আর কেহ নহে, তাহারা ভারতের সেই আদিমনিবাসী অনার্য্যবংশীয়গণ মাত্র। সে যাহা হউক, এই সময়ে আর্য্যগণ নিত্য শত শত নররক্তে স্নান করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন; এবং এই আর্য্যদস্যুরণস্থলেই, অসুরবিনাশিনী কালী, মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ-ঘাতিনী জগদ্ধাত্রী, ইত্যাদি দেব দেবী ও দেবাসুরসংগ্রাম-কাহিনীর ভাবি-উৎপত্তির সূত্রপাত হয়। আর্য্যেরা এই দৈত্যবর্গ লইয়া বহুক্লেশ পাইয়াছিলেন; এবং শেষে অনেক কষ্টে ও অনেক রক্তপাতে তাহাদিগকে বশ্যতায় আনিতে হইয়াছিল বলিয়াই, মানবচিত্তের

৪। ঋঃ বে ১।১১৭, ২।১১, ইত্যাদি অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত সূক্তসমূহ।

স্বভাবসুলভ প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষা ও বিদ্বেষভাবের ক্রীড়ার অনিবার্য্য-মোহে, আর্য্যগণ দৈত্যসন্ততি শূদ্রবর্গকে সমাজের মধ্যে এতাদৃশ হেয়-পদ দান ও তাহাদের উপর এতটা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুনশ্চ মানব, যখন যে পরিমাণে ঊৰ্দ্ধে মাথা তুলিতে ও পার্শ্বে গা মেলিতে না পারে, তখন নিম্নমুখে যেন তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, সেই পরিমাণে নির্ম্মম ও কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাও শূদ্রদিগের উপর অত্যাচারের এক অন্যতর কারণ; যেহেতু, আমরা দেখিতেছি যে, ঊৰ্দ্ধে এবং পার্শ্বে সকল দিকেই আর্য্যগণের ভীতির সীমাপরিসীমা ছিল না। কিন্তু ইহাও এখানে বক্তব্য যে, প্রথমকালে, শূদ্রবর্গের ব্যবহারফলে, তদ্রূপ অত্যাচার অনিবার্য্য; নতুবা যখনই আবার সমাজমধ্যে সুস্থতা স্থাপিত হইয়াছে, তখনই সে অত্যাচার অন্তর্হিত ও শূদ্রগণ সমাজমধ্যে গণনীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, গ্রীকদিগের অপেক্ষা সভ্যতাধিক্য সহ সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে অনুভব ও কল্পনা শক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহা কার্য্যে খাটাইবার পদার্থও এখানে এখন তাঁহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে পাইলেন। ভারতের প্রকৃতি যেমন ভয়ঙ্করী ও সর্ব্বদিকে ধারণার অতীত বিপুলা, তাহার মূর্ত্তিও আবার তেমনি বিশাল ও সর্ব্বপ্রকারে চিত্ত-উন্মাদন-কারি-বিরাটবেশযুক্ত। এক দিকে যেমন মেঘ বিদ্যুৎ বায়ু অরণ্যানী প্রভৃতি নিসর্গমূর্ত্তি ভীতি উৎপাদন করিতেছে; অন্য দিকে তেমনি সূর্য্য চন্দ্র ও শ্যামলশোভাপূর্ণ বসুন্ধরা আদি হর্ষের কারণ হইতেছে; আবার একধা সমগ্র জাগতিক মূর্ত্তি সুমহৎ বিস্ময়রসে ও বিশালতায় চিত্তকে আনত করিয়া ফেলিতেছে। এমন স্থলে আর্য্যচিত্ত যেমন এক দিকে অপরিমিত ভয়; তেমনি অন্য দিকে তাহার সমতুল অপরিমিত ভক্তি; আর এক দিকে আবার একধা সমগ্রদর্শনে, আপনার নগণ্যত্ব এবং অনৈসর্গিক শক্তির সর্ব্বশক্তিমানত্ব, পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনুভাব্য বিষয়ে কূল পাইবার আশায়, অপার

কল্পনাপথে প্রধাবিত হইয়া ছুটিলেন। এ কল্পনার পথধাবনে ক্ষান্তিও নাই, বিরামও নাই ;—এক ক্ষান্তি যাহা কিঞ্চিৎ হইতে পারিত আহারচিন্তাহেতু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতি জন্য, কিন্তু তাঁহারা যে রত্ন-প্রসবিনী ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে আহারীয় পদার্থের জন্য ক্ষণমাত্রও চিন্তা করিবার কথা নহে। তখন অন্য বিলাসবস্তুরও উদয় হয় নাই যে, তাহার জন্য সময় ব্যয় করিবেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, আহারবিষয়ক মানবীয় সামান্যতর পাশব অভাব সকল পূরণ হইলে, তদ্দ্বারা যে অবসরকাল পাওয়া যায়; তাহা প্রধানতঃ সাংসারিক উচ্চ অভাবের উদ্ভাবন ও তাহার পূরণকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রেই, বিলাসাদির বিস্তারসাধন এবং সাংসারিক উন্নতি ও সভ্যতাও ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইতে থাকে। কিন্তু ভালয় হউক বা মন্দয় হউক, আর্য্যদিগের সম্বন্ধে সে কথা খাটে নাই ; তাঁহাদিগের পক্ষে সে অবসর কাল এখানে আর এক রকমে ব্যয় হইতে চলিল। সাংসারিক দিকে যে অবহেলা তাঁহারা আদি হইতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য উদ্যোগ, উদ্ভাবনী শক্তি ও অনুষ্ঠানাদি যে হীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ বংশ-পরম্পরাগতে আজি পর্য্যন্তও যে কিছু না পাওয়া যায় এমন নহে ;—এই দেখ, যে কৃষি-প্রণালী বৈদিক সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত তাহাই হিন্দুদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, তথাপি অতি প্রাচীন হিন্দুসময়েতেও, বহুবিধ উত্তমোত্তম বিলাস বস্তু আদির উল্লেখ এবং বহুলাংশে সামাজিক ও সাংসারিক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা সকলও দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার কারণ?—আর্য্যশক্তি যে নিতান্ত তীক্ষ্ণ, এবং ভগ্নপদ হইলেও তাহার ক্রিয়াশক্তি যে বিপুল, উহা কেবল তাহারই পরিচায়ক ;—উহা কেবল তাঁহাদিগের আংশিকমাত্র ক্রিয়াশক্তিপ্রয়োগের ফল। পূর্ণশক্তি বরাবর প্রযুক্ত হইয়া আসিলে, কালে না জানি আরও কি হইত! কিন্তু হায়! সেই পূর্ণশক্তি-প্রয়োগের অভাবেই, ভারতে বড় বড় শোভাময় ফুলে শেষে কণ্টকময় ধুতুরা ফলের জন্ম-অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়।

হর্ষের কারণ অপেক্ষা ভয়ের কারণ যে সমস্ত, তাহারাই সাধারণতঃ মানবচিত্তের উপর অধিক আধিপত্য করিয়া থাকে; বস্তুতঃ অনুভূতি-স্থলেও ভয়ের কারণগুলি কিছু অধিকরূপে অনুভূত হয়। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ, ভারতে নবাগত আর্য্যদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়। হর্ষের কারণ বলিয়া পরিগণিত যাহারা, তাহাদের প্রদত্ত ফল আর্য্যদিগের দ্বারা যত অনুভূত বলিয়া দেখা যাউক বা না যাউক; কিন্তু ভয়ের কারণস্বরূপ যাহারা, তাহাদের প্রদত্ত ফল প্রকৃষ্টরূপে প্রত্যক্ষবৎ ও পদে পদে অনুভূত বলিয়া দেখা যায়। সে সকল ভয়ের কারণকে, আর্য্যেরা নিসর্গাতীত শক্তি সকলের ক্রিয়া বলিয়া গণিতেন ও মানিতেন। যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা বেশী, সেখানে শান্তির আকাঙ্ক্ষাও অতিশয়; যেখানে নিসর্গশক্তির ক্রিয়ায় শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলটা অধিক অনুভূত হয়, সেখানে অশুভের উপশম ও শুভের আধিক্য জন্য চেষ্টাও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠে। সুতরাং আর্য্যেরাও, সকল কার্য্য ফেলিয়া, শান্তি স্বস্ত্যয়নে অধিকতর ব্রতী হইয়া উঠিলেন। নিসর্গাতীত শুভদ এবং অশুভদ শক্তিভ্রমে, ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নৈসর্গিক বিষয়, মূর্ত্তিভেদে সু এবং কু গুণ বিশিষ্ট নানা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উপাস্য হইয়া উঠিল। বেদোক্ত যাবতীয় দেব দেবী, এই নৈসর্গিক বিষয়েরই উপর রূপক কল্পনা মাত্র।[৫] মানবহৃদয়ে যে পরমতত্ত্ব প্রথম হইতে রোপিত হইয়াছে, তাহা বুঝি এই নিসর্গ-সংযোগেই প্রথম প্রকটিত হইয়া থাকে! ভীতি এবং চিত্তবৈক্লব্যস্থলে যে কেহ উপকারে আইসে, সেই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে; বোধ করি এই নিমিত্ত, আর্য্যের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাগুণ, এমন কি স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষ্যাদিতে পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে লাগিল; তাহাদিগেতেও, শুভ অশুভ আদি গুণভেদে, কিয়ৎ পরিমাণে দেবত্বের আরোপ হইতে ত্রুটি হইল না। এইরূপে উপনিবেশিত দেশে শান্তি ও দেবকার্য্যের ক্রমোত্তর

৫। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তের ব্রহ্মবিদ্যায় কর্ম্মকাণ্ডভাগে বৈদিক দেবতা সকলের বিষয় দ্রষ্টব্য।

আধিক্য বর্দ্ধিত হইতে থাকায় এবং তদ্রূপ আধিক্যশূন্য পূর্ব্ববাসস্থান উত্তরকুরু সম্বন্ধীয় পূর্ব্বস্মৃতির সহ সে বর্দ্ধিত আধিক্য তুলনা করিতে যাওয়ায়, তুলনার ফল এই দাঁড়াইল যে, পৃথিবীর আর সমস্ত স্থান অপেক্ষা একমাত্র ভারতই ধর্ম্মভূমি ও কর্ম্মভূমি। উত্তরকুরুর স্মৃতি তখনও একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই। পুনশ্চ, দূরস্মৃতির মোহিনী কল্পনায়, উত্তরকুরু এখন ইহাদের নিকট কেবল কর্ম্মাতীত স্থান নহে, অধিকন্তু নিত্য সুখময় ভোগভূমি; দেবপিতৃগণ তথায় ধর্ম্মচর্য্যা ও কর্ম্ম-আচরণ হইতে অবসর পূর্ব্বক, নিত্য সুখে বিরাজ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মভূমি যাহা, তাহা একমাত্র ভারত, ইহাই এখন স্থির ধারণা হইয়া দাঁড়াইল।[৬]

এক্ষণে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আগত হইলে পর, আর্য্যচরিত্র এরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথমেই, বিশাল প্রাকৃতিক মূর্ত্তিদর্শনে, বিস্ময়ের আবির্ভাব ও আত্মখর্ব্বতাজ্ঞানের উদয়। আহারীয়ের অভাব হইলে, প্রাকৃতিক শক্তির সহ হাতাহাতি করিতে হয় এবং সেই হাতাহাতি জন্য প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্বলাভে, যথেষ্ট একরূপ আত্মদৃঢ়তা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু আর্য্যদিগের আহারীয়-প্রাচুর্য্যহেতু তদ্রূপ কারণাভাব, সুতরাং বিস্ময়েরই ক্রমানুশীলন হইতে থাকায় আত্মদৃঢ়তার পরিবর্ত্তে বরং আত্মখর্ব্বতাজ্ঞানই তাহাদের বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়ে, যেমন এক দিকে নিসর্গক্রিয়ার ভীষণতা-ভাগদর্শনে অপরিমিত ভয়; তেমনি অন্য দিকে তাহার হর্ষপ্রদ অনুকূলতাভাগদর্শনে, অতিশয় ভক্তি; এবং সর্ব্বশেষে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ ও শত্রু-কুলের প্রখর উত্তেজনায়, বিষয়ে ব্যাকুলতা ও বসতে অস্থিরতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভয় বিস্ময় ভক্তি ও ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হওয়ায় এবং আত্মখর্ব্বতাজ্ঞানের প্রভাবে আপনাকে নগণ্যে ফেলায়, আত্মনির্ভরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাশ্রয়ে পরম শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা

৬। মহাভারত ৬।৫।১৪ "উত্তরাশ্চৈব কুরব" ইত্যাদি; পুনশ্চ ৬।৫।৪০-৪৬ "উত্তরোত্তরমেতেভ্যো বর্ষমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ" ইত্যাদি।

আর্য্যমনে প্রবল হইয়া উঠিল। আত্মনির্ভরতার অভাব হইলেই চরিত্রবিষয়ে নানা অভাবের আবির্ভাব হয়; সুতরাং যেমন এক দিকে ইহলৌকিক বিষয়ে অস্থিরতা ও অনাস্থাভাব, তেমনি অন্য দিকে পরাশ্রয়-আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা হেতু পারলৌকিক বিষয়ে পরম আসক্তি, প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে চলিল। বহিঃসংসারস্থ তাবৎ বিষয়ে অস্থিরতা হেতু, একপক্ষে যেমন সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও মহদনুষ্ঠানে ক্ষুণ্ণতা আসিয়া উপস্থিত হইল; তেমনি তদ্বিপরীতে অন্তঃসংসারে, অপর পক্ষে, পারিবারিক সম্বন্ধ ঘনীভূত এবং অতি ক্ষুদ্র বিষয়কে বড় করিয়া মানবচিত্ত তিলে তাল করিয়া তুলিতে লাগিল। বলিতে কি, আর্য্য-দিগের তুল্য গৃহসুখ আর কোন জাতি কখনও ভোগ করিতে পাইয়াছে কি না সন্দেহ; আর ক্ষুদ্র বিষয়ে বৃহৎ দৃষ্টির উদাহরণ অধিক কি দিব?—নবমীতে লাউ খাইলে ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, অথচ গৃহের চতুর্দ্দিক ও সমস্ত গ্রাম অস্বাস্থ্যকর ময়লায় পরিপূর্ণ থাকিলে কিন্তু ইহাদের কিছুমাত্র যায় আসে না! এইরূপ সঙ্কীর্ণতা-বুদ্ধি হেতু, ক্রমে সমাজ-জ্ঞান, কর্ম্মজ্ঞান, দেশজ্ঞান, দূরত্বজ্ঞান, সমস্তই খর্ব্বাকারে পরিণত হইল;—সমস্ত পৃথিবী সঙ্কীর্ণতায় আসিয়া শেষে ভারতত্রিকোণে সমাহিত হইল; দূরস্থান অপবিত্রতার আধার হইয়া পড়িল; ব্যবসায়ে জাতি বাঁধিয়া গেল; এবং সকল কর্ম্ম-বুদ্ধি শেষে একমাত্র দেবসেবায় পরিণত হইল। এ সকলের ফলস্বরূপ হইল এই যে, নিজেরা নিতান্ত নিরীহ হইয়া পড়িলেন; এখন একটু শত্রুর অত্যাচার হইলেই, উদ্ধারার্থে দেবাবতার উদ্ভবের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেবাবতারের উদ্ভব কার্য্যতঃ যত হউক না হউক, শত্রুকৃত অত্যাচারের বড় একটা অভাব ছিল না। সুতরাং একে এত শান্তির চেষ্টাতেও শান্তি নাই, তাহার উপর আবার দৈত্যবর্গের সহ ঘন সংঘর্ষ; কাজেই বিকৃত মনের এরূপ প্রকৃতি-উত্তেজনা হেতু, নীচের প্রতি ক্রূর ভাব ইহাদের ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আর কত বলিব! এইরূপে সেই যে মূল বিশুদ্ধ আর্য্যচরিত, তাহাতে কতই না পরিবর্ত্তন ঘটনা হইতে থাকিল!

এখানে আর্য্যচরিত আরও সূক্ষ্মতরে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপরি-উক্ত ভাবাভাব সকলের আবার প্রতিপ্রসবে, ভয় হইতে নম্রতা; ভক্তি হইতে কৃতজ্ঞতা ও বাৎসল্য; বিস্ময় হইতে বিরাটমূর্ত্তির ধারণা ও বিরাটধারণা হইতে বৈরাগ্য; এবং ব্যাকুলতা হইতে ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে সামান্য বিষয় লইয়া খুঁটি নাটি; খুঁটি নাটি হইতে অনুষ্ঠানে আড়ম্বর ও প্রকরণবাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে;—ধর্ম্মের মূল পদার্থ যে ভক্তি শ্রদ্ধা তাহা যতটা থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু বিঘৎপ্রমাণ কুশের একচুল বাড়াকমা হইলেই যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়; হাঁচি কাশি চলা ফেরা সকলই নিয়মের উপর; সে নিয়ম হেতু কাজ পণ্ড হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু নিয়মভঙ্গ হইলে নরকে যাইতে হয়! তাহার পর আত্মখর্ব্বতাজ্ঞান হইতে সর্ব্বভূতে সম্মান; আত্মনির্ভরতার অভাব হইতে ধর্ম্মচর্য্যায় বিপুলতা, এবং নীচের প্রতি ক্রূরতা হইতে শ্রেণীবিশেষের স্বাভিষ্টসাধনপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইল। পুনশ্চ নম্রতা হইতে ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা হইতে দয়া, বাৎসল্য হইতে ক্ষমা, এবং বৈরাগ্য হইতে শমদমাদি কোমল গুণসমস্ত এবং কোমল গুণ সকল হইতে সমাজবিরতির উদয়। এই সমস্তের মধ্য দিয়া আবার গ্রন্থনসূত্রস্বরূপে চিত্তশক্তি, সর্ব্বত্র পরিচালিত; চিত্তের অবলম্বন পদার্থ যে কল্পনা, তাহা সুতরাং এই গুণগুলির সহ একধা এবং পৃথকরূপে প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িত; এই নিমিত্ত হিন্দুরা, উপরে উক্ত বা অনুক্ত যখন যে কোন গুণের চালনা বা যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহাতে বাড়াবাড়ি ও তাহার বর্ণনাবিষয়ক আয়তন অত্যন্ত প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন! এত বাড়াবাড়ি করিয়াও তাঁহাদিগের মনের তৃপ্তিসাধন হয় নাই। মন্বন্তরাদি পৌরাণিক কল্পনার কথা বা লোকব্যবহার বিষয়ে বহ্বায়তন নিয়মাদির কথা প্রভৃতি দূরে থাকুক; সামান্য একটা যশ কোন রাজার বর্ণনা করিবেন, তাহাতেও স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং কালের দিগন্ত ধরিয়া টানাটানি![৭] ইহার অতিরিক্ত আরও

৭। বাঞ্ছারাম বাবুকে ইহার আভাস দেওয়ার জন্য, অপেক্ষাকৃত বহু আধুনিক গ্রন্থ

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাব ও গুণ বিশ্লেষণ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে ; তাহা আলোচকবর্গের নিজের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। যে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষিত হইল, তাহাতে বোধ করি এ পর্য্যন্ত ভালই প্রতীত হইবে যে, আর্য্যেরা যেমন এক দিকে কোমল মনুষ্যত্ব বিষয়ে অপরিমিত উৎকর্ষ লাভ করিতে চলিলেন, তেমনি অপর দিকে বীরমনুষ্যত্ব বিষয়ে হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই,— কোমল মনুষ্যত্বে হীন হইলে, বীরমনুষ্যত্ব নানা পাপলিপ্ত হইয়া যত শীঘ্র অধঃপাতগত হয় ; কোমল মনুষ্যত্ব, বীরমনুষত্বে হীন হইলেও, ততটা শীঘ্র ও তত পাপগ্রস্ত হইয়া ততটা দূর অধঃপাতগত হয় না।

অতঃপর, গ্রীকদিগের উপনিবেশিত দেশানুযায়ী চরিত নির্ম্মাণ-বিষয়ে, একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। গ্রীকভূমি হিমানী-পীড়িত কুরুবর্ষ হইতেও স্বল্প-প্রাণ। যাহারা স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া, গ্রীস এবং উত্তরকুরু উভয়েরই অপেক্ষা আয়তন-বহুল জাগতিক মূর্ত্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে ; তাহাদের নিকট এই সামান্যপ্রাণ গ্রীস কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে ? ইহার প্রাণ স্বল্প, শক্তিও স্বল্প। বহুদেশদর্শনজ্ঞানে দার্ঢ্যতাযুক্ত মানবচিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া, নিয়ত ভয়বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহার কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিকমূর্ত্তিদর্শনে মানবচিত্ত, বাহ্যজগতের নিকট আত্মপরাধীনতা স্বীকার করিয়া দাসবৎ রহিল ; গ্রীকভূমে তেমনি তদ্বিপরীতে,

নৈষধ হইতে একটি রাজপ্রতাপ ও যশোবর্ণনার শ্লোক যথেষ্ট বোধে উঠাইয়া দিলাম।

তাদৃগ্দীর্ঘবিরিঞ্চিবাসরবিধৌ জানামি যৎকর্ত্তৃতা,
শঙ্কে যৎপ্রতিবিম্বমম্বুধিপয়ঃ পূরোদরে বাড়বঃ।
ব্যোমব্যাপিবিপক্ষরাজকযশস্তারাঃ পরাভাবুকঃ,
কাসামস্য ন স প্রতাপতপনঃ পারঙ্গিরাং গাহতে ॥—নৈষধ ১২।১১।

বোধ করি আর কোন দেশের কাব্যে কেহ এরূপ অদ্ভুত রূপক-উপমা দেখাইতে সমর্থ হইবেন না।

জাগতিক মূর্ত্তিতে ভীষণতার অভাবহেতু মানবচিত্ত সাহস লাভ করিয়া, বাহ্যজগতের নিকট মানবচিত্তের স্বাভাবিকী যে প্রকৃতিনিয়োজিত অধীনতা আছে তাহা সত্ত্বেও, বাহ্যজগতের উপর প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। গ্রীসে জাগতিক মূর্ত্তি, ঊর্দ্ধ অধঃ সকল দিকেই সামান্যপ্রাণ। সুতরাং তাহার অসামান্য ভাবহেতু ত কখনই নহে; তবে যদি কেবল পূর্ব্ব অপরিচিততাহেতু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র বিস্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সেই ক্ষণমাত্রেরই জন্য, তদতিরিক্ত নহে। ফিড্রসের উপন্যাসগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোন এক সময়ে ভেককুল দেবরাজ জুপিতারের নিকট অধিপতিস্বরূপ একজন রাজা পাইবার জন্য বারম্বার যাজ্ঞা করিলে, দেবরাজ বিরক্তি-বশতঃ একখণ্ড কাষ্ঠদণ্ড তাহাদিগকে রাজা স্বরূপে প্রদান করেন। ভেকগণ রাজার আগমনে প্রথমে কিয়ৎক্ষণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রাজাটা কাষ্ঠখণ্ড এরূপ জ্ঞান হওয়ায় যেমন সেই ভয়ের অপনয়ন হইল; অমনি রাজার উপর আরোহণপূর্ব্বক টিট্‌কার-নৃত্য এবং তাহাতে মলমূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তারস্বরে দেবতার নিকট আর একটি ভাল রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল। গ্রীকেরাও ঠিক তদ্রূপ; তাহাদের নবাগত দেশের মূর্ত্তিতে যে কিছু ভয়ের কারণ, অবিলম্বে তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, যেন সদর্পে বাহ্যজগতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"তোমার আর কি অধিক বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, যাহা দেখাইয়াছিলে তাহাতে ত কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় মনোমধ্যে ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে পথিস্থলে বহু বিভীষিকা দৃষ্টে ও বহু বিভীষিকা অতিক্রমে, তাহা অভ্যস্ত হওয়াতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তোমার ঐ একটু ভয় প্রদর্শনে মন্দ লাগিল না, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীবনোপায় পদার্থ সমস্ত আত্মগর্ভে লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না; তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিব।"

এক্ষণে ভারতচরিত্রের ন্যায় গ্রীকচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাহস, অহঙ্কার, এবং ধারণায় সাম্যভাব ইহাদের চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে সকলের প্রতিপ্রসবে, সাহস হইতে পৌরুষভাব, অহঙ্কার হইতে অধ্যবসায়, এবং সাম্যধারণা হইতে সংসাররতি। পুনশ্চ, পৌরুষভাব হইতে নির্ম্মায়িকতা, অধ্যবসায় হইতে সুখানুসরণ, এবং সংসাররতি হইতে সামাজিকতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই তাবৎ গুণ ও ভাবাভাব সকলের মধ্য দিয়া গ্রন্থনসূত্রস্বরূপে কল্পনাশূন্য অপক্ক মানুষী বুদ্ধি সর্ব্বত্র পরিচালিত। এই মানুষী বুদ্ধি একধা ও সর্ব্বথা প্রত্যেক এবং সকল গুণেরই সহ সংযোজিত; এই নিমিত্ত গ্রীকদিগের কোন বিষয়েতে, কল্পনার প্রাধান্যে যে বাড়াবাড়ি, তাহা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পনাপ্রসূত বিষয় সকলও সাম্যভাববিশিষ্ট এবং সম্ভবতা ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এমন কি, ইহাদের দেবতারা পর্য্যন্ত, সম্ভবপর মানবীয় আকারে গঠিত এবং দেবতাগণের কৃত কার্য্য সমস্ত, সাধারণ মানবীয় কার্য্যের স্ফীত ও স্ফুরিত অভিনয় মাত্র।

অধিক আর কি বলিব, যে চরিতবিশ্লেষণ ভারতীয়দিগের করা গিয়াছে; গ্রীকদিগের চরিত প্রায় সকল বিষয়েতে যেন তাহার অপর দিগ্‌-গামী। যে কোমল নৈতিক মনুষ্যত্ব হিন্দুচরিতের পরিচায়ক, গ্রীকচরিতে তাহা নাই; সেইরূপ যে ইহলৌকিক সুখানুসারী বীর-মনুষ্যত্ব গ্রীকচরিতের পরিচায়ক, হিন্দুচরিতে তাহা নাই। ফলতঃ, যদি বীরমনুষ্যত্ব ও কোমলমনুষ্যত্ব, উভয়সংমিলনে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলিয়া ধরা যায়; তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, এক মনুষ্য দুই সম অংশে দ্বিধা হইয়া, দুই বিভিন্ন জাতিরূপে দুই বিভিন্ন দেশকে অধিবাসিত করিয়াছিল।

এক্ষণে পুনরুক্তিস্বরূপে আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, কেবল এক উপনিবেশিত স্থানের জাগতিক মূর্ত্তি, এই এই জাতীয় প্রকৃতির নির্ম্মাণপক্ষে, জাগতিক মূর্ত্তি সম্বন্ধীয়

যে যে কারণের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সমস্তই পরিপূরণ করিয়াছে। সে কথা কিয়ৎপরিমাণে খাটিতে পারিত, যদি এ উভয় জাতি তাহাদের সেই স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে সৃষ্ট এবং সেইখানেই বর্দ্ধিত, এ উভয় হইত। কিন্তু তাহা নহে। ইহাঁরা সৃষ্ট হইয়াছিলেন এক জায়গায়, বর্দ্ধিত হইতে আসিলেন আর এক জায়গায়। শেষোক্ত স্থানে আসিবার পূর্ব্বেই যে ইহাঁরা পশুবৎ অজ্ঞানান্ধ ছিলেন, তাহা নহে; তখনও ইহারা পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন, পুর নগর গৃহ নৌকাদি নির্ম্মাণ, ধাতু ব্যবহার, হলচালন, রাজশাসনাদি স্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, পূর্ব্বস্থানপরিত্যাগান্তে উপনিবেশিত স্থানাভিমুখে আসিবার সময়েও, ইহাঁদিগকে বহুতর কারণের ঘাত-প্রতিঘাত ও বহুতর জাগতিক মূর্ত্তির আকর্ষণী শক্তির মধ্য দিয়া গতাগতি করিতে হইয়াছিল; অথবা এত কথা বলিতে যাইতেছি বা কি জন্য? এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই যখন অনন্তভাবময় এবং তাহাদের কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা যে কিছু, তাহাও যখন কি পূর্ব্ব কি পর উভয়-মুখে অনন্ত; তখন আমার এই আলোচিত বিষয়ের যে একটি ব্যতীত আরও কারণ ছিল, তাহা বুঝাইতে যাওয়া অধিক বাক্যব্যয় মাত্র। আমরা স্থূলদর্শী মানব, সূক্ষ্মকারণপরম্পরা সমগ্র একধা অনুভব ও তাহার ব্যক্তিকরণ শক্তি আমাদিগের তাদৃক্ নাই। এই নিমিত্ত আমরা স্থূল কারণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকি, সুতরাং এখানেও সেই স্থূল কারণের মাত্র অনুসরণ করা গিয়াছে।

স্থূল কারণের পার্শ্ববর্ত্তী ও সহযোগী ভাবে, বহুতর সূক্ষ্ম কারণ সকলও সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন পার্শ্বে, স্থূল কারণের গর্ভেও তেমনি, শ্রেণিপরম্পরায়, এক অপরের কোষনিহিত ভাবে, সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারণসমূহ সমাহিত রহিয়া, নিরন্তর কার্য্য করিয়া যাইতেছে; কিন্তু তোমার আমার সাধ্য নাই যে তাহা দেখি এবং দেখিয়া অন্যকে বুঝাইতে সক্ষম হই। তর্কশক্তি তাহাদের সীমানাতেও পৌঁছিতে পারে না। মানবের দৃষ্টি স্থূল, শক্তি স্থূল, এবং বাক্য স্থূল; এজন্য যে কোন

সূক্ষ্ম কারণ, এমন কি তাহা সামান্য সূক্ষ্মাকার হইলেও, আর তাহা তেমন সহজে বাক্য দ্বারা বর্ণনার বিষয় হয় না। উহা আরও সূক্ষ্মতায়, কেবল চিন্তনীয়; এবং তদতীতে আরও সূক্ষ্মতায় উঠিলে, চিন্তার সীমা ছাড়াইয়া একেবারে অচিন্তনীয় হইয়া উঠে। তখন কেবল এক ভক্তি-সংযুত হৃদয় চালনা করিলে, কতকটা মাত্র তাহারা অনুভবশক্তির বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু বাপু বাঞ্ছারাম, সেরূপ হৃদয় ও অনুভবশক্তির চালনায় রাজি আছ কি? যে হস্ত দ্বারা অতি সূক্ষ্ম আণবীয় কীট কীটাণুর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন দেহ ও দেহযন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে; সেই হস্ত দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারণ সকলের নিয়োগ ও সমাবেশ সাধন হয়। স্বীকার করি, ভৌতিক অণুবীক্ষণের কতক পরিমাণে তুমি উদ্ভাবন করিয়াছ বটে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে,আত্মিক অণুবীক্ষণ উদ্ভাবনে এখনও তোমার অনেক বিলম্ব! যেমন রেতঃস্থ কীটাণুর পরিপুষ্টিতে স্থূলতাপূর্ণ জীবদেহের বর্দ্ধন ও বিকাশ; সেইরূপ বা তথাবিধ প্রকারে অনেক সময়ে, অথবা সর্ব্বদাই, সূক্ষ্মকারণ স্থূলকারণের বীজ স্বরূপ হয়; কিম্বা স্থূল কারণ যাহা,তাহা সূক্ষ্ম কারণের মোটা ও বাহ্য বিকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম কারণের বিস্তার ও বিলাস এবং তাহার শিরা ধমনী, কালের সীমা ও বিশ্বের সীমা পর্য্যন্ত, ভূত ভবিষ্যৎ উভয় মুখে, পরিব্যাপ্ত। সুতরাং যে কেহ সূক্ষ্ম কারণে প্রবুদ্ধ হইতে পারে, সে সর্ব্বজ্ঞতালাভে সক্ষম হয়। আমাদের পক্ষে, সূক্ষ্ম কারণ যে আছে ও তাহার অস্তিত্বে যে প্রবুদ্ধ হইতেছি, এ পর্য্যন্ত বোধ হইলেও, অনেক ফললাভ হইতে পারে। বল বাপু বাঞ্ছারাম, আরও তোমাকে এ সম্বন্ধে কি বলিয়া বুঝাইব এবং এ তত্ত্ব কিরূপে তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইব?

যে কোন সাধারণপ্রকৃতি-সম্পন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, আর একটি সহজ উপায় দ্বারা অনুভূতির আয়তনগত হইতে পারে। যে জাতীয় সাধারণ পদার্থ, তজ্জাতীয় বিশেষ পদার্থ যাহা, তাহা দর্শন ও তাহার তত্ত্বাকর্ষণ দ্বারা, সেই দর্শন ও তত্ত্ব প্রসারিত আকারে সাধারণ পদার্থের উপর প্রয়োগ করিতে পারিলে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। এই প্রাকৃতিক

সংসারে,সম প্রকৃতির দুই বিভিন্ন নিয়ম নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া যাইতেছে। একটিকে 'শীঘ্র,' অপরটিকে 'গৌণ' আখ্যায় আখ্যাত করা যাইতে পারে। অনন্বিতভাবে দেখিতে গেলে, নিয়ম দুইটি প্রকৃতপক্ষে দুই বিভিন্ন নিয়ম নহে, বস্তুতঃ এক ; কেবল ক্রিয়াশীলতায় স্থান ও কালের ব্যাপকতা এবং ক্রিয়মাণ পদার্থের পরিমাণ,ইহা লইয়া তাহাদের পার্থক্য। পদার্থধর্ম্মে, বিশেষ এবং সাধারণ, এক এবং অনেক, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি, নিত্য এবং নৈমিত্তিক, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, অল্প এবং অধিক, ক্ষণিক এবং স্থায়ী,ইত্যাদি,সেই পার্থক্যের বিষয়ীভূত। প্রাকৃতিক নিয়মের 'আহ্নিক ও বার্ষিক গতি' এবং তদুভয়ের ফলস্বরূপ, প্রতি বিষয়ে এক আকৃতির ও এক প্রকৃতির বিশেষ এবং সাধারণ,ক্ষুদ্র এবং বৃহতাদি,ইত্যাকার দুইটি দৃশ্য আছে, অথচ প্রত্যেক দৃশ্যই স্ব স্ব আয়তন মধ্যে সম্পূর্ণাবয়ব। উহাদের প্রথমটি শীঘ্র নিয়মের কার্য্য এবং দ্বিতীয়টি গৌণ নিয়মের কার্য্য। এই জন্য শীঘ্র নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা উপলব্ধি পূর্ব্বক প্রসারিত আকারে প্রয়োগ করিতে পারিলে, গৌণ নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থজ্ঞানও স্বচ্ছন্দে আমাদের অনুভূতির ভিতরে আসিতে সমর্থ হয়। ঐরূপ প্রণালীক্রমে, হয় ত আবার এমনও হইতে পারে যে, গৌণ নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থজ্ঞান যথায় যথায় সহজ ও সুলভ, তথায় তদ্দ্বারা শীঘ্র নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থজ্ঞানকে অনুভব করিবার প্রয়োজন হয়।

যে বেগবশে পরমাণুর গতি এবং গোলত্ব, আকাশপিণ্ডগণের গতি ও গোলত্বও সেই এক নিয়মে। তোমার ঘরের ছেঁচের জলধারা, ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত নানা ধারায় শেষে একধারা হইয়া যেমন তর তর করিয়া চলিয়াছে; অববাহিকাসমন্বিত মহাস্রোতস্বতীরও সেই একই প্রকারে পরিণতি ও গতি। নিত্য উদয়াস্ত ও আবর্ত্তন কালে যে দিবা, বৎসরের তাহাই ক্ষুদ্ররূপ। প্রাত্যহিক নিদ্রা জাগরণ, নৈমিত্তিক মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অবিকল ক্ষুদ্র অভিনয়। কোন এক গৃহস্থ, সমস্ত সমাজের সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি। অথবা এত কথাই বা বলি কেন, প্রতি পদার্থ

ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিরূপ এবং প্রতি পদার্থে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয়-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। প্রতি ধূলিকণায়, পৃথিবীর অনন্ত আকৃতির সম্ভবতা; প্রতি বালুকাবৎ বীজ, অনন্ত অরণ্যানীর জনক; এবং প্রতি কুমারী কামিনী, অনন্ত জীব ও জাতির জননী। সুতরাং যে কোন পদার্থের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারিলে, তাহারই সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারা যায়। তবে কি না, আমরা এখনও অতি স্থূলদৃষ্টি ও সামান্যশক্তি; তাই কেবল সদৃশ তত্ত্বের সাহায্য পাইলেই সদৃশ অনুভবে সমর্থ হই। অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, সেই সদৃশতত্ত্ব অনুসারে এবং শীঘ্র নিয়মের অনুসরণে, যে কেহ আত্মজীবনের প্রতি অনুধ্যান, আত্মজীবনকে অনুশীলন, ও আত্মজীবনতত্ত্বে প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছে; তাহার পক্ষে যে কোন মানবজীবন বা মানবের জাতীয় জীবন সম্বন্ধীয় যে কিছু অভিনয়, তাহার মধ্যে প্রবেশ ও তাহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা অতি সহজ; যে হেতু যে কোন এক মানবচরিত, তাহা সমগ্র মানবীয় স্বভাবের সূক্ষ্ম দৃশ্য স্বরূপ। আত্মা এবং মন, তত্ত্বতঃ সকল মানুষে সমসাধারণ; সুতরাং আত্মিক এবং মানসিক সংসারে যে প্রবেশলাভে পারক—যে যতখানি পারক হয়, সে সেই পরিমাণে তাবৎ মানবীয় বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইয়া থাকে।

উপরে যাহা আলোচনা করিয়া আসিলাম, আশা করি, তদ্দ্বারা এক্ষণে কথঞ্চিৎ পরিমাণে লক্ষিত হইবে যে, গ্রীক এবং হিন্দু, এতদুভয় জাতির চিত্তবেগ, পূর্ব্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখন তাহা যথাপ্রারব্ধ কর্ম্মসূত্রবশে চালিত হইয়া, দ্বিধাভাবে দুই বিপরীতদিগ্‌গামী হইতে লাগিল।[৬] এইরূপে কর্ম্মসূত্রবশে, নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন

৬। জাগতিকবৃত্তি অনুসারে জাতীয় প্রকৃতি কিরূপে নির্ম্মিত হয় সে বিষয়ে, প্রয়োজন (necessity) ও যদৃচ্ছাবিধা ভাবের (chance) দাসানুদাস বকলনামা জনৈক ইংলণ্ডীয় বচনবাগীশ যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছে। এতদর্থে প্রধানতঃ, তৎপ্রণীত History of Civilisation নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। নিয়ামক এবং প্রবর্ত্তক ইত্যাদি কারণপরম্পরার নভক্তি অনুসন্ধান ইহার ততটা উদ্দেশ্য নহে; যতটা বচনপসরার

জাতীয় প্রকৃতির সূত্রপাত হইল। অতঃপর, সেই জাতীয় প্রকৃতির পরিপোষণ-পদার্থ কি কি, দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহা যথাযথ আলোচ্য।

ইতি প্রথম প্রস্তাবে পিতৃভূমি।

উদ্ঘাটন, পোষিত মতের সংস্থাপন, নিজপাণ্ডিত্য প্রকটন, এবং বহুপুস্তকের সহ নিজ পরিচয় জ্ঞাপন উদ্দেশ্য। সামান্য কথা যাহা সকলে জানে, তাহার প্রমাণস্থলেও বহুতর গ্রন্থের উল্লেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশ ভূমিকম্পের জ্বালায় চিরকালই অস্থির, কিন্তু দেখ একবার তাহার প্রমাণ কত। (History of Civilisation, vol. I, note 190। কিন্তু নাস্তিক-চূড়ামণি এই উদরদাসের গ্রন্থের বঙ্গসন্তান মহলে বড় প্রতিপত্তি। এমন কি, যদি এই গ্রন্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে টড নামক ইংরেজের রাজস্থান খানি না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের অর্দ্ধেক সাময়িক পত্রিকা আজি পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকিত, এবং অর্দ্ধেকের অধিক সাহিত্যসিংহদের জন্মানরই আবশ্যক হইত না। জ্ঞাত অজ্ঞাত তরবতর ভাষার তরবতর পুস্তক হইতে আবশ্যকে এবং অনাবশ্যকে রাশি রাশি ছন্ন ও অসংলগ্ন প্রমাণ প্রয়োগ ইত্যাদি পক্ষেও, বঙ্গসন্তানের শিক্ষা বোধ করি এই বকল ইংরেজের কল্যাণে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মাতৃভূমি।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উত্তর কুরু হইতে যে যে জাতি বহির্গত হইয়া, বিভিন্ন দেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, কালে ঐতিহাসিক গণনায় পরিগণিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে হিন্দু গ্রীক এবং রোমক, এই তিন জাতির মধ্যে রোমকেরা সর্ব্বপ্রথমে আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইতালিভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। রোমকদিগের পরে গ্রীকেরা বহির্গত হয়। এবং সর্ব্বশেষে, রোমক ও গ্রীকদিগের স্থানান্তর গমনের কিছুকাল পরে, ভাবী হিন্দুজাতিদিগের পিতৃপুরুষেরা, ইরাণীদিগকে সঙ্গে লইয়া, আদি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতে আগত হইয়া, পঞ্চনদের ধারে এবং স্বরস্বতীতটে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া জাতীয় গৌরব বিস্তারে রত হইয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রীকেরা গন্তব্য স্থানে অগ্রে উপস্থিত হইলেও, কি কারণে পরে আগত হিন্দুদিগের অপেক্ষা আগে আঢ্যতা এবং সভ্যতা গণনীয়রূপে লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই; কি কারণে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সভ্যতা বহুপূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল; পরিণামে কেনই বা পরে উদিত গ্রীকসভ্যতা অগ্রোদিত হিন্দুসভ্যতাকে বহুল বিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; আবার গ্রীকসভ্যতা বা কেন বহুল বিষয়ে হিন্দুসভ্যতার কখনই সমকক্ষতায় উঠিতে পারে নাই; এবং জাতীয় প্রকৃতির কিরূপ পরিপোষণ ও সম্প্রসারণ হেতু তদ্রূপ সংঘটিত হইতে পারে, সেই সকল বিষয় এ প্রস্তাবে যথাযথ আলোচ্য।

আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণস্থলে, যে যে কারণগুলি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তাহাদিগকে দুইটি বিভিন্ন নামে দ্বিভাগে বিভাজিত করা যাইতে পারে। বিভাগভেদে তাহাদিগকে এক

'ব্যবহারিক' কারণ, অপর 'বৈষয়িক' কারণ, এই দ্বিবিধ নামে অভিহিত করা গেল। বিভিন্ন ব্যক্তি বা জাতি সহ যে প্রকার সংস্রব হেতু, পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহার আদির বিনিময়ে পরস্পরের কৌলিক আচার ব্যবহার আদির বিকার বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনাদি সংঘটিত হয়; তাহাকে ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়কে, ব্যবহারিক কারণশ্রেণিতে গণনা করা যায়। আর জমির উৎপাদিকা শক্তি, জলবায়ুর গুণাগুণ, আহারীয় নির্ব্বাচন, ইত্যাদি ও তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগকে বৈষয়িক কারণশ্রেণিতে ধরা যায়। মানবের জাতীয় প্রকৃতির বিকাশ ও বর্দ্ধন বিষয়ে, প্রথম প্রস্তাবে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণের আলোচনা করা গিয়াছে; এক্ষণে সেই বিষয়ে, এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে, ব্যবহারিক ও বৈষয়িক প্রভৃতি অপরাপর কারণের আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যেক কারণ, স্ব স্ব অধিকার মধ্যে, স্বজাতীয় এক একটি পৃথক্ ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু এখন সেই বহু পৃথক্ ফলকে একতায় আনিয়া, একত্বপূর্ণ এক অভিনব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে কে এবং কোন কারণ সহযোগে?—সেই সমষ্টিতত্ত্ব, যাহার যৌগিকতাবশে বহু পরমাণুযোগে বস্তু, বহুবস্তুযোগে সৃষ্টিবৈচিত্র এবং সমগ্র সৃষ্টিবৈচিত্রযোগে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। সেই সমষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ তিনি, যাঁহাকে বেদ "শান্তং শিবমদ্বৈতং" বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছেন এবং এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যে অদ্বৈত পুরুষের যথাস্বরূপ বিরাট দেহ স্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডস্থলীতে, ব্যষ্টিতত্ত্বে এক মুখে অনন্ত পৃথক্ত্ব ও বিভিন্নতা; সমষ্টিতত্ত্বে অপরমুখে অনন্ত অদ্বৈতমূর্ত্তি ও একতা।

১। ব্যবহারিক কারণ।

পৃথিবী মনুষ্যনিবাস হওয়া অবধি, মনুষ্যমণ্ডলে কথিত ব্যবহারিক কারণের কার্য্য নিরন্তর হইয়া গিয়াছে, হইতেছে এবং হইতেও থাকিবে। মানবের সভ্যাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জাতিসহ সংস্রব ঘটিবার কারণ যেমন অসংখ্য; কোন এক জাতি হইতে জাত্যন্তরে গৃহীত

বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উপায়ও তেমনি অসংখ্য পরিমাণে রহিয়াছে ; কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে যে, জাত্যন্তর হইতে কতশত বিভিন্ন বিভিন্ন গৃহীত বিষয়ের জাত্যন্তরতাবোধ কালে একেবারে বিদূরিত হওয়াতে, তাহারা গ্রাহক জাতির মধ্যে জাতীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়া যায়। যখন সভ্য সময়েতেই এরূপ, তখন অসভ্য সময়ে উক্ত কারণের কার্য্য-ফল না জানি আরও কত অধিক। ফলতঃ, অসভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য, অথবা প্রাথমিক জাতিদিগের মধ্যে, জাত্যন্তর হইতে গৃহীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার নিমিত্ত, সভ্যসাময়িক সেরূপ উপায়সমূহের অস্তিত্ব অতি অল্প ; সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবে গৃহীত বা বিনিময়লব্ধ বিষয়, বহুলাংশে বা সমস্তই যে অবিলম্বে গ্রাহকজাতির মধ্যে স্বজাতীয় বস্তুপদে অধিরূঢ় হইয়া যাইবে এবং এমন কি, গ্রাহক জাতিকে পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?—কার্য্যতঃ তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ ইহা স্থির যে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্যফল প্রাচীনকালে যতটা পরিমাণে ফলিত ; আধুনিক সময়ে ততটা নহে। প্রাচীনকালে, এই কারণের প্রাবল্যবশে, এমন কি, অনেকানেক জাতি পর্য্যন্ত, স্বীয় স্বীয় আত্মস্বাতন্ত্র্যবিলোপে, অপরাপর প্রবলতর জাতিতে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইতালীভূমিতে, কত প্রকার বিভিন্ন জাতি বসতি করিত ; কিন্তু শেষে সকলেই, প্রবল লাটিন জাতিতে মিশিয়া, একজাতিরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। গ্রীস ও আসিয়া মাইনর ভূমিতেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। প্রাচীন স্কান্দিনেবীয়, নর্ম্মাণ, টিউটন, গথ, বেণ্ডাল প্রভৃতি জাতি এখন আর নাই ; ইউরোপের কোন একতর জাতিতে মিশিয়া তাহারা অস্তিত্বশূন্য হইয়াছে। অধুনাতন কালেও যে ব্যবহারিক কারণের কার্য্য কিছু কম পরিমাণে হইয়া যাইতেছে, তাহা নহে ; বরং উহার ক্রিয়াশীলতা ও ক্রিয়াস্থলীর আয়তন পূর্ব্বা-পেক্ষা বহু পরিমাণেই প্রসারতা লাভ করিয়াছে। এখন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া উহার কার্য্য চলিতেছে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিই, কোন না

কোন রূপে, উহার ক্রিয়াধীনে আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, এখন আর সে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক নাই; জাপনীয়েরা কত রকমেই না ইউরোপীয় আকারে আকারবিশিষ্ট হইতেছে; এবং আধুনিক হিন্দুসন্তানেরা দেখ, কত প্রকারে ইউরোপীয় ব্যবহারাদির স্রোতে স্রোতায়মান হইয়া, ফিরিঙ্গীয়ানায় ইয়ংবেঙ্গল নামে খ্যাত ও উপহসিত হইতেছে; ইত্যাদি। তবে কি না, প্রাচীনকালের তুলনায়, আধুনিক কালে এই একটা প্রবল পার্থক্য দেখা যাইতেছে যে, ব্যবহারিক কারণের এতটা কার্য্য সত্ত্বেও, কোন জাতি, একেবারে অস্তিত্বলোপে, অপর একটা জাতিতে মিশিয়া যাইতেছে না; আধুনিক রোমক ও গ্রীকদিগের মধ্যে প্রায় সমগ্র পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, তাহাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত হইতে পায় নাই।—ইহার কারণ উপরেই বলিয়াছি যে, অসভ্য সময়াপেক্ষা সভ্য সময়ে, আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় অসংখ্য এবং সে সকল উপায় সর্ব্বদা ও সম্পূর্ণতঃ লঙ্ঘনীয় নহে।

সাধারণতঃ সাহিত্য বিজ্ঞান আদিকে, জাতীয়ত্বের প্রধান পরিচয়-স্থল বলিয়া ধরা যায় এবং অনেকের এমনও বিশ্বাস যে, জাতীয়ত্বের অপরাপর পরিচয় লোপ হইলেও, এতদ্বিষয়ক পরিচয় সহজে লোপ হয় না। কিন্তু দেখ, এখানেও তোমাকে দেখাইব যে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্য কতটা গুরুতর। ভারতীয় দাশমিক অঙ্কপ্রণালী এবং জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ আদি শাস্ত্র বিদেশে নীত হওনান্তর, এতই অপর-জাতীয়ত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকার্য্যের উদয়কাল পর্য্যন্ত, গ্রাহকজাতিগণের সকলেই সে সকলকে স্ব স্ব জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ভাবিত; জন্মস্থান তাহাদের একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল; এমন কি, নিজ ভারতীয়েরাই, আত্মেতর অন্যান্য জাতিকে তত্তাবতের আবিষ্কারক ভাবিয়া,আবিষ্কারমাহাত্ম্যে আশ্চর্য্য হইয়া থাকিত এবং অধিকন্তু নিজের বিষয় পরের হাতে লাভ করিয়া, পরকে মহাদাতা জ্ঞানে কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইত; অথবা এখনই কোন্ তাহা না হইতেছে! এত গেল সাধারণ কথা, এখন বিশিষ্ট একখান গ্রন্থ সম্বন্ধেই

কত দূর কি যে হইতে পারে তাহাও একবার দেখ।—সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কৌতুকাবহ উপন্যাসে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে জনসমাজে সর্ব্বদা সমাদৃত। বিশেষ কোন জাতীয় সংস্রবসূত্রে, পারশ্যরাজ খস্রু নওসেরোয়া ইহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া, ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পহ্লবী অর্থাৎ তাৎকালিকী পারশ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিল। পরে পারশ্য যখন মহম্মদশিষ্যগণের দ্বারা অধিকৃত হয়, সেই সময়ে আরবী ভাষা মুসলমানদিগের প্রচলিত ভাষা হওয়ায়, ৭৬০ খৃষ্টাব্দে আলম কাফা নামে একজন আরব উহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। আলম কাফার আরবী অনুবাদ হইতে, সিমিওন নামক এক ব্যক্তি দ্বারা খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ গ্রীকের আবার লাটিন অনুবাদ ১৫৯৭খৃঃ শকে প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ, অন্য দিকে আরবী অনুবাদ হইতে, রাব্বি জোয়েল ঐ পুস্তকের হিব্রু অনুবাদ করে। ১৫৯৭ শকের লাটিন অনুবাদ ক্রমে বিস্মৃতিগর্ভে পতিত হইয়া যায়। তদন্তর রাব্বিজোয়েলের হিব্রু অনুবাদ হইতে, রাব্বিজোয়েল-কৃত এক অভূতপূর্ব্ব পুস্তক, ইত্যাকারখ্যাতিতে, উহা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় যাবতীয় ইউরোপায় ভাষায় নীত হইয়া সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়। এ যাবৎ ইউরোপভূমিতে লোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ সকল উপন্যাস হিব্রুজাতির সম্পত্তি। এ দিকে আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আরবী অনুবাদ হইতে, হুসেন বেগ নামক জনৈক পারশ্যদেশীয় লেখক, পারশ্য ভাষায় অনুবাদ ও অনুবাদে নানাবিধ নব অলঙ্কারসংযোজনে গল্প সকলের নূতনত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক, অন্যান্য গল্পের সহ সমাবিষ্ট করিয়া, আনোয়ার সোহেলি নামে প্রকাশ করে এবং তাহা, সপ্তদশ শতাব্দীতে সৈয়দ দায়ুদ ইস্পাহানী কর্ত্তৃক ফরাশী ভাষায় নীত হইয়া, নূতন আকারে পিল্পেকৃত (Fables of Pilpay) গল্পাবলী নামে প্রচারিত হয়। এইত ব্যাপার! পরে কাল সহকারে মনুষ্যমনে গবেষণাবৃত্তির কার্য্য আরম্ভ হইলে, অনুসন্ধানের দ্বারা শেষে স্থিরীকৃত হয় যে, এত গোলযোগের মূল সংস্কৃত সেই পঞ্চতন্ত্র মাত্র।

এ পর্য্যন্ত উহাকে অনেকেই আপন জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ভাবিয়াছে; এবং ক্রমাগত বহুকাল ধরিয়া হস্তান্তরিত হইতে থাকায় উহার আকার পরিবর্ত্তনও এত হইয়াছিল যে, সহজে মূলের সহ উহার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শঙ্কা হইত।

অতএব যখন ঐতিহাসিক ও সভ্যতালোকময় সময়ে,একখানি লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধে এরূপ ঘটিতে পারে; তখন সেই দূরগত আদিম এবং লিখন-জ্ঞানশূন্য কালে, শিথিলগ্রন্থি ও শিথিলমূল লোকব্যবহারাদি বিষয়ে, কতই কি না হইয়া যাইবে এবং তখন কত আপন বস্তু পরের ও কত পরের বস্তু আপন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অবনীতে সভ্যতাসূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে, সভ্যতার আনুষঙ্গিক যে সকল জাতীয় সংস্রব ঘটিবার কারণ, তাহারা যদিও তখন বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল না বটে; তথাপি জাতি সকলের পরস্পরের মধ্যে, সংস্রব ঘটিবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইত না। সেই সময়োচিত অন্যবিধ কারণের দ্বারা তাহা সংসাধিত হইত। পুনশ্চ, এখন সংস্রব ঘটে প্রায়ই স্বেচ্ছাবশে; আর তখন ঘটিত প্রায়ই অদৃষ্টবশে। স্বেচ্ছাস্থলে মানব স্বভাবতঃ যতটা সতর্ক থাকে; অদৃষ্টস্থলে তাহা হয় না। সভ্য সময়ে মানব আশ্রমী হইয়া এক স্থানে বাস করিয়া থাকে; কেবল কার্য্যব্যপদেশে ও স্বেচ্ছা-সূত্রে কোন নিয়মিত সময়ের জন্য, বিনিময়কারকগণের একতর কেহ স্থানান্তরিত হইয়া অপরের সহ সংমিলিত হয় এবং প্রায় সেই সংমিলনসময়ে, তদুভয়ের মধ্যে, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উভয়বিধ-রূপে, যাহা কিছু বিজাতীয় সংস্রব ও সেই সংস্রবসূত্রে ব্যবহারাদি বিষয়ের যাহা কিছু বিনিময়, তাহা ঘটনা হইয়া থাকে। এরূপ বিনিময়-লব্ধ বিষয় সাধারণতঃ বাহ্যমূল, জাতীয় বিষয়ের উপর ভাসমান এবং যেন বিদেশলব্ধ অধিকন্তু আসবাব রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং বিনিময়কারক জাতিগণের মধ্যে জাতীয়ত্ব পক্ষে, কি আমূলতঃ কি বিশেষতঃ, কোন রূপান্তর সাধন করিতে পারে না; অথবা অপর পন্থা অবলম্বনে, হয়ত বিদেশলব্ধ পদার্থ তাহার বিদেশীয়ত্ব ভাব হারাইয়া,

যত্র নীত তত্রস্থ জাতীয় মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু অসভ্যাবস্থার ব্যবস্থা অন্যরূপ। তখন মানব নিরাশ্রমী; সাধারণতঃ পশুপালন বা মৃগয়া-সূত্রে তাহাদের জীবিকা; ব্যবসায় বাণিজ্য বা অপরবিধ কোন স্বেচ্ছাসূত্রে তাহাদের দেশদেশান্তরে যাতায়াত নাই। কেবল পশুপালন ও মৃগয়াদি পক্ষে যথায় যথায় সুবিধা, তথায় তথায় তাহারা অদৃষ্টচালিতবৎ অনবরতঃ বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরে। যে স্থান হইতে তাহারা প্রথম যাত্রা করিল, অনাশ্রমিত্বধর্ম্মবশে হয়ত আর কখন সে স্থলে পুনরাগমন করিবেনা; এবং তাহাদের এ যাত্রা যে কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হইবে ও নিবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে কত কত কাল গত এবং কত কত স্থান তাহাদের পদতলগত হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বোধ করি এক অদৃষ্টপুরুষ ভিন্ন আর কেহই তাহা বলিতে পারে না। এই অনবরত গমন ও স্থানপরিবর্ত্তনের সময়ে, পথিমধ্যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহ তাহাদের সংস্রব ঘটিয়া থাকে। যেখানে যেখানে ঘাসজল বা মৃগ প্রচুর দেখিল, সেইখানে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অপরিচিত বহুতর জাতির, একই উদ্দেশ্যযুক্ত ভ্রমণাবর্ত্তন হেতু, একত্র সমাবেশ সাধন হইল। সেই সময়ে ও সেই দিন কয়েকের জন্য সংস্রবে, সংমিলিত জাতিসমূহের মধ্যে, পরস্পরের আচার ব্যবহার এবং পৌরাণিক ও অপরাপর নানাবিধ বিষয়ের বিনিময়কার্য্য সমাধা হয়। এই বিনিময় অতি বহুল রূপেই হইয়া থাকে, কারণ অনাশ্রমীদিগের আচার ব্যবহার আদি বিষয় সকল স্বভাবতঃ অতিশয় শিথিলগ্রন্থিযুক্ত। তবে ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা উহারই মধ্যে একটু উৎকর্ষযুক্ত ও যাহাদের জাতীয় বিষয় সকল অপেক্ষাকৃত দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহারা বিনিময়ে বিষয় গ্রহণ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আবার যখন সে স্থানের বাস ফুরাইল, তখন পরস্পরে সকল ঘনিষ্ঠতা বিরহিত হইয়া, যে যাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল; হয়ত ইহকালের মত আর কখনও তাহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে না। কাল গত হইল, জাতীয় সংস্রব বিস্মৃতিসাগরে

ডুবিল,—কিন্তু বিনিময়লব্ধ বিষয়সমূহ যাহা, তাহা অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া, স্থায়িভাবে জাতীয় সম্পত্তির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিল। ১

চেতনাচেতন সকল সংসারেই, 'অধিক' যে সে 'অল্প'কে, 'উত্তম' যে সে 'অধমকে' আকর্ষণ করিয়া থাকে। 'অল্প' যে, হয় সে 'অধিকের' আকর্ষণে রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়া, 'অধিকের' ন্যায় গুণাদি প্রাপ্ত হয়; অথবা 'অধিক' বিশেষ বলবান্ হইলে, 'অল্প' তাহার সংঘর্ষে তাহাতেই মিশিয়া দৃশ্যত বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাকৃতিক সংসারে এই অভিনয় নিত্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। ব্যবহারিক কারণের কার্য্যস্থলীতেও, সেই নিয়মের অভিনয়ে ইহাই প্রায় সাধারণতঃ লক্ষ্যগোচর হয় যে, বহির্বিকাশ বাহ্যসম্পৎ ও মানসিক বৃত্তিতে প্রকৃতির অনুগৃহীত যাহারা; তাহারা সাধারণতঃ অননুগৃহীতকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ;—তুমি হিন্দুসন্তান, কি তোমার প্রাচীনত্বে, কি তোমার পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে, বল দেখি পৃথিবীর কোন্ জাতি তোমার সমকক্ষ? কিন্তু তথাপি দেখ, কেমন তুমি আপনাকে ভুলিয়া ফিরিঙ্গী সাজিতে সতত লালায়িত হও! ইহার কারণ?—তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা ছিল, তুমি এখন তাহা নাই; তুমি এখন কি বহির্বিকাশ কি মানসিক বৃত্তি, সকল বিষয়েতে ইতর হইয়া পড়িয়াছ; তাই তোমার অনুকরণবৃত্তিও এখন এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে; তাই তোমার জ্ঞানদৃষ্টিতে হীনতা ঘটায়, এখন এমন কি, আর তোমার পিতৃগণের প্রতি লক্ষ্য ও তাহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধিতে আসিয়া যুটে না।

১। আমাদের দেশে এক সঙ্গে রৌদ্র ও জল হইলে, বলিয়া থাকে যে "খেঁক-শিয়ালীর বিবাহ হইতেছে।" জাপানদেশেও অবিকল ঐ কথা প্রচলিত। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যাসভ্য জাতির মধ্যে, আদিম ও মৌলিক ব্যবহার এবং বচন ও প্রবাদাদির একতা যে কত ও কি আশ্চর্য্য, তদর্থে লুবক নামক ইংরেজকৃত Origin of Civilisation নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল একতা, নিঃসন্দেহ, প্রবন্ধোক্ত-ব্যবহারিক কারণ বা আদিম জাতীয় সংস্রবসূত্রে জগতে বিকীর্ণ হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ ইতরকে আকর্ষণ করিলেও, স্বাভাবিক নিয়মে, শ্রেষ্ঠ যে সেও সংস্রবগুণে কিছু না কিছু সংক্রমিত না হইয়া যায় না ; তবে বিশেষ এই যে, ইতর অর্থাৎ প্রকৃতির অননুগৃহীত যাহারা, তাহারাই অপেক্ষাকৃত অত্যধিক পরিমাণে সংক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক কারণবশে, একজাতীয় আচার ব্যবহার আদি বিবিধ বিষয়, আর এক জাতির উপরে আরোপিত হয় এবং উক্ত আরোপ হেতু, সেই সেই বিষয় মনুষ্যের যে বিশেষ প্রকৃতিবশে উৎপন্ন, তৎ তৎ প্রকৃতিও আসিয়া ক্রমে আরোপিতের উপরে বর্ত্তে। সুতরাং ব্যবহারিক কারণবশে, কি ব্যক্তি কি জাতি, উভয়েতেই, কতক পরিমাণে প্রকৃতি পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকে। যে যেমন আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, তাহার প্রকৃতি ও মতিগতিও যে সেইরূপে কতকটা পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা নিতাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। এইসূত্রে আরও একটা কথা বক্তব্য যে, যখন কোন এক বিভিন্ন শ্রেণীর আচার ব্যবহার আদি অবলম্বন হেতু, আমাদের আত্মপ্রকৃতি পর্য্যন্ত তদনুরূপ ও তৎপরিমাণ অনুরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়ার কথা; অন্য কথায় আত্মপ্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহাতে যখন কতকটা হারাইতে হয় ; তখন তাহার যে কোন একটা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, আমাদের কতটা পরিমাণে বিবেচনা ও অনুধ্যান করিয়া চলা উচিত!

এখন, সেই প্রাচীন ও ইতিহাসের অনুদয় সময়, যখন হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষ ও গ্রীকের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিমস্থান পরিত্যাগে উপনিবেশিত দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখনকার কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। গ্রীকদিগেরও তাহা আদিমকাল, হিন্দুদিগেরও তাহা আদিমকাল। কিন্তু তথাপি, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, গ্রীক এবং হিন্দুগণ স্ব স্ব দিগন্তাভিমুখে বহির্গত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে, যখন স্বীয় আদিমস্থানে একজাতিভাবে অবস্থিতি করিতেন ; তখনও তাঁহারা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাসভূমিতে পুর নগর ও গৃহ

অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের অসদ্ভাব ছিল না; নৌকাচালন, বস্ত্রবয়ন আদি বিবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকলের অনুশীলন হইত; বিবিধ পশুপালন এবং যানবাহনাদিরও বহুল উল্লেখ দেখা যায়; এবং তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত প্রধানতঃ হলচালন ও কৃষিকার্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারা। ইহারা কৃষিকার্য্যের এতই প্রতিষ্ঠা ও কৃষি অবলম্বন জন্য আপনাদিগকে এতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন যে, অন্য জাতি হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিতে ও আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনার্থে, হলার্থবোধক 'অর' শব্দ প্রসূত 'আর্য্য' নামে আপনাদিগকে আখ্যাত করিয়াছিলেন। পৃথিবীস্থ তাৎকালিক আর যে কোন জাতি, যে কোন বিষয়ে হউক, কোন প্রকারে তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না; অথবা আর কোন জাতিই তাদৃশ উৎকর্ষলাভে সক্ষম হইতে পারে নাই; প্রত্যুত তাহারা এতই অপকৃষ্ট ও হীন ছিল যে, জীবিকার্থে পশুপালন ও মৃগয়ামাত্র অবলম্বন করিয়া, অনাশ্রমিভাবে দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইত। সুতরাং বলিতে হইবে যে, একমাত্র আর্য্যগণই তৎকালে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও বলবত্তর জাতি ছিলেন। এই কারণ হেতু, আমরাও দেখিতে পাই যে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্যস্থলীতে কার্য্যবহুলতা সত্ত্বেও, কি হিন্দু কি গ্রীক, কাহারই আত্মবিলোপ হইতে পায় নাই; অন্ততপক্ষে, আদিমজাতীয়ত্ব ও তৎপ্রকৃতির যে রেখাপাত, তাহা সর্ব্বদা তাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা সেরূপ সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, এত দূর কালান্তরে আমরাও আজি তদুভয়ের আদিম একজাতীয়ত্ব অনুভব করায় সক্ষম হইতে পারিতেছি। সে যাহা হউক, তথাপি বলিতে হইবে যে, ব্যবহারিক কারণের ধর্ম্মবশে তাহাদের আদিম কৌলিকতায় যে রূপান্তর ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও বড় সাধারণ রূপান্তর নহে।

বিভিন্ন জাতীয় সংস্রব ও ব্যবহারিক কারণের কার্য্য, হিন্দু এবং গ্রীক এ উভয় জাতিরই উপর, প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ সময়ে বর্ত্তিয়াছিল; এক আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব দিকস্থ গন্তব্য স্থানে গমন-

কালীন ; অপর গন্তব্য স্থানে আগমনের পর। পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ সহকারে নিরূপণ পূর্ব্বক কহেন যে, গ্রীকেরা পিতৃস্থান পরিত্যাগ করিয়া যেমন হিন্দুদিগের বহুপূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল ; গন্তব্য স্থান গ্রীক-ভূমে কিন্তু সেরূপ ভারতীয়দিগের ভারতে উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্বে আসিয়া উপনীত হইতে পারে নাই ;—প্রায়ই সমকালে অথবা অল্প ইতর বিশেষে আগুপাছু হইয়া পৌছায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে (অথবা কার্য্যতঃ তাহাই দেখা যাইতেছে) যে, স্বস্থানত্যাগানন্তর গন্তব্য স্থানে আসিতে, হিন্দুদিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগকে অনেক ভ্রমণ-ঘূর্ণাবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইতে হইয়াছিল এবং হিন্দুদিগকে যে পরিমাণে পথাতিবাহন করিতে হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে, গ্রীকের অতিবাহিত পথ অপার অবস্থাসঙ্কুল ও দৈর্ঘ্যে অসীম বলিলেও চলে। তাহার পর এক্ষণে, এতদুভয় জাতির এই পথাতিবাহনকালিক ব্যবহারিক কারণের কার্য্যায়তন আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুরা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে নিরাশ্রমী জাতির চলাচলভাগ অতি বিরল ; কিন্তু গ্রীকেরা যে পথে গিয়াছিল, তাহা আবহমানকাল হইতে বহুতর নিরাশ্রমী জাতির নিত্য পথ। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দূরতর পথ বাহিতে এবং পথিমধ্যে বহুতর জাতীয় সংস্রবে আসিবায়, গ্রীকদিগের মধ্যে অবশ্যই বহুল পরিমাণে পৈতৃক আচার ব্যবহারের লোপ,কিয়দংশের বা বিকার,এবং কিয়দংশের স্থানে কতকগুলি নূতন বিষয়ের অধিষ্ঠান হইয়াছিল; সুতরাং সেই সকল হইতেও হিন্দুদিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগের মধ্যে যে বহুপরিমাণে পৃথকত্ব জন্মিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? তাহার পর, সঙ্গগুণে উন্নত ভাবও অবনত এবং অবনত ভাবও উন্নত না হয় এমন নহে। গ্রীকদিগের সংস্রবে আগত জাতি যাহারা, তাহারা একে অসংখ্য, তাহাতে আবার সর্ব্বাংশে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হেয় ভিন্ন উন্নত ছিল না; কাজেই তাহাদের সংস্রবে অপকর্ষতাও কতকটা গ্রীকদিগের প্রাপ্ত হইবার কথা। পুনশ্চ, এইরূপে যে অপকর্ষপ্রাপ্তি তাহাকে, হিন্দুসভ্যতা

অপেক্ষা গ্রীকসভ্যতার পরে উদয়ের পক্ষে, একটি অন্যতর কারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অননুগৃহীত যাহারা, তাহারাই স্বস্থান হইতে আগে বিতাড়িত হয়; সুতরাং পরগামী হিন্দুর তুলনে বলিতে হইবে যে, একে পিতৃস্থান পরিত্যাগসময়ে হিন্দুর অপেক্ষা গ্রীকেরা কম পরিমাণে উৎকর্ষভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার নিকৃষ্ট জাতীয়সংস্রব হেতু নানা অপকর্ষের চাপাচাপি,অতএব কেন গ্রীকেদের জাতীয় উৎকর্ষ হিন্দুদিগের অপেক্ষা মন্থরগতি না হইবে? সে যাহা হউক, হিন্দুদিগের পথবাহনও অতি অল্প, পথবাহনকালীন বিভিন্ন জাতীয়সংস্রব যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও অতি সামান্য; এই জন্য কি ইহাদের অপকর্ষতা প্রাপ্তি, কি পৈতৃক আচার ব্যবহার হইতে ইহাদের পরিবর্ত্তনভাগ, উভয়ই অপেক্ষাকৃত অতি অল্প। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণেরও সেজন্য বিশ্বাস এরূপ যে, আদিমস্থানস্থ আর্য্যদিগের যাহা কিছু রীতি নীতি ছিল, তাহার প্রকৃত আভাস কেবল এক প্রাচীন হিন্দুচরিতেই পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, জাতিদ্বয় গন্তব্য স্থানে উপনিবেশিত হইলে পর, কি কি প্রকারে ব্যবহারিক কারণের কার্য্য ঘটিয়াছিল। যে যে প্রকারে ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথমতঃ—তৎ তৎ দেশস্থ আদিম অধিবাসিগণের সহ সংস্রব; দ্বিতীয়তঃ—পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর দেশস্থ জাতি সকলের সহ সঙ্গ-সংমিলন।

আদিম অধিবাসিগণ, আদিতে উভয় জাতিরই নিকট শত্রুভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। গ্রীসীয় আদিমগণ সংখ্যায় সামান্য হেতু, গ্রীকেরা অতি অল্পশ্রমে ও অতি অল্পকালে, তাহাদিগকে বশ্যতায় আনিয়া দাসত্বপদে নিয়োজন পূর্ব্বক, এক পক্ষে ভাবনাশূন্যতা ও অপর-পক্ষে আত্মদার্ঢ্যতা লাভ করিয়াছিল। আদিমগণও তাহাদের যথাপ্রাপ্ত ভাগ্যকে সহজে মানিয়া লওয়ায়, ক্রমে দাস ও প্রভু উভয়ে উভয়তঃ ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আসিতে থাকে; সুতরাং উভয়তঃ গুণাগুণ সকলের নির্বিঘ্নে বিনিময় চলিতে থাকায় এবং গ্রীকদিগের মধ্যে জাতি-

ভেদাদি পার্থক্যবিধায়ক প্রথা কিছু পরিবর্দ্ধিত হইতে না পাওয়ায়, ক্রমে ক্রমে ও কালে, দাস ও প্রভু এক জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। বশ্যতায় আসিবার পরেও, প্রথম প্রথমটা হেলোটগণের মধ্যে এখন তখন সামান্য গোছের বিদ্রোহ কিছু কিছু উপস্থিত না হইত, এমন নহে; কিন্তু সে কেবল প্রভুর অত্যধিক প্রভুত্বজন্য নিরাশ মনের বিদ্রোহমাত্র এবং তাহাও অতি সহজে প্রভুর বিক্রমে উপশমিত হইয়া যাইত। সুতরাং সমবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা ঘটনা হয়, তাহা এখানে কখনও ঘটে নাই এবং সেজন্য, গ্রীকভূমে কথিতরূপ ব্যবহারিক কারণের কার্য্যঘটনাতেও কোন ব্যাঘাত পড়িতে পায় নাই।

কিন্তু ভারতীয়দিগের অবস্থা ঠিক উহার বিপরীত। ভারতীয় আদিমগণ সংখ্যায় যেন অসংখ্য, একটা নিপাত করিলে রক্তবীজের ন্যায় শতটা উত্থিত হয়। নিত্য সংগ্রাম, নিত্য নররক্তে স্নান, তথাপি শত্রুরও কমি নাই; সুতরাং সুখ শান্তি বা নিরুদ্বেগিতার সঙ্গেও দেখা নাই। শত্রুও আবার সর্ব্বদা সম্মুখশত্রু নহে; নদীতট, বিহারভূমি, বনদেশ, আনাচ-কানাচ, সর্ব্বত্রেই গুপ্ত শত্রুর আশঙ্কা; কখন কি ভাবে আক্রমণ করিবে, কখন কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ধনজন হরণ করিয়া পলাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। বিপুল বীরত্ব সত্ত্বেও জয়ের আশা নাই; অসীম সাহস সত্ত্বেও আত্মদার্ঢ্যতার সম্ভাবনা নাই; চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির ও আকুলিত। এতদ্বিষয়ক ব্যাকুলতা তাহাদের চিত্তকে এতই আকুলিত করিয়াছিল যে, তাহাদের দেবস্তুতি এবং এমন কি, দৈবকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকাংশ ভাগ, শত্রুর অমঙ্গলকামনায় পর্য্যবসিত। অন্য দিকে তদ্বিপরীতে সমস্ত গ্রীকপুরাণ খুঁজিয়া দেখ, আদিমগণের বিরুদ্ধসূচক একটি কথাও সমস্ত গ্রীক দেবস্তুতি ও দৈবকার্য্যের মধ্যে খুঁজিয়া কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; সে পক্ষে তাহাদের আত্মবলই পর্য্যাপ্ত ছিল। হিন্দুর আত্মবলে না কুলান জন্যই দেববলের কামনাভাগ এত অধিক। সে কামনা ও তদুল্লেখ কেবল

বৈদিক সূক্তেই যে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা নহে, পৌরাণিক অসংখ্য ও অদ্ভুত দেবাসুরসংগ্রামকাহিনী সকলও এই সূত্রে উৎপন্ন। পুনশ্চ, সেই আদিম গুপ্তশক্রতার প্রভাব হইতে, বনভূমি, প্রান্তরভাগ ও লোকবিরল স্থান মাত্রে, চিরদিনের তরে ভূত, রাক্ষস, দৈত্যদানব, কুষ্মাণ্ড, প্রভৃতি অদৃষ্টচর জীবের চিরবিহারভূমিতে পরিণত হইয়া আসিল। লোকচিত্তও ক্রমে আত্মদার্ঢ্যতা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর রূপে অদৃষ্ট দেবতার বশীভূত হইয়া উঠিল। অন্য দিকে আবার, এরূপ প্রকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু প্রবল বিদ্বেষানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকায়, আদিমগণের সহ কোন প্রকার গুণাগুণাদি বিষয়েতে বিনিময় কার্য্যের কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না। যদিও কালে বহুকষ্টে আর্য্যেরা কিয়দংশ আদিমগণকে দমন করিয়া বশ্যতায় আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের সমস্ত বিষয়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও তাহাদিগকে সর্ব্বদা সহস্রহস্ত তফাতে রাখিতেন, এমন কি কোন শূদ্রের সঙ্গে পথ চলিতে পর্য্যন্ত রাজী হইতেন না;—মনুতেও একসঙ্গে পথ-চলার নিষেধবিষয়ক বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আর্য্যদিগের মধ্যে যদিও ব্যবসায় অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি জাতীয় সংজ্ঞা সকল স্থাপিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু জাতিসকলের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যে পরস্পর সংস্রবশূন্যতা তাহা, আমার বোধ হয়, শূদ্র-দিগকে ঘৃণাবশতঃ দূরে রাখার সূত্র হইতেই, ক্রমে উত্থিত ও কালে তাহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া থাকিবে। বশ্যতায় আগত শূদ্রেরাই আর্য্যচরিতের অনুকরণ করিত; কিন্তু আর্য্যেরা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ বশতঃ, তাহাদের কিছু কখনও যে অনুকরণ করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। এখন দেখ, আদিম জাতির সংস্রবহেতু গ্রীকদিগের উপর ব্যবহারিক কারণের যে যে রূপ কার্য্য অতি বিপুল; হিন্দুর উপর সেই সংস্রব বিরহে ব্যাহারিক কারণের সেই সেই রূপ কার্য্য কিছুই হইতে পায় নাই। অতএব এটাও এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই আদিম জাতির সংস্রবস্থলে, হিন্দু এবং গ্রীকচরিতে কতটা বিভিন্নতা আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং তাহাদের চিত্ত ও চিত্তের অবলম্বনীয় বিষয় সকলও স্থতরাং কতটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিকে গতিশীল হইতে চলিল।

এক্ষণে পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর দেশস্থ জাতি সকলের সহ সঙ্গ-সংমিলন বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দু একে নিজে বিদেশগামী হইত খুব কম; তাহাতে আবার সে দূর সময়ে, ঐতিহাসিক সময়ের আদিমকালে, ভারতের পার্শ্বস্থ জাতি সকল বর্ব্বর থাকায়, অপরাপর দেশের লোকও ভারতে যাতায়াত করিত কম। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি ঘৃণা করিতে গিয়া,আম্লেতরের প্রতি ইহাদের যে ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়াছিল; তাহা ক্রমে প্রতিবন্ধকতার অভাবে সংস্কারে পরিণত হওয়ায়, হিন্দুরা অপরাপর সকল জাতি ও তাহাদের জাতীয় বিষয়কেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অতএব একেই বিজাতীয় লোকের সহ সংস্রব কম, তাহাতে পুনঃ ঘৃণার চক্ষে দর্শন, স্থতরাং সঙ্গ-সংমিলনস্থলেও ব্যবহারিক কারণের কার্য্য ততটা হইতে পায় নাই, যতটা গ্রীকদের উপর হইয়াছে। এরূপে কি ভারতের আগমনপথে, কি ভারতের আদিম জাতির সংস্রবে, কি বিজাতীয় সঙ্গ-সংমিলনে, সর্ব্বত্রই ব্যবহারিক কারণের কার্য্যাল্পতা হেতু, হিন্দুগণ স্বীয় প্রাচীন কৌলিকতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্য আবহমান কাল, এবং এমন কি, আজি পর্য্যন্ত যতটা রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ততটা বোধ হয় এক চীন ভিন্ন, পৃথিবীর আর কোন জাতিই রক্ষা করিতে পারে নাই। গ্রীক ইতিহাস উহার বিপরীত; যেমন গ্রীসের গমনপথে, যেমন আদিমগণের সংস্রবে, তেমনি বিজাতীয় সঙ্গ-সংমিলনেও গ্রীকের উপর ব্যবহারিক কারণের কার্য্যভাগ অতি প্রবলতর। পার্শ্বস্থ বহুতর জাতির সহ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীকদিগের গমনাগমন চলিতেছে; ইউরোপা ও ইয়ো হরণ, আর্গোনটিক সমুদ্রযাত্রা, ট্রয়যুদ্ধ, ইত্যাদি বর্ণনায় তাহার পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল জাতির সঙ্গে তাহাদের গুণাগুণ, আচার ব্যবহার ও বিষয়াদির বিপুল বিনিময় সম্বন্ধে অনেক নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু এই জাতীয় সঙ্গ-সংমিলনের জন্য যে ফলাফলটা, তাহা বিশেষ লক্ষ্যস্থলীয়, যেহেতু উহাতে অনেক যায় আসে। উহা বর্ণিত জাতিদ্বয়ের উপর কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পাইয়াছে, তাহা এক্ষণে একটা উপমার দ্বারা দেখাইব। মনে কর দুইটি ব্যক্তি আছে, উভয়েই বিশেষ বুদ্ধিমান্; কিন্তু একজন নানা স্থানে যাওয়া আসা করে, নানা লোকের সঙ্গে মিশে, সুতরাং নানা বিষয় লইয়া এত ব্যাপৃত থাকে যে, ঘর অপেক্ষা বাহিরে থাকিতেই সে অধিক ভাল বাসে ও বাহিরের কার্য্যে তাহার অধিক প্রীতি। কিন্তু আর একজন তদ্বিপরীতে কোথাও যাইতে আসিতে বা কাহারও সঙ্গে মিশিতে ভাল বাসে না এবং এইরূপেই তাহার স্বভাব, বাল্যকালের অবস্থাক্রীড়া বশতঃ, নির্ম্মিত হইয়া উঠিয়াছে; সাধারণতঃ এরূপ স্বভাব যাহার, সে মানসপ্রসূত বিষয়কে অধিক ভাল বাসে ও বাহিরের অপেক্ষা ঘরের বিষয়ে তাহার অধিক প্রীতি। ইহার ফল, নানা স্থানে গতায়াত হেতু একজনের সাংসারিক বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ; আর একজনের তদভাবে সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাশূন্য ভাব। একজনের বহুলোকের সহ মিশামিশি হেতু, লোকব্যবহারে পটুতা ও ব্যবহারে পরিচ্ছিন্নতা; আর একজনের তদভাবে কোথায় কেমন ও কাহার নিকট কিরূপ চলিতে হয় ও বলিতে হয়, সে জ্ঞানে হীনতা এবং ব্যবহারে রূঢ়তা ও অমার্জ্জিত ভাব। একজনের বাহিরের বিষয়ে প্রীতি হেতু, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পূর্ণ আবেশ, কিন্তু নিজ গৃহমধ্যে কিরূপ করিলে কি হয়, তৎপ্রতি তাদৃশ ভ্রূক্ষেপ নাই; আর একজনের ঠিক তাহার বিপরীতে বাহিরের বিষয় উড়িয়া পুড়িয়া যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গৃহসুখটা তাহার পূর্ণ মাত্রায় না হইলেই বিপদ্। একজন চটকশালী লৌকিক কার্য্য লইয়া ব্যস্ত; আর একজন চিন্তামার্গে অনন্ত অদৃষ্টসংসারে প্রধাবিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ইতর ভদ্র সকলেই চিনে, সকলেই ভাল বাসে ও তাহার প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিকে সাধারণ লোকে চিনে না এবং চিনিলেও কোন প্রতিষ্ঠা করে না;

কেবল বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্য তাহার প্রতিষ্ঠা করে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা কয়টি? এখন বলা বাহুল্য যে, এই প্রথমোক্ত ব্যক্তিই গ্রীক এবং দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি হিন্দু। আত্মপ্রীতিপূর্ণ হিন্দু, বরাবরই বহি-বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ব্যবহারিক কারণকে বড় একটা স্পর্শ করিতে না দেওয়ায়, জগতের ইতিহাসে এক অতি আশ্চর্য্য আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ও অভূতপূর্ব্ব প্রকারের জাতীয়ত্ব এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন;—জানি না, এটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু আর সে অপূর্ব্ব জাতীয়ত্ব যে বড় একটা এখন রক্ষিত হইতে পারিবে, এমন বোধ হইতেছে না। যে কারণেই হউক, অধুনাতন কালে বিজাতীয়ের প্রতি সেই বিদ্বেষভাব যেমন বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে; অমনি দেখ কি প্রবল স্রোতে ভাসিয়া হিন্দুসন্তান এখন এমন কি ফিরিঙ্গী পর্য্যন্ত সাজিতে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে।

ফিরিঙ্গী পর্য্যন্ত সাজিতে যাওয়া অবশ্যই অতি দৌড়ের কথা! ততটা না হউক, কিন্তু উক্ত কারণস্রোতে এক্ষণে পূর্ব্বতন অনেক বিষয় যে প্রবল বেগে ভাসিয়া গিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয়কে স্বস্থান দান করিবে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই এবং ইহাও নিশ্চয় যে, কেহই তাহা আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। হওয়াও উচিত এবং এ সূত্রে ব্যবহারটা যদি সুমার্জ্জিত হয়, সেটা আরও প্রার্থনায়। ব্যবহারের উপর জাতীয় উন্নতি অবনতি বহু পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।—কিন্তু বলিতে লজ্জা করে যে, পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, অধুনাতন ভারতীয়ের তুল্য কুমার্জ্জিতলোকব্যবহারযুক্ত জাতি জগতের সভ্যমণ্ডলীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

২। বৈষয়িক কারণ।

অতঃপর বৈষয়িক কারণের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ব্যবহারিক কারণ যেমন গন্তব্য স্থানে আগমনের পূর্ব্ব হইতে কার্য্য

করিতে আরম্ভ করিয়াছে; বৈষয়িক কারণ সেরূপ নহে। তাহার কার্য্য প্রায় গন্তব্য স্থানে উপনীত হওরার পর হইতে আরম্ভ হয়।

বিজ্ঞানবিদেরা অনেক মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, মানবের সাধারণ জীবিকাবিষয়ক বৃত্তি সমুদায় যতদিন স্বচ্ছলতার সহিত পরিতৃপ্ত না হয়, ততদিন তন্নিমিত্ত ব্যস্ততা বশতঃ, মানবগণ অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ হইয়া থাকে। হিন্দুরা জীবিকাবিষয়ক অসচ্ছলতার হাত হইতে, বোধ হয়, ভারতে আগমনের দিন হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ভারতের যে স্থানে যাও, তথায়ই স্বচ্ছসলিলা নদীসকল প্রবাহিত; বর্ষাগমে তাহারা পল্লল দ্বারা সন্নিকটস্থ ভূমি সমস্তকে উর্ব্বরা হইতে উর্ব্বরতর করিতে পটু। স্বভাবতঃ ভূমি সর্ব্বত্র এরূপ অনুকূলা যে, অযত্নপূর্ব্বক একমুষ্টি বীজ ছড়াইলেও, অল্প দিনে তাহার ফললাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; এবং হয়ত আবার, সে প্রাচীন কালে ভূমি অক্ষুব্ধ থাকাতে, অনেক স্থানে শস্য সকল যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং বিকীর্ণ হইয়া থাকিত। যেখানে যাও, কানন সকল যতই ভীষণদর্শন হউক, বৃক্ষাবলী তাহার সর্ব্বত্র পরিপক্ক সুস্বাদ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত সকলও সর্ব্বত্র শ্যামল-দেহে ফল-রস-জল প্রদান করিয়া পথিকের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। অথবা সংক্ষেপে আকবরের রাজস্ব-সচিব তোড়লমল্লের কথায়, এদেশ এতই সৌভাগ্যশালী যে, বিধাতা ইহার অধিবাসীদিগের নিমিত্ত বৃক্ষের উপরে পর্য্যন্ত দুই দুই রুটি ও এক পেয়ালা সরবৎ রাখিয়া দিয়াছেন। হিমাদ্রি এবং সন্নিকটস্থ অপরাপর পর্ব্বতসমূহ রত্নাধার, ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে নানা রত্ন উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। যে দেশের এমন অবস্থা, সেখানকার অধিবাসীর আর সামান্য-বৃত্তি-পরিতৃপ্তি-বিষয়িণী চিন্তা কোথায়? ইহার ফল, হিত অহিত উভয়ই আছে।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, সমবেতসাধ্য যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, আজ্ঞাদাতা এবং আজ্ঞাপ্রতিপালক, এতদুভয় পর্য্যায় সংস্থাপন না করিলে, আরব্ধ কার্য্য আয়ত্ত এবং তাহা সাধন করিতে নানা

বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে; হয়ত অন্তে একবারে অসমর্থতা আসিয়া পড়ে। কোন নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলেও, এই নিয়ম অভিনীত হইয়া থাকে; অথবা স্বভাবতঃ উহা, চুক্তি প্রতিজ্ঞা বা কল্পিত নিয়মের অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনা হইতেই আসিয়া প্রবর্ত্তিত হয়; ইতর জীব, এমন কি ক্ষুদ্র কীট কীটাণুতে পর্য্যন্ত, উক্ত স্বভাবানুরূপ কার্য্য হইতে দেখা যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন, তাহারা স্বাভাবিক-নির্ব্বাচনবশে এবং গুণানুসারে, উচ্চাধঃক্রমে পর্য্যায়ভেদে, নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং যাহারা অল্পগুণসম্পন্ন, তাহারা সেইরূপ নীতের পদ প্রাপ্ত হয়। নেতৃগণ বুদ্ধি, কৌশল বা বল, যথাসম্ভব পরিচালন দ্বারা, নীত ব্যক্তিগণকে উপায় ও পন্থা প্রদর্শন, আপদ বিপদ হইতে রক্ষণ, এবং তাহাদের স্বস্থানে সংস্থিতিসাধন করিয়া থাকে। নীতগণও, কৃতজ্ঞতাবশে এবং প্রাপ্ত উপকারের বিনিময় স্বরূপে, স্বোপার্জ্জিত সৌভাগ্যের অংশ, নেতাদিগকে, তাহাদিগের উচ্চ নীচ পর্য্যায় অনুসারে যথাযোগ্য ভাগে, প্রদান করিয়া থাকে। এই নিয়মের ক্রমোত্তরপুঞ্জতা হইতে, সময় সহযোগে, নেতৃগণ ক্রমে রাজা, রাজপারিষদ, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি নানা নামধারী আঢ্য শ্রেণীতে স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীস্থের সংখ্যা স্বভাবতঃ এবং কার্য্যগতিকে অপেক্ষাকৃত অল্প। অপরাপর ব্যক্তিগণ কালে, উচ্চ শ্রেণীস্থগণের আঢ্যতা বশে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তাহাদের আজ্ঞাকারী হইয়া পড়ে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থবর্গের উক্ত আজ্ঞাধীনতা অবস্থা হেতু, আঢ্যেরা ক্রমে স্বার্থবশবর্ত্তিতায় তাহাদিগকে অল্পপুরস্কারে অধিক পরিমাণে খাটাইয়া, আপনাদের পূর্ব্ব হইতে পুঞ্জ সৌভাগ্য, আরও পুঞ্জ করিয়া লইতে ক্ষমবান্ হয়। এক দিকে পুঞ্জতার অন্যায় বৃদ্ধি এবং অপর দিকে তদ্বিপরীতে ক্রমবর্দ্ধিত অধিকতর নিঃস্বতা হেতু, ইতর শ্রেণী যদিও ক্রীতদাসবৎ হইয়া উঠিবার কথা বটে; কিন্তু তথাপি এখনও, এ আদিম অবস্থাতে, ততটা বিপুল বৈষম্যভাব, অথবা উচ্চ এবং অধমের মধ্যে অপরিমিত ব্যবধান স্থাপন, এ সকল ঘটিয়া উঠে নাই।

অধম শ্রেণী এখনও, অপরপ্রদত্ত বেতনের উপর সর্ব্বদা নির্ভর না করিয়া, আপন ভাগ্যমাত্রে নির্ভর পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলতার সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইত; উচ্চশ্রেণীও, ইহাদিগকে স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, সর্ব্বদাই ইহাদের উপর হেয়ভাব ও অনাদর প্রদর্শনে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে সমর্থ হইত না।

কিন্তু অতঃপর এই যে আদিম অবস্থাবৈষম্য—তাহার যথাভাবে স্থিতি বা তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাসতা; দেশের শীতাতপ, উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা, ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। যথাপ্রয়োজনানুরূপ শরীরসঞ্চালন ক্রিয়া এবং শারীরিক কার্য্যসাধনোপযুক্ত শরীরজ তাপরাশি, পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, তাহার শৈত্য বা উষ্ণতা অনুসারে, হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৈত্যে যথায় তাপের হ্রাস হয়, তথায় তাপের সমতা রক্ষার্থে, ক্ষতিপূরণ জন্য মাংস, মাদক ও তৈলাক্ত দ্রব্য, আহারার্থে প্রয়োজন হয়; এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালনে তাপোৎপাদন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্ব্বদা শরীররক্ষণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। আর যথায় উষ্ণতা হেতু তাপের বৃদ্ধি হয়, তথায় তদ্রূপ আহারের অপ্রয়োজন; সাধারণ ফল মূল শস্য প্রভৃতি অল্পায়াসলভ্য দ্রব্যই প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়। শ্রম দ্বারা তাপবৃদ্ধিও অনাবশ্যক; অনুপার্জ্জিত সহজ তাপই এত যে তাহাতে অলসতা বৃদ্ধি হওয়ায়, পরিশ্রম করিতে মানবচিত্ত প্রবৃত্তিশূন্য হয়। পরন্তু শরীরে কোন প্রকার আবরণেরও আবশ্যক হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রায়ই সজল এবং উর্ব্বরা। কিন্তু যদি জলশূন্য অনুর্ব্বরা হয়, তাহা হইলে সজল ও উর্ব্বরা উষ্ণদেশ, এবং নির্জ্জল ও অনুর্ব্বরা উষ্ণদেশ, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দেশের বায়ু সজল ও উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা; শেষোক্ত দেশের বায়ুও উষ্ণ বটে, কিন্তু শুষ্ক, এবং দেশে জলশূন্যতা হেতু ভূমি অনুর্ব্বরা। এই নিমিত্ত শেষোক্ত দেশের লোকেরা, দুষ্প্রাপ্য আহারীয়ের নিমিত্ত, বাধ্য হইয়া শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে

সক্ষমও হইয়া থাকে ; কারণ জলীয় বাষ্পযুক্ত উষ্ণ বায়ুমধ্যে দেহ হইতে তাপ নির্গমণ পক্ষে যে প্রতিবন্ধকতা জন্মে, শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে সে প্রতিবন্ধকতা জন্মে না বলিয়া, শ্রমজনিত তাপ সহ্য করিতে তাহাদের ক্লেশ বোধ হয় না। এই সকল কারণে ও অবস্থাগুণে, প্রথমোক্ত দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা, শেষোক্ত দেশের অধিবাসিগণ অধিক পরিশ্রমপ্রিয় ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত, অপেক্ষাকৃত সজল, উর্ব্বরা ও উত্তপ্ত বঙ্গদেশস্থ এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জল অনুর্ব্বরা ও প্রায় সম বা অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ অধিবাসী-দিগের মধ্যে, দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাইবে যে, একজন বাঙ্গালী কতদূর অলস, পরিশ্রমকাতর, ভীরু এবং দুর্ব্বল ; আর একজন হিন্দুস্থানী কতদূর উদ্যোগী, পরিশ্রমপ্রিয়, সাহসী এবং সবল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায়, শীতপ্রধান দেশেরও দুইরূপ অবস্থা আছে। যথায় শৈত্যের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং বায়ু সজল, তথায় ভূমি সাধারণতঃ একেবারে অনুর্ব্বরা এবং আহারীয় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, অথচ সসার আহারীয়যোগে তাপবৃদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন ; সেখান-কার লোকের চিরকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুঃখভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত হয়, অথচ অভাবও মিটে না এবং সুখের দিনও ভাগ্যে একদিন ঘটে না। আর যেখানে শৈত্যভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প, বায়ু শুষ্ক, এবং ভূমিও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা ; সেখানে লোকে নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা অভাব পরিপূরণ করিয়া, চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটির আদর্শস্থল,—লাপলাণ্ড প্রভৃতি উত্তরকেন্দ্রস্থ দেশ সমুদায়। আর দ্বিতীয়টির আদর্শস্থল পৃথিবীর সমমণ্ডলস্থ দেশসমূহ।

যথায় দেশ সজল ও উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা, তথায় কষ্টলভ্য মাংস মাদক ও তৈলাংশযুক্ত দ্রব্য প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রয়োজন হেতু, মানবেরা অনায়াসলভ্য ফল মূল শস্যাদি সংগ্রহ দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়। শৈত্যপ্রধান দেশে তাপবৃদ্ধির

জন্য ব্যয়-বাহুল্য এবং কষ্টলভ্য যে সকল গরম গাত্রাবরণের সর্ব্বদা আবশ্যক হয়, এখানে লোকের তন্নিমিত্ত সেরূপ ভাবিতে হয় না। এক কথায় অন্নবস্ত্র যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহা ইহাদের অল্পায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। মালথুস নামক জনৈক ইংরেজ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লোকতত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়ক পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা অনুসারে মানববংশ উন্নত অবস্থায় নীত বা ইতর অবস্থায় অবনমিত, এবং বংশস্থ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কখন কখন বা অধিক স্বচ্ছলতা হেতু লোকসংখ্যা অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইয়া যায়। এ কথা নিতান্ত অসত্য নহে। এই মত ধরিতে গেলে, উক্তরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট উর্ব্বর ও উষ্ণ দেশে লোকসংখ্যা অচিরাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার কথা। এই লোকবৃদ্ধিসহকারে এবং মানবের উষ্ণদেশজ স্বাভাবিকী আলস্যপ্রিয়তা হইতে, সাধারণ লোকের মধ্যে আহারীয় বস্তুর অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা উপস্থিত হওয়ায়, বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন হেতু অধিক পরিমাণে শ্রমের আবশ্যক হইয়া থাকে; সুতরাং আগে যাহারা যে কোন উপায়ে বসিয়া খাইত,তাহাদেরও শ্রম নিরত হওয়ার প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে কাজেই শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই পরিশ্রমেরও মূল্য কমিয়া যায়। তখন এই সুযোগে, পূর্ব্বার্জ্জিত ধনযুক্ত সৌভাগ্যশালী যাহারা, তাহারা অল্পব্যয়ে অধিক শ্রম বিনিময়ে পাইয়া, বহুধন সঞ্চয় বা যথা অভীপ্সিত কার্য্যকরণে সমর্থ হয়; ইহাতে অন্য দিকে, শ্রমশালীরা ক্রমে সেই পরিমাণে নির্ধন এবং সৌভাগ্যশালী-দের পদনত হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত, এবম্ভূত দেশমধ্যে, অতি অল্প দিনেই উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী, স্পষ্টরূপে স্থাপিত এবং তাহাদের মধ্যে অপরিমিত বিষয়বৈষম্য ঘটিয়া উঠে;—সুতরাং সামাজিক যে শ্রী-শালিতা ভাব,তাহা সর্ব্বজনীন না হইয়া, একচেটিয়া ভাবে উচ্চশ্রেণীস্থের করতলগত হয়। আঢ্য বা উচ্চশ্রেণীরা তখন সম্পত্তিলাভে, ভোগ-বিলাসী মনুষ্যদিগের মনোবৃত্তিসমূহের আকাঙ্ক্ষাপূরক, সুতরাং আশু

সুখোৎপাদক, বিলাসবিস্তারে রত হয়। তাহার সিদ্ধি পক্ষে, লোক সকলও আজ্ঞাকারী থাকায়; দেশমধ্যে অচিরে নানাবিধ শিল্প কারু স্থাপত্য ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রাদুর্ভাব ও প্রাচুর্য্য হইতে থাকে এবং তজ্জন্য, অনুগামিনী বাহ্য সভ্যতার বাহ্য মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সভ্যতা, সমাজমধ্যে শ্রেণীভেদে দারুণ বৈষম্য হেতু, সর্ব্বজনীন হইতে পায় না। সুতরাং উহা আভ্যন্তরিক না হইয়া বাহ্যিকভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে; এবং যখনই কোন বিপ্লবকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন হয় সমাজ ও তাহার সভ্যতাকে একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়; নয় ত তদুভয় এমন মুমূর্ষাবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে যে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সজীব করা একরূপ অসাধ্য কার্য্যে পরিণত হয়।

বকল নামক ইংরেজের লিখিত সভ্যতাবিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এইরূপ ধনবৈষম্য হইতেই মিসর দেশের আদিমকালীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়।[২] ঐ সভ্যতা বাহ্যিক দৃশ্যে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যাহাই থাকুক, ফলতঃ কিন্তু উহা কখনও সর্ব্বজনীন ছিল না। সকল শ্রেণীতে সমভাবে উহা বিকীর্ণ হয় নাই। উচ্চশ্রেণীস্থেরা যেমন অপরিমিত-ধনশালী হইয়া বিলাসরত হইয়াছিল; নিম্নশ্রেণীস্থেরা তেমনি নিঃসম্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কোনরূপে জীবন অতিবাহিত করিত এবং সর্ব্বদা আঢ্যগণের পদাবনত থাকিত। এতদূর পদাবনত থাকিত যে আঢ্যেরা যখন যাহা মনে করিত, তাহাদের দ্বারা তখনই তাহা সম্পাদন করাইয়া লইত। মিসরদেশীয় পীরামিড প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহকে তৎপক্ষে সাক্ষ্যস্থল স্বরূপ, অনেকে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া থাকে। এই পীরামিড সকল,ইউরোপীয় গণনায়,পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্য্য কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণিত। সপ্তাশ্চর্য্যের আর ছয়টি কতকাল হইল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সপ্তম আশ্চর্য্য পীরামিড সকল অদ্যাপি অচল ও অটলভাবে, বিরাটবেশে, মেঘমুকুটে শিরোভূষিত

২। Buckle's History of Civilisation, Vol I., P.P. 81.92.

করিয়া, দর্শকের মনে বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব যুগপৎ উৎপাদন পূর্ব্বক, মিসরীয়দিগের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কত কত কাল-স্রোত ইহাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতেছে; আবারও কত কত কালস্রোত সেইরূপে অতিক্রম করিয়া কত যুগযুগান্ত যে ইহারা অবস্থিতি করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইস্থানে যত পীরামিড আছে, তন্মধ্যে গিজা নগরের পীরামিড, যাহা স্থফি নামক মিসরাধিপতির সমাধি-মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং বিস্ময়কর। হিরোদোতস্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবেত্তার হিসাব অনুসারে, এই পীরামিড নির্ম্মাণ করিতে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত ছিল এবং কুড়ি বৎসরে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। এতদর্থে শ্রমজীবী রক্ষা করিতে ৩৮৪০০০০ টাকা ব্যয় হয়। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এবম্ভূত অদ্ভুত কীর্ত্তি এত স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতি সুলভ ও আজ্ঞাকারী না হইলে, কখনও সমাধা হইতে পারিত না। সাহজাঁহার তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে, এরূপ কথিত আছে যে,৭৫০০০০০টাকা ব্যয় হয়। মিসরদেশীয় কর্ণাক নগরস্থ প্রাচীন দেবমন্দিরের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ডও, বহুশ্রম-সুলভতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারিত না। উহা কিরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড ছিল তাহা বর্ণনাতীত। ইহার আয়তন এবং আকৃতি অতি বিস্ময়কর। ইহার একটিমাত্র হল অর্থাৎ দালানের স্তম্ভাবলী দেখিয়া,বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাম্পলিওন বিস্ময়-সহকারে এরূপ উক্তি করিয়াছিল,—"যে কল্পনা-শক্তি ইউরোপীয় সুমহান্ অলিন্দস্তম্ভাবলীকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধোত্থিত হইয়া থাকে; কর্ণাকনগরের দেবদালানস্থ ১৪০ স্তম্ভাবলীর আকৃতি দৃষ্টে, সে কল্পনাও লজ্জাবসন্নমুখে বিনত হইয়া যায়।[৩] ফলতঃ মিসরের শ্রমজীবীরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল, যদি এত দূর সময়ে, বহুবিপ্লবে রূপান্তর প্রাপ্ত তাহাদের

৩। "The imagination which in Europe rises far above our porticoes sinks abashed at the foot of the 140 Columns of the hypostyle hall of Kernak."

বংশধরদের দ্বারা কিছুমাত্র প্রতীত হইবার সম্ভাবনা থাকে; তবে মিসরীয় আধুনিক ফেলাদের অবস্থা বারেক পর্য্যালোচনা করিলে সে পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবে। এক দিকে মিসরের সভ্যতা, ধনবত্তা ও কীর্ত্তি এবং অন্য দিকে তাহার সামান্য শ্রেণীদিগের দুরবস্থা, যেরূপ যেরূপ কারণ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল; ব্যাবিলন সাম্রাজ্যেও ঠিক তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অস্তিত্ব থাকায়, তদ্রূপ তদ্রূপ ফল ফলিয়াছিল। বাইবেল-গ্রন্থোক্ত ব্যাবিলনের ধনবত্তা, সামান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার, ব্যাবিলনপতির ঐশ্বর্য্য, মিডদেশীয়া অমিতানাম্নী ব্যাবিলনরাজমহিষীর সন্তোষার্থে মনোহর অট্টালিকা এবং গগনোদ্যান প্রভৃতি রচনা, এই সকল তাহার পরিচয়স্থল।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি মিসর হইতে বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে; কিন্তু যে বিষয়টি ধরিয়া এ স্থানে আলোচনা করা যাইতেছে, কেবল তৎসম্বন্ধে দেখিতে গেলে, মিসর যে শ্রেণীতে, ভারতকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করিতে পারা যায়। ইহা প্রায়ই উত্তপ্ত ও সজল; অধিকন্তু ইহা অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উর্ব্বরতা-গুণ-সম্পন্ন। আহারীয় দ্রব্যের এখানে অভাব নাই; এজন্য অতি অল্প দিনে ধনসঞ্চয়, এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থা পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর, সুতরাং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্য বিপুলভাবে জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে, আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত, আরও এক দল দাসবৎ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—ইহারা ভারতের সেই কতকাংশ আদিম অধিবাসিগণ, যাহারা আর্য্য-অস্ত্রতেজে পদাবনতভাবে বশ্যতায় আসিয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। অতএব নানারূপেই, আর্য্যেরা অপার শ্রম নিয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এজন্য ইহাদের ধনবত্তা ও সভ্যতাও অতিশীঘ্র সমুদিত হয়। যাহা হউক, উহারই মধ্যে একটু সৌভাগ্য এই যে, তুল্যরূপ কারণের সম্ভবতা সত্ত্বেও, এখানকার নিম্নশ্রেণী, মিসরীয় নিম্নশ্রেণীর ন্যায় নিপীড়িত হয় নাই; এবং সে পক্ষে, পীরামিড

বা গগনোদ্যান প্রভৃতির ন্যায় অদ্ভুত কীর্ত্তি সকলের যে অনস্তিত্ব, তাহা সাক্ষ্য স্বরূপে উল্লেখ করিতে পারা যায়। সেরূপ নিপীড়িত না হওয়া পক্ষে মিসর ও ভারতের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—মিসরীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃতিভেদ মাত্র। মিসরীয়চিত্তও পারলৌকিক বিষয়ে কিছু কম সমাহিত ছিল না ; কিন্তু তথাপি ইহলৌকিক বিষয়ে তাহার সমাহিত হওয়ার ভাগ যেন আরও বেশী এবং ভারতীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী। চিন্তা-উত্তেজক বাহ্যজগৎ-পরিবৃত আর্য্যদিগের চিত্ত, পারলৌকিক বিষয়ে অধিক পরিমাণে সমাহিত থাকায় ; অবসরকাল এবং চিন্তাশক্তি, কেবল বিলাসভোগে ও বিলাস-পোষক বস্তু উদ্ভাবনে ব্যয়িত না হইয়া, ধর্ম্মচর্য্যা ও তত্ত্ববিদ্যার অনু-শীলনেই সমধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইত। এই নিমিত্ত ইহা বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হইবে না যে, মিসরীয়েরা যথায় পীড়ামিড লাভ করে, আর্য্যেরা তথায় বিজ্ঞান তত্ত্বাদি লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে যেমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সেখানে সেই কর্ম্ম-প্রকৃতি অনুসারেই, কর্ম্ম-কারকের উপর ব্যবহার নিরূপিত ও প্রবর্ত্তিত হয় ; সুতরাং এতদুভয় দেশভেদে, নিম্নশ্রেণীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, ভারতীয়েরা যথায় কেবল হেয়জ্ঞান করিয়া ও দাসকার্য্য মাত্র করাইয়া লইয়া ক্ষান্ত হইতেন ; মিসরীয়েরা তথায় পীরামিড তৈয়ার না করাইয়া ছাড়িত না। যাহা হউক, এক্ষণে ভারতের এই শীঘ্র উদিত সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, অগ্রে একবার গ্রীকদিগের প্রকৃতিভেদ ও তদুদিত সভ্যতার উদয় তত্ত্ব কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে, ভারত যদ্রূপ বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূখণ্ড তদপেক্ষা যদিও বহুলাংশে ন্যূন বটে ; কিন্তু গ্রীসের প্রকৃতিবৈচিত্র সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায়, তাহা পরিমাণা-তিরিক্ত গাঢ়তাপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষকরূপে প্রতীয়মান হয়। তত্রাধিবাসকৃত মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে, উহার পরিণামফলও অবশ্য তদনুসারী হওয়ার

কথা। ফলতঃ সামান্য আয়তনে সন্নিবিষ্ট হেতু গ্রীসীয় প্রকৃতি বৈচিত্র এতই গাঢ় যে, তাহার তুলনায়, দূরবিক্ষিপ্ত ও আয়ত্তাতীত ভাব হেতু, ভারতীয় বিশাল বৈচিত্রও যেন কেমন বিরল ও মলিন বলিয়া বোধ হয়;—যদিও বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং অপার আধিক্যশালী। এই ক্ষুদ্র সীমান্তর্বর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতলক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃতিতে বিভাজিত হইয়া, বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গক্রোশের অধিক হইবে না। বোধ হয়, আমাদের এক একটি পরগণাও প্রদেশবিশেষে তাহার অপেক্ষা বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে, থেসালি ও এপিরুস গ্রীসের উত্তরভাগে অবস্থিত এবং উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি প্রায় চতুর্দিকে পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধ সমতলক্ষেত্র, উহার মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উর্ব্বরা। এপিরুস উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে এবং মধ্যদেশে পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা আকৃষ্ট, ভূমিতল বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী,ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত হইয়া, মধ্যগ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে; উহার পশ্চিমভাগে ইটোলিয়া, এবং তৎপশ্চিমে আকার্নানিয়া ও লিউকেডিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। ইটোলিয়া ও আকার্নানিয়ার মধ্য দিয়া, আকিলোস নামক গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া করিন্থ সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয় প্রদেশ পর্ব্বত ও বনময় এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকূল না থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুবর্গের দ্বারা অধিবাসিত ছিল।

মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ গ্রীকবিদ্যাবুদ্ধি গৌরব ও বীরত্বের আকরস্থল। যে পর্ব্বতমালা মধ্যদেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তিভাবে প্রধাবিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং থেসালি হইতে পূর্ব্ব-মধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে বিখ্যাত গিরিসঙ্কট

থার্ম্মপলি অতিক্রম করিতে হয়। পূর্ব্বভাগের পূর্ব্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিস নামক প্রদেশ। লোক্রিসের পশ্চিমে ডোরিস এবং ফোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। ফোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্ণাস্‌স নামক পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমমুখে প্রধাবিত। উহারই অত্যুচ্চ শিখরোপরি গীতিবিষয়িণী নয় জন অধিনায়িকা দেবীর লীলাভূমি, এবং পর্ব্বতের পাদদেশে বিখ্যাত ডেলফিনগর ও তথায় ততোধিক সুবিখ্যাত ভবিষ্যৎ-জ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। ফোকিসের পূর্ব্বে ও লোক্রিসের দক্ষিণে, বিওতিয়া নামক প্রদেশ। ইহা প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ এবং জলনির্গমণের পথশূন্য। এ নিমিত্ত, ভূমি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত থাকায় তাহা উর্ব্বরতাগুণবিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; বায়ু সর্ব্বদা সজল ও কুজ্ঝটিকাময়। বিওতিয়ার পূর্ব্বদক্ষিণে আটিকা প্রদেশ। এতদুভয় প্রদেশের মধ্যভাগে পর্ব্বত-শ্রেণী। আটিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও উত্তরে সমুদ্র, উত্তর সমুদ্রে দেশভূমি সহ সংলগ্নভাবে ইউবিয়ানামক দ্বীপ। আটিকা প্রদেশের বায়ু শুষ্ক; ভূমি নির্জ্জল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উহা বিবিধ প্রকার ফলের উৎপাদন পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। মিগারিসের দক্ষিণে করিন্থিয়া, উহা পর্ব্বতময় বন্ধুর ও অতি সংকীর্ণ। গ্রীসের উত্তর খণ্ড হইতে দক্ষিণ খণ্ডে যাইতে হইলে, মধ্যে করিন্থ-দেশস্থ যোজক অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; কিন্তু এই পথে পর্ব্বতের বাধা এত অধিক যে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই অধিক সুগম।

উত্তর খণ্ড অপেক্ষা দক্ষিণ খণ্ড নদীবিরল ও পর্ব্বতময়। দক্ষিণ খণ্ডের উত্তরভাগে আর্গোলিয়া; এই আর্গোলিয়া প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত। এই সামান্য স্থানের মধ্যে প্রকৃতি বৈচিত্র এবং স্থানভেদে ভূমির গুণাগুণভেদ এত যে, কোথাও কলম্বা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও কিছুই উৎপন্ন হয় না। আর্গোলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে আকৈয়া। উত্তর খণ্ডের মধ্যভাগে আর্কেডিয়া, প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া

অন্যান্য প্রদেশ হইতে উহাকে ছিন্নসম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেসিনিয়া ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পর্ব্বতময়, কিন্তু অনুর্ব্বর নহে। মেসিনিয়া প্রদেশে খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল এবং এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। লাকোনিয়া প্রদেশেই সুবিখ্যাত স্পার্টা নগরী ইউরোতস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার পশ্চিমে ইলিয়া নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

গ্রীসদেশের এই প্রকৃতিবৈচিত্রচিত্রে লক্ষিত হইবে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কতই স্বভাব-বিভিন্নতা। কোন প্রদেশ হয়ত প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত; তদ্বিপরীতে কোন কোন প্রদেশ আবার নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান হইতে ছিন্নসম্বন্ধ এবং বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবার যো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ, স্ব স্ব ভাবে যেন প্রকৃতি কর্তৃক বিভাজিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় আত্মস্বাতন্ত্র্য সহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ আকৃতিভেদ, প্রকৃতিভেদও তদনুরূপ। কোন প্রদেশ অতিশয় উর্ব্বরতাগুণবিশিষ্ট, শস্যপ্রচুর, ফল-রস-জলে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একবারে সে সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবনধারণের যে কিছু পদার্থের জন্য অধিবাসিদিগকে অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। দেশ ব্যাপিয়া কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্করপূর্ণ সমতলক্ষেত্র, কোথাও বা অবিরল শস্যচূড় শ্যামশোভায় নয়নরঞ্জন করিয়া থাকে; ও দিকে আবার সর্ব্বত্রই উপলখণ্ডবর্দ্ধিত গিরিশ্রেণী, সেই সকলকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিতেছে। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী এবং বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতে হয় বলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের মধ্যে বা যে কোন দূর গতায়াতের পক্ষে, স্থলপথ দারুণ কষ্টকর; সুতরাং জলপথ অতিশয় সুগমতা হেতু প্রলোভন প্রদান করিয়া থাকে।

এখন স্থলভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পূর্ব্ব ও

দক্ষিণস্থ সমুদ্র ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রীসের অভ্যন্তরে ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, গ্রীস বহু প্রদেশে বিভক্ত হইলেও, কেবল এক আর্কেডিয়া ভিন্ন, আর সকল প্রদেশেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত থাকায়, সমুদ্রে গমনাগমন পক্ষে প্রায় সকলেরই সুবিধার প্রচুরতা দৃষ্ট হয়। এই সমুদ্র সর্ব্বত্র দ্বীপশ্রেণীতে এরূপ আকৃষ্ট যে, তাহাদের জন্য সমুদ্রের অস্থিচর্ম্ম অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপের অধিকাংশ পর্ব্বতময়, কোনটি উর্ব্বরা, কোনটি বা মধ্যমপ্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রম্যদর্শন ও বাসযোগ্য। তাহাদের কেহই আয়তনে বৃহৎ নহে, সকলেই আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এবং পরস্পর পরস্পরের এত সন্নিকটে অবস্থান করে যে, একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে অনতিবিলম্বে আর একটিতে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এইরূপে ইউরোপখণ্ডে গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া, স্বচ্ছন্দে আসিয়াখণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়। পুনশ্চ, এই গতায়াতের সুবিধাকল্পে অতি অনুকূল ও সুখস্পর্শ বায়ু, হেলাসপণ্ট হইতে ক্রীট দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব্ব উপকূলের অনুকূল মূর্ত্তি বশতঃ, তথায় জাহাজ ও নানাবিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংস্থাপিত। পশ্চিম সমুদ্রও দ্বীপাবলীসংযুক্ত, কিন্তু পূর্ব্বসমুদ্রের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। পূর্ব্বসমুদ্র অপেক্ষা উহা আয়তনে বৃহৎ, স্বভাবও উহার অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপকূলভাগ পোতাশ্রয়তার পক্ষে, পূর্ব্ব উপকূলের ন্যায় অনুকূল নহে। উহা উচ্চ এবং পয়োভিন্ন দুরারোহ পাহাড়ে পরিবৃত; সমস্ত উপকূলভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচ একটি পোতাশ্রয়ের উপযুক্ত সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। পার্শ্বস্থ সমুদ্রশাখা সকল অতিক্রম করিলে, এক দিকে সুসভ্য ও বিক্রমশালী মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ বলসম্পন্ন কার্থেজ প্রভৃতি অন্যান্য স্থান; অন্য দিকে সমুদ্রপ্রিয় ফিনিকীয় এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য ধন, জন ও সৌভাগ্যপ্রচুর প্রদেশ-নিচয়। অপর পার্শ্বে

নবপরাক্রম-বিস্ফূরিত, বিকস্বরবাহুযশোদর্পিত শিশু ইতালী। গ্রীসের অধিবাসীদিগের পক্ষে যেরূপ সমুদ্রগতায়াতের সুবিধা, এই সকল প্রতিবেশী দেশসমূহেরও তদ্রূপ ; এবং গ্রীসে যে যে কারণ মনুষ্যকে সৌভাগ্যপূর্ণ সভ্যমনুষ্যপদবীতে স্থাপন করিতে পারে, এ সকল দেশেও, বিষয়বিশেষের বৈচিত্র-সাধক কারণবিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত ন্যূনতা ছিল না বলিতে হইবে।

জনৈক ফরাসিস্ বিজ্ঞ ব্যক্তি নাকি এরূপ বলিয়াছেন যে, যে কোন দেশের মানচিত্র তাঁহাকে দেখাইলে এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও দেশস্থ নৈসর্গিক পদার্থনিচয়ের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলে, তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে, সেই দেশবাসীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া মনুষ্যসমাজে কিরূপ কার্য্যফল প্রসব করিবে এবং মানবীয় ইতিহাসেরই বা কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থান পূর্ব্বক কিরূপ গণনায় আসিবে। এ কথায় বাস্তবিক যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে বাঞ্ছারাম, বলিতে পার কি, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের অধিবাসিবর্গ কিরূপ অবস্থাসম্পন্ন হইবে? ভাল, একবার দেখাই যাউক না কেন।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এরূপ স্বভাববিশিষ্ট দেশের প্রদেশসমূহ, পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন কাহারও সঙ্গে কাহার সংস্রব নাই এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান ও স্বতন্ত্র। প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে স্বতঃ-উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা, এতৎসূত্রে উভয়ে যেমন একসূত্রে বদ্ধ এবং একপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ও একধর্ম্মযুক্ত হইয়া, একজাতিত্বে পরিগণিত হয় ; এখানে, প্রদেশপরম্পরার ব্যবধানদুর্গমতা হেতু, তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন তেমন না হইয়া, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথমকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাপিত

ও বর্দ্ধিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর প্রদেশসমূহ, যেন ভিন্নসীমাবিশিষ্ট ভিন্ন দেশরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাব এবং তদুৎপন্ন অহঙ্কারবোধ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এতদ্রূপ কারণোৎপন্ন অহঙ্কার-বোধ, ভাবী পার্থিব-গৌরবের ভিত্তিস্বরূপ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের মধ্যে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে স্থানীয় আবশ্যকাধিক জীবনো-পায় বস্তুসমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আবার কোথায় বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া দুষ্কর। অতএব লক্ষিত হইবে যে, কোন কোন প্রদেশ বহু লোকবৃদ্ধি সত্ত্বেও, আহারপ্রাচুর্য্যে অত্যন্ত সচ্ছলতাযুক্ত; আবার কোন কোন প্রদেশকে হয়ত তদভাবে এককালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্বদেশজাত যে কোন বস্তু, যাহা বিদেশীয়ের নিকট বাঞ্ছনীয়, তদ্দ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ব্যতীত, সকল স্থানের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য অন্যান্য দেশের সহ তুলনায় এখানে, প্রত্যেক প্রদেশ অধিবেশিত হওয়ার অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্র-পাত হয়। প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্যসূত্রে, দূরদর্শিতা বিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিদেশ-বাণিজ্যের যে সকল আনুষঙ্গিক ফল, সেই সকল ফললাভও হইয়া থাকে। ক্রমে লোকবহুলতায় যখন বাণিজ্যের উত্তরোত্তর আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে দুর্গম স্থলপথের যে ক্লেশ, তাহা বিশেষরূপে অনুভূত হইতে থাকে এবং সেই অনুভবশক্তির তাড়না হইতে, প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমনের প্রবর্ত্তনা হয়; এই প্রবর্ত্তনের ক্রম-পুষ্টতায়, তদ্রূপ গমনাগমনের যান প্রকরণাদি সম্বন্ধে, ক্রমে অথচ শীঘ্র শীঘ্র উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে। এরূপ ক্রমাগত গতায়াত ও সংস্রবে, পরস্পরের মধ্যে স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতা উপস্থিত হওয়াতে, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত

থাকিলেও, প্রথম কালিক ব্যবহারিক কারণের প্রাবল্যবশে, বাহ্যিকে ক্রমে একজাতিত্বের আকার ধারণ করে। রীতিনীতি পথে কূট-শিক্ষাশূন্য এরূপ প্রাদেশিকদিগের মধ্যে, একের রীতি নীতি অপর দ্বারা রূপান্তরিত, একের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অপরের দ্বারা গৃহীত, ইত্যাদি সহজে এবং বিনা যত্নে আপনা হইতে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহা হইলেও, বহুকাল ধরিয়া অবলম্বিত যে মানবীয় মনের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা, তাহা তদ্দ্বারা অপলোপ হইতে পায় না; প্রত্যুত তদ্দ্বারা স্বাতন্ত্র্য ভাবের মল-ভাগ পরিত্যক্ত হওয়াতে, তাহা মার্জ্জিত হইয়াই থাকে। এজন্য বাহ্যিকে একজাতিত্বভাব দৃষ্ট হইলেও, ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়ভাব বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্য দ্বারা আহারের স্বচ্ছলতা সাধিত হইলে, স্বচ্ছলতার পরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোকবৃদ্ধি হইতে থাকায়, দেশের মধ্যে যখন স্থানসঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়; তখন কিয়দংশের দেশত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। এরূপ উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে, ঘনসন্নিকৃষ্ট ও ঘন-সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর ভূখণ্ড যেরূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার কথা, সেরূপ অন্য স্থান নহে। এজন্য ক্রমে সেই সকল স্থান উপনিবেশিত, কালে তদ্রূপ উপনিবেশসমূহের বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্য আবার নূতন নূতন স্থান সকল মনোনীত করণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যেরও বিস্তার এবং তজ্জনিত ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। যে সমুদ্র-যাত্রা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগে এই দেশ শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হইবার কথা, ইহার প্রতিবেশিবর্গেরও তদ্রূপ সুবিধা; সুতরাং তাহাদেরও ইহাদের সঙ্গে একই সময়ে ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা। অথবা যদি তৎপক্ষে কোন প্রতিবেশীর ন্যূনতা হয়, অথচ সে প্রতিবেশী নানা কারণে পূর্ণতার যে স্বাদ তাহাও জ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অপরের ক্ষতিকরণ ভিন্ন নিজ আকাঙ্ক্ষা আশু পূরণ করিবার উপায়ান্তর নাই; তাহার পর, আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত

ধন সাধ্যমত হরণের দ্বারা আত্মপরিপোষণ করার প্রবৃত্তি, পার্থিব-স্থখ-বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; পুনশ্চ, তদ্রূপ হীনতা না থাকিলেও, মানবের মনে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল প্রবাহ হেতু ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসদ্ভাব নাই ; অতত্রব তদ্রূপ প্রতিবেশিবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা আক্রমণের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায়, প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইলেও এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন সূত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্ শত্রুর পক্ষে প্রতিযোগিতায় এক এক প্রদেশ এককভাবে অসমর্থ বিধায়, সকলের সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়ার প্রয়োজন। এই একতা ক্ষণিক নহে, সর্ব্বদা আবশ্যক ; স্থতরাং তৎসাধন কেবল কথায় গাঢ়রূপে এ চলচিত্ত-সময়ে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব একতা-বন্ধনোপযোগী কোন প্রকার বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের আবশ্যক ; এ নিমিত্ত কোনরূপ পর্ব্বাদি উপলক্ষ্য করিয়া ঘন ঘন জাতীয় সংমিলনের প্রয়োজন হয়। তথাপি প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বহ্বায়তন হেতু, একতা সত্ত্বেও ইহারা সংখ্যাতে সামান্য গণনায় আইসে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেমন পার্থিব-স্থখসর্ব্বস্বতা হেতু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, ইহারাও তদ্রূপ পার্থিব-স্থখসর্ব্বস্বতা হেতু আত্মধনরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যায় যখন সামান্য, তখন সংখ্যার অভাব পরিপূরণার্থে একমাত্র বীরকার্য্যে পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতিলাভ ভিন্ন অন্য উপায় কি হইতে পারে ? বাহিরের শৈত্যগুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন ঘনীভূত হইয়া থাকে, তেমনি যত বৈদেশিক প্রতিবেশীরা ইহাদের উপর শত্রুতাচরণ করিবে এবং তন্নিমিত্ত ইহারা যত বিদেশীয়দিগের উপর বিতৃষ্ণা-যুক্ত হইবে, ততই ইহাদের আত্মস্বত্বের উপর মমতা এবং স্বদেশরক্ষণে বীরত্ব প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। মানবচিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতিযুক্ত হয় ; আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি, সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকে; কিন্তু যদি তেমন স্থলে, পূর্ব্বস্মৃতি, ইতিহাস, বিশেষত : কবিত্ব দ্বারা সেই ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া যায়

ও সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ধরা হয়, তাহা হইলে সে জড়তা তিরোহিত এবং মানবচিত্ত সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এবম্ভূত দেশমধ্যে, বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তার যতটা মনোমধ্যে উদয় করার আবশ্যক, তত অন্য বিষয়ের নহে। যে দেশের যেরূপ মতি গতি, তাহাদের হইতে প্রকৃতি সেইরূপ বস্তুই উৎপাদন করাইয়া থাকেন; সুতরাং, সাহিত্য কাব্যাদি মনুষ্য-মুখ-সাহায্যে প্রচারিত অভূতপূর্ব্ব দেববাক্যস্বরূপ হইলেও এখানে তাহা দেশের উপযোগিতা অনুসারে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশহিতৈষিতার জীবিতভাবে পরিপূর্ণ হইবে; এবং এবম্ভূত দেশেই কেবল ইতিহাসের যথার্থ মূল্য অবধারিত ও তাহার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পূর্ব্বগত বীরপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপে বিমোহিত হইয়া চিরনেত্রপথে আদর্শরূপে তাহাদিগকে স্থাপিত করণের আকাঙ্ক্ষায়, ভাস্কর্য্যেরও উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ সুসাধিত হয়।

বাহ্যজগৎ ইহাদিগের নিকট সামান্য বেশে প্রতীয়মান হওয়াতে এবং প্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্যকলাপের সঙ্কীর্ণতা জন্য উচ্চশক্তিবিষয়ে সম্যক্ অনুভূতির অভাব হেতু,ইহাদের চিত্ত পারলৌকিক তত্ত্বে তাদৃশ আকর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত ইহাদের পরলোক বিশেষ বিভীষিকা-পূর্ণ, অথবা দেবতত্ত্ব নিতান্ত অমানুষিক হইবার কথা নহে। এতদুভয়ের, ইহাদের নিকট, দেব-মানবীয় এ উভয় ভাবের সামঞ্জস্যসাধক আকৃতি ধারণ করা সম্ভব। পরলোক ভীষণ হইতে ভীষণতর নহে; এবং দেবতারাও অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, বিকটসাজ, বিকটকাজ বা বিকট-মূর্ত্তি বিশিষ্ট নহে। সকলেই মানবের ন্যায়, মানবীয় ভাব স্বভাব ও ক্রীড়াযুক্ত;—তাহার সহিত মানবের সহানুভূতি জন্মিতে পারে, এতদ্রূপ। পরলোক সামান্যবিভীষিকাযুক্ত বলিয়া, তাহা হইতে উদ্ধারকল্পে, মানবচিত্তকে বিষম আকুলতাযুক্ত হইয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব উদ্ঘাটনের অভাবে, সাধারণ দেবতত্ত্বেই মানবচিত্ত সতত

সন্তোষযুক্ত; পুনঃ তাহাতে ভয়বিরহিত। তৎপক্ষে ভয় ও বিস্ময়ের অভাব এত যে, মানব দেবতা হইতেও আত্মস্বাতন্ত্র্যরক্ষণে অপরিমিত-যত্নশীল।

পারলৌকিক বন্ধনে দৃঢ়তার অভাব হেতু, মানবচিত্ত পার্থিব বিষয়ে অত্যধিক সংলগ্ন হওয়াতে, তদ্বিষয়ক যে কোন ব্যাপারে সম্যক্ হস্তক্ষেপে শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই। সুতরাং সাংসারিক ও সামাজিক বিষয়াদির পরিরক্ষক যে রাজনীতি, তাহাতে যে ইহারা সম্যক্ হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তাহেতু, প্রত্যেক প্রদেশে এক এক রাজ্য, আবার কোন স্থানে এক প্রদেশের মধ্যেই চারি পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য দেখিতে পাওয়ার অসদ্ভাব নাই। এতদ্রূপ ক্ষুদ্র রাজত্বের মধ্যে, রাজা স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শিত হওয়াতে, রাজদেবত্ব আর বড় একটা রক্ষণে সমর্থ হয়েন না। রাজনীতির বিস্তারস্থান অল্পায়তন হওয়ায়, প্রজামাত্রেই তাহা আরত্ত করিয়া, তাহার দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রতীকারকরণেও সহজে উদ্যত হয়। এ নিমিত্ত, এখানে সর্ব্বদা রাজবিপ্লব এবং প্রজাবিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা। শাসন-প্রণালী এই কারণে কখন বা রাজতন্ত্র, কখন বা তাহা ঘুচিয়া সাধারণতন্ত্র, আবার কখন বা সম্ভ্রান্ততন্ত্র, ইত্যাদিরূপে যখন যাহা লোকচিত্তে বলবতী, তখন তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন বা দেশ আত্মকলহজাত রক্তধারায় স্নাত হয়; কখন বা আবার রাজ-প্রজা-সংমিলনে দেশমধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে। এরূপ স্থানে, প্রজামাত্রেই অল্পবিস্তর রাজনীতি-বিশারদ, তন্মর্ম্মজ্ঞ এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাযুক্ত হইয়া, আপনাপন কার্য্যকলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইহার প্রত্যেক প্রদেশ পরস্পর সমক্ষে এক একটি বিভিন্ন বিদেশ স্বরূপ; সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক একটি বিভিন্ন জাতি স্বরূপ। কেহ কাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। ভারতীয়দিগের অবস্থা তদ্রূপ নহে। আর্য্যেরা

প্রথমে যে সপ্তসিন্ধুতটমাত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং যথা হইতে তাঁহাদের ভাবী অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়; তাহা এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, যাহা কালে বংশবিস্তারে ক্রমোপনিবেশিত হইয়াছিল, প্রায় সর্ব্বত্র একপ্রকৃতিযুক্ত হওয়াতে, গ্রীসের ন্যায় স্বাতন্ত্র্য-যুক্ত প্রদেশবিভাগজনিত ফল ফলিতে পায় নাই! উপনিবেশিত স্থান-সমূহ সর্ব্বত্রই গতায়াত-সুগম এবং ঘনিষ্ঠতাযুক্ত। এই ঘনিষ্ঠতা দস্যু-বর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে আর্য্যেরা যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন; গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না ছিল এমন নহে। কিন্তু গ্রীস যেমন সঙ্কীর্ণায়তন, তাহারাও তেমনি সঙ্কীর্ণসংখ্যক; সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্প শ্রমেই তাহাদের সমগ্র বল চূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে পদাবনত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতীয় দৈত্যেরা, সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায় অপরিমিত এবং অপার ও অভেদ্য স্থান ব্যাপিয়া বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। আর্য্যেরা কিয়দংশের বল চূর্ণ করিয়া পদাবনত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে, তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন হেতু, যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলকেই অখণ্ডিত একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই সূত্র আমূলতঃ পরিচালিত বলিয়া হিন্দুসন্তানমাত্রে, কি ভিতরে কি বাহিরে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে প্রথমকালে একজাতি ছিলেন। গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথমকাল হইতেই প্রদেশভেদে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতিস্বরূপ হইয়াছিল। আবার গ্রীকেরা যখন একজাতিত্বরূপ আকার ধারণ করিল, তখনও চির-প্রবুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যভাব তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু কালে ভারতীয়েরা বংশবাহুল্যে, যদিও বিভিন্ন প্রদেশ অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্যস্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন বটে, তথাপি চিরপ্রবুদ্ধ একতাভাবের তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপলোপ হইল না। একতা অবশ্যই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে

প্রার্থনীয় ; কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যদি স্বাবলম্বনরূপী ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে একতা বড় একটা কার্য্যকরী হয় না। উহা মেষপালের একতা ; একটা মেষ যদি কোন স্থানে খেয়াল-বশে একটা লাফ দিল, আর গুলিও অমনি সেইরূপ লাফ দিতে লাগিল। ইহাকে অন্ধ একতা বলে। আবশ্যক, সজ্ঞান একতার। গ্রাকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাব ভাবী গৌরবের সোপান স্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইলেন না। অহঙ্কারবোধেও ইহাঁরা অতি হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—যেহেতু এতদ্বোধের প্রথম বাধকতা বাহ্যজগতের নিকট আত্মখর্ব্বতা জ্ঞান ; দ্বিতীয় বাধকতা, পূর্ব্বকথিত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাবের অভাব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,গ্রীসের ভূমি উর্ব্বরতাগুণে সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তুসমূহ অপরিমিতভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা একেবারে বা প্রায়ই কিছু হয় না। গ্রীসের যে সকল ভূমিখণ্ডকে উর্ব্বরতাগুণবিশিষ্ট বলিয়া বলা যায়, সে সকলকে ভারতীয় ভূখণ্ডের তুলনায় আনিলে, তাহাদের উর্ব্বরতাগুণকে অনু-র্ব্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। অতএব ভূমির উর্ব্বরতাগুণ উপলব্ধ ও তাহা হইতে ফলাকর্ষণ করিতে, ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগকে, বহুবুদ্ধি ও বহুশ্রম ব্যয় ও বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এরূপ করিতে বাধ্য হওয়ার ফলও, দ্বিবিধ প্রকারে ফলিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, বহুবুদ্ধি ও বহুশ্রম ব্যয়-সূত্রে, তৎপক্ষে কারণশূন্য ভারতীয়দের অপেক্ষা, গ্রীকদিগের সাংসারিক বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা, এতদুভয় গুণ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বহুকাল অতিবাহিত করিবার ফলে, গ্রীকদিগের অবসর, অবসর-উৎপন্ন চিন্তা, চিন্তাজাত উদ্ভাবনী শক্তি এবং তজ্জনিত সভ্যতা, সুতরাং ভারতীয়দের অপেক্ষা বহুকাল পরে উদিত ও বর্দ্ধিত হয়। সে যাহা হউক, ভূমির প্রোক্ত উর্ব্বরতাগুণ যাহা কিছু তাহা নিকৃষ্ট হউক আর উৎকৃষ্টই হউক, গ্রীসের সর্ব্বপ্রদেশে সম বা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় ; প্রত্যেক

প্রাদেশিকদলকে যদি কেবল আপন আপন প্রাদেশিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে অনেকের অনাহারে মরিবার কথা। এ দিকে এই, অন্য দিকে শীতপ্রধান দেশের প্রয়োজনীয় পদার্থাদি স্বভাবতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় সামান্যমূল্য সামান্যাকার ও সহজসাধ্য নহে। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বাঞ্ছনীয় বস্তুর সহ, প্রদেশপরম্পরায় পরস্পর বিনিময় ও বাণিজ্য ব্যতীত, একের আহারবিষয়ক অভাব; অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব; উভয়তঃ এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, একের মনুষ্যোচিত ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ, অপরের বিলাসবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা পূরণ, প্রদেশভেদে এতদ্রূপ প্রয়োজনভেদের প্রথম উদ্রেকে,—অর্থাৎ সভ্যতাসূর্য্যের উদয়কালেইবলিতে হইবে,—গ্রীকেরা প্রদেশপরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল; এবং সেই সকল প্রদেশ আদিমকালে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের আকারও ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে আত্মোন্নতিকল্পে যে যে ফললাভ হইবার কথা, এই সূত্রে গ্রীকেরা সেই ফলও কিয়ৎপরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছিল এমন নহে। এ স্থলে যদি ভারতীয়দের সহ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গ্রীকদিগের ন্যায় অনুরূপ কারণের অভাবহেতু, প্রথম অবস্থায় ভারতীয়দের কোনরূপ বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক হয় নাই। যখন কালসহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই কেবল ভারতীয়দের প্রদেশপরম্পরায় বাণিজ্যের সূত্রপাত ও ক্রমে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। সকল প্রদেশেই আহারীয় দ্রব্যাদির যথেষ্ট স্বচ্ছলতা হেতু, তাহাদের এ বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলাসবস্তুর খাতিরে; সুতরাং তজ্জন্য যে আগ্রহ-গাঢ়তা, তাহা আহারীয়-বস্তু-বাণিজ্য বিষয়ক আগ্রহ-গাঢ়তা অপেক্ষা ন্যূন। আবার ভারতীয় প্রদেশ-

সমূহ পরস্পরে মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবম্ভূত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা পরবর্ত্তী অপর কোন সময়ে কখন স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, প্রথমকালে কখনই নহে। বাঙ্গারাম অবশ্য না বুঝিতে পারিতেছে এমন নহে যে, এখানে যে সময়ের আলোচনা করিয়া যাওয়া যাইতেছে, তখনও জগতে ইতিহাসের উদয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

যে অভাবসূত্রে গ্রীকদিগের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব; সেই সূত্র-তাড়নায়, মূল হইতেই, সেই বাণিজ্য বিস্তৃত আকার ধারণ করিবার কথা। কালে লোকবৃদ্ধি সহকারে, তাহা যে আরও বিস্তার প্রাপ্ত হইবে, তাহা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। অভাবতাড়নায়, এই বাণিজ্যের নিত্য প্রয়োজন। সুতরাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থলপথ দিয়া ইহা নিত্য সমাধা করা, ক্রমে যেমন অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে; তেমনি অন্য দিকে সুগম সমুদ্র সর্ব্বদা প্রলোভিত করিতে থাকে। যেখানে দৃষ্টির এক দিকে ক্লেশ ও অন্য দিকে সুবিধা বর্ত্তমান, সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনী শক্তি সুবিধাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত, স্বতঃই উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাজেই বাণিজ্য-প্রবর্ত্তনার অতি অল্পকাল পরে, গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্রগমনাগমনের আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত, ইতিহাসের উদয়সময়ে অতি প্রাচীনকালেই আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকেরা সমুদ্রগমনাগমন পক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, স্বদেশের সীমাতিক্রমে অনেক দূরস্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীনতমগ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের সেই সমুদ্রযাত্রা যে গ্রীকদিগের ন্যায় সমপুঙ্খতাসম্পন্ন ছিল, এরূপ কোন মতে অনুমিত হয় না। গ্রীকদিগের সমুদ্রযাত্রার পুঙ্খতাও আপেক্ষিক মাত্র। নতুবা গ্রীকেরাই যে সেই ইতিহাসের উদয়কালে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে একবারে

অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে; যেহেতু দেখা যায় যে, হোমারের সময়েতেও, গ্রীকদিগের জাহাজের আকৃতি অতি সামান্য ছিল এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও আসিয়ামাইনরের উপকূলবর্ত্তী স্থান সকলে মাত্র, সে সকল জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিত; কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থান সকল পরিজ্ঞাত ছিল না এবং মিসর প্রায় জনশ্রুতিতে পরিজ্ঞাত ছিল মাত্র। কিন্তু যে কোন বিষয় হউক, নিয়ত ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়; গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যেই সমুদ্র-গমনের যতটা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, ভারতে তদ্রূপ নিয়ত ব্যব-হারের কারণাভাব হেতু তাহা হয় নাই।

আবারও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কেবল গ্রীকেরা যে বিদেশ-গমনের দ্বারা সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা করিত তাহা নহে; ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিকীয় ও কার্থেজবাসীরাও, অতিপ্রাচীন কাল হইতে সমুদ্রগমনাগমনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সর্ব্বদা বাণিজ্যাদি করিয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, ঐ সকল জাতির সহিত সংস্রব হেতু, গ্রীকেরা পোতচালন ও বাণিজ্যতত্ত্ব পক্ষে, উৎকৃষ্ট কৌশল সকল আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষা করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং তজ্জন্য আরও দূর বিদেশ-গমন ও আরও বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎকর্ষ বিধানে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল সূত্রে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্যও অপরিমিত পরিমাণে হইতে পায়। অস্ত্রচালন ও পার্থিব-চতুরতা শিক্ষাও, এ সকল সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই; যেহেতু ইয়ো, ইউরোপা, মিডীয়া প্রভৃতি স্ত্রীহরণবৃত্তান্ত ও তদানুষঙ্গিক ঘটনাবলী সে পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পুনশ্চ, মুহুর্মুহু তদ্রূপ বৈদেশিক সংস্রবজন্য, গ্রীক-দিগের যে সভ্যতা তাহা বৈদেশিক সভ্যতার সহ সহানুভূতিশূন্য হইতে পায় নাই। ভারতের তাৎকালিক প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে তেমন কেহ না থাকায়, তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অভাবে তদ্রূপ তদ্রূপ কোন ফলই ফলে নাই এবং তজ্জন্য ভারতীয় সভ্যতা, তাবৎ বৈদেশিক সভ্যতা সহ সহানুভূতিশূন্য হইয়া, একক ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাবে গঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ক্রমে লোকবৃদ্ধি সহকারে দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মধ্যদেশ, মধ্যদেশ হইতে ক্রমে সমগ্র উত্তরদেশ, পরে দক্ষিণাবর্ত্তেও জনস্থান স্থাপনপূর্ব্বক তাহা উপনিবেশিত করিয়াছিলেন ; গ্রীকেরাও সেইরূপ দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে, শেষে আসিয়ামাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে হিন্দু এবং গ্রীকে প্রভেদ আসিয়া এই দাঁড়াইল যে, হিন্দুর প্রতিবেশিবর্গ তখন সকলেই হয় বন্য ও বর্ব্বর অবস্থাযুক্ত, নতুবা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল থাকায়, বাহিরের আক্রমণ ও বহিঃশত্রুর দ্বারা ধনাদি অপহরণের কোনই আশঙ্কা থাকিল না ;—এক যে আদিমনিবাসিগণ, তাহারাও কালে আর্য্যবংশবিস্তারের সঙ্গে দমিত ও দূরিত হইয়া আসিল। গ্রীকের অবস্থা দাঁড়াইল প্রায় তাহার অন্যতর বা বিপরীত। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়াইয়া বিভিন্ন দেশগত হইল ; প্রতিবেশিবর্গ তখন প্রবল হইয়া পরধনলোভে আত্মোন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতাসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাজেই তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিযোগিতায়, ইহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপ জাতীয় একতাবন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমিয়ান প্রভৃতি পর্ব্বের সৃষ্টি। এইরূপ পর্ব্বসময়ে, অন্ততঃ পর্ব্বাহ কয়েক দিনের জন্য, আত্মকলহ ও আত্মশত্রুতা পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু থাকিত তাহা সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে হইত। শত্রুর অপেক্ষা ইহারা অল্পসংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিযোগিতায় পারগতালাভের নিমিত্ত, ঐ ঐ পর্ব্বসময়ে শরীরপরিচালক ও বলবিধায়ক ক্রীড়াকৌতুকেরই অধিক পরিমাণে অভিনয় হইত। এই সকল বলবিধায়ক ক্রীড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা গ্রীকেরা এতই অধিক পরিমাণে অনুভব করিত যে, অলিম্পিক ক্ষেত্রে শক্তি-ক্রীড়ায় যে কেহ জেতা হইতে পারিত, সে সহস্র রাজ্যখণ্ডের জেতা অপেক্ষাও অধিক সম্মানিত হইত ; কবি তাহার যশ গাহিত ; তাহার পিতা মাতা

এরূপ সন্তানের জনক জননী বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানিত; দেশশুদ্ধ লোক তাহার উদ্দেশে ধন্য ধন্য রব তুলিত; যে প্রদেশে তাহার বাস সে প্রদেশ আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিত এবং জেতার স্বদেশ ও স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে, পথে এবং পুরপ্রবেশে, দেবসম্মান তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। ফলতঃ বহিঃশত্রুর সহ প্রতিযোগিতায় পারগতালাভের নিমিত্ত, গ্রীক দেশের সর্ব্বত্র বলের অর্চ্চনা এবং সর্ব্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে, বলপ্রতিপোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য দেখা যায়. উহারই নিমিত্ত, স্পার্টানগরে লাইকার্গসের অদ্ভুত নিয়মাবলীর উদ্ভাবন হয়; সেই নিয়মাবলী দৈহিক বল-বাহুল্য উৎপাদনের অনুরোধে, এমন কি, প্রাকৃতিক বৃত্তিনিচয়কেও ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই;—তাহার প্রভাবে জননী বিকলাঙ্গ শিশুকে হত্যা করিয়াছে, বীরত্ব-বিমুখ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং স্বামী আপন স্ত্রীকে আত্ম-অপেক্ষা বলিষ্ঠ-পুরুষের সহবাস করিতে অক্লিষ্টমনে উপদেশ দিয়াছে। এই বলেরই উত্তেজন সাধন হেতু, হোমারের চিরনূতনত্বময় কাব্য; এবং ইহারই পরিপোষকতা হেতু, টির্টিয়স প্রভৃতি কবিগণকৃত গীতিকাব্যের উৎপত্তি। এই সকল কাব্যের তুলনায় ভারতীয় কাব্য পর্য্যালোচন কর; ভারতীয় কাব্যে যদিও কোন স্থানে বীররস ক্ষণিক উদ্ভাসিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা করুণরস এবং শান্তি ও বৈরাগ্যভাবের অসীম স্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যায় না। আবার দেখ, এই বলেরই প্রভাবে এবং বহিঃশত্রুর উত্তেজনা-হেতু বর্দ্ধিত স্বদেশপ্রিয়তার মোহিনী শক্তির মোহে, সালামিস, থার্ম্মপলি প্রভৃতি তীর্থনিচয়, গ্রীকদিগের বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশপ্রিয়তার চির-উদ্দীপক ও চিরসাক্ষ্যস্বরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ভারতে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াও, উহা পুণ্যক্ষেত্র; তপঃ-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি; যুদ্ধস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের মুখে যোগবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন! সে যাহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, গ্রীকেরা এরূপ সুন্দর বল ও

সাহস প্রাপ্ত হইয়া, বহু সময়ে তাহা খামখেয়ালিতায় ও স্বজাতীয় রক্তপাতে অপব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভারতীয়েরা, তৎপরিবর্ত্তে ও তত্তুলনে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাবে সুখসংমিলনে বাস করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হিতকামনায় রত হইয়া, মনের সুখে, পরলোকের আশায় আশ্বস্ত রহিয়া, স্বচ্ছন্দভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন। ইহাদের মধ্যেও যে আত্মকলহ ছিল না এরূপ নহে, নতুবা কুরুপাণ্ডবাদির যুদ্ধকাহিনী কোথা হইতে আসিল। কিন্তু যাহা ছিল তাহা, গ্রীকদিগের অত্মকলহের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে, নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়। ভারতীয়দের এই আত্মকলহ-বিরলতা, আভ্যন্তরিক একতার ফল। গ্রীকদিগের মধ্যে যে ঘন ঘন আত্মকলহ ঘটিত এবং তাহাতে বলবীর্য্য যে অনর্থক ব্যয়িত হইত; প্রদেশপরম্পরায় অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্যভাব, অহঙ্কারপূর্ণ বলদীপ্ত অনলস শরীর ও মন এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সে সকলের মূলীভূত কারণ।

অতঃপর, বর্দ্ধিত জাতীয় প্রকৃতিদ্বয় হইতে কালে যেরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, বিষয় বিভাগে তাহা আলোচ্য।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাবে মাতৃভূমি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ধর্ম্মবিদ্যা।

১। ধর্ম্মতত্ত্ব।

(এই পরিচ্ছেদ যাঁহার ভাল না লাগিবে বা অসংলগ্ন বোধ হইবে, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।)

জ্ঞান ব্যতীত নিয়ম হয় না, নিয়ম ব্যতীত শক্তি চলে না, শক্তি না চলিলে কর্ম্ম হয় না। সুতরাং, 'এই বিশ্বরূপ কর্ম্মপদার্থের এক জন কর্ত্তা আছেন'—এই বোধের স্বতঃ ও স্বভাবতঃ উদয়ে, জ্ঞানস্বরূপকে পিতা বা ঈশ্বর এবং শক্তিস্বরূপকে মাতা বা দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। জ্ঞান নিয়তিলীলায় এবং শক্তি প্রকৃতি-ক্রিয়ায় পরিচিত হইয়া থাকেন।

দেশ ও কাল প্রত্যক্ষদৃষ্ট অনন্তমূর্ত্তি এবং তদুভয়ের উদ্ভাসক সৃষ্টিও অবশ্য অনন্ত। সুতরাং সৃষ্টির রচয়িতা শক্তি, শক্তির চালক নিয়ম এবং নিয়মের মূল জ্ঞানও অনন্ত এবং অবিনাশী। নিয়ম শক্তি ও সৃষ্টি, ইহারা এক অপরের অস্তিত্ব-পরিচায়ক, সুতরাং জ্ঞান সহ উহারা কি একক কি সম্যক উভয় ভাবেই অনন্তত্বভাববিশিষ্ট; পরোৎপন্ন পূর্ব্বোৎপন্ন কেহ নাই; ফলতঃ আমাদের বোধায়তন লইয়া যতদূরে কথা, ততদূরে আমরা দেখিতে পাই যে সকলেই সহোৎপন্ন ও সমোৎপন্ন। "এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" —এখন দেখ ইহা কতদূর সঙ্গত।

সাক্ষাৎ জ্ঞানাংশ স্বরূপ যে জীবাত্মা, জ্ঞানের নিত্যতা হেতু, তাহারও অবিনাশিত্ব কল্পনা করা যায় জ্ঞানাংশ ও শক্ত্যংশ, উভয় সংমিলনে জীবত্ব। সেই জীব যখন স্বীয় দোষে উচ্চতর সম্বন্ধ সহ বিচ্ছিন্ন হইবাতে দুঃখভাজন হয়,তখন শান্তির আশায় মহাজ্ঞান ও মহাশক্তিকে

আশ্রয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিভু ও প্রভুরূপে অনুভব ও কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সে সকল কি মিথ্যা কল্পনা?

ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অনুভূত হয় যে, দৃষ্টাদৃষ্ট তাবৎ বিষয়ে, প্রকৃতির প্রয়োজনপূরকতা হেতু, সফলতা। এখন সেই প্রকৃতি শূন্য-দ্বেষিণী। শূন্য শব্দের অপর আখ্যা মিথ্যা, অসৎ, বিকার, বিরোধিতা, স্বভাবান্তর, ইত্যাদি। অতএব সত্য ও সৎস্বরূপের দ্বারাই প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ হয়; মিথ্যা দ্বারা হয় না। প্রত্যুত জগতে মিথ্যার সঞ্চার হইলেই, দেখা যায় যে অবিলম্বে প্রকৃতি তাহার নিরাকরণ করিয়া থাকেন। মিথ্যা, প্রকারভেদে কখনও আশু কখনও বিলম্বে, অথবা চলিত কথায় নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবে, নিরাকৃত হয়; এবং তাই কখন কখন কালব্যাজ হেতু ভ্রম হয় যে, মিথ্যারও বুঝি তবে এ জগতে নিত্যস্থিতি সম্ভবপর! ফলত এটা নিশ্চয় যে, কি জড় কি অজড়, কি ভৌতিক কি আত্মিক, যে কোন সংসারে, আজি হউক কালি হউক, নিরাকৃত হইতে এ জগতে কোন মিথ্যাই বাকী থাকে না। প্রকৃতি শূন্যদ্বেষিণী!—পূর্ব্বোক্ত কল্পনা সকল যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন না একদিন তাহারা নিরাকৃত হইয়া যাইত; একদিন না একদিন অবশ্যই তাহাদের প্রতি প্রকৃতির যে প্রতিকূলাচরণ তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহার কিছুই হয় না, বরং প্রকৃতি সে সকল কল্পনায় উৎসাহ দেয়। ফলতঃ ঈশ্বর এবং জীব এবং তদুভয়ের মধ্যে যে সাধ্য-সাধকভাব, ইত্যাদির সত্যতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে, বিশ্বাসে যে প্রকৃতির অনুকূলতা তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া জানিও। অথবা অন্য কথা কি, মনুষ্যমনের এই বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবেই পূর্ণ প্রাকৃতিক সংস্কারমাত্র।

বলিয়াছি, এই বিশ্ব কর্ম্মস্বরূপ। বিশ্বই যদি কর্ম্মস্বরূপ হইল, কর্ম্ম শব্দের অনধীন তবে আর থকিতে পারে কে? কিন্তু কর্ম্ম কি—কর্ম্ম কাহার—কর্ত্তা কে? শক্তির পরিণতি কর্ম্ম; পদার্থমাত্রে কর্ম্ম এবং

প্রচ্ছন্ন ভাবে হউক কি প্রকাশ্যভাবে হউক, যেখানে কর্ম্মত্ব সেইখানে কর্ত্তৃত্বেরও বিদ্যমানতা; যেহেতু সংসার এক অদ্বৈত এবং অখণ্ডিত এবং "এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং"। কর্ম্মত্ব এবং কর্ত্তৃত্বের যুগপৎ একত্র সমাবেশ হইল যেন; কিন্তু খণ্ডদর্শনে কর্ম্মভাবকে পৃথক্ করিয়া, পর পর কেবল কর্ত্তৃত্বের অনুসরণ করিতে গেলে কোথায় গিয়া তাহার অবধি হয়? বীজবৃক্ষবৎ শেষে অবধির অভাবে অনবস্থ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়! কিন্তু এখন এ ভ্রান্তি ও নির্ব্বুদ্ধিতার সীমা কোথায়? জ্ঞান এবং শক্তি অখণ্ডনীয় অনন্তরূপ, এক-এবং-সর্ব্ব; কেবল ভেদজ্ঞানের বশবর্ত্তিতায় আধার-আধেয়ভেদে কারক-কৃত অভিধানে খণ্ডরূপ; এবং দেশকালে আবদ্ধ হইয়া তদ্রূপ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত হয়। কিন্তু দেশকাল ও আধার-আধেয়াতীতে সমষ্টিরূপ, পদাতীত নামশূন্য নিরঞ্জন! তখন এক কর্ত্তৃত্বে ও এক কর্ম্মত্বে সমস্ত আসিয়া সমাহিত হয়। জ্ঞান এবং শক্তি পৃথক্ নহে; যে জ্ঞান সেই শক্তি, যে শক্তি সেই জ্ঞান; উভয় সমাবেশে অস্তিত্ব। অস্তিত্ব হেতু নাস্তিত্বের অভাবে, অস্তিত্ব অনন্ত এবং নিত্য; কর্ম্মত্ব এবং কর্ত্তৃত্বের উহা উপরম স্থান, তদুভয়ের উহা সাম্যাবস্থা।

অস্তিত্ব স্বভাবতঃই প্রকাশময়। প্রকাশপ্রভায় রূপোৎপত্তি হইতে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ; অনাদিসত্তায় অনাদি সৃষ্টি, কেবল প্রবাহরূপে সে সৃষ্টি সাদি। ব্যষ্টি-জ্ঞানাত্মক দর্শনে যে প্রবাহ-অনুভূতি, বিকারের তাহাই আরম্ভ; বিকার হইতে অসৎ, অসৎ হইতে আধার-আধেয় এবং কারক ও কৃতবোধ; সেই বোধ হইতে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব; কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব হইতে জ্ঞান ও শক্তিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিকার ও তথাবিধ তদুত্তর পরিণতি হইতে, অদৃষ্টোৎপত্তি ও অদৃষ্ট-পুঞ্জি; অদৃষ্ট হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতে যথাদৃষ্ট সৃষ্টিলীলা অনুভূত হয়। পুনশ্চ অদৃষ্ট হইতে সংস্কারের উৎপত্তি। সেই সংস্কার হইতে অস্তিত্বের যে কিছু আভাস-অনুভূতি, তাহাই লৌকিক সৎ এবং সত্য; তদভাব ও তদন্যতরে লৌকিক অসৎ ও অসত্য। সত্যের অনুসরণে, অস্তিত্ব অর্থাৎ চিদভিমুখী হওয়ায়,সংস্কারাতীত উর্দ্ধগতি; বিপরীত অনুসরণে বিপরীত-

ভাবে বিপরীত মুখে গতি। ভ্রান্তিমূল অদৃষ্টোৎপন্ন সংস্কারাদি না থাকিলে, এই সংসার বিশুদ্ধ এবং নিত্য সত্যের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বস্থান হইত।

এই বিকারময় সংসারে কর্ম্মত্ব এবং কর্ত্তৃত্বের যে যুগপৎ একত্র সমাবেশ, তাহা এরূপে পরিণত ও পরিচিত।—কর্ম্মভার উপকরণরূপে এবং কর্ত্তৃত্বভাব কারণরূপে এবং তদুভয়ে পুনঃ পর পর পর্য্যায়বিনিময়ে, অথবা সহজ কথায়, আজি যাহা কর্ম্ম কালি তাহা কারণ এবং আজি যাহা কারণ কালি তাহা কর্ম্মরূপে, ইত্যাকারে প্রকটিত ও ক্রিয়াশীল হয়। তাহা হইতে পুনঃ উত্তরোত্তর ও যুগপৎ অনন্ত কর্ম্ম ও কারণের উৎপাদনে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত মহিমা ঘোষিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। সদসৎ বুদ্ধিপূর্ণ মানবের পক্ষে, তাহার সেই কর্ম্মত্ব ভাব হইতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তজ্জনিত নৈতিক বাধকতা ও অধীনতা এবং কর্ত্তৃত্বভাব হইতে ক্রিয়াশীলতা, কর্ম্মপথে স্বাধীনতা ও তজ্জনিত বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের উদয় হয়।

যাহা কর্ত্তব্যের পরিবোধক এবং যাহা কর্ম্মার্থে ক্রিয়াশীলতার প্রবর্ত্তক, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। প্রকৃতির প্রয়োজনপূরক ও তদনুকূলতাসাধক কর্ম্মের যাহা বোধক ও প্রবর্ত্তক, তাহা সৎধর্ম্ম। আর যদ্দ্বারা তদ্রূপ কর্ম্মবোধের বিপর্য্যয় সাধন হয়, তাহা অসৎধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। উভয়ভেদে উভয়তঃ সম্পাদিত কার্য্যপরিণামকে পুণ্য ও পাপ বলা যায়। ভাল, এখন প্রকৃতি সম্বন্ধীয় অনুকূলতা ও প্রতিকূলতাভেদে এত তফাত বাদ হয় কেন?

যেমন জড়, তেমনি অজড়, তেমনি জ্ঞান ও বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য সকলও, সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতির অংশস্বরূপ; সুতরাং তাহাদের কৃত কার্য্য যাহা তাহাও, প্রকৃতিগর্ভস্থ অপরাপর তাবৎ কার্য্যের ন্যায়, প্রাকৃতিকক্ষেত্রে সংলগ্ন হয়। ভেদনির্ব্বিশেষে সংলগ্ন হয় সকল কার্য্যই; কিন্তু উহার মধ্যে, যাহা প্রাকৃতিক সুতানলয়ের পোষক তাহাকেই প্রকৃতির প্রয়োজনপূরক বলা যায়; আর যাহা তাহা নয়, তাহাকে তদ্বিপরীত ও অসৎ কর্ম্ম বলা গিয়া থাকে। প্রকৃতির অংশস্বরূপ বলিয়াই, প্রকৃতির নিকট মানবাদির বশ্যতা এবং প্রকৃতিও সেই নিমিত্ত

তত্তাবৎকে সকল বিষয়ে তত্ত্বাভাস এবং ক্রিয়াভাস প্রদান করিয়া থাকেন। মানবে সেই সকল আভাস সঞ্চিত হইয়া বুদ্ধিরূপে প্রকটিত এবং বুদ্ধির প্রতিপ্রসবে পুনঃ, কায়িক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধরূপে কার্য্যপ্রকরণ ও কার্য্য সকল উদ্ভাবিত ও কৃত হয়। সত্যরূপা প্রকৃতির সেই আভাস সকল সত্যস্বরূপ। মানব যদি সর্ব্বদা তাহা ভালরূপে বুঝিতে ও ঠিক তদনুরূপ চলিতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা হেতু সে সর্ব্বদা অব্যর্থবাক্ অক্ষুণ্ণকর্ম্মা এবং যথাপ্রয়োজন সর্ব্বজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইতে পারিত; অথবা তাহার বাক্য ও কার্য্য সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির পরিচায়ক হইত। কিন্তু বিকারাচ্ছন্ন মানব, অহঙ্কারজনিত ভেদজ্ঞানের বিষম মোহে, প্রকৃতির সহ একতানতা হারাইয়া, নিজেতে কৃত্রিম প্রকৃতির আরোপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার আভাসের অনুভূতিস্থলে প্রায় সর্ব্বদাই মিথ্যার সঞ্চার হইয়া থাকে। মিথ্যার সঞ্চার হইতে এক পক্ষে প্রকৃতির প্রয়োজনহানি এবং অন্য পক্ষে নিজের স্বভাবচ্যুতিহেতু, মানবের অনেকই অধোগতি সাধিত হয়। ঐরূপে যখন যখনই মিথ্যা নৈমিত্তিক নিয়মে স্বীকৃত হয়, তখনই প্রকৃতি কর্ত্তৃক তন্নিরাকরণ-চেষ্টা হেতু জগতে এক একটি বিষম বিপ্লব ঘটনা হইয়া থাকে।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

জ্ঞান এবং শক্তির যাহা অনন্বিত একীভূত ভাব, তাহা আত্মাবস্থা—নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আদি বিশেষণাত্মক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। ক্রিয়ান্বয়ে সেই পরমাত্মাই পরমেশ্বর অভিধানে পূজিত হইয়া থাকেন। উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি-অভিমুখী যে বেগ তাহা চেতনা; ক্ষয়াভিমুখী বেগ জড়তা; অনুভূতি সজীবতা এবং নিয়ামকভাব কৃতিত্ব বা কারকতা। প্রথম তিনটি আধিভৌতিক তত্ত্ব ও উপায়; চতুর্থটি আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য। আধিভৌতিক তত্ত্ব শক্তিধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আত্মধর্ম্ম। শক্তিধর্ম্মে, উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, রজঃ ও সত্ত্ব গুণের ক্রিয়া এবং ক্ষয় বা মৃত্যু, তমোগুণের

ক্রিয়া। মৃত্যু অবস্থান্তর প্রক্রিয়ামাত্র; বৈচিত্রবিন্যাসের আদি ও উত্তরসাধক কারণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণ সেই কারণের পরিণতি। যেখানে মৃত্যু, সেই খানেই নূতনোৎপত্তির সূত্রপাত এবং যেখানে উৎপত্তি, সেই খানে বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। আধিভৌতিক তত্ত্ব হইতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়বিশিষ্ট শরীর এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে শরীরাধিষ্ঠাতা। অনুভূতি উভয় তত্ত্ববিশিষ্ট ও তদুভয়তত্ত্বের সংযোগক্রিয়া,—এই সংযোগে দিব্য ভাবোদয় হেতু উহাকে আধিদৈবিক তত্ত্ব বলায় ক্ষতি নাই। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমাবেশে বিশ্বরূপাত্মক সর্ব্বমূর্ত্ত লীলামূর্ত্তি যিনি, তিনিই ব্রাহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বর; এবং তাঁহার সেই লীলাপ্রপঞ্চে ব্যষ্টিরূপাত্মক যাহা তাহা জীব।—

"উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপিহ বিষ্ণো।"

এই সংসার সর্ব্বত্রই শরীরময়, সর্ব্বত্রই জীবের সঞ্চার। অনন্ত খণ্ডজীব লইয়া বিশ্বজীবত্ব এবং প্রতি খণ্ডজীব পুনঃ অনন্ত জীবের নিবাসস্থলী। জীবশরীরের প্রতি আণবীয় অংশ এবং যে কোন আণবীয় দেহ পর্য্যন্ত জীবত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। এইরূপই জগৎ এবং এতদ্রূপই জগতকর্ত্তার লীলাপ্রপঞ্চ!

নিয়ম এই যে, মহৎ যে সে ক্ষুদ্রকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং সেই আকর্ষণের নিত্যতা হেতু, তদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যাহা তাহাও অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হয়। পুনশ্চ সেই আকর্ষণের অস্তিত্ব হেতু, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তন্নিহিত পদার্থ সমুদয় যে যাহার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট থাকিতে সক্ষম হইয়াছে। যদ্রূপ আকাশস্থ গোলকপিণ্ড সকল পর পর এক অপরকে অবলম্বন করিয়া এবং সর্ব্বোত্তরে মহৎ অবলম্বনমুখে সকলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া অনন্তদেশব্যাপী আবর্ত্তনরত রহিয়াছে; যদ্রূপ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অচ্ছিন্ন ও অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ, যদ্রূপ তাহাদের

কেহই যদৃচ্ছা উন্মাদবৎ ঘুরিতে পায় না; তদ্রূপ এই বিশ্বরাজ্যস্থ ক্ষুদ্র-তাবৎ, উত্তরোত্তর বৃহৎ-তাবৎকে অবলম্বন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি মহান্ বৃহতে সকলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া,সংসারচক্রে যে যাহার যথানির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্মরত হইয়া ফিরিতেছে। জড়াজড় সকল সংসারে সেই একই দৃশ্য এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সামান্য-মহৎ, ইত্যাদি অভিধান ও পর্য্যায়ভেদ, সৃষ্ট স্রষ্টা বা দাস ও প্রভু, এতদুভয়ের পদার্থপতিত ছায়াপাতমাত্র। যে আকর্ষণসূত্রে মহতের নিকট ক্ষুদ্র আকর্ষিত হয়, ক্ষুদ্রের স্বভাবরক্ষাও সেই আকর্ষণসূত্রে হইয়া থাকে। যতক্ষণ যথানিয়মে ও যথাসম্ভব-প্রকারে ক্ষুদ্র মহতের দ্বারা আকর্ষিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার স্বভাব, সুতরাং পবিত্রতা রক্ষিত হয়। ক্ষুদ্রে স্বভাবব্যত্যয় অর্থাৎ অপবিত্রতা বা গুণব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেই জানা যায় যে, সে আকর্ষণসূত্রে ব্যতিক্রম বা বিকার ঘটনা হইয়াছে।

উপরে আভাসিত হইয়াছে যে, মহাপ্রকৃতির পতি ও পরিচালক স্বরূপ পরমজ্ঞানাত্মক পরমাত্মা যিনি, তিনি বিশ্ববিধায়ক মহাশক্তি-যোগে এবং মহাপ্রকৃতিরূপ ভাবদেহে আত্মপ্রকটিত করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত,মহান্ আত্মা সকাশে ব্যষ্টি আত্মা অর্থাৎ জীবের যে আকর্ষিত হওয়া তাহা, জীবমাত্রে দৃষ্ট উচ্চশক্তির প্রতি ভক্তি ও আসক্তি; প্রাকৃতিক দেহের নিকট জীবদেহের বশ্যতা; এবং প্রাকৃতিক তত্ত্বাভাস ও ক্রিয়াভাসের নিকট জীবের আশ্রয়-আশ্রিতভাব; এই সকলের দ্বারা পরিচিত হয়। শক্তিমাত্রে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা শক্তির আনুগত্য করিয়া থাকে এবং তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, এমন কি অধম-তম ইতরজীবকে পর্য্যন্ত, শ্রেষ্ঠশক্তি মনুষ্যের বশ্যতায় আনিতে বা আনু-গত্য করাইতে পারা যায়। মানবও, নিজাপেক্ষা উচ্চতর শক্তির প্রতি আসক্তি বশতঃ, পারলৌকিক ভাবে দেবতার এবং লৌকিকভাবে সমাজ ও রাজনীতির বশীভূত হইয়া থাকে। উচ্চশক্তির প্রতি এই আসক্তি ও অধীনতাই ধর্ম্মবীজ এবং উহা হইতেই ধর্ম্মোৎপত্তি। এই বীজ কি কীট পতঙ্গ, কি পশু, কি মানব, সকলেতেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক যথাযোগ্য

পরিমাণে নিহিত করা রহিয়াছে। জীবোন্নতি সহ ক্রমপরিণতি সহকারে উহাই মানবে আসিয়া ধর্ম্মভাবে স্ফুরিত হয়।

ফলতঃ উচ্চশক্তি ঈশ্বর বা দেবতায় যে বিশ্বাস ও ভক্তি, তাহা মানবের স্বভাবজাত; নিজকৃত নহে। বৈজ্ঞানিকচূড়ামণি যে ডারুইন বানরাদি নিকৃষ্ট জীব হইতে মানুষের উৎপত্তির কথা উত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছিল, সেও সে উচ্চের অনুভূতি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই; পারলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি যাহার এতটা বিরোধিতা, সেও তাহা অনুভব করিয়াছিল। ডারুইন কর্ত্তৃক একস্থানে এরূপ উক্ত হইয়াছে—'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ইহার সর্ব্বথা আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, মনোমধ্যে যেন স্বতঃই ইহা অনুভূত হয় যে, অবশ্যই এ সকলের মূলে আদিকারণ স্বরূপ একটি বিধাতৃ-শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এবং মনের এই যে অনুভূতি ইহা সর্ব্বতোভাবেই অনিবার্য্য। কিন্তু তদ্রূপ অনুভব করার পরক্ষণেই আবার এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, মানুষের যে মন সেই সামান্য আদি জৈবিকপদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ ইতর প্রাণিপরম্পরায় বিবর্ত্তনিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া তাহার বর্ত্তমান পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যে বিবর্ত্তনিয়মানুক্রমকে আমি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেই মনের তদ্রূপ অনুভূতির উপর সত্যস্বরূপ জ্ঞানে নির্ভর করা যাইতে পারে কি না?' বলা বাহুল্য যে, ডারুইনের অনুভূতিটুকু স্বভাব হইতে এবং বিতর্কটুকু স্বভাববিপর্য্যয়কারী বিকৃত শিক্ষা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

ডারুইনের বিশ্বাস যে, বিবর্ত্তনিয়মানুসারে, যাহার যেমন প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুসারেই তাহার মন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা একের প্রয়োজনে উদ্ভূত ও অস্তিত্বশীল, তাহা অন্যের পক্ষে হয়ত কার্য্যকরী ও সত্যপ্রকাশক না হইলেও হইতে পারে; অথবা সর্ব্বজনীন সত্যপ্রকাশক বলিয়া কিরূপে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়। ডারুইনের এই ভ্রান্ত তত্ত্বানুশীলন ও বিশ্বাসই ওরূপ উক্তির মূলীভূত কারণ।

ওরূপ তত্ত্ব ও বিশ্বাস সত্য হইলে, অবশ্যই ওরূপ উক্তিকে সারবান্ বলিয়া ধরা যাইত। কিন্তু উহা ঠিক নহে,—বিবর্ত্তবাদের প্রয়োজন মিথ্যা; প্রকৃতির পরিণতিই অখণ্ডনীয় ও অনন্ত সত্য।

পরিণতির প্রকরণ ও নিয়ম সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব বিষয়ে এক; যে নিয়ম ও প্রকরণে সামান্য একটা পদার্থরচনা, ব্রহ্মাণ্ডরচনাও তাহা হইতে; যে নিয়ম ও প্রকরণে দিবসরচনা, বৎসর রচনাও তাহা হইতে; প্রভেদ কেবল বিষয়ের সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে, নিয়ম এবং প্রকরণ একে বিলম্বিত ও অপরে দ্রুত। অতএব যে নিয়ম ও প্রকরণে শিশুজীবনের উত্তর পরিণতি; মানবের জাতীয় জীবনের পরিণতিও তদ্রূপে। তুমি বিবর্ত্ত-বাদী, তোমার আদিজৈবিক হইতে মানবীয় বর্ত্তমান পরিণতি পর্য্যন্ত যে কিছু অবস্থা এবং অবস্থাপর্য্যায়; তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা মানুষ-বিশেষের গর্ভবাস হইতে ভূমিষ্ঠোত্তরে জ্ঞানসম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্তি অবস্থা পর্য্যন্তে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া লইতে পার। কিন্তু এখন কথা, শিশু যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি সহ উদ্ভাবনী-শক্তি-সমন্বিত নানাজ্ঞানসম্পন্ন মানস প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখনকার তাহার সেই মন কি নূতন সৃষ্টি না মাতৃ-গর্ভ হইতে যে মন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহারই উহা উত্তর পরি-ণতি মাত্র? জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের মন যদি গর্ভগত মনেরই ক্রম-পরিণতি ভিন্ন আর কিছু না হয়; তাহা হইলে সাধারণ মানবীয় মনও, মনঃসম্বন্ধীয় আদি এবং প্রাথমিক বীজের ক্রম-পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

কিন্তু এখন কথা এই, পরিণতিযোগে প্রাপ্ত যে অবস্থা, তাহা কি পরিণতি-নিয়মে নূতন সৃষ্ট, না আদি বীজেরই তাহা সম্প্রসারণমাত্র। প্রকৃতিতে যাহা নাই তাহা হয় না; যাহা আছে তাহাই হয়। কি জীব কি মনুষ্য, কেহই কিছু নূতন সৃষ্টি করে না; অথবা বিবর্ত্তনিয়ম বা পরিণতি বশেও কিছু নূতন উৎপন্ন হয় না; হয় কেবল প্রকৃতিতে যাহা ছিল, কাল ও উপকরণযোগে তাহারই সম্প্রসারণমাত্র। প্রকৃতির অনন্ত সামর্থ্য, প্রাকৃতিক বীজে অনন্ত পরিণতির সম্ভবতা;—রেণুমাত্র বীজে

অনন্ত অরণ্যানির পরিণতি নিহিত রহিয়া থাকে। এমন কি তোমার মাধ্যাকর্ষণ, বা রেলের গাড়ী ও তারের খবর, ইত্যাদি, এ সকলেরও নূতন সৃষ্টি হয় নাই; প্রকৃতিতে সে সমস্তেরই তত্ত্ব নিহিত ছিল, মানুষ কেবল তাহা আবিষ্কার করিয়াছে মাত্র। আবিষ্কারও হঠাৎ হয় নাই, ক্রমপরিণতিবশে হইয়াছে; যাহার আয়োজন পূর্ণ হইয়া আইসে, পরমুহূর্ত্তে তাহাতে যে আহুতি প্রয়োগ তাহাই আবিষ্কার শব্দে ঘোষিত হয়। যে দিন ভাস্করাচার্য্য পৃথিবী সম্বন্ধে বলিল,—"স্বশক্তৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতি," সেই দিন জানা গেল, সেখান হইতে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের দিন অতি নিকট।

এখন মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, সূক্ষ্ম আদিবীজে কিরূপে সমস্ত উত্তর পরিণতি, একটা সূক্ষ্মরেণুবৎ বীজকণায় কিরূপে অনন্ত অরণ্যানি, এ সকলের সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে। এটা কি বাস্তবিকই অসম্ভব ও আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়? ইহাত দেখিয়াছ, সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্র বিন্দুরেতে গর্ভসঞ্চার ও তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হয়; সন্তান পরিণতবয়স্ক হইল, তখন দেখা গেল কি?—সন্তানে পিতৃদোষ, পিতৃগুণ, পিতৃরোগ, পিতৃবুদ্ধি, পিতৃপ্রকৃতি এবং কখন কখন পিতৃ-অবয়বের সামান্য চিহ্নবিশেষটি পর্য্যন্ত, পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সে গুলি ছিল কোথায়, আসিল বা কোথা হইতে? ছিল সেই গুলি, বলিতে হইবে কি, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একবিন্দু পিতৃরেতে; পুত্রদেহে তাহারা পরিণত হইল শেষে প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রকৃতির প্রয়োজনে। সেই এক ক্ষুদ্র বিন্দুরেতে যদি এতগুলি বিষয় সূক্ষ্মভাবে সমাবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে, তবে আর যে কোন আদি বীজের অনন্ত পরিণতি-সামর্থ্যে অসম্ভবতা ও আশ্চর্য্যের বিষয় কোথায়? অতএব যদি বক্ষ্যমাণ বিষয় সমস্ত, যে যে প্রকারের ও যে যে আকারের হউক, যখন তাহারা তত্তৎ জাতীয় আদিবীজের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ও পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; তখন কেন তাহাদের সত্যপ্রকাশকতাশক্তি স্বীকার না করিব?—যেহেতু আদিবীজ প্রকৃতির নিজ সম্পত্তি

এবং যাহা প্রকৃতির নিজ সম্পত্তি তাহা কখন মিথ্যার আশ্রয় হইতে পারে না; তাহা অখণ্ডনীয় ও নিত্য সত্যস্বরূপ!

যেরূপ পিতৃবীজের পরিণতিতে সন্তানের বর্দ্ধিষ্ণু ভাব; সেইরূপ জগৎপিতার প্রদত্ত বীজপরিণতিতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। মহাজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই সমস্ত সৃষ্টিবীজপ্রদ পিতা, এবং সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি সেই সর্ব্ববীজের গর্ভধারিণী মাতা;—

"সর্ব্বযোনিস্থঃ কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

ধর্ম্মবিদ্যা বলিতে আমি বা কি বুঝি, অন্যকে বা কি বুঝাইতে চাই, এবং 'ধর্ম্মবিদ্যা' শীর্ষে আলোচনা বা করিতে চাই কি, তাহা একটু খুলিয়া বলা উচিত। অতএব ধর্ম্মবিদ্যা কাহাকে বলে?

বাহ্য অনুষ্ঠানে মানুষ কিরূপ আকার প্রকার ও বিভূতি বিশিষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহা লইয়া মানুষের ধর্ম্ম নহে। অনেকে গীর্জ্জায় গিয়াও প্রকৃত খৃষ্টান-শব্দে বাচ্য হয় না; অনেকে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির নিকট মাথা নোয়াইলেও হিন্দু-নামের যোগ্য হইতে পারে না। পুনশ্চ হিন্দুর ঘরে জন্মিলেও হিন্দু হয় না; খৃষ্টানের ঘরে জন্মিলেও খৃষ্টান হয় না। অথবা কেবল কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক দেবোপাসনা হেতু, কাহাকে কোন বিশেষ ধর্ম্মের ধর্ম্মী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। আমি এই কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু সাংসারিক চলিত ব্যবহার অন্যরূপ; অর্থাৎ ভিতরে যাহার যাহা থাকুক, বাহ্য অনুষ্ঠানে মানুষকে যেরূপ সম্প্রদায়ানুগত বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ধর্ম্মী বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। এরূপ করার কারণ আছে,—সাংসারিক ব্যবহারে বিশ্বাস এই যে, দেবতত্ত্বই ধর্ম্মতত্ত্ব এবং দেবোপাসনাই ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য, ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস! এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু, অধুনাতনকালে প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মধ্যে অভ্যুদয় ও উন্নতির পরিবর্ত্তে, অধোমুখতা

ও অবনতি নানা প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ভ্রান্তির ফল, অবনতি ভিন্ন আর কি হওয়া সম্ভব ? কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে, অভ্যন্তরভাগেও যখন মানুষ কোন এক বিশেষ ধর্ম্মপ্রভাবে সম্পূর্ণতঃ ও সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে সেই ধর্ম্মবিশেষের ধর্ম্মী বলা যাইতে পারে।

কেবল দেবতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব নহে, তবে ধর্ম্মতত্ত্বের একটা অতি প্রধান অঙ্গ বটে ; সেইরূপ কেবল দেবোপাসনাও ধর্ম্ম নহে, তবে ধর্ম্মের একটা অতি প্রধান অঙ্গ বটে। ধর্ম্মতত্ত্ব বা মানবীয় যে কোন তত্ত্ব নিরূপণের পূর্ব্বে, আগে দেখা উচিত যে, মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ; তাহা স্থির হইলে তৎসহ অন্বয় ও ব্যতিরেকে আর সমস্ত বিষয়ের অবধারণা সহজ হইয়া আইসে। কি আপ্তবাক্য কি যুক্তিমার্গ, উভয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ম্ম। ভাল, যদি তাহাই হইল, তবে এখন কর্ম্মান্বয়ে আর সমস্ত বিষয় আলোচনা ও অবধারণা কর, অতি সহজে সফলতা লাভ করিতে পারিবে। কারণ, মুখ্য পদার্থ যাহা আর সমস্ত তাহারই উৎস, উপায়, উপকরণ, সমবায়ী কারণ ইত্যাদি নানা আকারে অবস্থান করিয়া থাকে।

মানবের আত্মিক জীবনের সমষ্টিরূপ যাহা,—মানবের কর্ম্মজীবন যাহার অক্ষুণ্ণ অবিকল প্রতিবিম্ব স্বরূপ ; যাহার প্রভাবে কি কর্ম্ম-বিশেষ কি কর্ম্মসমষ্টিপ্রবাহ উভয়ই কল্পিত ; যাহার প্রভাবে তদুভয় নিয়মিত এবং যাহার উত্তেজনায় তদুভয়ই অনুষ্ঠিত ও কৃত হয়, তাহাকে মানুষের ধর্ম্মজীবন বলা যায়। এই ধর্ম্মজীবন যে সকল কারণ ও উপকরণ যোগে গঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের যে সমষ্টি, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায় ; নিম্নে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। কিন্তু অগ্রে বিচার্য্য, সে সকল কারণ ও উপকরণ কি কি ?

মানবের আত্মিকজীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার যে অংশ প্রভাবে, কি কর্ম্মবিশেষ কি কর্ম্মসমষ্টিপ্রবাহ, উভয়ই ধারণা-যোগে উদ্ভাবিত হয়, তাহা জ্ঞান ; এবং যে অংশের দ্বারা তদুভয় নিয়মিত

হয়, তাহা নীতি; এবং যে অংশের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও কৃত হয়, তাহা প্রকৃতি। এই জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, এতত্রয়ের সামঞ্জস্য-সংমিলিত সমষ্টিমূর্ত্তি যাহা, তাহাই ভাবরূপে মানুষের আত্মিক বা ধর্ম্মজীবন; এবং বিষয়রূপে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মজীবন, উভয়েরই সার্থকতা এবং পূর্ণত্ব প্রাপ্তি কর্ম্মজীবনে। কর্ম্মজীবন যাহার কুণ্ঠিত, বিকৃত বা ক্ষুণ্ণ হয়, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন উভয়ই তাহার পক্ষে বৃথা; অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় কোন কার্য্যেই আইসে না। তাহার সৃষ্টি হেতু স্রষ্টার যে অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য, সে তাহা সমস্তই ব্যর্থ করিয়া থাকে। সহস্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও দেবোপাসনাতেও তাহার কোন ফল ফলে না।

জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, ইহাদের বিষয়রূপে যে সমষ্টি, তাহাকেই উপরে ধর্ম্মশব্দে আখ্যাত করা গিয়াছে। এই ধর্ম্মের স্বরূপতঃ তত্ত্বকে ধর্ম্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মবিদ্যা, স্বরূপতঃ আদেশকে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং স্বরূপতঃ অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মচর্য্যা বলা যায়। উপরে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি এতত্রয়ের সমষ্টি, ভাবরূপে ধর্ম্মজীবন; অতএব ধর্ম্মজীবন পদার্থটা কি তাহা হয়ত এখন অনেকেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন। এক্ষণে জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, যাহাদের সমষ্টি-ভূত বিষয়-রূপকে ধর্ম্ম বলা গিয়াছে, তাহাদের পৃথক্ বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সৎ অসৎ, দৃষ্টাদৃষ্ট, এক কথায় যাবতীয় পদার্থেরই বোধস্বরূপকে জ্ঞান বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্র ও প্লেটোর দর্শন, এ সকল অনুসারে যাহা জ্ঞানশব্দে বাচ্য, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও অতি গুহ্য পদার্থ। আমাদের এখানে তাহাতে প্রয়োজন নাই। ব্যবহারতঃ জ্ঞান অর্থে যাহা বুঝায়; তাহাই আমাদের আলোচ্য। জ্ঞান সাংসারিক হউক, বা পারলৌকিক হউক, উভয়েতেই সৎ ও অসৎ দ্বিবিধ বিভাগ আছে। সৎজ্ঞানের সহ অসৎজ্ঞানেরও উপার্জ্জন প্রয়োজনীয়, যেহেতু অসতের প্রকৃতি-বোধ ভিন্ন, কখনও অসৎ পরিহারপূর্ব্বক সৎজ্ঞানে পরিচিত হওয়া ও তাহাকে অবলম্বন করা যাইতে পারে না। জ্ঞানে সৎ অসৎ উভয়

ভাবেরই অবস্থান হেতু, জ্ঞান হইতে যে কর্ম্মধারণা, তাহাও সৎ অসৎ উভয় প্রকারের হইয়া থাকে।

জ্ঞান দ্বিবিধ, এক সাংসারিক, অপর পারলৌকিক। আধিভৌতিক সংসারে যে কিছু পদার্থবোধ, তাহাকে সাংসারিক জ্ঞান বলা যায়। সাংসারিক জ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয়, ভৌতিক জগৎ সহ আমাদের সম্বন্ধ কি এবং ভূতগ্রাম বা কি হিসাবে ও কি পরিমাণে আমাদের ও আমরা বা কি হিসাবে ও কি পরিমাণে ভূতগ্রামের অধীন ও প্রয়োজন-পূরক হই। এতদ্বিষয়ে জ্ঞাতব্য সমস্তকে, সংসারতত্ত্ব নামেও অভি-হিত করিতে পারা যায়। সাংসারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষভাব, মানবের সাংসারিক শ্রী, সৌভাগ্য ও অভ্যুদয় বিষয়ে, উন্নতি বা অবনতি কারক হয়। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেতর যাবতীয় বিদ্যা, সাংসারিক জ্ঞানের অন্তর্গত।

মানবের আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক প্রয়োজনে যে কিছু পদার্থ-বোধের আবশ্যক, তাহাকে পারলৌকিক জ্ঞান বলা যায়। স্রষ্টাস্বরূপে যিনি অদৃষ্টশক্তিবিশিষ্ট অদৃষ্ট পুরুষ, তিনি বা তৎস্থানীয়গণ, তদীয় বিভূতি, তৎসহ আমাদের সম্বন্ধ, পরলোকে আমাদের পরিণাম এবং সে সমস্তের অন্বয়ে ইহলোকে আমাদের অনুষ্ঠান ও আচরণ; এই সকল পারলৌকিক জ্ঞানের জ্ঞাতব্য।—এক কথায়, এ সকলকে দেবতত্ত্ব নামে আখ্যাত করিতে পারা যায়। পারলৌকিক জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে, মানুষের মনুষ্যত্ব, আধ্যাত্মিক শ্রী ও পরিণামাদি, উন্নতি বা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পারলৌকিক জ্ঞানের অন্তর্গত।

সাংসারিক জ্ঞান ও পারলৌকিক জ্ঞান, উভয়ে যখন সৎ-ভাবাপন্ন, তখন স্বীয় স্বীয় এবং উভয়তঃ শ্রীসাধনের নিমিত্ত, উভয় উভয়ের সাপেক্ষতাযুক্ত হয়। অসৎ-ভাবাপন্ন হইলেই সাপেক্ষতাত্যাগী হইয়া থাকে এবং একটী অসৎ-ভাবাপন্ন হইলে, অপরটীও সাপেক্ষতাবিরহে, নিতান্ত অসৎ-ভাব না হউক, অন্ততঃ যথেষ্ট পরিমাণে মলীনতা প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। সাংসারিক জ্ঞানকে আধিভৌতিক এবং পারলৌকি জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে।

মনুষ্য উন্নতিপর্ব্বে যেমন পর্য্যায়েতেই অবস্থান করুক, জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি অথবা এক কথায় ধর্ম্ম ছাড়া কখনও থাকিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যসমাজের উৎপত্তিসময় হইতেই যে, কি অবিশ্লেষিত-মূর্ত্তি ধর্ম্ম, কি বিশ্লেষিত-মূর্ত্তি জ্ঞানাদি, তাহাদের সম্যক্ পরিপুষ্টতা সহ, মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে তাহা নহে। জ্ঞান যখন যাবতীয় পদার্থ হইতেই আকর্ষিতব্য, তখন পদার্থ অনন্ত হেতু, জ্ঞানায়তনও অবশ্য অনন্ত। অতএব মানব কখনও জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিপুষ্টতা দেখিতে পাইবে কি না, তাহা সন্দেহ। জ্ঞানানুসারিণী নীতি সম্বন্ধেও সুতরাং সেই কথা এবং তদুভয় অনুসারিণী প্রকৃতি সম্বন্ধেও অবশ্য সেই একই কথা।

মানবীয় চিত্তের ক্রমোৎকর্ষ সহ, জ্ঞানও কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয় মুখেই তিল তিল করিয়া সমানপদে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। মানবের আদিম বন্যাবস্থা সহ বর্ত্তমান সভ্যাবস্থার তুলনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সংসারতত্ত্ব কি সামান্য বীজ হইতে, মানবের ক্রমোত্তর চিত্তোৎকর্ষ সহ পর্ব্বে পর্ব্বে পুষ্টতা পাইয়া, শেষে এখন কি মহাবৃক্ষে আসিয়াই পরিণত হইয়াছে এবং উত্তর কালে না জানি আরও কি হইবে। দেবতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই একই কথা। অতএব আদিম জঘন্য ভূতোপাসনা হইতে বর্ত্তমানকালিক দেবতত্ত্ব পর্য্যন্ত, ভূতপ্রেত উপাসনা আদি যে সকল বিবিধ নিকৃষ্ট দেবতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কি শয়তানী ভাব কি মূঢ়তা, অথবা তাহাতে নিন্দা করিবার বা আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। তথাপি যদি নিন্দা কর বা আশ্চর্য্য হও, তাহা হইলে জানিও তোমার অবলম্বিত দেবতত্ত্ব দেখিয়াও উত্তর পুরুষেরা একদিন সেইরূপ নিন্দা করিবে ও হাসিবে। কারণ, পূর্ব্বগত দেবতত্ত্বে তোমার নিন্দা করিবার কারণ যাহা যাহা; তোমার অবলম্বিত দেবতত্ত্বে নিন্দা করিবার কারণ

সকলও অবিকল তাহাই। যে সকল দেবতত্ত্বাদি দেখিয়া নিন্দা করিতে চাও বা করিয়া থাক, তাহা উন্নতিপর্ব্বে,দেশকাল পাত্র অনুসারে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পর্য্যায়ভেদমাত্র ; তদ্ভিন্ন উহাতে আর কিছুই নাই এবং তুমি সে পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া আর এক পর্য্যায়ে আসিয়াছ, এইমাত্র তোমার সহ তাহার প্রভেদ।

অথবা কোন বিশেষ জাতির দেবতত্ত্ব বা বহুদেব উপসনাতেও কিছুমাত্র বিসদৃশ, উপহাস, অন্যায়, নিন্দা বা পাপের বিষয় নাই। মানবীয় মনের বিষয়-ধারণাশক্তি একবারে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; কালে ও ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। এজন্য মনের উন্নত অবস্থায় বিষয়-ধারণা যত সহজ, অনুন্নত ও অপেক্ষাকৃত আদি অবস্থায় তত সহজ থাকে না ; উন্নত অবস্থায় যাহা লোকে এক কথায় আয়ত্ত করিতে পারে, অনুন্নত অবস্থায় তাহাই আয়ত্ত করিতে অনেক কথার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই দেখা যায় যে, প্রাচীন ভাষা সকলে এক পদার্থের বহুনাম এবং প্রাচীন ধর্ম্ম সকলে এক পরমেশ্বরের সত্ত্ব এবং তত্ত্ব বহুদেব-রূপে কল্পিত হইয়া থাকে ; পুনশ্চ প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি ভেদে, কথা এবং কল্পনা উভয়ই ভিন্ন প্রকারের হয়। এখন এক 'জল' শব্দ বলিলেই, জল সম্বন্ধে যত কিছু গুণাগুণ ও প্রকৃতি তাহা সমস্ত তোমার ধারণাগত হয়; কিন্তু প্রথমকালিক মানবের তাহা হইত না ; সেই জন্য তখন জলের প্রত্যেক গুণাগুণ ও প্রকৃতি যে যেমনে বুঝিয়াছে ও আয়ত্ত করিয়াছে, সে তাহাকে সেইরূপ নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই জলের 'বন 'আপ' 'সলিল' ইত্যাদি বহু নামের উৎপত্তি।[১] কিন্তু যেমন সেই 'বন', 'আপ' 'সলিল' আদি সমস্ত শব্দ

১। জলম্ ঘাতনে, জৈঃ প্রাণিভিঃ লয়েতে আদীয়তে ইতি জলম্। বনম্ সম্ভক্তৌ, বন্যতে সেব্যতে বনং। আপঃ ব্যাপ্তৌ, ইন্দ্রেণ আপ্তা আপঃ। সলিলম্ গতৌ, সলতি নিম্নং দেশম্। উদকম্ খননে, উৎখনতি ভূমিং স্বেন বেগেন কর্ত্তা। নীরম্ প্রাপণে, নয়তি প্রাপয়তি শুদ্ধিম্। তোয়ং বৃদ্ধিকর্ম্মণি, তবতি বর্দ্ধতে বর্ষাসু। অম্ভঃ ব্যাপ্তৌ, ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমম্ভঃ। 'বহুদেবে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার দোষ', এই বুদ্ধি আজি

জলকেই বুঝাইয়া থাকে,তাহা ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না; সেইরূপ ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, মাতরিশ্বা আদি সমস্ত দেবনাম, পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তি ও মহিমা প্রকাশক এবং ঐ সকল নামে এক পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেই বুঝায় না। অতএব পদার্থের যদি বহু নাম থাকায় ও তাহা ব্যবহার করায় কোন দোষ না থাকে; তাহা হইলে এটাও স্থির যে বহুদেব কল্পনা ও তাহাদের পূজা ও উপাসনা করাতেও কোন প্রকার দোষ নাই। অতঃপর নীতির বিষয় বলা যাউক।

জ্ঞানের দ্বারা যাহা কর্ম্ম বলিয়া ধারণাকৃত, সেই কর্ম্ম ও কর্ম্ম-যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ যদ্দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাকে নীতি বলা যায়। জ্ঞানে সৎ ও অসৎ উভয় ভাব থাকায়,কর্ম্মধারণা এবং কর্ম্মযন্ত্র চালনাও সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল নীতির দ্বারা তাহার মধ্যে অসৎ যাহা তাহা নিরাকৃত হয়। আমরা দেখিতে পাই, মহাজ্ঞানী হইতে মহামূর্খ, সকলের মনেই, সৎ ও অসৎ উভয়বিধ চিন্তা নিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অসৎচিন্তা যাহা তাহা মহাজ্ঞানীর মনে অনতিবিলম্বেই নিরাকৃত হয়; তাহার কারণ, নীতির প্রভাব। আর মহামূর্খের মনে ?—তদ্বিপরীতে, অসৎ চিন্তা পোষিত এবং শেষে হয় ত কার্য্যে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াও থাকে; ইহার কারণ, নীতির অভাব। নীতির অভাবকে অসৎনীতি বা দুর্নীতি বলে। সংসারে সদসন্ময়তা হেতু, নীতির পার্শ্বেও অসৎ নীতি আছে।

নীতিরও বীজ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক মানবে নিহিত; জ্ঞানের ক্রমোৎকর্ষতা সহ পার্শ্বচরভাবে পুষ্টতা প্রাপ্ত ও প্রকটিত হইতে থাকে। আধুনিক চলিত ভাষায় বুঝাইতে গেলে, নীতি ধর্ম্মসংসারে আইন স্বরূপ। উহার বাধ্যবাধকতা সূত্র, ক্ষেত্রভেদে দ্বিবিধ;—এক সমাজ-

---

কালি ব্রাহ্মদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং কোন কোন হিন্দুকেও ইহার জন্য কুণ্ঠিত ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায়; উহা সাময়িক ফেসিয়ন মাত্র। নতুবা উক্ত বুদ্ধি সম্পূর্ণতঃ খৃষ্টানদের হইতে এ দেশে আসিয়াছে ও খৃষ্টানী উত্তেজনায় প্রচলিত হইয়াছে।

সকাশে কর্ত্তব্যবুদ্ধি; অপর স্রষ্টাসকাশে কর্ত্তব্যবুদ্ধি; আত্মস্বার্থ তদুভয়েতেই কিছু কিছু জড়িত আছে। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বয়ই কেবল সৎ-নীতির প্রবর্ত্তক। পরোক্ষ স্রষ্টা ও সমাজ উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যবুদ্ধি যখন অপরোক্ষ আত্মস্বার্থে মুগ্ধ হয়; তখনই কেবল দুর্নীতির সঞ্চার হইয়া থাকে।

নীতি ভিন্ন জ্ঞান কোন কার্য্যে আইসে না এবং জ্ঞান ব্যতীত নীতিও দাঁড়াইতে পারে না। পুনশ্চ, প্রকৃতিও জ্ঞান ও নীতি ভিন্ন জড়বৎ কার্য্যশূন্য হইয়া থাকে। ফলতঃ এ তিনই তিনের পরস্পর এত সাপেক্ষতাযুক্ত যে, একটির অভাব হইলে আর দুইটি অস্তিত্বশূন্যবৎ প্রতীয়মান হয়।

মানুষের স্বীয় স্বভাবকে প্রকৃতি বলা যায়। প্রতি মানুষের প্রকৃতি পৃথগ্‌বিধ। যাহা জ্ঞানের দ্বারা ধারণাকৃত এবং নীতির দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাই প্রকৃতিযোগে কর্ম্মরূপে প্রকটিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন নীতি দ্বারা নিয়মিত, নীতি যেমন জ্ঞানদ্বারা উন্নীত এবং জ্ঞান ও নীতির দ্বারা প্রকৃতি যেমন পরিমার্জ্জিত হয়, তেমনি জ্ঞান ও নীতিও আবার প্রকৃতিবিশেষপ্রভাবে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যভাব ব্যক্তিভেদে ব্যক্তিগত স্বধর্ম্ম এবং জাতিভেদে জাতিগত স্বধর্ম্ম নামে আখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যদিও বহুলোকের অবলম্বিত ধর্ম্ম বটে, তথাপি কোন ব্যক্তিবিশেষ খৃষ্টানকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম কিরূপ বুঝিয়াছে। নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহার বুঝার মধ্যে এমন একটু নূতন ভাব দেখিতে পাইবে, যাহা অন্যেতে নাই। প্রতি ব্যক্তির বোধগত যাবতীয় বিষয়েতেই এইরূপ একটু নূতনত্ব আছে, যাহাকে কথিত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাব বা প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্য বলা যায়। জাতিগত স্বাতন্ত্র্যভাবও তদ্রূপ এবং তাহারই প্রভাবে কোন এক সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে বহুতর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। এমন কতক-গুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়, যাহা যতগুলি লোকে সম পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহার সমষ্টিকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম এবং সেই লোক সমষ্টিকে

সম্প্রদায় বলা যায়। বহুসম্প্রদায়সমষ্টি পুনঃ কোন এক সাধারণত্ব-বিশেষ-যুক্ত হইলে, অথবা সম্প্রদায়বিশেষই অতি বহ্বায়তন হইলে, তাহাকে ও তাহার অবলম্বিত ধর্ম্মকে 'জাতীয়' নামে আখ্যাত করা হয়। জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের তদ্রূপ অবলম্বিত ধর্ম্মকে জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক স্বধর্ম্ম বলা যায়। কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, শাক্ত, শৈব, এ সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ; কিন্তু হিন্দু, খৃষ্টীয়, ইত্যাদি জাতীয় স্বধর্ম্ম।

কি ব্যক্তি কি জাতি ভাবে, মানব যখন স্বধর্ম্মানুগত হইয়া চলে, তখনই তাহার জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, সমস্ত অনুকূল হইবাতে, কি কর্ম্মক্ষেত্র কি ধর্ম্মক্ষেত্র, উভয়তঃ সে সফলতালাভে সক্ষম হয়। স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলে, সেরূপ সফলতালাভের পক্ষে নানা প্রকারে ব্যতিক্রম ঘটনা হইতে পারে। স্বধর্ম্ম কোন কারণে নানা দোষে দূষিত হইয়া পড়িলেও, আমার বিবেচনায় তাহা পরিত্যাগ না করিয়া সংস্কার করিয়া লওয়াই প্রশস্ত পরামর্শ। বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি নাই ; এ সংসারে প্রতি পদার্থপর্য্যায় এবং শ্রেণী সমস্তই পৃথক সৃষ্ট ; স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের দ্বারা সেই পৃথকত্বের উদ্দেশ্য হরণ হয়।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। বাহ্যে কোন হিন্দুসন্তান খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টান হয় না, অভ্যন্তরে তখনও সে হিন্দু রহিয়া যায়। লাভের মধ্যে এই হয় যে, স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম উভয়ই ছন্ন হওয়ায়, কর্ম্ম-ক্ষেত্র ও কর্ম্ম উভয়ই তাহার বিকৃত হইয়া থাকে। কি ব্যক্তি,কি জাতি, কি প্রকৃতিলীলায় অন্য সর্ব্বত্র, সহসা আলোক আঁধারের পরিবর্ত্তন মঙ্গলদায়ক হয় না। প্রাকৃতিক অতর্কিত ধীর নিয়মে যে পরিবর্ত্তন, তাহাই প্রকৃতি সহ সামঞ্জস্য হেতু মঙ্গলের কারণ হয়। এ সংসারে স্বধর্ম্মপরিবর্ত্তন, অথবা প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, স্বধর্ম্মের পর্য্যায়-পরিবর্ত্তনের দিনও আসিয়া থাকে। জাতি ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে যখন মানবের জ্ঞানোৎকর্ষ সহকারে তথাকালিক অবলম্বিত ধর্ম্ম অর্থশূন্য হইয়া পড়ে, তখন আর একটি যাহা অতর্কিতে তৎস্থান অধিকার করে, তাহা দৃশ্যত বিধর্ম্ম হইলেও, পূর্ব্বগত স্বধর্ম্মেরই উত্তর পর্য্যায়রূপে

গণিত হইতে পারে এবং তাহা স্বধর্ম্মজন্য যে কিছু শ্রেয়ঃ তদুৎপাদনেও সক্ষম হয়। যে ধর্ম্ম যতদিন অর্থশূন্য না হয়, তাহা ততদিন অবশ্য পালনীয় বলিয়া জানিবে। ঈশ্বরঘোষণা সকল ধর্ম্মেই করিয়া থাকে, ভূতপ্রেতাধিষ্ঠিত ধর্ম্মও ভূতপ্রেত আখ্যায় তাহা করিয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্ম প্রকৃত তাহা নহে। ধর্ম্ম বলা যায় তাহাকে যাহা মানবের উপস্থিত জ্ঞানোৎকর্ষ অনুরূপ এমন কর্ম্মের শিক্ষা দেয়, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিলাভ করিতে পারা যায়।

ধর্ম্মের বিরোধী ভাব অধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের অপব্যবহার ও ব্যবহারাধিক্য অপধর্ম্ম। উহারা যে যে কারণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এই কয়টি প্রধান,—সামঞ্জস্যচ্যুত খণ্ডজ্ঞান, অসৎজ্ঞান, অসৎনীতি, অসৎ প্রকৃতি,অসৎ সঙ্গ,অসৎ শিক্ষা ইত্যাদি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত দূষিত; তাহাতে সামঞ্জস্যচ্যুত খণ্ডজ্ঞান ও খণ্ডনীতির মাত্র শিক্ষা হইয়া থাকে এবং তাহার ফলও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অধুনাতন শিক্ষিতদিগের মধ্যে কি ধর্ম্মজীবন কি কর্ম্মজীবন উভয়ই অতি ছন্ন ও শোচনীয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, সাংসারিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ জ্ঞান ও উভয়বিধ নীতির সংমিলিত শিক্ষা ভিন্ন, জ্ঞান ও নীতি এবং তদন্বয়ে প্রকৃতিও, কখনও সম্পূর্ণতা ও সুশ্রীকতা প্রাপ্ত হয় না এবং তাহা না হইলে সুকর্ম্মশীলতারও অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। সুকর্ম্মশীলতা ভিন্ন, সমাজও কখন উন্নতি লাভ করে না; বরং তদ্বিপরীতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই স্বার্থবান্ লোকপূর্ণ সমাজে সুকর্ম্মশীলতা কোথায়?

অতঃপর উভয় জাতীয় ধর্ম্মবিদ্যার আলোচনা করা যাউক।

২। জাতীয় ধর্ম্মবিদ্যা।

আমি এক্ষণে উভয় জাতির ধর্ম্মবিদ্যা আলোচনা করিতে চলিয়াছি, কিন্তু সম্মুখেই উভয় জাতির জাতীয় ধর্ম্মবিদ্যা তুলনে কি দুরন্ত পার্থক্য

সমুপস্থিত! হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিদ্যা এক বিশাল ও দিগন্তব্যাপী মহাবৃক্ষ-স্বরূপ; আর গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিদ্যা তাহার তুলনে এক ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গণনার অতিরিক্ত; কি পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় উভয় প্রকারের যে কোন প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থে জাহাজ বোঝাই করিতে পারা যায়। আর গ্রীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ?—পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় ধারাবাহিক কিছুই দেখিতে পাই না; অধিকন্তু অপৌরুষেয় কাহাকে বলে, গ্রীকদিগের বুদ্ধিতে তাহা কখনও আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইহার দ্বারাই একরূপ উপলব্ধি হইতে পারিবে যে, পারলৌকিক জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপর কোন্ জাতির কতটা ধারণা ও কতদূর আস্থা, অথবা কে কতটা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। অপৌরুষেয়ত্ব বুদ্ধির অভাবে, গ্রীকবিশ্বাস অনুসারেই গ্রীকদিকের ধর্ম্ম-বিদ্যা মানবমুখনিঃসৃত;—কবির মুখে লোকের মুখে এবং তদতি-রিক্তে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর নিজের মনেও কতকটা উৎপন্ন। এ উৎপাদকত্রয়েরও কেহ এবং কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই; যখন যেমন কবি, যখন যেমন লোক, এবং যখন যেমন অনুষ্ঠাতা ও তাহার মন, ইহাদিগের ধর্ম্মতত্ত্বও তখন তেমন। হিন্দুদিগের দেবাদিনির্দ্দেশ বেদাদি (অপৌরুষেয়, সুতরাং স্বয়ং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট এবং অনাদি) গ্রন্থ হইতে; আর গ্রীকদিগের দেবাদিনির্দ্দেশ? কখন কখন, এমন কি, রাজ্য-পরিচালক সভার অনুজ্ঞা হইতেও হইতে পারিত।[২] এমন স্থলে ইহা বলিলে নিতান্ত হাস্যের

২। থিবা নগরে মিলানিপুস্, এবং আর্গস নগরে আদ্রাস্তস, লোকসমিতির আজ্ঞাক্রমে দেবত্বপ্রাপ্তে দেবপূজা পাইত। এক সময়ে সিকীওন-পতি ক্লিস্থিনিস, আদ্রাস্তসের প্রতি শত্রুতা বশতঃ, তাহার দেবত্ব লোপ করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন মিলানিপুসের মূর্ত্তিকে সিকীওনে লইয়া গিয়া,আদ্রাস্তসের মূর্ত্তির পার্শ্বে স্থাপন করে—এই মতলবে যে মিলানিপুস ও আদ্রাস্তসের জীবনকালে যখন বড়ই শত্রুতা ছিল, তখন সিকীওনে মিলানিপুসের আদর দেখিয়া; আদ্রাস্তস্ অবশ্যই বিরক্তিতে আপনিই সিকীওন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। দেখ

কারণ হয় না যে, গ্রীক দেবতা, অন্ততঃ তাহাদের কিয়দংশ, একরূপ আমাদের দেশীয় চাটু বা অর্থসুলভ রায়বাহাদুর, রাজা বাহাদুর বিশেষ;—এক গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হইলেই, অমনি যে কেহ রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুরীতে স্থাপিত হইল। এই সুবিধার কল্যাণে, বিশ্ব-বোমবেটে আলেক্‌জণ্ডারও জুপিটার-আমনের পুত্র হইয়াছিল। পরন্তু মিলিতুস-কৃত সক্রেতিসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান নালিশ এই যে, আথেন্স নগরী যে সকল দেবতাকে জাতীয় সভার বিধানক্রমে গ্রহণ ও উপাসনা করিয়া থাকে, সক্রেতিস তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসশূন্য। লোকসমিতির সম্মতিক্রমে দেবত্বস্থাপনকল্পে উক্তরূপ প্রথা হইতে দেখা যায় যে, রোম নগরেও, রোমুলস, নিউমা প্রভৃতি, জীবন অন্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও যে মানুষ দেবতারূপে পরিগণিত হওয়ার পক্ষে কিছু অভাব আছে, তাহা নহে; কিন্তু এখানকার কারণ ও প্রকরণ উভয়ই স্বতন্ত্র। যাহারা দেবতা হইয়াছিল, তাহারা প্রথমতঃ দেববৎ গুণযুক্ত মানুষ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জীবন অন্তে,দোষাবলীর কালক্রমে লোপ এবং গুণাবলী ঘনীভূত হইয়া আসিলে, লোকচিত্ত স্বতঃ ভক্তি-প্রবর্ত্তিত হইয়া অজ্ঞাত ও অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে দেবমধ্যে গণনা করিয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, মানুষকে যখন দেবতার পদে উঠান হইত, গ্রীকেরা প্রায়ই জ্ঞানতঃ উঠাইত, আর হিন্দুরা উঠাইত অজ্ঞানতঃ। সে যাহা হউক, এক্ষণে যত দূর দেখা যায়, তাহাতে গ্রীকদিগের গৃহীত ও

একবার, লোকসমিতি ও লোকের এ সম্বন্ধে ভ্রান্তবুদ্ধি কতদূর! থিবা নগরে, ইটিওক্লিস ও পলীনিকস্, এই ভ্রাতৃদ্বয়ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাষ্টর এবং পলক্ষ স্পার্টা নগরে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্লেটো (*Repub.* 16—21), হোমারাদির বর্ণিত দেবচরিত্র দূষিত বলিয়া, নূতন দেব ও দেবচরিত্র নির্ম্মাণার্থে আইন প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। গ্রীসীয় দেববর্গের কতক অংশ মিসর, থ্রেস, ফ্রাইজিয়া লিডীয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও গৃহীত হয় (Grote's *Greece*, Vol. i. 32—33).

মানিত দেবতা ত্রিবিধ প্রকারে উৎপন্ন ;—প্রথমতঃ, যে সকল দেবতা প্রাচীন কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় উপাসিত হইয়া আসিতেছে; দ্বিতীয়তঃ, লোকসমিতির অনুজ্ঞাক্রমে যে সকল মানুষ দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ; তৃতীয়তঃ, ব্যবহারিক নিয়মের কার্য্যবশে এবং লোকসমিতির অনুজ্ঞাক্রমেও বটে, যে সকল দেবতা বিজাতীয় ক্ষেত্র হইতে গ্রীকজাতীয় ক্ষেত্রে আনীত হইয়াছে।৩ ঐরূপ হিন্দুদিগের দেবতা সকলও, দেখা যায় যে, এই দ্বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন ;—প্রথমতঃ

৩। গ্রীকদিগের দেবতাগণ ও দেবতত্ত্ব কোথা হইতে ও কিরূপে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে নানা জনের নানা মত দৃষ্ট হয়। ফরাসী আবে বালিয়ার এবং জর্ম্মান হগ ও বুটিগেরের মতে, মিসরীয় ও গ্রীসীয় অতি প্রাচীন ইতিহাসই, অলঙ্কারযুক্ত ও অমানুষিক বর্ণনাযোগে, দেবতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং গ্রীসীয় দেবতাগণ অতি প্রাচীন ও অসাধারণ চরিত্রের মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। রুডবেকের বিশ্বাসে গ্রীসীয় দেবতাগণ, স্কান্দিনেবিয়ার প্রাচীন দেবতা সকলের রূপান্তরিত মূর্ত্তিমাত্র। বথার্ট ও ব্রাইয়াণ্ট প্রভৃতির মতে, পুরাতন বাইবেলোক্ত ইতিহাসের রূপান্তর-কল্পনায় গ্রীসীয় দেবতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার পককনামক ইংরেজের মতে (India in Greece নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) মিসর, গ্রীস, আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান, ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মবিপ্লবে বিতাড়িত হিন্দুগণের দ্বারা অধিবাসিত, সুতরাং গ্রীসীয় দেবতত্ত্ব ভারতীয় আদিম দেবতত্ত্বেরই রূপান্তর মূর্ত্তিমাত্র। বলা বাহুল্য যে, এ সকল মত তাদৃশ সমাচিন নহে। তবে গ্রীকেরা মিসর ও পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর দেশ হইতে যে কোন কোন দেবতাদি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা,সাধারণ গ্রীক দেবতত্ত্ব যাহা তাহা জাতীয় সম্পত্তি ও মানবীয় যথাস্বভাব বশে উৎপন্ন হইয়াছিল। সমস্ত পুরাণের মধ্যে বাইবেল-ইতিহাসের সহ সাদৃশ্য আর কোথাও দেখিতে পাই না, কেবল এই দুই ঘটনায়—(১) ডুকালিওনের সাময়িক পৃথিবী জলে প্লাবিত হওন, বাইবেলোক্ত নোয়ার জলপ্লাবনের সহ সাদৃশ্যযুক্ত ; (২) পাপপূর্ণ ফ্রাইজিয়ানগরধ্বংসার্থে জিউস ও হার্মিসের তথায় গমন, ফিলেমন ও তাহার স্ত্রী বাউকিসের গৃহে আশ্রয় লওন, নগরধ্বংসকালে ফিলেমন ও তাহার স্ত্রীকে পলাইতে উপদেশ দিয়া রক্ষা করণ এবং তাহার পর নগরধ্বংসান্তে দম্পতীদ্বয় তথায় গমনেচ্ছুক হইলে, তাহাদিগকে বৃক্ষাকারে পরিণত করিয়া শাস্তি দেওন। এই উপাখ্যানের, বাইবেলোক্ত লট ও তাহার স্ত্রী এবং সডম ও গমোরা নগরের ধ্বংস বৃত্তান্ত সহ সাদৃশ্য আছে।

শাস্ত্রোক্ত দেবতা; দ্বিতীয়তঃ অতর্কিত ভাবে মানুষে আরোপিত দেবত্ব, কিন্তু এ শেষোক্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত সামান্য এবং কালে তাহারাও শাস্ত্রোক্ত দেবতার আকার ধারণ করিয়াছিল।

উপরে বলিয়াছি যে, গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিদ্যা জ্ঞাত ও জানত ভাবেই মানবীয় উপায়ে উৎপন্ন;—কবির মুখে,লোকের মুখে, এবং কতক পরিমাণে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীদিগের স্ব স্ব মনেও বটে। ৪ হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিদ্যাও

৪। হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ পুরাণাদির ন্যায়, গ্রীকদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল না। গ্রীকদিগের দেবচরিতবিষয়ক বর্ণনাপূর্ণ আদি গ্রন্থ, হোমারের নামাঙ্কিত ইলিয়দ ও ওডিসী নামক কাব্যদ্বয় এবং হোমারিকস্তোত্র নামে কতকগুলি স্তোত্র বিশেষ। হোমার নামে কেহ ছিল কি না, সন্দেহ; ফলতঃ গ্রীসে যাহা কিছু প্রাচীন রচনা, তাহাই হোমারের কৃত বলিয়া কথিত। যাহা হউক সে সকল কাব্যভাবেই রচিত এবং অধুনাতন কালে কাব্য বলিয়াই গৃহীত। হোমারের পরে হেসিওদের উৎপত্তি; ইহার কৃত থিওগণিতে সবিস্তারে দেববংশাবলী এবং "কর্ম্ম ও দিবা" (Works and Days) নামক পুস্তকে, সাংসারিক ও গার্হস্থ নীতি বর্ণিত হইয়াছে। হেসিওদ কৃত অন্যান্য পৌরাণিক রচনাও ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে "হিরাক্লিসের বর্ম্ম"নামক গাথা ছাড়া আর সকলই লোপ পাইয়াছে। হেসিওদের অব্যবহিত পরে উৎপন্ন অফিক দেববংশাবলীর বিবরণ আছে। কোন কোন মতে অফিক বিবরণ হোমারের অপেক্ষাও পুরাতন। কিন্তু অর্ফিউস্ নামে বস্তুতঃ কেহ ছিল কি না, তাহাই অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকে। হোমার হেসিওদাদির পর কিপ্রুসনিবাসী স্তাসিনোস্, মিলেতুস্নিবাসী আর্কেতিনোস্, লেস্বোস্নিবাসী লেস্থেস্, পিওসনিবাসী কিনিথোস্ এবং করিন্থনিবাসী ইউমেলোস্, ইহারা অনেক দেবগাথা রচনা করিয়াছিল। এই সকলই, গ্রীকদিগের দেবতত্ত্ব সম্বলিত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পর গ্রীসের গৌরবান্বিত সময়ের, অর্থাৎ মাকিদুনিয়ার অধিপতি আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক কবিগণের দেববিষয়ক রচনাও নিতান্ত নগণিত ছিল না। হোমার হইতে আরম্ভ করিয়া আলেকজাণ্ডারের সময় পর্য্যন্ত, দেবতত্ত্বাদি বিষয়ে যত কাব্য পুরাণ ও গাথা সকল রচিত হয়, সে সমস্ত, মিসরাধিপতি প্তলেমী ফিলাডেলফোসের রাজত্ব কালে এফিসোস্নিবাসী জেনোডোটস্ কর্ত্তৃক একত্রে সংগৃহীত হইয়া "এপিক সাইকেল" (Epic Cycle) নামে খ্যাত হয়; কিন্তু এ সংগ্রহগ্রন্থ এখন লোপ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল গ্রন্থোক্ত কোন বিষয়ই, কোন গ্রীকের পক্ষে অবশ্য

অবশ্য সেই মানবমুখে যে উৎপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে পক্ষে নিজ হিন্দু সাধারণের যে বিশ্বাস তাহা স্বতন্ত্র। তাহাদের বিশ্বাসে, তাহাদের ধর্ম্মবিদ্যার প্রধান অংশ যাহা তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট ও ঐশ্বরিক উপায়ে উৎপন্ন; কেবল তদিতর অংশমাত্র মানবমুখনিঃসৃত, কিন্তু সেও যেমন তেমন মানুষ নহে—দেববৎ বা দেবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ হিন্দুর এবম্বিধ বিশ্বাস নিতান্ত যে অমূলক তাহা নহে; যেহেতু হিন্দু ধর্ম্মবিদ্যার প্রণেতা যাহারা, তাহারা প্রকৃতই ঈশ্বরের সহ একতানতা-সম্পন্ন দিব্যপ্রকৃতি ঋষি এবং ঋষিকল্প কবি সকল। হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ যেমন অসংখ্য, তেমনি সকল বিষয়ই গ্রন্থবদ্ধ থাকায়, অনুষ্ঠানকারিগণ আপন মনের সাহায্যে বা স্বীয় ইচ্ছামত কিছুই করিতে পাইত না; সুতরাং অনুষ্ঠানপর্ব্বে গ্রীকদিগের ন্যায় অস্থিরতা কোথাও ছিল না এবং সেই জন্য, অনুষ্ঠানকারীদের অনুষ্ঠান হেতু গ্রীকধর্ম্মবিদ্যায় যেমন অনেক নূতন বিষয় প্রবেশ করিতে ও সঞ্চিত হইতে পাইয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মবিদ্যায় তাহা পায় নাই। পুনশ্চ হিন্দুর অপৌরুষেয় গ্রন্থ ও গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল যদিও ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নামে নামিত বটে, কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাসে সে সকল ঋষি প্রকৃত তাহাদের রচয়িতা নহে;—গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল বস্তুত ঈশ্বরবাক্য, কেবল সেই সকল ঋষির মুখ দিয়া প্রচারিত হইয়াছে এইমাত্র সম্বন্ধ।

ধর্ম্মবিদ্যার উৎপত্তিতত্ত্ব যেরূপ আলোচিত হইল, তাহাতেই প্রতীত হইবে যে, ধর্ম্মবিদ্যা সম্বন্ধে কোন্ জাতির ধারণা ও বুদ্ধি কতদূর উচ্চ বা

পালনীয় বোধে সর্ব্বদা পালনীয় ছিল না; কোন গ্রন্থেরই অবশ্যপাল্য শক্তি ছিল না। প্রতিরাজ্যের রাজসমিতি, যে যে গ্রন্থের যে অংশ, যে যে দেবতা ও যে যে অনুষ্ঠান অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্থির করিত; তাহাই কেবল সেই রাজ্যস্থ লোকদিগের পক্ষে অবশ্যপালনীয় হইত। অতএব ধর্ম্মগ্রন্থাদির যে অবশ্যপাল্যশক্তি, তাহা রাজ-সমিতির অনুজ্ঞার উপর নির্ভর করিত।—কি গূঢ় ধর্ম্মভাবের পরিচয়! পুনশ্চ, হিন্দুর বেদপুরাণাদির পার্শ্বে, এই সকল গ্রীক ধর্ম্মগ্রন্থের উল্লেখ করিতে লজ্জাই বোধ হয়। বেদ উপনিষদাদির তুলনে সামান্য কাব্যনাটকের যে অন্তরতা, হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থের নিকট গ্রীক ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তরতা তদপেক্ষা কম কোথায়?

তদন্তর; ধর্ম্মবিদ্যায় স্থিরতা বা অস্থিরতা কাহার কত এবং তদ্দ্বারা কোন্ জাতির প্রকৃতি কিরূপ পরিচিত হইতেছে। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন, সংসারসুখমুগ্ধ বৈষয়িক বা আধিভৌতিক জীবনসহ সংমিলনেই কার্য্য করিয়া থাকে; তদুভয়ের সংমিলন একেবারে কখনও বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। তবে কি না জীবনকার্য্যে উহারই মধ্যে যাহার আধিক্য, তাহারই প্রাধান্য প্রতিফলিত এবং ঘোষিত হয়। এ হিসাবে হিন্দুজীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাধান্য; আর গ্রীকজীবনে? তদ্রূপ আধিভৌতিক জীবনের প্রাধান্য। হিন্দুগণ আধ্যাত্মিকতার জন্য অনেক পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং করিতে পারিত; গ্রীক তাহা করে নাই এবং করিতে পারিতও না। গ্রীকদিগের মধ্যে, হিন্দু ঋষি এবং বেদগ্রাহকস্থলীয় যাহারা, হিন্দু হয়ত তাহাদের অনুষ্ঠানচরিত ও কথা সকল শুনিয়া হাসিয়াই আকুল হইবে এবং হাসিয়াও ছিল একদিন;—দূরকালিক ঐতিহাসিক টুকরা সকলে সে হাসির কিছু কিছু পরিচয় এখনও না পাওয়া যায় এমন নহে। যাহা হউক, অতঃপর জাতিদ্বয়ের জাতীয় ধর্ম্মবিদ্যা সংসারে আদি-প্রবেশ বিষয়ক একটু তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

মানবের মনুষ্যত্ব প্রধানতঃ নীতি হইতে। নীতির সঞ্চারে আধ্যাত্মিক জীবনের সঞ্চার, এবং নীতির পরিবর্দ্ধনে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্দ্ধন। ইহাদের এক অপরকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্দ্ধনে মনুষ্যত্বের উপস্থিতি হইয়া থাকে। পশু এবং মানব, এতদুভয়ের সমভোগ্য সাধারণ আধিভৌতিক জীবনের উপর অধিকন্তু ভাবে, এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপস্থাপন হেতুই, আধিভৌতিক-জীবনভোগী পশু হইতে, মানবীয় জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব। মানবজীবনের একমাত্র সুমহান্ এবং মুখ্য উদ্দেশ্য যে কর্ম্ম, এই নীতিই কর্ত্তব্যবুদ্ধিরূপে তাহার প্রবর্ত্তক এবং বিধিরূপে তাহার নিয়ামক। নীতির উৎপত্তি ধর্ম্ম হইতে এবং ধর্ম্মের উহা এক মুখ্য

সহচর ও ধর্ম্মাংশ স্বরূপ। এই পৃথিবীতলে যে যে স্থলে মনুষ্য বলিয়া জীবের সঞ্চার আছে, তথায়ই, যে কোন আকারে হউক, ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে। দাব্রিজফার আদি বহুতর পরিব্রাজক কহিয়া থাকে, তাহারা এই জগতে আবিপোণ আদি এমন অনেক জাতি দেখিয়াছে যে, যাহাদের কোনরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব নাই। সে কথা শুনিও না। তাহারা যে ধর্ম্মতত্ত্বের অভাব দেখিয়া সেরূপ. রটনা করিয়া থাকে, তাহা সেই তাহাদিগের আপন আপন ধারণার বিষয়ীভূত ধর্ম্মের। নতুবা, আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, আজি পর্য্যন্ত এমন কথা কেহ আসিয়া শুনাইতে পারে নাই যে, যথায় মানবজীবনে কোন না কোন প্রকার লোকাতীত শক্তির প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বাসে নির্ভরতা, এবং নির্ভরতার ভাবানুরূপ নীতির অভাব দৃষ্ট হয়। তবে এ কথা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতিবিশেষে, পালনীয় ধর্ম্মের আকার প্রকার, হীনতা বা উৎকর্ষভাব, গভীরতা ও প্রশস্ততা, ইত্যাদি বিষয়ে বহুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু সে যতই হউক ও সেই সেই ধর্ম্ম যে প্রকারেরই থাকুক, তাহা যে তত্তৎ ব্যক্তি এবং জাতির জ্ঞানজীবন,জীবনের উদ্দেশ্যভূত পালনীয় কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষমতা,জীবনের সুখ দুঃখ এবং শুভাশুভ বোধ, ইত্যাদির পরিচালকতা পক্ষে প্রচুর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ; এক কথায় যেমন মানুষ, যেমন জ্ঞান, ধর্ম্মও তাহার তদ্রূপ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তোমার গির্জা এবং মন্দির এবং তোমার ধর্ম্মভাবোৎপন্ন যথোপযুক্ত শুভাশুভ, ইত্যাদির কল্যাণে তুমি যেমন জীবিত রহিয়াছ; তাহারা কখন তদ্রূপ জীবিত থাকিতে পারিত না। পাপে মৃত্যু, ধর্ম্মে জীবন। পুনশ্চ, তোমরা ভাবিতেছ, তাহাদের জ্ঞানধর্ম্মাদি যেমনই হউক, তাহা অবশ্য অপূর্ণ ; কারণ দেখা যাইতেছে যে, তাহারা বড় কষ্টে আছে। তুমি এরূপ ভাবিতেছ বটে, কিন্তু তাহারা তাহা ভাবে না। ঈশ্বর তাঁহার ছোট বড় সকল কর্ম্মকারকের পক্ষেই, তাহাদের যথাপ্রাপ্ত স্ব স্ব ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জ্ঞান ও অনুভবশক্তির সীমান্তমধ্যে, অনুরূপ চিত্তপ্রবোধক এবং জীবনের

অবলম্বন স্বরূপ উপায় সকল ও তদুৎপন্ন তৃপ্তির বিধান করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গারাম, তুমি বলিবে কত কত জাতি চুরী করিতেছে, মানুষ মারিতেছে, মানুষ খাইতেছে, এবং ধর্ম্ম লইয়াও কাটাকাটি করিতেছে, অথচ তাহারা সেরূপ করাকে অধর্ম্ম ভাবে না; তবে সে সকল কোন্ মঙ্গলকর ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মের ফল? তাহাই হউক, মানুষ মারুক, মানুষ খাউক, কাটাকাটি করুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। উচ্চ আদর্শ-সীমায় উঠা পর্য্যন্ত, অজ্ঞদিগের মানুষমারা, মানুষ খাওয়া প্রভৃতি যে সকল অসৎ-দৃষ্ট কার্য্য,প্রকৃতি তাঁহার উৎপত্তি-ক্ষয়াদি-বিধায়ক শক্তি দ্বারা স্বয়ং সে সকলের হরণ পূরণ ও নিরাকরণ করিয়া থাকেন। মানসিক ধারণার অতিরিক্ত এবং অনধীন কার্য্যে, মানব হিতাহিত-বুদ্ধিশক্তি-শূন্য;—ধারণাধীন কার্য্যেই পাপ-পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। ধারণার অনধীনে যে সকল কার্য্য কৃত, তাহা প্রকৃতিক্ষেত্রে প্রকৃতি-কারকতায় বিলীন হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়। হয়ত বন যেথানে দাবানলে দহিত, মানুষ যেথানে প্রাকৃতিক বিঘটনে মরিত; প্রকৃতি সেখানে সে সকলের পরিবর্ত্তে অজ্ঞ নরাকার নিমিত্তবিশেষ প্রয়োগ করিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। ধারণার সীমা পর্য্যন্তেই, আধ্যাত্মিক জবাবদিহিতা এবং ধর্ম্ম-ধারণার বিকাশ। অতএব অজ্ঞদিগের পক্ষে আপাততঃ যে পর্য্যন্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া কর্ম্মসংসারের যে কর্ম্মটুকু তাহাদের দ্বারা লওয়ার আবশ্যক তাহা সচ্ছন্দে লওয়া যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ অনুরূপ সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবুদ্ধি ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাহার অতিরিক্ত যে সকল কার্য্য, সময়ে তাহার নিমিত্ত উন্নত ধর্ম্মবুদ্ধি ও সময়ে তাহা নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। ফলাফলের যথায় সীমা নাই, গতি যথায় অনন্ত, তখন অসৎনিরাকরণ ও কর্ম্ম হরণ-পূরণ জন্য এত চিন্তা কি? গতি ঊর্দ্ধমুখে; অপকর্ম্ম সকল প্রায়শ্চিত্ত সহ ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। আরও একটা কথা, যদি সকলেরই শেষ এইথানে হইত, তাহা হইলেও না হয় একদিন তোমার কথা শুনিতাম ও

তোমার কথা লইয়া ভাবিতাম। কিন্তু তাহা নহে। বাঞ্ছারাম, এক্ষণে তোমার সম্বন্ধে এই বলি যে, অন্যের কিরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারণা তাহা লইয়া তোমার কার্য্য নহে; তুমি তোমার মনীষাশক্তির ঊর্দ্ধতম চালনে বা অন্যের প্রদর্শনে আপনার মনে কতদূর ধারণা করিতে পারিয়া থাক, তাহা লইয়া তোমার কার্য্য। সেই ধারণা মত সাত্ত্বিক ভাবে কার্য্য করিও, প্রচুর হইবে। অসভ্যদিগের একটি বড় গুণ, তাহা তোমাতে কিন্তু বড় একটা দেখিতে পাই না;—ভালয় হউক মন্দয় হউক, অসাত্ত্বিক ভাব কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। যাহা করে, তাহাই পূর্ণচিত্তে ও যথাস্বভাবে। তুমি তাহা পার না? ছি ছি! তোমার বুদ্ধি ও হিতাহিত বোধের আধিক্য হেতু শেষে 'বাঁশবনে ডোম কাণা,' হইয়া গিয়াছ?

কাষ্ঠে অগ্নিসংগ্রহ সুপ্তভাবে সর্ব্বদাই আছে। কাষ্ঠের প্রকার-ভেদে, যে যে কাষ্ঠ যে পরিমাণে সূর্য্যতাপ অগ্নিরূপে সংগ্রহ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দহ্যগুণবিশিষ্ট। সংঘর্ষ বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গযোগে সেই অগ্নি জাগরিত বা উদ্দীপিত হয়। সকল কাষ্ঠেই অগ্নি সমানভাবে উদ্দীপিত হয় না, কোথাও ধোঁয়া, কোথাও ধীরে, কোথাও একবারে উদ্দীপিত হয়; আবার কোথাও বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতায় ও আকাশের সংস্রবে, উদ্দীপিত অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়া অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট হইয়া থাকে। মানবে ধর্ম্মপদার্থ তদ্রূপ, বিভিন্ন জাতি ব্যক্তি বা শ্রেণী-ভেদে যথাকর্ম্মসূত্রানুরূপ বিভিন্ন পরিমাণে নিহিত। আত্মচিন্তা প্রভাবে বা উপদেশ সহযোগে, পাত্র অনুসারে, অনুরূপ উদ্দীপিত হইয়া অনুরূপ তেজধারণে কার্য্যকরী হয়; আবার অনেক স্থলে উদ্দীপিত হইয়াও প্রতিকূল কারণযোগে নির্ব্বাপিত হইয়া অঙ্গারাবশিষ্ট হইয়া থাকে,—ইহারাই এ জগতে নাস্তিক ও পাষণ্ড নামে খ্যাত। যদি কোথাও পুনঃ সর্ব্বদেব-ঋত্বিক অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান প্রকটিত না হইয়া সুপ্তভাবেই থাকেন, তথাপি কাষ্ঠ অব্যবহারে যায় না। সুধু কাষ্ঠের নানারূপ ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা যখন আছে, তখন অপ্রকটিত-

ধৰ্ম্ম অসভ্য জাতির প্রয়োজনীয়তা না থাকিবে কেন, এবং কেমন করিয়াই বা বলিবে যে, সে একেবারে ধর্ম্মপদার্থের অস্তিত্বপরিশূন্য! সকল প্রকারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারসমষ্টি লইয়াই জগৎ ও জাগতিক ক্রিয়া। কিন্তু এক কথা আছে বাঞ্ছারাম, কখন কখন এমন বিসদৃশ দৃশ্যও দেখা যায় যে, অপ্রকটিত-অগ্নি কাষ্ঠ এবং দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গার, এ দুয়ের মধ্যে অঙ্গারের প্রয়োজনাধিক্য অধিক; মনে কর যেন কাঁচা ভেরেণ্ডাকাষ্ঠ আর তেঁতুল কাঠের অঙ্গার; ইহাকে কি বলা যাইবে বল দেখি?— উৰ্দ্ধ সংখ্যায় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রথমটা শ্রেষ্ঠ শ্রেণির অপকৃষ্টাংশ, আর দ্বিতীয়টা অপকৃষ্ট শ্রেণির উৎকৃষ্টাংশ মাত্র! সে যাহা হউক, সুমার্জ্জিত নাস্তিক পাষণ্ড অপেক্ষা অমার্জ্জিত ও অপ্রকটিত-ধর্ম্ম অসভ্য বর্ব্বরও ভাল; যেহেতু একের পক্ষে এখনও আশা আছে, আর অপরে তাহা নাই।

কিন্তু স্বভাব-নাস্তিক বা স্বভাবতঃ ধর্ম্মহীন এ জগতে কি কেহ আছে? 'অমুক ব্যক্তি বা জাতি ধর্ম্মহীন' এ কথা কি অশ্রদ্ধেয়, শুনিবার কি অযোগ্য কথা! পুনর্ব্বার বলিতেছি, মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল নীতি, নীতির মূল ধর্ম্ম, অথবা সহজ কথায়, কর্ম্মের মূল ধর্ম্ম; যথায় ধর্ম্ম নাই তথায় কর্ম্মও নাই, কর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্যজীবন উদ্দেশ্য-শূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য বস্তু এ জগতে তিষ্ঠে না, তখনই তাহার লয় হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম যথায় দৃষ্ট হয়, তথন অবশ্য বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মও তথায় আছে। এ জগতে স্বভাব-নাস্তিক নাই, হাজারও পণ্ডিত হাজার বার এ কথা বলিয়া গিয়াছেন; আমি হাজারের উপর আর এক-বার বলিব, এ জগতে স্বভাব-নাস্তিক নাই। যাহাদিগকে সচরাচর নাস্তিক বলা যায়, তাহাদের আপন বুদ্ধিবিপাকে ও লোকে তাহাদের প্রতি সেই বুদ্ধিবিপাক হেতু নাস্তিকার্থ-বোধক শব্দ প্রয়োগ করে বলিয়া, তাহারা নাস্তিক নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। তাহারা বুদ্ধিদোষে স্বীয় আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে চাপা দিয়া কৃত্রিম প্রকৃতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক, নাস্তিকতা ও পাষণ্ডপণার মুখোস্ লইয়া ফিরে মাত্র।

তোমার চার্ব্বাকদর্শন, কোম্‌তে দর্শন, সৌখীন আসবাবের মধ্যে জানিও; সময়কালে কিন্তু সেই "রাধেকৃষ্ণ" বা সময়ের অতীত পুরুষ যিনি ও সময় যাঁহাতে নিরস্তকুহক হইয়া থাকে, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এ জগতে যে কেহ হাজার নাস্তিক বা কুকর্ম্মশীল হউক, যতক্ষণ দেখিবে সে জীবিত রহিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, ততক্ষণ জানিও, সে দেখিতে পাউক বা না পাউক, অথবা তুমিই দেখিতে পাও বা না পাও, ধর্ম্ম তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। সে দগ্ধ অঙ্গার, অঙ্গারেও অগ্নি কিছু কিছু সুপ্তভাবে থাকেন। তবে কথা এই, সেরূপ ধর্ম্মে বা সেরূপ কর্ম্মে জীবনের উদ্দেশ্য সফল বলিতে পারা যায় না। সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য যাহাকে শক্তি প্রদান করা হইয়াছে, সে যদি গোষ্পদ ছেঁচিয়া পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করে, তাহাকে লোকতঃ অলোকতঃ কোন রকমেই শক্তির সার্থকতা বলা যায় না। অসভ্য মানব যে, সে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির অভাবে তাহার সেই সামান্য বুদ্ধি প্রাণপণে পরিচালিত করিয়াই, শ্রেষ্ঠের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

ধর্ম্মবুদ্ধি মানবের আভ্যন্তরীণ পদার্থ, বহির্জগতের সহিত সংস্রবে রূপ প্রাপ্ত হয়। বহির্জগৎ যখন অন্তর্জগৎ সহ আসিয়া একমিল এবং একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই এই রূপের সঞ্চার হইয়া থকে। এই রূপের প্রতিপ্রসবে কর্ম্ম। রূপের পরিমাণ ও প্রকৃতি আদি, কথিত উভয় জগতের মিলনের পরিমাণ ও প্রকার অনুসারে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যতক্ষণ না অন্তর্জগৎ বহির্জগতের সহিত মিলিত হইবে, ততক্ষণ অন্তর্জগৎ বা আত্মিক জীবন দৃষ্টি-শূন্য। এই মিলনের প্রথম সংঘটনে জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মিলিত হয়, এবং ভাবী গুরুতর মিলনের জন্য বহির্জগৎস্থ বিষয় সংগ্রহার্থে দৃষ্টি প্রসারিত হইতে থাকে। এই প্রসারিত দৃষ্টি-দৃষ্ট বিষয় যত সংগৃহীত হইয়া আইসে, ততই অন্তর্জগৎ বিস্ফারিত সুতরাং ততই ধর্ম্মবোধের কলেবর বৃদ্ধি হয়, এবং সেই কলেবরবৃদ্ধি হইতে আবার অনুরূপ পুষ্টতর কর্ম্মের উৎপাদন হইয়া থাকে। অথবা উপমায় বলিতে গেলে, কর্ম্ম ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ, ধর্ম্ম তাহার স্কন্ধ, অন্তর্জগৎ

মূল, বহির্জগৎ পরিপোষক রসাদি। কথিত দৃষ্টিসঞ্চালনকে সাধারণতঃ দূরদর্শন বলে; সেই দৃষ্টি আরও গুরুতর হইলে তাহা কবিত্ব, এবং গুরুতম হইলে ঋষিত্ব; ঋষির মুখেই ধর্ম্মপ্রচার হইয়া থাকে। আর সেই দৃষ্টি-উপার্জ্জিত বিষয় সকলকে যাহারা গুণবিশ্লেষণে বুঝাইয়া দেয়, তাহারা তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্ববিৎ। সাধারণ দৃষ্টি যাহাদের সম্পত্তি, তাহারা দূরদর্শী; যাহারা তাহাদের সেই দূরদর্শনকে কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণ কথায় "কাজের লোক।" গুরুতর দর্শক যাহারা তাহারা কবি; তাহাদের উদ্ভাবিত বিষয় যাহারা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে তাহারা জ্ঞানী। গুরুতম দর্শক যাহারা তাহারা ঋষি; এবং যাহারা সেই ঋষিবাক্য কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, তাহারা ধার্ম্মিক। কিন্তু হতভাগ্য তাহারা, যাহারা দৃষ্টিশূন্য অথবা দৃষ্টি-দৃষ্ট বিষয় গ্রহণ এবং অনুসরণেও অক্ষম। সেই হতভাগ্যেরা বহির্জ্জগৎকে অন্তর্জ্জগতের সহিত না মিলাইয়া, বা তাহাদের মিলন অনুভব করিতে না পারিয়া, বহির্জ্জগৎকে বাহিরে রাখিয়া বাহিরে বাহিরেই তাহাকে ক্রীড়াপদার্থের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা দৃষ্টিশূন্য অন্ধের ন্যায়, অপার আয়োজনযোগ্য প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব-ঘূর্ণিত হইয়া উন্মাদবৎ ফিরিতে থাকে এবং প্রতিকূল ঘাত-প্রতিঘাতে মুহ্যমান হইয়া শেষে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হয়। তাহাদের যে কোন কার্য্য অন্তঃস্থল হইতে জ্ঞান ও বিশ্বাসযোগে উৎপন্ন হয় না, সময়ের রোষতোষাপেক্ষী বিকৃত বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহা অসাত্ত্বিক এবং মিথ্যা; তাহা কর্ম্ম নহে, কর্ম্ম-মরীচিকা-মাত্র। যেমন উৎপন্ন হইতেছে, এবং উৎপন্ন হয়ও অনেক, তেমনি আবার পরমুহূর্ত্তে চিহ্নমাত্রশূন্য হইয়া বিলীন হইতেছে; এবং বিলীন হইবার কালে উন্মাদকে যেন আরও উন্মাদিত করিয়া যাইতেছে। এরূপ দৃষ্টিশূন্য অন্ধের যে কিছু অনুষ্ঠান, তাহা বস্তুত প্রলয়-প্রতিরূপ। আমা-দিগের আধুনিক জাতীয় জীবনের বহুলাংশে এই দশা,—সেই প্রলয়-প্রতিরূপের অভিনয় হইয়া থাকে। এখানে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা,

যে কিছু বিষয়, সমস্তই বাহ্যভাবাপন্ন ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ; আভ্যন্তরীণ ও সাত্ত্বিক এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই; সকলই বাহ্য শোভা বা বাহ্য অলঙ্কারস্থলীয়, সকৃৎ জ্যোতির্বিভাসিত আত্মভূ ও আপ্ত পদার্থ নহে।

ধর্ম্মই কর্ম্মমূল বটে, কিন্তু তা বলিয়া সকল ধর্ম্মও এক নহে, সকল কর্ম্মও এক নহে। নানা প্রকৃতিবিশিষ্ট অন্তর্জগৎ, নানারূপবিশিষ্ট বহির্জগৎ; যখন যে প্রকৃতি যেরূপ রূপের সহ সংমিলিত হয়, তখন প্রসারিত দৃষ্টিও তদভিগামিনী হইয়া থাকে। অনুরূপ দৃষ্টি হইতে অনুরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি; এবং অনুরূপ ধর্ম্ম হইতে অনুরূপ কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। সুতরাং দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে, ধর্ম্ম এবং কর্ম্মে নানা পার্থক্য আসিয়া জুটে এবং মূলকারণের উচ্চেতর ভাব অনুসারে ধর্ম্ম ও কর্ম্মে উত্তম-অধম ভেদে নানা পর্য্যায় ও শ্রেণিভেদ হয়। যে দৃষ্টি ইহলৌকিক বিষয়ে প্রসারিত, তদুৎপন্ন ধর্ম্মকে লৌকিক ধর্ম্ম বলে; যাহা পারলৌকিক বিষয়ে প্রসারিত, তাহাকে পারলৌকিক ধর্ম্ম বলে। এই উভয়বিধ ধর্ম্মই লোকমনে তিষ্ঠিয়া থাকে; কিন্তু তখনই তাহারা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কারণ হয়, এবং তখনই তাহাকে পূর্ণধর্ম্ম বলা যায়, যখন উভয়ে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য সংমিলিত হইয়া চিত্তমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কখনও সম্পূর্ণ ভাবে পৃথিবীতে ঘটিয়া উঠে নাই, এবং পৃথিবীও তাহার জন্য আজি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। পৃথিবীতে এখনও একতর প্রাধান্যযুক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য, হয় লৌকিক নয় পারলৌকিক। প্রচীন যুগের ভারতীয় ধর্ম্ম অতিপারলৌকি, গ্রীকধর্ম্ম অতিলৌকিক। যাহা হউক, জগতে সত্বরেই এক দিন আসিবে, যে দিন এই লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় আসিয়া একতায় মিলিত হইয়া,লৌকিক ও পারলৌকিক প্রভেদশূন্য হইবে। সেই দিনের পর হইতেই জগতে নূতন পৃথিবী বিরাজ করিতে থাকিবে; স্বর্গ ও পৃথিবীর উভয় সংমিলনে, স্বর্গপ্রিয়গণ স্বচ্ছন্দে উভয়লোকে বিচরণ করিয়া ফিরিবে। উহাকে মানবীয় আত্মিক উন্নতির চরম পুরস্কার বলিলে বলা যায়। কিন্তু এখনও সে দিন দূরে!

—দূর হইলেও, সে সর্ব্বসুন্দর মহাধর্ম্মের সর্ব্বসুন্দর মহাশাস্ত্র যাহা, তাহা জগতে অনেক দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে এবং এখনও তাহা সম্যক্ অনুভূত বা অনুষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। সে শাস্ত্র ?— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা !

আত্মিক উন্নতি যখন যাহার যেরূপ, তাহার সেই অবস্থার উপযুক্ত যাহা, তাহার অতিরিক্তে চাপাচাপি করিয়া যে কোন প্রকারের ধর্ম্মে তাহাকে দীক্ষিত করা যাউক না কেন ; সে তখনই তাহাকে আপন প্রকৃতি ও জ্ঞানের সমতায় আনিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত মুসলমান ও খৃষ্টানগণ। যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদ উভয়ই ধর্ম্মপ্রচারক ; কিন্তু একজন বিনীত আর একজন উদ্ধত ; অথবা অন্য কথায় এক-জনের প্রচারকার্য্য পারলৌকিক বা আত্মিক ভাবে, আর একজনের প্রচারকার্য্য লৌকিক বা সাংসারিক ভাবে। ইহলোক-সুখ-প্রার্থী মুসলমানেরা দেখ স্বধর্ম্মে কতই আগ্রহবান ও অটল ; তাহার কারণ, অবলম্বিতধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতি সহ সমতাপন্ন। আর আধুনিক খৃষ্টশিষ্যেরা ? তাহারাও অনুরূপসুখপ্রার্থী, অথচ খৃষ্টধর্ম্ম তাহাদের উপর চাপান, সুতরাং খৃষ্টান হইয়াও ইহারা খৃষ্টান নহে ;—ক্লোবিসের ন্যায় খৃষ্টান, স্বদলবলে খৃষ্টের আত্মবলির সময় যদি উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে খৃষ্টের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইত ! খৃষ্টের শিক্ষা আত্মবলি, কিন্তু খৃষ্টশিষ্যেরা বুঝে পরবলি ; ধর্ম্ম ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেও, অসুবিধা দেখিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম ভিন্ন তাহার আর কিছু গ্রহণ করিল না। খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেক স্থলে ও বিষয়বিশেষে, ধর্ম্মের আবরণ দিয়া না হয় এমন কার্য্যই নাই। ইতিহাস যদি মিথ্যা না বলে, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্মের নামে যত আত্মকলহ, যত বিবাদ বিসম্বাদ, যত রক্তারক্তি,যত কুক্রিয়া, যত নৃশংসতা,যত নিষ্ঠুরাচরণ ও যত পাপাচরণ, খৃষ্টশিষ্যগণের দ্বারা কৃত হইয়াছে ; তেমন আর কোন ধর্ম্মের নামে আর কোন ধর্ম্মশিষ্যগণের দ্বারা কৃত হয় নাই। যিশুখৃষ্ট যদিধর্ম্মপ্রাণ ভারতে জন্মিতেন, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার প্রকৃত সম্মান রক্ষা হইত।

সে যাহা হউক, আমরা কথায় কথায় মূল প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অতর্কিতভাবে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি; কার্য্যটা বোধ হয় ভাল হয় নাই। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি হউক্ বা জাতি হউক—এখানে আমাদের জাতি লইয়াই কথা, অতএব যে কোন জাতি হউক্—তাহার এ জগতে প্রকৃতি কি, উদ্দেশ্য কি, কার্য্য বা কি ও তৎ তৎ বিষয় তাহাদের হাতে কতদূর অনুসৃত, সম্পাদিত এবং সফলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে; এই সকলের আলোচনা ও মূল অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানে প্রবেশাধিকার লাভ, ইত্যাদিতে ইচ্ছা থাকিলে, সর্ব্বাগ্রে সেই জাতির ধর্ম্মজীবন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরাও তাহা করিতে যথাযথ চেষ্টা পাইব। আপাততঃ দেখা যাউক, দেবচরিতের দ্বারা উভয়জাতীয় গূঢ় চরিত কতটা অনুমিত হইতে পারে।

দেবচরিত।

ভারতে ভারতীয় মানবচিত্ত, ভারতের অদ্ভুত প্রকৃতিদর্শনে, বিস্ময়াভিভূত হইয়া ক্রমে মনস্তত্ত্ব এবং পারলৌকিক চিন্তায় এরূপ সমাহিত হইয়া আসিল যে, পর পর অদৃশ্য ভেদ করাই যেন মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীকচিত্তের ভাব সেরূপ নহে। দেখা যায় যে, প্রকৃতিবক্ষে যথায় যথায় হিন্দুর হস্ত বিস্ময়-আকুঞ্চিত, গ্রীকহস্ত তথায় তথায়ই প্রভূত বলদীপ্ত; বস্তুতঃ গ্রীক তাহার নিজ অহংতত্ত্ব ও স্বয়ং-স্বামিত্বই বুঝে ভাল। গ্রীকের নিকট পরলোক বা লোকাতীত শক্তি যত থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তাহার বড় একটা অধিক যায় আসে না; কিন্তু স্বীয় শক্তিসাধ্য আত্ম-ঐশ্বর্য্য এবং সুখ, ইহার স্বচ্ছন্দসম্ভোগে ইহ জীবন কাটাইতে পারিলেই তাহার পক্ষে জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করা হইল। গ্রীকদিগের কর্ম্মপ্রবাহ যাহা তাহার মূলস্থানকে, এই আধিভৌতিক সাংসারিক বুদ্ধি সামান্য উত্তেজিত করে নাই। বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় জীবন ঠিক ইহার বিপরীত। ভারতচিত্ত, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, চতুর্দ্দিকের যে কোন দিকে নেত্র

নিপতিত তথায়ই, যাবতীয় পার্শ্বস্থ বিষয়ে একমাত্র অদৃষ্টহস্তকে বলবান দেখিতে পাইতেন। প্রকৃতি, তাহাদের নিকট, সর্ব্বত্রই তাহার ভীষণ শক্তিপ্রবাহে পদে পদে মনুষ্যহস্তকে বিমুখ, বিতাড়িত এবং ভগ্নোদ্যম করিয়া দিতেছে। উর্দ্ধমুখে তাকাইতে গেলে এই ফল; ওদিকে নিম্ন-মুখে তাকাইতে গেলে ঘৃণিত দাসবর্গের ঘৃণিত জীবনাদর্শ সম্মুখে; সুতরাং নিম্নমুখে যে কিছু জীবনসুখ হেতু আশ্রয়ের অভিলাষ, তাহাও এই ঘৃণিত দাসবর্গের ঘৃণিত জীবনদর্শনে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। অতএব কোন দিকেই স্থান না পাইয়া, ভগ্নোদ্যম, ভগ্ন-শক্তি মানব, ভয়বিস্ময়ে আপ্লুতচিত্ত ও আত্মলুপ্ত হইয়া, অদৃষ্টহস্তে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। "আমি কে", "কোথা হইতে আসিয়াছি," "কেন এ সংসারে স্থিতি"—"আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি"—"কোথায় যাইব"—"এ বাহ্যজগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি"—এবং "কাহার আজ্ঞায় এই বাহ্যজগৎ পরিচালিত হইতেছে", নিরাশ্রয় মানবচিত্ত আকুলিত হইয়া এই সকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, নিগূঢ়ভাবে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। চিন্তারও সীমা নাই; আত্মলোপেরও সীমা নাই; সুতরাং চিত্তে শান্তির আশা কোথায়? চতুর্দ্দিকে, যে দিকে তাকাই, কেবল একমাত্র স্বচ্ছন্দতিমির-রাশি দিগ্বলয়কে বিনষ্ট করিয়া, বিকটবেশে যুগপৎ হৃদয়কে আকম্পিত ও আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর—তাহার উপর—তাহার উপর, তথাপি কোথাও তাহার সীমা দেখিতে পাই না। আশা-নিরাশা-সমপ্রায় অবলম্বন-ভ্রষ্ট কূলশূন্য কালতরঙ্গে কেবল হাবুডুবু খাইয়া হাহাকারমাত্র সার, সে হাহাকারের ঘোর ঘটা বারেক দেখিতে চাও কি? ঐ দেখ এক জন অতি প্রাচীন, কিন্তু তখনও নবাগত, বৈদিক ঋষি, কিরূপ দুর্জ্জয় পাথারে পতিত হইয়া, তরঙ্গতুফানগত বিষম ঘোগাবেশে কি হৃদয়োন্মাদক অস্ফুট চীৎকার করিতেছে! ঋষিটি মন্ত্রদ্রষ্টা, ভয়ে বিস্ময়ে 'গহনম্ গভীরম্'—ঘন ঘনান্ধকার প্রত্যক্ষ করিয়াই, সেরূপ চীৎকার করিয়াছিলেন। সে চীৎকারের ধ্বনি

এরূপ দিগন্ত-বিশ্রুত যে তাহার শব্দ, এত দূরে, এ নানা আবর্ত্তময় কালতরঙ্গ ভেদ করিয়াও, আমাদের কর্ণগত হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না;—"সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম, ইহার কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। বলিতে পার এ সকল কিসের দ্বারা আবরিত ছিল,—বা কাহার অভ্যন্তরেই বা এ সকলের বীজ নিহিত ছিল? যাহাতে আবরিত ছিল, তাহা কি জল?—না 'গহনম্ গভীরম্'? তখন হয়ত মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল না, রাত্রি বা দিবার প্রভেদ ছিল না, কেবল একমাত্র, যাহার অন্যতর বা ঊর্দ্ধে কেহ নাই, যিনি আপনাতেই নির্ভর করিয়া শ্বাসক্রীড়ায় নিরত, কেবল একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন। অগ্রে কেবল অন্ধকার গূঢ়তম অন্ধকারে আবৃত, এবং সর্ব্বত্র 'অপ্রকেতম্ সলিলম্' দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই একমাত্র, যিনি তুচ্ছের দ্বারা আবরিত ছিলেন এবং তপোদ্বারা পুষ্কতাযুক্ত হইয়াছিলেন; মনের প্রাথমিক বীজস্বরূপ কাম সর্ব্বাগ্রে তাহা হইতে উৎপন্ন হইল এবং কাম হইতে পুনঃ রেতঃ উৎপন্ন হইল। সদসতের সংযোগরজ্জু-স্বরূপ ইহার (সেই একমাত্র স্বরূপের) অবস্থিতি, কবিগণ আপনাপন অন্তকরণে বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগৎ-ব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত, তাহা কি অধঃ না উপরে অবস্থিত ছিল? রেতঃ, মহিমা এবং স্বধা কি নিম্নে ও মহাশক্তি কি ঊর্দ্ধে ছিল? এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কে ইহার সৃষ্টি করিল, কে জানে?—কে কহিতে পারে? দেবতারা কি পারেন? তাঁহারাত এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, অতএব তাঁহারাই বা কেমন করিয়া কহিবেন? অতএব কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে বলিবে? যাহারা সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছে, তাহাদের ত জানিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কি এ তত্ত্ব জানেন? হয়ত তিনি এ তত্ত্ব জানিতে পারেন, অথবা হয়ত তিনিও ইহা জানেন না।"—কি বিষম ঘোর বিঘূর্ণনে নিপতিত, কি চীৎকারের ঘটা! ৫

৫। ঋঃ বেঃ ১০ মঃ। ১২৯ সূঃ।

পিঞ্জরবদ্ধ মানবচিত্ত পিঞ্জরমুক্ত হইবার নিমিত্ত উন্মত্তবৎ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,—পিঞ্জরের দ্বার বদ্ধ। বিনষ্ট দিক-অন্ধকারে ভ্রান্ত পথিক নিদর্শনী আলোক-দর্শন-লালসায় এদিক ওদিক ধাবিত হইয়া কুশকাঁটায় রক্তারক্তি হইতেছে,—অথচ কোথাও নিদর্শনী আলোকের চিহ্নমাত্র নাই। আর্য্য-ঋষি যখন এই ঘোর চিন্তাতরঙ্গে পড়িয়া আকুলিত হইতেছেন, তখন এক বার গ্রীকচিত্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। হিন্দুচিত্ত যখন প্রকৃতি-করুণায় স্বচ্ছন্দে আহার-লালসাকে অতিক্রম করিয়া, জীবনের তদূর্দ্ধতর অবলম্বনের অনুসন্ধানে অচিন্তনীয়কে ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে; গ্রীকচিত্ত হয়ত তখনও আহারলালসাকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া, তাহার অনুসরণে নানা দিকে ছুটাছুটী করিয়া ফিরিতেছে। "সকল কর্ম্ম ফেলিয়া, আগে একটি ঘর, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি হাল গরু করিবে; স্ত্রীলোকটি যেন ক্রীতা, বিবাহিতা না হয়, এবং গবাদিচারণে পটু হয়।" "যে কিছু যন্ত্রাদির আবশ্যক তাহা ঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিও, নতুবা অন্যের কাছে চাহিলে যদি সে না দেয়, তবে তাহার অভাবে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সমস্ত শ্রম বিফল হইয়া যাইতে পারে।" অথবা, "গৃহ যাহাতে আহারীয় বস্তুতে পূর্ণ থাকে, এরূপ শ্রমে সন্তোষ লাভ করিতে শিখ। শ্রমেই লোকে ধনধান্যপূর্ণ ও স্বচ্ছলতাযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ শ্রমেই লোকে দেব ও মানবের প্রিয়পাত্র হয়।" যে হেসিওদ্‌ আপন ভ্রাতাকে এবং ভ্রাতার উপলক্ষে সমস্ত গ্রীকবর্গকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন;[৬] তাঁহার বর্ণিত সৃষ্টি ও দেবতত্ত্ব হয়ত তখনও ভবিষ্যতের দূরতম গর্ভে নিহিত ছিল।

প্রকৃতি যেখানে যতই ক্ষীণবেশে থাকুক, স্বীয় আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে মানবচিত্তে পারলৌকিক ভাবের কিছু না কিছু আবির্ভাব করিবেই করিবে; প্রভেদ কেবল প্রাকৃতিক মূর্ত্তির প্রকার অনুসারে আকর্ষণী শক্তির গুরুত্ব বা লঘুত্ব ও প্রকরণাদিভেদে, বিভীষিকা

৬। Hesiod, Works and Days, 309-312, 407-409.

ও বিস্ময়াদি ঔপসর্গিক বিষয়ের ন্যূনেতর ভাব এবং ধারণা ও বিশ্বাসে বিভিন্নতা ও বিপুলতা বা ন্যূনতা আদি শ্রেণীভেদ মাত্র। অতএব গ্রীকচিত্ত যখন দেখিল যে, পারলৌকিক ভাব-আবির্ভাবের হাত হইতে আর কোন রকমে ছাড়াইবার যো নাই, তখন যাহা হউক তাহার একটা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক; নতুবা চিত্ত প্রবোধ মানিতেছে না। ভাল! তাহাই হইবে। ইহারা আদত কাজের লোক, হাতে হাতে ফল চাহি,—হাতে হাতে অসাব্যস্তের নিরাকরণ এবং সাব্যস্তের স্থিরীকরণ প্রয়োজন, নতুবা বাতাসে দড়ি দিয়া বা হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়া কি হইবে; অতএব অদৃষ্ট বিষয়ের জন্য মিছা অধিক ঘূর্ণাতরঙ্গে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং যে 'গহনম্ গভীরম্' লইয়া হিন্দুসন্তানকে এত গোলে পড়িতে ও ঘোর অন্ধকারে ঘুরিতে দেখিয়া আসিলে, গ্রীকসন্তান এক নিশ্বাসেই তাহার সমস্ত গোলযোগ নিরাকরণ ও যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ফেলিল। প্রকৃতির প্রতি বারেক দৃষ্টিমাত্রেই স্থির হইল, 'গহনম্ গভীরম্' (chaos) অর্থাৎ প্রলয়াবর্ত্ত হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। কিন্তু কেন হইল, কে করিল? 'গহনম্ গভীরম্' বা কি? তাহা বৈদিক ঋষি বসিয়া ভাবুন, আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই; কেন হইল, কে করিল, তাহাতে এবং ততদূরে আমার আবশ্যকটা কি? যেই করুক, যে কারণেই হউক, উহা হইয়াছে; উহা আছে এবং আমিও আছি,—পৃথিবী হইয়াছে এবং পৃথিবী আমার সকল রকমের অভাব পূরণ করিতেছে, ইহাই যথেষ্ট; আর অধিকে আমার আবশ্যক কি? 'গহনম্ গভীরম্' লইয়া কাজ কিছু থাকিত, না হয় ভাবিতাম; তাহা যখন নাই, তখন সকল অভাবের পূরণকারিণী পৃথিবীর জনয়িতা বলিয়াই তাহার যে কিছু উল্লেখ এবং সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট! চিত্তের এ নিষ্পত্তি, শেষ নিষ্পত্তি; ইহার উপর তর্ক খাটে না। অতএব গ্রীকচিত্ত অম্লানমুখে তর্ক তকরারের উপর ঢাল চাপা দিয়া, আহার করিতে করিতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া সুস্থিরতা লাভ করিল। পৃথিবী

হইতে উরেণোস্ অর্থাৎ তারকামণ্ডলবেষ্টিত আকাশের উৎপত্তি হইল। অনন্তর পৃথিবী এবং আকাশ এতদুভয়ের মধ্যে প্রণয়সংস্থাপন হইলে, উরেণোসের অর্থাৎ আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে দ্বাদশ তিতান, কিক্লোপিস্ত্রয় ইত্যাদির জন্ম হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি।[৭]

ক্রমে বহুদেবের উৎপত্তি হইল। কিন্তু ইহাদের সকলেই তৎসাময়িক মানব-চিত্তায়ত্ত সুখের জন্য লালায়িত; এজন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি মানবীয় হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, পিতৃহত্যা প্রভৃতি কুক্রিয়াচালনা দ্বারা স্ব স্ব বিভবে স্থাপিত হইল;—অথবা অন্য কথায় কল্পনামার্গে আর একদল উচ্চশক্তি ও উচ্চবিভবশালী গ্রীকের উপস্থিতি হইল। যাহা হউক ইহারা উচ্চ এবং দেবতা, অতএব ইহাদিগকে মান্য কিছু করিতেই হইবে; কিন্তু মান্যেরও ত প্রতিদান আছে,নতুবা ওসকল আমা হইতে হইবে না। কাজেই, গ্রীক দেবতা সাধকের সন্তোষার্থে, কখনও ভূমি চষিয়া চাস করিতে লাগিলেন; কখনও বা মদচোয়ানর সাহায্য করেন; কখনও বা ভাল অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত; আবার কখন বা রণস্থলে যাইয়া, বীরগণের সাহায্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দেবতাই হউন আর যিনিই হউন, গ্রীকসংসারে বিনা খাটুনিতে খাইবার সাধ্য নাই। "লেন-দেন" বিজ্ঞান হাতে হাতে। গ্রীকদিগের দেবতা হওয়াও দায়! প্রকৃতি হারি মানিলেন, তাঁহার প্রদত্ত পারলৌকিক ভাবাভাস লৌকিকে আসিয়া পরিণত হইল!

এক্ষণে ভারতচিত্তের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর;—দারুণ ঘূর্ণবায়ুতে ঘোর তিমিরে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় আকুল হইয়া ঘুরিতেছেন। কি দুরন্ত ঘূর্ণন! কিন্তু ঘূর্ণবায়ু বা ঘোর তিমির, ইহার কেহই স্থায়ী নহে। কালে সকলই তিরোহিত হইয়া থাকে। ক্রমে ঘূর্ণবায়ুর সাম্য হইল, প্রচণ্ড বায়ু ধীরে ধীরে নামিয়া সুখস্পর্শ শীতল

৭। এই প্রবন্ধের অন্তভাগে পরিশিষ্টরূপে গ্রীক পুরাণের সারসংগ্রহ করিয়া, গ্রীক দেবদেবীর একটি যথাযথ বৃত্তান্ত দেওয়া গেল। বঙ্গীয় পাঠকদিগের অনেকেই গ্রীক পুরাণ জ্ঞাত না থাকায়, এখানে তাহার ধারাশূন্য উল্লেখ যথাসাধ্য পরিহার করা হইল।

বায়ুতে পরিণত হইল। ঘোর অন্ধকার ক্রমে ক্ষীণ অন্ধকারে নামিল, পূর্ব্বদিক্ ফরসা ফরসা বোধ হইতে লাগিল; আরও ফরসা—আরও ফরসা, ক্রমে বস্তুনিকর নয়নপথে পড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব অশান্তির অপলোপে মন তখন রমণীয়তায় পরিপূরিত হইলে, সমগ্র দৃশ্যের যখন যে খণ্ড নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহাই যেন অভিনব নূতন সৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।—আর্য্য-ঋষি এখন পথ পাইয়া, প্রতি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবতাবিশেষের অবস্থান ও কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাইলেন। তথাপি, এ বহুদেবকল্পনা গ্রীকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর হইলেও, মনের শান্তি কিন্তু পূর্ণভাবে উদয় করিতে পারিল না। আর্য্য-ঋষি আবার সর্ব্বশান্তি-বিধায়কের অনুসন্ধানে চলিলেন। এ দিকে ফরসার উপর আরও ফরসা হইতে হইতে সূর্য্য আসিয়া উদয় হইল, দিক সকল হাসিতে লাগিল; ভ্রান্ত পথিক এখন তৃপ্ত-শ্রান্তি, দেখিতে পাইল যে যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইলাম! দৃশ্যের প্রতি পুনর্দৃষ্টি করিয়া তখন হৃদ্বোধ হইল যে, আমার মানসিক আগ্রহে যাহাদিগকে প্রত্যেক নূতন সৃষ্টি বলিয়া ভাবিয়াছিলাম তাহারা বস্তুতঃ প্রত্যেকে নূতন সৃষ্টি নহে,—উহারা এক মহাসৃষ্টিরই বিভিন্ন অংশমাত্র। আর্য্য-ঋষিও তাঁহার বোধসূর্য্যের উদয়ে দেখিতে পাইলেন ;—

"সুপর্ণস্বরূপ যে দেব ঋষিগণ দ্বারা বহুবিভিন্নরূপে কল্পিত হইয়া স্তুত হইয়াছেন, তিনি একমাত্র।" [৮]

অথবা,

"সেই সুপর্ণ গরুত্মান্ একস্বরূপ। বিপ্রকবিগণ তাঁহাকেই ইন্দ্র যম মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুনামে আখ্যাত করিয়াছেন।" [৯]

"যে একমাত্র দেব স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি-করণ-কালীন বাহু এবং পক্ষ সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বচক্ষু, বিশ্বমুখ, বিশ্ববাহু, এবং বিশ্বপদ।" [১০]

৮। ঋঃ বে। ১০ মঃ। ১১৪সূঃ। পুনশ্চ "একস্য আত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। নিরুক্ত ৭।৪। ৯। ঋঃ বেঃ ১মঃ। ১৬৪ অস্যবামীয় সূক্ত

১০। ঋঃ বেঃ। ১০ মঃ। ৮১ সূঃ।

বৈদিক দেবতাবর্গের মধ্যেও যে বাপ ভাই খুড়া জেঠা শালি শালাজ প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান নাই, এমন নহে, বরং প্রভূত পরিমাণেই আছে। কিন্তু তাহা সমস্ত রূপক উক্তির স্বরূপে; যখন যেমন ভাব মনের আবেগে প্রসূত ও কবিত্বযোগে অবয়বীকৃত, তখন তাহাই গৃহীত ও বর্ণিত হইয়াছে; এবং এই জন্য, সেই সকল সম্পর্ক নিরূপণ, প্রতি সূক্তে প্রায় নূতন নূতন দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। গ্রীকদিগের মূল দেববর্গ সম্বন্ধে সুন্দর সুগ্রথিত ধারাবাহিক যে বংশাবলী, যে কেহ তাহা কীর্ত্তন করিতে যাউক, কীর্ত্তনে বড় অধিক রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইলিয়দ ও অপরাপর গ্রন্থ সকলে পরস্পরের মধ্যে যে একটু আধটু রূপান্তর দৃষ্ট হয়, তাহা গণনায় অতি সামান্য। কেবল বেদ বলিয়া নহে; হিন্দুদিগের পরবর্ত্তী অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থেও,দেববংশাবলী বর্ণন ও দেবতাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ব্বাচন পক্ষে নানা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিদ্বয়ের দেববংশাবলী প্রভৃতি বর্ণনে,এই অস্থিরতা এবং স্থিরতার কারণ ?—হিন্দুবর্ণনা সাধারণতঃ এক এবং অদ্বিতীয় মহেশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির রূপক কল্পনা স্বরূপ, সুতরাং যখন যেমন ঋষি, তখন সেইরূপ ভাবে ভাবিত ; আর গ্রীকদেবতত্ব লৌকিক বুদ্ধিতে লৌকিক ইতিহাসবৎ গ্রথিত ও সেইরূপভাবে গৃহীত, সুতরাং তাহাতে বড় রূপান্তর ঘটিতে পায় নাই। মানসিক প্রকৃতিও উভয় জাতিতে উভয়ানুরূপ হইয়াছে। হিন্দুচিত্ত আত্মিকক্ষুধাক্ষিপ্ত, গ্রীকচিত্ত উদরক্ষুধাক্ষিপ্ত ; হিন্দুচিত্ত উদরক্ষুধাকে অতিক্রম করিয়া আত্মিকক্ষুধা নিবারণ করিতে অচিন্তনীয়তে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে; গ্রীকচিত্ত উদরক্ষুধা নিবারণ করিতে চিন্তনীয়কেই ক্ষুধাশান্তিকর দেখিয়া তাহাকে অবলম্বন করিতে চলিয়াছে। অচিন্তনীয়কে আয়ত্ত সহজ নহে; কিন্তু চিন্তনীয় আয়ত্ত সহজে হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত, একে চিত্ত অস্থির, গহন চিন্তাক্ষেত্রে প্রধাবিত; অপরে তাহা সে চিন্তার হাত হইতে অপেক্ষাকৃত স্থিরতাপ্রাপ্ত। ইহার ফল, সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে গ্রীকের মস্তিগতির দার্ঢ্যতা যেমন এবং যতটা ; হিন্দুর তেমন এবং ততটা নাই। সে যাহা হউক, এরূপে

চিত্ত স্থির হইলে সুস্থতা অনেকটা লাভ না হয় এমন নহে, কিন্তু উন্নত-তত্ত্বলাভের আশা তেমন স্থলে অতি অল্পই থাকে। হিন্দুচিত্ত নিয়ত চিন্তাপথে প্রধাবিত থাকায়, তত্ত্বভিত্তিও অতি উচ্চ সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু দেখা যায় যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যাহা, উহার আর দোষাদোষ যাহাই থাকুক, উহার মূল কিন্তু নিহিত হইয়াছে সেই সর্ব্বমূলে যাহা "সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ঃ বচোভিঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।" আর গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্ব বা দেববংশের মূল নিহিত "গহনম্ গভীরম্" বা প্রলয়াবর্ত্ত মধ্যে। উপযুক্তই হইয়াছে! একের মূল আলোক, অপরের মূল অন্ধকার। কিন্তু কেবল আলোক বা কেবল অন্ধকারে কিছুই হয় না; উভয় সংমিলনেই রূপ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই আলোক এবং অন্ধকার, দুই বিপরীত দেশে সৃষ্ট হইয়া, দুই বিপরীত দিক হইতে, কালে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে। উভয় উভয়কে এখনও জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু ক্রমে কালকর্ত্তৃক আনীত হইয়া যখন হিন্দু আধ্যাত্মিকতা ও গ্রীক আধিভৌতিকতা সম্মিলিত হইতে পারিবে, বলা বাহুল্য যে, তখনই জগতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য—পূর্ণ মনুষ্যত্বের সঞ্চার হইবে।

গ্রীকদেবরাজ্যের মধ্যে ঊর্দ্ধতম দেবতা জিউস্, "দেবতাবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহাবিক্রমশালী, দূরদর্শী, সর্ব্বশাসক, ঘটনা সকলের ঘটক, এবং সুখশায়িনী ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী থেমিসের সহ সর্ব্বদা ন্যায়ালোচনারত।"[১১] ইনি সর্ব্বশাসক বটে, কিন্তু অনেকে আবার ইহাঁর শাসন একেবারেই উপেক্ষা করিয়া থাকে। ঐ শুন, একজন কিক্লোপিস্ ইউলিসিস্‌কে কি বলিতেছে, "ওহে পথিক, তুমি দেখিতেছি উন্মত্ত হইয়াছ, অথবা নিশ্চয় তুমি নিতান্ত দূরদেশ হইতে এখানে আসিয়াছ; তাহা না হইলে দেবতাদিগকে ভয় বা তাহাদের সংস্রব পরিহার করিবার জন্য আমাদিগকে কখনও এরূপ উপদেশ দিতে না। জানিও, কিক্লোপিসেরা বজ্রধারী জিউস্, বা যে কোন দেবতা হউক,

১১। হোমারিক স্তোত্র—জিউস্।

কাহাকেই গ্রাহ্য করে না; কারণ তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।"[১২] শুদ্ধ কিক্রোপিস্ নহে, পৌরাণিক ইন্দ্রশত্রুর ন্যায় জিউসের শ্রেষ্ঠতানাশক শত্রু অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ জিউস্ যে সর্ব্বশাসক ও সকলের পতিস্বরূপ পরমেশ্বর, গ্রীকদিগের এ ধারণা একেবারে এবং হঠাৎ উদয় হয় নাই। ইলিয়দ ও আদিম গ্রীকপুরাণ সকল অনুসারে দেখা যায় যে, ক্রোণস্ ও হ্রিয়ার তিন পুত্র; জিউস্, পোসিদোন্ ও হেদিস। ইহারা পিতাকে বলে পরাজয় পূর্ব্বক বন্ধন ও অধোদেশে নিক্ষেপের দ্বারা দূরীভূত করিয়া, স্ফুর্ত্তিখেলার সাহায্যে আপনাপনির মধ্যে পৃথিবীর রাজত্বভাগ করিয়া লয়। স্ফুর্ত্তির দ্বারা সমুদ্রের রাজ্য পড়িল পোসিদোনের ভাগে; নরক এবং মৃত্যু-সংসার পড়িল হেদিসের ভাগে, এবং তদ্ভিন্ন আর সমস্ত চরাচর পড়িল জিউসের ভাগে। অবশ্য জিউসের ভাগে যে ভাল অংশ পড়িল, তাহা আর বলাই বাহুল্য; অর্থাৎ এই স্ফুর্ত্তি অনুসারে, জিউস্ স্বর্গ এবং স্থলজজীবলোকপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইলেন। এখানে প্রাচীন গ্রীক পুরাণ অনুসারে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সংস্থানটাও বলা উচিত। সমস্ত জগৎ, ভিতর ফাঁপা একটী বৃহৎ গোলক বিশেষ; তক্তার ন্যায় সমতল পৃথিবী, সেই গোলকটির ভিতরস্থ ঠিক মধ্যস্থল ব্যাপিয়া, ভিতরের ফাঁপা শূন্যস্থানকে, উপর ও নীচে, দুই সম অংশে বিভাগ করিতেছে। পৃথিবী হইতে উপরদিকস্থ গোলকাবরণ স্বর্গ, আর নিম্নদিকস্থ গোলকাবরণ নরক ও মৃত্যুদেশ এবং ব্যবধানস্থিত শূন্যস্থান যাহা, তাহাই আকাশ। কেবল স্বর্গের দিকস্থ আকাশে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি বিচরণ করিয়া থাকে, নরকদিকস্থ আকাশে তাহারা কখনও যায় না; এজন্য নরক ও মৃত্যুদেশ সর্ব্বদা চির অন্ধকারে আবৃত। স্বর্গ হইতে পৃথিবী কতদূর, তাহা নিরূপণ করিতে হেসিওদ্ বলিয়াছেন যে, স্বর্গ হইতে একটা হাতুড়ী পৃথিবীতে পড়িতে নয় দিন

১২। ওডিসী, ৯ম সর্গ।

কাল সময় লাগিয়া থাকে। নরক হইতেও, বলা বাহুল্য যে, সেই একই দূরত্ব।১৩

গ্রীকদিগের ত এই, এক্ষণে হিন্দুরা স্বর্গ ও যমলোকের অবস্থিতি নিরূপণ করিতেন কিরূপ?

"সহস্রাশ্বিনে বৈ ইতঃ স্বর্গলোকাঃ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ স্বর্গ এখান হইতে এক হাজার ঘোড়ার ডাক! হিন্দুর স্বর্গধারণাই বা গ্রীক অপেক্ষা উচ্চ কোথায়? কিন্তু একটা কথা আছে। দেখা যায় যে, হিন্দুরা অতি আদিম কাল হইতেই, ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস্য পদার্থ দুই রূপে অবধারণ করিয়া আসিয়াছেন; একটি জ্ঞানীর জন্য, আর একটি সাধারণ লোকের জন্য। জ্ঞানীর জন্য যাহা, তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে; আর সাধারণের জন্য যাহা, তাহা তদ্বিপরীতে আধিভৌতিক ও স্থূলভাবে পরিপূর্ণ। উক্ত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস্য বিষয়ই, হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃত নিদর্শক এবং উহাই, উক্ত উন্নতি যে কি অপরিসীম, তাহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আর আধিভৌতিক এবং স্থূলভাবপূর্ণ বিশ্বাস্য বিষয় যাহা, তাহাও নিতান্ত হীন ছিল না; মোটের উপর ধরিতে গেলে, তাহাও এত প্রশস্ত যে, গ্রীকদিগের বিশ্বাস্য তত্ত্বের সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে যেন লজ্জা বোধ হয়। সে যাহা হউক, হিন্দুদিগের এই শেষোক্ত সাধারণ বিশ্বাস্য তত্ত্ব অনুসারেই, স্বর্গ এক হাজার ঘোড়ার ডাক পরিমিত ব্যবধান দূরে। পুনশ্চ সাধারণ বিশ্বাস্য তত্ত্ব অনুসারে,

১৩। Theog. 722. এখানে প্রাচীন স্কান্দিনেবীয় অর্থাৎ ইংরেজ আদি ইউরোপীয় জাতির অপর এবং অব্যবহিত পূর্ব্বগত পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বর্গধারণা কিরূপ ছিল, তাহাও একটু উল্লেখ করায় ক্ষতি নাই। তাহারা বলিত, আকাশের ঊর্দ্ধে একটি সুদৃঢ় স্থান আছে; সেই স্থানই স্বর্গ। ঐ স্থানের উপরিভাগে আসগাদর নামে দেবতাগণের নিবাসস্থলী। মৃত পুণ্যবানদিগের আত্মাসকল, উক্ত দেবলোকে, রামধনুরূপ প্রশস্ত ও রমণীয় পথের দ্বারা বাহিত হইয়া নীত হইত। বলা বাহুল্য যে, এই স্কান্দিনেবীয়গণ, প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকের তুলনায়, সেদিনকার লোক বলিলেই হয়।

স্বর্গ পৃথিবীর উত্তর দেশে এবং দক্ষিণ দেশে তাহার নরক। হিন্দুরা, গ্রীকদিগের ন্যায়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ফাঁপা গোলকবৎ ভাবিয়া স্বর্গ নরক পৃথিব্যাদির সংস্থান তথাভাবে কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদের মতে, ব্রহ্মাণ্ড এবং আকাশ, উভয়ই অনন্ত।[১৪] গ্রীকেরা আরও বলিত, ডেল্‌ফী

১৪। এতৎসম্বন্ধে পৌরাণিক ধারণা অন্যরূপ। নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য আদি ইহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন লোকস্বরূপ। পৃথিবী যাহা, তাহা সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রে বিভাজিত। মধ্য-স্থলে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা জম্বুদ্বীপ, তৎপরে চক্রাকারে এই দ্বীপ বেষ্টন করিয়া লবন নামক প্রথম সমুদ্র। উক্ত সমুদ্রকে চক্রাকারবেষ্টনে দ্বিতীয় দ্বীপ, তাহাকে পুনঃ চক্রাকার বেষ্টনে দ্বিতীয় সমুদ্র। এইরূপে পর পর ও ক্রমান্বয়ে চক্রাকার বেষ্টনে, সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের স্থিতি। শেষোক্ত সমুদ্রের পর, লোকালোকীয় নামক পর্ব্বতের দ্বারা সৃষ্টির সীমানা করা রহিয়াছে; তাহার ওদিকে সৃষ্টির সঞ্চার নাই। চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি, পৃথিবীর উপরিস্থ ও চতুর্দ্দিকস্থ আকাশে মাত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; লোকালোকীয় পর্ব্বতের ওদিকে তাহাদের গতিবিধি নাই। এরূপে সংস্থিত যে পৃথিবী, তাহারই হিমাদ্রি ও মেরুসন্নিহিত উত্তরদেশে কর্ম্মফলাত্মক স্বর্গ; আর পৃথিবীর অতিদক্ষিণাংশে সেইরূপ কর্ম্মফলাত্মক মৃত্যুলোক। জ্ঞানাত্মক স্বর্গ অবশ্যই আত্মার অবস্থান্তর মাত্র, দেশ ও কালাদির অতীত। পূর্ব্বস্মৃতির মোহবশতঃ আর্য্যদিগের আদিস্থান উত্তরকুরুও স্বর্গসম সুখের ভোগভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত। পূর্ব্বস্মৃতির মোহ বশতঃ কেবল হিন্দুরাই যে উত্তরকুরুকে এরূপ কল্পনা করিত, তাহা নহে। গ্রীকদিগের মধ্যেও উক্ত আদিস্থান সম্বন্ধে সেরূপ সুখময় কল্পনাস্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; পৃথিবীর পূর্ব্বদিকস্থ হাইপারবোরিয়া (উত্তরকুরুর গ্রীক নাম) এত নিত্য সুখের ও পুণ্যময় দেশ যে, দেবতারা অনেক সময়ে অলিম্পস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তথায় গমন ও অবস্থান দ্বারা সুখানুভব করিতেন,—হেসিওদ, থিও ৪; ইলিয়দ ১ম ও ২৩শ সর্গ এবং ওডিসী ৫ম সর্গ। পুনশ্চ, গ্রীকদিগের স্বর্গ ফাঁপা গোলকের উপর অর্দ্ধ হইলেও, তাহা শূন্যে অবস্থান করিত না; পৃথিবীর পৃষ্ঠে সংস্থাপিত স্তম্ভাবলীর উপরে স্বর্গদেশের নির্ভর ছিল; অথবা আটলাস্ নামক এক অসাধারণ মনুষ্য স্তম্ভাবলীর সাহায্যে, পৃথিবী হইতে স্বর্গকে পৃথক স্থাপন পূর্ব্বক, তাহাকে ধারণ করিয়া থাকিত।—ওডিসী ১।৫২। সূর্য্যের গমনাগমন ও উদয়াস্ত সম্বন্ধে এরূপ কথিত যে, সূর্য্য চতুরশ্বযুক্ত রথে গমনাগমন করিয়া থাকেন; তিনি পৃথিবীর পূর্ব্ব সীমানায় উদয় হইয়া পশ্চিমে গমনানন্তর অস্ত হইলে, হেপিস্তস নামক দেবকর্ম্মকার নৌকাযোগে তাহাকে রাতারাতি সমুদ্র পার

নগরই পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থল[১৫]; কিন্তু হিন্দু বিশ্বাস অন্যরূপ, তদনুসারে যজ্ঞবেদীই পৃথিবীর মধ্যবিন্দুরূপে কল্পিত।[১৬] ফলতঃ ইহা দ্বারাও হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা সাধারণতঃ কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কতকটা অনুমিত হইতে পারিবে;—দেবতার অধিষ্ঠানভূমিই যে পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবিন্দু, ইহা অপেক্ষা আর কি সঙ্গত ও সুন্দর কথা হইতে পারে? হিন্দুর স্বর্গ-ধারণা এইরূপ;—সেখানে বিশ্ববিধাতার নিবাসস্থলী, সেখানে অজস্র জ্যোতিঃ এবং লোক সকল জ্যোতিষ্মন্ত; সেখানে কামনা সকল নিকামতাকে প্রাপ্ত হয়; সেখানে স্বধা ও তৃপ্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন; সেখানে আনন্দ এবং হর্ষ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং সেখানে পুণ্যবান্ লোক সকল অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়; ইত্যাদি।[১৭] পুনঃ স্বর্গ বিষয়ে, আধ্যাত্মিক ধারণা এইরূপ—

"এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে, রাত্রিদিবাপ্রবর্ত্তক নিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত বা দুষ্কৃত, ইহার কিছুই নাই। এখানে আসিলে সকলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ, সে অনন্ধ হয়; যে ক্লেশাদিতে বিদ্ধ, সে অবিদ্ধ হয়। এখানে রাত্রি দিবায় প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভায় দিবসের ন্যায় সমতাযুক্ত। ইহাই সকৃজ্জ্যোতির্ব্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।"—ছান্দোগ্য ৮।৪।১-২। অথবা;—

করিয়া, ঠিক পুনরুদয় সময়ে পুনঃ পূর্ব্বদিকে লইয়া উপস্থিত করিত এবং তখন আবার উদয়াস্তাদি পূর্ব্ববৎ চলিত। অসারত্ব পক্ষে, আমাদেরও পৌরাণিক বর্ণনার অনেকাংশ ইহার নিকট নিতান্ত ফেলা যায় না।

১৫। Paus. X 16.

১৬। ঋঃ বেঃ ১।১৬৪। "ইয়ং বেদিঃ পরোঅন্তঃ পৃথিব্যাঅয়ং যজ্ঞ ভুবনস্য নাভিঃ।"

১৭। "যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং বাচং বদন্।

গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং

জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥ ৬॥

"তথায় সূর্য্য চন্দ্র ও তারকা, ইহারা আলোক দান করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎও সেখানে আভাতিত হয় না, অগ্নির ত কথাই নাই। সেই স্বপ্রকাশরূপ পরমাত্মার জ্যোতিতেই সমস্ত জ্যোতিষ্ময় হইয়া থাকে এবং সূর্য্য চন্দ্র তারকাদিও, সেই জ্যোতির আভায় আভাতিত হইয়াই আলোকপ্রদানে সমর্থ হয়। জীব তথায় নীত হইলে, শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়; পাপতাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়; সংসারবন্ধনরূপ গ্রন্থি হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"—মুণ্ডক শ্রুতি ২।২।১০, ৩।২।৯।

হিন্দুদিগের স্থূল-বিশ্বাসিত স্বর্গ পৃথিবীর উত্তরে এবং মেরুসন্নিহিত হইলেও, তথাপি হিমালয় যেমন কখনও কখনও দেবস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেইরূপ গ্রীকদিগের স্বর্গ নয় দিন ধরিয়া হাতুড়ী পড়ার ব্যবধান দূরে হইলেও, তথাপি থেসালীদেশস্থ ওলিমপস পর্ব্বতই সাধারণতঃ স্বর্গস্বরূপ ও প্রধান দেবনগর বলিয়া কীর্ত্তিত

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ৭ ॥

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ৮ ॥

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ৯ ॥

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১০ ॥

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥" ১১।

ঋঃ বেঃ ৯।১১৩।

হইয়াছে। এই দেবনগর, প্রাচীন গ্রীসদেশস্থ নগরবিশেষের অতিরঞ্জিত ছবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর একটা কথা, হিন্দুদিগের স্বর্গ, যেমন দেবতাদিগের বাসস্থান বটে, তেমনি পুণ্যবান্ মনুষ্যেরও উহা পুরস্কারের স্থান। কিন্তু গ্রীসের স্বর্গ সেরূপ নহে, তথায় কেবল দেবতা-দিগের বাস; মনুষ্য-আত্মা যেমন পুণ্যবানই হউক না কেন, তাহার পুরস্কারের স্থান তথায় নহে বা তথায় তাহার প্রবেশাধিকারও নাই।

গ্রীক দেবনগরের গৃহাদি পিত্তল বা তাম্রনির্ম্মিত। গৃহের আসবাব সকল দেবশিল্পী হেপিস্তসের হস্তজাত। এবং দেবতার আসবাব বলিয়া, বসিবার আসন সকল উপবেশককে লইয়া ইচ্ছামত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাধা সকল (পাদুকা) পায়ে দিয়া ইচ্ছা করিলে, তাহা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যায়; রথ সকলও, যেমন নানা ধাতুতে নির্ম্মিত, তেমনি তাহাদের ইচ্ছামত মনোরথ-গতি; ইত্যাদি। এ হেন দেবনগরের একাধীশ্বর, দেবরাজ জিউস্; হিরা, তাঁহার ভগিনী এবং রাণী উভয়ই; গ্যানিমিডিস্, প্রিয়পাত্র; কন্যা হিবি, চাকরাণী-ঝী ও হুকুম বরদার; আপলো, সঙ্গীত এবং ধনুর্ব্বিদ্যার অধিপতি; হেপিস্তস্, দেবশিল্পী; পৈওন, দেববৈদ্য; হার্ম্মিস্, লাভালাভের মালিক; আরিস্ বা মঙ্গল, যুদ্ধ-বিশারদ ও দেবসেনানী; আর্ত্তিমিস্ বা দীয়ানা দেবী মৃগয়া এবং শিকারপ্রিয় ও তদ্বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আফ্রোদিতে বা রতিদেবী, প্রেমবিলাসিনী; থেমিস্, ন্যায়াধিকারিণী এবং পালাস্-আথিনে, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই অপূর্ব্ব দেবপরিবার সেই দেবনগরে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন; মধ্যে মধ্যে সমুদ্রাধিপতি ভায়া পোসি-দোনও আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যান। তাহা ভিন্ন গীতিবিষয়িণী অধি-নায়িকাগণ,[১৮] শোভনাগণ[১৯], নদী ও জলস্থলের অপরাপর অপ্সরাকল্প-দেবীগণ,[২০] তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। দেবতারা, অলিম্পুস্ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইলেই, হেপিস্তস্-

১৮। Muses. ১৯। Graces. ২০। Nymphs.

নির্ম্মিত নানা বেশভূষা ধারণে অঙ্গসজ্জা এবং পায়ে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। নতুবা যখন স্বগৃহে অবস্থান করেন, তখন (নব্যমতে) বাঙ্গালী অসভ্যের ন্যায়, খালি গায়ে ও খালি পায়ে সময় কাটাইয়া থাকেন।

এই দেব-পরিবার ও প্রোক্ত তৎসম্বন্ধীয়গণ ছাড়া, আরও নানা দেবদেবী নানা স্থানে নানামূর্ত্তিতে বিহার ও বিচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে গ্রীক পুরাণে দেওয়া যাইবে। যাহা হউক, অলিম্পুস্ পর্ব্বতস্থ এই দেব-পরিবার সর্ব্বদা যে সুখে সময়টা কাটাইতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। কারণ দেখা যায় যে, উগ্রমূর্ত্তি, রাগ, খামখেয়ালিতা, হিংসা, দ্বেষ, কলহ, প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি, পরকুচ্ছ, পরিবাদ, ইত্যাদির প্রবাহ তথায় প্রায়ই পূরা পরিমাণে চলিয়াছে। জেদ হইলে ন্যায় অন্যায় জ্ঞানও বড় একটা থাকিত না এবং তজ্জন্য আশ্রিত মনুষ্যমণ্ডলে পর্য্যন্ত, একের প্রিয়পাত্র মানুষবিশেষ অপরের দ্বারা লাঞ্ছিত হইবার পক্ষে ক্রটি হইত না। আবশ্যক হইলে পুনঃ, দুষ্ট স্বরস্বতীকেও এ উহার ঘাড়ে, বা এ উহার প্রিয়পাত্র মানুষের ঘাড়ে চাপাইতে ছাড়িত না।[২১] তাহার উপর আবার, জিউসের বাহিরটান রোগটা কিছু বেশী বেশী রকম থাকাতে,[২২] ভগিনী এবং গৃহিণী হিরার সঙ্গে প্রায়ই

২১। II VII 218. XIII 794.

২২। জিউসের বাহিরটানে দেবী এবং মানুষী কেহই বাদ যাইত না এবং রসিকরাজ স্ত্রীগণকে ভুলাইতেনও নানা ছলে। হিরাক্লিসের মাতা আল্কিমিনেকে ভুলাইয়াছিলেন, তাহার স্বামী আম্ফিত্রিওনের রূপ ধরিয়া। লিডাকে ভুলান সুন্দর রাজহংসরূপে, যেহেতু লিডা বড় রাজহংস ভাল বাসিত। সুবর্ণবৃষ্টির আকারে দানয়ের কারাগারে প্রবেশ লাভ করিয়া, তাহাকে মোহিত করিয়াছিলেন। আন্তিওপিকে ভুলান, অর্দ্ধনর অর্দ্ধছাগ রূপ 'সাতীর' নামক জন্তুর আকারে। কালিস্তোকে ভুলাইবার নিমিত্ত, সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর্ত্তিমিসের আকার পরিগ্রহ করেন। বলদের আকার ধারণ করিয়া, পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দূরে গমন পূর্ব্বক ইউরোপাকে হরণ করেন। এগিনাকে ভুলান ইগল পক্ষীর পালকে পরিণত হইয়া। ইহা ভিন্ন আরও কত কামিনীকে যে হরণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। জিউসের পুত্রসংখ্যাও সুতরাং অপরিসীম। স্বয়ং হিরাদেবীকেও ইনি সহজে প্রাপ্ত হয়েন নাই। সহোদরা

তাঁহার এমন বেয়াড়া কোন্দল বাধিত যে, সময়ে সময়ে দেবনগরের চালে কাক বসিতে পাইত না এবং দেবতাগণেরও তাহাতে আমোদের সীমা

হিরা যখন ইহার ভাবগতিক বুঝিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেন, তখন একদা জিউস্ এক ঘোরতর ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত করেন এবং স্বয়ং একটি ঝটিকামথিত অনাথ পক্ষীর আকার ধরিয়া, অনন্দিগ্ধচিত্ত হিরায় হাটুর উপরে পড়িয়া শরণাপন্ন হয়েন। পক্ষীটিকে দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া হিরাদেবী যেমন কাপড় ঢাকা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন, অমনি জিউসও তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফেলিলেন,—আর যায় কোথা! সে যাহা হউক, শেষে প্রতিশ্রুত হইয়া বিবাহপূর্ব্বক হিরাকে পাটরাণী করেন।

ফলতঃ বাহিরটানটা কেবল জিউসের একা নহে, দেবনগরস্থ অপরাপর দেব দেবীগণের মধ্যেও কিছু বাড়াবাড়ী গোছের ছিল। নেহাত একটা মাত্রও তাহার নমুনা দেওয়া উচিত। দেবতাদের মধ্যে হেপিস্তস্ যেমন কুরূপের একশেষ, আফ্রো-দিতে অর্থাৎ রতিদেবী ছিলেন তেমনি স্বরূপার চরম। এই দুইজনে বিবাহ হয়। ভাবুকেরা বলেন যে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, এ দুয়ের যে পরিণয় তাহা অতি ভাবগ্রাহিতার কল্পনা। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু এখানে কার্য্যত যে তাহা খুব ভাল দাঁড়াইয়াছিল, কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাহা বড় একটা বোধ হয় না; যেহেতু দেখা যায় যে, রতিদেবীর মনটা বড়ই এদিক ওদিক ছুটিত। ফলতঃ পতি কুরূপ বলিয়া হউক, আর যে কারণেই হউক, রতিদেবী নানা দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ চপল দেবতা আরিস্ অর্থাৎ মঙ্গলের সঙ্গেই প্রণয়টা তাহার যেন কিছু বেশী বেশী গোছের হইয়াছিল। কিন্তু শত্রুছাড়া কোথাও নাই; সুতরাং, এখানেও সূর্য্যদেব শত্রুতা করিয়া সে কথা হেপিস্তস্‌কে বলিয়া দেন! বক্সুর হেপিস্তস্ মঙ্গলকে বলে পারিবেন না জানিয়া, কলে কাজ হাত করিবার মতলবে নিজের কারখানায় প্রবেশ করিলেন এবং এইবার তাহার সকল গুণপণাকে তন্ন তন্ন খাটাইয়া মনের মত করিয়া একখানি জালের ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। একে দেবশিল্পী, তায় মর্ম্মান্তিক চেষ্টার ফল, সুতরাং গুণপণার আর অবধি রহিল না;—জালখানি এমন কৌশলের হইল যে দৃশ্যত অদৃশ্য, অথচ এমন মজবুত যে, তত বড় মজবুত যে মঙ্গল, তাহারও তাহা ভেদ করিবার সাধ্য নাই; এদিকে আবার জালে পড়িতেই হইবে, তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। হেপিস্তস্ স্থানান্তর যাওয়ার ছল করিয়া যেমন অজ্ঞাতে জাল খানি পাতিয়া গেল, এবং রতি ও মঙ্গলও যেমন একত্র হইল, তখনই উভয়ে জালের বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেপিস্তস্ তখন ক্রোধে ও তাপে অস্থির হইয়া, ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, অলিম্পুসের

থাকিত না। ফলতঃ দেবরাজ একবার গৃহিণীর জ্বালায় এতই জ্বালাতন হইয়াছিলেন যে, শেষে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাকে অতি অদ্ভুত উপায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ, হিরার হাত পা বাঁধিয়া ও পায়ে লোহার মুদ্গর লট্‌কাইয়া, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ শূন্য স্থানে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখেন। এদিকে পুনঃ মাতৃবৎসল পুত্র মায়ের এই দুর্গতিদর্শনে থাকিতে না পারিয়া তাহার সাহায্য করিতে উদ্যত হইলে, জিউস্ অতি বড় ক্রোধে হেপিস্তস্‌কে এমন ধাক্কায় অলিম্পুস্ হইতে নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, এমন কি, গরিব হেপিস্তস্‌কে গড়াইতে গড়াইতে ভূমধ্যসাগরস্থ লেমনোস্ দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল।[২৩] পুরুষের রাগ বটে! এবং বলিতে কি বাঞ্ছারাম, গৃহিণী-পালকতা পক্ষে আদর্শ-চরিতও বটে!

এত গুণের স্বামী সত্ত্বেও, হিরাদেবী সতিনীর নামে কম্পিত হইতেন। সতিনীও তাঁহার ছিল অনেক গুলি। প্রথম বিবাহিতা সতিনী মিতীস্; ইনি গর্ব্ভিণী হইলে, অবনীদেবী জিউস্‌কে বলেন যে, এই গর্ভে যে

সমস্ত দেবদেবীগণকে হাঁকিয়া ও ডাকিয়া তথায় একত্র জড় করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগা! দেবগণ সমবেদনা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, সকলেই হো হো হাসিয়া অজ্ঞান ও ঠাট্টা তামাসায় একাকার। সেই সময়ে ভাইজী পোসিদোনও আলিম্পুসে ছিলেন; তিনিই কেবল সে তরল হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীর ও স্থির ভাবে দেখিতে লাগিলেন যে, গোলমালটা এখন চুপি চুপি ও আপোষে মিটে কিরূপে। শেষে তিনি হেপিস্তসকে একান্তে ডাকিয়া ভাইপোকে বলিলেন, "বাপাজি আর গোলে কাজ নাই; যা হবার হইয়া গিয়াছে, এখন কিছু হাতে লইয়া গোলমালটা আপোসে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলাই ভাল।" হেপিস্তস্ তাহাতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু মঙ্গল যে শঠ ও জুয়াচোর, তাহাতে চুক্তির দ্রব্য হাতে না পাইলে বিশ্বাস নাই। কাজেই তখন অনন্যোপায় হইয়া পোসিদোন নিজেই মঙ্গলের জামিন হইয়া রতি ও মঙ্গলকে জাল হইতে খালাস করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই আখ্যায়িকা সেই প্রাচীন গ্রীকচরিত্রেরও প্রকাশক বটে, এবং তজ্জন্যই ইহা এখানে গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় আচারেরও উহা ভিত্তিভূমি;—ক্ষতীপূরণাদির দাবী উহার রূপান্তর অভিনয়মাত্র।

২৩। ইলিয়দ ১ম সর্গ।

সন্তান হইবে, সে জিউসের ন্যায় সমান বলবান্ ও বিজ্ঞ হইবে ; জিউস্ ইহা শুনিয়া, ভয়ে ও আশঙ্কায় মূল শুদ্ধ আপৎ নিবারণের অভিপ্রায়ে, মিতীস্ দেবীকে আদরে ভোলা অন্যমনা অবস্থায় টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া উদরসাৎ করেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহাতেও আপৎ চুকিল না ; মিতীস্‌দেবী যদিও উদরে রহিলেন বটে, কিন্তু সন্তানটি থাকিল না ; সে পালাস্-আথিনে নামে লইয়া ফট্ করিয়া জিউসের কপাল ফাটাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।[২৪] হিরাদেবীর তৎপরবর্ত্তী সতিনীগুলি ক্রমান্বয়ে থেমিস্ ; ইউরিনোমি ; দেমিতুর এবং ম্লিমসিনে। হিরাদেবীর সতিনীর আশঙ্কা কতদূর, তাহার সম্বন্ধে এরূপ একটি আখ্যায়িকা কথিত হয়। জিউসের সঙ্গে কলহ হেতু হিরাদেবী একবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশিনী হইয়াছিলেন ; অনেক সাধ্যসাধনাতেও অনুকূল হয়েন নাই। শেষে জিউস্ আর কোন উপায় না দেখিয়া, একটা কৃত্রিম বিবাহের আয়োজন করেন। এক দিকে নিজে বরের বেশে সজ্জিত এবং অপর দিকে একটি কাঠের পুতুলকে পাত্রী সাজাইয়া পাত্রীবাহক রথের উপরে স্থাপনপূর্ব্বক, দলবল সঙ্গে বিবাহ সজ্জায় সজ্জা করিয়া পথে বাহির হইলেন। এমন সময়ে হিরাদেবী শুনিলেন যে, জিউস্ আর একটি নূতন বিবাহে চিত্ত মজাইয়া ফেলিয়াছেন। তখন আর কি রাগ সহ্য হয়, না মন মানে। তখন আলুলায়িতকুন্তলে উন্মত্তার ন্যায় উল্কাবেগে ছুটিয়া হিরাদেবী রথোপান্তে উপস্থিত ; রাগে ও ঝালে টুকরা টুকরা করিয়া পাত্রীর বেশভূষা ছিড়িয়া ফেলিলেন ; কিন্তু শেষে দেখিলেন কি ?—একটা কাঠের পুতুল! ঘোরতর হাসির গট্‌রা পড়িয়া গেল ; মান ঘুচিল, মিলন হইল, হিরাদেবী তখন নিজে কনে হইয়া সুখের বেগে বিবাহরথ হাঁকাইয়া দিলেন।[২৫]

২৪। ভাবুকদিগের ভাব অনুসারে, মিতীস্ বিজ্ঞতা ; সুতরাং তাহা জিউসের উদরসাৎ হওয়াই সঙ্গত। বিজ্ঞতার সন্তান জ্ঞান এবং সে জ্ঞান ললাটবিলোড়নেই বাহির হয় ; এই অর্থে পালাস্-আথিনের জন্ম জিউসের ললাটভেদ করিয়া।

২৫। Paus. IX 3.

এই ত গ্রীকদিগের দেবরাজ্য, দেবনগর, দেবরাজ, দেবপরিবার এবং তাহাদের লীলাখেলার কতকটা আভাস প্রদান করিলাম। কিন্তু ইহার সঙ্গে হিন্দু দেবচরিতের কোন স্থান যে তুলনা করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অতি সাধারণ পৌরাণিক বর্ণনাও ইহার সমতায় নামে না। পৌরাণিক বর্ণনায় অতি অসংলগ্ন, অযৌক্তিক বা নানা বিসদৃশ বিষয় থাকিলেও, তথাপি তাহা দেবচরিত; আর এই গ্রীক দেবসংসার, কেবল অতিরঞ্জিত ও স্ফীত আয়তনের গ্রীকচরিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুর দেবসংসার ও ঐশ্বরিক তত্ত্বের নিকট গ্রীকের এ সকল, বর্ব্বর বালকোচিত কল্পনা ভিন্ন অপর কোন উচ্চ নামে নামিত করা যাইতে পারে না।

উপরে যে দেবচরিতের আদর্শ প্রদত্ত হইল, তাহা হোমার ও হেসিওদের সময়ের। তাহাদের পরবর্ত্তী সময়ে লোকচিত্তের উন্নতি সহকারে, দেবচরিতেও অনেকটা উন্নত ভাব লক্ষিত হয়। ওলিম্পুস্ তখন, থেসালির অন্তর্গত তন্নামধারী পর্ব্বত হইতে পৃথক হইয়া, লোকাতীত কোন অদৃষ্ট এবং দিব্য স্থানে পরিণত হইয়াছে; দেবচরিতে প্রকৃত দেবত্বভাব কতকটা প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং জিউস্‌কে তখন বহুলাকারেই সর্ব্বশাসক দেবরাজপদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। জিউস্, এখন হিন্দু মহাদেবের ন্যায় ত্রিনেত্রে ভূষিত হইয়াছেন; ২৬ এই ত্রিনেত্র দ্বারা তিন লোক অর্থাৎ স্বর্গ নরক ও পৃথিবী অবলোকন করিয়া থাকেন।

কিন্তু তথাপি, এতটা উন্নতি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহবিতরণের সময় দেবতাদের খামখেয়ালিতাই বেশী এবং ন্যায়ানুসরণের ভাগ অতি কম। এবং জিউস্ তখনও, পৃথিবীস্থ সাহ বাদসাহের প্রতিরূপ;—এক পাল গৃহিণী, রোষতোষের আধার, শত্রুমিত্র উভয়ে পরিবেষ্টিত, খামখেয়ালিতায় পরিপূর্ণ, ভোগলালায়িত, ইত্যাদি। নতুবা, "আত্মৈবেদমগ্র আসিদেক এব" নহেন। বর্ব্বর জাতিকে বিদূরিত

২৬। Paus. II 24. 3.

করিয়া গ্রীক যেমন আত্মমনে আপনি শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যবান্ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বরূপ; দেবতার মধ্যে দেবরাজ জিউসও তদ্রূপ,—স্ফীতাকারের গর্ব্বিত গ্রীকমাত্র। লোকাতীত দেবত্বভাবের ছায়া সে চরিতে তখনও, হিন্দুর সঙ্গে তুলনা করিলে, অতি অল্প মাত্রাতেই পড়িয়াছে বলিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে হিন্দুর দেব-সংসারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর;—

"স্বর্গ ও পৃথিবীকে যিনি সৃজন ও ধারণ করিয়াছেন; যিনি ভূত সকলের জনয়িতা ও পিতা, যিনি আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, সেই আদি দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করি।"[২৭] পুনঃ ইন্দ্রদেবরাজ সম্বন্ধে,—

২৭। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতহঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১।
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ২। ইত্যাদি।
ঋঃ বে ১০।১২১।

এই সূক্তটি অতি অপূর্ব্ব। গুরুত্ব গূঢ়তা ও ভাব, তিনই ইহাতে চরমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক কষ্টে সমস্ত উদ্ধৃত করার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছি। এ হেন মহাসূক্তও, বৈদিকষণ্ডা মক্ষমূলর এবং সুতরাং তাহার উচ্ছিষ্টভোজী বঙ্গীয় বৈদিকবাচাল ও বৈদিকধৃষ্টগণের দ্বারা, নাস্তানাবুদ হওয়ার পক্ষে ক্রটি হয় নাই। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম," তাহারা এই পদের অর্থ করিয়া থাকে যে, ঋষি যেন দেবতা ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা স্বরূপ বলিতেছেন,—"কোন দেবতাকে হবি প্রদান করিব?" কেবল এই অর্থ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে; পুনঃ বলিতেছে যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থও, এই পদের ঠিক অর্থ করিতে না পারিয়া,"কস্মৈ" শব্দে "ক"নামক দেবতা এই অর্থ করিয়াছে? বেদের অপর অংশ ও স্বয়ং বেদস্বরূপ যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ, সেও মন্ত্রোক্ত কস্মৈ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে নাই এবং এখন সেই অর্থ ঠিক করিয়া দিলেন মক্ষমূলর! ধৃষ্টতার কি ইহাপেক্ষা আরও দৌড় থাকিতে পারে! ভাল, প্রশ্নাত্মক বাক্য হয় কখন?—যখন পূর্ব্বগত পদে কোন সন্দেহের সমাবেশ থাকে; কিন্তু এখানে তাহা কোথায়? বাক্যের প্রথমাংশ যেখানে স্থিরোক্তিসম্পন্ন, তদন্বয়ে দ্বিতীয় অংশ কখনও প্রশ্নাত্মক হইতে পারে না; সুতরাং এখানে প্রশ্নাত্মক বাক্যের একবারেই কারণাভাব। ক আদি বর্ণ হেতু, কদেবতা

"সেই বলই তাঁহার প্রদীপ্ত বল, যদ্দ্বারা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কে চর্ম্মের ন্যায় আবরিত করিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন।" ২৮

অথবা এরূপ পদ কতই উদ্ধৃত করিয়া শেষ করিব?

জিউস্ যেরূপে দেবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে ইন্দ্র দেবরাজত্বে অধিষ্ঠিত হইলেন কিরূপে, তাহা একবার দেখা যাউক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের দেবরাজপদে অভিষেক সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে।—'অনন্তর প্রজাপতি-প্রমুখ দেব সমস্ত এরূপ স্থির করিলেন যে, ইন্দ্র যখন দেবতাদের মধ্যে ওজিষ্ঠ বলিষ্ঠ সহিষ্ণু সত্তম পারয়িষ্ণুতম, তখন ইহাকেই আমাদিগের মধ্যে রাজা করিয়া ইহার মহাভিষেক করা যাউক। তখন ইহার জন্য ঋড্‌মন্ত্রনির্ম্মিত সিংহাসন আনয়ন করিলেন। বৃহৎ এবং রথন্তর সাম ঐ সিংহাসনের পূর্ব্ব দুই পদ; বৈরূপ ও বৈরাজ মন্ত্র উহার পশ্চাতের দুই পদ। শক্কর ও বৈরত মন্ত্র উহার শীর্ষক

বলায়, আদিদেবতাকেই বুঝান উদ্দেশ্য এবং এই সূক্তের বাচনীয় দেবতাও সেই আদি দেবতা। "কস্মৈ কায়াদিরূপায় (ক+৪র্থী—আদিরূপায়)। স্মৈ ভাবোঽপি ছান্দসঃ।"—শঙ্করাচার্য্য। কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণকে কস্মৈ অর্থ বুঝে নাই বলিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহারা যে শঙ্করাচার্য্যকেই ছাড়িবে তাহার সম্ভবতা কি?—বিশেষতঃ তাহাদের যখন এটাও একটা বিশ্বাস্য বিষয় যে, তখনও বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। সে যাহা হউক, সংস্কৃত 'কস্মৈ' শব্দ কি এতই কঠিন যে, স্বয়ং বেদমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ ও শঙ্করাবতার স্বরূপ শঙ্করও তাহার কাছে হারি মানিয়া ভ্রান্ত হয়? তবে কিনা ধৃষ্টের যদিও অবারিত মুখ ও অবারিত গতি বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাহা ছাপা না থাকায়, সংসারে তাহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

২৮। সাঃ বেঃ ২।২।৭।৯। ঋঃ বেঃ ১ম, ৩২ সূঃ অষ্টমঋচান্তে নিষ্কেবল্য শস্ত্রোক্ত যে নিবীদ্ প্রয়োগ হয়, তাহাতে ইন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ বিশেষণ পদগুলি একধা দৃষ্ট হয়।—"একজানাং বীরতমঃ। ভূরিদানাং তবস্তমঃ। হর্য্যোঃ স্থাতা। পৃশ্নে প্রেতা। বজ্রস্য ভর্ত্তা। পুরাং ভেত্তা। পুরাং দর্ত্তা অপাং স্রষ্টা। অপাং নেতা। নিজঘ্নিদুরেশ্রবাঃ। উপমাতি কৃদ্দংশনাবান্। ইহোশং দেবো বভূবান্। ইন্দ্রোদেব ইহ শ্রবদিহ সোমস্য পিবতু। প্রেমাংদেবো দেবহূতিমবতু দেব্যা ধিয়া।"

স্থান; নৌধস ও কালেয় মন্ত্র উহার পার্শ্ব। ঋভুমন্ত্র উহাতে বসিবার আসনের টানা, সামমন্ত্র পড়েন, যজুর্মন্ত্র টানা পড়েনের মধ্যস্থ ব্যবধান-গুলি। যশোদেবী উহার আস্তরণ, শ্রীদেবী উপবর্হণ। সবিতা ও বৃহস্পতি সিংহাসনের সম্মুখস্থ পদদ্বয়, বায়ু ও পূষা পশ্চাতস্থ পদদ্বয়, মিত্র ও বরুণ শীর্ষক এবং অশ্বিনদ্বয় পার্শ্বধারণ করিয়া আছেন।'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮।৩।৩

এক্ষণে প্রতীত হইবে যে, সিংহাসনের যেরূপ ধারণীয় ও ধারক সকল নিরূপণ পূর্ব্বক যে প্রকার মন্ত্রময় সিংহাসনে ইন্দ্রকে আরূঢ় করাইয়া দেবরাজপদে অভিষেক করা হইয়াছে; তাহাতে ঐ বর্ণনা সম্পূর্ণই যে কোন গুরুতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশেষের রূপক কল্পনা, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।[২৯] ফলতঃ বলিতে কি, হিন্দু দেবতত্ত্বের সঙ্গে গ্রীক-দেবতত্ত্বের তুলনাই হইতে পারে না; কারণ, দুই এক প্রকৃতির হইলেই তুলনা হইতে পারে, নতুবা পারে না; কিন্তু এখানে এক প্রকৃতিত্বের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। গ্রীকের দেবসংসার, দেবতত্ত্ব ও দেবচরিত আদি যথাবর্ণিতরূপে ইতিহাসবৎ বিশ্বাসিত, সুতরাং উহা ঐতিহাসিক বা ঔপন্যাসিক বর্ণনাবিদ্যার বিষয়ীভূত; আর হিন্দুর সেই সেই সমজাতীয় বিষয়, কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের রূপক কল্পনামাত্র; সুতরাং তাহা জ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত। একারণে যে ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য এবং বর্ণনায় স্থিরত্ব ভাব গ্রীকসংসারে দেখা যায়; হিন্দুসংসারে তাহা

২৯। আধুনিক বৈদিকবাচালের নিকট ঋকসূক্ত সকল কৃষকের গান ও কাব্যরস আস্বাদনের উপকরণ স্বরূপ হইলে হইতে পারে কিন্তু স্বয়ং বেদকর্ত্তা বৈদিক ঋষি যাঁহারা, তাঁহারা ঋক সম্বন্ধে সেরূপ ভাবিতেন না। যথা—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৩৯।

ঋঃ বে ১।১৬৪।

এখন বাঞ্ছারাম অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে, ইন্দ্রের সিংহাসন মন্ত্রময় হওয়ায়, উহাকে কিজন্য আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিশেষের রূপক স্বরূপ বলিয়াছি।

দেখিতে পাওয়ার বিষয় নহে। তত্ত্বানুভূতির প্রকার ও ক্রম অনন্ত, এজন্য তাহার কল্পনারূপও নব নব ও অসীম। তাই বলি, কোন্‌টা গ্রীকদিগের সঙ্গে তুলনা করা যাইবে? এখন একটা সদৃশ কল্পনা পাইয়া তুলনা করিতে বসিলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হয়ত আর একটা কল্পনা এমন বাহির হইতে পারে, যাহা তাহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রদিক্‌গামী। অধিক কথা কি, এই দেখনা কেন, এখনই যে ইন্দ্রের অভিষেক সম্বন্ধে এতটা বর্ণনা দিলাম, আর এক স্থানে সেই ইন্দ্র সম্বন্ধে কি বলিতেছে।—"ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি যম ইত্যাদি সেই একস্বরূপের কেবল বহুত্ব কল্পনা ও বহু নামস্বরূপ মাত্র।" [৩০] ইহাও এ স্থানে বলা কর্ত্তব্য যে, দেবদল সম্বন্ধে এরূপ একত্ব-নির্ব্বাচক ও একেশ্বরত্ব-বিধায়ক বাক্য, সমস্ত গ্রীকপুরাণ খুঁজিলে, কোথায়ও একটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু এবং গ্রীকের দেববিবরণ তুলনাস্থলে এরূপ বিসদৃশ ভাব ঘটিবার কারণ কি?—

মানবহৃদয়ে ধর্ম্মবীজের প্রথম বিকাশে, সুতরাং উচ্চতর শক্তি-বোধের প্রথম স্ফুরণে, মানব নিসর্গনিহিত শক্তি সকলেতে প্রধানতঃ দেবত্ব কল্পনার আরোপ করিয়া থাকে। উক্ত কল্পনা হইতে, প্রতি পৃথক ক্রিয়াধর্ম্মবিশিষ্ট প্রত্যেক শক্তিলীলায়, এক একটি পৃথক দেবতাস্বরূপ নির্ব্বাচিত হয়। সেই সকল দেবতা পুনঃ,মানবীয় বুদ্ধি ও জ্ঞানের নানাবিধ প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসারে, নানা মূর্ত্তি ও বিভূতিবিশিষ্ট এবং সেই নানা

৩০। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সম্রপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ ৪৬।
ঋঃ বেঃ ১।১৬৪।

গ্রীকদিগের গ্রন্থ হইতে কোন মূলাংশ উদ্ধৃত না করিয়া হিন্দু বৈদিক গ্রন্থ হইতে কেবল মূলাংশ উদ্ধৃত করিতেছি কেন, তাহার একটু কৈফিয়তের প্রয়োজন। বৈদিক-বিদ্যা অতি কঠিন: সুতরাং এই গ্রন্থে গৃহীত অর্থ বা ভাবসংগ্রহ পাঠকের অনুমোদিত না হইলে, মূল দেখিয়া যাহাতে তিনি নিজের সন্তোষ সাধন করিতে পারে, তাহারই জন্য মূলাংশ, যতদূর সম্ভব হইতে পারে ও স্থানে কুলায়, উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

মূর্ত্তির মধ্যে আবার কেহ স্ত্রী, কেহ বা পুরুষরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। তদনন্তর মানব, স্বীয় স্বীয় পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ পরম্পরায় অনুকরণে, দেবতাগণের মধ্যেও নানা সম্বন্ধ নির্ব্বাচনে ক্ষান্ত হয় না; এবং উহা হইতেই দেবতাদিগের মধ্যে, কেহ রাজা,কেহ পারিষদ, কেহ চর, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা ভ্রাতা, ইত্যাদি নানা সম্বন্ধের উদয় হয়। অতএব ধরিতে গেলে, এই দেবতত্ত্ব স্ফুরিতধর্ম্মবীজ মানবীয় মনের অবিকল প্রতিচ্ছায়ামাত্র। দেবতত্ত্বের ইহাই আদি অবস্থা। যত দিন মানব স্বীয় পাশববৃত্তি, অর্থাৎ শরীরপোষণ বিষয়ক চিন্তা লইয়া নিরন্তর ব্যাকুল থাকে এবং তদতিরিক্তে বিশেষ কোন অবসর পাইয়া উঠে না, ততদিন এই আদি অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। মানব যখন পাশববৃত্তির হাত হইতে অবসর পাইয়া, চিন্তাপথে প্রধাবিত হইতে পারে ও জ্ঞানমার্গে বহুদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হয়,তখনই কেবল দেবতত্ত্বের উক্ত আদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আলোচ্য জাতীয় জীবনদ্বয়ে,দেবতত্ত্বের প্রোক্ত আদি অবস্থা গ্রীকদিগের; যদিও গ্রীকদিগের ক্রমোন্নতি হেতু, কালে তাহা অনেকটা পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনশ্চ, যদিও পরবর্ত্তী সময়ে গ্রীকেরা পাশববৃত্তি পরিপূরণ হইতে অনেকটা অবসর লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও তাহাদের মন অভ্যাসবশে ও দেশকালাদির প্রভাবে ইহলৌকিক বিষয়ে এতই মগ্ন হইয়া থাকিত যে, দ্বিতীয়বিধ দেবতত্ত্বে প্রবেশ করিতে আর তাহাদের তাদৃশ প্রবৃত্তি ও মতিগতি ঘটিয়া উঠে নাই। প্লেটো ও সক্রেটিস আদির সময়ে যদিও দ্বিতীয়বিধ অবস্থায় প্রবেশ করিবার কতকটা চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও হিন্দুর তুলনায় অতি সামান্য, সুতরাং ফলও তাদৃশ ফলে নাই।

কিন্তু দেখা যায় যে,হিন্দু সেই দূরতম বৈদিককালেই, মনীষাশক্তির অসীম পরিচালনে, প্রথমবিধ দেবতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া, দ্বিতীয় অবস্থায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে একস্বরূপকে পুরাকালীন

গ্রীকেরা স্বপ্নেও কখনও অনুভব করিতে পারে নাই; হিন্দুদিগের নিকট, বহুধা-বিচ্ছুরিত দেবত্ব এবং দেবশক্তি আসিয়া সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় সমাবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে, মনুষ্যজীবনের উপরও নূতন তেজ ও নূতন জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে চলিয়াছে। বৈদিক ঋষি তখন দিব্যনেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন যে,সেই বহুদেব,তাহাদের ঐতিহাসিক ক্রম, পৌর্ব্বাপর্য্য এবং পারিবারিক সম্বন্ধ, ঔপন্যাসিক বিবরণ ও বর্ণনা, এ সকল বস্তুতঃ সেই একস্বরূপের বহুধা প্রচারিত মহিমা বিকিরণমাত্র; তাঁহারই বহুবিস্তৃত বিভূতির বিভিন্নরূপক কল্পনা স্বরূপ; তদ্ভিন্ন বস্তুতঃ তাহাদের পৃথক্ কোন সত্তা নাই। তাই তিনি যোগাবেশে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিলেন যে, "সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।" তাই তাঁহার নিকট সকল দেবতাই সমান শ্রেষ্ঠ; অথবা অনুষ্ঠানবিশেষের আবেশ ও আগ্রহবশে, কেহ এখন শ্রেষ্ঠ হইতেছে, কেহবা তখন কনিষ্ঠ হইতেছে; এবং তাই পুনঃ এখন যথায় যেরূপ বর্ণনা ও বিভূতি, পরক্ষণেই তথায় অন্য বিবরণ ও অন্য বিভূতির সমাবেশ দেখা যাইতেছে। তাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বত্রই সমত্বপূর্ণ এবং সর্ব্ববিধ প্রয়োগ অপ্রয়োগেরও তিনি আশ্রয় অথচ উপরমস্থান। ফলতঃ মানবীয় মনের অবস্থা ও ভাবাবেশের প্রকার ও প্রকরণ অনুসারেই, প্রয়োগ অপ্রয়োগে প্রকারভেদ এবং দেবচরিতে ইতরবিশেষত্ব, বহুত্ব ও বৈচিত্র আদির উপস্থিতি হয়। এখন অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে, কেন হিন্দু এবং গ্রীকের দেবতত্ত্ব তুলনস্থলে বিসদৃশ ভাব দৃষ্ট হয়। দুই সম অবস্থা ও সম পর্য্যায়ের হইলেই সুন্দর তুলনা হইতে পারে। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, গ্রীকের দেবতত্ত্ব আদি পর্য্যায়ের, আর হিন্দুর পর্য্যায় তদুত্তরতর।

মক্ষমূলর প্রভৃতি, ইউরোপীয়; হিন্দুর তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দেবতত্ত্বে সুতরাং প্রবেশ করা সহজ নহে। তাই আকুল হইয়া স্থির করিতে পারে নাই যে, হিন্দুকে বহুদেব-উপাসক বলা যাইবে কি একেশ্বরবাদী বলা যাইবে; অথবা দেবতার মধ্যে ইহাদের নিকৃষ্ট

বা কে আর উৎকৃষ্টই বা কে। আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীন হিন্দুরা কিরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন? তাঁহাদের সে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" বলিতে তাঁহারা কি বুঝিতেন? ইন্দ্র অগ্নি বায়ু ইত্যাদি, এ সকল কি একমাত্র পরমেশ্বরের বহুধাব্যাপ্ত বিভূতির কেবল অলীক ভাবকল্পনা; অথবা ইহাদিগেরও প্রত্যেকের পৃথক্ দেবতারূপ পৃথক্ সত্তায় বিশ্বাস করিতেন? দেখা যাউক।

পরমাত্মাই অনন্বিতভাবে ব্রহ্মশব্দে আখ্যাত হইয়াছেন; ক্রিয়ান্বয়ে তাঁহাতেই পুনঃ পরমেশ্বরত্ব। পরমেশ্বর স্বীয় বৈষ্ণবী শক্তিযোগে এই বিশ্বমধ্যে আত্মপ্রকটিত করিয়া থাকেন। শক্তি এবং শক্তিধরে দুই পৃথক্ সত্তা নহে; সুতরাং যেখানে শক্তির বিকাশ, সেইখানে ঐশ্বরিক-সত্তারও বিদ্যমানতা। শক্তির পরিচয় কর্ম্মে এবং কর্ম্মই পদার্থপদ-বাচ্য। অতএব ঐশ্বরিকসত্তাও, সর্ব্বপদার্থে দ্যোতনশীলতায় বিদ্যমান রহিয়াছে; ফলতঃ তাহা ভিন্ন কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। ঐশ্বরিকসত্তার দ্যোতনশীলতা হইতে দেবতা। এই কারণেই, বেদোক্ত যাবতীয় পদার্থনামকে দেবতাপদে গণনা করা হইয়াছে।[৩১] আমার বোধ হয়, তদ্রূপ সেই আদিম বৈদিক দেবতা বোধ হইতেই হিন্দুগৃহে মূর্ত্তিপূজা, এমন কি বৃক্ষ প্রস্তরাদির পর্য্যন্ত পূজা উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ যেখানে ঐশ্বরিক সত্তার সর্ব্ব-ব্যাপকতায় এরূপ বিশ্বাস, সেখানে মূর্ত্তি বা সাঙ্কেতিক পদার্থ বিশেষের পূজা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না; অথবা ইহা বলিলেও নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না যে, সেরূপ পূজা বস্তুতঃ সেই পরমেশ্বরে গিয়াই বর্ত্তে। ঈশ্বরই হউন বা দেবতাবিশেষই হউন, মূর্ত্তি যে তাঁহা-দের নাই বা থাকিলেও তাহা অপরিজ্ঞাত; অথবা সত্তা যাহা তাহা যে মূর্ত্তি বা আকৃতি বা আধারবিশেষের অপেক্ষা রাখে না, তাহা হিন্দুরাও না বুঝিতেন এমন নহে। তথাপি তাঁহাদের বর্ণনে বা গঠনে, মূর্ত্তি কল্পনার কারণ কি?—ইহার কারণ অন্য কিছুই দেখা যায় না, কেবল

৩১। নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড।

এই যে, মানুষ স্বীয় ধারণাকে অতিক্রম করিয়া কোন বিষয় অনুভব বা আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং অনুভূতি ও ধ্যানের সহায়তাই উহার উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ক কল্পনাও সুতরাং সম্পূর্ণতঃ মানবীয়। ৩২ পুনশ্চ, ঐশ্বরিক সত্তা ও পদার্থ, এতদুভয়ে যেরূপ সম্বন্ধ ও যেরূপ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব; সে পক্ষে এই উপমা দেওয়া হয় যে, আকাশকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ বায়ুর অস্তিত্ব এবং আকাশ তাহাকে আশ্রয় করিয়া নাই, সেইরূপ ঐশ্বরিক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া পদার্থ এবং পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ঐশ্বরিক সত্তা নাই। ৩৩

এক্ষণে সামান্য পদার্থখণ্ড সকল অতিক্রম করিয়া, বিস্ফারিতদৃষ্টিতে দর্শন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ জগতে এমন আরও কতকগুলি বিশালশক্তিলীলা-সমম্বিত পদার্থ আছে, যাহা জগতের প্রত্যক্ষ পরিচালকস্বরূপ এবং মনুষ্যপক্ষেও যদ্দত্ত শুভাশুভকে অবলম্বন ভিন্ন মনুষ্যজীবন তিষ্ঠিতে পারে না; যথা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, সে সকলও অবশ্য কথিত ঐশ্বরিক সত্তায় সত্তাবান্। এজন্য সে সকলকেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবতা এবং তাহাদিগের জগৎ-পরিচালকতা হেতু, লোকপাল দেবতারূপে কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের প্রত্যেকে, কোন এক পৃথক ধর্ম্মানুসারে যে কার্য্য, তাহাই করিয়া থাকে এবং তদতিরিক্তে আর কিছু করে না; যেমন আগুন কখন জলের কাজ করে না; তখন কাজেই, কি সেই দেবত্ব কি লোকপালত্বকে, কেবল ভাব কল্পনা বলা যাইতে পারে না; তখন কাজেই, তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্

৩২। এতদ্বিষয়ে একটি শ্লোক ভক্তসম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা এই ;—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতঃ ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দ্দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষান্তব্যং জগদীশ তৎকরুণয়া দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥"

৩৩। ভগবদ্গীতা ৯। ৬।

লোকপাল দেবতা বলিয়া ভাবতঃ ও কার্য্যতঃ (যদিও অবশ্য বস্তুতঃ নহে) তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্‌সত্তা ও পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। উপনিষদ্ সকল, নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরবাদপূর্ণ হইলেও, প্রোক্ত কারণ হেতুই দেখা যায় যে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আদির পৃথক্ অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই। তথায় তাহাদিগকে অগ্নির অভিমানী দেবতা, বায়ুর অভিমানী দেবতা ইত্যাদি ভাবে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। দেবতা একই, কেবল বিশেষ বিশেষ গুণ কার্য্য ও উপাধি অভিমান হেতু পৃথকত্ব ও পৃথক্ দেবত্ব ; যদ্রূপ আত্মা সমষ্টিভাবে যদিও এক, তথাপি পৃথক্ পৃথক্ শরীরাভিমান হেতু পৃথক্ পৃথক্ জীবত্ব। সে যাহা হউক, এরূপ মধ্যবর্ত্তী লোকপালের ধারণা, আমার যেন বোধ হয়, স্বাভাবিক ;—স্বাভাবিক হেতু সত্যপূর্ণও বলা যাইতে পারে। যেহেতু, দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল জাতীয় দেবতত্ত্বই, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী দেবতার অস্তিত্বে যে বিশ্বাস, তাহা একবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এমন কি, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে পর্য্যন্ত, এই মধ্যবর্ত্তী দেবতার অস্তিত্ব দেখা যায় ; যদিও তথায় তাহাদের দেবতা নামের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যভারপ্রাপ্ত 'স্বর্গীয় দূত' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন বোধ হয় প্রতীত হইবে যে, হিন্দুরা কি প্রকারে একই সঙ্গে একেশ্বর বাদ ও বহুদেবতাবাদ, উভয় মত পোষণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বব্যাপী এক ঐশ্বরিক সত্তার গুণকার্য্যবিভাগ ও উপাধিভেদে পৃথকত্ব হেতু, দেবতত্ত্বে এক মুখে বহুত্ব আর মুখে একত্ব। সেই জন্য হিন্দুরা কখনও বহুদেবতা পৃথকভাবে পূজিয়াছেন, কখনও তাহাদিগকে একস্বরূপের বহুধা কল্পনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুনশ্চ, উক্ত বহুত্বকে মূলে ঈশ্বরেরই মহিমাবিকাশ বুঝিয়া, দেবতাদের মধ্যে কি স্থায়ী সম্বন্ধভেদ, কি স্থায়ী শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টতা আদি শ্রেণিনির্ব্বাচন, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। আদিম হিন্দু ধর্ম্মবীজের প্রথম স্ফুরণে নিসর্গশক্তি সকলে যে দেবতা

কল্পনা করিয়াছিলেন; বৈদিক হিন্দু তত্ত্বপথে প্রধাবিত হইয়া তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের দ্বারা, তাহাকে এরূপে সংস্থিত ও তাহার সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন।

আরও কথা এই। মানব আত্মিকভাবে, পরমাত্মার ব্যষ্টিরূপ এবং আর সমস্ত ভাবে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের সূক্ষ্মরূপ। এজন্য কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয় সংসারে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই মানবের জীবত্বতত্ত্বে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এক্ষণে মানব কোন দেবতাবিশেষ হইতে শুভাশুভপ্রার্থী হইলে, সেই বিশেষ দেবত্ব তত্ত্ব,যাহা সূক্ষ্মভাবে তাহাতেও অবস্থান করিতেছে, তাহাকে উত্তেজনার দ্বারা অভীষ্ট দেবতা সহ স্বীয় একতানতা সাধন করিতে পারিলে,অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। সেই উত্তেজনা ও একতানতা, উপযুক্ত ও অনুরূপ শব্দশক্তির দ্বারা যতদূর হইতে পারে, ততটা আর কিছুতে হয় না; যেহেতু সংসারেও নিত্য ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, শব্দশক্তিতে যতটা কার্য্য হয়, মানবীয় আর কোন শক্তিতে ততটা সাধন করিতে পারে না। ইহাও পুনঃ স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, শক্তিতে শক্তিতে ঘাত প্রতিঘাত হইলেই, তরঙ্গ উত্থানে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ইহার একতর বা উভয় সূত্র ধরিয়াই, কর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং এই শব্দশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই, কথিত উত্তেজনা ও একতানতা সাধনের উপায় স্বরূপ, অনুরূপ শব্দ যোজনায় বেদমন্ত্রের উদয় হইয়াছে; এবং এই বেদমন্ত্রের যে ফলোপধায়কতা, তাহা দার্শনিকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।[৩৪] ইহাই হিন্দুর বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে, বিশেষ বিশেষ দেবোপাসনা যজ্ঞ ও মন্ত্রাদির তত্ত্ব।

দেবতত্ত্বসহ শব্দশক্তির তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হেতু, শব্দশক্তি "শব্দব্রহ্ম" আখ্যায় ঘোষিত হয় এবং এই শব্দব্রহ্মের চূড়ান্ত সঙ্কেত "ওম্"। "ওম্"

৩৪। মন্ত্রশক্তি নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ লেখক স্বয়ং এতৎ সম্বন্ধে যে দুই একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

শব্দের অর্থ "হাঁ", ৩৫ অর্থাৎ অস্তিত্ব; অস্তিত্বই সৎ, সত্য এবং ব্রহ্মস্বরূপ। অতঃপর উভয় জাতির পরলোকবুদ্ধি কতদূর ও কি প্রকারের, তাহা আলোচনা করা যাউক।

পরলোক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই পৃথিবীস্থ জীবলোকের উর্দ্ধে, স্তম্ভাবলীর আশ্রয়ে এবং আটলাস্ নামক অসাধারণ মনুষ্যের দ্বারা ধৃতভাবে, দেবলোক বা স্বর্গের অবস্থিতি; পুনঃ ঐ জীবলোকের নিম্নদেশে নরক। এই নরকের গ্রীক নাম তার্তারোস্। কিন্তু হোমারাদির সময়ে মৃত লোকের আত্মা, না ঐ স্বর্গ না ঐ নরক, এ দুয়ের কোথাও স্থান পাইত না। স্বর্গ দেবলোকের বাসস্থান এবং তার্তারোস্ অপরাধী দেবতাদের কারাগার স্বরূপ ছিল। মৃত মনুষ্যের আত্মা সকল, তখন ইরিবোস্ নামক স্থানে প্রেরিত হইত। পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে ওকেয়ান্ ৩৬ নামে

৩৫। উর্দ্ধ উ স্ব্ ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতেতি যদ্বৈ দেবানাং নেতি তদেষা-মোমিতি।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৩।

এই স্থান দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে "ওম্" অর্থে "হাঁ"।

৩৬। ওকেয়ান্ অর্থে মহাসমুদ্র। হোমারের সময়ে ঐ শব্দে নদী বুঝাইত; কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে উহাই,নদী অর্থ লোপে,মহাসমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং তখন ইরিবোস্ও দ্বীপ, এবং কেবল দ্বীপ নহে, পুণ্যাত্মার আবাসভূমি সুখময় দ্বীপ বলিয়া গৃহীত ও ইলিসীয় ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, সে কথা মূল প্রস্তাবেই কিছু পরে উল্লিখিত হইবে। আপাততঃ, ওকেয়ান্ শব্দের নদী অর্থ লোপে সমুদ্র অর্থপ্রাপ্তির সুন্দর সাদৃশ্য, সংস্কৃত সিন্ধু শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃতে সিন্ধু অর্থে নদী; এই জন্য আর্য্যেরা প্রথমে আসিয়া যে পঞ্জাব প্রদেশে বাস করেন, তথায় সপ্ত নদীর (সিন্ধু, তাহার পঞ্চ শাখা ও স্বরস্বতী) প্রাবল্য হেতু,সে প্রদেশের নাম হয় সপ্তসিন্ধু প্রদেশ। এই সপ্ত সিন্ধুই একপক্ষে, পৌরাণিক সময়ে যখন সিন্ধু অর্থে সমুদ্র বুঝাইতে লাগিল, তখন লবণ ইক্ষু আদি সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণদোষে, সিন্ধু শব্দ "হিন্দু" উচ্চারিত হইয়া, ভারতীয়

নদী, সেই নদীর পশ্চিমপারস্থ স্থানের নাম ইরিবোস্; তথায় চন্দ্র সূর্য্যাদি কখনও উদয় হইত না বলিয়া তাহা চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

ইরিবোস্, সর্ব্বদা নিরানন্দময় ও নানা ক্লেশভোগের স্থান। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্ফূর্ত্তির ফলে ইরিবোস্ বা নরকের রাজত্বভার, জিউসের ভ্রাতা হেদিসের ভাগে পতিত হয়। সেই হেদিস্ এই ইরিবোসের অধিপতি, হিন্দুদিগের যমরাজস্থানীয়। হেদিসের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় অভিপ্রায়ে অটল, কাহারও সহস্র কান্নাকাটী বা অনুরোধে দৃক্‌পাত করেন না, ক্ষমা কাহাকে বলে তাহা জানেন না, দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, নিরানন্দময় এবং মুখ সর্ব্বদা কালিমার ছায়ায় আচ্ছন্ন; একবার কেহ তাঁহার পুরে গমন করিলে আর কখনও সে ফিরিতে পারে না। হেদিসের এইরূপ চরিত্র জন্য, তিনি দেব এবং মানব উভয়েরই নিকট ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র।[৩৭] কিন্তু এ হেন হেদিসেরও প্রেমকাহিনী ও প্রেমের খেলা অনেক। তিনি পার্সিফোনি বা প্রোসার্পিণিকে হরণ করিয়া নিজের পাটরাণী করেন। তাহা ব্যতীত লিউকে ও মেন্থা নামে আরও দুইজন ভালবাসার পাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইরিবোস্ বৈতরণীর ন্যায় ষ্টিক্স নামক নদীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং পুর প্রবেশের পথ কের্বিরোস্ নামক ত্রিশিরোবিশিষ্ট একটা কুকুরের দ্বারা রক্ষিত; উত্তম অধম, পুণ্যবান পাপী, সৎ অসৎ, উভয় নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের আত্মাই ইরিবোসে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং সকলেরই একবিধ গতি। হেদিসের অধিকার সম্বন্ধে, প্রেমপাত্রী পার্সিফোনিকে হেদিস্ আশ্বাসবাক্যে বলিতেছেন ;—"তুমি এখানে আসিলে, যাবতীয় মৃত জীবের এবং এমন কি যাহারা জীবিত ও এখনও অবনীতলে

দিগের হিন্দুনামের সৃষ্টি করে। তাহা পুনঃ, গ্রীকদিগের "হ" অক্ষর না থাকায় "ইন্দ" এবং "ইন্দ" আবার লাতিন ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গান্ত হইয়া "ইণ্ডিয়া" নামের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ ইণ্ডিয়া নামেই ভারত আপাততঃ ইউরোপভূমে বিদিত।

৩৭। Il. IX. 158, 159.

বিচরণ করিতেছে, তত্তাবতেরও তুমি স্বামিনী হইবে। যে কেহ কোন রূপে তোমার ক্ষতিকারক, যাহারা তোমাকে পূজোপহারে সন্তুষ্ট না করিয়া থাকে, এখানে নিরন্তর তাহাদিগের দণ্ডবিধান করা যাইবে।" ৩৮ এই লোকে সৎ ও অসতের প্রভেদ না রাখার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবীপুত্র একিলিস্ এবং অপরাপর মহাজ্ঞানী প্রভৃতি হইতে অঘোর পাপী পর্য্যন্ত, সকলেই একস্থানে সন্নিবিষ্ট। ৩৯ সকলের পক্ষে যেমন একই বিধ গতি, তেমনি আবার সে গতি অতিশয় দুঃখময় ; সুখ স্বচ্ছন্দতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। প্রেতাত্মা সকল, এই নিরানন্দময় অন্ধকারপূর্ণ দেশে, যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়ায় ; পৃথিবীতে বসতিকালীন সেই পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, পরস্পর আলাপ ও অনুশোচনা করিয়া থাকে ; তাহাদের দুর্দ্দশা দুরবস্থা ও ক্লেশভোগ সর্ব্বদা অতি তীব্র ও তীক্ষ্ণতর ; এবং তাহারা, কি শরীর কি মন, উভয়তঃ, সর্ব্বপ্রকারে শক্তি ও সামর্থ্যশূন্য। ৪০ জনৈক প্রেত ইউলিসিসের নিকট ব্যক্ত করিতেছে,—"মৃত্যু অন্তে সকল ব্যক্তিরই এই দুর্দ্দশা। জীবন গত হইবামাত্র অগ্নিতেজে শিরা সকল অস্থিমাংসশূন্য হয়, কিন্তু আত্মা স্বপ্নবৎ পলাইয়া প্রস্থান পূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে।" ৪১ দেবীপুত্র একিলিসের আত্মা ইউলিসিসের নিকট বলিতেছে ;—"মৃত্যুর নাম আর আমার সাক্ষাতে করিও না। মৃত্যুলোকের উপর রাজত্ব অপেক্ষা, পৃথিবীতে যে নিতান্ত দরিদ্র এবং চাষবাস ও উঞ্ছবৃত্তি করিয়া খায়, তাহার দাসত্ব করিয়া খাওয়াও পরম সুখের বলিয়া জানিবে।" ৪২

পরলোক সম্বন্ধে উপরে যে অংশ সংগ্রহ করা হইল, তাহা সমস্ত প্রায় ইলিয়দ ও ওডিসী নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে। ৪৩ গ্রীকদিগের মধ্যে

৩৮। Hom. Hym.—Ceres.
৩৯। Odys. XI.
৪০। Odys. XI.
৪১। Odys. XI.
৪২। Odys. XI.
৪৩। ইলিয়দ, ওডিসী এবং হোমারিক স্তোত্র সমূহই, গ্রীক ধর্ম্মবিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা

আর যে কতকগুলি খণ্ডস্তোত্র প্রচলিত আছে, যাহা হোমারিক স্তোত্র নামে খ্যাত, তাহাতেও পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চ আশা ভরসার পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ সকল স্তোত্রেও, পাপপুণ্য ও তদনুসারে বিভিন্ন প্রকার ফলভোগ সম্বন্ধে, স্পষ্টতঃ কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্তোত্রের মধ্যে, প্রার্থনা অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা সমস্তই কোন না কোন পার্থিব বিষয়ের জন্য। ৪৪ তাহার পর, এই সকল স্তোত্র এবং ইলিয়দ ও ওডিসীর পরবর্ত্তী সময়ে, হেসিওদকৃত গ্রন্থ সকল এবং থিওগণিসোক্ত বিজ্ঞ বচনাবলীর যখন উদয় হয়; তখনও পরলোক সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অপেক্ষাকৃত উন্নতভাব গ্রীকমনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। এই শুন, থিওগণিসোক্ত বিজ্ঞ বচনাবলীর মধ্যে, পরলোক সম্বন্ধে কিরূপ আশা ভরসা এবং জীবনের কিরূপ প্রার্থনীয় বিষয় সকল সূচিত হইয়াছে।

"মনুষ্যসন্তানের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, একবার মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত এবং প্রোসার্পিণির বাসভবন যমপুরিতে উত্তীর্ণ হইলে, আর সে আনন্দভোগে সমর্থ হয়; যেহেতু গীতবাদ্যও তখন আর তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, এবং মধুররস মদিরাও আর তাহার রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে আইসে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, যে পর্য্যন্ত জীবন থাকে তাহা যেন নিঃশঙ্ক ভাবে ও মনের আনন্দে অতিবাহিত করিয়া যাই।

"যাহারা মৃত ব্যক্তির জন্য খেদ করে, কিন্তু (বিনা সুখভোগে

প্রাচীন সম্পত্তি; অর্থাৎ হিন্দুদিগের বৈদিক মন্ত্র প্রকরণাদির স্থলীয়। কিন্তু যদি উভয়তঃ প্রাচীনত্বের তুলনা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, হিন্দুর বেদবিদ্যার তুলনে, গ্রীকের হোমারিক স্তোত্র ও ইলিয়দ আদি সে দিনকার পদার্থ। উভয়তঃ কত শত শত বা সহস্রাধিক বর্ষের ব্যবধান হইবে।

৪৪। Homeric Hymns, VI Aris, IX Athae, XI Ceres, XIV Æsculap, XVI Herm, XX Posied, XXI Zeus, XXVI Dion, XXVII Hest and Herm. XVIII Earth, ইত্যাদি।

বিফলে) গতপ্রায় যৌবনের প্রতি একবারও সাশ্রুনয়নে তাকাইয়া দেখে না, তাহারা কি বালকবৎ মূঢ়!

"অন্তঃকরণ, তুমি আশ্বস্ত হও এবং (যে পর্য্যন্ত জীবন থাকে সে পর্য্যন্ত) আনন্দে কালাতিপাত করিতে শিখ; যেহেতু মৃত্যু আসিলেই এই মৃত্তিকাবৎ তোমাকে চৈতন্যশূন্য হইতে হইবে।

"যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা অর্থই সুন্দর এবং আনন্দদায়ক; হে অর্থ, তোমার অনুগ্রহ হইলে, আমি অধম হইয়াও উচ্চ মনুষ্যপদবী-লাভে সমর্থ হই।

"লোটোনাপুত্র ফিবস্-আপলো এবং দেবরাজ জিউসের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি যেন পার্থিব আপৎ হইতে তফাত থাকিয়া যৌবনসুলভ সুখ এবং অর্থপ্রাচুর্য্যে এই জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই।" ৪৫

হিন্দুর পরলোক এরূপ নহে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। জাতিদ্বয় সম্বন্ধে যে তুলনা করিয়া যাওয়া যাইতেছে, তাহা তদুভয় জাতির জাতীয় জীবনের সমকালিকতা ধরিয়া নহে। সমকালিকতা ধরিয়া সেরূপ তুলনা হইতেই পারে না, কারণ হিন্দু সভ্যতার উদয় সহস্র বা বহু সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, আর গ্রীক সভ্যতার উদয় সহস্র বা বহু সহস্রাধিক বর্ষ পরে। অতএব তুলনা করা যাইতেছে, যখন উভয়তঃ ঐতিহাসিক কালের প্রভাতোদয় হইয়াছে, তদানীন্তন সেই ঐতিহাসিক অবস্থা-সমতা ধরিয়া। বাঞ্ছারাম, কথাটা একটু মনে রাখিয়া চলিও।

হিন্দুর পরলোক এরূপ নহে। এ পরলোকের সংসারচিত্র অতি অপূর্ব্ব, পরিষ্কার, পরিছিন্ন ও সম্পূর্ণ। ত্বষ্টৃদুহিতা শরণ্যু এবং বিবস্বানের পুত্র যম, সর্ব্বপ্রথমে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরলোকের প্রভুত্ব অধিকার করিয়াছেন। তিনি পাপের দণ্ডদাতা; অথচ পুণ্যপ্রতিম পবিত্রদেহ এবং দিব্যমূর্ত্তি পিতৃলোকেরও অধিপতি। গ্রীক ত্রিশির

কের্বিরোস্ নামক কুক্কুরের ন্যায়, যমেরও পুরপ্রবেশের পথ শ্যামা ও সবলা নাম্নী কুক্কুরীদ্বয়ের দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। পাপিগণ যমকিঙ্করের দ্বারা নীত হইয়া দুঃখদেশে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পুণ্যবান্ যাহারা, তাহাদের সঙ্গে যমের অনুচরবর্গের কোন সংস্রব নাই; অগ্নিদেব স্বয়ং তাহাদিগকে পুণ্যদেশে নীত করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহারা অপার সুখভোগের ভাগী হয়। অগ্নিই পুণ্যবানের নেতা। সামমন্ত্রোক্ত স্তোত্রে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে;—"হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। অতএব প্রার্থনা, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর এবং যাহাতে স্বর্গ ও উচ্চলোকে যাইতে পারি, তাহা সম্পাদন করিয়া দেও।"[৪৬] বেদোক্ত এবং তৎপরবর্ত্তী উপনিষদোক্ত পুণ্যলোক কিরূপের, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।[৪৭]

পরলোকে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার, ইহা হিন্দুদিগের অনাদি বিশ্বাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরলোকে পাপপুণ্যের তুলাদণ্ড নিতান্ত অনবহেলনীয়রূপে বর্ত্তমান; তাহাতে পুণ্যপাপের সর্ব্বদা সত্য পরিমাণ হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে অনুজ্ঞা করিলেও, সে তুলাদণ্ডের ব্যতিক্রম নাই। কৃষ্ণ উপদেশ করিলেন, যুধিষ্ঠির কৌশল খাটাইলেন, সত্যকে চোক ঠারিয়া বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"; কিন্তু তথাপি তাঁহার নরক-দর্শন হইতে নিবৃত্তি হইল না!

বেদে তিন লোক মাত্র কীর্ত্তিত দেখা যায়,—ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক। কিন্তু উপনিষদ ও পুরাণের সময়ে, ঐ সংখ্যার অনেক আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ঊর্দ্ধে সপ্ত লোক এবং অধোতে সপ্ত লোক; ঊর্দ্ধলোক পুণ্যস্থান এবং অধোলোক পাপস্থান। কি মনুষ্য, কি ইতর জীব, কি কীটপতঙ্গ, সকলেই অবিনাশী আত্মার

৪৬। সাঃ বেঃ ১।১।১০।

৪৭। ১৪৫।১৪৬ পৃষ্ঠা এবং ১৭ সংখ্যক টিপ্পনী দেখ।

আত্মাবান্। জীব সকল, সুকৃতি বা দুষ্কৃতির পরিমাণ অনুসারে, পর পর উচ্চ বা অধম লোক সকলে গমন করিয়া, কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। কি উচ্চ কি অধম, কোন পক্ষেই এ ভোগ অনন্ত নহে। কর্ম্ম দ্বিবিধ, এক সকাম ও অপর নিষ্কাম। সকাম কর্ম্মই সুকৃতি বা দুষ্কৃতির আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য ভোগাভোগ ঘটনা হয়। এই সকাম কর্ম্মের মূলস্বরূপ কামনার দ্বিবিধ প্রকার ভেদে দ্বিবিধ পরিণাম; যে কামনা কার্য্যতঃ কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার পরিণাম ভোগ; যে কামনা তাহা হইতে না পাওয়ায় অতৃপ্ত রহিয়াছে, তাহার পরিণাম কামনানুরূপ ক্রিয়াপ্রদ পুনর্জন্ম। এই শেষোক্ত কামনাকেই পুনর্জন্মপ্রবর্ত্তক কর্ম্মসূত্র [৪৮] বলা যায়। কামনার উত্তমাধমতা অনুসারে, পুনর্জন্মও উত্তম বা অধম যোনিতে সংঘটিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মজন্য যে ভোগ, তাহা যে কেবল পরলোকে ভোগ্য তাহা নহে। কোন কোন ভোগ ইহলোকেও হইয়া থাকে। কার্য্যকারণপরম্পরার উত্তেজনায় তীব্রতা বা মৃদুতা অনুসারে, যে ভোগ শীঘ্র ঘটিবার তাহা ইহলোকে ভোগ হইয়া যায় এবং যাহা সেরূপ শীঘ্র না ঘটে, তাহা কাজেই লোকান্তরে ভোগ্য হয়। কর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে উচ্চ বা বা অধম যে লোকে হউক, ভোগ শেষ হইয়া গেলে; জীব তখন কর্ম্ম-সূত্র অনুসারে যথাযোগ্য দেহ মন অবলম্বনে নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া

৪৮। ফলতঃ ধরিতে গেলে, হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার মূলসূত্রই কামনা। অবিদ্যামোহে আত্মার যে কিছু কামনা উৎপন্ন হয়, সেই কামনা জন্যই জীবত্ব ও জড়সৃষ্টি। কামনা জন্য আদি সৃষ্টি মনঃ, উহাই 'হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা' অবস্থা। মানসধর্ম্মে পুনঃ, উচ্চাধঃ উভয়মুখে, সেই কামনা যত বিভিন্ন প্রকারে প্রসারিত হয়; স্থূল সৃষ্টিও সেই-রূপ উত্তমাধমাদি নানা শ্রেণিভেদে, নানা বিভিন্ন আকারে উদয় হইতে থাকে। বোধ হয়, এই তত্ত্বেরই রূপক অর্থে, পুরাণাদিতে "বিধাতার মানস-সৃষ্টি" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ বিধাতা যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তাহা সমস্তই ইচ্ছাসূত্রে ও মানস-শক্তির প্রভাবে।

থাকে। কর্ম্মসকলও যে কেবল ভুক্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা নহে; ভালয় হউক, মন্দয় হউক, উহা সূক্ষ্মদেহে যে কলঙ্কপাত করিয়া থাকে, তাহাও কর্ম্মসূত্রসহ সংমিলিত হইয়া পরজন্মে দেহ মনাদির আকার ও অবস্থা গঠনে নিতান্ত অল্প সহায়তা করে না। সকাম কর্ম্ম যতই উৎকৃষ্ট হউক, মোক্ষ যাহাকে বলে তাহা তাহাতে হয় না। ঐরূপ কর্ম্মফলে জীব যত উচ্চলোকে নীত হউক না কেন, ভোগশেষান্তে পুনরাবর্ত্তনে আবার তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে। কেবল নিষ্কাম কর্ম্মেই মোক্ষ হইতে পারে। ফল-কামনা না থাকিলে, ফলস্বরূপ কর্ম্মজন্য ভোগও হইতে পারে না। অথবা ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত সেরূপ কামনায় কর্ম্মসূত্রও নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং কর্ম্মহেতু ভোগলোক এবং কর্ম্মসূত্র হেতু পুনর্জন্ম, উভয়েরই অভাব নিবন্ধন, কাজেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, উপরে কর্ম্ম ও কর্ম্মসূত্র জন্য যে সকল ভোগাভোগ এবং পুনর্জন্মাদির বিষয় কথিত হইল, সেই সকল তত্ত্ব ঠিক সেই ভাবে বেদসংহিতা সকলে নাই; উহা বেদান্তস্বরূপ উপনিষদ সকলের শিক্ষা। কিন্তু যে তত্ত্বসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদে তদ্রূপ মত ঘোষিত; সে তত্ত্বসূত্র বেদসংহিতা সকলে যথেষ্ট ও স্পষ্টরূপে উক্ত ও আভাসিত দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকদিগের মধ্যেও, পুনর্জন্মতত্ত্বের প্রচলন ও তাহার প্রতি বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; যদিও কেহ কেহ বলিয়া থাকে বটে যে, ঐ বিশ্বাস হোমারাদির সাময়িক ও সমপ্রাচীন নহে; অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। ৪৯ ফলতঃ আসিয়া-

৪৯। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে গ্রীকদিগের প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। উহার প্রাচীনতম উল্লেখ পিণ্ডারকৃত গ্রন্থে (Ol. ii.) কিন্তু ডিওগিনিস লেয়ার্টিয়সের লিখিত গ্রীক বিজ্ঞদিগের জীবনচরিত গ্রন্থে দেখা যায় যে, পীথাগোরাস ও তাঁহার শিষ্যবর্গ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। পীথাগোরাস্ নিজে, পীথাগোরাস্-জন্মের পূর্ব্বগত চারি জন্মের সংবাদ দিতেন এবং বলিতেন যে, আপলোদেবের বং

খণ্ডস্থ দেশ সকলও মিসরের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতায় আসিবাতে, গ্রীকদিগের বুদ্ধি, বহুদর্শিতা ও ধারণাশক্তি যখন বহু পরিমাণে বিস্ফারিত হইয়াছিল; দেখা যায় যে তখনই তাহাদের পরলোক সম্বন্ধে প্রাচীন অস্পষ্ট ও অস্ফুট ধারণা সকল অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। তখন পুণ্যবানের আত্মার জন্য পুরস্কারস্থান ও পাপীর শাস্তির জন্য নরক, স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সমুদ্রের পশ্চিম-পারস্থ ইলিসীয় ক্ষেত্রে, পুণ্যবানের আত্মা সকল পুণ্যানুরূপ সুখ-ভোগার্থে গমন করিত; এবং তার্তারোস্ নামক স্থানে, শাস্তিভোগের নিমিত্ত পাপীর আত্মা সকল প্রেরিত হইত। পরলোক পূর্ব্ব হইতেই যমরাজ হেদিসের রাজ্য বলিয়া নিরূপিত আছে। স্তিক্সের পরিবর্ত্তে, এখন উহার চতুর্দ্দিক, বৈতরণীস্থলীয় আথেরণ নামক নদী দ্বারা পরি-বেষ্টিত। খারণ নামক জনৈক যমের অনুচর, মৃত আত্মাদিগকে উক্ত নদী পার করিয়া যমপুরে প্রবেশ করাইলে; তথায় মিনোস্, ঐয়াকোস্ ও রাদামান্থিস্ নামক বিচারকত্রয়, পাপপুণ্যের বিচার করিয়া, যে পুণ্য-লোকে যাইবার যোগ্য তাহাকে পুণ্যলোকে, এবং যে নরকে যাইবার উপযুক্ত তাহাকে নরকে পাঠাইয়া দিত। নরকের ভোগশেষান্তে, প্রেত-গণকে 'বিস্মৃতি' নামক নদীর জলপান করাইলে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া, পৃথিবীতে পুনঃ যথাযোগ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিত।

প্রাচীন গ্রীকমণ্ডলে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে যাহাই হউক; সাধারণ লোকের মধ্যে, পরলোক যে একটা আছে এবং আত্মা যে অবিনশ্বর, ইহা অধিকাংশেরই ধারণার ভিতর আসিত না। এমন কি, শিক্ষিত-গণের মধ্যেও, পরলোক ও আত্মার অবিনাশিত্ব বিষয়ক জ্ঞানের যে

জাতিস্মরত্ব লাভ করায়, বিগত জন্ম সকলের যে কিছু সংবাদ তাহা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। Deog. Laert. Pyth. IV. পীথাগোরাস্ পিণ্ডার অপেক্ষা অনেক পুরাতন। কেহ কেহ পীথাগোরাসের প্রাদুর্ভাবকাল খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে নিরূপণ করিয়া থাকে।

হীনতা, তাহা নিতান্ত অবিরল নহে। কারণ, দেখা যায় যে, পরলোক যে আছে এবং পরলোকেও যে অস্তিত্ব লোপ হয় না, সক্রেতিস নানা কাণ্ড করিয়াও, তদ্বিষয়ে অজ্ঞবুদ্ধি ক্রিটোকে পরিচ্ছিন্নরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই।[৫০] ফলতঃ সক্রেতিসের পূর্ব্বে, কেবল এক থেলিসকে ঐশ্বরিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরলোকের পরমগতি সম্বন্ধে এখনও পূর্ণ আশার সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার উক্তি—

"ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, যেহেতু তিনি জন্মরহিত।"

"পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, যেহেতু ইহা ঈশ্বরের সৃষ্টি।"

"দেশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যেহেতু ইহা সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিতেছে।"

"বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, যেহেতু ইহা সর্ব্বভেদী ও সর্ব্বত্রই গতায়াতশীল।"

"প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয়, যেহেতু ইহা আর সকলকেই দমন করিয়া থাকে।"

"কাল সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী, যেহেতু ইহার নিকট সকল ফাঁকিই বাহির হইয়া পড়ে।"

অতি সুন্দর! থেলিস্ বলিতেন, জীবন ও মৃত্যুতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; তাহাতে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তবে তুমি না মর কেন?" উত্তর—"যেহেতু জীবন ও মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই।"[৫১] থেলিসের গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য। থেলিস্ গ্রীকদেশীয় বিখ্যাত সপ্তবিজ্ঞের আদি বিজ্ঞ।

পরলোক ও আত্মা সম্বন্ধে, গ্রীকদিগের মধ্যে কেবল সক্রেতিসের শিক্ষা, পূর্ব্বতন সকল শিক্ষা হইতে কতকটা বিভিন্ন এবং অনেকটা বিশুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়। যে আর্থিক সুখের জন্য, অন্যান্য গ্রীকধর্ম্মশিক্ষকেরা এতটা লালায়িত, সে আর্থিক সুখকে সক্রেতিস্ অতি তুচ্ছের মধ্যে

৫০। Plato—Phædo. 148. ৫১। Diog. Laert. Thales C. XI.

গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ নাই; কিন্তু যে অর্থ সাধারণতঃ দম্ভ ও অসৎ প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহারই প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ, নতুবা সৎভাবে ব্যবহৃত অর্থের অপ্রশংসা করেন নাই। একদা বিখ্যাত আথেন্সবাসী আল্কিবিয়াদিস্, তাহার বিপুল অর্থ ও ভূসম্পত্তি লইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে থাকিলে, সক্রেতিস্ তাহাকে একখানি গ্রীসের মানচিত্রের নিকট লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ইহার মধ্যে আটিকা কোন স্থানে দেখাও দেখি।" মানচিত্রের মধ্যে আটিকা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া, আল্কিবিয়াদিস্ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহা বাহির করিয়া দেখাইল।

স। ইহার মধ্যে তোমার নিজ ভূসম্পত্তি কোথায় বলিতে পার?

আ। তাহা অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে পাওয়া যাইবে কেন?

স। দেখ তবে এখন, তোমার কতটা ভ্রম; সেই অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড লইয়া এখনই তুমি কতটা দাম্ভিকতা ও আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে ছিলে। ৫২

সক্রেতিসের মতে যে যত অভাব কমাইয়া আনিতে পারে, সে ততই সুখের ভাগী হয় ও ততই সে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সক্ষম হইতে পারে। ৫৩ হিন্দু যোগীর ন্যায় ক্ষমা ও তিতিক্ষা গুণও, সক্রেতিসে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্ত্রীর ন্যায় দুঃশীলা ও মুখরা স্ত্রী আর কখনও জন্মিবে কি না সন্দেহ; সক্রেতিস্ সহ্য গুণ অভ্যাস করিবার নিমিত্ত জানিয়া শুনিয়াই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সক্রেতিসের প্রধান শিক্ষা, মানবীয় আত্মার অবিনাশিত্ব। কিন্তু অনেক গ্রীকই তাহা বড় একটা বুঝিত না। এজন্য সন্দেহকারীদের প্রতি সক্রেতিসের উক্তি;—"আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ত উহা বিশ্বাস করায় নিশ্চয়ই পরম লাভ। আর যদি মৃত্যুর পর উহা মিথ্যাই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাস করায়

৫২। Ælian. I. iii. C 28.

৫৩। Xenoph. Memorab. I. i.

অলাভ দেখা যায় না; যেহেতু কেবল ঐ বিশ্বাস জন্য আর আর লোক অপেক্ষা আমি যতটা নির্ব্বিকভাবে শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিতেছি; অন্য প্রকারে জীবন অতিবাহিত হইলে, কথনই ততটা ঘটিত না।"[৫৪] ঈশ্বরের নিকট সক্রেতিসের প্রার্থনা;—"হে পরমেশ্বর, তোমার নিকট এইমাত্র আমার সকাতর প্রার্থনা যে, আমরা যাচ্ঞা করি বা না করি, তথাপি তুমি আমাদিগকে ভাল হইলেও সেরূপ পদার্থ সকল কথনও প্রদান করিও না, যাহা অশুভকর ও অসৎ পথে মতি লইয়া যায়।"[৫৫]

সক্রেতিস্ বলিতেন যে, কোন একটি হিতৈষী সদাত্মা, আশৈশব তাঁহার সঙ্গে সহচরভাবে ফিরিত। তাহার কার্য্য এই ছিল যে, সক্রেতিস্ কথন কি করিবেন, তাহা সে বলিয়া দিত না; কিন্তু কর্ম্মোদ্যমে কোন্ কার্য্য বা কি করা অনুচিত, তাহাই মাত্র বলিয়া দিত।[৫৬] অনেকে বিবেচনা করে যে,সক্রেতিসের এই সহচর সদাত্মা,সক্রেতিসের স্বীয় আত্মার প্রজ্ঞাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সক্রেতিস্ প্রদত্ত পরলোকচিত্র এরূপ[৫৭]—"মৃত্যুদূতগণ যথন মৃত ব্যক্তিগণকে সেই অন্তকপুরে প্রেতসংঘের মধ্যে আনয়ন করে, তথন তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে। যাহাদের জীবন দোষে গুণে ও পাপপুণ্যে জড়িত হইয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারা আগে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত্যন্তে পরিষ্কৃত হইলে পর, স্বাধীনতা লাভ করিয়া পুণ্যকর্ম্মজনিত ফলভোগে অধিকারী হয়। স্বেচ্ছাকৃত দেবদ্বেষিত্ব, হত্যা, ইত্যাদি মহাপাপের পাপী বলিয়া যাহারা বিচারে সাব্যস্ত হয়; ভাগ্যদেবী, যিনি তাহাদের উপর বিচারফল আদেশ করিয়া থাকেন, তিনি তাহাদিগকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করেন এবং সে নরকে এক বার পতিত হইলে আর কথনও নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু যাহারা সেইরূপ মহাপাপ করিয়াছে বটে, অথচ স্বেচ্ছাকৃত নহে; অর্থাৎ যাহারা কোন

৫৪। Plato Phæd.

৫৫। Plut. in Alcib. l. ii.

৫৬। Plato. Theab.

৫৭। Plato. Phæd.

কারণবিশেষের বশবর্ত্তিতায় স্বেচ্ছার বিপরীতে রাগান্ধ হইয়া, পিতা মাতার প্রতি বিশেষ দুর্ব্যবহার বা কাহাকে হত্যা, ইত্যাদি করিয়া পরক্ষণেই আবার জ্ঞানোদয়ে অনুতপ্ত হইয়াছে; তাহারাও সেই মহা-পাপীদিগের নরকে পতিত হইবে বটে, কিন্তু চিরদিনের জন্য নহে। তাহারা তথায় কিছুকালমাত্র নরকভোগ করিয়া, যাহাদিগের অহিত করিয়াছিল তাহাদিগকে প্রার্থনা ও বিনয়ের দ্বারা প্রসাদন করিলে পর, নরক হইতে মুক্তিলাভান্তে, জীবনকৃত যে কিছু পুণ্যকর্ম্ম তাহার ফলভোগেও সক্ষম হইতে পারিবে।

"কিন্তু যাহারা চিরজীবন পবিত্রভাবে অতিবাহিত করিয়াছে এবং যাহাদের জীবন তত্ত্বযোগে পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা একেবারেই উর্দ্ধলোকে নীত হইয়া, সমস্ত অনন্তকালব্যাপী আনন্দ ও সুখপ্রবাহে বিচরণ করিতে থাকিবে। সে আনন্দ ও সুখপ্রবাহ অনির্ব্বচনায় এবং বাক্যের দ্বারা তোমাদিগকে তাহার আভাস প্রদান করিবার পক্ষে আমারও সময়াভাব।" আথিনীয়গণ কর্ত্তৃক সক্রেতিসের উপর মৃত্যুদণ্ড প্রচার হওয়ার পর এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, সক্রেতিস্ তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট উক্ত তত্ত্বকথাগুলি ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন। সক্রে-তিসের ধর্ম্মাদিবিষয়ক যে সকল মতামত এ স্থানে গ্রহণ করা গিয়াছে, বলা বাহুল্য যে, সাধারণ গ্রীকবুদ্ধির নিকট তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য; কেবল অতি অল্পসংখ্যক লোক তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।

ধর্ম্মচর্য্যা ও নৈতিকতা।

পরিদৃশ্যমান যাবতীয় কার্য্যের কল্পনা-মূর্ত্তি অগ্রোদ্ভবা। এই কল্পনা-মূর্ত্তি, কার্য্যমাত্রের আত্মিক মূর্ত্তি বা কারণ-শরীর স্বরূপ। মনুষ্যকৃত এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা বস্তুতঃ তদ্রূপ কোন কারণ-শরীরের বাহ্যপ্রচার নহে। সম্মুখে ঐ যে বাড়ীটি রহিয়াছে, আগে উহার ঐরূপ মূর্ত্তি, ঐরূপ আয়তন, ঐরূপ সমস্ত, প্রস্তুতকারকের মনোমধ্যে উদিত

এবং নির্ম্মিত হইয়াছে; তবে তাহা পরে ভৌতিক উপকরণযোগে প্রকাশিত হইয়া এই বাড়ীর আকার ধারণ করিয়াছে। যদি তাহা মনোমধ্যে তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নরূপে উদিত ও নির্ম্মিত না হইত, তাহা হইলে বাড়ীটির আকারও তদ্রূপ অনির্ম্মিত বা ক্ষুণ্ণ নির্ম্মিত থাকিত। ফলতঃ বাক্য, ইন্দ্রিয়, ভূতরাশি বা যে কোন উপকরণ সহযোগেই প্রকাশিত হউক, মনুষ্যকৃত এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা তাহার মানসিক ধারণার অবিকল প্রতিবিম্বস্বরূপ নহে বা কল্পনামূর্ত্তি যাহার অগ্রে উদ্ভব হয় নাই। বস্তুমাত্রের এই কারণ-শরীরাংশকে কল্পিত রূপ; এবং তাহার বাহ্যপ্রচার বা ভৌতিক বা পরিদৃশ্যমান শরীরাংশকে অনুষ্ঠিতরূপ শব্দে কহা যাউক। এই কল্পিত রূপ, প্রচারোপযোগী পুষ্টতা প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহা পুষ্ট অনুষ্ঠিতরূপে প্রকাশমান হয়। ছন্ন কল্পিতরূপ ছন্ন অনুষ্ঠিতরূপ, আবার বিকৃত কল্পিতরূপ বিকৃত অনুষ্ঠিতরূপেরই কারণস্বরূপ হয়। কল্পিতরূপ ও অনুষ্ঠিতরূপ এতদুভয়ের সংমিলনে, যখন কোন কৃত বস্তু তাহার যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন তাহার যে পূর্ণাভাস, তাহা মনোরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, অপর উদ্দেশ্যবিশেষ পূরণার্থে বা আবার নবকার্য্যবিশেষের উৎপাদনার্থে, সমগ্রত বা অংশত, নবকল্পিতরূপাংশ অর্থাৎ নবকারণ-শরীরবিশেষের আয়োজন ও উপকরণ পদার্থরূপে পরিণত হয়। এইরূপ হওয়ার ফলেই মনুষ্য-ইতিহাস ক্রমোত্তরবিবর্ত্তনে অগ্রসর হইতে, এবং ভূত ও ভবিষ্যতে আলম্বিত সম্বন্ধযুক্ত নব রূপ বা নব কার্য্য প্রসবিতে, সক্ষম হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের কার্য্যের ন্যায়, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই অবনী এবং বিশ্বমণ্ডল ও তদুপরিস্থ সমুদয় এবং আমরাও, সেইরূপ অপর এক এবং আমাদের সকলেরই অতীত, মহাকল্পনামূর্ত্তি বিশেষের বাহ্য-প্রচার মাত্র; এবং আমরা ও আমাদের রূপাভাসও, সেই মহাকল্পনামূর্ত্তি যে মহাচিত্তের আত্ম-পদার্থ, সেই মহাচিত্তপ্রাণ মহাপুরুষের প্রয়োজনসংসারে, হয় ত তথাবিধ পরিণাম প্রাপ্তিতে সৃষ্টি ও সৃষ্টিস্থ তাবৎকে অগ্রসর করাইয়া থাকে। আমি

বলিয়াছি, মনুষ্য মহাশক্তি রাশিমধ্যে স্ফাটিকত্ব প্রাপ্ত শক্তিখণ্ড মাত্র। শক্তিরাশির সমস্ত গুণাগুণই উহাতে অবস্থিতি করিতেছে। এ নিমিত্ত আমরা, প্রত্যক্ষ হউক অপ্রত্যক্ষ হউক, নিজসাধ্যের অতীতে হউক বা সাধ্যায়ত্তে হউক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারেই, মহাকারণ-শরীরময়ী সেই শক্তিরাজ্যেরই যথাসম্ভব অভিনয় করিয়া থাকি; এবং এই নিমিত্তই, আমাদিগের যাবতীয় সাত্বিক কার্য্য প্রকারান্তরে প্রকৃতির অনুকরণ ও প্রকৃতির প্রয়োজন-পূরকতা ব্যতীত আর কিছুই দাঁড়ায় না। সুতরাং, ইহা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, সৃষ্টি ও সৃষ্টিস্থগণের মধ্যে, একে অপরের বা পরস্পর পরস্পরের তত্ব-নিরূপক হইয়া থাকে। বাঙ্গারাম, ভয় নাই, প্রকৃতির অনুকরণ করা বলায় তোমার বীরত্ব লোপ করিতেছি না; তুমি এখনও প্রকৃতির অনুকরণ বা তাহার শিক্ষার অতীতে কার্য্যকরণে সক্ষম। বস্তুমাত্রে কারণ-শরীরের যে অবশ্যম্ভাবিতা এবং তদুৎপাদক কর্ত্তার যে অপরিহার্য্য অস্তিত্ব, যাহা প্রকৃতি ও তোমার নিজকৃত কার্য্যসমূহও নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, তুমি যখন তাহা প্রকৃতির পরিচালক পুরুষের পক্ষে অস্বীকার করিয়া থাক, তখনই তোমার নূতন সৃষ্টির সঞ্চার—শয়তানি-বীরত্বের উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক, উপরি-উক্ত উক্তি সকলে যথেষ্টই আভাসিত হইয়াছে যে, বাড়ীটি ভাঙ্গিলে ও লোপ হইলেও, তাহার কল্পনামূর্ত্তি বা কারণ-শরীর যাহা তাহার লোপ হয় না। অনন্ত মানবীয় মনীষাস্রোতে বা জগৎ-প্রবাহে তাহা সংমিলিত হইয়া প্রচ্ছন্ন কারণ ও উপাদান ভাবে পরিণতি পূর্ব্বক, উত্তরোত্তর নবকার্য্য উৎপাদনে প্রধাবিত হয়। কিন্তু বাঙ্গারাম, তুমি অর্থাৎ তোমার শয়তানী ভাঙ্গিলে, তোমার নিবৃত্তি ঐ খানেই! তোমার ও তোমার নূতন সৃষ্টির এরূপ নূতন পরিণাম ও ফল না হইলে মানাইবে কেন? শয়তানী মিথ্যাসৃষ্টি, এবং মিথ্যা যাহা তাহা নিজ সাক্ষ্যতেই অস্তিত্ব-শূন্য। মিথ্যায় কার্য্যহানি; পুনঃ তাহা উত্তর কার্য্যের বাধক ও বিঘ্নকারক বলিয়াই ত তাহা নিন্দনীয় ও পাপমধ্যে গণিত হইয়া থাকে।

অতএব কার্য্যমাত্রের কারণ-শরীর পূর্ব্বগামী বা পূর্ব্বোদ্ভব। এই মনুষ্য-জীবনের পরিদৃশ্যমান বিকাশ ধরিতে গেলে, উহা বিধাতৃনিয়োজিত কতকগুলি কার্য্যসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কার্য্যসমষ্টি যে কারণ-শরীর সমষ্টির বিকাশ ও বাহ্যপ্রচার স্বরূপ, তাহাই সংমিলিত মূর্ত্তিতে প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের ধর্ম্মতত্ত্ব। এই ধর্ম্মতত্ত্ব, উপরে এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, বাহ্যজগতের সহিত মানব প্রকৃতির সংস্রবসংঘটনে গুরুতম দৃষ্টি প্রসারণফলে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার পারলৌকিক দিকে যে দেবতত্ত্ব, এবং লৌকিক দিকে যে যাগযজ্ঞ ও পূজা প্রকরণাদি, তাহা ধর্ম্মভাবের তত্তৎদিকস্থ কেবল সঙ্ক্ষিপ্ত বা সঙ্কেতলিপি মাত্র। সঙ্কেত বস্তু যে প্রকারের, তাহার সম্প্রসারণ-বস্তুও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যের আত্মিক জীবনের সম্পত্তি এবং কার্য্যসমূহ ভৌতিক বা সাংসারিক জীবনের সম্পত্তি। পরস্পর উভয়কে উভয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। অতএব যে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি যেমন, তাহার কার্য্যসমূহও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুনশ্চ, মূল ব্যতীত কোন বস্তুর উৎপত্তি বৃদ্ধি বা স্থিতি হয় না; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বও মূলশূন্য হইতে পারে না; অতএব এই ধর্ম্মতত্ত্ব যে পরিমাণে ও যেরূপ ধারণাযোগে মূলরূপী ঈশ্বরে সংলগ্ন এবং যে পরিমাণে সর্ব্বালোক-উৎসের আলোকে আলোকিত, তাহা সেই পরিমাণে দৃষ্টি-সংযুত; সুপরিমাণে হইলে দৃষ্টি সম্মুখে বহুদূর প্রসারিত হইবাতে, দৃষ্টিফল দীর্ঘগতি প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ধর্ম্মতত্ত্ব যে পরিমাণে ঈশ্বর হইতে সংলগ্নতা-বিচ্যুত, তাহা সেই পরিমাণে দৃষ্টিশূন্য, ভ্রমসংযুক্ত এবং মিথ্যায় আবরিত; সুতরাং অল্প গতিতেই বিকৃতি ও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক বিগ্রহের বিশ্বাস, ঊর্দ্ধদেশিক শক্তিকে আশ্রয় না করিলেও মনুষ্য-সমাজ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। পারিত বটে, যদি মানব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং পশুবৎ ক্ষুণ্ণমনীষাযুক্ত হইত। কিন্তু মানুষ হইয়া ও কথা বলিলে চলিবে না; যেহেতু মানুষে রক্ষাকারক ও নির্ম্মায়ক বুদ্ধিবৃত্তি যতটা, ধ্বংসকারক বুদ্ধিবৃত্তি তদপেক্ষা অধিক বই

কম দেখা যায় না। কেবল ঊর্দ্ধদেশিক বাধকতাতেই সেই ধ্বংস-কারক বুদ্ধি দমিত ও উপশমিত হইয়া থাকে; তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে মানববংশ এতদিন উৎসন্ন হইয়া যাইত। এত বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও, সংসারে কোন্ প্রকার বুদ্ধির আধিক্য দেখিতে পাইয়া থাক, বল দেখি? সত্য স্বরূপ ঐশ্বরিক সত্তার অবলম্বন ভিন্ন, কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে বা তিষ্ঠিতে পারে না। মিথ্যায় সৃষ্টি করিতে বা রক্ষিতে পারে না; মিথ্যায় কেবল পণ্ড বা বিকৃত বা তমসাবৃত করিয়া থাকে মাত্র। সেরূপ মিথ্যাবিশ্বাসবিনোদক সমাজতত্ত্বকে তথাপি যে কখন কখন ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেখা যায়; তাহার কারণ সেখানেও, যদিও মিথ্যার দ্বারা বিকৃত বটে, কিন্তু সত্যসত্তার অবলম্বন এখনও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই; নতুবা সেরূপ তিষ্ঠান মিথ্যার নিজ শক্তি বশতঃ নহে। অতএব ঐশ্বরিক সত্তার অপেক্ষা না রাখিয়া যে সে সমাজতত্ত্ব নির্ম্মিত হইয়া তিষ্ঠিতেছে ইহা যথার্থ নহে; সত্তা সেখানে মিথ্যা আবরণে বিকৃত বা তমসাবৃত হইয়া দৃষ্টিগোচর যে সুস্পষ্টরূপে হইতেছে না, ইহাই যথার্থ! মিথ্যার প্রাবল্যবিশিষ্ট সমাজতত্ত্বের ভাবিফল যাহা, বলিতে পার, কেহ তাহাকে সুন্দরমূর্ত্তি ও সুদীর্ঘস্থায়ী হইতে কখনও দেখিয়াছ কি না? বাঙ্গারাম, ফরাসিরাজবিপ্লবে রুসোর সর্ব্বজন-সুখপ্রদ হিত-বাদশাস্ত্র, টালিরাণ্ডের সখের খৃষ্টয়ানী, রোমনামক জনৈক ফরাসী বিপ্লবকারীর বর্ষাদি বিভাগ, সমেটের নাস্তিকতা, জ্ঞানদেবীর অভিনয়-কারিণী কাণ্ডেলনাম্নী বেশ্যাপূজাদি, স্বাধীনত্বের ছড়াছড়ি, রোবস্পেরের Etre Supreme, একে একে সমস্তইত অভিনয় হইয়া গিয়াছে; তবে আবার সে কথা ফিরিয়া কেন?

এক্ষণে গ্রীক এবং হিন্দুর জীবনকার্য্য অভিনয়ের কারণ-শরীর কি, তদাভাস ও তাহার মূল সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আসিলাম। উহা কি তাহা সংক্ষেপত বলিতে গেলে, গ্রীকের, যেমন উপরে বলিয়া আসিয়াছি, নির্ব্বীক, নিরানন্দময়, স্নেহশূন্য দেব-সংসার; শূন্য, শ্রদ্ধারহিত, মরুকান্তারসদৃশ মনুষ্যহৃদয়; অন্ধতমসাচ্ছন্ন

পরলোক; উন্মত্ত বাতুলবৎ সংসারপ্রিয়তা; এবং ঔর্দ্ধদেশিক বন্ধনছিন্নে বিনতশির ধূলিমুখে পতমান। এই নিমিত্ত দেবসকাশে গ্রীকের প্রার্থনা সকলও এত হেয় এবং কেবল তাহা পার্থিব সুখলালসায় পরিপূর্ণ; পরলোকের প্রতি আস্থাশূন্য ও তাহাতে দৃষ্টিপাত না করাই যেন উদ্দেশ্য। মনুষ্যের প্রকৃতি যাহা এবং সে জবাবদিহি করিতে যতটা প্রস্তুত, তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। হিন্দুর ভাব গ্রীকের বিপরীত। তথায় দেবসংসার অচিন্তনীয়, বিরাটবেশ, গূঢ়গুহ্যময়, স্নেহপূর্ণ অথচ ভীতির আধার, এবং হস্তে সদসদের তুলাদণ্ড দোদুল্যমান; শ্রদ্ধার আধার, করুণার আধার, মমতাপূর্ণ,— গাঢ়তায় এদিকে কিন্তু আবার সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে; পরলোক পরিচ্ছিন্ন ও দিবামানে আলোকিত, লোকে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইতেছে যে তথাকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। ঔর্দ্ধদেশিক অচিন্তনীয় আয়-তনের সমতা করিবার আয়াসে, সমস্ত শক্তি তাহাতেই পর্য্যবসিত হওয়ায় এবং ঊর্দ্ধদেশের প্রতি চিত্তের দৃঢ় আকর্ষণ হেতু, মানব সংসার-প্রিয়তাশূন্য; পুনঃ সংসারসহ উপযুক্ত সংস্রব পরিশূন্যে, অবথা ঊর্দ্ধমুখে ধাবমান। এই জন্য ভারতীয়দের প্রার্থনা মধ্যে পারলৌকিক শুভ কামনা অধিক; এই জন্য হিন্দুসন্তানের নিকট "ধর্ম্মাৎ পরতরং নহি"; এবং এই জন্য আজি পর্য্যন্ত হিন্দুসন্তান, অধুনা প্রায় সকল সাত্ত্বিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িলেও, সাবেক দাঁড়ার খাতিরে সকল কর্ম্মে শ্রীহরিকে স্মরণ এবং এমন কি, চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে সর্ব্বাগ্রে "শ্রীদুর্গা" নাম লিখিয়া থাকেন। এখনও হিন্দুসন্তানের মধ্যে যাহা কিছু গাঢ় নৈতিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঐ "শ্রীদুর্গার" ন্যায় কেবল সাবেক দাঁড়ার খাতিরে। ফলতঃ হিন্দুর পুরাকালিক সেই সর্ব্বজনীন মহদুচ্চ নীতি, এখন অতি সঙ্কীর্ণ আয়তনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—হিন্দুর একতা ও সহানুভূতি গুণ এখনও না আছে এমন নহে, নতুবা বহুপরিবার-প্রথা ও এক জনের ঘাড়ে দশজন চাপিয়া থাকিবে কেন? কিন্তু স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস, মমতা একতা

ও একপ্রাণতা যাহা তাহা আর নাই। ত্যাগস্বীকার এখনও আছে, নতুবা পরিবারাদির জন্য এমন চাকুরী-লাঞ্ছনা সহিবে কেন? কিন্তু স্বজাতির জন্য আর বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকারে রাজী নহে; বরং উল্‌টীয়া পুন্‌কে শত্রুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ সকল প্রকার নীতিই একটু একটু এখনও আছে বটে, কিন্তু সমস্তই প্রায় স্বীয় পারিবারিক বা আত্মস্বার্থে আবদ্ধ। কর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্তই সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; হিন্দুরও আজি সেই দশা ঘটিয়াছে। তাই হিন্দুকে যদিও এখনও কোন মতে অনৈতিক বলিতে পারা যায় না বটে; তথাচ কিন্তু সে নীতিতে কি সংসার কি সমাজ, কাহারই কোন প্রকৃত কার্য্য সাধিত হইতে দেখা যায় না।

গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্বে, পারলৌকিক মুখে চূড়ান্ত সঙ্কেত পদার্থ জিউস; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির অনিষ্ট সাধনে ইহার ঐশ্বর্য্য অধিকার;—গ্রীকের গূঢ় জীবনও তাহাই। হিন্দুর চূড়ান্ত সঙ্কেত পদার্থ, "সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি;"—হিন্দুর গূঢ় জীবনও তাহাই। গ্রীকের যাগযজ্ঞাদি,—পশ্বাদি হনন করিয়া, প্রমিথিওসের কল্যাণে দেবতাদিগকে মাংসাদিশূন্য তাহার নিঃসার হাড়গোড় মাত্র উৎসর্গ ও অর্পণ পূর্ব্বক, মাংসমেধাদি যাহা তাহা মধুসংযোগে নিজের পেট ভরিয়া আহার। আর হিন্দুর যাগযজ্ঞাদি,—দেবতাদিগকে সকল দিয়া, নিজে উপবাস। উভয়ের সাংসারিক জীবনও তাহাই। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বমাত্রের দুইদিক, এক লৌকিক ও অপর পারলৌকিক। গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্ব, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লৌকিক-ভাবে অযথা লিপ্ত; সুতরাং ভ্রমবিকৃত ঐশ্বরিক সত্তা ইহাদের অবলম্বন। আর হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব পারলৌকিকভাবে অযথা লিপ্ত; এজন্য উহাও, লৌকিক-বিষয়িণী ঐশ্বরিক আজ্ঞা অবহেলা বা সম্যক পালন না করায়, ভ্রমসংযুক্ত। কিন্তু গ্রীকের বিকার আর এ বিকারে প্রভেদ আছে;—অধমের দোষ এবং উন্নতের দোষে যে প্রভেদ, এখানেও সেই প্রভেদ। দোষের পরিমাণ অনুসারে অধঃপাতের পরিমাণ;—এ কথা যদি সত্য

হয়, তাহা হইলে এখানেও তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গ্রীক সভ্যতা এবং জাতীয় জীবন, হিন্দুর তুলনে কত অল্পক্ষণস্থায়ী ও কতটা অধঃপাতগত হইয়াছিল, তাহা বারেক আলোচনা করিলেই প্রতীত হইতে পারিবে।

অযথা পরিমাণে সংসারনীতি যথায় জীবনকার্য্য অভিনয়ের মূল, তথাকার কার্য্যপ্রবাহের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র; এবং অযথা পরিমাণে পারলৌকিক নীতি যথায় জীবনকার্য্য অভিনয়ের মূল, তথাকার কার্য্য-প্রবাহের বন্দোবস্তও স্বতন্ত্র। সাংসারিক নীতির ফল এবং ভোগ প্রত্যক্ষ, এবং উহার মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার-সুখের প্রাপ্তি; তদ্রূপ পারলৌকিক নীতির ফল এবং ভোগ অপ্রত্যক্ষ, এবং তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য অদৃষ্ট, অনিশ্চিত ও অপরিচিত পারলৌকিক সুখের প্রাপ্তি। অতএব ফলপক্ষে একে নিশ্চয়তা, অপরে অনিশ্চয়তা। লোকে ঠিক আদিষ্ট উপায়কে অপেক্ষাকৃত তখনই দৃঢ় অবলম্বন করিয়া থাকে, যখন ফল অপ্রত্যক্ষ অনিশ্চিত ও অনুমানসিদ্ধ বা তথাবিধ; যেহেতু অন্য কোন উপায়ে সফলতা হইতে পারে কি না তাহা জানা নাই, সুতরাং যে পথে মহাজনগণ গত ও যাহা মহাজন কর্ত্তৃক আদিষ্ট, তাহা অবলম্বন করাই প্রশস্ত। কিন্তু নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ ফলের জন্য আদিষ্ট উপায়কে সেরূপ দৃঢ় অবলম্বনের আবশ্যক হয় না; এখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হেতু একমাত্র ফলের প্রতি দৃষ্টি থাকায় এবং উহা যে কোন উপায়ে প্রাপ্য হইব ইহাই ধারণা হওয়ায়, উপায় সকল প্রায় স্বায়ত্তগত এবং বহুলাংশে স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব এই 'যে কোন' উপায় বোধে সদসৎজ্ঞান সকল সময়ে বড় একটা না থাকায়, কার্য্যত প্রায় বিকৃতি এবং বিকৃতি হইতে আরও গুরুতর বিকৃতির উপস্থিতি হয়; শেষে পেনালকোড আসিয়া বেদাদির স্থানাধিকার করে। গ্রীকভূমেও তাহাই হইয়াছিল এবং তৎপ্রভাবে, দেবতত্ত্ব পর্য্যন্ত শেষে বিকৃতির অবলম্বন দণ্ডস্বরূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল।

ডিওনিস্যুস্ দেবের উদ্দেশে ডিওনিসীয়া বলিয়া যে পর্ব্ব হইত,

তাহার বিবরণ যদি বারেক পাঠ করিয়া দেখ, তাহা হইলে গ্রীকদিগের বীভৎস রুচি ও বীভৎস কার্য্যের অনেকটা পরিচয় পাইতে পারিবে। ঐ পর্ব্বাহ বহুদিন ব্যাপিয়া থাকিত এবং উহাতে দৃশ্য-অভিনয়, কুস্তি, নানাবিধ খেলা, এবং মদের হাট বাজার বসিত। ঢাক ঢোল সিঙ্গা বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যের ধুমে গগন নিনাদিত হইত; উপাসকগণ বিপুল উৎসাহে, স্ত্রী পুরুষ একত্রে, নানাবিধ বিকৃত মূর্ত্তিধারণে সং সাজিয়া, দিবারাত্র মদিরাপানে উন্মত্তবৎ ঘূর্ণিত হইয়া ও লোক মাতাইয়া ফিরিত; কখন বা উচ্চৈঃস্বরে দেবতার নাম ধ্বনিত করিতে করিতে উন্মাদবৎ পর্ব্বত বা অরণ্য প্রান্তে ছুটিত। দর্শকেরাও তাহাতে সমানে যোগ দিতে ক্রটি করিত না। ইহার পরে, এই ঘূর্ণাতরঙ্গমধ্যে না হইত এমন কুকার্য্য নাই, না হইত এমন ঘৃণিত কার্য্য নাই, এবং না হইত এমন অশ্লীল কার্য্যই নাই; এবং সেই সকল যাহা হইত, তাহা আবার দিগ্বিদিক্‌শূন্য ও পাত্রাপাত্রজ্ঞানরহিত ভাবে। ইহা কেবল সামান্য শ্রেণীর লোকেরা যে করিত তাহা ভাবিও না; আথেন্স নগরীর শ্রেষ্ঠতম বংশের পুত্র কন্যারাও, স্বচ্ছন্দে এবং অপ্রতিবন্ধকে, তাহাতে সহস্রে সহস্রে সংযোজিত হইত।[৫৪] অতঃপর আর তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। ধর্ম্মের নাম করিয়া এমন কদাচার অতি অল্পস্থানেই আচরিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ এই সকল পর্ব্বাহ ক্রমে এমন কদর্য্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল যে, শেষে বিবেচক লোকমাত্রেই ইহাকে অপার ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিত। ডিওগিনিস্ একবার কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বারম্বার ইল্যুসীয় পর্ব্বভুক্ত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েন; যেহেতু ইল্যুসীয় সাধকদিগের বিশ্বাস এই যে, যে কেহ তাহাদের শ্রেণীভুক্ত না হইবে, সে দেহান্তে উচ্চলোকে যাইতে পারিবে না। এই অনুরোধের

৫৪। প্লেটো এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ডিওনিসীয়া পর্ব্বসময়ে তিনি দেখিয়াছেন, সমস্ত আথেন্স নগরী একেবারে মদোন্মত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া ফিরিতেছে। —Lib. i. de Leg.

উপর ডিওগিনিসের উত্তর,—"সে কি হে বাপু, এ যে অতি অসম্ভব কথা যে, ইগিসিলাউস্ ও এপামিনণ্ডাসের ন্যায় লোক যাহারা, তাহারা সকলে কাদায় পড়িয়া মাটি খাইবে, আর অপদার্থ ও ছাঁটে লোক যাহারা, যাহারা সাধারণতঃ এই পর্ব্বভুক্ত হইয়া থাকে, তাহারা কেবল ভাল স্থানে যাইবে!" এই উক্তি, পর্ব্বাহের যেরূপ প্রকৃতি এবং তৎপ্রতি বক্তার যেরূপ ভক্তি, এ উভয়ই এককালে প্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বাহের গূঢ় গুহ্য প্রকাশ করিলে, লোকে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইত।[৫৫] পুনশ্চ, আরিষ্টফানিসের দেবভক্তির প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত কর। এই কবি তদানীন্তনকালিক দেববর্গ ও দেবোপাসনা-প্রকরণের প্রতি নিদারুণ উপহাসক ও ব্যঙ্গকারক ছিল; কিন্তু তখনকার লোক সকলেরও মতিগতি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তজ্জন্য তাহার অনাদর দূরে থাকুক, বরং সমাজমধ্যে প্রভূত আদরই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কৃত প্লুটোস্ নামক ব্যঙ্গ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকে আর বলি ও পূজোপহার না দেওয়ায় এবং পুরোহিতেরাও পৌরহিত্য পরিত্যাগ করায়; দেববর্গ ক্ষুধায় আকুল হইয়া শেষে মনুষ্যলোকে আসিয়া মজুর, বেহারা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদির কার্য্যে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়া, উদর ঠাণ্ডা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থকারের আরও একখানি নাট্যগ্রন্থে[৫৬] বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন সময়ে পক্ষিকুল দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তিতায় মধ্য আকাশে একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থান পূর্ব্বক, মনুষ্যলোক হইতে দেবলোকে যে কিছু পূজোপহার প্রেরিত হইত, মধ্যপথে তাহা হরণ করিয়া লইত। তাহাতে দেবদল কাজেই তখন আহার্য্য অভাবে ক্ষুধায় আকুল ও অস্থি-চর্ম্ম-শেষ! অবশেষে বেগতিক দেখিয়া ও নিরুপায় হইয়া, পক্ষীদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়া, দেবগণ হিরাক্লিস্ প্রভৃতি দেবতাত্রয়কে দূত করিয়া পক্ষিনগরে পাঠাইয়া দিলেন। দেবদূতগণকে যেন দৃষ্টি-আগুনে দগ্ধ করিবার জন্যই, পক্ষিগণ

৫৫। Hor. Od. 2 III. ৫৬। Aristo. Birds.

দরবারগৃহের পরিবর্ত্তে রন্ধনশালায় তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। এই রন্ধনগৃহস্থিত আহারীয় দ্রব্য দর্শনে ও তাহার ঘ্রাণে ক্ষুধার্ত্ত দেবদূতগণের যে লোলুপতা ও ভাবভঙ্গী, কবিকৃত তাহার বর্ণনা সকল অতিশয় হাস্য-উদ্দীপক ও দেববর্গের হেয়ত্ব-সাধক। যাহা হউক, শেষে দেবদল, পক্ষিরাজকে বহু খোষামোদ করিয়া এবং অধিকন্তু তাহাকে বাসিলীয়া নামক সুন্দরী দানে সন্তুষ্ট করিয়া, সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্ন হইলেন। আরিষ্টফানিসের এই সকল তীব্র ব্যঙ্গোক্তির মূল উদ্দেশ্য, গ্রীকদিগের তাৎকালিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও তদনুষ্ঠানে বিকৃত ও বীভৎস ভাব যে সকল, তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওন। ফলতঃ ধর্ম্মের নাম করিয়া গ্রীসে নানাবিধ কদর্য্যকাণ্ড সকল অবাধে হইয়া যাইত। আধুনিক যুগের হিন্দুও যে ইহার তুলনায় কিছু কম হইবেন তাহা বোধ হয় না, বরং হয়ত কোন কোন বিষয়ে কিছু উপরেও যাইতে পারেন; কিন্তু এখানে আধুনিক হিন্দু লইয়া কথা নহে। যে সিংহবংশে সেই আধুনিক হিন্দু শৃগালরূপে জন্মিয়া মুখ উজ্জ্বল করিতেছে, এখানে সেই সিংহবংশেরই কথা কহা যাইতেছে; এবং তাহারই সহিত বক্তব্য বিষয়গুলি তুলনীয়।

এ দিকে এই সকল দেবপর্ব্বাহের বীভৎস ব্যাপার; ওদিকে কিন্তু আর একটি বিষয় স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা গ্রীকচরিত্র বিষয়ে উজ্জ্বল পরিচায়ক স্বরূপ; অর্থাৎ যে সকল পর্ব্বাহ পুনঃ জাতীয়ত্ব-বিধায়ক, তথায় বীরত্ব, বীর-মনুষ্যত্ব এবং জাতীয় একতা কি তীব্র ও ক্রিয়োদ্দীপক ভাবেই স্ফুরিত ও স্ফুটিত হইয়াছে! এ সকল পর্ব্বাহে বলের অর্চ্চনাই প্রধান। কিকিরো একস্থানে বলিয়াছে যে, ওলিম্পিয়ার কুস্তি প্রভৃতিতে জেতা যে, সে গ্রীকদিগের নিকট এতই সম্মানিত হইত যে, রোমনগরীতে রণজয়ী বীরপুরুষের গৌরবও তাহার নিকট মলিন হইয়া যাইত।" ৫৭ হরেস কিকিরো অপেক্ষা ওলিম্পিকজেতার আরও উন্নত সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছে; তৎকর্ত্তৃক একস্থানে লিখিত

৫৭। Cec. Pro Flacco. num. XXXI.

হইয়াছে যে, তদ্রূপ জেতা যে, সে যেন মনুষ্যলোকের অতীত বলিয়া গণিত হইত এবং লোকে তাহাকে মনুষ্য নহে, যেন দেবতারই ন্যায় জ্ঞান করিত।[৫৮] বলা বাহুল্য যে, ইহারই প্রকারান্তর ফলে গ্রীকভূমে মারাথন, থার্ম্মপিলি প্রভৃতি বীরতীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ, পর্ব্বাহ, যাগযজ্ঞ, পূজা প্রকরণাদি অগাধ সমুদ্রবিশেষ; অতএব কোন স্থান হইতে কি তুলিয়া গ্রীকদিগের সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখাইব। তবে ধর্ম্মের ফল স্বরূপ নৈতিক জীবন সাধারণতঃ কিরূপ ছিল, তাহা দৃষ্টি করিলে বরং ধার্ম্মিকতাও সেই সঙ্গে বহুলাংশে উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কিন্তু আমরা হিন্দু-সন্তান, এজন্য হয়ত নিরপেক্ষভাবে হিন্দুর কথা নাও বলিতে পারি, হয়ত নিরপেক্ষ হইবার জন্য চেষ্টা করিলেও অতর্কিতে পক্ষপাত আসিয়া ঘটিতে পারে; অতএব তেমন স্থলে তাহা যদি একজন প্রাচীন গ্রীক দর্শকের দ্বারা উক্ত হয়, তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকে না। তাহাই হউক। অবশ্যই বলা বাহুল্য যে, এই গ্রীক কেবল একজন বাহ্যদর্শী মাত্র, সমাজের অন্তস্তলের নিগূঢ় কথা কিছুই তাহার জানা সম্ভব নহে এবং জানিতও না; সুতরাং তেমন নিগূঢ় কথা সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহার দ্বারা উক্ত তাহা যে একটু দেখিয়া শুনিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এইমাত্র সাবধান করিয়া দিই। অতঃপর শুন এখন গ্রীকদর্শক কি বলিতেছে।[৫৯]

"ভারতীয়েরা মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের জীবনকালের মধ্যে কৃত সৎকার্য্য যাহা, এবং তাহারই যে গুণগান, তাহাই তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিস্তম্ভ।

"ভারতীয়েরা আহার বিহারে সর্ব্বদাই পরিমিতজীবী;—বিশেষতঃ

৫৮। Hor. Od. I & II.

৫৯। Megas. Frag. XXVI & XXVII et Seq.

যখন সেনানিবাসের মধ্যে থাকিতে হয়। বিশৃঙ্খল জনতাকে ইহারা সর্ব্বদা ঘৃণা করে, এ নিমিত্ত ইহাদের সর্ব্ববিষয়েই সুশৃঙ্খলা পরিদীপ্যমান। চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়া কদাচ ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে অন্যূন ৪০০০০০ লোক থাকিত; কিন্তু এত লোকের সমাবেশ সত্ত্বেও কোন দিনেরই অপহৃত দ্রব্যের মূল্য কখনও দুইশত ড্রাম, অর্থাৎ ৮১।০ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই।" এইখানে দর্শক আশ্চর্য্য হইতেছেন যে, "যে জাতির মধ্যে লিখিত নিয়মাদির অভাব; এবং লিখনপ্রণালী যাহাদের নিকট এখনও অপরিজ্ঞাত, সে জাতি কেমন করিয়া এতটা শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে।" দর্শক হয়ত শিবিরবাসীদিগের মধ্যে লিখনপ্রণালীর ব্যবহার দেখিতে পায়েন নাই। ৬০ সে যাহা হউক, পুনশ্চঃ—

৬০। মিগাস্থিনিস্ যে স্থানে লিখনপ্রণালীর অভাবের কথা বলিতেছে, সে স্থানের অর্থ স্পষ্ট নহে। উহা সমস্ত হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতেছে, কি কেবল চন্দ্রগুপ্তের শিবিরস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে বলিতেছে, তাহা ঠিক নিরূপণ করা যায় না। তখন ভারতের উচ্চ গৌরব ও উচ্চ সভ্যতার সময়, অতএব তখন যে লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব ছিল না,এ কথা সমগ্র জাতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এবং প্রয়োগকারী যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মিগাস্থিনিস্‌কে ততদূর অনভিজ্ঞ দর্শক বলিয়াও বলা যাইতে পারে না। অতএব অনুমান হয়, ঐ কথা কেবল চন্দ্রগুপ্তের শিবিরস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং তখনকার কালে যুদ্ধার্থে নিযুক্ত নীচজাতীয় সৈনিকের পক্ষে নিরক্ষর হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। অধুনাতন কালে মক্ষমুলারাদি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়া থাকে যে, প্রাচীন ভারতে, এমন কি পাণিনির সময়ে পর্য্যন্ত, লিখনপ্রণালী প্রচলিত হয় নাই; পর্ব্বতপ্রমাণ সমস্ত গ্রন্থরাশি কেবল স্মৃতিশক্তির সাহায্যে রচিত, অধীত ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। যাহারা সাধারণ স্মৃতির এরূপ অসম্ভব ও অলৌকিক শক্তিতে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পারে, অথচ অতি সম্ভব ও সামান্য কথা লিখনপ্রণালীর অস্তিত্বতে বিশ্বাস করিতে পারে না; যাহারা পুনঃ, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ গ্রন্থরাশিস্থ অপার শব্দসমুদ্র বিলোড়িত মথিত ও বিশ্লেষিত করিয়া কেবল বর্ণমালার বর্ণ সকলের মারপেঁচ ও কাটাকাটিতে পাণিনির যে অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যাকরণ, তাহাও একমাত্র স্মৃতিশক্তির যোগে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে; তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা উভয়কেই ধন্যবাদ দিতে হয়। সেরূপ বিকৃত বুদ্ধি ও বিবেচনা যুক্ত লোকের

"ভারতীয়েরা পরম সুখে বাস করিয়া থাকে; স্বভাবে পরিমিতজীবী, এবং ব্যবহারে আড়ম্বরশূন্য ও সুরুচির। কেবল যজ্ঞাদির সময় ভিন্ন কখনও সুরাপান করে না।" যজ্ঞের সময় সুরাপান, বোধ করি, দর্শক সোমরসপানে দৃষ্ট করিয়া থাকিবে। "যবের পরিবর্ত্তে তণ্ডুল হইতে একরূপ পানীয় প্রস্তুত করিয়া, তাহা ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের আহারীয় তণ্ডুলপাক অন্ন। ইহাদের আইন ও চুক্তি প্রভৃতি যে নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য, তাহা ইহারই দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহারা কদাচ বিচারালয়ের স্মরণ লইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকাদি সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হয় না, অথবা ইহারা সাক্ষ্য মোহরাদিরও আবশ্যক রাখে না। ইহারা যখন যাহার নিকট কিছু গচ্ছিত করিবে, তাহা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই করিয়া থাকে। ইহাদিগের গৃহ সম্পত্তি আদি অরক্ষিতভাবে পড়িয়া থাকে, অথচ কোন বস্তু অপহৃত হয় না। এই সকলের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, ইহারা সদ্বুদ্ধিশালী এবং সংপ্রকৃতিস্থ।" এই স্থানে বিজ্ঞ ডিওগিনিসের গ্রীক আদালত দর্শনান্তে যে উক্তি তাহা স্মরণ করিও,—"উভয় পক্ষের উকিলী শুনিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক ব্যক্তি কথিত দ্রব্যটি চুরি করিয়াছে, আর অপর ব্যক্তির তাহা চুরি যায় নাই।" ৬১

পুনশ্চ মিগাস্থিনিস্ কহিতেছে, "ইহারা সত্য এবং সততার সমধিক পরিমাণে সম্মান করিয়া থাকে। এজন্য ইহাদের মধ্যে কেবল বয়োবৃদ্ধ নহে, জ্ঞানবৃদ্ধ হইলে তবে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" মিগাস্থিনিসের আর এক অদ্ভুত কথা শুন,—"স্ত্রীলোকের সতীত্ব আয়াস-

সঙ্গে তর্ক ও বিচারে প্রবিষ্ট হওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। অথবা তাহাদের উল্লেখ পর্য্যন্তও কেবল সময় অপব্যয়মাত্র। তবে একটা কথা এই যে, কেবল টটানটি সংস্কৃত জ্ঞানকে মাত্র অবলম্বন করিয়া যাহারা স্বচ্ছন্দে এরূপ আশ্চর্য্য মত সকল প্রকাশে সাহসী হয়; তাহাদের সেই সাহসটা দেখিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে॥

৬১। Diog. Laert. VI Diog.

সাধ্যে রক্ষা না করিলে, তাহারা দুশ্চারিণী হইয়া থাকে"; এ কথা নিঃসন্দেহ অবরোধ-প্রথা দৃষ্টে উক্ত। যেমন বলিয়াছি, সমাজের অন্তস্তলে যে দর্শকের দৃষ্টি ছিল না, ইহা তাহারই পরিচায়ক। বিশেষতঃ যে দেশের স্ত্রীলোক গ্রীকপর্ব্বাদির অংশভাগিনী; যথায় নিরবচ্ছিন্ন উলঙ্গ পুরুষবর্গের ক্রীড়া কৌতুক স্ত্রীগণ স্বচ্ছন্দে এবং অকাতরে দাঁড়াইয়া দেখিত; যে দেশের মধ্যে স্পার্টাভূমে উলঙ্গ যুবতী স্ত্রীগণ স্বচ্ছন্দে উলঙ্গ যুবকের সঙ্গে কুস্তি লড়িত এবং যথায় যুবতী কামিনীগণ স্বচ্ছন্দ-অঙ্গসঞ্চালনের নিমিত্ত গোপনীয় অংশ অবস্ত্রাবৃতে অগোপন করিয়া রাখিত, [৬২] সে দেশের এক-জন দর্শক, ভারতীয় সঙ্কীর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া, ওরূপ কথা না বলিবে ত বলিবে কে? [৬৩]

ভারতীয়ের ধর্ম্মবুদ্ধি সম্বন্ধে. ঐ মিগাস্থিনিস্ বলিতেছে [৬৪]—ইহাদিগের আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই মৃত্যু সম্বন্ধে। ইহারা এই জীবনকে গর্ভবাসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সেই গর্ব্ভবাসের পূর্ণতা অন্তে মৃত্যুই তাহাদের বিবেচনায় প্রকৃত জন্ম;—মৃত্যুর পর হইতেই যথার্থ সুখ ও সুখময় জীবনের আরম্ভ হয়। এই কারণে ইহারা মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য, সর্ব্বদা নানাবিধ ব্রত নিয়মাদির আচরণ করিয়া থাকে। ইহলোকে মনুষ্যভাগ্যের যাহা কিছু সুখ দুঃখ, সে সকলকে ইহারা কিছুই গণনায় আনে না এবং তাহাকে নিরর্থক মায়া ক্রীড়া স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি তাহা মায়াক্রীড়া না হইয়া সত্য ও সৎপদার্থ হইত, তবে একই বস্তু এক ব্যক্তির নিকট দুঃখদায়ক ও আর একজনের নিকট সুখদায়ক; অথবা একই বস্তু সময়ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ চিত্ত উদ্দীপনার কারণ স্বরূপ হইবে কি

৬২। Plut. Licurg.

৬৩। অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতের অবরোধপ্রথা মুসলমানদের আমল হইতে; সেটা ভ্রম। অবরোধপ্রথা ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত; তবে হইতে পারে যে এখনকার ন্যায় তখন ততটা বাঁধাবাঁধি ছিল না। এ বিষয় লোকনীতি প্রস্তাবে যথাস্থানে যথাযোগ্য ভাবে আলোচিত হইবে।

৬৪। Mrgas. Faag. XII.

জন্য? গ্রীক বিজ্ঞদিগের মনে এরূপ মায়াবাদ আপনা হইতে কোন কালে কখনও প্রবেশ করে নাই।

পুনশ্চ, একদা মাকিদুনিয়ার অধিপতি আলেক্জাণ্ডার, ব্রাহ্মণ-বিজ্ঞ দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া, আচার্য্যপদবীর দণ্ড (Dandames) ৬৫ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিকটে আনিবার জন্য, গ্রীকবিজ্ঞ অনেসিক্রিটোস্‌কে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রেরণ করেন। দণ্ডাচার্য্য পর্ণশয্যায় শায়িত, এমন সময়ে অনেসিক্রিটোস্ যাইয়া তাঁহাকে আলেক্‌জাণ্ডারের অনুজ্ঞা এরূপে জ্ঞাপন করিল। "হে ব্রাহ্মণাচার্য্য, আপনার মঙ্গল হউক, দেবরাজ জিউসের পুত্র রাজাধিরাজ ও সর্ব্বজনস্বামী মহারাজ আলেক্‌জাণ্ডার আপনাকে একবার তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছেন। আপনি সেই অনুজ্ঞা পালন করিলে, অপার পারিতোষিকদানে তিনি আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু যদি অবহেলা করেন, তাহা হইলে তদ্বিপরীতে আপনার মস্তকচ্ছেদন হইবে।" দণ্ডাচার্য্য উঠিবার পাত্র নহেন; সেই পর্ণশয্যাগত সুখ-শয়নে সমান শায়িত থাকিয়া ও অনুজ্ঞার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এ কথা সে কথার পর শেষ উত্তর প্রদান করিয়া এরূপ কহিলেন,—"দেখ, ঈশ্বর যিনি, তিনিই সর্ব্বোপরিস্থ এবং সর্ব্বেশ্বর রাজা, এবং তাঁহা হইতে কখনও ধৃষ্ট কদভিসন্ধির উৎপাদন হয় না। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—এই আলোকের, এই শান্তির, এই জীবকুলের, এই জলের, এই মনুষ্য-দেহ এবং এই মনুষ্য-আত্মার; আবার ইহারা যখন মৃত্যুহস্তে পড়িয়া বন্ধনশূন্যে স্বাধীনত্ব লাভ করে, তিনিই তাহাদিগকে নির্ব্বিকার প্রসন্ন মুখে পুনর্গ্রহণ করিয়া শান্তিদান করিয়া থাকেন। তিনি কোন যুদ্ধেরও প্রবর্ত্তনা বা হত্যারও প্রশ্রয় দিয়া থাকেন না; সেই একমাত্র মঙ্গলময়

৬৫। কেহ কেহ বাঙ্গলায় "দণ্ডমা" লিখিয়া থাকে, তাহা ভুল। দণ্ড শব্দের দ্বিতীয়ান্ত পদ দণ্ডম্, উহাকে গ্রীক-ব্যাকরণানুরূপ নামান্ত-প্রত্যয়ে লইয়া আসিলে Dandames হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য যে, অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লেখকদিগেরও এ ভুল লক্ষ্যগত হয় নাই।

দেবই আবার স্বামী, এবং তাঁহারই নিকট আমি বিনতশির হইয়া থাকি। কিন্তু তোমার আলেক্‌জাণ্ডার ঈশ্বর নহে, তাহাকেও এক দিন মরিতে হইবে। বিশেষ যে ব্যক্তি এখনও তীব্রবহা নদীর তীর পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হয় নাই; অথবা যে এখনও বিশ্বরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাহার উপর আরূঢ় হইতে পারে নাই, সে কেমন করিয়া সর্ব্বজন-স্বামী হইতে পারে? অথবা আলেক্‌জাণ্ডার এখনও সশরীরে রসাতল গমনে সমর্থ হয় নাই; অথবা সূর্য্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মধ্য আকাশ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, তাহাও নিরূপণ করিতে পারে নাই। যদি তাহার বর্ত্তমান রাজ্যায়তনকে সে তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ পূরক বলিয়া বিবেচনা না করে, বলিও তাহাকে যেন এই গঙ্গা পার হইয়া ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণের যথেষ্ট উপকরণ মিলিতে পারিবে। তুমি নিশ্চয়ই জানিও, আলেক্‌জাণ্ডার আমাকে যে সম্মানদানে প্রস্তুত, অথবা সে আমাকে যে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইতেছে, আমার পক্ষে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমি যে দ্রব্যের সমাদর করিয়া থাকি এবং যাহা আমার কার্য্যে লাগিয়া থাকে, সুতরাং যাহা আমার নিকট মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত, তাহা আমার এই শয্যা ও কুটীর নির্ম্মায়ক পত্রপুঞ্জ; অথবা ঐ লতা যাহা আমার সুরস আহারীয় যোগাইয়া থাকে; অথবা ঐ জল যাহা আমার পানীয় প্রদান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য যে সকল আয়াসসাধ্য বস্তু,যাহা অন্যে সংগ্রহ করিয়া থাকে,তাহা তাহাদের পক্ষে পরিণামে কেবল দুঃখ ও বিরক্তির কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমি যাহার শয্যা এই পর্ণপুঞ্জ এবং রক্ষণীয় বস্তু যাহার কিছুই নাই, আমার নিদ্রা কত সুখের!—যদি আমি রত্নাদি সম্পত্তি সংগ্রহ করিতাম, তাহা হইলে আর আমার এ নিঃশঙ্ক সুখের কিছুই থাকিত না। সন্তানের প্রতি জননীর ন্যায়, এই অবনী আমার সমস্ত অভাবই পূরণ করিয়া থাকেন। আমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গমন করিতে পারি, কোন বন্ধনেই আমি বদ্ধ, বা কোন ভারে ভারভূত নহি। যদি

আলেক্‌জাণ্ডার আমার মস্তকচ্ছেদ করে, তাহা বলিয়া আমার আত্মাকেও যে সে ধ্বংস করিতে পারিবে তাহা নহে। আমার মস্তক নির্ব্বাক পড়িয়া রহিবে বটে; কিন্তু আমার আত্মা, এই শরীরকে ছিন্ন বসনের ন্যায়, যে পৃথিবী হইতে উহার উৎপত্তি তথায় পরিত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহার ঈশ্বর-সকাশে আরোহণ করিবে। যে ঈশ্বর আমাদিগকে শরীরী করিয়াছেন; যিনি, আমরা পৃথিবী-পতিত হইলে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকি কি না তাহার পরীক্ষার্থে আমাদিগকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছেন; যিনি আমাদিগের এই জীবন অন্তে আমাদিগের কর্ম্মসমূহের বিচার করিবেন, যেহেতু তিনিই সর্ব্বোপরি বিচারক; এবং যাঁহার নিকট পীড়িতের যে আর্ত্তনাদ তাহাই পীড়াদায়কের শাস্তির কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে; আমি সেই ঈশ্বর-সকাশে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করিব।”

“অতএব যাও, তোমার আলেক্‌জাণ্ডারকে বল গিয়া, এ সকল ভীতিপ্রদর্শন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, বা যাহারা সুবর্ণ সম্পত্তি আদি লাভের জন্য বাসনা-ক্ষিপ্ত; ব্রাহ্মণেরা সম্পত্তি চাহে না বা মৃত্যুকেও ভয় করে না। যাও তবে, আলেক্‌জাণ্ডারকে আবার বলিও, তোমার নিকট এমন কিছুই নাই যাহার প্রাপ্তি জন্য দণ্ড লোলুপ, এজন্য সে তোমার নিকট যাইতে অশক্ত; তবে তোমার যদি দণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনীয় থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকটে স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।” ৬৬

দণ্ডাচার্য্যের এই উত্তরের উপর মিগাস্‌থিনিস্ লিখিতেছে—“আলেক্‌জাণ্ডার অনেসিক্রিটোসের দ্বারা দণ্ডের নিকট হইতে এই উত্তর প্রাপ্তান্তে, দণ্ডকে দেখিবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক হইয়াছিলেন। ৬৭ এই দণ্ড

৬৬। Megas. Frag. LV. মিগাস্‌থিনিসের সাময়িক যথাপ্রাপ্ত হিন্দুধর্ম্মের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া যাইবে।

৬৭। অন্যত্র কথিত আছে, আলেক্‌জাণ্ডার দণ্ডাচার্য্যের বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রথমে তিনি অরণ্যভ্রমণের ছলে দণ্ডাচার্য্যের তপোবনে আইসেন। কিন্ত

যদিও বৃদ্ধ এবং নগ্নবেশী, কিন্তু ইনিই কেবল একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহার নিকট সর্ব্বজাতিবিজয়ী জগজ্জেতা বীর আলেক্‌জাণ্ডার পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন।” তথাস্তু। মাতঃ ভারতলক্ষ্মি! এই আমাদের পিতৃপুরুষ, ঐ তাঁহার হৃদয়বল, আর সেই তাঁহার পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বী জগজ্জেতা বীর আলেক্‌জাণ্ডার! আর এতাদৃক্ পিতৃপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমরা বা করিতেছি কি?—বিধর্ম্মী দাসত্বে বাহবা মিলিবে বলিয়া স্বচ্ছন্দে দোষশূন্য মাতৃসন্তানকে ফাঁশিকাষ্ঠে তুলিয়া দিতেছি; বিজাতীয় বিধ্বস্তকারীর প্রসন্নতার আশায়, স্বচ্ছন্দে মাতৃসন্তানের অপ্রিয় সাধন করিয়া অপরের প্রিয়রচন করিতেছি; স্বজাতিধর্ষণে আনন্দে হাততালি দিতেছি; অপরম্বা বিজাতি-গুণগানে কণ্ঠ ছিন্ন করিতেছি! মাতঃ ভারতলক্ষ্মি! আর তোমাকে কি বলিব? ছি! ছি! ভাগ্যদোষে হয় তুমি চোখের মাথা খাইয়াছ; নতুবা সমুদ্রে কি জল কমিয়া গিয়াছে, তাই এ দেশ ডুবাইয়া আজিও দহ পড়াইতে পার নাই? কালের প্রভাবে কি দুরন্ত বৈষম্যই ঘটিয়াছে!

অনেকের বিশ্বাস, ভারতের উচ্চ জাতিরা নীচ জাতির প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করিতেন; বিশেষতঃ শূদ্রেরা ক্রীতদাসবৎ থাকিত। তৎসম্বন্ধে মিগাস্‌থিনিস্ বলিতেছে;—“ভারতের আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, এখানে ভারতীয়মাত্রে স্বাধীন, ইহাদের মধ্যে দাসশ্রেণীস্থ কেহ নাই। কেবল এই বিষয়ে ভারতীয় এবং লাকিদিমোনিওদিগের মধ্যে বিষয়ের একতা দেখা যাইতেছে। তথাপি, লাকিদিমোনিওদিগের মধ্যে হেলোটদিগকে দাসস্বরূপ বলিলে বলা যায়, এবং হেলোটেরা দাসের ন্যায় খাটিয়াও থাকে; কিন্তু ভারতে তাহাও নাই। স্বদেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয়দিগেরও কাহার প্রতি ইহারা দাসের ন্যায় ব্যবহার করে না।”[৬৮]

থায় দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে নিকটে লইয়া যাইবার জন্য অনেসিক্রিটোস্‌কে পাঠাইয়াছিলেন। (Frag. LV.—B). দণ্ডাচার্য্য আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট যাইতে অস্বীকার করিলে, এরূপ উক্ত আছে যে, আলেক্‌জাণ্ডার স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। (Frag. LIV). আলেকজাণ্ডারও কি প্রভূত মহামনা!

৬৮। Magas Frag. XXVI. গ্রীস এবং রোম, উভয়েতেই দাসপ্রথা অতিশয়

অতঃপর, গ্রীকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব ও তাহার প্রকৃতি আদি সম্বন্ধে, এক-জন ফরাসী ইতিহাসবেত্তার মতামত পাঠ করিয়া দেখ। "ইহাদিগের সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব; পর্ব্বাহ এবং উৎসবাদির স্বভাব ও মতি (যাহার একমাত্র শিক্ষক এবং নেতা, কবিগণ); এবং দেবতাদিগের চরিত-আদর্শ পর্য্যন্ত (যে দেবতাদের দুর্দ্দমনীয় কুপ্রবৃত্তি, নিন্দনীয় কীর্ত্তি এবং নিতান্ত ঘৃণাকর ক্রিয়া সকল, স্তোত্র বা গাথায় গ্রথিত এবং লোকসমূহের উপাস্য এবং অনুকরণযোগ্য বলিয়া সম্মানিত ও গৃহীত হইয়াছে); এই সমস্তের মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যাহা লোকচিত্তকে আলোকিত বা উন্নত, জ্ঞানাধার বা নীতিসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যুত ইহাই বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয় যে, যে সকল বিষয় তাহাদের গুরুতম দৈবকার্য্য এবং নিতান্ত পবিত্র ও গূঢ় গুহ্য ধর্ম্মাচরণ বলিয়া গণিত; সে সকলের মধ্যে, মনুষ্য জ্ঞানসম্পন্ন ও নীতিসম্পন্ন হইয়া এই সাধারণ জীবনক্রিয়া কিরূপে সুভাবে অতিবাহিত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় ও তৎপোষক কোন উপদেশ বা অনুষ্ঠানসূত্র থাকা দূরে থাকুক; বরং তৎপরিবর্ত্তে কদুপদেশ ও তদ্ব্যতীত আইনের প্রভুত্ব, প্রথার আধিপত্য

প্রচলিত ছিল এবং দাসেদের উপর যে ব্যবহার, তাহাও তেমনি কঠিন ছিল। ে যেমনই গুণজ্ঞানসম্পন্ন বা গণ্যমান্য লোক হউক, একজাতি অপরের নিকট বিজি হইলেই, জেতাকর্ত্তৃক দাসত্বে বিক্রীত হইত। রোমান সেনাপতি এমিলিয়স্ পৌল এপিরোস্ জয় করিয়া, একদিনের বাজারেই ১৫০০০০ এপিরোস্‌বাসীকে দাস বিক্রয় করিয়াছিল। কিপিও কার্থেজ জয়ের পর, একদিনে ৫০০০০ কার্থেজবাসী দাসত্বে বিক্রয় করে। স্ত্রাবোর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মাকিদুনিয়ার একদিনে বাজারে ১০০০০ দাস বিক্রীত হইয়াছিল। এই সকল দাসেরা বিবাহ করিলে, বা পুত্রের উপর ইহাদের কোন অধিকার থাকিত না; কিছু উপার্জ্জন করিলেও তা মুনিবের হইত; তাহাদের জীবন মরণ প্রভুর রোষতোষের উপর নির্ভর করি ইত্যাদি। প্রভুদের অত্যাচার এত ছিল যে, তাহার জন্য সময়ে সময়ে ঘোরতর দা বিদ্রোহ সকল ঘটিত। রোমের রূপিলিয়স্ ও আকুইলিয়স্ কর্ত্তৃক উপশমিত দা বিদ্রোহদ্বয় এতই ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, তজ্জন্য সমস্ত রোমক বল কম্পান্বিত হইতে হইয়াছিল।

শাসকবর্গের উপস্থিতি, রাজন্যবর্গ্যের সমিতি এবং পিতৃমাতৃদৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত, কিসে এই সমস্ত জাতিকে আমূলতঃ, ধর্ম্মের নামে বা প্রকারান্তরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, অপবিত্র এবং দুর্নীতিশীল উপাসনায় রত করিবে, তাহারই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে।” ৬৯

এখানে আর একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত, তাহা এই ; হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্ধৃতাংশসমূহ বেদাদি উচ্চ শাস্ত্র হইতে লইলাম কি জন্য এবং গ্রীকের বেলাই বা গ্রীক কবিগণ প্রভৃতির দোহাই দিলাম কেন ?—ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে বেদাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব—কবিগণের রচনা ও গাথাদিই কেবল তথায় তৎপদস্থ।

এক্ষণে একবার পূর্ব্বাপর সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক। ভারতীয় চিত্ত ক্রমে ক্রমে পারলৌকিক তত্ত্বে এরূপ সমাহিত হইল যে মানবচিত্ত, পরপর অদৃশ্য ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান্ হইয়া, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা দৃষ্টে পরলোকের প্রতি সমস্ত নির্ভরতা স্থাপন পূর্ব্বক, পার্থিব সমস্ত বিষয় অসার এবং তাহা ক্ষণমাত্রের বস্তু এরূপ বোধ করিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিল-যত্ন হইল। উপাস্য বিশ্বপতি, যিনি সেই বিশ্ববাসস্থানের পিতৃদেবতা। গ্রীকদিগেরও উপাস্য ইষ্টদেবতা আছে বটে, কিন্তু কিরূপ দেবতা, তাহা তাহাদের বর্ণিত দেবতত্ত্ব দ্বারা অবধারণ কর। ভারতীয়দিগের উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য পারলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ এবং প্রাপ্তমঙ্গলের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন ; গ্রীকদিগের উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ। গ্রীকবুদ্ধির নিকট দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের বিশেষ কারণ কিছু দেখা যায় না ; কারণ, যাহা আমি পাইয়াছি বা যাহা আমার আছে, তাহা আমারই হক্ প্রাপ্য তাই পাইয়াছি, তাহাতে আবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? আর এখন ?—এখন যেরূপ উপাসনা করিব, তাহার যে ফল পাইব সে ত তেমনি তাহার প্রতিদানমাত্র। অতএব

৬৯। M. Rollin.

ভারতীয়দিগের দৈবকার্য্য বিষ্ণুপ্রীতিকামার্থে; আর জমাখরচ-বিজ্ঞান-বিৎ গ্রীকদিগের দৈবকার্য্য আত্মপ্রীতিকামার্থে। এ সংসার-ক্ষেত্রে যে চিত্তের অবলম্বনীয় বস্তু যেরূপ, সে চিত্তের এ সংসার-উপযোগী কর্ত্তব্য-বোধ ও নীতিমার্গও তদ্রূপ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের কর্ত্তব্যবোধ ঐশ্বর্য্যলাভ; ভারতীয়দিগের কর্ত্তব্যবোধ ধর্ম্মলাভ। সুতরাং ভারতীয়-দিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ধর্ম্মবিধায়ক; গ্রীকদিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ঐশ্বর্য্যবিধায়ক। এতৎ কারণে ভারতীয়েরা ধীর, শান্ত, বিনীত, সর্ব্বভূতে সমান দয়াবিশিষ্ট, সর্ব্ব-জীবের প্রতি নৈতিকহিতসাধনে আগ্রহবান্। আর গ্রীকেরা নৈতিক-হিতবিষয়ে উদ্ধত; বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত; কার্য্যসম্পাদক উপস্থিত নীতি-প্রিয়; ক্ষমতার পক্ষপাতী—যাহার বল অধিক, সেই অধিকারী, সেই পূজনীয়; হিত ও দয়া আত্মহিতে সমাবিষ্ট।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহার একটি উদাহরণ দেখা যাউক। ভারতীয় এবং গ্রীকেরা যখন আদিতে স্ব স্ব উপনিবেশ-ভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন উভয়কেই তত্তৎ-দেশজ আদিম অধিবাসীদিগের নিকট বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে পদানত করিয়া, তাহাদিগের বাসস্থান দখল করিতে হইয়াছিল। আদিমগণের উপর উভয়েই আত্মপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে তাহারা শূদ্র, গ্রীসে তাহারা পিলাস্‌গী বা পরবর্ত্তী খ্যাতনামা হেলোট। ভারতীয়দিগের নিকট শূদ্র যেরূপ সম্বন্ধযুক্ত, গ্রীকদিগের নিকট পিলাস্‌গীও তদ্রূপ। কিন্তু এখন দেখ, এই উভয় জাতি, আপন পদানত আদিম অধিবাসীদিগের উপর, কে কেমন ব্যবহার করিয়াছিল। ভারতীয়দিগের নিকট, মানব যতই হীনাবস্থায় থাকুক না কেন, তথাপি প্রত্যেক মানব যখন অনন্ত আত্মায় আত্মাবান্, তখন ধরিতে গেলে তাহাকেও ঈশ্বরের অংশমূর্ত্তি-স্বরূপ বলিতে হয়; অতএব কাহারও প্রতি একবারে হেয়ভাব প্রদর্শন করিলে, সে হেয়ভাব বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রতিই প্রদর্শন করা হয়। ভারত-সন্তান তেমন কার্য্যে কখনই সাহসী হইতে পারে না। সুতরাং

শূদ্রেরা সহস্রগুণে নীচ হইলেও, তাহারা মানবীয় অধিকার হইতে চ্যুত হইতে পারে না। এজন্য শূদ্রেরা দাস্যবৃত্তি-অবলম্বী হইলেও, তাহারা সামাজিক স্বাধীনতা হইতে কোন অংশে বঞ্চিত নহে; এবং সাধারণ রাজদ্বার ভিন্ন, কি আপন প্রভু, কি অপর কেহ, কাহারই নিকট তাহাদিগকে আপন সদসদের জবাবদিহি করিতে হইত না। পুনশ্চ, এই শূদ্রেরা দাসত্বসূত্রে হীনতা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্ব পশুভাব হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যভাবই প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এ দিকে পিলাস্‌গীদিগের অবস্থার প্রতি একবার অবলোকন করিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে যে, মানুষ হইয়া, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মানুষকে কতদূর পশুভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই পিলাস্‌গীদাসেরা গো মেষাদি আর আর পশুপালের সঙ্গে সমজাতীয় অবস্থার সম্পত্তি-বিশেষ ছিল। সমাজের সঙ্গে গো মেষাদি পশুপালের যে সম্বন্ধ, ইহাদিগেরও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতায় ইহারা একেবারে বঞ্চিত। প্রভুই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাখিলে রাখিতে পারে, মারিলে মারিতে পারে। প্রভুরাও ইহাদের উপর ততোধিক অত্যাচার করিত এবং যখন ইচ্ছা যাহার প্রাণদণ্ড বা প্রাণরক্ষা দ্বারা আপনার রোষ বা তোষ ভাবের জ্ঞাপন করিত। সময়ে সময়ে এই হতভাগ্যদিগকে অরণ্যচর পশুর ন্যায় পালে পালে এককালে নিপাত করিবার পক্ষেও, উদাহরণ বিরল নহে। এখানে দেখ, ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তাবশে নিজ স্বার্থসাধন হেতু, মনুষ্যচিত্ত কিরূপ মনুষ্যত্বপরিত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছিল। পিলাস্‌গীরা ইহাদের দাস্য, কৃষি, পশুপালরক্ষা, ইত্যাদি যাবতীয় শ্রমসাধ্য এবং সামাজিক বোধে যাহা যাহা হেয়, সেই কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর কোন্ ধর্ম্ম কিরূপ শ্রেষ্ঠ, তদালোচনায় একটা প্রধান পরিচয়, ধর্ম্মের ধার্ম্মিকতাবিধায়ক শক্তিতে। আবার ধার্ম্মিকতা-বিধায়ক শক্তিকে উপলব্ধি করিবার প্রধান উপায়, ধর্ম্মশিষ্যগণের প্রকৃতিপর্য্যালোচনে। তত্ত্ব এবং নীতি, অল্পবিস্তর সকল ধর্ম্মেই

আছে; কিন্তু ভিত্তি উপলক্ষ্য এবং প্রয়োগ-প্রকরণ, এ সকলের তারতম্য ও বিভিন্নতা হেতু, কোথাও বা তাহা বর্ণমালার বর্ণযোজনা মাত্র, আর কোথাও বা জীবন্ত শক্তিস্বরূপ হয়। মনে কর, কোন একটা নীতিবিশেষ, একদিকে স্কুলপণ্ডিত এবং আর দিকে হিন্দুগুরু, উভয়ই আপন আপন শিষ্যকে শিক্ষা দিতেছে। এখন সে শিক্ষার ফল ফলিল কি? দূর ফল যাহা হউক, আপাততঃ নিকট ফলেই দেখা যায় যে, একদিকে পণ্ডিতমহাশয়ের টীকি লইয়া টানাটানি; আর দিকে গুরু দেববৎ পূজিত! অথবা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, এক গালে চড় খাইলে আর গাল পাতিয়া দিতে হয়, অর্থ নশ্বর এবং তুচ্ছ, ইত্যাদি; এ সকল বাইবেলও শিক্ষা দিতেছে এবং হিন্দুশাস্ত্রও শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু ফলের বেলায়? বাইবেলশিষ্যের, পৃথিবী মথিয়া, নানা দিগ্দেশ লুটিয়া এবং জাতিসংঘের স্বাধীনতা-রত্ন হরিয়াও, উদর পুরে না; আর শাস্ত্রশিষ্য ঘরের পুঁজী স্বচ্ছন্দে পরকে বিলাইয়া, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈরতা সহ বনাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। এখন কাজেই বলিতে হয় যে, একেতে শিক্ষাগুলি বর্ণমালার বর্ণযোজনা মাত্র; অপরে তাহা জীবন্ত শক্তি। এই জীবন্ত শক্তি যে যে ধর্ম্মে যত পরিমাণে অধিক, সেই পরিমাণে সে ধর্ম্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা উভয়ই স্থাপিত হয়।

এখন এই জীবন্ত শক্তি লইয়া ধরিলে, নিতান্ত বিপক্ষ যে,তাহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কি প্রাচীন কি আধুনিক, যে কোন ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের তুলনাতেই আসিতে পারে না। যেহেতু, হিন্দু সমাজের অতি উর্দ্ধতম পর্য্যায় হইতে অতি নিম্নতম পর্য্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, নৈতিকতা এবং ধর্ম্মভীরুতা এরূপ অক্ষুণ্ণ পরিব্যাপ্ত, যে সেরূপ আর কোন ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখ, তোমার ইউরোপে গ্রামে গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় গীর্জা এবং ধর্ম্মযাজক; তাহা ছাড়া কত কত ধর্ম্মসভা, সমিতি এবং প্রচারক ও প্রচারিকা নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইহা সত্ত্বেও, তোমার নিম্নশ্রেণীস্থ ইউরোপীয় রীতি নীতি ও স্বভাবে হিংস্রপশুবৎ নয় কি? আর সেই শ্রেণীস্থ হিন্দুসন্তানকে কোন উপদেষ্টা

কোন দিন ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না; অথচ তাহারা তাহাদের তুলনে দেববৎ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব হিন্দুধর্ম্মের শক্তি এতই দিগন্তব্যাপী ও প্রবলতর!

কিন্তু তদ্রূপ ফলাফল সত্ত্বেও, হিন্দু ঋষির দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতে পারি না। জগতের আর সর্ব্বত্র পাশবশক্তির উপশমতা না হওয়া পর্য্যন্ত, হিন্দুস্থানকে নৈতিকতা জন্য এরূপ নিরীহ মানুষে পরিণত করা উচিত হয় নাই। এ কথা কটা অনেক দুঃখেই আসিয়া পড়িল! দ্বিতীয়তঃ, নৈতিকতা অতিতরভাবে পরিণত হওয়ায়, হিন্দুসন্তানে স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি বহু পরিমাণেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইতি তৃতীয় প্রস্তাবে ধর্ম্মবিদ্যা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

তত্ত্ববিদ্যা।

১। তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ।

এ জগতে যদি অসতের অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে কি ধর্ম্মবিদ্যা কি তত্ত্ববিদ্যা, কি ধর্ম্মাচরণ কি তত্ত্বানুশীলন, এ সকলের কিছুরই প্রয়োজন হইত না; অথবা অসৎ অভাবে এই সৃষ্টিরই সঞ্চার এবং সম্ভাবনা থাকিত কি না সন্দেহ। যাহা সৎস্বরূপ ও সত্য, তাহা নিত্য, অব্যয়, অপরিবর্ত্তনীয় এবং সনাতন পদার্থ; কিন্তু সৃষ্টি সেরূপ নহে। দেখা যায় যে, সৃষ্টি মূল হইতে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনীয়, সর্ব্বদা উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের অধীন; অথবা হিন্দুর তত্ত্বকথায় উহা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণাত্মিকারূপে প্রসিদ্ধা। সৃষ্টিকেও সুতরাং স্বভাবতঃ অসৎ-মূল বলিয়া প্রতীত হয়। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র, এই অসৎ-মূল বৈকারিক সৃষ্টি স্বীকার করিয়া থাকে। অন্যান্য জাতীয় শাস্ত্র, যদিও ধর্ম্ম ও তত্ত্বোদয় সম্বন্ধে অসতের আদিকারণতা অস্বীকার করে না বটে; কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, মূলে উহা অসৎ হইতে উদিত নহে, তবে উদয়ের পরক্ষণে বটে অসৎপ্রভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সে বিচারে এখন প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। এখানে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট যে ধর্ম্মবিদ্যা এবং তত্ত্ব-বিদ্যা সম্বন্ধে, অসৎ-অধিকার যে আদি ও নিমিত্ত কারণ, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সেই অসৎকে পুনঃ নিরসন ও নিরাকরণ করিবার নিমিত্তই ধর্ম্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা, উভয়ের প্রয়োজনীয়তা। মানব অসৎপ্রভাবে স্বীয় যে মূল স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তত্ত্ব এবং ধর্ম্মবিদ্যা দ্বারা সেই স্বভাবের পরিজ্ঞান এবং প্রাপ্তি সাধন হয়।

খৃষ্টীয় পুরাণে কথিত আছে যে, সৎ-অসৎ বোধের প্রথমোদয়ে, বিধাতার আদি সৃষ্টি ইডেন-বিহারী আদমকে দিব্যাবস্থা হইতে পতিত

হইয়া, সুখদুঃখময় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আবার যখন সেই সৎ-অসৎ বোধের পূর্ণতায় সৎ হইতে অসতের পূর্ণ বিচ্যুতি হেতু সদসৎ বোধরূপ ভেদভাবকে বলি দিতে সক্ষম হইয়া, (স্বার্থ-বলিরূপ) মহাবলিকে আশ্রয় এবং আত্মভূত করিতে পারিবে; তখনই আদমের পুনর্মুক্তি—পুনর্ব্বার সেই দিব্যাবস্থা লাভ। বাইবেল গ্রন্থের এই ঘোষণা কি অপূর্ব্ব, কি অভাবনীয় গূঢ় সত্যপূর্ণ এবং সার্থক! যে জ্ঞান-বিজ্ঞ হিব্রু-ঋষি এই দুর্জ্ঞেয় গূঢ় গুহ্য ভেদ করিয়াও তাঁহার দিব্য দৃষ্টি চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বহু নমস্কার। বাইবেল গ্রন্থের এই কথা রূপক বা প্রকৃত যে ভাবেই গ্রহণ করা যাউক, ইহা কিন্তু নিশ্চয় এবং প্রত্যক্ষ যে, আদি পিতৃদেবের এই পতনোন্নয়ন, অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকার স্বরূপে, তাঁহার সন্ততিবর্গের জীবনের প্রতি পর্ব্বে এবং প্রতি গ্রন্থিতেই নিরন্তর ও অক্ষুণ্নভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমাদের, প্রত্যেক মানবের, আশৈশব সমগ্র জ্ঞানজীবনে ইহা নিত্য নিয়মিত ভাবে অভিনীত হইয়া যাইতেছে। আমরা আত্মদোষে জড়প্রায় ও ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি বা না পারি, তথাপি সে অভিনয়ের তিলমাত্র ক্ষান্তি নাই। দুর্ভাগ্যবান সে, যে ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া তদনুসরণে পদচারণ করিতে অসমর্থ।

• পুনশ্চ, "বালকদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করিও না, যেহেতু ঐরূপ প্রকৃতি লইয়াই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মিত"—এতদ্বাক্যে লোকহিতার্থে স্বার্থবলির জীবন্ত মূর্ত্তি যিশুখৃষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগের প্রতি অনুযোগ করিয়াছিলেন। যথার্থই ঐরূপ বালকপ্রকৃতি লইয়া স্বর্গরাজ্য নির্ম্মিত। আদমের কথিত আদি অবস্থা ঐরূপ বালকবৎ। শিশু অনন্ত হইতে নবাগত, কুটিল কালের সহিত অপরিচিত এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যশূন্য, সদসৎ-বোধে অনভিজ্ঞ, রাজারও প্রজা নহে, সাধুরও খাতক নহে, পাপপুণ্যের বিচার-বিহীন, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, যথার্থতঃ এবং সর্ব্বতোভাবেই ইডেনবিহারী আদমের প্রতিরূপ। শয়তানপ্রতিরূপ কাল-

প্রবর্ত্তনায় শেষে সৎ-অসৎ-বোধের উদয়ে, শিশু এখন মানুষ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, এবং শয়তানের সহ নিত্য সংগ্রামে রত হইল। এই শিশুত্ব ঘুচিয়া মানুষত্বে প্রবেশই আদমের দিব্যদশাচ্যুতি। আবার যখন মানুষ সেই সদসৎ-বোধকে আয়ত্ত করিয়া, সেই শয়তান-প্রলোভনকে উপেক্ষা পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার বালকত্ব লভিতে এবং স্বার্থক্ষয়ে মহাবলির অনুকরণ সূচিত করিতে পারিবে; অথবা রূপকবাক্যে, খৃষ্টশিষ্য যখন আত্মিক খৃষ্টের রক্তমাংস উদরস্থ করিতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহার পুনর্মুক্তি। ফলতঃ বালক,বালক ঘুচিয়া মানুষ হইলেও, যদি নিত্য রাজ্যের অধিকারী হইতে চাহে, তবে আবার তাহাকে বালক না হইলে চলিবে না। বালক এবং প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদিগের মধ্যে স্বভাবগত অন্য কিছু প্রভেদ নাই; প্রভেদ কেবল এই পর্য্যন্ত যে, বয়োবালক যে সে অজ্ঞান বালক এবং জ্ঞান-বালক যে সে সজ্ঞান বালক। আমাদিগের এই সংসারক্ষেত্রে সৎ-অসৎ সহ কর্ম্ম-সংগ্রামে, লাভের অঙ্ক কেবল শেষ বালকত্বে সেই সজ্ঞানতা টুকু। এই সজ্ঞানতার অনেক গুণ। অজ্ঞান বালক কাল-প্রবর্ত্তনায় সহসা বিচলিত হইয়াছিল. কিন্তু সজ্ঞান বালক অনন্তকালের নিমিত্ত অটুট। অজ্ঞান বালক বিশ্বের প্রতি বিচারশূন্য; সজ্ঞান বালক বিশ্বের প্রতি পূর্ণ বিচার-দক্ষ অথচ তাহাতে শয়তানী বিকার ও বিকম্পনশূন্য, অসৎ প্রতিরূপে বোধশূন্য খ্রীষ্টীয় দিব্য দূতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে দিব্য দূতেরও পতন সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইহাদের আর পতন নাই। শয়তান আর প্রলোভনে ইহাদিগের মধ্য হইতে স্বদলপুষ্টিকরণে অসমর্থ। অসৎকে ভেদ করিয়া সতের উদয় হইয়া থাকে; এবং যে সৎ-বিশেষ যে অসৎ-বিশেষকে ভেদ করিয়া উদয় হয়, সেই সৎ সে অসতের নিকট একবারে অনন্তকালের নিমিত্ত স্পর্শের অতীত হইয়া উঠে।

অতএব অজ্ঞান হইতে সজ্ঞান বালকত্বে উপস্থিত হইলেই, খৃষ্টীয়-রূপকে নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে; এবং এবার সে ইডেন হইতে শয়তান বিধ্বস্ত, বিদূরিত এবং চূর্ণশির। অবস্থাভেদে কথিতমত

তারতম্য দৃষ্ট হইলেও, তথাপি এ উভয় বালকত্বই দিব্যাবস্থাসম্পন্ন সুতরাং সুখের। কিন্তু কি ভয়াবহ, ক্লেশকর এবং দুঃখসঙ্কুল তদুভয়ের মধ্যসাময়িক অবস্থা। এক বালকত্ব লোপে অপর বালকত্বে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত, মানবের ইহা প্রকৃতই ইডেনচ্যুত পতিতকাল; উহাই প্রকৃত স্বার্থপূর্ণ সংসারী এবং মনুষ্য অবস্থা। মানব এখন স্বীয় বুদ্ধিস্ফীত, আত্মগর্ব্বে ঘোরতর মোহাচ্ছন্ন; প্রতি বিষয়ের জন্য আর এখন ঈশ্বরের উপর অকপট নির্ভরতাও নাই, সুতরাং নির্ভরতাজনিত শান্তিও নাই; অথবা ঈশ্বরও, বলিতে গেলে, এখন আর তাহাদিগের প্রতি বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় তত্ত্বাবধারণ করেন না। শয়তানকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সম্মুখীন দেখিয়া; এবং রক্ষণীয় বস্তু হইতে অরক্ষণীয় বস্তু রক্ষণে প্রতারিত হইয়া; আত্ম-রক্ষণের প্রবৃত্তি-সূত্রের বিকারে, মানব এখন সতত ঘোর স্বার্থবান্, স্বায়ত্ত-শক্তিতে স্ফীত, নিয়ত সংগ্রামরত, স্বয়ং-সর্ব্বস্ব, আত্ম-বল-দৃপ্ত, আত্মবুদ্ধিতে বৃহস্পতি, তর্কবুদ্ধিতে বিশারদ; অথবা এক কথায়, হীনপক্ষ-বোধ-বিক্ষুব্ধ ও স্বপক্ষ-সহায়তায় সন্দিহান সম্মুখ যোদ্ধার যে কিছু দোষ গুণ তদ্দ্বারা পরিচালিত। সংগ্রামে বিধ্বস্ততা ও শ্রম-ক্লিষ্টতায়, সৎ যাহা তাহাই এখন শত্রুরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; কেবল শত্রু নহে, কখন কখন তাহাকে ছন্নস্বপক্ষ ও ঘরের শত্রু ভাবিয়া, রাগে ও বিরক্তিতে বিপক্ষ অসৎকে বন্ধু ভাবিয়া তাহার শরণাপন্ন হয় ও ক্ষণিক শান্তির প্রলোভনে তাহার আশ্রয়গ্রহণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। মানবের এই মধ্য সময়—এই পতনদশাটিই বুদ্ধিমানের কাল, জ্যেষ্ঠত্ব বিস্তারের সময়, বিদ্যার জাহাজগিরি, তর্করঙ্গের ছড়াছড়ি; মানব এখন স্বীয় তেজে উন্মত্ত ষণ্ডের ন্যায় মদবিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সময়ে, এই ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যেই, আবার ভাবী শুভাশুভের বীজ যাহা তাহাও বপিত হইয়া থাকে।

মানবের এই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থার অবলম্বনপদার্থও ত্রিবিধ। অজ্ঞান বালকের অবলম্বন, পরিশুদ্ধ ঐশ্বরিকসত্তাময়ী প্রকৃতি দেবী স্বয়ং; মধ্যাবস্থার অবলম্বন, বুদ্ধি এবং বিচারণাশক্তি; সজ্ঞান বালক বা

চূড়ান্ত অবস্থার অবলম্বন, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। উক্ত তৃতীয় অবস্থার উপস্থিতিতে শয়তান যখন বিদূরিত হইবাতে, বিভিন্ন অর্থের অভাবে স্বার্থকে বলি দিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখনই আবার স্বার্থক্ষয় দ্বারা মহাবলির আশ্রয় হেতু ঈশ্বরসত্তা পুনর্ব্বার অবলম্বনস্থল হওয়ায়, মানবের পুনর্মুক্তি—খৃষ্টীয় নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার। প্রথম অবস্থার বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, তাহা অবশ্যই সহজ জ্ঞান এবং ধূলা-খেলা; দ্বিতীয় অবস্থা বা বুদ্ধি এবং বিচারণাশক্তির বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, সৎ-অসৎ বোধের সুনির্ণয় যথায় উদ্দেশ্য, তাহাকে তত্ত্ববিদ্যা কহা যায়। শ্রদ্ধা এবং ভক্তির বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, তাহা ধর্ম্মবিদ্যা। তত্ত্ববিদ্যার বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

পুনঃ ক্রিয়ামার্গে, প্রথম অবস্থার সম্বল চিত্তচালনা; দ্বিতীয় অবস্থার সম্বল বুদ্ধিচালনা; এবং তৃতীয় অবস্থার সম্বল হৃদয়চালনা। তত্ত্ববিদ্যা সেই বুদ্ধিচালনা হেতু সাধারণ দূরদর্শনফলে উৎপন্ন। ধর্ম্মবিদ্যা যেমন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ লইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি উভয়বিধ দৃষ্টিযোগে কার্য্য করিয়া থাকে, তত্ত্ববিদ্যার স্বভাব সেরূপ নহে; একমাত্র বহির্দৃষ্টি প্রধানতঃ ইহার উপায়। এই জন্য তত্ত্ববিদ্যা এতটা হৃদয়শূন্য এবং এই জন্যই লোকে, একজন অতি সামান্যালোকসম্পন্ন ধর্ম্মশিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে তাহাও স্বীকার, তথাপি তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ পর্য্যায়ের হউক না কেন, প্রাণ মন বিক্রয় করিয়া কখনও তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে চাহিবে না। একজন সামান্য শিক্ষকের ধর্ম্মখাতিরেও লোকে প্রাণধন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াছে,এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ হউক, তাহার খাতিরে কাহাকে কখনও সেরূপ করিতে দেখিয়াছ কি? কথায় মরা ও কাজে মরা যতটা অন্তর, বুদ্ধি এবং হৃদয়ে তদপেক্ষা কম অন্তর নহে। ফলতঃ ধর্ম্মবিদ্যা যত নিম্ন পর্য্যায়ের হউক, যদি সাত্ত্বিক হয়, তবে তাহা সর্ব্বদা কোন না কোন মানবসমক্ষে গ্রহণীয় এবং ভক্তির বিষয় হইবেই হইবে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার পক্ষে সেরূপ নহে। উহা যতই উৎকর্ষযুক্ত হউক না কেন, কেবল আদরণীয় ও

পরামর্শ-দাতৃস্থলীয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও ভাবিও না যে, তত্ত্ববিদ্যা (যদি তাহা সাত্ত্বিক এবং সুপ্রকৃতিযুক্ত হয়) সংসারে অতি সামান্য কার্য্য করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে; তাহা নহে। তত্ত্ববিদ্যা হইতেই ধর্ম্মবিদ্যা সুনির্ম্মল ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে। এ সংসারে যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি ধর্ম্ম বিষয়েতেও, "কেন?" হেতু অনেক আটকাইয়া যায়। সোজা কথায়, সেই "কেনর" উত্তর-দানের নাম তত্ত্ববিদ্যা। ইহা দ্বারা এখন বুঝিতে পারিবে যে, তত্ত্ব-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা কি গুরুতর।

তত্ত্ববিদ্যা মানবীয় জ্ঞানজীবনের অনেক এবং অতি সুমহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রধানতঃ অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ বিপাকের নিরসন দ্বারা, অবলম্বনীয় ধর্ম্মবিদ্যাকে সর্ব্বতোমুখে স্থাপন ও তাহার নির্ম্মলতা সাধন পক্ষে সাক্ষাৎ হেতু স্বরূপ হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ, উত্তরোত্তর গুরুতম দূরদর্শন চালনার জন্য, পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানকে সহজ-আয়ত্তসাধ্য ও সূত্রবদ্ধ করিয়া সোপানস্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। পদার্থপর্ব্বে রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বিবিধ পূর্ণ পদার্থের অবস্থাবিকার সাধন করিয়া, তাহাদের পরিপাচন পূর্ব্বক, পদার্থান্তর উৎপাদনের উপায় করিয়া দেয়; তত্ত্ববিদ্যাও সেইরূপ জ্ঞান-সংসারে রাসায়নিক ক্রিয়ার কার্য্য করিয়া থাকে। এই রসায়ন-কালে যেরূপ যেরূপ তত্ত্ব-উপকরণের অভাব বা অনভাব হয়; তত্ত্ব-বিদ্যাও তদনুরূপ আকার ধারণ করে। এই আকারগত প্রভেদ হইতে, আস্তিক তত্ত্ববিদ্যা, নাস্তিক তত্ত্ববিদ্যা; আবার তাহার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত-পরিপোষক তত্ত্ববিদ্যা, ইত্যাদি পৃথকত্বের উৎপত্তি হয়। রসায়নের ন্যায় তত্ত্ববিদ্যারও অবস্থা দ্বিবিধ; এক মসলাস্থলীয় পূর্ণ পদার্থ সকলের অবস্থা-বিকৃতিসাধন, দ্বিতীয়তঃ তৎসহযোগে উদ্দেশ্যভূত ভাবী পদার্থের অবয়ব নির্ম্মায়ণ। প্রথম অবস্থার অবলম্বনীয় তত্ত্ববিষয়িণী শাস্ত্রবিদ্যা, প্রধানতঃ তর্কদর্শনাদি; দ্বিতীয় অবস্থার শাস্ত্র-বিদ্যা, তত্ত্ববিজ্ঞান প্রভৃতি। একের কার্য্য ভাঙ্গা, অপরের কার্য্য

গড়া। তর্ক সন্দেহের নিরসন করিয়া থাকে অল্পই ; কিন্তু সন্দেহের উৎপত্তি করিয়া থাকে অনেক। যত তর্কতরঙ্গের ঘটা, ততই জ্ঞান-মার্গে ঘোর ঘূর্ণাতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদুর," এই সাধারণ-উক্ত বাক্যটি কি গূঢ় সত্যপূর্ণ! তর্কদর্শনের কার্য্য ভাঙ্গা ;—এই নিমিত্ত আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইয়া থাকি যে, যে কোন জ্ঞানপর্য্যায়বিশেষের অবস্থা বিস্রংসন দশাতেই তদ্বিষয়িণী ও তৎশ্রেণীর দর্শনবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। জ্ঞান-সংসারের ক্রমোন্নতি হেতু, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার বিষয়ীভূত পুরাতন বিষয় সকল যখন অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে, তখন আগে এই তর্কদর্শন উদয় হইয়া তাহার ধ্বংসকার্য্য সমধা করিয়া দেয় ; তাহার পর আত্মজ্ঞান ও মনস্তত্বাদি আকারে তত্ত্ববিজ্ঞান আসিয়া তৎস্থানে নূতন বিশ্বাস্য বিষয়ের নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া থাকে ; সেই নির্ম্মাণের পূর্ণশ্রীসাধন ধর্ম্মবিদ্যায়।

তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মবিদ্যার তুলনে যতই নিম্ন পর্য্যায়ে থাকুক, তথাপি এ সংসারে সে মনুষ্যকে দুর্ভাগ্যবান্ বা অল্পভাগ্য বলিতে হইবে, যাহার ভাগ্যে তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে হয় ; এবং তত্ত্ববিদ্যারূপ উপায় সহযোগে যাহার ধর্ম্মজ্ঞান পরিষ্কৃত ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত না হইতে পায়। তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যায় যে অধিকার, তাহা কখন দৃঢ় বা অটল বা সর্ব্বাবয়বযুক্ত হয় না এবং তাহা না হইলে, ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা পক্ষেও অবশ্য ত্রুটি রহিয়া যায় ; সুতরাং অল্প আঘাতেই তাহা সহসা বিচলিত হইয়া পড়ে। মানব সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র, যে ঘোরতর সদসৎ-জালে জড়িত হয় এবং অসৎ-সংস্রবে যে দারুণ সন্দিগ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তাহা হইতে, একমাত্র তত্ত্ববিদ্যার সহায়তা ভিন্ন, সর্ব্বাঙ্গীনভাবে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এ কথা সকলে বুঝে না ; পুনঃ ইহাও অনেকে বুঝে না যে, মানব আত্মপ্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, উন্নত অবস্থা এবং ভাব, উভয় গ্রহণেই অক্ষম। কাহারও মুক্তি অন্যের উপর বরাতে, কেহবা কেবল তিলকছাপায় স্বর্গভূমি অধিকারে উদ্যত,

আবার অধিকাংশ লোক শুষ্ক নীতি শিখিয়া ও শিখাইয়া উদ্দেশ্য সাধিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। ধর্ম্মশূন্য, কর্ম্মশূন্য, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য যে নীতি, তাহা নব্য বাঙ্গালির মূলশূন্য স্থূলপণ্ডিতী নীতি; এরূপ নীতিজ্ঞের ধর্ম্মও তদ্রূপ কর্ম্মও তদ্রূপ। কেহ বা আরও চতুরের চূড়ামণি, জমাওয়াশিলবাকীর দ্বারা পাপপুণ্যের হরণ পূরণ করিয়া পুণ্যলোক অধিকারে অসন্দিগ্ধচিত্ত;—জুয়াচুরি কর, অপহরণ কর, কিন্তু আহ্নিক করিও বা গঙ্গায় নাহিও, পাপ কাটিবে; লোকের সর্ব্বনাশ কর, ঘর জ্বালাইয়া দেও, কিন্তু সেই অর্থে পূজা করিও বা ব্রাহ্মণকে দান দিও, তোমার মুক্তি হইবে। এ সকল কি নীতি না ধর্ম্ম? উহা নীতিও নহে, ধর্ম্মও নহে;—বহুকালের গতায়ু নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বের বহু পুরাতন ও পরিত্যক্ত জীর্ণশল্কের উহা প্রাগল্‌ভ প্রকটন মাত্র। উহা অনীতি এবং অধর্ম্ম।

ফলতঃ তত্ত্বাদি সহযোগে প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্বাদির শিক্ষা এবং প্রয়োগ, অবিকল গ্যালবানিক ব্যাটারী অর্থাৎ তাড়িতপ্রবাহের বেগসংযোগে শরীরযন্ত্রে সঞ্চালন-শক্তি উৎপাদন করার ন্যায়; উভয়ই অফলপ্রদ বা ঊর্দ্ধসংখ্যায় ক্ষণিক ও মাত্রামাত্র ফলপ্রদ। "চুরি করিও না", এ নীতি এ কাল ধরিয়া সকলেইত ঘোষণা করিয়া আসিতেছে; তথাপি লোকে কেন চুরি করে, কেনই বা নিত্য জেলখানা পরিপূর্ণ হয়, কেনই বা লোকে চুরি করায় আজি পর্য্যন্ত বিরত হইতে শিখিল না? তাহার কারণ, বাঙ্গারাম? তাহার কারণ আছে,—শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির উন্নয়নের অভাব; সুতরাং সে নীতি চিত্তস্থ বা কণ্ঠস্থ থাকিলেও, হৃদয়স্থ হইতে পারে নাই এবং হৃদয়স্থ না হইলে, প্রকৃত ফলও কখন ফলে না। এরূপ শুষ্কনীতিবাদী এক্ষণকার বাঙ্গারাম-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সকলেই; যদিও বিদ্যাভিমান যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাহারা কোন সাত্ত্বিক তত্ত্ববিদ্যা বা কোন প্রকার যথার্থ বিদ্যারই প্রকৃত ধার ধারে না। কেহ বা পড়াপাখী, মিল্ বা কোম্‌তের বুলি বলিতে শিখিয়াছে,—নিজের বুলি

অবস্থা নাই; কেহ বা তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়াই অভিনব ধর্ম্ম-বিদ্যার প্রচণ্ড অধিকারী,—অন্ততঃ মুখে। ইহার উপর অনুকরণ-প্রিয়তা সর্ব্বত্র; কাপট্য অঙ্গভূষণ,—কপটে স্বার্থ সাধিব অথচ বলিব উহা ঈশ্বরাদিষ্ট; বাহির নীতি ভিতর নীতি, বাহির মান ভিতর মান—বাহ্যদৃশ্যই সর্ব্বস্ব। ভ্রান্তবোধবিমূঢ়! নিজে নিজে এত ঠকিয়াছ, এত ঠকিতেছ, তথাপি তোমার চৈতন্য হইল না! তোমার আবার নীতি—তোমার আবার ধর্ম্ম, নীতিধর্ম্মের তুমি কি ধার ধার? পেনালকোড তোমার বেদ, স্বার্থ তোমার গয়া-গঙ্গা, 'পাঁচজন' তোমার গুরু, এবং বাহ্যদৃশ্য তোমার অলঙ্কার। ইহাতে যে গতি তোমার প্রাপ্তব্য, তোমার জন্য তাহাই প্রস্তুত হইয়া রহিতেছে!

কিন্তু যাহাদের নীতি ও ধর্ম্মে আস্থা আছে এবং প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী ছাত্র যাহারা, তাহাদের ভাব ওরূপ নহে। তাহারা সহসা কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না এবং একবার প্রবৃত্ত হইলে আর তাহা পরিত্যাগও করে না। তাহারা তত্ত্বাদি সহযোগে আত্মপরিশোধন পূর্ব্বক, নিজ প্রকৃতিকে এরূপ উন্নীত করিয়া থাকে; যেখান হইতে নীতিচ্যুত হওন বা দুর্নীতিক্ষেত্রে অবতরণ তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষ যাহা কিছু বলে বা করে, তাহা তাহার প্রকৃতি-মন্থনে উদিত হয়। সংসারপ্রবেশকালীন, নানা প্রতিকূল কারণের তাড়নায়, প্রকৃতিতে যে কৃত্রিমতা ও বিকৃতি আসিয়া বিজড়িত হইয়া থাকে; তত্ত্বজ্ঞানাদি সহযোগে সেই কৃত্রিমতা ও বিকৃতি বিদূরিত হয়। কাজেই তখন, উৎসের পরিশুদ্ধতা হেতু, প্রকৃতিপ্রসূত যাহা কিছু, তাহা কখনও সৎ-বিরোধী বা নীতিবহির্ভূত হইতে পারে না। অতএব এখন বলা বাহুল্য যে, প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্নীতি-পরিহারের আর কোন প্রশস্ত পন্থা নাই। কাপট্য, স্বার্থসাধন ও বাহ্যদৃশ্য যেখানে স্থান পায় না; অনুকরণপ্রিয়তা, আত্মলোপ ও আত্মনাশ সর্ব্বত্র পরিহার্য্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বাঙ্গারাম, অনুকরণ-প্রিয়তা ও আত্মনাশ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। এমন কি, গুরুশিষ্যস্থলেও,

স্বীয় আত্মভাব সর্ব্বদা অটুট্ রাখা বিধেয়। এটা নিশ্চয় জানিবে, প্রতি মানব স্বীয় স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতে ও তাহাকেই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে এ জগতে প্রেরিত হইয়াছে; অন্যের প্রকৃতিতে নিজ প্রকৃতি বিলুপ্ত করিতে প্রেরিত হয় নাই। অতএব যে কেহ যত বড় শ্রেষ্ঠ এবং জগদ্গুরু পর্য্যন্ত হউক না কেন, তাহার অন্ধশিষ্য হওয়া কখন উদ্দেশ্য নহে; তাহার প্রক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গযোগে তোমার স্বনিহিত অগ্নিরাশিকে—স্বীয় প্রকৃতি-মৌলিকতাকে উদ্দীপিত করিয়া লওয়াই উদ্দেশ্য; শিক্ষকমাত্রের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, তদতিরিক্তে অন্য সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত উত্তমের নিকট প্রকৃত অধমের যে বিনত ভাব অথবা প্রকৃত উচ্চের দ্বারা প্রকৃত নীচের যে পরিচালিত হওন, এ কথা উহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রকৃত অধম এবং নীচের তদ্রূপ বিনত ও পরিচালিত হওন, তাহার পক্ষে ভূষণস্বরূপ; অথবা ভূষণ কেবল নয়, তাহা তাহার কর্ত্তব্যস্বরূপ বলিয়াও জানিও। উচ্চ ও নীচ সম্বন্ধে এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে সমাজও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্যার অনপেক্ষশীল আরও এক প্রকৃতির লোক ঈশ্বর এ জগতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন কতকগুলি লোক দেখা যায় যে, সহস্র সুশিক্ষা ও সহস্র সুনীতি চাপান সত্ত্বেও সুপ্রকৃতিযুক্ত কখন হয় না; তেমনি আর কতকগুলি লোক আছে যে, সহস্র কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, তাহাদের সুপ্রকৃতি কখনও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। ইহাদিগকেই লোকে যথার্থতঃ স্বভাবসিদ্ধ দিব্যপ্রকৃতি বলিয়া আদর করিয়া থাকে। প্রাথমিক বালকত্বের যে দিব্যভাব, তাহা আজীবন ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং এরূপ প্রকৃতি যাহাদের,তাহারা তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়া একবারেই ধর্ম্মবিদ্যার আশ্রয় স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। পুনশ্চ, তত্ত্বশিক্ষা শুনিলেই ভাবিও না যে, সকলকেই যেন ঘট পট যত্ন শত্ব আদি জ্ঞান শিখিতে ও নানাবিধ পুস্তক পড়িতে হইবে। শিক্ষা যাহা, তাহা যে কোন বিষয়ের হউক, দেশকালপাত্র অনুসারে,

ক্ষমতা ও পরিমাণ অনুরূপ হওয়া উচিত এবং তাহা কেবল পুস্তক না পড়িয়া আরও নানাবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

তত্ত্ববিদ্যা দ্বারা যে সুফল কতটা ফলিতে পারে এবং প্রয়োজনীয়তাও যে তাহার কতদূর, তাহা উপরে বলিয়া আসিলাম। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাকে কখন কখন আবার বিকৃত ফলও প্রসব করিতে দেখা যায়। তাহার কারণ, যদি সে তত্ত্ববিদ্যায় সাত্ত্বিক বুদ্ধির অভাব হয়; অথবা তত্ত্ববিদ্যায় যদি কেবল প্রতিপক্ষ অংশের অনুসরণ করিয়া সপক্ষ অংশের সংস্রব ছাড়িয়া যাওয়া হয়; অথবা উভয় পক্ষের অনুসরণ করিয়াও, যদি তাহাদের উভয়েরই প্রকৃত উদ্দেশ্যে দৃষ্টিশূন্য হওয়া যায়। অতএব, সাবধান, সর্ব্বদা যেন সাহসিকতা ও সোৎসাহে অথচ বিজ্ঞতার সহিত পদ সঞ্চরণ করিও।

মানবজীবনের অবলম্বন এবং উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম। ধর্ম্ম ভাগ, আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান এবং কর্ম্মভাগ, আধিভৌতিক গুণপ্রধান। কর্ম্ম, ধর্ম্মের পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি-প্রচারণামাত্র। অদৃষ্ট-সংসারে যে অনুজ্ঞা ঘোষিত হইতেছে, কর্ম্ম দৃষ্ট-সংসারে তাহার পালন ফলস্বরূপ। ধর্ম্ম সেই অনুজ্ঞা এবং পালন-ফলের মধ্যস্থানাধিকারী; সুতরাং মনুষ্যের ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা একমাত্র ধর্ম্মই সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে; এবং উহারই সহযোগে মনুষ্য, ইহলোক হইতে পরলোক এবং পরলোক হইতে ইহলোক, এতদুভয়ের মধ্যে আত্মিকভাবে গতায়াত করিয়া থাকে এবং উহাই তৎপক্ষে একমাত্র সোপান স্বরূপ হয়। সেই ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম,—তদুভয়ের সৎ-অসৎবোধ লইয়াই প্রধানতঃ মানবীয় তত্ত্ববিদ্যার কার্য্য। সুতরাং সেই দুই বিষয় বিভাগে তত্ত্ববিদ্যাকেও দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের বিষয় যে তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, লোকে তাহাকে আত্মজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্ব, এবং কর্ম্মের বিষয় যে তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, তাহাকে কর্ম্ম বা সামাজিক তত্ত্ব বলিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যেরূপ নাম ও বিষয় বিভাগে আলোচনা করিব, নিম্নে তাহা বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, তত্ত্ববিদ্যার অবলম্বনীয় শাস্ত্র প্রথমতঃ তর্কদর্শন, দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববিজ্ঞান। প্রথমটির কার্য্য, কালে লুপ্তসার হইয়াছে যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার অবলম্বনীয় পদার্থ, তাহার প্রতিকূল চিত্র দেখাইয়া অশান্তি-সমুদ্রে নিক্ষেপণ; দ্বিতীয়টির কার্য্য সেই বিশ্বাস্য বিষয়ে মলনির্মুক্ত নূতনত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক, শান্তিকরীরূপে মনুষ্য-হৃদয়ের সহ তাহার দৃঢ় সংযোজন। একের ফলে, মানব দারুণ অশান্তিতরঙ্গে পতিত হইয়া প্রকৃত কার্য্যকরণে অস্থির বা দূষিতহস্ত হইয়া থাকে; অপরের ফলে, মনুষ্য স্বচ্ছন্দ সৌরকর-বিহসিত কূলভাগে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া সানন্দমনে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমটির আতিশয্য অবস্থাতেই নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং তাহা হইতে, প্রকৃতি-বহুল মানবকুলের অধ্যয়নভেদে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বসময়ে, তত্ত্ববিদ্যা আর একপ্রকার দ্বিবিধ বিভাগে বিভাজিত হয়;—তাহা আস্তিকতা ও নাস্তিকতা। সামাজিক তত্ত্ব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ এবং আনুষ্ঠানিক হওয়ায়, নাস্তিকতা তথায় বড় তাল পাইয়া উঠে না; কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বে ইহার দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশী। অতএব আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া জ্ঞানতত্ত্বকে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা ভেদে আলোচনা করিতে হইতেছে; এবং এই নাস্তিকতা ও আস্তিকতাভেদে আলোচনা হেতু, আর তর্কদর্শন এবং তত্ত্ববিজ্ঞান লইয়া পৃথক বিভাগ পূর্ব্বক আলোচনার আবশ্যক হইবে না, যেহেতু নাস্তিকতা ও আস্তিকতাই তদুভয়ের অবলম্বন ও শেষ ফল।

হিন্দুর তত্ত্বসংসারে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যতগুলি দর্শন ও তত্ত্ববিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে, এবং তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত নগণ্য আরও যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলই আস্তিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল এক চার্ব্বাককেই পূর্ণভাবে নাস্তিক তত্ত্ব মধ্যে গণনা করা যায়। অনেকে সাঙ্খ্যকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য বলিয়া নাস্তিক তত্ত্ব মধ্যে গণনা করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে গেলে, সাঙ্খ্যকে নাস্তিকতত্ত্ব বলা যায় না; তবে উহা যে জটিল আস্তিকতা, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য।

গ্রীকদিগের মধ্যে এই নাস্তিকতা ও আস্তিকতা ভাগ করিয়া লইতে যাওয়া একটু কঠিন। সে যাহা হউক, যদি কেবল লোকাতীত শক্তিতে বিশ্বাস থাকিলে আস্তিকতা এবং তাহার বিপরীতে নাস্তিকতা বলা যায়; তবে গ্রীকদিগের আস্তিক তত্ত্বের উৎপত্তি থেলিস্ হইতে, যদিও তাহা নিতান্ত অস্ফুটভাবে বটে। আর নাস্তিক তত্ত্বের প্রকাশ্য ও ধৃষ্টভাবে আরম্ভ; আরিষ্টিপোস্ হইতে; এপিকুর্যসের সময়ে আসিয়া তাহার চূড়ান্ত প্রাপ্তি হইয়াছে।

আগে আস্তিকতা ও নাস্তিকতাভেদে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, পরে কর্ম্ম বা সামাজিক তত্ত্বের আলোচনা করিব।

২। তত্ত্ববিদ্যায় আস্তিকতা।

হিন্দুর জ্ঞানতত্ত্বে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বস্থানে প্রায় এই একমাত্র অক্ষুণ্ণ উদ্দেশ্য, 'ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।' গ্রীকতত্ত্বের উদ্দেশ্য,—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ; এই সক্ষমতা নীতিমার্গ অনুসরণে সাধিত হয়, যেহেতু তাহা তদ্রূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।[১] ইহাই প্রায় সমস্ত গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌বর্গের ধারণা।[২]

১। জিনোর উক্তি।

২। ক্রীসিপুসের বিশ্বাস, সাধারণ মানবীয় নীতি যাহার অনুমোদন করিয়া থাকে, তাহার অনুসরণ করাই পরম পুরুষার্থ; যেহেতু ঐ মানবীয় নীতি যখন দেবসত্তা বিশ্বনীতির অংশ কলা স্বরূপ, তখন উহা অবশ্য পালনীয় জ্ঞানে অনুসরণীয়। ডিওগিনিসের উক্তি, প্রতি ব্যক্তির স্ব স্ব স্বভাব ও জ্ঞানানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করায় পরম পুরুষার্থ। আর্কিমিডিসের জ্ঞানে,যথাযোগ্য কর্ত্তব্যাদি সাধন করায় পুরুষার্থ। ক্লিয়াস্থিস্ কহেন, বিশ্বনীতির অনুসরণে পুরুষার্থ, তজ্জন্য ব্যক্তিগত স্বভাব লইয়া কিছুমাত্র যায় আসে না। পুনশ্চ, মানবীয় চিত্তের বৃত্তি সমস্ত একতায় সংমিলিত হেতু যে স্থিরবুদ্ধি, ক্লিয়াস্থিসের বিশ্বাসে তাহাই ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম অন্য ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া ধর্ম্মেরই খাতিরে অনুসরণীয়, যেহেতু তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহন করা স্বতঃই সম্ভবপর

হিন্দু নিরন্তর বুঝাইতেছেন এবং বুঝিতেছেন যে, এই সংসারকে যে প্রকারেই সুখের করিতে চাও না কেন, তাঁহা হইতে দুঃখের নিবৃত্তি একবারে কখনই হইবে না; অতএব যে কোন উপায়ে হউক, পুনর্জ্জন্মরহিত হইয়া এই পৃথিবীর সহ অনন্তকালের জন্য সংস্রবশূন্য হইতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ। গ্রীক বলিতেছেন, তাহা নহে; স্বভাব সহ আত্ম-প্রকৃতির সামঞ্জস্য দ্বারা সদ্ভাবে ইহসংসারকে অতিবাহিত করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব হিন্দুর উদ্দেশ্য-ফল পরসংসারে, গ্রীকের সেই স্থলে তাহা ইহসংসারে। হিন্দুর তত্ত্ব, প্রায়ই ধর্ম্মবিদ্যার বিচার ও বিশ্লেষণে আত্মবোধ; আর গ্রীকের তত্ত্ব, যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞতামাত্র। সুতরাং উভয়ের উদ্দেশ্য এবং আকারে অনেক অন্তর। কেবল প্লেটোতে কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ববিদ্যা এবং তদনুসরণের ফল পরসংসার সহ সম্বন্ধবান্। অন্যান্য তত্ত্ববিদেরাও পরসংসার লইয়া কিছু না কিছু আলোচনা না করিয়াছেন এমন নহে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও পরিষ্কার ভাবে আলোচনা একমাত্র প্লেটোতে এবং প্লেটোতেই কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর উভয় জাতির জ্ঞানতত্ত্ব হইতে এই কয়টি মুখ্যতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাউক;—এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন, আমরা তথায় কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাদের তাহার সঙ্গে সংস্রব

হইয়া থাকে। পিথাগোরীয়দিগের মতে নির্ম্মলভাবে জীবনাতিবাহন এবং দেবতার প্রিয়কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা হইলে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ জন্মের প্রাপ্তি হয়। জিনোর শিষ্যবর্গের মধ্যে পুরুষার্থ অর্থে আর একটি বিষয় বুঝাইত, অর্থাৎ দুঃখ ক্লেশ সুখাদিতে পূর্ণ অনাস্থাভাব। কিন্তু শিষ্যবর্গ যে সেই শিক্ষা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিল,তাহা বড় বোধ হয় না। ডিওনিস্যাস(Dionysius the Deserter)তাহার চক্ষের পীড়াজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হইতে না পারায়, গুরুর শিক্ষা তাহাকে শেষে হাওয়ায় উড়াইতে হইয়াছিল। সেই হইতে সুখানুসরণই পুরুষার্থ বলিয়া তাহার দ্বারা ঘোষিত হইত। মানব যে পর্য্যন্ত ভুক্তভোগী না হয়, সে পর্য্যন্ত কতমতেই না প্রলাপ রটনা করিয়া থাকে!

কতদূর, কি করিতে আসিয়াছি এবং আমাদের শেষগতি কোথায়। যেহেতু, এই এই তত্ত্ব যেরূপ যেরূপ ধারণাযোগে আয়ত্তাধীন হয়, তাহাদের ফল-প্রতিরূপ কর্ম্মকরী মানবজীবনও তদ্রূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে। অতএব অগ্রে তদ্রূপ তদ্রূপ ধারণা কোন্ জাতির মধ্যে তত্ত্ববিদ্যার প্রভাবে কিরূপ আকার ধারণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তাহা যথাযথ নিরূপণ করা যাউক। বিচারভাগ পরিত্যাগ করিয়া, বিচারফলমাত্র সংক্ষেপে বিবরিত করা যাইবে।

সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, প্লেটোর পূর্ব্বগত যাবতীয় গ্রীক-তত্ত্ববিৎ অপেক্ষা,প্লেটোর নিরূপিত তত্ত্বই অপেক্ষাকৃত অধিক সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন; অতএব তাহারই সারভাগ এখানে মূল স্থানে গ্রহণ করা যাইতেছে।[৩] প্লেটোর সারাংশ মূল স্থানে গ্রহণের আরও উদ্দেশ্য এই যে, যাবতীয় গ্রীকতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে প্লেটোর তত্ত্বই হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার সহ বহু পরিমাণে সাদৃশ্যযুক্ত। অপরাপর তত্ত্ববিদ্‌গণের মতামত যাহা, তাহা টীকাকারে বা পার্শ্ববর্ত্তী ভাবে সন্নিবেশিত হইবে।

প্লেটোর পূর্ব্বে আরও অনেকানেক গ্রীসীয় তত্ত্ববিৎ সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিল। থেলিসের মতে জল, আদি কারণ; যথাস্বভাব

৩। প্লেটোর যে সারাংশ গ্রহণ করিতেছি,তাহা প্লেটোর কোন স্থানবিশেষ হইতে অবিকল অনুবাদ নহে। অবিকল বাক্যানুবাদ হইলে,গ্রীক ধরণ ধারণ ও শব্দ ব্যবহারের বৈদেশিকতা হেতু,পাঠকেরা হয়ত তাহার কিছুই বুঝিতেন না; সুতরাং প্রথমতঃ শ্রম বৃথা হইত,দ্বিতীয়তঃ অবিকল অনুবাদ করিলে অল্পস্থানে কুলাইবার বিষয় নহে। এজন্য যাহাতে সংক্ষেপ হয় এবং পাঠকেরাও যাহাতে অর্থগ্রহ করিতে পারেন, এরূপ ভাবে সারসংগ্রহ করা গিয়াছে। তবে এই পর্য্যন্ত পাঠকদিগের নিকট কড়ার দিতে পারি যে, সারসংগ্রহের ভিতর সমস্তই প্লেটোর কথা ভিন্ন, একটিও নূতন ও বাহিরের কথা জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে দিই নাই। এই সারসংগ্রহ প্রধানতঃ প্লেটোর টিমিয়োস্, এবং অংশত ফিডো, ফিড্রোস্ ও সাধারণতন্ত্র হইতে নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। প্লেটোর সৃষ্টিতত্ত্ব যে হিন্দুর তত্ত্ব সহ অনেকটা মিলে, ইহার কারণ অনুসন্ধানস্থলে কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্লেটো তাঁহার দেশভ্রমণকালে নিজ ভারতে আসিয়াই সে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমার

এই জলের পরিণাম ও পরিপাকে সৃষ্টি, সৃষ্টিস্থ জীবজন্তু, মানুষ এবং দেবতা পর্য্যন্ত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; সুতরাং থেলিসের মতে এক স্বভাব-পরিণাম ভিন্ন আদি সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। থেলিসের ন্যায়, অনাক্সিমিনিস্ ও ডিওগিনিসের মতে বায়ু এবং হিরাক্লিটোসের মতে অগ্নিই সৃষ্টির আদি কারণ। অনাক্সিমিনিসের মতে আদিতে প্রলয়াবর্ত্ত মাত্র ছিল; তাহাতে নিয়মের স্বতঃ উদয় হওয়ায়, নিয়মপ্রভাবে দেবতা মানুষ ও জীবজন্তু সমন্বিত এই সৃষ্টির উদয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবল এক অনাক্সগোরাসের মতে দেখা যায় যে, আদিতে একটি পরম জ্ঞানসত্তা ছিল এবং তাহারই কার্য্য দ্বারা প্রলয়াবর্ত্ত, পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, জীব ও জড়সৃষ্টির উদয় করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে এইরূপ আরও নানা জনের নানা মত আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল এক অনাক্সগোরাস্ ভিন্ন, আর কেহ আদিকর্ত্তাকে অনুভব করিতে পারে নাই। যাহাদের সৃষ্টিমূল এইরূপ, তাহারা জীবাত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোকে তাহার বিভিন্ন গতি এবং সেই বিভিন্ন গতিপ্রদ পাপপুণ্যের যে স্পষ্ট ধারণা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে এবং কার্য্যতঃ তাহা হয়ও নাই।

এই সকল প্রাচীন তত্ত্ববিদ্গণের মতামত অতিক্রম করিলে, এক প্লেটোতে কেবল মতের গাঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য এবং বহু পরিমাণে সত্যানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে, এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ এক মহাসৃষ্টিমূর্ত্তির অন্তর্ভূত ও তাহার অংশস্বরূপ। সেই সৃষ্টিমূর্ত্তি মূলে সাদি হইলেও, উত্তরভাগে অনন্ত এবং নিত্য প্রতিরূপ। বিনা সৃষ্টিকর্ত্তায় এরূপ সৃষ্টির উদয় হইতে পারে না এবং সেই সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তিনিই অনাদি এবং অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর; পরমেশ্বর দেব ও মানব, জড় ও অজড়, সকলেরই কর্ত্তা এবং তাহাদের

বোধ হয়, উহাতে সত্যের ভাগ অল্পই। আমার বোধ হয়, প্লেটোর চিত্তে উহা কতক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন। প্রকৃত সত্য অনুসৃত হইলে, সকল স্থানেই তাহা তত্ত্বতঃ একাকার ধারণ করিবার কথা; যেহেতু সত্যের মূর্ত্তি দ্বিতীয়বিধ নাই।

এক ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর। পুনশ্চ প্লেটো বলেন যে, এই সৃষ্টি ও সৃষ্টিস্থ পদার্থ সমুদয় যখন ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ ও মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল ; তখন ইহারা কখনও সৎস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহাদের অতীতে এমন কোন একটি সত্তা আছে, যাহার ইহারা বাহ্য প্রচার ও যাহা ইহাদের পদার্থত্ব পক্ষে পরিমাণ স্বরূপ হয়। একমাত্র সেই সত্তাকেই সৎ বলা যাইতে পারে, যেহেতু তাহার কখনও ক্ষয় বা ধ্বংস নাই এবং নিত্যই তাহা এক ও অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। এই সত্তাই প্লেটোর বর্ণিত সুবিখ্যাত "আইডিয়া"। সৃষ্টিমধ্যে এই সত্তা বা আইডিয়ার সন্নিবেশ কিরূপ, তাহা যথাস্থানে বিবরিত করা যাইবে।

প্রাচীন গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌বর্গ হইতে, তত্ত্বভাগে যেরূপ, সেইরূপ তত্ত্বানুসরণের প্রণালীতেও, প্লেটোতে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্লেটোর পূর্ব্বে তত্ত্বানুসারিগণের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাহারা উপস্থিত ও চলিত মতামতকে যথেষ্ট সত্য জ্ঞান ও তাহাকেই ভিত্তি স্বরূপ করিয়া, তাহার উপর বিষয়বাদ ও বিষয় স্থাপন করিয়া যাইত। চলিত মতামতকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষে তাহারা এই কারণ দর্শাইত যে, সে সকল যদি সত্য না হইবে, তবে তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ও সর্ব্বসাধারণ লোক কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া বিশ্বাসিত ও অনুসৃত হইবে কি জন্য? এরূপ তত্ত্বাবধারণে সাধারণতঃ সাধারণ-বুদ্ধি লোকসকল সহজে সন্তুষ্ট ও সহজে বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারিত বটে,কিন্তু সেরূপ অবধারিত বিষয় সকলের মধ্যে, বস্তুতঃ সত্যের ভাগ অতি অল্প পরিমাণেই থাকার কথা ও থাকিত। প্লেটোর গুরু সক্রেটিস্ এবং প্লেটো, উভয়ে এ প্রথাকে সমীচীন জ্ঞান না করিয়া, কোন চলিত মতামতকেই ততক্ষণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, যতক্ষণ বিচারের দ্বারা তাহাদের সত্যতা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণিত না হইত। এরূপ প্রণালীর অনুসরণে ঘটিত এই যে, চলিত মতামত বিধ্বস্ত ও তাহার উপর বিপুল সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। চলিত মতামত সকলকে এইরূপে দূষিত বলিয়া প্রমাণ করিতে থাকাই, সক্রেটিসের

উপর আথিনীয়গণের বিরাগ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে মুখ্যতম কারণ; কারণ, সাধারণ লোকে ভাবিত যে সক্রেটিস্ বুঝি কি সর্ব্বনেশে কুতর্ক উপস্থিত করিয়া চলিত সমস্ত বিষয়কে ভাঙ্চুর করিতে বসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাময়িক অনেকানেক সফিষ্টনামধেয় বিজ্ঞগণ এরূপ তর্কপ্রণালীতে বিধ্বস্ত ও হতমান হওয়ায়,[৪] সক্রেটিসের মর্ম্মান্তিক শত্রুও যথেষ্ট যুটিয়াছিল। অবশেষে সেই শত্রুবর্গের শত্রুতাবৃত্তির পরিপূরণ এবং আথিনীয়গণের আশঙ্কার নিবারণ হয়, সক্রেটিস্কে বিষ-পান করাইয়া। সে যাহা হউক, যে সন্দেহের উৎপত্তি সাধারণের নিকট এতটা ভয়ের কারণ; সক্রেটিস্ ও প্লেটোর নিকট তাহাই প্রকৃত সত্য উদ্ভাবনের মূলসূত্র। অতএব প্লেটোর তত্ত্বানুসরণপ্রণালী, পূর্ব্বগত তত্ত্বানুসারিগণের ঠিক বিপরীত। উপস্থিত মতামতকে বিলোড়নপূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্নিহিত যে সত্য উপলব্ধি হইত, তাহারই সাহায্যে তিনি বিষয় স্থাপন করিতেন। অথবা এক কথায় বলিতে

৪। গ্রীকভূমে বিজ্ঞগণকে সফিষ্ট বলিত। সফিষ্ট শব্দে জ্ঞানী। ভারতে আগত আলেক্জাণ্ডারের সহচর গ্রীকেরা, ভারতীয় ব্রাহ্মণবিজ্ঞগণকেও, সফিষ্ট শব্দযোগে, গিম্নো-সফিষ্ট (Gymnosophist) নামে নামিত করিয়াছে। গিম্নো, সংস্কৃত জ্ঞান শব্দের গ্রীকাকারে অপভ্রংশ; অতএব গিম্নো-সফিষ্ট অর্থে জ্ঞানবিজ্ঞ বা জ্ঞানবাদী। শ্রুতি এবং বেদান্ত অনুসারে,জ্ঞানই মোক্ষের কারণ এবং ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যোগাশ্রমে প্রবেশ করিবার পর নিয়ত জ্ঞানেরই অনুশীলন করিতেন; সুতরাং জ্ঞানী বা জ্ঞানবাদী নামে তাঁহারা সর্ব্বদা বিখ্যাত ছিলেন। সে যাহা হউক, সক্রেটিসের পূর্ব্বে গ্রীকভূমে, সফিষ্ট বলিলেই জ্ঞানী ও তত্ত্ববিদ্ বুঝাইত এবং আদরও তাহাদের অতিশয় ছিল। কিন্তু আদর যতটা, প্রকৃত জ্ঞানের ভাগ তাহাদের ততটা দেখা যায় না এবং অবশেষে তাহারা ঘোরতর কুতর্কবাদী ও ভ্রান্তজ্ঞানের গুরুমহাশয় হইয়া উঠিয়াছিল। সক্রেটিস্ উহা দর্শনে, তাহাদিগের দর্প চূর্ণ ও তাহাদিগকে বিষম বিধ্বস্ত করেন। ইহাতে সক্রেটিসের মর্ম্মান্তিক শত্রু যদিও যথেষ্ট যুটিল এবং এমন কি, সক্রেটিস্কে বিষপান পর্য্যন্ত করাইয়া ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু সফিষ্টদিগেরও গৌরবের সেই হইতে এককালে লোপের সূত্রপাত হইল। সেই হইতে সফিষ্ট নাম নিন্দনীয় ও উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল এবং সফিষ্ট বলিতে, কেবল কুজ্ঞানী ও কুতার্কিক মাত্র বুঝাইতে লাগিল।

গেলে, অন্য তত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, চলিত মত সমস্তই সত্য, যতক্ষণ তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত না হয়; আর প্লেটোর মত, সমস্তই অসত্য, যতক্ষণ না তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

প্লেটোর মতে, পরমেশ্বরই সমস্তের সৃষ্টিকর্ত্তা। ভূত চারিটি,—অগ্নি, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা। নিত্য পদার্থ তিনটি,—পুরুষ, জননশক্তি ও দেশ।[৫] পুরুষ, যাহা আত্মা বলিয়া নিরূপিত; এই আত্মসত্তা, নিম্নে বর্ণিত প্লেটোর নিত্য ভাব। জননশক্তি, যাহার প্রভাবে পদার্থমাত্রের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইয়া থাকে; ইহারই ক্রিয়মাণ অবস্থা, নিম্নে বর্ণিত প্লেটোর জনন ভাব। পরমেশ্বর, পুরুষ, জননশক্তি ও ভূত সমস্তের বিষয় নিম্নে ক্রমান্বয়ে যথাযথ বিবরিত হইবে। এক্ষণে দেশ কাহাকে বলে, তাহা বলি। বিশ্বব্যাপী সমস্ত স্থানের নাম দেশ; এই দেশকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির স্থিতি। প্লেটো দেশের আরও একটা ব্যবহার কল্পনা করেন;—এই দেশের মধ্যে স্থূলসৃষ্টির অতিরিক্ত অবসরস্থান যাহা, তাহা এক প্রকার জ্যোতিঃপদার্থে পরিপূরিত। এই জ্যোতিঃপদার্থে, যাবতীয় স্থূল পদার্থমাত্রের আকৃতি নিত্যকালের নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে।[৬] কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। এই আধিভৌতিক স্থূল সৃষ্টিস্থ সমস্ত আধিভৌতিক পদার্থই হইতেছে ও যাইতেছে; এই মানুষবিশেষটির দেহ, এই তোমার বাড়ীটি, ইত্যাদি, ইহারা হইয়াছে

৫। ইংরেজীতে, "Being," "Generation," 'Place." জননশক্তি, হিন্দুমায়ার সঙ্গে প্রায় অবিশেষ পদার্থ। হিন্দুতত্ত্বানুসারে, দেশের পৃথক্ সত্তা নাই; উহা ইন্দ্রিয়-শক্তির বিষয়বোধের প্রকার বিশেষ মাত্র।

৬। আধুনিক থিওসফিষ্টদিগের ইহাই "Astral light" (নাক্ষত্রিক জ্যোতি?); হিন্দুর আকাশ পদার্থস্থলীয়। থিওসফিষ্টদিগের উক্ত নামধের আকাশতত্ত্ব যে প্লেটো হইতে গৃহীত, তাহা স্পষ্টতই দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ ইউরোপীয় অধিকাংশই গূঢ় ও অতিলৌকিক তত্ত্ব সকল প্লেটো হইতে গৃহীত। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে এমন কি, নূতন বাইবেলের খৃষ্টের খৃষ্টীয়ত্ব পর্য্যন্ত এই প্লেটো হইতে কিয়দংশে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেণ্ট্‌জাহনের Logos ও প্লেটোর Logos একই পদার্থ এবং প্লেটো হইতে তাহা লওয়া।

এবং আবার একদিন ইহারা যাইবেও। কিন্তু এই যে উহাদের প্রত্যেকের আকার ও ভাবভঙ্গী আদি, এ গুলিও কি উহাদের যাওয়ার সঙ্গে সমানে ধ্বংস হইয়া যাইবে? প্লেটো বলেন, তাহা হইবে না; পদার্থ ধ্বংস হইয়া গেলেও, তাহার আকার ও ভঙ্গী আদি ধ্বংস হয় না; তাহারা দেশগত জ্যোতিঃপদার্থে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল আকার ও ভঙ্গী আদি ছায়ার ন্যায়, বস্তু-সত্তা উহাদিগেতে নাই; নিত্য ভাবের উহারা একরূপ অনুকৃতি স্বরূপ। প্লেটো কহেন, আমরা স্বপ্নে যে সকল বিষয় দেখিয়া থাকি, তাহা সেই জ্যোতিঃপদার্থে রক্ষিত পদার্থ-আকার প্রভৃতি মাত্র; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। [১]

পুনশ্চ প্লেটো কহেন, এই পৃথিবী ও ইহার উপরিস্থ জীব ও জড় সৃষ্টিপ্রবাহ যাহা এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, ইহাই প্রথম বা আদি

১। Tim, XXVI & XXVII, এই স্থানের দ্বারা প্লেটো কর্তৃক স্বপ্নের কারণ অবধারিত হইল। হিন্দুতত্ত্ববিদেরা বলেন স্মৃতি, সংস্কার এবং প্রত্যাদেশ, এই ত্রিবিধ কারণ হইতে স্বপ্ন সকল সংঘটিত হইতে পারে। এই ত্রিবিধ কারণের কার্য্য কিরূপে হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমতঃ দর্শন, শ্রবণ ও মনন, এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা বিষয় সকল স্মৃতিতে সংগৃহীত হয়। মানুষের কি নিদ্রা, কি জাগরণ,সকল সময়েতেই চিত্ত নিয়ত ক্রিয়াশীল, কিন্তু জ্ঞান নিদ্রাবস্থায় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানই চিত্তের ক্রিয়া সকলকে সুসজ্জিত করিয়া থাকে। কিন্তু নিদ্রা-কালে সেই জ্ঞানের সুষুপ্তি হেতু সুসজ্জিত করণের অভাবে, চিত্তক্রিয়া যদৃচ্ছভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে ও তাহারই মধ্যে যে যে কার্য্যগুলি কিছু চটকের, তাহাই স্বপ্ন বলিয়া জাগরিত অবস্থায় স্মরণ হয়; এই গুলিকেই এলোমেলো এবং স্মৃতিজন্য স্বপ্ন নামে বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নে কখনও কখনও সুন্দর ও সুসজ্জিত ভাবে এমন স্থান, জন ও ঘটনা সকল দৃষ্ট হয়, যাহা ইহজন্মে কখনও কোথাও চিত্তমধ্যে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে নাই; কাজেই এ গুলিকে জন্মান্তরীণ সংস্কারজন্য স্বপ্ন বলা যায়। তৃতীয়তঃ,স্বপ্নে ঔষধাদির এমন উপদেশ এবং অপরাপর বিষয়েতেও কোন কোন আদেশ ও উপদেশাদি এমন প্রকারের পাওয়া যায় যে,যাহা কার্য্যে লাগাইলে ধ্রুব ফল ফলিয়া থাকে এবং ফলও পুনঃ এমন যাহা মানুষের চেষ্টায় ফলাইতে পারা যায় নাই। এই তৃতীয় প্রকারের স্বপ্নকেই প্রত্যাদেশ জন্য বলা যায়।

নহে; অথবা পৃথিবীর আকারও বরাবর এইরূপ ছিল না। এক এক যুগ গতে অগ্নির ক্রিয়াযোগে এই পৃথিবীতে এক এক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই প্রলয়ে, পৃথিবীর পূর্ব্বগত আকারপ্রকার এবং জড় ও জীব সৃষ্টির প্রবাহ প্রভৃতি, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই-রূপে পূর্ব্বে, পৃথিবীর আকারপ্রকারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছে এবং বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ও সভ্যতাপূর্ণ অনেকবিধ মনুষ্যবংশ, আকার অবস্থা ও স্বভাবগত প্রভেদ সহ, উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৮

এক্ষণে জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের জ্ঞান কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—যে কোন পদার্থ জন্মবিশিষ্ট, তাহা অবশ্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু কারণ ব্যতীত তদ্রূপ উৎপত্তি অসিদ্ধ। কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি

৮। প্লেটো যে প্রকার সাময়িক প্রলয় বর্ণন করিয়াছেন, হিন্দুরাও সেইরূপ সাময়িক প্রলয় এবং অধিকন্তু মহাপ্রলয়ও ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্লেটোর বর্ণিত প্রলয়ের প্রকার ও প্রকরণ উভয়ই,হিন্দুর বর্ণনা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। হিন্দুর দ্বিবিধ প্রলয়, নিত্য ও নৈমিত্তিক। প্লেটোর প্রলয় এবং হিন্দুর নিত্য প্রলয়, এ উভয়ে সমজাতীয়; উহাতে সৃষ্টির একেবারে ধ্বংস হয় না, কেবল পুরাতনের উপর নূতনত্ব সম্পাদন হয় মাত্র। হিন্দুর নৈমিত্তিক প্রলয়ে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গেলে, নারায়ণ একার্ণবশায়ী হইয়া থাকেন এবং তদনন্তর মায়াবীজ পরিপুষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার সৃষ্টির সঞ্চার হয়।

থিওসফিষ্টদিগের সৃষ্টিতত্ত্ব যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যেন তাহা প্লেটোর এই স্থান হইতে অনুকরণ করিয়া লওয়া। থিওসফিষ্টরাও, প্লেটোর বর্ণনা মত, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরস্থ আট্‌লাণ্টিস নামক দ্বীপাকার মহাদেশের বিগত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। প্লেটো বলেন, এই মহাদ্বীপ ভৌতিক বিপ্লব বিশেষের তাড়নায় এখন সমুদ্রতলগত হইয়া গিয়াছে। এই মহাদ্বীপও, তাঁহার কথামত, অতি সভ্যতা ভব্যতা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ মহাদেশ ছিল। এই মহাদেশের প্রাচীন রাজশাসন ও সভ্যতাদির বিষয়, রূপকচ্ছলে বা সত্য আভাসে যাহাই হউক, বহু পরিমাণে প্লেটোর ক্রিটিয়াঃ নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

আবর্ত্তনশীল, তাহা অভেদ অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য ভাবের প্রতিরূপ; আর যে চক্র অন্তর্ভাগে ও বামাবর্ত্তে আবর্ত্তিত, তাহা ভেদ, পরিবর্ত্তনীয় ও অনিত্য ভাবের প্রতিরূপ। বহিশ্চক্র অভেদ ও নিত্যাবস্থা হেতু অখণ্ডিত ভাবে রহিল, কিন্তু অন্তশ্চক্র তদ্বিপরীত স্বভাব হেতু বহুভাগে বিভাজিত হইল; এজন্য, বহিশ্চক্র হইতে একতা ও অন্তশ্চক্র হইতে বৈচিত্র বোধের উদয় হইয়া থাকে। চক্রদ্বয়, অথবা চক্রদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া এখন আত্মা বলিয়াই বলা যাউক;—আত্মার এরূপ গঠন ও স্বভাব হেতু, যখন কোন পদার্থ আত্মার সংলগ্নতায় আইসে, তখন আগে অন্তশ্চক্র সহ সংস্পর্শ হেতু ইন্দ্রিয়-বিষয় রূপ স্থূল জ্ঞান, পরে সেই স্থূল জ্ঞানের দ্বার দিয়া বহিশ্চক্র সংস্পর্শে পদার্থনিহিত সত্ত্ব জ্ঞানের অনুভূতি হয়। ঐ সত্ত্বজ্ঞান বহিশ্চক্রে মিলিত হইয়াও যদি বিধ্বস্ত না হইয়া অটল থাকিতে পারে, তাহা হইলে জানা গেল যে পদার্থটি সৎ আদর্শে নির্ম্মিত; নতুবা অসৎ উহার আদর্শ, সুতরাং পদার্থটি ছন্নপদার্থ এবং তন্নিহিত সত্ত্বজ্ঞানও ভ্রমাত্মক। অতএব অন্তশ্চক্র দ্বারা পদার্থের ইন্দ্রিয়-বিষয়তা জ্ঞান ও বহিশ্চক্র দ্বারা পদার্থ-গত সত্ত্বাংশের সদসৎ[১৩] পরিমাণ হয়; অথবা বহিশ্চক্র প্রমাণিত যে জ্ঞান, তাহাই সত্য ও সৎস্বরূপ; আর অন্তশ্চক্র হইতে যে জ্ঞান তাহা অসত্য, ভ্রমসঙ্কুল ও ক্ষণস্থায়ী। এই বহিশ্চক্রজাত যে সত্য ও সৎস্বরূপ জ্ঞান, তাহাই প্লেটোর সুবিখ্যাত আইডিয়া। এই আইডিয়ার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং এখনও ইহার বিষয় কিছু বলিতে বাকী রহিল।

প্লেটো একবার বলিয়াছেন, আত্মা অসৃষ্ট ও অনন্ত পদার্থ। কিন্তু এখানে আবার দেখা গেল যে, কেবল অসৃষ্ট বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন; অধিকন্তু আত্মা সৃষ্টি করার প্রকরণ, সেই সৃষ্টির মালমসলা এবং মালমসলার ভাগযোগ পর্য্যন্ত বিবরিত করিয়া যাইলেন। এ বিষম

১৩। এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রে সৎ ও অসৎ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে মূলভাগেও সৎ ও অসৎ শব্দ প্রায় সেইরূপ অর্থে ব্যবহার করা যাইতেছে।

মতবিরোধের কারণ কি;—প্লেটোর কি তবে মত স্থির নাই? বাঞ্ছারাম, একটু আস্তে, বেশী ব্যস্ত হইও না। মত স্থির যথেষ্টই আছে এবং আত্মাও অসৃষ্ট পদার্থ বটে; তথাপি যে এখানে তাহাকে সৃষ্ট বলিয়া তাহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখাইলেন, সে বোধ হয় কেবল লোক বুঝাইতে অধ্যাস-সৃষ্টি মাত্র; নতুবা প্রকৃত সৃষ্টি নহে। গূঢ় আত্মিকতত্ত্ব সকল অধ্যাস-বিবৃতি ব্যতীত ভূতভাবাকৃষ্ট মানুষের বুদ্ধিতে যে সহজে আনিবার সাধ্য নাই, তাহা হিন্দু দার্শনিকেরা অনেক বার বলিয়াছেন এবং প্লেটোও তাহা সক্রেটিসের প্রতি টিমিয়োসের উক্তি দ্বারা জানাইতে ত্রুটি করেন নাই।[১৪] ফলতঃ কথিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আত্মার নহে; আত্মার উপর উহা অধ্যাসমাত্র। এরূপ অধ্যাসের উদ্দেশ্য যে তদ্দ্বারা আধিভৌতিক সৃষ্টির ক্রম ও প্রক্রিয়া সূচনা করা, তাহা প্লেটোর আধিভৌতিক সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিলেই সহজে প্রতিপন্ন হইতে পারিবে।

আধিভৌতিক সৃষ্টি আলোচনার পূর্ব্বে আর একটি কথা বক্তব্য আছে। আমি আরম্ভে বলিয়াছি যে, হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে প্লেটোর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এখন জিজ্ঞাসা যে, যে পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহার মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না। আত্মার প্রোক্ত অন্তশ্চক্র ও বহিশ্চক্রে কতকটা সেই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হিন্দুতত্ত্বানুসারে পরমাত্মার অবলম্বনে প্রকৃতি; অথবা অন্য কথায়, প্রকৃতি স্বয়ং বিষ্ণুচৈতন্যের ঐশী শক্তিস্বরূপা। সেই প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাবৎ সৃষ্টির জননী। এই পরমাত্মসত্তা ও প্রকৃতি সহ, প্লেটোর বহিশ্চক্র ও অন্তশ্চক্রের বহুল সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবৎ অন্তশ্চক্রও, আত্মাস্থলীয় বহিশ্চক্রের আশ্রয়ে এবং অবলম্বনে স্থিত; অথবা হিন্দুতত্ত্বানুসারে, বহিশ্চক্রকে জ্ঞানাত্মা এবং অন্তশ্চক্রকে বিজ্ঞানাত্মা বলিয়াও বলা যাইতে পারে। পরমাত্মা শুদ্ধসত্তা কিন্তু প্রকৃতি বিকার, সুতরাং এই বিকার হেতু বিপরীত গতি

১৪। Timœus. XII.

অসিদ্ধ, ইহা প্লেটো বহুদর্শন হইতে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। পুনশ্চ, ইহাও সিদ্ধ যে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই জন্মবিশিষ্ট। এই বিশ্ব ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, সুতরাং ইহাও জন্মবিশিষ্ট; এজন্য ইহাও স্থির হইতেছে যে, এই জাত-মূর্ত্তি ও কার্য্যস্বরূপ বিশ্বের কারণ-স্বরূপ একজন সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য আছেন। তাহার পর ঈশ্বরের স্বরূপতা সম্বন্ধে বলিতেছেন;—এই বিশ্বের যিনি পিতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ কিরূপ, তাহার আবিষ্করণ নিঃসন্দেহ অতি কঠিন। যদি বা আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তথাপি এত গূঢ় যে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধির নিকটে তাহা সুপ্রকাশিত করা একেবারে অসাধ্য।[৯] অতএব কার্য্যদৃষ্টে কারণের উপলব্ধি স্বরূপ ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই সাধারণতঃ অবলম্বনীয়। পুনশ্চ, এই কার্য্যকারণ

৯। জিনোর সাম্প্রদায়িকেরা কল্পনা করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর একটি অবিনাশী জীব স্বরূপ, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট নহেন। তিনি জ্ঞান ও আনন্দময় এবং অসতের অতীত; এই পৃথিবীতে যাহা আছে ও যাহা হইতেছে ও হইবে, তিনি তাহার তত্ত্বজ্ঞ। তিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সর্ব্ববস্তুতে তাঁহার সত্তা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং ঐ সত্তাই স্থানবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ দেবদেবীরূপে কল্পিত ও পূজিত হইয়া থাকে, যথা দেমিতুর ক্ষিতিরূপে,পোসিদোন রসরূপে,আথিনা সূক্ষ্ম বায়ু বা ইথার রূপে, হেপিস্তস অগ্নিরূপে ইত্যাদি। ইহা বহুরূপ কল্পনা মাত্র, নতুবা দেবতা যিনি তিনি এক। ইহার সহ আমাদিগের বৈদিক গাথা একবার মিলাইয়া দেখ—"সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।" ঋঃ বেঃ ১০।১০৪ অথবা—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

ঋঃ বেঃ ১।১৬৪।৪৬।

স্থানান্তরে জিনো কহিয়াছেন যে এই বিশ্বই ঐশ্বরিক মহাসত্তা, উহাই ঈশ্বর। আরিষ্টটলও, অশরীরী একেশ্বরবাদী। তিনি বলেন ঈশ্বর স্বয়ং নিশ্চল; কিন্তু তাঁহার নিয়মচক্র সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং তাহাই যাবতীয় বিষয়কে পরিচালিত করিয়া ফিরিতেছে। জিনো এবং আরিষ্টটল, উভয়ই প্লেটোর পরবর্ত্তী লোক। আরিষ্টটল নিজে প্লেটোর শিষ্য ছিলেন।

বোধক্ষম বুদ্ধিযোগে ইহাও উপলব্ধি হইতেছে যে, যখন এই বিশ্ব সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী ও পূর্ণত্বপ্রাপ্ত, তখন ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাও অবশ্য দ্বেষরহিত ও সতের আধার, তাহাতে সংশয় নাই। এখানেও দৃষ্ট হইবে যে, প্লেটো কার্য্যদৃষ্টে কারণের স্বভাবজ্ঞান উপলব্ধি করিতেছেন।

তাহার পর আত্মা সম্বন্ধে প্লেটোর মতামত কি, তাহা বলিতে যাওয়া একটু গোলযোগের কথা। প্লেটোর ফিড্রোস[১০] নামক গ্রন্থ দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্লেটো আত্মাকে কেবল অবিনাশী বলেন নাই; তিনি আরও বলিয়াছেন যে উহা অসৃষ্ট পদার্থ এবং অসৃষ্ট বলিয়াই অবিনাশী। কিন্তু টিমিয়োসে[১১] আবার বলা হইয়াছে যে আত্মা সৃষ্ট পদার্থ বটে, তবে কিনা তাবৎ ভৌতিক সৃষ্টির পূর্ব্বজাত। এক্ষণে সেই আত্মার সৃষ্টি কিরূপে ও কি কি উপাদানে, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন;—ঈশ্বর, একটি ক্ষর ও আর একটি অক্ষর, এই দুই তত্ত্বের সমাবেশে, তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় আর একটি সত্তার উৎপাদন করিলেন। তদনন্তর, উক্ত ক্ষর তত্ত্ব সহ 'ভেদ' ও অক্ষর তত্ত্ব সহ 'অভেদ'[১২] প্রকৃতি সংযোজিত করিয়া, তদুভয় সহ কথিত তৃতীয় সত্তাকে শক্তি সহযোগে সংমিলিত করিলেন। তাহার পর, এই তিন বিষয়ের বহুবিধ অংশ ও প্রত্যংশ ক্রমে বহুতর মিশ্রণের পর যে একটি মিশ্ররাশি উৎপন্ন হইল, সেই রাশিকে দুই অংশে বিভাগ করিলেন। রাশিবিভাগ দুইটিকে পুনঃ + ইত্যাকার সংস্থাপনে ও সংযোজনে এবং সংযোজিত রেখা দুইটির অন্তভাগের আনমনে, এক অপরে সন্নিবিষ্ট এরূপ দুইটি চক্রের উৎপত্তি করিলেন। এই চক্রদ্বয়ই, সংমিলিত একত্ব ভাবে আত্মা। উক্ত চক্রদ্বয়ের একটি বহিশ্চক্র ও একটি অন্তশ্চক্র এবং চক্রদ্বয়ে গতি সংযোজিত হইলে, উভয় উভয় সম্বন্ধে দুই বিপরীত দিকে আবর্ত্তনশীল হইতে লাগিল। যে চক্র বহির্ভাগে ও দক্ষিণাবর্ত্তে

১০। Phœdrus, 51. ১১। Timœus, 12.

১২। ইংরেজীতে ভেদ, different এবং অভেদ, same বলিয়া অনুবাদিত।

জন্য প্লেটোর অন্তশ্চক্রের বামাগতি কল্পনা সঙ্গত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। তাহার পর অন্তশ্চক্রের বিভিন্ন বিভাগ, বৈচিত্র ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়প্রাণতা প্রভৃতি সহ, প্রকৃতির ভেদ ও বৈকারিক সৃষ্টি প্রভৃতির যথেষ্টই সাদৃশ্য রহিয়াছে। পুনশ্চ, পরমাত্মা ও প্রকৃতি, এ উভয়ের মধ্যে যদিচ প্রকৃতিই একমাত্র ক্রিয়াশীলা বটে, তথাচ কিন্তু প্রকৃতি পরমাত্মার সহায়তা ব্যতীত সৃষ্টি করণে অক্ষম; অর্থাৎ পরমাত্ম-ভাস প্রকৃতিতে যেরূপ যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, প্রকৃতি কেবল তাহারই বৈকারিক প্রচারে সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এতৎ সাদৃশ্যে প্লেটোও বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তাহা স্বীয় অনুরূপতা অনুসারেই করিয়া থাকেন এবং পরমেশ্বর স্বয়ংই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টির আদর্শ।[১৫] আবার দেখ, প্রকৃতিতে পতিত পরমাত্ম-ভাস প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যখন সৃষ্টি, তখন সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত সত্তাংশ যাহা তাহা পরমাত্মসত্তায় নিহিত এবং যাহারা পুনঃ সেই সত্তা হইতে বহির্মুখগামী হয়, তাহারাই জগতে পাপের সঞ্চার করিয়া থাকে। পরমাত্মভাস যাহা, তাহাই সৎ এবং প্রকৃতিজ আধিভৌতিক প্রপঞ্চ যাহা কিছু, তাহা অসৎ; পুনঃ পরমাত্ম-ভাস অভেদ, অব্যয়, সত্য ও নিত্য স্বরূপ, কিন্তু আধিভৌতিক প্রপঞ্চ সকল বিষয়েতেই তাহার বিপরীত; প্রকৃতিজ পদার্থবোধ, বিজ্ঞানমাত্র; যথার্থ জ্ঞান তাহাতে তখনই পাইতে পারা যায়, যখন বিজ্ঞানের সাহায্যে তন্নিহিত পরমাত্মসত্তারূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়;—এখানেও, প্লেটোর অন্তশ্চক্র ও বহিশ্চক্র জন্য যে যে ক্রিয়া কার্য্য ও তত্ত্ব, তাহাদের উক্ত বিষয়গুলির সহ যথেষ্টই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ফলতঃ প্রকৃতিজ পদার্থ বোধরূপ বিজ্ঞান সহ, অন্তশ্চক্রজাত স্থূল জ্ঞান এবং পদার্থনিহিত পরমাত্মসত্তাংশরূপ জ্ঞানসহ, প্লেটোর আইডিয়ার অবিকল সাদৃশ্য দেখিলে আনন্দিত হইতে হয়। তত্ত্বানুসরণে হিন্দুর মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন জ্ঞান, প্লেটোরও সেইরূপ আইডিয়া।

১৫। Tim. X.

এক্ষণে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ আধিভৌতিক সৃষ্টির উদয় হইল কিরূপে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—এই বিশ্ব দ্বৈত উপায় সংযোগে সৃষ্ট। একটি 'নিত্যভাব' ও অপরটির নাম ?—'জনন ভাব' নামেই বলা যাউক। নিত্য ভাব,—অব্যয়, অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নিত্য অবস্থা। জননভাব—হইতেছে কিন্তু হয় না; বাঞ্ছারাম, বুঝিলে কিছু ?—গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে খসে না! তামাসা নহে, ইউরোপীয় তাত্ত্বিকেরা জননভাব অর্থে প্রায় সেইরূপই বুঝিয়া থাকেন। জননভাব,—পদার্থটি জন্মিতেছে বটে, অথচ বস্তুতঃ কিন্তু পদার্থটি নাই; অন্য কথায়, ইহা গ্রীক পোষাকে ঢাকা বেদান্তের মায়াতত্ত্ব মাত্র। এখন মায়াবাদের তুল্য সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম গাঢ় ও গূঢ় তত্ত্বব্যাখ্যান বোধ করি পৃথিবীতে আর কিছুই উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু ইউরোপীয়বুদ্ধি জড়-বিজ্ঞান-বিষয়িণী, সুতরাং উহা তাহাদিগের নিকট গাজির কুড়ুল স্বরূপ হওয়ায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ ইউরোপীয়বুদ্ধির নিকট, নিত্যভাব,—বিচারশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধির বিষয় এবং জননভাব,—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়োৎপন্ন সহজ জ্ঞানের বিষয়। ইউরোপীয়েরা এই ভাবদ্বয়ের কত দূর মর্ম্মগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা পরেও প্রদর্শিত হইতেছে।

নিত্য ভাবই সত্য পদার্থ; জননভাব তদ্বিপরীতে পরিবর্ত্তনশীল, হ্রাস বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের অধীন, অনিত্য ও অবস্তু—অর্থাৎ বস্তু বোধ হইতেছে বটে কিন্তু প্রকৃত বস্তু নহে, বস্তুভ্রম মাত্র। সুতরাং বৈদান্তিক রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, নিত্যভাবের উপর জননভাবের অধ্যাসক্রমে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ এবং সৃষ্টিজ্ঞান হইয়া থাকে। এখানে পুনঃ প্লেটোর আত্মায় সৃষ্টির অধ্যাস মিলাইয়া দেখ। জ্ঞানাত্মা রূপ আত্মার বহিশ্চক্র নিত্যভাব এবং বিজ্ঞানাত্মা রূপ আত্মার অন্তশ্চক্র জননভাব। কি খণ্ড কি সমূহ, যাবতীয় পদার্থরূপ, নিত্য-ভাবের উপর জননভাবের অধ্যাস বশতঃ উৎপন্ন হওয়ায়, প্রত্যেক পদার্থমূলেই নিত্যসত্তা, অথবা প্লেটোর কথায় আইডিয়া নিহিত রহিয়াছে। তাবৎ খণ্ড পদার্থের খণ্ড আইডিয়া সমূহ, নত-উন্নত

পর্য্যায়ক্রমে গ্রথিত, সংযোজিত ও সমাবিষ্ট হইয়া, শেষে মহাসমষ্টিযুক্তে ঐশ্বরিক মহাসত্তাস্বরূপে মহা আইডিয়া সংজ্ঞায় খ্যাত হইয়াছে। অতএব মানবের পক্ষে সেই ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধি এবং তাহার অনুভবসুখে সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে, তাহা পর পর পর্য্যায়ক্রমে একমাত্র আইডিয়াজ্ঞানের অনুসরণে সংসিদ্ধ হইতে পারে। ভাল কথাই! কিন্তু জর্ম্মাণ পণ্ডিত রিটার, প্লেটোর আইডিয়া সম্বন্ধে এক স্থানে এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছে ;—"প্লেটো এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বতত্ত্ব অবধারণ করিতে গিয়া, দিগ্বিদিকশূন্য ভাবে একমাত্র আইডিয়া দ্বারা সেই অবধারণ কার্য্যের পূর্ণ সংসাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন। এ হেতু অদৃশ্য হইতে এই জগতকে দৃশ্য ক্ষেত্রে আনয়নের জন্য তাঁহার যে সেই চেষ্টা, তাহাতে বহুপরিমাণেই অস্ফুট ও অপূর্ণভাব রহিয়া গিয়াছে।" ইত্যাদি। ইউরোপীয় আইডিয়া বোধের ইহাও যে একটা পরিচয়-আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তজ্ঞানে যাহাদের প্রবেশ নাই, সেরূপ লোকে রিটারের ন্যায় যদি প্লেটোতে সমস্তই অস্ফুট ও অপূর্ণ দেখিতে পায়, তাহাতে তাহাদিগকে তত দোষ দিতে পারা যায় না।

জননভাব সম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন যে, উহা সহজ জ্ঞানযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ক্রিয়া জন্য এই অনুভূতিতে বিশ্বাস করিতে নাই; যেহেতু পদার্থরূপ ভ্রমাত্মক, এজন্য তদুৎপন্ন জ্ঞানও ভ্রমাত্মক; সুতরাং তাহা ক্ষুণ্ণতা ও অসৌন্দর্য্যের কারণ স্বরূপ হয়। পূর্ণতা ও পূর্ণ-সৌন্দর্য্যের কারণ, নিত্যভাবোত্থিত জ্ঞান এবং সে জ্ঞান লাভ হইতে পারে একমাত্র বিবেকবুদ্ধি পরিলাচনা দ্বারা নতুবা অন্য প্রকারে হয় না। এজন্য প্লেটো বলিতেছেন যে, যে কোন অনুষ্ঠান বিষয়ে বিবেকজাত নিত্যভাবোথ জ্ঞানকে অবলম্বন করিলেই অনুষ্ঠিত বিষয় পূর্ণ ও সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে, নতুবা অন্যরূপে হয় না। আমরা দেখিতেছি যে, এই সৃষ্টি নিরূপম সৌন্দর্য্যশালিনী, অতএব ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, পরমেশ্বর ইহার সৃষ্টিতে নিত্যভাবকেই মূলস্থানে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কথিত ভাব দুইটির সমাবেশে স্থূল সৃষ্টির উদয় হইল কিরূপে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে সকল বস্তুই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন; এজন্য এই প্রয়োজন পূরণার্থে সর্ব্বপ্রথমে নিয়মশূন্য প্রবল ঘূর্ণাস্থলে নিয়মের উদয় করিলেন এবং সেই নিয়ম এই সৃষ্টির নিয়ামক হইল। তাহার পর, যাহা কিছু জন্মবিশিষ্ট, তাহা অবশ্য শারীরিক আকারবিশিষ্ট এবং দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় হইবার কথা। এই সৃষ্টি জন্মবিশিষ্ট, এ নিমিত্ত ইহাকে দর্শনীয়ত্ব ও স্পর্শনীয়ত্ব আদি গুণ প্রদান করিবার জন্য পরমেশ্বর অগ্নি, জল বায়ু ও মৃত্তিকা এই ভূতচতুষ্টয়ের সমাবেশে ইহাকে নির্ম্মাণ করিলেন। যেহেতু পরমেশ্বর নিজের অনুরূপতায় এই সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্য সৃষ্টি, ঐশ্বরিক মহাসত্তা বা মহা আইডিয়ারূপ যাহা তাহার অবিকল বাহ্য-প্রচার স্বরূপ হইল, সুতরাং ইহার অঙ্গসৌষ্ঠবেও আর কোথায় কোন ক্ষুণ্ণতা রহিল না। আকারে ইহা গোলাকার হইল, কারণ গোলাকারই সম্পূর্ণ মূর্ত্তি এবং আর যাবতীয় আকার এই গোলাকারের অন্তর্ভূত হয়। গোলাকার হেতু, এই সৃষ্টি সর্ব্ববিধ আকারের অধিষ্ঠানভূতা এবং জননী স্বরূপ হইল।

বিনা বুদ্ধিশালিত্বে কোন পদার্থ সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে না, বিনা চৈতন্যে বুদ্ধিশালিত্ব হয় না এবং চৈতন্য আবার আত্মার অনস্তিত্বে সম্ভবপর নহে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সৎ, এজন্য তিনি সতেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব সেই সততার বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার সৃষ্টিকে পূর্ণ সৌন্দর্য্যময়ী করিবার নিমিত্ত; পূর্ব্বে যে আত্মার সৃষ্টি-প্রকরণ বলা হইয়াছে, সেই আত্মপদার্থকে আনিয়া সৃষ্টির অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া, সৃষ্টিকে আত্মাবিশিষ্ট এবং মহাবুদ্ধি ও জ্ঞানশালিত্বের অধিকারিণী করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আত্মাপ্রাপ্তে সৃষ্টি আত্মাবান অদ্বিতীয় মহাজীবের স্বরূপ হইল। ১৬

১৬। পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িক তত্ত্ববিদেরাও, পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টিকে জীবরূপে কল্পনা এবং তাহাতে বুদ্ধিশক্তির অস্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে। তাহাদেরমতে

অনন্তর আত্মাকে সৃষ্টিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল কি ভাবে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—পরমেশ্বর আত্মাকে সৃষ্টিচক্রের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলেন এবং তথা হইতে উহা সৃষ্টিচক্রের ভিতর বাহির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। বাহিরভাগে এমন কি, দূরতম প্রান্ত—চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্ররাজি ছাড়াইয়া যাহা কিছু আছে, তাহাও অতিক্রম করিয়া আত্মা পরিব্যাপ্ত হইল। আত্মার বহিশ্চক্র ও অন্তশ্চক্রের সংস্থানবিধান মত, বহিশ্চক্র বাহিরে এবং অন্তশ্চক্র অন্তরে রহিয়া, নিজেদের আবর্ত্তনশীলতা হেতু, সৃষ্টিকেও সর্ব্বদা আবর্ত্তনের বশবর্ত্তী করিল[১৭]

আদিতে একতত্ত্ব (Monad) মাত্রের অস্তিত্ব ছিল। একতত্ত্ব হইতে দ্বিত্ব (Duad), দ্বিত্ব হইতে সংখ্যা (অর্থাৎ ব্যষ্টিত্ব), এবং সংখ্যা হইতে রেখা (অর্থাৎ ব্যষ্টি আকৃতি), ইত্যাদির পরিপাক ও উন্নতি পরম্পরায়, এই সৃষ্টি এতাদৃক প্রকাশমান হইল। কথিত আছে যে, গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে অনাক্ষগোরাসই প্রথমে ভূতে চৈতন্যের কল্পনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল যে, যাবতীয় পদার্থ আদিতে যদৃচ্ছা ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত ছিল, শেষে চৈতন্য স্বতঃ উদয় হইয়া তাহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তিতায় আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। ক্রিসীপোস্, আপলোডোরোস্, পোসিদোনিয়োস্ প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্‌দিগের ধারণা এই যে, জড়জগৎ জড় নহে; উহা গুণজ্ঞান ও চৈতন্যাদিসম্পন্ন মহাজীব এবং মানবীয় চৈতন্য বা আত্মা সেই মহাচৈতন্যের খণ্ডরূপ। এখানেও পুনঃ হিন্দুশ্রুত্যুক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি তত্ত্বের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জিনোর শিষ্যবর্গেরা কহিয়া থাকে যে, আদিতে সকর্ম্মক (active) এবং অকর্ম্মক (passive) এই দ্বিবিধ শক্তির অস্তিত্ব ছিল। অকর্ম্মকশক্তি ভূত এবং সকর্ম্মকশক্তি চৈতন্য। তাহাদের বিশ্বাসে, এই চৈতন্যই ঈশ্বর। সকর্ম্মক শক্তি অকর্ম্মক শক্তিতে সংযোজিত হইলেই সৃষ্টি প্রচার হয়। সকর্ম্মক শক্তি নিত্য, দেহশূন্য এবং অবিনাশী; কিন্তু অকর্ম্মকশক্তির ভাব তাহার বিপরীত, সুতরাং তাহাতে ধ্বংস আছে। জিনোর এই সকর্ম্মক এবং অকর্ম্মক শক্তির সহ, প্লেটোর বহিশ্চক্র ও অন্তশ্চক্র এবং হিন্দুর পুরুষ ও প্রকৃতি, ইহাদের উভয় উভয়তঃ স্বভাব তুলনা করিলে, এখানেও পরস্পরের মধ্যে কতকটা একতা লক্ষিত হয়।

১৭। Plato Tim. 10-12. এই স্থান দৃষ্টে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, প্লেটোর এতদুভয় চক্রের তাৎপর্য্য এরূপ যে, এই সংসারে কিছুরই উন্নতি বা অবনতি নাই; আমরা যাহা কিছু উন্নতি বা অবনতি বলিয়া দেখি তাহা ক্ষণিক বৈচিত্র, নতুবা একই বিষয় বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে আসিতেছে মাত্র। প্রাচীন কালের যে সকল

এবং তাহার এই আবর্ত্তন ও আত্মার ব্যাপনশীলতা হইতে, সৃষ্টি চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণপ্রবাহ জীবকুলের আধারস্থলী হইল। বহিশ্চক্রের অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য ও অদ্বৈতভাব এবং অন্তশ্চক্রের তদ্বিপরীতে মুহুঃ পরিবর্ত্তনীয় ক্ষয়শীল ও খণ্ডভাব; পুনঃ আত্মার গঠনোপকরণে ভেদ, অভেদ ও সত্তা, এই ত্রিবিধ সন্নিবিষ্ট তত্ত্ব; এই সকলের যথানুক্রমিক ক্রিয়া হেতু, সৃষ্টিও সেইরূপ স্বভাবাদি প্রাপ্ত হইল। এস্থানে প্লেটোর অর্থ বিশ্লেষণ করিলে, ইহাই যেন উপলব্ধি হয় যে, আত্মার ব্যাপনশীলতা ও বহিশ্চক্র বা নিত্যভাবের প্রভাবে জীবসৃষ্টিপ্রবাহ যদিও নিত্য; কিন্তু অন্তশ্চক্র বা জননভাবের প্রভাবে, সেই সৃষ্টিপ্রবাহ মধ্যে পুনঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষণিক, পরিবর্ত্তনীয় ও খণ্ডমূর্ত্তি শারীর সৃষ্টিরও অভিনয় চলিতে লাগিল। অভেদ ও ভেদ তত্ত্বহেতু, সৃষ্টির সহ অবিচ্ছিন্ন ও তাহার অঙ্কশয়নশায়িভাবে অথচ পৃথক পৃথক্ মূর্ত্তিবিশিষ্ট জীবের উদয় হইল। তাহার পর, সত্তা নামক তৃতীয় তত্ত্ব হেতু, উক্ত জীব সকল জ্ঞানাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মা প্রাপ্ত হইয়া; একের প্রভাবে সত্য এবং বুদ্ধি ও বিবেকজাত জ্ঞান, আর অপরের প্রভাবে অজ্ঞান মোহ ও ইন্দ্রিয়জাত বাসনাদির বিকাশ করিতে থাকিল। প্লেটো এখানে বলিতেছেন যে, সৃষ্টি-আত্মারই অন্তর-বাহির উভয়তঃ সমাবেশ ও আবর্ত্তনশীলতা হেতু, সৃষ্টি নিত্যকালের জন্য জীবাধার হইল[১৮]; আবার অন্যত্র[১৯] জীব

মানবীয় বা যে কোন ইতিহাস শুনিতেছ এবং এখন আবার যাহা দেখিতেছ, তাহাই পুনঃ ফিরিয়া পর পর আসিবে ও যাইবে। সুতরাং জাতীয় উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি কেবলভ্রম। পৌরাণিক কল্পমন্বন্তরাদির কল্পনাও এরূপ বটে এবং তাহাও যেন কতকটা একইবিধ সৃষ্টির পুনঃ পুনঃ আগতি এবং বিরতি শিক্ষা দেয়। সে যাহা হউক, হিন্দুপুরাণ এবং প্লেটো, এ উভয়েরই নিগূঢ় শিক্ষা যে ঠিক সেরূপ, এমনটা বোধ হয় না। অথবা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনই যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও একই পথে পুনঃপুনঃ চক্র চালনা করিলে যে একই ধূলা উড়াইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বিশেষতঃ ইহাও পুনঃ বলা হইতেছে যে নিত্য বিভিন্নতাই অন্তশ্চক্রের ধর্ম।

১৮। Tim. XIII.

১৯। Tim. XVII.—যে পাত্রে যে সকল মালমসলার পরিপাকে সৃষ্টি-আত্মা

সকলের অন্তর্নিহিত পৃথক্ পৃথক্ আত্মা আসিল কোথা হইতে, তৎ-সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, যে মালমসলার সংমিশ্রণরাশিতে সৃষ্টি-আত্মা নির্ম্মিত, সৃষ্টি-আত্মা নির্ম্মাণানান্তে তাহার যে কতকটা অংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহাকেই নানাখণ্ডে বিভাগ ও বিন্যাস পূর্ব্বক প্রতি জীবকে আত্মাবিশিষ্ট করা হইল। বলিতে পার বাঞ্ছারাম, ইহাতে কি বুঝা যাইবে? পুনশ্চ কালসৃষ্টি-কথনে প্লেটো বলিতেছেন যে, সংখ্যাতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এক এবং অদ্বৈত মূর্ত্তির মধ্যে তিনি বহুত্বের সমাবেশ করিলেন।[২০] এ সকলের দ্বারা বোধ করি এক মাত্র এই কথা অনুমিত হইতে পারে যে, সমস্ত সৃষ্টি এক অদ্বৈতমূর্ত্তি এবং তন্নিহিত আত্মা যিনি, তিনিও এক ও অদ্বৈত সত্তা বটে; কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব সেই অদ্বৈত সৃষ্টিতে ব্যষ্টিভাব এবং প্রতিজীবাত্মা সুতরাং সেই মহান অদ্বৈত সৃষ্টি-আত্মার খণ্ড বা ব্যষ্টিরূপ মাত্র।

ফলতঃ যতদূর দেখা গেল, তাহাতে ইহা প্রতীত হইতেছে যে, বহিশ্চক্ররূপকাত্মক নিত্যভাব বা জ্ঞানাত্মা যাহা, ব্যষ্টি-সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহাই আদর্শ এবং আত্মিকতা ও ভাবাদির দাতা; আর অন্তশ্চক্র-রূপকাত্মক জননভাব বা বিজ্ঞানাত্মা যাহা, তাহা সেই সকল আদর্শাদি অনুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থূল সৃষ্টির কারয়িতা। প্রারম্ভভাগে আত্মায় যেরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ অধ্যাসিত এবং তদুত্তর ভাগে স্থূল সৃষ্টিতে সেই প্রকরণ যেরূপ প্রয়োজিত হইতে দেখা গেল, তাহাতে এখানেও হিন্দুতত্ত্বের সহ বহুল সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সৃষ্টি মহদাত্মাবান্

নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেইই পাত্রে সেই মালমসলার অবশিষ্ট অংশ পরিপাক করিয়া জীবাত্মা সকল গঠিত হইল। কিন্তু এই সকল আত্মা, সৃষ্টি-আত্মা অপেক্ষা, স্বভাবে ও গুণে দুই তিন পর্য্যায় পরিমাণে নিকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইল।

২০। Tim. XIV. ইউরোপীয়েরা সংখ্যা অর্থে যে কি বুঝিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিলাম না। কিন্তু সংখ্যা অর্থে যে হিন্দুতত্ত্বের ব্যষ্টিভাব ও ব্যষ্টি-রূপতা, সে পক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। সে অর্থ ভিন্ন, অন্য কোনরূপেই উহার অর্থ হওয়ার সম্ভবনা দেখা যায় না।

মহাজীবস্বরূপ কল্পনা করায়,হিন্দুর বিরাটমূর্ত্তি বা বৈরাজতত্ত্ব সহ কতকটা সাদৃশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কি জীব কি জড় উভয় সৃষ্টিতে যে নিত্যভাবের একত্ব ও জননভাবের বহুত্ব এবং জননভাবজন্য যে পদার্থ-ভ্রম, সেই সকলে, হিন্দু অদ্বৈতবাদ ও মায়াতত্ত্ব যেন বহুলাংশেই প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্লেটো বলিতেছেন যে পরমেশ্বরের মনে যে আদর্শ বর্ত্তমান এবং নিত্যভাব যাহার প্রতিরূপ, জননভাব প্রভাবে সৃষ্টি তদনুকরণে প্রকাশমান হইতেছে। এখানেও সাদৃশ্য যথেষ্ট। কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি উভয় ভাবেই, আত্মায় অনন্ত সংস্কারের বিদ্যমানতা; সেই সংস্কারের যখন যাহা মায়াশক্তিতে যেরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেইরূপেই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ প্রকাশমান হইয়া থাকে। আত্মিক সত্তাই সত্য এবং তাহা একমাত্র বিবেক ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়, মায়িক সত্তা তাহার বিপরীত। আমি প্লেটোর তত্ত্ব যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে জগদাত্মাই যেন খণ্ডরূপে জীবাত্মা। হিন্দুতত্ত্বেও তাহাই; পরমাত্মা, সমষ্টি বা অদ্বৈত মূর্ত্তিতে জগদ্ব্যাপনশীল বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং তাঁহার ব্যষ্টিভাব যাহা, তাহাই মায়িক আবরণে জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এখানে একটা কথা আছে। অদ্বৈততত্ত্ব নাম শুনিলে অনেকেই চম্‌কাইয়া উঠে এবং কেবল চম্‌কাইয়া ক্ষান্ত নহে, অধিকন্তু উহাকে নাস্তিকতারও কাছাকাছি বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা এই যে, জীব ও ঈশ্বর যে এক, এ কথা অতি অশ্রদ্ধেয়। আরও বলিয়া থাকে যে, জীব ও ঈশ্বর যদি এক হইল এবং সেই একেতেই গিয়া যদি জীবাত্মা শেষে লয় পাইল, তবে জীবাত্মার থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য হইয়া দাঁড়াইল। কথাটা উঠিয়াছে অতি গুরুতর, দুই চারি কথায় বলিবার বিষয় নহে; অথচ কিন্তু আমারও এখানে দুই চারি কথার অধিক বলিবার সময় ও স্থান উভয়ই নাই।

আমার বোধ হয়, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লোকের এরূপ ধারণা, অদ্বৈত-তত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিবার ফল মাত্র। অদ্বৈততত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে অন্য কিছুই নহে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিতত্ত্ব মাত্র; অর্থাৎ একেতে বহু ও বহুতে

এক। জিজ্ঞাসা করি, এ সংসারে এমন কোন পদার্থ কোথাও দেখাইতে পার কি, যাহাতে যুগপৎ একত্ব ও বহুত্বের সমাবেশ নাই? এই যে কলম, যাহাতে লেখা যাইতেছে, তাহা যেমন একটি পদার্থ স্বরূপ বটে, তেমনি আবার ঠিক একটিও নহে; উহা উপকরণ-আখ্যাধারী একত্র সমাবিষ্ট বহু পদার্থের যে একতর সমষ্টিরূপ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাগান বলিলে একটি পদার্থ বুঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বহুবৃক্ষের একত্র সমাবেশমাত্র। পুষ্করিণীস্থ জল বলিলে একটি পদার্থ বুঝায়, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে উহা অসংখ্য জলীয় কণা বা বাষ্পের একটি সমাবিষ্ট-মূর্ত্তিবিশেষ। একটি বালুকাকণার প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাহাতেও ঐ কথা। এক্ষণে ক্ষুদ্র পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, পর পর ক্রমোর্দ্ধে, এমন কি সমগ্র সৃষ্টি-পদার্থের প্রতি একবার তোমার দৃষ্টি চালনা করিয়া দেখ; দেখিতে পাইবে সেখানেও,সেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিতত্ত্বের বিদ্যমানতা। ফলতঃ এ সংসারে ক্ষুদ্রবৃহৎ এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে একত্ব ও বহুত্ব একধা সন্নিবিষ্ট নহে। আরও দেখ, এই যে একত্ব ও বহুত্ব বা সমষ্টি ও ব্যষ্টি বোধ এবং তদুভয় শ্রেণীভেদে যে বহুতর পদার্থ জ্ঞান হয়; তাহা সমস্তই আমাদের ইন্দ্রিয়-বিষয়-বোধের আকার ও প্রকারভেদ জন্য তদ্রূপ তদ্রূপ হইয়া থাকে এবং আমাদেরই প্রদত্ত সংজ্ঞা হেতু পুনঃ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি সকল কেহ বাষ্প কেহ জল, বা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও স্থূল হইতে স্থূলতর, নানাবিধ নামের দ্বারা নামিত হয়। ভাল, এখন যদি একবার বিষয়বোধক আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ ও নাম-দায়ক সংজ্ঞা সকলকে সংহরণ করিয়া লই, তাহা হইলে বলিতে পার, বস্তুতঃ এ সংসারে থাকে কি? তাহার পর এটাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি, এ উভয়বিধ ভাবোদয়ের মধ্যে কি যোগ কি বিয়োগ এ উভয় স্থলেই, মূল পদার্থের ধ্বংস বা জন্মাদি কিছুমাত্র হইতেছে না; হইতেছে কেবল তাহাদের রূপেরই উদয় বিলয় ও স্থিতি বিষয়ে ক্ষণিক পরিবর্ত্তন মাত্র। এখন একবার অন্য সমস্ত ভাব মন হইতে পরিত্যাগ করিয়া, একায়ত্তক এক সমগ্র দৃষ্টিতে অবলোকন

করিয়া দেখ, সমষ্টিরূপা এই সমগ্র সৃষ্টি এক এবং অদ্বৈতমূর্ত্তি কি না। কিন্তু এ অদ্বৈতমূর্ত্তির মধ্যে, ব্যষ্টিরূপা পৃথক পদার্থ সকলের কি তা বলিয়া লোপ বা বিলয় দৃষ্ট হয়? তাহা হয় না। ফলতঃ ব্যষ্টিরূপ সকল সমষ্টিমধ্যে তত্ত্বতঃ পৃথকত্ব পরিত্যাগে একস্বরূপতায় সমাবিষ্ট হইলেও, ব্যষ্টিরূপে পার্থক্য তাহাদের যাহা কিছু,তাহা তদ্দারা লোপ না হইয়া, তখনও অভ্যন্তরভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়।

এখন আধিভৌতিকমূর্ত্তিমাত্রে, আধ্যাত্মিক কল্পনা-মূর্ত্তির বাহ্য-প্রচার স্বরূপ। প্লেটো যে কল্পনামূর্ত্তিকে ঈশ্বরের মনঃস্থিত আদর্শ বলিয়াছেন, হিন্দুতত্ত্ববিৎ তাহাকেই জীবসকলের কামনা বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। প্রতিজীবের পৃথক কামনা ফলে পৃথক পদার্থত্ব এবং সমষ্টি জীবের সমষ্টি কামনা ফলে এক এবং অদ্বৈত পদার্থত্ব। সমষ্টিকামনার এইরূপ ফল ও পরিণাম হেতু, পুরাণে বিধাতার মানস-সৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হয়। আধিভৌতিক মূর্ত্তি আধ্যাত্মিক কল্পনামূর্ত্তির বাহ্য প্রচার হেতু, এই আধিভৌতিকসৃষ্টি দৃষ্টে আধ্যাত্মিক সংসারের ভাবও অবশ্য অনেকটা আমরা উপলব্ধি করিতে যে পারি, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অতএব আধ্যাত্মিক সংসারে ব্যষ্টিভাবাত্মক কামনাবান প্রতি-জীবস্থ পৃথক আত্মা, দেবতাত্মা সকল এবং অপরাপর অবস্থা ও গুণ প্রাপ্ত তাবৎ আত্মা, এই সমস্ত লইয়া সমষ্টিরূপ এবং এই সমষ্টি আত্মভাবকেই ভাবভেদে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা পুরুষ শব্দে কহা যায়। কামনা এবং কামনা জন্য পদার্থত্ব প্রকটন প্রকৃতির কার্য্য এবং সেই প্রকৃতিই পুরুষের শক্তি। এক্ষণে পুরুষের অন্বয়ে প্রকৃতি, প্রকৃতির অন্বয়ে সৃষ্টি; সুতরাং পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও আশ্রয়-আশ্রিত ভাব হেতু, জড়াজড় এবং আত্মা ও ভূত সমস্ত লইয়া এক মহান্ বিরাট ও বিশ্বরূপ এবং অদ্বৈত মূর্ত্তি বলা যায়। নতুবা অদ্বৈততত্ত্ব বলিলে, অনেকে যেরূপ বুঝিয়া থাকে, সেরূপ এই সৃষ্টিমূর্ত্তিকেও ঈশ্বর বলে না অথবা প্রতি ব্যষ্টি আত্মা, পরমাত্মায় পরমগতি হেতু মিশিলেও, স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হয় না। যেমন আধিভৌতিক সংসারে রূপেরই পরিবর্ত্তন,পদার্থতত্ত্বে ধ্বংসসৃষ্ট্যাদি নাই;

আত্মিক সংসারেও সেইরূপ জীবত্বেরই পরিবর্ত্তন, নতুবা আত্মার সৃষ্টি-ধ্বংসাদি নাই। জীবাত্মাও, পরমাত্মার ব্যষ্টিভাবতা হেতু, নিত্য এবং অসৃষ্ট পদার্থ। সমষ্টিভাবজন্য পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা ও সম্পূর্ণতা হেতু, প্রকৃতি তাহার বশ এবং পুরুষে সেই প্রকৃতিক্রিয়ার অধ্যাস হেতু, পুরুষের কর্ত্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব। আর ব্যষ্টিত্ব ভাবজন্য অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা হেতু, ব্যষ্টি আত্মা মহাপ্রকৃতির বশ্য এবং সেই প্রকৃতির ক্রিয়া তাহাতে অধ্যাসিত হওয়ায়, জীবের কর্ম্মত্ব এবং আশ্রিত ভাব। পুনঃ ব্যষ্টি আত্মার ব্যষ্টি প্রকৃতি যতটুকু, তাহা তাহার বশেই আছে এবং সেই বশ্যতা জন্য সে, আশ্রিত এবং কর্ম্মস্বরূপ হইয়াও, স্বেচ্ছাচালনে ও স্বেচ্ছা মত কর্ম্ম আচরণে সক্ষম হয়। প্রকৃতিবশে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হওয়াই, জীবের জন্ম মরণ সুখ দুঃখাদি অবস্থাভেদ; পুনঃ জ্ঞানযোগে সমষ্টিমূর্ত্তি পুরুষকে আশ্রয়ের দ্বারা সমষ্টি প্রকৃতিক্রিয়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই হিন্দুতত্ত্বানুসারে মোক্ষ। যতদূর দেখা যায়,তাহাতে কি ধর্ম্ম কি তত্ত্ব, উভয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় দুরূহ ও কূট প্রশ্ন, কেবল এই এক অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই মীংমাসিত হইতে পারে, নতুবা অন্য কোনরূপে হইতে পারে কি না সন্দেহ।

অতঃপর প্লেটো কালের সৃষ্টি কল্পনা করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টিরূপী মহাজীবের জ্ঞান ও চৈতন্য প্রভা দৃষ্টে, আনন্দবশে উহাকে নিত্যস্বরূপা করিয়া তুলিলেন। কিন্তু কেবল অব্যয় নিত্যস্বরূপা হইলেও আবার চলে না, যেহেতু তাহা হইলে জননভাবোৎপন্ন পদার্থের আর সম্ভবতা থাকে না; অথচ জননভাবও নিত্য ভাবের সঙ্গে সমস্থায়ী, যদিও তদুৎপন্ন পদার্থ সকল অবশ্য নিত্যস্থায়ী নহে। অতএব জননভাবের ক্রিয়াজন্য নিত্যতে অনিত্য সৃষ্টির যুগপৎ সমাবেশ সাধনার্থে পরমেশ্বর, সংখ্যাতত্ত্ব (ব্যষ্টিতত্ত্ব) অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতসত্তাশায়ী নিত্যভাবেরই প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ এবং চলৎ-নিত্য প্রতিরূপ কালের সৃষ্টি করিলেন। এই কালের গতিবশে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদির সঞ্চার হইতে লাগিল। অতঃপর কালের পরিমাপক রূপে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইল। ইহাদ্বারা রাত্রি দিবা, মাস, সংবৎসর আদি কাল বিভাগের প্রবর্ত্তনা

হইল। প্লেটো কহেন, সৃষ্টি এবং কাল, উভয়ই অনন্তকালস্থায়ী। কালের ভূত এবং ভবিষ্যৎ ভাব, অর্থাৎ 'হইয়াছে' এবং 'হইবে', ইহা কেবল সৃষ্টির জননভাবেতে আরোপিত এবং তাহারই অস্তিত্ব ও স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। 'হইয়াছে' বা 'হইবে' ইহা দ্বারা, বৃদ্ধি ক্ষয়াদি অভিমুখে পরিবর্ত্তনশীলতা যাহা, তাহাই বিজ্ঞাপ্ত হয়। নিত্য ভাব এবং নিত্যবস্তু সম্বন্ধে সেরূপ নহে; তৎপক্ষে একমাত্র বর্ত্তমান কাল অর্থাৎ 'আছে' এরূপ কালবোধক ক্রিয়াপদ মাত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান কেবল এক এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য ভাবকে বুঝাইয়া থাকে। জননভাবোৎপন্ন পদার্থে যদিও আমরা 'আছে' শব্দ প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ বোধার্থে; নতুবা তৎপক্ষে কেবল 'হইয়াছে'; 'হইতেছে' 'হইবে' ইহাই প্রয়োগ হইতে পারে। সৃষ্টি নিত্যস্বরূপা হইলেও, তাহাতে কালের এই ত্রিবিধ ভাব, অর্থাৎ 'হইয়াছে' 'হইতেছে' এবং 'হইবে' আরোপিত হওয়ায়, তাহার প্রভাবে ও সেই প্রভাব হইতে উত্তেজিত জননভাবের স্বভাবে, উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদি গুণযুক্ত সৃষ্ট পদার্থ-সমূহের প্রকটন হইয়া থাকে। জিনো কহেন, কাল পৃথিবীর গতির ব্যবধান মাত্র। উহার ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাগ অসীম, কেবল বর্ত্তমানভাগ সসীম।

কালের সহ নিত্যভাবের সম্বন্ধ সম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন যে, যাহা নিত্যস্বরূপে অবস্থিত,তাহা সর্ব্বদা এক অভেদ ও অপরিবর্ত্তনীয়; কোন সময়ে উহার যুবত্বও নাই, বৃদ্ধত্বও নাই; পূর্ব্বে কখনও উহা সৃষ্টও হয় নাই, পরেও কখনও হইবে না, অনন্তকালই একভাবে আছে। অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের উপর জননভাব যে সকল ঘটনা ও অবস্থাদি আনিয়া উপস্থিত করে, নিত্যভাব বস্তুতঃ তাহারও অধীন নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, উহারা অনন্তের অনুকারী কালপ্রভাবে সংঘটিত হয় এবং সংখ্যা (ব্যষ্টিভাব) দ্বারা বিভক্ত অন্তশ্চক্রানুবর্ত্তী হইয়া কালপথে নিয়ত আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ধ্বংস উৎপত্তি আদিযোগে কখনও উদয় কখনও বিলয় প্রাপ্ত হয়।

প্লেটো বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের উপর জননভাব যে সকল ঘটনা ও অবস্থাদি আনিয়া উপস্থিত করে, নিত্য-ভাব বস্তুতঃ তাহার অধীন নহে ; এই কথায় হিন্দুতত্ত্ব বিদ্যার একটী কথা মনে পড়িল। হিন্দুতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, জীবরূপে যে সকল জন্মমরণ ও সুখদুঃখাদি ঘটনা ও অবস্থাদি উপস্থিত হয়; জীবের আত্মা যদিও তাহার কারণ ও নিমিত্ত বটে, কিন্তু তথাপি তাহা তখনও শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃত কিছুতে লিপ্ত হয় না। মনে কর, বহু নক্ষত্ররাজির মধ্যে একটি নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইয়াছে। নক্ষত্রটি যদিও তখনও আকাশে আছে বটে, কিন্তু জলে প্রতিবিম্ব দৃষ্টে তাহার এই ভ্রম জন্মিয়াছে;—আকাশস্থ আমি, আমি বা এ নক্ষত্ররাজির একতর নহি, ঐ জলে যে প্রতিবিম্ব উহাই আমি। এই ভ্রমহেতু প্রথমে, আকাশস্থ নক্ষত্ররাজি হইতে নিজের ভেদজ্ঞান; দ্বিতীয়তঃ স্বীয় আকাশস্থ অবস্থার জ্ঞানলোপ; তৃতীয়তঃ, প্রতিবিম্বে আমিত্ব জ্ঞান জন্য, জলের আন্দোলন আলোড়ন আদি নানা ভাব হেতু প্রতিবিম্বটি যে সকল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, নক্ষত্রটি সেই সকল অবস্থান্তর নিজেতে আরোপ করিয়া, অবস্থা সকলের পরিণাম-ভাগী হইতেছে। এই সকল অবস্থা ও পরিণাম ভোগ হইতে থাকিলেও, নক্ষত্রটি বস্তুতঃ তখন আছে কোথায় ?—তখনও সেই পূর্ব্ববৎ প্রতি-বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অবস্থা সকল হইতে নির্লিপ্তভাবে আকাশে। প্রতিবিম্বের অবস্থা সকল, এক অপরের কার্য্য-কারণ আকারে, উত্তরো-ত্তর যতই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক না কেন; নক্ষত্রটি তখনও নির্লিপ্ত ভাবে সেই আকাশেই থাকে। তবে ভ্রমের অবশ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন কমি নাই বটে এবং সেই বৃদ্ধ ভ্রম হেতু, অবস্থা সকলের কার্য্য-কারণতায়, কারণে কামনা ও কার্য্যে কামনা-পরিণামের অধ্যাস হয়। জীবের জীবত্বও ঠিক ঐরূপ; মায়াজলে সমষ্টিচ্যুত নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে ভেদজ্ঞানের উদয় ও ঐ প্রতিবিম্বে আমিত্ব বোধ হয় এবং তদ্ভত্তরে নক্ষত্রের ন্যায়, প্রতিবিম্বের অবস্থায় অবস্থান্বিত হইয়া থাকে। আবার

যখন, এই ভ্রম দূর হইয়া, আকাশস্থ নক্ষত্ররাজি সহ অবস্থায় অভেদত্ব অনুভব হইবে, তখনই জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি। অবস্থা হইতে অবস্থান্তর উৎপাদনে অবস্থা সকলের কার্য্যকারণতায়, কারণে কামনা ও কার্য্যে পরিণামের অধ্যাস হয় বলিয়াই; গীতার একস্থানে এরূপ উক্ত যে, প্রকৃতিই আপন গুণানুসারে কর্ম্ম করিয়া যায়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা যে, সে তাহাতে নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[২১] উক্ত কামনার মধ্যে পুনঃ যাহা শুভকর তাহা পুণ্য এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহা পাপ এবং কামনার পরিণামভেদে সেইরূপ স্বর্গনরকও ভেদ হয়। এক অবস্থায় বিভিন্নরূপাদি, জীবনবিশেষের অবস্থাদি ভেদ এবং অবস্থা হইতে অবস্থান্তর পরিবর্ত্তনে,জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কল্পিত হয়। কাম কর্ম্ম সুখ দুঃখাদির আরও সূক্ষ্ম বিভাগ বিন্যাসে এখানে প্রয়োজন নাই, উহারাও কামনা-পরিণাম ও অবস্থাদির সূক্ষ্মবিভাগ মাত্র। এখন বলা বাহুল্য যে পাপপুণ্য, স্বর্গনরক, জন্ম মৃত্যু, ইত্যাদির বস্তুতঃ কোন সত্তা নাই; উহারা আত্মার ভ্রম জন্য সংস্কার মাত্র। তবে কিনা যতদিন ভ্রম ঘুচিয়া সে সকলের অতিক্রম-কারী জ্ঞানের উদয় না হইতেছে, ততদিন তাহারাও যে অখণ্ডনীয় সত্যস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই গীতার একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর কাহারও পাপপুণ্যাদি সৃষ্টি বা ফলাফল প্রদান করেন না, প্রাণিগণ মোহবশতঃ আপনিই তাহা সৃজন করিয়া লয়।[২২]

প্লেটো কহিতেছেন, স্রষ্টা এক্ষণে বিভিন্ন আইডিয়াপ্রাণ বিভিন্ন গুণ ও রাশি অনুসারে বিভিন্ন জীবসৃষ্টির বাসনা করিয়া, ক্রমান্বয়ে প্রথমতঃ দেবাদি দিব্য প্রাণিগণ, তৎপরে পক্ষবিশিষ্ট গগনচরগণ, তৃতীয়ে জলচর এবং চতুর্থে স্থলচরের উৎপত্তি সাধন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি হইতে দেব নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়; ইহারা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই অমরত্বলাভে চরিতার্থ হইয়াছিল। অতঃপর প্লেটো দেববংশাবলীর

২১। ভগবদ্গীতা ৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

২২। ভগবদ্গীতা ৫ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক।

যথাযথ উৎপত্তি এবং সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। [২৩] ঈশ্বর দেববংশ সৃষ্টি করণান্তে, অপরাপর জীব সৃষ্টির ভার দেবতাদিগের উপর দিয়া, স্বয়ং স্বাভাবিক বিশ্রাম সুখানুভবে রত হইলেন। দেবতারা ক্রমান্বয়ে মনুষ্য ও নানাবিধ ইতর জীবের সৃষ্টি করিলেন। এখানে দৃষ্ট হইবে যে প্লেটো, অবিকল হিন্দু দেবতত্ত্বের ন্যায়, ঈশ্বরের নিম্নে ও তদাজ্ঞাবাহী আর একদল মধ্যবর্ত্তী লোকপাল দেবতার অস্তিত্ব অবধারণ করিতেছেন। ইহারা গ্রীকদিগের পৌরাণিক দেবতা এবং হিন্দুর ইন্দ্রাদি লোকপাল-স্থানীয়। এমন কোন জাতিরই দেবতত্ত্ব দেখা যায় না, যাহাতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি দিব্যজাতীয় জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তবে প্রভেদ এই, কোথাও তাহারা দেবতা, কোথাও স্বর্গীয় দূত, ইত্যাদি বিবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তী দেবতার কল্পনা সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বদেশীন হওয়ায়, ইহাকে স্বভাবিক ও সত্যপূর্ণ বলিতে পারা যায় না কি?

অনাক্ষগোরাস্ বলিতেন যে, যাবতীয় জীবসৃষ্টি, তাপ শৈত্য ও পার্থিব পদার্থের সংমিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। [২৪] আর্কিলাউস্ বলিতেন তাপ এবং শৈত্য, এই দুই সকল উৎপন্ন বস্তুর আদি। জল তাপের দ্বারা দ্রব হইয়া, পুনর্ব্বার গুণবিকার বিশেষের দ্বারা অগ্নির সহ সংস্রবে ঘনীভূত হওয়াতে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি। সেই মিশ্রপদার্থ আবার যখন তরলিত হয়, তখন বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত

২৩। গ্রীসে কেবল পুরাণকীর্ত্তিত দেববংশস্থগণ দেবতা নহেন। লোকসমিতি ইচ্ছা করিলেও যাহাকে তাহাকে দেবতা করিতে পারিতেন। ধর্ম্মবিদ্যা প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। প্লেটোর বর্ণিত দেবতাগণ সমস্তই পৌরাণিক; অনুজ্ঞাক্রমে স্থাপিত দেবতার কথা অবশ্য তাহার মধ্যে গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে।

২৪। অনাক্ষগোরার সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত মত ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, স্বর্ণাদি বস্তু যেরূপ বহু পদার্থের একত্র সমাবেশ ভিন্ন কিছুই নহে, পৃথিবীও সেইরূপ। সূর্য্য ইহার মতে একটি বৃহৎ তপ্ত লৌহপিণ্ড। চন্দ্র জীবগণের বাসস্থানের উপযুক্ত, তথায় লোকের গৃহাদি আছে এবং চন্দ্রের উপরিভাগ পর্ব্বত অধিত্যকাদি বিশিষ্ট, ইত্যাদি।

এবং বিক্ষুব্ধ; বায়ু আবার অগ্নিদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। তাপযুক্ত মৃত্তিকা অপরাপর ভূতাদি সংযোগে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবাদির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

প্লেটোর মত যেরূপ পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, তাহাতে মানবও সৃষ্টি-রূপী মহাজীবের ন্যায় আত্মা ও শরীর উভয় বিশিষ্ট হইল। মানুষের আত্মা কোথা হইতে আসিল, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ও দেখান হইয়াছে যে উহা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত মহান্ আত্মার অংশ স্বরূপ। মানুষ আত্মিক ভাবে যেমন জ্ঞান বুদ্ধি ও সুখদুঃখাদির অনুভবশক্তি প্রভৃতি পাইল; সেইরূপ আবার শারীরিক সংস্রব বশতঃ,কাম ক্রোধ দ্বেষ ভয়াদি অন্যান্য নানা ইতরবৃত্তি ও সেই সকল ইতরবৃত্তির পুনঃ ঠিক বিপরীত সংবৃত্তি সকলও প্রাপ্ত হইল। যে সকল মানুষ সেই সকল বৃত্তিকে সংযত করিতে সক্ষম, তাহাদেরই জীবন ন্যায়ানুগত ও পুণ্যের; আর যাহারা সেরূপ সংযমে অপারক, তাহাদের জীবন পাপের। জীবন-কালে যাহারা ঐরূপ সংযতভাবে পুণ্যজীবন অতিবাহিত করে, তাহারা অনুরূপ নক্ষত্রলোকে নীত হইয়া, উপযুক্ত সুখ ও আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[২৫] কিন্তু যাহারা সেরূপ সংযত ও সুনীতিবান্ হইতে না পারে, তাহারা পরজন্মে স্ত্রীলোক; অথবা পাপের পরিমাণ অনুসারে, এমন কি, অত্যধম পশুযোনি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা, জ্ঞানবলে অতি দুর্দ্দান্ত ও অজ্ঞানাধার আধিভৌতিক প্রকৃতিকে

২৫। Tim. XVII. এই স্থান দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, প্লেটো অচল নক্ষত্র সকলকে, পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের আত্মার জন্য পরলোকে বাসস্থানরূপে নিরূপণ করিতেছেন। প্রতি অচল নক্ষত্র পৃথক প্রকৃতির,এজন্য যে যেরূপ প্রকৃতির পুণ্যাত্মা, সে তাহার তদ্রূপ সমধর্ম্মী নক্ষত্র লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও শনি, ইহারা সচল বলিয়া ইহাদিগকে জননচক্রের এবং অপরাপর নক্ষত্র সকল অচল বলিয়া তাহাদিগকে নিত্য চক্রের অধীন করা হইয়াছে। অচল নক্ষত্র সকল নিত্য চক্রের অধীন বলিয়াই, নিত্যধর্ম্মী আত্মার উপযুক্ত অবস্থিতিস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বশ্যতায় আনিয়া একেবারে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহারা সেই আত্মার অতি সৎ ও পরিশুদ্ধ প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়। ২৬

আত্মার বৃত্তি সকলের অপ্রতিহত পূর্ত্তি বা তাহাদের সংযমনের দ্বারা পাপ ও পুণ্যসঞ্চয়ের যেরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সেই সকল পাপ ও পুণ্য অনুসারে পরিণাম স্বরূপ আত্মার যেরূপ পুনর্জ্জন্ম বা উচ্চলোক ভোগাদি বর্ণিত হইয়াছে, বৈদান্তিক বা শ্রৌত তত্ত্ব সহ তাহার প্রভেদ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পুনঃ শ্রুতিতে যাহা মোক্ষ বলিয়া বর্ণিত তাহার সহ, প্লেটোর বর্ণিত আত্মার সৎ ও পরিশুদ্ধ প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্তিকে একই পদার্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। তত্ত্বমার্গে যদিও এইরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তৎ তৎ তত্ত্বানুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত্যর্থে অনুষ্ঠানমার্গে, আর সেরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্লেটোর তত্ত্ববর্ণনাগুলি মতবিশেষ মাত্র, তদতিরিক্তে কার্য্যতঃ অন্য কিছুই বলা যায় না; কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মতমাত্র নহে, তাহা অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-অনুজ্ঞা বিশেষ। হিন্দুর বর্ণিত মোক্ষাদি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, কেবল বৃত্তির সংযমন নহে; তদতিরিক্তে বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তপঃ, যোগ ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং এমন কি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য ও গিরিকন্দরাদি আশ্রয় করিতে হয়। আর প্লেটোর তত্ত্বানুসরণ করিতে হইলে, সে সকল কিছুই করিতে হয় না; ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্য, বিলাসাদির মধ্যে বসিয়া, পায়ের উপর পা দিয়া, আরামের উপর সুনীতিসম্পন্ন ভাল সামাজিক হইতে পারিলেই, প্লেটোর বর্ণিত মোক্ষকে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই অনুষ্ঠান-পর্ব্বে যে বিষয়গত পার্থক্য, তাহা উভরত জাতীয় প্রকৃতির পৃথকত্ব বিষয়ে অনেকটা পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

২৬। Tim. XVII.

প্লেটো কহেন, ইচ্ছা করিয়া কেহ অসৎ হয় না।[২৭] শরীর, উহার গঠন-উপকরণের স্বভাব হইতে,রোগের আধার হইয়াছে; এবং শারীরিক রোগ হেতু আত্মাও রোগের বশীভূত হইয়া থাকে। শারীরিক রোগ নানাবিধ, কিন্তু আত্মিক রোগ প্রধানতঃ বুদ্ধিবিকার। শরীরকে স্বচ্ছন্দ-রূপে চালাইতে না পারিলে, সেই সূত্রে আত্মিক রোগও উপস্থিত হইয়া থাকে। কুশিক্ষা, কুমতি, মাদকতা, ইত্যাদি আত্মিক রোগ হইতে, অসৎ চেষ্টা ও অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। শারীরিক রোগের ন্যায়, আত্মিক রোগেরও চিকিৎসা আছে; তত্ত্বানুশীলন, ধর্ম্মে মতি, নীতির অনুসরণ, ইত্যাদি আত্মিক রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ উভয়ই।

উপরে বরাবর দেখান হইয়াছে যে,আত্মার ভাব দ্বিবিধ,এক নিত্য ও অপর জননভাব; অথবা এক জ্ঞানাত্মা ও অপর বিজ্ঞানাত্মা। জ্ঞানাত্মার অবস্থান মস্তকে, ইহার দ্বারা মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়। বিজ্ঞানাত্মা দুইভাগে বিভক্ত; যে ভাগ ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন তাহা হৃদয়ে এবং অপরভাগ, যাহা রাগ দ্বেষাদির অধীন, তাহা মস্তকের নিম্ন ভাগে অবস্থান করে। বিজ্ঞানাত্মার দোষেই মানুষ অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। হিন্দুতত্ত্ববিৎ আত্মার যে চতুর্ব্বিধ অবস্থা নিরূপণ করেন, অর্থাৎ বৈশ্বানর, তৈজস্, প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্ম; এথানে তাহার সহিত কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হইতেছে না। প্লেটোর জ্ঞানাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মা,এই দ্বিবিধ আত্মভাবোত্থ কারণের অবলম্বনেই কার্য্যপ্রবাহের উৎপাদন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে এক দিব্য বা নিত্য কারণ, অপর জন্য বা নৈমিত্তিক কারণ। দিব্য কারণ আয়ত্ত করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য (এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে)। প্লেটো কহেন,দিব্য কারণ এক-বারে আয়ত্ত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে বটে, কিন্তু তথাপি মানব সর্ব্বদাই সেই দিকে চেষ্টাবান্ হইবে। অপর জন্য কারণ; ইহার অনুসরণ-ক্রিয়া দিব্য কারণকে অনুধাবন করিবার উপায় স্বরূপ, এ নিমিত্ত মনুষ্য সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করিবে; পরন্তু নিত্য কারণকে আদর্শ

২৭। Tim. LXVIII.

করিয়াই জন্য কারণের দ্বারা সমস্ত পদার্থ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। জন্য কারণ এরূপ দুর্দ্দমনীয় যে পিটাকস্ কহেন যে, স্বয়ং দেবতারাও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না।

পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িকদিগের মতে আত্মা এক, কিন্তু ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে শরীরের ত্রিবিধ স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন। সহজবুদ্ধি ও জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কে এবং চিত্তরূপে হৃদয়ে। সহজবুদ্ধি ও চিত্তরূপ পশ্বাদিতেও বিরাজমান আছে কিন্তু জ্ঞানরূপ নাই, শেষোক্তটি কেবল মনুষ্যতে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মার প্রথম দুইটি বিভাগ ধ্বংসশক্তির অধান, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ যাহা তাহা অবিনাশী। কেবল কোন কোন পীথাগোরীয় ভিন্ন, অতি প্রাচীনকালীয় গ্রীকেরা আত্মার অবিনাশিত্ব বড় একটা বুঝিত না; তাহারা ভাবিত শরীরধ্বংসে বায়ু বা ধূমের ন্যায় আত্মাও, তদ্দণ্ডে বা (কাহারও কাহারও বিশ্বাসে) কিছু কাল নিম্নদেশে বাসান্তে, ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিলীন হইয়া থাকে। ২৮ কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আত্মার অবিনাশিত্ব সর্ব্বপ্রথমে থেলিসের দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং থেলিস্ জড় অজড় সমস্ত পদার্থেই আত্মার কল্পনা করিতেন। আত্মার অবিনাশিত্ব পক্ষে জ্ঞান, সক্রেটিসের সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত এবং গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়।

প্লেটো যে হিন্দুদিগের ন্যায় পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এখন মানুষ কিরূপে কর্ম্মদোষে জন্মান্তরে নর হইতে নারীত্ব, অথবা উত্তরোত্তর আরও ইতর বা পশুযোনি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা দেখাইতেছেন। যে সকল নর ইহজন্মে অসৎ এবং অনর্থক প্রমোদসুখে রত হইয়া কাল কাটাইয়া থাকে, তাহারাই পর জন্মে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মে। যে সকল স্ত্রী এবং পুরুষ, যদিও নিরীহভাবে হউক কিন্তু অনর্থক ও অকার্য্যে, জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে; এবং যাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় মনে করিয়া থাকে যে, দিব্যবিষয় সমস্তও নেত্রগোচর করণ সুসাধ্য; তাহারা পরজন্মে

২৮। Phædo, 39.

বায়ুবিহারী পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানরহিত হইয়া জীবনাতি বাহিত করিয়াছে, তাহারা পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনশ্চ যাহারা অজ্ঞানতায় পূর্ণ হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় জীবন কাটাইয়া থাকে, তাহারা পরজন্মে মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্লেটোর পূর্ব্বে পীথাগোরীয় তত্ত্ববিদেরা পুনর্জ্জন্মতত্ত্বে বিশ্বাস করিত। [২৯] সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল যে, আত্মার আর পুনর্জ্জন্ম নাই; কারণ, তাঁহার বাসনা যে মৃত্যুর পরেও তিনি পরলোকে গিয়া পার্থিব জীবনকালীনের ন্যায়, জ্ঞানমূঢ়দিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সুজ্ঞান প্রদান করেন। [৩০]

এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে প্লেটো কহেন যে, আচারের পবিত্রতা দ্বারা, দেবতার ন্যায় পবিত্র জীবন সংসাধন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ পবিত্রতা যদিও অপরাপর বস্তুর সাপেক্ষবিহীন হইয়া স্বয়ংই সুখের আধার হইতে পারে; তথাপি সেই পবিত্রতালাভের জন্য উপকরণ এবং উপায় স্বরূপ অর্থ, বল, আভিজাত্য এবং যশাদি সাংসারিক বস্তুর প্রয়োজন। প্লেটো স্থানান্তরে বলিয়াছেন [৩১] যে, উচ্চতত্ত্ব যাহা কিছু তাহা কেবল আত্মার সহযোগেই লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু শরীর সে পক্ষে প্রায়ই প্রতিকূলতা করিয়া থাকে, যেহেতু উহাই দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের

২৯। পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক পীথাগোরাস্ সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, পোসিদোন্ দেবের নিকট দিব্য স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া, কোন্ জন্মে কি ছিলেন, তাহা পীথাগোরাস্ এইরূপে প্রকাশ করিতেন;—তিনি বহু পূর্ব্বকালে পোসিদোনের পুত্ররূপে ইথলিদিস্ নামে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাহার কিছুকাল পরে ইউফর্বস নাম লইয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়েন এবং ট্রয় যুদ্ধের যোদ্ধা মানিলসের দ্বারা আঘাতিত হইয়াছিলেন। তৎপরে হার্মেটিমস্ নাম প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে ডিলোস্ নগরে, পিরুস্ নামে একজন মৎস্যজীবী হয়েন। এই জন্মের পরেই, দুইশত সাত বৎসর পরলোকে বাসান্তে, পীথাগোরাস্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩০। Apology of Socrates 22.

৩১। Phædo 29—31.

মূলাধার। যথায় আত্মিক প্রকৃতিতে ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জড়িত, তথায় কথনই সর্ব্বসিদ্ধির প্রত্যাশা করা যায় না; এজন্য তিনি বলেন যে, মনুষ্য কেবল মৃত্যুর পরেই প্রকৃত উচ্চতত্ত্বলাভে সক্ষম হয়। ইহ-জীবনেও তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইতে না পারা যায় এমন নহে; কিন্তু যদি শরীরকে কেবল আবশ্যক মত রক্ষা ভিন্ন তাহার সঙ্গে আর কোন বিষয়ের সংস্রব বা কোন নিকৃষ্ট বৃত্তির সহিত তাহাকে মিলিত হইতে না দিয়া, পরিশুদ্ধ ভাবে তত্ত্বের অনুধাবন করা হয়। এই স্থান দৃষ্টে সহসা যেন এরূপ অনুমিত হয় যে, প্লেটো বুঝি হিন্দুযোগী বা সন্ন্যাসীর ন্যায় কোন এক জীবন কল্পনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তদ্রূপ যোগ বা সন্ন্যাসযুক্ত যে জীবন হইতে পারে, ইহা বোধ হয় গ্রীকের ধারণাতেও কখনও প্রবেশ করে নাই। প্লেটো যাহা এখানে বুঝাইতেছেন, তাহা সমাজ ও সংসারে থাকিয়াই, একটু উচ্চ ধরণের সংযমসাধন মাত্র; এবং সে সংযমনটাও যে কখনও কাহার দ্বারা পালিত হইয়াছিল, এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং প্লেটোর কথাটাকে মতমাত্রে পর্য্যবসিত ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। এই উপরে যাহা বলিলাম, প্লেটোর নিম্নোক্ত উক্তির দ্বারা তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। প্লেটো কহেন, ধন, বল, আভিজাত্যাদি না থাকিলেও যে জ্ঞানী ব্যক্তির সুখী হইবার পক্ষে বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকতা হয়, এমন নহে; যেহেতু যদি তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়মাদি লঙ্ঘন না করেন এবং যখন তাঁহার বিবাহ করণে এবং সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তখন তাঁহার সুখী হইবার পক্ষে বিশেষ বাধকতা কিছুই থাকিতে পারে না।

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনাক্ষগোরাস্ বারেক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, সূর্য্য চন্দ্র আকাশাদির বিষয় চিন্তনই তাঁহার মনুষ্য-জীবন ধারণের উদ্দেশ্য [৩২]। তিনি ধনীর সন্তান হইয়াও, তত্ত্বানুসন্ধানের খাতিরে সামাজিক সুখাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য

৩২। Diog. Lært. Anaxagoras VI.

একবার কোন ব্যক্তি তিরস্কার করিয়াছিল, "তুমি স্বদেশের প্রতি নিতান্তই মায়াশূন্য।" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "দূর মূর্খ, আত্মদেশের প্রতি আমার স্নেহ অপরিসীম;" এই বলিয়া আত্মদেশ নির্দ্দেশ হেতু আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। একদা এক মূঢ় ব্যক্তি, বিদেশে মৃত্যুশয্যায় শুইতে হইল বলিয়া, বহুতর খেদ প্রকাশ করায়; বিরক্তিপূর্ণ বিদ্রূপে অনাক্ষগোরাস্ তাহাকে এরূপ বুঝাইয়াছিলেন, "এত ভাবনা কি জন্য বাপু! নরকের রাস্তা সকল স্থান হইতেই সমান দূর।" থেলিসও একজন ঐরূপ কতকটা নির্লিপ্ত সংসারী ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, যৌবনে ইঁহার জননী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করেন—"এখনও বিবাহের সময় হয় নাই।" আবার যৌবন অতিবাহিত হইয়া গেল, পুনর্ব্বার অনুরোধ করায় উত্তর করেন—"বিবাহের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।" সুতরাং এ জীবনে আর বিবাহ করা হইল না!

গ্রীসীয় প্রায় যাবতীয় তত্ত্ববিদ্দিগের মতে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, তত্ত্ববিদ্যা অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানলাভে জ্ঞানী হওয়া। জ্ঞানীর পক্ষে পিটাকসের উপদেশ—"পরিমিত আচারী হইয়া পুণ্যচেতা হইবে; এবং সত্য, শ্রদ্ধা, চতুরতা, সামাজিকতা এবং শ্রমশালিত্ব লাভ করিবে।" আরিষ্টটলের মতে আত্মিক পবিত্রতা সাধন পূর্ব্বক, জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা সুখী হওয়াই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। সুখী কেবল ত্রিবিধ সতের সাধনে হইতে পারে। প্রথমতঃ আত্মিক সৎ, যথা জ্ঞানাদি; দ্বিতীয়তঃ দৈহিক সৎ, যথা স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্যাদি; তৃতীয়তঃ বাহ্যিক সৎ, যথা আভিজাত্য, যশ, ধনাদি; মানব এই ত্রিবিধ সতের আশ্রয় ভিন্ন, কেবল একমাত্র আত্মিক সতের সহায়ে সুখী হইতে পারে না। আরিষ্টটল বলেন, জ্ঞানী হইলেই যে সাধারণ মানবীয় বৃত্তি সমস্তকে অতিক্রম করিতে পারা যায় এমন নহে; তবে অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানীর পৃথকত্ব কেবল এইমাত্র যে, জ্ঞানীরা সেই সকল বৃত্তি পরিমিতরূপে চালনা করিয়া থাকেন।

জিনোর সাম্প্রদায়িকেরা জ্ঞানীর এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।—
"যাহারা জ্ঞানী তাহারা সর্ব্বদা দেবতার প্রতি ভক্তিসংযুত এবং কখনই তাহারা দেবতার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করে না; তাহাদের জীবনও পবিত্রতায় দেববৎ ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। তাহারা সরল, সর্ব্বদা সৎপথাবলম্বী,কাপট্য-বিহীন ও যে কোন বিষয়ে আড়ম্বর ও মৌখিকতা-শূন্য; তাহারা কখনই কর্ত্তব্যের বিপরীতাচরণ করে না,অথবা নির্ব্বোধের ন্যায় যদৃচ্ছা যে কোন কার্য্যে লিপ্তও হয় না। তাহারা মদিরা পান করে বটে, কিন্তু কখনও তাহাতে মত্ততা প্রাপ্ত হয় না। স্বভাবে ইহারা নির্ম্মল, প্রমোদে পরাঙ্মুখ এবং কখনই সুখদুঃখের দোলায় দোদুল্যমান হইয়া তাহাতে মুহ্যমান হয় না। জ্ঞানীরা পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, সমাজের হিতসাধন, ইত্যাদি কার্য্য দেবনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বোধে, সর্ব্বদাই সযত্নে আচরণ করিয়া থাকে। কথিত আছে, গ্রীকভূমে 'কর্ত্তব্য' শব্দের অর্থ ব্যক্তিকরণ ও তাহার প্রথম প্রচার জিনো হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। ৩৩

প্লেটো প্রভৃতির পুনর্জ্জন্মতত্ত্বে মানব কর্ম্মফলে উচ্চনীচ যোনি প্রাপ্ত হওয়ায়, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত পাপে গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল এবং কর্ম্মানুসারে মানব স্বর্গনরকের ভাগী হইত। পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িকেরা কহিতেন যে, পোসিদোন দেব মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার সংগ্রাহক, পরিরক্ষক এবং পরিচালক; তিনিই, যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুসারে তাহাকে স্বর্গে বা নরকে নীত করেন। প্লেটো তাঁহার ফিড্রোসে ৩৪ রথী এবং অশ্বের রূপকে, আত্মার অধঃ বা ঊর্দ্ধলোকে গমন বা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পুনশ্চ তাঁহার ফিডোতে সক্রেটিসের মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং নরক, উভয়ই অবস্থিতি করিয়া থাকে। পৃথিবীর ঊর্দ্ধস্থ স্থান সমস্ত স্বর্গপর্য্যায়, মধ্যস্থান নরনিবাস, নিম্নস্থান হইতে নরকবাসের আরম্ভ। তথায়

৩৩। Diog. Laert. Zeno 62. জিনোর জন্ম আনুমানিক ৩৫৭ খৃঃ পূঃ; মৃত্যু ২৬৩ খৃঃ পূঃ।

৩৪। Phaedrus 53—62.

মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নীত হইয়া, পাপ বা পুণ্যের ফলভোগান্তে, শত বা সহস্রাদি বর্ষ পরে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা আগে পাপের ফল ভোগ করিয়া, পরে তাহাদের পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে; এবং যাহারা পুণ্যবান, তাহারা একেবারেই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করে। পুনশ্চ, যাহাদের পাপের ভরা পরিপূর্ণ, তাহাদের আর নরক হইতে নিবৃত্তি নাই।

গ্রীকতত্ত্ববিদ্যার সারস্বরূপ প্লেটোর তত্ত্ব-ব্যাখ্যান যথাযথ বিবৃত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার সারস্বরূপ বেদান্তের আভাস প্রদানেও ত্রুটি হয় নাই। শ্রুতিসকলে যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদর্শিত ও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্কলিত সারাংশ মৎপ্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের পরিশিষ্টভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গ্রীকদিগের মধ্যে কি তর্কদর্শন কি তত্ত্ববিজ্ঞান, উভয়বিধ তত্ত্ব-বিদ্যাই বহুশ্রেণীর এবং তাহাদের আলোচ্য বিষয়ও বহুতর এবং পৃথক্ পৃথক্। তাহারা কেবল ধর্ম্ম ও মোক্ষাদি বিষয়ক তত্ত্ব-আলোচনায় পর্য্যবসিত হয় নাই; রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহার, অর্থ, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় নিয়োজিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতে দর্শন নামে বহুতর বিষয় গণিত হইয়া থাকে, যেমন পাণিনির ব্যাকরণ, যেমন রসেশ্বর দর্শন, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ববিদ্যাস্থলীয় যাহারা, তাহারা সমস্তই ধর্ম্ম এবং মোক্ষ, এই দুই বিষয় লইয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা, তাহা সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া, এবং মোক্ষবিষয়ক যাহা, তাহা সাধারণতঃ জ্ঞানকাণ্ড লইয়া। মোক্ষবিষয়ক তত্ত্বগ্রন্থ অনেক, কিন্তু তাহারা যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর হউক এবং যে যত বিভিন্ন পথে প্রস্থান করুক, উদ্দেশ্য এবং শেষ ফল সকলেতেই প্রায় এক; সেই উদ্দেশ্য মোক্ষ এবং শেষ ফল মোক্ষসাধনের উপায় স্বরূপ যোগের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ। উদ্দেশ্য এবং শেষ ফল সকলেতে একবিধ হওয়ায়; হিন্দুতত্ত্ববিদ্যায় কেমন যেন

একটা একঘেয়েপণা আসিয়া যুটিয়াছে। তবে কি না, সে একঘেয়েপণা অপবাদের উত্তরে, হিন্দুতত্ত্বের সপক্ষবাদীরা এই উত্তর করিতে পারে যে, সত্যস্বরূপ যাহা তাহা লোকরুচির খাতির করিতে গিয়া পৃথক্ আকার ধরিতে পারে না; সত্যের আকার এক, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিত্য, সুতরাং সেই সত্য লইয়া আলোচনা করিতে গেলে একঘেয়েপণা কাজেই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সপক্ষবাদীদিগের এই উত্তর কতদূর যে সার্থক বা তদন্যতর, তাহা পাঠকেরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও মতি গতি অনুসারে অবধারণ করিয়া লইবেন।

ভারতে দর্শনপ্রাণ তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে ষড়দর্শনই প্রধান। তন্মধ্যে বেদান্তদর্শন সম্পূর্ণ শ্রৌত ধর্ম্মের আশ্রয়ে এবং অবলম্বনে নির্ম্মিত। শ্রুতিতে যাহা আদেশিত, দর্শনযোগে বেদান্তে তাহাই প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এজন্য শ্রুতির সহযোগে একমাত্র এই দর্শন, ধর্ম্মার্থে দত্তজীবন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত হইয়া থাকে। ৩৫ অপরাপর দর্শনগুলি সম্বন্ধে সেরূপ নহে। তাহাদের সাধনপ্রণালী প্রভৃতি শ্রুতি হইতে কিয়দংশে বা বহুলাংশে রূপান্তরযুক্ত থাকায়, ধর্ম্মগ্রন্থ স্বরূপে প্রায়ই অধীত হয় না। প্রায়ই বিদ্যাগ্রন্থ স্বরূপে অধীত এবং সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাস্থলে কেবল শিক্ষার অঙ্গবিশেষরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ ভক্তিপূর্ব্বকও কথন কথন অধীত না হয় এমন নহে, কিন্তু সে ভক্তি সম্পূর্ণত সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক ভাবে যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক গৃহীত হয়, তাহাদের মধ্যে সাঙ্খ্যদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এ দিকে পুনঃ বেদান্তের নিম্নে, পাতঞ্জলের

৩৫। ভারতীয় তত্ত্বসংসারে বেদান্তদর্শন যতটা প্রভুত্ব করিয়াছে, সাঙ্খ্যের প্রভুত্ব যে তাহা অপেক্ষা কিছু কম তাহা নহে। কিন্তু বেদান্তদর্শনের প্রভুত্ব যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সাঙ্খ্যের প্রভুত্ব সেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। উহা, নাস্তিকতা ভাবের কতকটা আভাস হেতু, প্রকাশ্যরূপে অধিক গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার তত্ত্বপ্রকরণ হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক দেবতত্ত্বের প্রায় অধিকাংশভাগ সাঙ্খ্যতত্ত্বের রূপক। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মসংসারে, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভুত্ব যত বেশী এত বোধ করি আর কাহারও নহে।

যোগমীমাংসা এবং জৈমিনীর ধর্ম্মমীমাংসাও, সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মগ্রন্থস্বরূপে ভক্তিপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া থাকে।

এক্ষণে গ্রাক এবং হিন্দু এ উভয় জাতির তত্ত্ববিদ্যা তুলনা করিলে, স্পষ্টতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীক তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য, জ্ঞানকে সুমার্জ্জিত করিয়া ইহজীবন যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে, তাহার উপায় সাধন করা। ফলতঃ সে বিষয়ে যতটা, পরজীবন বা পারলৌকিক তত্ত্ব নিরূপণ বা মানবজীবনের নিগূঢ় অর্থানুসন্ধানের প্রতি ততটা লক্ষ্য নাই, অথবা তাহাতে পার্শ্বদৃষ্টিমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীকতত্ত্ববিদ্যা, প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহলৌকিক সুখানুসন্ধানতত্ত্ব। তদন্যতর বিষয়ের আলোচনায় যদিও অনেক গ্রীকতত্ত্ববিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে সকল, ইহলৌকিক স্বচ্ছন্দতার সান্নিধ্যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর পদবীপ্রাপ্ত বলিয়াই যেন অনুমিত হয়।

হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা ইহার বিপরীত। গ্রীকতত্ত্ব যেমন পার্থিব স্বচ্ছন্দতার মোহে উচ্চ লোকের সহ বহুপরিমাণে ঘনিষ্ঠতা হারাইয়া, লৌকিক ও সামাজিক বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; হিন্দুতত্ত্ব তেমনি, তদ্বিপরীতে অদৃষ্টশক্তির প্রতি ভীতিহেতু,লোকাতীত বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুতত্ত্বের উদ্দেশ্য এবং বিষয় যদিও অনেকটা একঘেয়েপণায় পরিপূর্ণ, তথাপি উহার তত্ত্বাবর্ত্তে প্রবেশ করিলে, জনে জনে ও প্রস্থানভেদে, কতই বিচিত্র বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। যথায় রামানুজস্বামী নিরূপণ করিতেছেন যে, পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ; সুতরাং দ্বৈততত্ত্ব এবং স্রষ্টা-সৃষ্ট জ্ঞানের বিদ্যমানতা ; শঙ্করাচার্য্য তথায় বেদান্তভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন যে, এই বিশ্ব অদ্বৈত, মহাবাক্য তত্ত্বমসি উহার তত্ত্ব এবং পরিণাম তাহার,—"আমিই শিব," "আমিই শিব ;" এবং প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনও সেই সঙ্গে দেখাইতেছেন যে, "স এবেশ্বরোহহম্।" কণাদের মতে জীবাত্মার গুণ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, যত্ন, দ্বেষ, চিন্তা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

এই কয়টি বিষয় আছে এবং পরমাত্মাতেও ঠিক তাই, প্রভেদ কেবল পরমাত্মায় সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, চিন্তা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই কয়টি নাই। ইহাঁর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র। সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলে, কিন্তু তাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথকত্ব দর্শাইয়া নহে, পুরুষ ও প্রধানের স্বাতন্ত্র্য ও সমসাময়িকতা ও সমস্থায়িত্ব লইয়া। সাঙ্খ্য পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এই জন্য সাঙ্খ্যকে নিরীশ্বর দর্শন বলিয়া থাকে। সাঙ্খ্যের মতে পুরুষ ও প্রধান, এই দুই নিত্য বস্তু এবং ইহাদের সংযোগে সৃষ্টি। পুরুষ এক নহে, বহু অথবা অনন্ত। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, কেবল প্রধানই গুণ ও ক্রিয়াশীলা। প্রধান বা প্রকৃতি, পুরুষে উপগত হইলে, জীব ও জড় সৃষ্টির উদয় হইয়া থাকে এবং পুরুষই, প্রকৃতিজ গুণে আবদ্ধ হইয়া, জীবরূপে প্রকাশিত হয়। পুরুষ অনন্তসংখ্যক হেতু, সৃষ্টিপ্রবাহও অনন্ত। পুরুষ জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতিজন্য সংস্কারবশে পাপপুণ্যের অধীন হইয়া সুখ-দুঃখাদির ভাগী হয় এবং কামকর্ম্মানুসারে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই জীবত্বরূপ বন্ধন হইতে পুরুষের তখনই কেবল মুক্তি সম্ভব, যখন সে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা প্রকৃতি হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। সাঙ্খ্যের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, সাঙ্খ্য বেদান্তেরই একটি শাখাস্বরূপ মাত্র; অনুধাবন করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ পক্ষে তাহাই অনুভূত হয়। বেদান্তের সমষ্টিতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ব্যষ্টিতত্ত্বের উদয়, সেইখান হইতে সাঙ্খ্যের আরম্ভ কল্পনা করিয়া লইলে, বেদান্তের সঙ্গে সাঙ্খ্যের আর বিরোধ ভাগ অতি অল্পই দৃষ্ট হইতে পারে।

জীবাত্মা দ্বৈতবাদীর হউন বা অদ্বৈতবাদীরই হউন, এখন তাঁহার অবস্থা, কর্ত্তব্য ও পরিণাম কি? কণাদ বলেন, জীবাত্মা সুখদুঃখাদির অধীন; এবং সুখ দুঃখাদি আবার ধর্ম্ম বা অধর্ম্মফলে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম, ইহার মতে, তীর্থাদি ভ্রমণ ও যাগাদিকরণ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা হয়; অধর্ম্ম অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা

তাহার অনেকটা ক্ষয় হইতেও পারে। ধর্ম্মের ফল স্বর্গ, অধর্ম্মের ফল নরক। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বা বৈধ ও অবৈধ কর্ম্ম কাহাকে বলে, তৎস্থলে পাতঞ্জলদর্শন শিক্ষা দেন, বেদ অনুরূপ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বৈধ; আর তদ্বিপরীত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম অবৈধ। সাংসারিক প্রবৃত্তি যাহা, তাহা অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই অস্মিতা অজ্ঞানের ফল। এখন যাহা কিছু কর্ম্ম বৈধ বলিয়া আদিষ্ট হইল, তাহাই বা করিতে হইবে কিরূপে?—করিতে হইবে কর্ম্মফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া; কারণ কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পন্ন না করিলে, সে কর্ম্মফল কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট পায়সাদির ন্যায় এবং সে কর্ম্মপরিণাম আরও গুরুতর বন্ধনের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। এ ভাল কথা! বস্তুতঃ লোকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের সাধন এরূপে না করিলে সে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বৃথা। কর্ম্ম সকল যখন লোকহিত, সমাজহিত এবং সংসারের হিতসাধনের জন্য সম্পাদিত হয়, তখনই কেবল তাহাদিগকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে; নতুবা কর্ম্ম আত্মস্বার্থে আচরিত হইলে তাহা সকাম হয়। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত মহলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ অন্যরূপ; অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার বেলা হইবে মানুষ, কিন্তু ফল গণনার বেলায় হইবে জ্ঞান ও বুদ্ধিশূন্য জড়পিণ্ড, কিন্তু তাও কি কখনও সম্ভব হয়? কামনাশূন্য হইলে মানুষে আর মানুষ থাকিতে পারে না। সে যাহা হউক, শাস্ত্রে কর্ত্তব্যবুদ্ধির ধারণা যদিও অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু সম্পাদ্য কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ধারণার প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাহাতে সেরূপ শ্রেষ্ঠতা সামান্য পরিমাণেই লক্ষিত হয়। সে কর্ম্মধারণা বা কর্ত্তব্য কি?—কর্ম্মকাণ্ড-পক্ষে সাধারণতঃ ও সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে, দেবসেবা, যাগযজ্ঞ, দান এবং ব্রত নিয়ম ও উপবাসাদি; বিদ্যা, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, প্রভৃতি এখানে একেবারেই উল্লেখবহির্ভূত হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ড পক্ষে কর্ত্তব্য কি? পাতঞ্জলি বলিতেছেন, কর্ম্মের মধ্যে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ও চিত্তশুদ্ধিকর যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। এই যোগাঙ্গ অষ্টবিধ, যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। পুনশ্চ

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি বলেন দেখ ;—এ জগতে সৎ ও ঈশ্বরের প্রিয়কর কার্য্য তিন প্রকার, অঙ্কন অর্থাৎ গায়ে হরিনামের ছাপের ন্যায় নারায়ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ; নামকরণ অর্থাৎ নিজ পুত্রপৌত্রাদির নারায়ণ-বোধক নামের দ্বারা নামকরণ করিবে, যাহাতে সেই উপলক্ষে দেবনাম সর্ব্বদা মুখে উচ্চারিত হইতে পারে; তৃতীয় ভজন। ভজন তিন প্রকার, কায়িক বাচিক ও মানসিক। কায়িক ভজন আবার ত্রিবিধ, দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ; বাচিক চারি প্রকার, সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়; মানসিক ভজনও তিন প্রকার, দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা।

এক্ষণে উভয়জাতীয় তত্ত্ববিদ্যা, স্ব স্ব প্রকৃতিভেদে, উভয়জাতীয় প্রকৃতিতে কিরূপ ফলের উৎপাদন করিয়াছে, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। যে সাধারণ-হিতচিন্তায় গ্রীক আত্ম বা আত্ম-পুত্র বলি দিতে প্রস্তুত, এবং যে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় গ্রীক মনীষাশক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে; হিন্দুপ্রকৃতিতে সে সকল তদ্রূপ আকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ-হিতচিন্তা বা পরহিত-সাধন,হিন্দুর একটি মুখ্য ব্রত সত্য; কিন্তু সে পরহিতব্রত জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল অতি অল্পই। হিন্দু ব্যক্তিবিশেষের হিতচেষ্টায় যথেষ্ট আগ্রহবান্ বটে, কিন্তু জাতীয় হিত লইয়া যথায় কথা, তথায় তাহাকে উদাসীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রীকের সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা,—বাসনার অতিশয় পূরণ, ইন্দ্রিয়সুখের অতিশয় প্রাপ্তি,অথবা এক কথায় ভোগবিলাসিনী বৃত্তিনিচয়ের অতিশয় স্ফূর্ত্তিতে। হিন্দুও সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা কামনা না করিতেন এমন নহে, কিন্তু তাঁহার সে স্বচ্ছন্দতা অন্যরূপ; বৃত্তি সকলের সংযম দ্বারা তাহা সাধ্য। উক্ত বিষয় দুইটির জাতিদ্বয়ভেদে এরূপ প্রকৃতিভেদ হেতু, কার্য্যমূলও তাহাদের উভয়েতে স্বতন্ত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়; হিন্দু মোক্ষ বা পারলৌকিক সুখপ্রার্থী এবং সাধনা তাহার স্বতন্ত্র বা এককভাবে, আর গ্রীক ইহ-লৌকিক সুখপ্রার্থী এবং সাধনা তাহার সংমিলিত বা জাতীয় ভাবে।

হিন্দু মোক্ষপথে ঘোর স্বার্থবান্, একক, অনাসঙ্গ, এমন কি আপন স্ত্রীপুত্রাদি পর্য্যন্ত স্থান ও অনুষ্ঠান বিশেষে তাহার ভাগী হইতে পারে না; অতএব তাহার তত্ত্ব ও ধর্ম্ম, উভয় বিষয়ক অনুষ্ঠানই, যত একান্তে ও একক ভাবে সম্পন্ন হয়, ততই তাহা অধিক ফলোপধায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল অনুষ্ঠান করিতে হইলে, বৃত্তিগুলির কতক সংযম ও কতক স্ফুরণ আবশ্যক; সুতরাং হিন্দুকে তাহার নিজ প্রয়োজন হেতুই সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রীতিসম্পন্ন এবং পর-হিতব্রতে রত হইতে হইয়াছে। কিন্তু নামে সর্ব্বভূতে হইলেও, কাজে তাহা দাঁড়ায় নাই; যেহেতু এককানুষ্ঠান জন্য, সেই সকল সন্নীতি জাতীয় আকার ধারণ না করিয়া, ব্যক্তিগতভাবেই পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জাতির মধ্যে কি হইতেছে না হইতেছে হিন্দু তাহার খোজ বড় রাখেন না, সে খোজ রাখার ভার রাজার উপর; তিনি ব্যস্ত, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত যে সকল লোক কেবল তাহাদিগকে লইয়া এবং বিশ্বপ্রীতি হেতু, সে সকল লোক কে ও কি জাতি,তাহাতে বড় বিচার ছিল না। অতএব কাজেই বলিতে হইতেছে যে, হিন্দুর তত্ত্ব এবং ধর্ম্মানুসরণপ্রণালীই, হিন্দুর জাতীয় ভাব শিথিল করিবার পক্ষে একটি অন্যতর কারণ স্বরূপ। ইহা যেমন হিন্দুতত্ত্ববিদ্যা ও তদনুসরণের আংশিক ফল বলিয়া অনুমিত হয়; সেইরূপ গ্রীকতত্ত্ব ও তদনুসরণের আংশিক ফলস্বরূপেও দেখা যায় যে, গ্রীকের ভাব অন্য-বিধ। গ্রীকের যে ইহলৌকিক সুখানুসরণ, তাহা সংমিলিত জাতীয় চেষ্টা ভিন্ন পূর্ণভাবে সংসাধিত হইতে পারে না; এজন্য ব্যক্তিগত হিতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতীয় হিতব্যাপারে গ্রীক বিশেষ রত। সম্মুখে উপস্থিত লোক সকল অতিশয় দয়ার পাত্র হইলেও গ্রীক তাহাতে মনোযোগ করে না, কিন্তু একটু জাতীয় অসুবিধার উদয় হইলেই তাহাতে বিপুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকে। গ্রীক ইহা বিলক্ষণ বুঝিত যে, জাতীয় উন্নতি ব্যতীত নিজের কোন উন্নতি সম্পূর্ণাবয়ব হইতে পারে না এবং নিজের কোন উন্নতি করিলেও, জাতীয় উন্নতির

অভাবে তাহা স্থায়ী হয় না। গ্রীক, ব্যক্তিবিশেষের হিতের ভার (সেও যদি স্বজাতি হইত) রাজশাসনের উপর নিক্ষেপ করিয়া, নিজে জাতীয় হিতের নিমিত্ত উত্তেজিত হইয়া ফিরিত। কি ধর্ম্ম্য কি সামাজিক কি জাতীয়, সকল কার্য্যেই, গ্রীক এককানুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বদা বিরুদ্ধবাদী ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইহাদের ধর্ম্মকার্য্যও সামাজিক ও সামাজিকতাবিধায়ক।

উপরে যেরূপ আলোচিত হইল তাহাতে দেখা যায় যে, হিন্দুর হিত-ব্রতের ক্রিয়াস্থলী অতি সঙ্কীর্ণ এবং গ্রীকের ক্রিয়াস্থলী তাহার তুলনায় অতিশয় বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু যেটুকু হিত করেন, তাহা অবশ্য গ্রীকের তুলনায় যে অপেক্ষাকৃত অতিশয় নিঃস্বার্থ ও অহৈতুকী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই হিত জাতীয় অন্বয়ে সাধিত না হওয়ায়, সমাজ তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অকর্ম্মা আলস্যপ্রিয় ও পরকৃত-হিতপ্রার্থীর দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীক সেরূপ অকর্ম্মা শ্রেণী হইতে সর্ব্বাংশে রক্ষিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখনও, সেই সমান কারণের উপস্থিতি হেতু, হিন্দুসমাজ অকর্ম্মা দলের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া ফিরিতেছে। ইহলৌকিক বিষয়ের প্রতি হিন্দু, কিছুমাত্র স্বার্থপর না হইলেও, অনুষ্ঠানদোষে সাধারণ ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনাস্থা হেতু, স্বার্থপরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; আর গ্রীক, সেই সেই বিষয়ে মূলে স্বার্থপর হইলেও, জাতীয়ত্ব পক্ষে নিঃস্বার্থবানের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পুনশ্চ, হিতব্রতে হিন্দুর ক্রিয়াস্থলী সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, জাতীয় হিত ও জাতীয় কার্য্যবিষয়ে যে বিপুল কার্য্যধারণা, তাহাতেও হিন্দুপ্রকৃতি অতিশয় কৃপণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ মহাভারতের ঘটনাবলী ও কৃষ্ণচরিত দর্শাইয়া সে কৃপণতার খর্ব্বতা দেখাইতে উৎসুক। হইতে পারে সে খর্ব্বতা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও, কাগজে তাহা যতটা কাজে কিন্তু তত নহে। গ্রীকের কাগজে যতটা থাকুক বা না থাকুক, কাজে তাহা অনেক। ফলতঃ আত্মবৃত্তির স্ফুরণ ও পরিশুদ্ধিকল্পে যে কিছু অনুষ্ঠান, তাহার অতিরিক্তে হিন্দুর দৃষ্টি বড় চলিত

না। প্রত্যেক ব্যক্তি ধরিলে, হিন্দু অবশ্যই মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং গ্রীকের তুলনে দেববৎ; কিন্তু হায়! সেই দেবত্বসমষ্টিকে একত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে জাতীয় আকার প্রদান করিবার উপযুক্ত যে বন্ধনরজ্জু, তাহার অভাব অতিশয়।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল হিন্দুর অবলম্বিত সেই হিতব্রত, আত্মশুদ্ধিকল্পে যে কিছু অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মার্থে যাহা যাহা সাত্ত্বিক কার্য্য বলিয়া নিরূপিত, সেই সকলের অতিরিক্ত আর যাহা কিছু তাহা হিন্দুর বিশ্বাসে অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞানের ফল; সুতরাং সেই পরিমাণে তাহারা তাচ্ছিল্য বা ঔদাসিন্যের বিষয়। শৈবদর্শনমতে ভোগ, সাধন, কলা, কাল, নিয়তি, রোগ, প্রকৃতি ও গুণ ইত্যাদি তত্ত্বের বশীভূত জীব যাহারা, তাহারা অপক্কপাশদ্বয় শ্রেণিবিশিষ্ট; ইহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ মহেশ্বর সংসারকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। হিন্দুতত্ত্বের শেষ নিরূপণ, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" অন্তে কর্ম্মমাত্রের নির্ব্বিশেষ ধ্বংস। বেদান্ত আদি যাবতীয় দর্শনেরই ঐ শিক্ষা। কণাদ ঋষিরও ঐ কথা; শ্রুতি পুরাণাদি দ্বারা আগে কর্ম্মসাধনান্তে আত্মার স্বরূপ ও গুণাদি পরিজ্ঞাত হওনানন্তর, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ ব্যতীত, মুক্তির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানমার্গে উত্থানের পূর্ব্বে সকল তত্ত্বশাস্ত্রই কর্ম্মকাণ্ডের অবশ্যপালনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ সে কর্ম্মকাণ্ড কি তাহা দেখিতে গেলে, তাহা প্রায়ই একপিণ্ড আতপ চাউলের অন্ন আপনার উদরে এবং আর এক পিণ্ড দেবোদ্দেশে দানের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। এতদতিরিক্তে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে যে তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে একরূপ লাঠালাঠি করিয়া করা হয়। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা নিজে কিছু মন্দ নহে, বরং আর সকল জাতির তুলনে, উহাকে সর্ব্বোৎকর্ষময়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু লোকসংসারে সাধারণ হিন্দুর তুল্য তত্ত্ববিদ্যার এমন অবসন্নকারী অর্থকারক ও মর্ম্মগ্রাহক আর কোথাও নাই। অর্থগ্রহফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে মোক্ষই নিত্য, আর তিনটি অস্থায়ী ও অসার; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রধানতঃ মোক্ষলাভেই যত্ন করা উচিত। উৎসন্ন-মুখ ভারতে, ফলেও তাহা দাঁড়াইয়াছে; অথবা তাহারই ফলে ভারত উৎসন্ন-মুখ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের আদি ও সত্ত্ববান্ শিক্ষক যাঁহারা যাঁহারা, তাঁহাদের শিক্ষা প্রকৃত ওরূপ নহে; তাঁহাদের শিক্ষা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এ সকলই সমভাবে সঞ্চয় ও সকলেরই সদ্ব্যবহার করিতে শিখ। কিন্তু যে যে লৌকিক ও প্রাকৃতিক কারণসমূহের সমাবেশে ভারতে হিন্দুচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সে সামঞ্জস্য-সাধক সুশিক্ষা বহুদিন অনুসৃত হইবার কথা নহে। যে ভীতিতে মানবচিত্ত ভারতীয় প্রকৃতিমূর্ত্তিদর্শনে প্রথমে আকুলিত হইয়াছিল,সেই ভীতিই কালে দুর্দ্দমনীয় মোক্ষের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়া মানবকে একমাত্র মোক্ষপ্রয়াসী করিয়াছিল। ধর্ম্ম অর্থ কামে এখন জলাঞ্জলি, ঘরে বাহিরে সকল স্থানে একমাত্র মোক্ষই প্রধান প্রয়াসপদার্থ। হিন্দুসন্তান কেবল মনের সাধে মোক্ষের চিন্তা করিয়াছেন; এবং পদে পদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ছায়াবাজী, কিছু নহে—কিছু নহে। উহাতে লিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, উহার সংস্রব পর্য্যন্ত থাকিলে আর মোক্ষের প্রত্যাশা করিতে পারিবে না। অতএব হিন্দুসন্তান কায়মনে একমাত্র মোক্ষেরই আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। এই আলোচনা করিতে গিয়া, ইহলোকেত তাঁহার দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই; ঈশ্বর করুন, পরলোকেও যেন তাঁহার সেরূপ দুর্দ্দশা না হয়। এত আগ্রহের মোক্ষচেষ্টা যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ফলবান্ হয়!

গ্রীকতত্ত্ববিদ্যা লৌকিকবিষয়প্রাণা ও আধিভৌতিকগুণপ্রধানা; হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা তদ্বিপরীতে অলৌকিকবিষয়প্রাণা ও আধ্যাত্মিকগুণ-প্রধানা। গ্রীকমনীষাশক্তি পারলৌকিক বিষয়ে একে সংকীর্ণ আয়ত্তে আবদ্ধ, তাহাতে আবার মতামতের দৌড় সম্বন্ধে হিন্দুর ন্যায় সম পরিমাণে স্বাধীনতা অনুভব করিতে পাইত না; এজন্য গ্রীকতত্ত্ববিৎ,

তত্ত্বপথে যতই ধাবিত হউন না কেন, শেষে আসিয়া জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রায়ই বিশ্রাম লাভ করিতেন। হিন্দুর আয়তনও প্রশস্ত এবং স্বাধীনতাও অনেক। হিন্দু তত্ত্বপথে, রীতিনীতি, অর্থ, লোকব্যবহার, লোকধর্ম্ম, কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং তাহাদিগকে একটুমাত্র প্রতিকূল দেখিলেই স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, একেবারে দিগ্বিদিক্‌শূন্য হইয়া ধাবিত হইয়াছেন। সম্মুখে শাস্ত্রীয় দেববংশাবলীতে বাধা পড়িল এবং তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে হয়; কিন্তু হিন্দুতত্ত্ববিৎ তাহাতেও প্রস্তুত। অবলীলাক্রমে চলিত শাস্ত্রবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া, দেববংশকে অতিক্রম পূর্ব্বক, নানাবিধ অপূর্ব্ব ও অভিনব মতাদিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহাতে পূর্ব্বস্থ লোকরুচি, লোকপ্রবৃত্তি, এবং লোকের ধারণাশক্তির অপেক্ষা অল্পই রাখা হইল। লোকে অবাক হইল এবং নূতন মতাদি বুঝিতে ও তাহা আয়ত্ত করিতে পারিল না; সুতরাং সেই সকল যথাকথিতভাবে কখনই সাধারণ লোকবর্গের মধ্যে গৃহীত ও অনুসৃত হইল না। অথচ লোকে, সেই সকল দৃষ্টে ও তাহাদের তত্ত্বাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া, মোটের উপর এইটুকু মাত্র অনুভব করিল যে তাহাদের নিজ অনুসৃত অর্থকামাদি অকিঞ্চিৎ-কর; পুনঃ তাহাদের বিস্ময়-আপ্লুত বিশ্বাসে এই তত্ত্ববিদেরা মহাজন; তাহার পর "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ," এ কথার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি উভয়ই অতি সহজ। সুতরাং ইহারাও, দেখা দেখি, লৌকিক বিদ্যা ও অর্থাদিতে আস্থাশূন্য হইয়া, তত্ত্ববিদ্‌দিগের প্রদর্শিত উচ্চপথ বাহনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল; এ দিকে কিন্তু সে পথ ধারণার অতীত বলিয়া দূরগম্য, কাজেই তাহার বিকৃতিসাধনপূর্ব্বক তাহাকে আত্মসমতায় আনিয়া, অভীপ্সিত লাভ হইল বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইল যে এক দিকে নিশ্চিত বিষয় যাহা, তাহা হস্তচ্যুত হইতে লাগিল; অন্য দিকে অনিশ্চিত বিষয়ত লাভ হইলই না, অধিকন্তু অনিশ্চিতের অনিশ্চিত—তাহার বিকার মাত্র হাতে আসিয়া সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। কোন বিষয় একেবারে না পাওয়া যায় সে ভাল, কিন্তু তাহার

বিকার ভাব পাওয়া কখনই ভাল নহে। না থাকাতে তত দোষ নাই, যত বিকৃত ও কদর্য্যভাবে থাকায় দোষ আছে। অতএব জন কয়েক প্রকৃত তত্ত্বশীলকে বাদ দিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাদের আধ্যাত্মিক পথে একরূপ দুকূল দুষ্ট হইল বলিতে হইবে। এই দুষ্টতা জন্য হিন্দুচরিত্র কার্য্যতঃ অনিশ্চয়, অস্থিরপদ; যে কোন বিষয়ে আসক্তি ও দার্ঢ্যতা-শূন্য। হিন্দুসন্তান যদি বা কখনও বহু আড়ম্বরে ও বহু আসক্তিতে কোন কার্য্য বা কার্য্যচিন্তায় রত হইলেন, এমন সময়ে সহসা মনে উঠিল,—'মরিতে হইবে', অমনি তাহার সকল বন্ধন ঢিলা হইয়া পড়িল, সকল আসক্তি অবসন্ন হইয়া আসিল; ইহাই হিন্দুচরিত্রে নিত্য দৃশ্য। কি শোচনীয় দৃশ্য! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এমন রত্নপ্রসবিনী ভারত, তথাপি ইহাতে এমন ব্যাখ্যাকারক আজিও জন্মিল না যে তত্ত্ববিদ্যাসমূহের সদ্ব্যাখ্যা পূর্ব্বক, হৃদয়গ্রাহী ও ফলোপধায়ক ভাবে এরূপ শিক্ষা দিতে পারক হয় যে,ইহজীবনের যে কোন প্রকারের কার্য্যই হউক না কেন,সংযত ও সাত্ত্বিকভাবে সম্পাদিত হইলে, তাহা সর্ব্বদাই পরমপুরুষার্থের অংশ কলারূপে সহায়তা করিয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্যার অসদ্ব্যাখ্যান বা ভ্রান্ত অনুভূতি, যাহারই ফলে হউক, ক্ষুণ্ণ শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে আর একটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে;—ইহা তাহাদিগকে ঘোর অদৃষ্টবাদী করিয়া তুলিয়াছে। এ কথার উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু ক্ষুণ্ণ শিক্ষিতগণ লইয়াই প্রধানতঃ সমাজ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের অবলম্বিত যে অদৃষ্টবাদ, তাহা বড় বিকৃত ও অনিষ্টকারী, প্রকৃত শাস্ত্রীয় নির্দ্দোষ অদৃষ্টবাদ নহে। একে হিন্দুর ঘরে বাহিরে ছন্নছাড়া বিকৃত মায়াবাদ, তাহার উপরে আবার এই দূষিত অদৃষ্টবাদ; একে মায়াবাদে রক্ষা নাই, তাহার উপরে আবার এই অদৃষ্টবাদের চাপাচাপি! মায়াবাদও অদৃষ্টবাদের ন্যায় এই তত্ত্ববিদ্যারই বিকৃত ব্যাখানের ফল। অতি শোভনীয় প্রাসাদস্থলী হইতে কৃষকের ক্ষেত্র বা রাখালের মাঠে পর্য্যন্ত, যেখানে যাইবে, সেইখানেই দেখিবে বিকৃত মায়াবাদ ও দূষিত অদৃষ্টবাদ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সবাই

কহিতেছে এ সংসার কেবল মায়ার কাণ্ড; সবাই বলিতেছে, আমার সুখ দুঃখ, কর্ম্ম অকর্ম্ম, কর্ম্মণ্য অকর্ম্মণ্যভাব, সকলই অদৃষ্টবশে ঘটিতেছে; তাহার উপর আমার শক্তি কি, যাহা করাইতেছে আমি কেবল তাহাই করিয়া যাইতেছি;—চেষ্টায় আবার ফল কি, অথবা এ মায়াময় সংসারে বেশী আড়ম্বর করারই বা প্রয়োজন কি? পুনঃ, তাহা কয়দিনের জন্য? বলিতে কি, বাঞ্ছারাম, এমন অবসন্নকারী বিশ্বাস আর এ জগতে হইতে পারে না; এবং ইহা মানবকে যতদূর অকর্ম্মণ্য করিতে সক্ষম, বোধ করি তেমন আর এ জগতে কিছুই নাই। ইহা কথায় বলিয়া আর কি করিব; নিত্য নিত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিজনে, প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে ইহার ফল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, তাহার উপর আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে কোথায়? আমার নিজ প্রতিবেশিবর্গের মধ্যেই এই অদৃষ্টবাদের চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। অনাহারে, অনুচিত ক্রিয়ায়, ইহারা ও ইহাদের আশ্রিত পরিবারবর্গেরা নিত্য ক্লেশে, নিত্য ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতেছে; ইহারা স্বচ্ছন্দে দেখিতেছে এবং কি দেখিতেছে তাহাও বুঝিতেছে, তথাপি তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্নগ্রহণ করিতেছে না। শৃগালকুকুরের জীবন অতিবাহিত করিবে তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি উপায়ের জন্য ঘরের বাহির হইবে না; আরও আশ্চর্য্য, উপায় হাতে তুলিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না! এক অদৃষ্ট দেখাইয়া, উপায় অনুপায়, সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, সকলেরই নিবৃত্তি সাধন করিয়া থাকে। বলিতে কি, দেখিয়া শুনিয়া, উপায়ের অযাচিত সংগ্রাহক এবং দাতা যিনি, তাঁহাকে বরং অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখে ফিরিয়া আসিতে হয়। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মনুষ্যবুদ্ধি জ্ঞানের আধার হইয়াও এতটা আত্মসংহারক হীনাবস্থায় নামিতে পারে! ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি যতটুকু স্থানের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দর্শনে এরূপ চিত্র দেখিয়া খেদান্বিত হইতেছি; বোধ করি প্রত্যেক দর্শক দৃষ্টিচালনা করিলে সর্ব্বত্রই এইরূপ চিত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার পক্ষে অসম্ভাব হইবে না। নিশ্চয়ই বাঞ্ছারাম, ভারত অধঃপতনের শেষ

সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে! এখন হইতে কি তবে এ চিত্রের পরিবর্ত্তনের আশা করা যাইতে পারে না?

ভারতীয় তত্ত্ব এবং ধর্ম্মবিদ্যায় যে মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা অতি উন্নত ও পবিত্র তত্ত্ব। মায়াবাদ পরমেশ্বরের শক্তিলীলা এবং অদৃষ্টবাদ পুরুষকার ও কর্ম্মের উত্তর পরিণতি। এ মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, মায়াবাদে ধার্ম্মিকতা এবং অদৃষ্টবাদে পুরুষকারের বৃদ্ধি করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতের পোড়াভাগ্যে ফল ফলিয়াছে উহার বিপরীত। মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদ উভয়ই অতি প্রাচীনতত্ত্ব; বেদে উহা উল্লিখিত, উপনিষৎকর্ত্তাদিগের দ্বারা স্থাপিত এবং দর্শনকর্ত্তাগণের দ্বারা উহা মীমাংসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ, যথা পুরাণাদি, সেই দার্শনিক মীমাংসাসমূহের রূপক লইয়া প্রায় অধিকাংশ পরিমাণে গ্রথিত। এক্ষণে সমাজমধ্যে এই পুরাণাদি অভিনব শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের আধিপত্যই সর্ব্বেসর্ব্বা; সুতরাং জ্ঞানী হইতে অজ্ঞানী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদের কথা কিছু না কিছু চালাচালি হইয়া গিয়াছে। বিষয় দুইটি যেমন উচ্চ, তেমনি যদি উচ্চশ্রেণীস্থ জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেবল উহা আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আর কোন ক্ষতিই ছিল না। কিন্তু দারুণ অজ্ঞানী পর্য্যন্তে উহা চালিত হওয়ায়, সর্ব্বনাশের সূত্ররূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যে যেরূপ জ্ঞান-পর্য্যায়ের লোক, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব দিলে, সে তাহার বিকৃতি-সাধন পূর্ব্বক আপন সমতায় না আনিয়া ক্ষান্ত হয় না। মায়াবাদ ও অদৃষ্ট-বাদ সম্বন্ধেও সেই দশা ঘটিয়াছে। যে অপরমুখীন তত্ত্বগ্রন্থি, মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ ছন্ন এবং বিকৃতিবিশিষ্ট হইলেও, বহু পরিমাণে তাহাদের সমতা সাধনে সক্ষম হইত, তাহা ইহাদের কাছে একেবারে শূন্য। অতএব একে ইহাদের মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ ছন্ন ও বিকৃত, তাহাতে আবার সে সকলের শিক্ষা একমুখী মাত্র; সুতরাং কেন না তাহাতে নানা অনিষ্টের উৎপাদন হইতে থাকিবে? ইহাদের শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তাহা দেখ, একে মায়ার শিক্ষা—এ সংসারে সমস্তই অনিত্য এবং অকিঞ্চিৎকর;

তাহার উপর আবার অদৃষ্ট শিক্ষা দিতেছে যে কোন মঙ্গলের আয়োজন করিতে বা অমঙ্গলের বেগ ফিরাইতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা, যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। যে দিন ভারতে এরূপ বিকৃত তত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবন, সেই দিন হইতেই ভারত উৎসন্নমুখ। উহারই জন্য প্রধানতঃ ভারত উৎসন্ন গিয়াছে, এবং এখনও যাইতেছে। এখনও কি সময় হয় নাই, বিধাতঃ, এখনও কি কাহাকে পাঠাইবে না, যে এই বেগ ফিরাইয়া অধঃপাতিত ভারতকে পুনর্ব্বার উর্দ্ধমুখ করাইতে সমর্থ হয়? আসল মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ হইতে তাহাদের বিকৃত রূপকে পৃথক করিবার জন্য, শেষোক্তকে নিম্নে বিকৃত শব্দের দ্বারা বিশেষণযুক্ত করা হইল।

ভাল তোমার এ বিকৃত অদৃষ্টবাদে আছে কি? আইস বাঞ্ছারাম, আমরা এই সুযোগে স্ব স্ব জ্ঞানযোগ মত একটু তাহা দেখিয়া লই। আমি একবার একজন ঘোর অদৃষ্টবাদীকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাহার অদৃষ্ট পড়িয়া বলিলাম, তোমার অদৃষ্টে লেখা আছে যে, আমি তোমাকে এই উচ্চতট হইতে পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিব, আইস তবে তোমাকে ফেলিয়া দিই; তাহাতে সে অদৃষ্টে নির্ভর করিতে ও সম্মত হইতে পারিল না। কেবল ইহা নহে, তদ্রূপভাবাপন্ন অপারপর বিষয়েতেও অদৃষ্টপাঠে অদৃষ্টবাদী আপন অদৃষ্ট দেখিতে পায় না; দেখিতে পায় সে কেবল যখন কোন মহৎ বা শ্রম ও কষ্টসাধ্য কার্য্য সে করিতে পারে না বা করিবে না অথবা যেখানে আলস্যে গা ভাসান দেওয়ায় বাধা জন্মে। অতএব এ বিকৃত অদৃষ্টবাদিত্বে যে কিছু গোল আছে, তাহা ইহা দ্বারা আপনিই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিকৃত অদৃষ্টবাদকে ক্ষণেক স্থগিত রাখিয়া, আগে বিকৃত মায়াবাদের বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক; যেহেতু প্রথমোক্তটি কিয়দংশে শেষোক্তের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ও তত্ত্বগ্রন্থোক্ত মায়াবাদ অতি উন্নত পদার্থ এবং তাহার ব্যাখ্যানভাগও এমন কূটতর যে, অতি প্রশস্ত ও প্রখর বুদ্ধি না হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণও অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন; তাঁহাদের বিচক্ষণতার

একটা প্রধান পরিচয় এই যে, কে কেমন অধিকারী, কাহার পক্ষে কি উপযুক্ত এবং কোনটাই বা কাহার পক্ষে অপকারী হইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা একের পক্ষে যাহা উপকারী, অন্যের পক্ষে এমন কি তাহার পরিচয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই কারণ হেতু, মায়াবাদেরও আলোচনা ও অনুষ্ঠান এমন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে সাধারণ সংসারস্থলীতে, সংসারস্থলীর নিজের চেষ্টা ও দোষ ভিন্ন, তাহার প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। এই জগৎ ও জগতস্থ বিষয় সমস্ত মায়িক সৃষ্টি, সুতরাং অনিত্য এবং ভ্রমদৃশ্য বটে, কিন্তু সে অনিত্যতাদি কাহার তুলনে?—অনন্ত সচ্চিদানন্দ পুরুষ যিনি তাঁহার! পুনশ্চ, মায়িক সংস্কারের অতীতে সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক, ইত্যাদি সমস্তই অলীক বলিয়া ব্যাখ্যাত;—কিন্তু বাপু বাঞ্ছারাম, একবার মনে কর দেখি, অনধিকারীর পক্ষে এই সকল কি ভয়ঙ্কর কথা এবং উহা সর্ব্বনাশের মূল স্বরূপ হয় কি না? ঋষিরাও এ কথা না বুঝিতেন এমন নহে। বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহারা, মায়িক সংস্কারের অতীত তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান যাহা, তাহার নাম জ্ঞানকাণ্ড এবং সংস্কারাধীন তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান যাহা, তাহার নাম কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং এই ও অপরাপর সাধারণ বুদ্ধির বিপ্লবকারী বিষয় সম্বন্ধে ইহাও শাসন করিতে ত্রুটি করিলেন না যে, অত্যুচ্চ শাস্ত্র যে সকল, তাহার অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান, উভয়ই সংস্কারাচ্ছন্ন অল্পজ্ঞানীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এখন বুঝিবে কি যে, এই নিষেধ উপকারী কি অপকারী এবং উহা স্বার্থপ্রণোদিত কি তদন্যতর? এখনকার দিনে অনেকের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই ওরূপ উচ্চ শাস্ত্রাধ্যয়নাদি নিষেধ করিয়াছিলেন!

এখন জ্ঞানকাণ্ড পালনীয় কাহার পক্ষে?—যাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসাবলম্বী; যাহারা সংস্কারাতীত অত্যুচ্চ সৎস্বরূপ পদবীতে আরূঢ়; যাহাদিগকে আর কোন সন্দেহ, সংশয় বা কিছুতেই ঈশ্বরানুগত পথ হইতে

বিচলিত করিতে পারে না। সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড পালনীয়,—সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ জ্ঞানমাত্রসম্বল সংসারাবলম্বীর পক্ষে; তাহাদের সমক্ষে এই সৃষ্টি মায়িক ও মিথ্যা নহে, উহা যথাদৃষ্টবৎ সত্য এবং জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সৃষ্ট-স্রষ্টা সম্বন্ধও অনিবার্য্য; সুতরাং ইহার মধ্যে মায়িক অনিত্যতা আদি, জ্ঞানসঙ্গত ভাবে স্থান পায় না এবং যদি বা জোর করিয়া স্থান পাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা স্থানানুরূপ আত্মবিকৃতি না করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। লোক সকল যদি স্বীয় স্বীয় সংস্কার ও মতিগতি অনুসারে চলিত এবং সংস্কার অতিক্রমে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত, সংস্কারাতীত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না চাহিত, তাহা হইলে আর কোনই গোল বা অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু মানুষের ক্রমোন্নতি-বিষয়িণী আকাঙ্ক্ষা সে কথা বড় বুঝে না, এজন্য তাহা কখনও কখনও সামঞ্জস্যচ্যুতিতে অযথা প্রধাবিত হইতে পাইয়া বিষম গোল বাধাইয়া বইসে। কার্য্যতঃ মায়িক ধারণা ও তদনুষ্ঠানের সামর্থ্য না থাকিলেও, অনায়ত্ত ব্যাখ্যান ও ভাক্ত জ্ঞান এ উভয়কে অবলম্বন পূর্ব্বক, মানুষ মায়িক অনিত্যাদি বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সেই বিকৃতবুদ্ধিফলে এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে তদ্দ্বারা চেষ্টা এবং পুরুষকার উভয়ই প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়, উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল কার্য্যে মানুষ ভগ্ন-পদ হইয়া গিয়াছে এবং জীবনেরও প্রতি সম্ভবাতিরিক্ত মমতা বৃদ্ধি হইবাতে, জীবনান্তপণে করণীয় যে সকল জাতীয় হিতকর কার্য্য তাহা দূরে পলায়ন করিয়াছে। এক কথায়, মনুষ্যপ্রকৃতি দারুণ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মায়াবাদ ভারতে পূর্ব্বাপরই আছে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা কোন অনিষ্ট করে নাই আর ইদানীং তাহা করিতেছে; ইহার কারণ, ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে জ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহাদের শাসনও অক্ষুণ্ণ ছিল; আর এখন তাঁহাদের সে জ্ঞানও কমিয়াছে এবং শাসনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। ৩৬

৩৬। বোধ করি, এই বিকৃত মায়াবাদকে নিন্দা করিবার জন্যই পদ্মপুরাণে এরূপ উক্ত,—

সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় করিয়াই জগৎ এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে, জ্ঞানকাণ্ড-আশ্রয়ীর পক্ষেও কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যজনীয় নহে। পুনশ্চ, উপরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মাত্মকদৃশ্যে এই সৃষ্টি যথাদৃষ্টবৎ সত্য; সুতরাং এই জগতে অনিত্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিবার বিষয় কিছুই নাই। অনিত্যতা বুদ্ধির নিকট কর্ত্তব্যবুদ্ধি তিষ্ঠে না, কর্ত্তব্যবুদ্ধি না থাকিলে যথার্থ কর্ম্ম যাহা তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে; অথচ কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে কর্ম্মের দ্বারাই এই জগৎ পরিচালিত হয়। অতএব তোমার অনিত্যতা বিষয়ক বুদ্ধি, কর্ম্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বড়ই গর্হিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্ম্মদৃষ্টিতে জগৎও মিথ্যা নহে এবং বিষয়ও কোনটাকে অনিত্য বলিতে পারা যায় না। অনিত্য তাহাকেই বলা যায়, যাহার পূর্ব্বতন তত্ত্ববিদ্দিগের নির্দ্দেশিত জন্ম বৃদ্ধি ও ক্ষয় ত আছেই, অধিকন্তু যাহা ক্ষয় হইলে সর্ব্বপ্রকারেই অস্তিত্বশূন্য হয় অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বকালীন নিক্ষিপ্ত উত্তেজন অথবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উত্তর ফল প্রভৃতি পশ্চাতে কিছু না থাকে; এবং পূর্ব্বে যাহা গত হইল ও তাহার উত্তরে যাহা আসিতেছে, যদি তাহাদের মধ্যে সসম্বন্ধ ভাব না থাকে; এবং পূর্ব্বে গত বিষয়ের দ্বারা যদি উত্তরে আগত বিষয় বিশেষণবিশিষ্ট না হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহার কিছুই হয় না।

বাঞ্ছারাম, তোমার সম্বন্ধে বহিঃপ্রকৃতির অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ভাব, তুমি তোমার নিজ পূর্ণ অহঙ্কারবোধের বশ্যতায় কিরূপ উপলব্ধি করিয়া থাক; এবং তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কেবল সেই জন্য, বাহ্যজগৎ তোমার নিকট কিরূপ মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; অগ্রে একবার তাহার অলোচনা করিয়া দেখ। বায়ুভরে কুসুমগন্ধ আসিতেছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি, অতএব উহারা আছে। ঐরূপ রূপ, ঐরূপ রস, ঐরূপ শব্দ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ইত্যাদি না থাকিত, তাহা হইলে উহাদের অস্তিত্ব থাকিত

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্॥"

কোথায় ? আমাদের যদি অন্যেতর-বোধশক্তি না থাকিত, তবে তোমার বৃক্ষ,পত্র,পশু,পর্ব্বত,সমুদ্র, শিলা, এ সকল ভিন্নতা-জ্ঞান কোথায় রহিত ? ভিন্নতাবোধক আমার বোধশক্তি ও আমি যাই আছি, তাই উহারা আছে ; আমি না থাকিলে উহারাও থাকিত না। অহঙ্কারপূর্ণ ও আত্মসম্বন্ধসূত্রে পদার্থদ্রষ্টা ভ্রান্ত তত্ত্বদর্শিমাত্রে ঐরূপ ভাবিয়া থাকে, এবং উহারই কল্যাণে নানাবিধ মোহজাল বিস্তার করিয়া আপনা আপনি তাহাতে আবদ্ধ হয়। ভাল, এখন জিজ্ঞাস্য, উহারা যদি ছিল না এবং পরেও যদি না থাকে, তবে তুমি যখন নিঃসহায়, নিরুপায় শক্তি-সঞ্চালন-বিমূঢ়, বিবেকশূন্য, এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলে, তখন তোমার অবলম্বন কি হইয়াছিল; এবং যখন আবার যাইবে, তখনই বা তোমার অবলম্বন কি হইবে ? কার্য্যমাত্রের পক্ষে কারণ যেমন অচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য্য, অস্তিত্ব বা উৎপত্তি বা ক্ষয়াদির পক্ষে অবলম্বন পদার্থও সেইরূপ অপরিহার্য্য জানিবে। এই অবলম্বন পদার্থের মধ্যবর্ত্তিতা হেতুই, জীব ও মানবের বৈরাজতত্ত্ব সহ যে মহৎ সম্বন্ধ, তাহার সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব তুমি থাক বা না থাক, উহারা ছিল এবং থাকিবেও। ভাল, তুমিই কেন না ছিলে, বা থাকিবে না ? তবে থাকিবে না কি ?—রূপবৈচিত্র-আয়ত্তক তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিই, তুমি মহাবিরাটের অংশ হইলেও, তোমাকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; উহার প্রভাবে তুমি অন্য সকল হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া ভাবিতেছ; উহার প্রভাবে তুমি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর যাবতীয় বিষয়ে মানদণ্ডরূপে আপনাকে কল্পনা করিতেছ এবং যেন সেই সকল প্রাগল্ভ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপেই, সেই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিবশে আবার স্ববুদ্ধি-নিরূপিত সুখদুঃখাভিঘাতে মুহ্যমান এবং পরিমেয় বস্তুর ভাব সকলের দ্বারা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছ।

এখন একবার তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া দেখ, বহিঃপ্রকৃতি বা বাহ্যজগৎ বস্তুতঃ কিরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। এখন যদি সত্য সত্যই তোমাকে খুন না করিয়া, কেবল তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং

সেই সংজ্ঞাপ্রদায়ক তোমার চিত্তশক্তিমাত্র হরণ করিয়া, আর সমস্ত তোমার যেটা যেমন বজায় রাখিয়া, বাহ্যজগতাদির প্রতি অবলোকন ও তাহা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহাতে কিরূপ ফল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা ? কি বলিব, বলিতে পারিতেছি না; হৃতসংজ্ঞায় বলিবার 'বলনই' নাই যেখানে, সেখানে কি বলিব? সত্য কথা! তুমি কি করিয়া বলিবে, তোমার দোষ কি? তোমাকে কিরূপ হইয়া দেখিতে বলিতেছি তাহা অবশ্য অনুভব করিয়াছ ?— বাহ্যজগৎ+(তুমি—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাদায়ক চিত্তশক্তি)। পাটীগণিত পড়িয়াছ, তবে এ অঙ্ক না বুঝিবে কেন ?

ভাল! তুমি বলিতে না পার, আমি দেখিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। আমি তুমি হইয়া দেখি, বা তুমি আমি হইয়া দেখ, এ স্থানে তাহা একই কথা; কেবল এইমাত্র মনে রাখিও, কোথায় দাঁড়াইয়া এবং কিরূপ সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়া দেখিতেছ। এখন দেখ, বাহ্যজগৎ হইতে সংজ্ঞা এবং তৎপ্রদায়ক চিত্তশক্তি হরণ পূর্ব্বক উঠাইয়া লইলে রহিল কি? নামশূন্য অপার রূপরাশিমাত্র; এবং যেমন দেখিয়া আসিলে, তুমিও, কেবল তোমার চৈতন্য ও চিত্তশক্তি বাদে, সেই অপার রূপরাশির অপৃথক অংশ! বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, সমুদ্র, শিলা, এবং তোমার তুমিত্ব বাদে তুমি, সেই মহান্ রূপরাশির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গবৈচিত্র বিশেষ। রূপরাশি বৈচিত্রময়, সচঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল। ঐ যে পর্ব্বতসানু, ঐ যে বনভূমির গর্ভদেশ, উহাতে কত নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত, কাহারও অঙ্কুর, কাহারও প্রাদুর্ভাব, কাহারও বিলয় এবং তাহাতে আবার অপরের আবির্ভাবের সূত্রপাত কতই যে হইতেছে,তাহা তুমি যদিও দেখিতে পাইতেছ না,তথাপি তাহা হইতেছে। তিল তিল করিয়া হইতেছে, অদৃশ্য ভাবে হইতেছে; যখন দৃশ্য হইবে, তখন যদি দেখিবার জন্য কোন চক্ষু থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে, সে কার্য্য কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব! যদি যুগারম্ভে এবং যুগের অন্তে,তোমারও দেখিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমিও দেখিতে পাইতে যে,

রূপ-বৈচিত্রের কি দারুণ তরঙ্গ কালমূল হইতে আরম্ভ করিয়া কাল-অন্ত-মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কাল এবং শক্তির সংমিলনে রূপের প্রচার। জলবাষ্পে সৌরকর-সংযোগে মেঘহৃদয়ে ইন্দ্রধনুর সঞ্চার দেখিয়াছ, এরূপ রূপরাশির সঞ্চারও অবিকল তদ্রূপ না হউক, সেই রকমের বটে;—কিন্তু এ কথা ব্যাখ্যেয় নহে, অনুভবনীয় মাত্র। বিষয় যত গুরুতর ও গাঢ় হয়, ততই তাহা বাক্যের অতীত হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, রূপ বস্তুবিশেষের বাহ্য-প্রচার মাত্র, স্বয়ং বস্তু নহে। অতএব রূপরাশিকে অতিক্রম করিয়া চল, যে বস্তুর উহা বাহ্যপ্রচার তাহার অনুসন্ধান কর। কই, দেখিতে পাইলে?—কাল এবং শক্তির সংমিলন ভাব। সংমিলনও সম্পূর্ণ বস্তু নহে, সাহচর্য্যে উহা বস্তু। অতএব উহাও অতিক্রম করিয়া আইস, দেখ এখন কি আছে,—কাল এবং শক্তি! তাহাই। এখন বুঝিলে, যাহাকে তুমি বাহ্যজগৎ বলিয়া থাক, তাহা রূপ-প্রচার, কালহৃদয়ে শক্ত্যাভাসে এই রূপ-প্রচার সংঘটিত হয়; যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া থাক তাহা শক্তি; যাহাকে আশ্রয় বলিয়া থাক, তাহা কাল; যাহাকে আধার বলিয়া থাক, তাহা দেশ; যাহাকে কর্ম্ম বা রূপ-বৈচিত্র সংঘটন বলিয়া থাক, তাহা কালসংমিলনে শক্তির গতিমাত্র। এই কাল ও শক্তি সাংখ্যকারের হাতে পড়িয়া পুরুষ ও প্রধান; এবং তন্ত্রকারের হাতে পড়িয়া মহাকাল ও মহাকালীরূপে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্য-কারের নীরস পুরুষ ও প্রধান হইতে, বঙ্গগৃহে কালীমূর্ত্তিটি বড় সুন্দর দেখি, ও দেখিতে বড় ভাল বাসি। আর্য্য ঋষি অনেক দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া, কোথাও স্থির ভাবে বসিতে স্থান না পাইয়া, বহুশ্রমবিধ্বস্ত হইয়া, অবশেষে এই কাল ও কালীকে অবলম্বন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমলরজতশ্বেত সহাস্য-আস্য স্থির নিশ্চল প্রশান্তমূর্ত্তি মহাকাল, পদতলে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে নিপতিত। উপরে উপগতা, নৃত্য-সচঞ্চলা, মেঘবরণা, বরাভয়-খর্পর-মুণ্ডহস্তা, এবং "শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চী হসন্মুখী, ঘোররাবা মহারৌদ্রী

শ্মশানালয়বাসিনী” রূপে মহাশক্তিরূপা শ্যামা বিরাজিত। উর্দ্ধকেশা, উন্মত্তা, উন্মাদিনী, বেগভরে আমূলজগৎ কম্পিত,—স্বর্গে সূর্য্য, পাতালে ভুজগাধিরাজ! কিন্তু স্থিরবক্ষ সহাস্য-আস্য সেই মহাদেব কেমন স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছেন। যে দিকে দেখ, সর্ব্বত্রই সেই মহাকাল-ময় জগৎসংসার; সর্ব্বত্রই বক্ষ সমানভাবে পাতিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং, এ অঘোর নৃত্যে নর্ত্তকীর পদচ্যুতিজনিত সৃষ্টিবিশৃঙ্খলের সম্ভাবনা নাই। তোমার সাংখ্যকারের পুরুষ ও প্রধানের ন্যায়, তন্ত্র-কারের এই মহাকাল ও মহাকালী নিরস নির্ম্মম জড়জটিল আত্মসর্ব্বস্ব নহেন; ইহাঁরা উভয়েই আবার আপন ইষ্টবিশেষকে জপিয়া থাকেন; অথবা গুণকর্ম্মাতীতে ইহাঁদিগকেই স্বয়ং ইষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাত না করি কেন,—“অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাঞ্চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং” এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে? এখন বলিতে পার, সেই ইষ্ট কি?

বিস্তারবৈচিত্র, অনন্ত বহুল হইলেও, ক্রমসংকোচে সংমিলিত হইয়া অন্তে যথায় বিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই বিন্দুই কি তবে সেই “যস্য প্রভাবমতুলং ভগবান্ অনন্তব্রহ্মাহরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ” এবম্ভূত অনন্ত মহিমাপূর্ণ ইষ্টমূর্ত্তি? সেণ্ট আগষ্টিনের উক্তি—‘যে বিন্দু বিশ্বচক্রের সর্ব্বত্রই মধ্য-বিন্দুরূপে বিরাজিত, তাহাই ঈশ্বর।’ বলিতে পার, আমাদের এ বিন্দুও কি সে সেই মধ্যবিন্দু? বলিতে না পার, ভাবিয়া দেখ; যতক্ষণ বলিতে না পার, ততক্ষণ এ কথা আর তুলিও না, এ কথা আর কহিও না। এই বিন্দুরূপী মহান্ মূল হইতে যে কামনা-প্রবাহ ছুটিয়াছে, কামনায় সেই প্রবাহ-গুণই মহাশক্তি। এই মহাশক্তির আভাসব্যাপ্তি, মহাকাল। মহাকালের বিস্তার-বিকাশে দেশ। মহাশক্তি এই তাহার আত্মাধারভূত মহাকালের সহ সংমিলনে, তদবলম্বনে বেগবতী হইয়া চলিয়াছে। তবে কি এই জন্যই, তান্ত্রিক ঋষি সকাম ব্রহ্ম-চৈতন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির প্রসূতিরূপে মহাশক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাকেই আবার সেই মহেশ্বরের পরিণীতারূপে স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন? কি গূঢ় গুহ্য, কি দুষ্কর তত্ত্ব! আর্য্য ঋষি ভিন্ন এ গূঢ় গুহ্য উদ্ভেদ করিয়া তত্ত্ব উদ্ঘাটন আর কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? আর্য্য ঋষি! পিতৃ-দেবতা! তোমাকে শত শত নমস্কার।

কাল অনন্তব্যাপ্ত এবং নিশ্চল। তদবলম্বনে মহাশক্তি প্রবাহিত। অনন্তমূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, অনন্ত পথে, অনন্ত বেগে, অনন্ত অন্তে ছুটিয়া যাইতেছে। আশ্রয়ভূত কাল অনন্তব্যাপ্ত, সুতরাং দুর্দ্দম-গতিতেও আধাররূপী কালচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। এই অনন্ত গতিবশে প্রতি-মুহূর্ত্তে, অথচ পূর্ব্ব ও পর মুহূর্ত্ত সহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে, কাল সহ শক্তির নিত্য নূতন সংমিলনে, নিরবচ্ছিন্ন নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রের সঞ্চার। গতির বিরাম নাই, সুতরাং নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রেরও বিরাম নাই। এ বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতেছ, স্থূল নেত্রে যাহা কিছু নয়নগোচর হইতেছে, সকলেই সেই শক্তিস্রোতে নিরবচ্ছিন্ন ভাসিয়া যাইতেছে; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে; অথবা তাহাই বা বলি কি জন্য, শক্তিস্রোতে তাহারা ধারা প্রতিধারা ইত্যাদি মাত্র। ঐ যে বৈঠকের উপরে সুন্দর বাঁধা হুকাটি দেখিতেছ, ঢাকাই শিল্পকৌশলে একটি স্ফীতগণ্ড ব্যাঘ্র হাঁ করিয়া, ছাগ বা মনুষ্যশিশুর অভাবে, একটি কুসুমশিশুর মাথা ছিঁড়িতে উদ্যত; ভাবিতেছ যে উহাকে যেমন দিব্য হুকাটি বসাইয়া রাখিয়াছি, উহা তেমনই দিব্য হুকাটি রহিয়াছে; শক্তি-স্রোতের ত কোন চিহ্নই দেখি না, রূপেরই বা রূপান্তর কই? কিন্তু নির্ব্বোধ! তুমি যতই বল, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, তুমি যে সকল দেখিতে না পাইয়া উপহাস করিতেছ, তুমি দেখিতে পাও বা না পাও, তথাপি জানিও, যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। তুমি যতক্ষণ ধরিয়া এই কয়টি কথা কহিলে, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে যে, ইহারই মধ্যে ব্যাঘ্রবিক্রম সমেত তোমার বাঁধা হুকাটি শক্তিস্রোতে কতদূর ওতপ্লুত ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রত্যয় না হয়, আর এক কার্য্য কর, তোমার ঐ বাঁধা হুকাটি যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে পঞ্চাশ বৎসর ঘরে চাবি দিয়া ফেলিয়া

রাখ, একবারও উঁকি দিয়া দেখিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে ঘর খুলিয়া হুকাটি যেমন অবস্থায় দেখিবে বলিও; তখন আবার তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বাক্যালাপ ও বাক্‌চাতুরী করা যাইবে।

ফলতঃ এই বিশ্বের প্রতি বারেক সযত্নে অবলোকন করিয়া দেখ। পরমাণুটি হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কপিণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থ সচল, সকলেই নিরবচ্ছিন্ন গতিবশে অনন্তমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। শান্তি নাই, বিরাম নাই, সেই একই মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ যে লোক আসিতেছে, লোক যাইতেছে, কাপড় কিনিতেছে, কাপড় ছিঁড়িতেছে; ভাত হইতেছে, ভাত পচিতেছে; এ সকল কি? সেই সেই বস্তুর সেই অবিশ্রান্ত গতিক্রিয়ামাত্র। কালসমুদ্রজলে জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণেক উঠিতেছে, ক্ষণেক ডুবিতেছে। এই জলবুদ্বুদবৎ যখন যাহা ভাসিয়া উঠিতেছে, তখন তাহা আমরা ভাত, কাপড়, বা যে কোন সংজ্ঞাধারী বস্তুরূপে তাহাদিগকে অবলোকন; আবার যখন ডুবিতেছে, তখন তাহাদিগকে ধ্বংসরূপে দর্শন করিয়া থাকি! অপার-ভ্রমণক্ষেত্রবিহারী ভ্রাম্যমাণ ধূমকেতু সদৃশ, এই বিশ্বরঙ্গভূমে বারেক মাত্র তাহারা নয়নসমক্ষে সমুদিত হইয়া, অবিলম্বে আবার স্বীয় গতিবশে নয়ন-অতীতপথে বিলীন হইয়া যাইতেছে; আর কখনও নয়নসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে কি না, কে বলিতে পারে!

বৈচিত্র হইতে বৈচিত্রান্তর প্রবর্ত্তনে, পূর্ব্ববৈচিত্রের যে ভিত্তিভাবে পরবৈচিত্র মধ্যে অপলোপ হয়, তাহাকেই আমরা আমাদের চলিত ভাষায় ধ্বংস বলিয়া থাকি। তবে ধ্বংস কি বস্তুতঃ ধ্বংস? বাঞ্ছারাম, কখন কোন বস্তু ধ্বংস হইবার সময় জ্ঞানচক্ষুতে কি তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার ভাল করিয়া দেখা উচিত। দেখিতে পাইবে, কোন বস্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর, ধ্বংসমুখে পতিত হইবার নিমিত্ত যেখান হইতে তাহার অবনতিপ্রাপ্তির সূত্রপাত হইয়াছে; ঠিক সেইখান হইতে, তাহার গাত্র-উদ্ভূত ও গাত্র-সংলগ্নভাবে, আর

একটি বস্তু সমুদ্ভূত হওয়ার সূত্রপাত হইয়া চলিয়াছে। পূর্ব্ব বস্তু ক্রমেই উত্তরোত্তর যেমন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত ও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে; উত্তর-বস্তুও তেমনি ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ব বস্তুর ক্রম-সঙ্কীর্ণতা হেতু পরিত্যক্ত স্থান অধিকার পূর্ব্বক, স্বীয় মধ্যাহ্ন যৌবনমুখে চলিয়া আইসে। উত্তর-বস্তু ক্রমে ক্রমে, তিল তিল করিয়া, যত দূরে আসিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল;, পূর্ব্ববস্তুও ঠিক ততদূরে ক্রমে ক্রমে, তিল তিল করিয়া, উত্তর বস্তুতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকনয়নে ধ্বংসপ্রাপ্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। যেখানে পূর্ব্ব-বস্তুর এই অপলোপ এবং উত্তরবস্তুর পূর্ণতা দৃষ্টি করিলাম; ঠিক তাহার অব্যবহিত পরে বা সেইখান হইতেই, সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত উত্তর-বস্তুর কোলে আবার এক নূতন উত্তরবস্তুর সঞ্চার;—প্রথমোক্ত উত্তরবস্তু, আবার সেখান হইতে পূর্ব্ববস্তুত্ব ভাব পাইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে চলিল। একের বিকার ও ধ্বংসে অপরের উদয় হয়, মৃত্যু ও জন্মের যুগপৎ একত্র সমাবেশ;—এ বিশ্বসংসারের এইই গতি! যে দিকে দেখিবে, ইহাই প্রতি মুহূর্ত্তে অভিনয় হইয়া আসিতেছে। অতএব এখন জিজ্ঞাসা করি, ধ্বংস কি বস্তুতঃ ধ্বংস? রূপবৈচিত্র হইতে রূপবৈচিত্রান্তর গ্রহণ বা পূর্ব্ব-বস্তু উত্তর-বস্তুতে ঢাকা পড়িয়া তাহার ভিত্তিরূপে পরিণত হওনকে যদি ধ্বংস বল, তবে তাহাই। নতুবা বস্তুতঃ ধ্বংস কোথায়? পদার্থমাত্রের, প্রাণিমাত্রের, ইহাই ক্ষয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অনন্তমূর্ত্তি জগৎসংসার, অনন্তগতিযোগে ও অনন্ত প্রকারে তাহার রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ এবং বস্তু হইতে বস্ত্বন্তর সংঘটন; তাই তুমি সকল সমভাবে দেখিতে পাইতে ও মিলাইয়া লইতে না পারিয়া গোলে পড়িয়া থাক। কিন্তু তুমি গোলে পড়িয়া থাক বলিয়া, প্রকৃতির ক্রিয়া ও তাহার নিয়মে কখনও ব্যতিক্রম ঘটনা হইতে পারে না।

মহাকালপথে গম্যমান্ মহাশক্তিবশে আবর্ত্তনশীল পদার্থনিকরে, নিরন্তর স্থানান্তর কালান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে তাহাদের নিত্য নবগুণবিকার উপস্থিত হওয়ায়, নিত্য নবরূপবৈচিত্র সংঘটিত হওয়ার

সম্ভাবনা হয়। গুণবিকারই লোকনয়নে ধ্বংস বা অসৎ; এবং রূপ, অস্তিত্ব বা সৎ। উপরে রূপবৈচিত্রসঞ্চারের যে নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করা গিয়াছে, এরূপেই তাহার আধিভৌতিক ও বহিঃপ্রচার হইয়া থাকে। রূপ সৎ বলিয়াই, রূপ এবং রূপাত্মক যাবতীয় বিষয় অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যাংশ ও শুভাংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। 'রূপ' এবং 'বিকার', এই ভাবদ্বয়, ইহারাই আধিভৌতিক জগতে বিষয়ভেদে ও বস্তুভেদে, শুভাশুভ, আলোক অন্ধকার, দিবারাত্র, বসন্ত শিশির, উন্নতি অবনতি ইত্যাদি। বাঞ্ছারাম, তুমি যে মনোহর বাসন্ত সমৃদ্ধি-পরিপূরিত প্রদোষকাল দেখিয়া সুখানুভব করিতে করিতে, আবার পরক্ষণেই তদ্বিপরীত মেঘ বিদ্যুৎ বজ্রঘটা ঝড় জল দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া কাঁপিতেছিলে, তাহা কি? তোমার সেই সুখময় প্রদোষ এবং তাহার পরক্ষণেই তন্নাশক সেই ঝড় জল, ইহারা এই সর্ব্বজনীন অসৎ ও সতের প্রকারান্তর অভিনয়মাত্র; বস্তুভেদে, বিষয়ভেদে, ভিন্নরূপ দেখাইতেছিল, তাই তাহাকে চিনিতে পার নাই। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ তখন চিনিতে না পারিয়া থাক; ভাল, এখন একবার দেখ দেখি চিনিতে পার কি না। কিন্তু আর এক তামাসা দেখিয়াছ এবং উপরেও তাহা আভাসিত করিয়াছি যে, যে অসৎকে, যে অশুভ বা যে অবনতিকে, আমরা সাধারণতঃ অসৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি; এবং যাহা স্মরণ করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ বশতঃ মোহমুগ্ধ হইয়া থাকি, কখন কখন বা কতই বিলাপ-ব্যাকুলিত হই; তাহা পরিণামে সত্যসত্যই তদ্রূপ বিলাপ বা অনুতাপের বিষয় নহে। যেহেতু, সদুদয়েরই তাহা পূর্ব্বসূত্র এবং কথা আছে না, অসৎ হইতেই সতের উদয় হইয়া থাকে? ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, মহাশক্তি অগ্রগামিনী হইয়াই চলিতেছে,পশ্চাৎ হটিতেছে না; সুতরাং পূর্ব্ব অবস্থা হইতে উত্তর অবস্থায় যে গমন, সেই গমনকে অগ্রস্থিত বা উচ্চ অবস্থায় গতি এবং উন্নতিশালী বলিয়া বলা যায়। পুনঃ, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের মধ্যে যে অন্তরতা, তাহার অতিক্রমক্রিয়াই গুণবিকারভাব বা অসৎ; অতএব অসতের

পরিণাম যাহা, দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত পক্ষে তাহাই উচ্চে গতি বা সৎ; এবং যে অবস্থার যখন যাহাকে আমরা হ্রাস বলিয়া গণনা করিতেছি, সে অবস্থার তখন তাহা কার্য্যতঃ তজ্জাতীয় উচ্চপথে গতিক্রিয়ামাত্র। দেখ তবে এখন, অসৎও বড় কম আদরের বস্তু নহে; অসৎ অভাবে উন্নতির সংসার অচল হইয়া যায়।

এখানে যখন সদসতের কথা উঠিয়াছে, তখন আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। আধিভৌতিক জগতের সদসৎ দেখিয়া ভাবিও না যে, আধ্যাত্মিক জগতের বা আত্মিক সদসৎও তদ্রূপ। ভূত পদার্থ দেশ-কালাদির অধীন, আত্মপদার্থ তাহার অতীত। অথবা ভূত পদার্থের মূল-উৎপাদক ও পরিচালক যে প্রাকৃতিক শক্তি, জীবের স্বেচ্ছাশক্তি তাহার সঙ্গে সমশ্রেণীর; সুতরাং স্বেচ্ছাশক্তি ভূত পদার্থের অনেক উপরে এবং অনেক উপরে বলিয়াই,জীব সকল জড়জগতের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়। এখন দেখ,শক্তির সদসৎ ভাব কি হইতে পারে? শক্তির যখন একমাত্র পরিচয় ও কার্য্য গতিশীলতা, তখন তাহারই ব্যতিক্রম বা তদন্যতরে অসৎ বা সতের সম্ভাবনা হয়। অতএব, শক্তির যথাপথে গমনে সৎ এবং তদন্যতর বা অযথা পথে গমনে অসৎ বলা যায়। শক্তির গতিশীলতার ফল কার্য্য। সুতরাং তাহার যথাপথ বা সুপথগমনে সুকার্য্য হয়, আর বিপথ গমনে কুকার্য্য বা অকার্য্য এবং অকার্য্য হেতু সুকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। এই অকার্য্য এবং অকার্য্যজন্য সুকার্য্যের ব্যাঘাতে আত্মিক অসতের সঞ্চার হেতু, মানবে পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং ইহারই নিমিত্ত মানব "স্বর্গনরকাদির" ভাগী হয়। যেমন মহাজ্ঞান হইতে মহাশক্তি চালিত হইতেছে, তেমনি মানবীয় জ্ঞান হইতে স্বেচ্ছাশক্তি চালিত হইয়া থাকে। এই কারণে, মানব সেই শক্তির সুপথ বা বিপথ গমনের নিমিত্ত দায়ী হইবায়, পুণ্যবান্ বা পাপী হইয়া থাকে;—প্রাকৃতিক শক্তি মহাজ্ঞান হইতে চালিত হওয়ায়,বস্তুতঃ তাহা তজ্জাতীয় অসদ্ভাবপরিশূন্য। তথাপি যে আমরা প্রকৃতিতে অসৎ (অর্থাৎ বিকার বা ধ্বংস) দেখিয়া থাকি এবং যে অসতের বিষয়

অব্যবহিত পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহা বস্তুতঃ রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহণে মধ্যবর্ত্তী অবস্থার সংজ্ঞাবিশেষ মাত্র। তাহাকে অসৎ বলিয়া বিবেচনা করার আরও এক বিশেষ কারণ এই যে, জীবের ভৌতিক ভাগ, প্রকৃতির অংশভূত হওয়ায়, যথাপরিমাণে সেই বিকারে বিকারভাগী হয়; এবং জীবের চৈতন্য অংশ, তাহার ভৌতিক ভাগসহ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিধায়, সেই বিকারে ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। সাম্যাবস্থাতেই চৈতন্যের সুখ, বিকারে দুঃখ এবং দুঃখই সাধারণতঃ অসৎ-পরিণাম বলিয়া গণিত হয়।

এখন বলা বাহুল্য যে, উক্ত প্রাকৃতিক অসৎ যাহা তাহা কেবল বহ্বায়তন ও ক্রিয়া দুৰ্দ্ধর্ষতা হেতু এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-গ্রাহিতার ভাব হইতেও,যেন যথার্থ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই অসতেরই উন্মাদে, সাধারণ জ্ঞানিবর্গ হাতাকাতা ছাড়িয়া নানা রূপে উন্মাদিত হইয়া আসিতেছেন। একটা কাঁকুড়ে তিন লক্ষ বিচী হইয়াছে, দুইটার মাত্র চারা হইল, কিন্তু আর সকল ধ্বংস হইয়া গেল; এরূপ কেহ বাঁচে কেহ মরে, কেহ পাকে কেহ ফুলে, এ তরবতর সদসৎ লীলা খেলার কারণ?—ভাবিয়াই আকুল! ইহাদের মতে যে কয়টা বিচীর চারা হইল, তাহাই সার্থক ও সতের কার্য্য; যাহা নষ্ট হইল তাহা অসার্থক ও অসতের কার্য্য। এই সদসদের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ আনেন আহুরমজ্‌দ ও অংগ্রৈমেনু, কেহবা ঈশ্বর ও শয়তান; কেহ বলেন সৎ ও অসৎ দুইটি নিত্য সত্তা আছে এবং তাহারাই এ সংসারে নিরন্তর একাধিপত্য করিয়া থাকে। কেন বাপু, এত কল্পনা এত গোলযোগ! তোমারও ত প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজনে কত ভাঙ্গ ও কত গড়। তোমার যেমন, প্রকৃতিরও সেইরূপ প্রয়োজন থাকায় বাধা কি? মনে কর, প্রকৃতির ঘরে একটা নূতন পুতুল তৈয়ার হইবে, তাহার মসলার নিমিত্ত দুই কম তিন লক্ষ কাঁকুড়ের বিচীর বিকার হইতে প্রস্তুত মৃত্তিকার আবশ্যক;—আবশ্যক কিছু অদ্ভুত বা অসম্ভব

নহে, তোমারও কলম বাঁধিতে ত নানা রকমের মৃত্তিকার দরকার হইয়া থাকে। আমার বাগান, আমার শ্রম, তিন লক্ষ বিচী তৈয়ার করিতেছি, দুইটি বা তাহার মধ্যে পুনরুৎপত্তির জন্য রাখিতেছি, বাকি মাটি করিয়া লইতেছি, তাহাতে তোমার মাথাব্যথা এত কেন? শয়তান,শনি, মায়ার ধন্দ অথবা জরথুস্ত্রের অংগ্রমইন্যু বা ইংরেজ মিলের অসৎ-তত্ত্ব, ইহাদেরই বা মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যকতা গণিয়া থাক কি জন্য? তাই ভাল জিজ্ঞাসা করি, এখন একবার তোমার নিজের কাজ দেখিলে ভাল হয় না কি?—পরের খোঁজে (যখন উন্মাদ বই হও না) উন্মাদ না হইয়া, নিজের সদসতের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেইত ভাল হয়। বলা বাহুল্য যে,মানবীয় শক্তিচালনেও,শক্তিধর্ম্মানুসারে,প্রকৃতি সহ সমজাতীয় অসতের কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব অপরিহার্য্য; তবে কিনা তাহা সঙ্কীর্ণতা ও বহুলাংশে আয়ত্তাধীনতা হেতু সচরাচর বড় একটা গণনায় আইসে না। যাহা হউক, আমরাও লোকাচার অনুসরণে ভাক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতিক অসৎকে শুদ্ধ অসৎ বলিয়াই সংজ্ঞাযুক্ত করিয়া যাইব; হয়ত তজ্জন্য প্রবন্ধোত্তরদেশে সদসদ্‌বোধের জ্ঞান লইয়া কিছু জড়তা ঘটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু বাঙ্গারাম, সে জড়তা হইতে আসল পদার্থ উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে না কি?

এখানে আরও একটা কথা উঠিতেছে যে, তবে কি এ জগতের—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, প্রাকৃতিক তাবৎ বিষয়ে উন্নতি বা শুভই সর্ব্বস্ব; অবনতি বা অশুভ যাহা তাহা স্বপ্ন? শুভ হইতে শুভান্তর উচ্চে নীত হওনার্থ গতিক্রিয়ার নাম যদি অশুভ হয়, তবে অশুভ শব্দ সম্বন্ধে আমাদিগের যে ভয়ভাব আছে, তাহা কি অলীক এবং অকারণ? তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই যে অশুভ দেখিতেছি, ইহা আমাদের ভেদ ও খণ্ড দৃষ্টিতে যতই অসুখকর ও বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া অনুভূত হউক না কেন, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে এখন যেন উহা প্রার্থনীয় বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের কাম সঙ্কল্প ও দৃষ্টি, সমস্তই সীমাবিশিষ্ট; তাই অনন্তায়ত বিষয় বুঝিতে না পারিয়া নানা গোলযোগ উপস্থিত

করিয়া থাকি। এখানে তুমি হয় ত তদ্রূপ উন্নতির অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকারে বলিবে যে মনে কর, একটা জাতি একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল; তাহার সে স্থলে উন্নতির সম্ভাবনা রহিল কোথায়?—বিশ্ব-নিয়মে উন্নতি কিছু বন্ধ থাকিবে না; তবে কি না এখানে তাহা ব্যক্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত সংসারে আবরিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। ইহা জানিও; নদীতে স্রোতোবেগের প্রবলতা হেতু অনেক ধারা বিপরীতগামী হইলেও, মোটের উপর সমস্ত ধারাই সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। তাই তবে এখন দেখিয়া বল দেখি যে বর্ণিত অশুভের অস্তিত্ব না থাকিলে,উন্নতি অভাবে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও সৌন্দর্য্য-শূন্য হইয়া যাইত কি না? কিন্তু নিয়ন্তা যিনি তিনি মঙ্গলময়,তাঁহা হইতে তাহাও কি কখনও সম্ভব হয়?—মঙ্গলময় মহা-উৎস হইতে যাহার উৎপত্তি সে মহাশক্তি যেরূপেই গতিশীলা হউক না কেন,তাহা কি কখন অমঙ্গলময়ী হইতে পারে, না তাহা হইতে অমঙ্গলময় অবনতি বা অশুভ ফল ফলিতে পারে? মঙ্গলময় মনীষা হইতে অমঙ্গলময় কামনার সম্ভাবনা কোথায়? তুমি ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধিগুণে আপনাপনি কখন কখন মানুষ ঘুচিয়া বানর সাজিতে পার, কিন্তু নিয়ন্তার নিয়মপথ অবলম্বন করিলে কখনই সেরূপ পারিবে না। সে নিয়ম ধরিয়া চলিলে, তোমার উচ্চ হইতে উচ্চতর মনুষ্যত্ব বা উন্নতি পথে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

রূপ এবং বিকার, এতদুভয়ের মধ্যে 'রূপ' কি নিকট কি দূর উভয় সম্বন্ধে অনাগত অনন্ত কার্য্যসমষ্টির জনক, সুতরাং ইহার সত্তা অনন্ত; 'বিকার' তাহা নহে, যেরূপ রূপ প্রবর্ত্তিত করিতে উহা উপস্থিত, তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হয়,সুতরাং ইহার সত্তা অন্ত। মানবীয় অন্বয়ে ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ,—রূপ নিত্যই, উত্তর কার্য্যরাশির কল্পনা-মূর্ত্তি অর্থাৎ মানস-শরীর নির্ম্মাণার্থে, নিজ স্বরূপোত্থ ভাবময় উপকরণ সকল যোগাইয়া যাইতেছে; কিন্তু বিকার তাহা যোগায় না অথবা ঊর্দ্ধ সংখ্যায় মানস-শরীরনির্ম্মাণে, ত্রুটিবোধের কারণস্বরূপ হইয়া, সাবধান মাত্র করিয়া

দেয়। যাহা হউক, নিরন্তর সেই অনন্ত ও অন্ত, রূপ ও বিকার, অথবা উৎপত্তি ও ধ্বংস সংঘটনে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া; তদুভয়ের যুগপৎ সমাবেশ হেতু অথবা যুগপৎ জন্মমৃত্যু অভিনয়ের দ্বারাই, এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি উত্তরগামিনী ও উন্নতিশালিনী হইয়া প্রবাহরূপে পর পর প্রকাশমান হইয়া আসিতেছে। বৈদান্তিক মায়াবাদও, প্রবাহরূপে এই সৃষ্টির (সুতরাং সৃষ্টিস্থ বিষয় সকলের) অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া থাকে; পুনঃ উক্ত বৈদান্তিক শিক্ষা অনুসারেই, সংস্কারাধীনে এই অনন্তত্বজ্ঞান একেবারে অপরিহার্য্য। ফলতঃ এই প্রত্যক্ষ অনন্তমূর্ত্তি এবং তাহার অনন্ত ক্রিয়াপ্রবাহ ও ক্রিয়া-পরিণাম সম্মুখে দেখিয়াও, যে তাহাকে অনিত্য জ্ঞানে উদ্যমশূন্য হয়, তাহাকে বিষম ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! তবেই দেখ, তুমি অন্তস্বরূপ বিকারের দ্বারা অনন্তস্বরূপ রূপকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া এবং বিকারের ক্রিয়া-তেজে বিমূঢ় হইয়া, রূপ ও রূপময়ী সমস্ত জগৎকে অনিত্য জ্ঞানে, তাহাকে উন্মাদবৎ উপেক্ষা পূর্ব্বক কেবল আত্মনাশ ও সকলনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছ। ধ্বংসক্ষয়াদির অধীন হইলেও, যাহা ভূত বিষয়ের উপর পদ স্থাপন করিয়া উদ্ভূত এবং যাহা ভবিষ্যতের উৎপাদক ও উত্তেজক স্থলীয় হয়; সুতরাং যাহা উভয়মুখেই অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ সর্ব্বদা অটুটভাবে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাকে কখনও অনিত্য বলা যাইতে পারে না।

যেমন বলিলাম, এইরূপেই ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয় সহ অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ রক্ষায় রূপোৎসারণে রূপান্তরের উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ, এই সংসারে অনন্ত ও অন্ত এতদুভয়ের প্রভাবোৎপন্ন দুইটি গুণ নিরন্তর কার্য্য করিয়া যাইতেছে এবং সেই কার্য্যফলে এই জগৎ। প্রথমটি পুরুষগুণ, দ্বিতীয়টি স্ত্রীগুণ। পুরুষগুণ সত্তা, স্ত্রীগুণ তদন্যতর ও বিকার। সত্তা রূপ, বিকার ধ্বংস বা লোপ। ধ্বংস এবং লোপ, অন্বয়শূন্য হইলেই, রূপে প্রকৃত অনিত্যতা আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা অন্বয়শূন্য নহে; ধ্বংস —একের অপরে পরিণতি এবং লোপ,—এক অপরের ভিত্তিরূপে পরিণত

হওন। অতএব রূপ এবং রূপপ্রবাহ, সুতরাং জগৎস্থ পদার্থ সকল, অনিত্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। তাই আবার বলি, জগৎ সত্য; তোমার অবলম্বিত মায়াবাদ ও অনিত্যতাবুদ্ধি মিথ্যা। আর সেরূপ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উদ্যমশূন্যে আত্মনাশ ও সকল নষ্ট করিও না।

তোমার অবলম্বিত অদৃষ্টবাদও তদ্রূপ। লোকে যেমন ধ্বংসলোপাদি-ক্রিয়ার প্রভাবদৃষ্টে ভ্রমান্ধতাবশতঃ রূপের অনিত্যতা কল্পনা করিয়া এবং বৈদিক মায়াবাদের বিকৃত ধারণায় মুগ্ধ হইয়া অনিষ্টভাগী হইয়াছে; সেইরূপ প্রাকৃতিক ক্রিয়াশক্তির প্রভাবদৃষ্টে, দৃষ্টিভ্রমবশতঃ স্বেচ্ছাশক্তি অর্থাৎ পুরুষকারের অভাব কল্পনা করিয়া, অদৃষ্টবাদে মুহ্যমান হইয়া নানাবিধরূপে অনর্থোৎপাদন করিতেছে। বৈদিক অদৃষ্টবাদ যথার্থ সত্যোদ্ভাসক, সুতরাং তাহাতে পুরুষকারেরও প্রয়োজন ও প্রবলতা সম পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈদিকতত্ত্ব অনুসারে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্বেচ্ছোৎপন্ন কামকর্ম্মজন্য যে কর্ম্মসূত্র, তাহাই ইহজন্মে অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া ইচ্ছাতীত কার্য্য সকলের উৎপাদক হইতেছে; এবং ইহজন্মের স্বেচ্ছোৎপন্ন কামকর্ম্ম যে সকল, তাহা পুনঃ ভবিষ্যৎ জন্মের জন্য অদৃষ্টাকারে পরিণত হইবে। অতএব শ্রুতির মতে মূলস্থানে মানুষের স্বেচ্ছাশক্তিই প্রবল। এবং সেই স্বেচ্ছাশক্তি, জন্ম-জন্মান্তরভেদে, কখনও অদৃষ্ট কখনবা সাক্ষাৎ স্বেচ্ছাশক্তির আকারে কর্ম্মরাশির উৎপাদন করিয়া থাকে। জন্মান্তর স্বীকার করিলে এ অদৃষ্টবাদ, জ্ঞান এবং যুক্তি উভয়সম্মত এবং বুদ্ধি-মানের নিকট পুরুষকারের পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজক স্বরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু তোমার অবলম্বিত অদৃষ্টবাদ স্বতন্ত্র পদার্থ; তদনুসারে মানুষ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ দ্বার দিয়া যাহা কিছু কর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহা সমস্তই অগ্রে বিধাতা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কিছু যত্ন ও চেষ্টা সে সমস্তই বিফল, যেহেতু মানুষের সাধ্য নাই যে এক পদও তাহার অন্যথায় অগ্রসর হইতে পারে। এমন স্থলে মানুষের যে কিছু উদ্যম ও

অধ্যবসায়, তাহা অধিকন্তু ও পণ্ডশ্রমমাত্র; অতএব এ অদৃষ্টবাদ পুরুষকারকে একেবারেই নষ্ট করিয়া,মানুষকে জড়পদার্থ স্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। এরূপ অদৃষ্টবাদীরা স্বেচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব, তাহার চালনা ও তজ্জনিত ফলাফল, বড় একটা বুঝে না; জড় পদার্থের কলে ঘুরিয়া বেড়ানর ন্যায়,মানবকে অদৃষ্টহস্তে ক্রীড়াপুতুলের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, অকর্ম্মশীলতায় মাটি হয়। "যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে," এ বড় সর্ব্বনাশকর বিশ্বাস! কেন না মানব ইহার প্রভাবে অকর্ম্মা হইয়া অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইবে! বাঞ্ছারাম, এরূপ অদৃষ্টকে আমরাও সত্য সত্য পূজা করিতাম, যদি দেখিতে পাই তাম যে মানবীয় স্বেচ্ছা-শক্তি সর্ব্বসময়েই, প্রাকৃতিক শক্তি হইতে অন্যথা গমন বা তাহা হইতে পিছু হটন বা তদগ্রগমনে অসমর্থ; অথবা সর্ব্বদাই যদি যথাচালিতরূপে প্রাকৃতিক শক্তির অনুসরণ করিয়া ফিরিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা করে না।

এ বিশ্বে আমরা শক্তির কেবল এই দ্বিবিধ মাত্র বিভাগ দেখিতে পাই, এক প্রাকৃতিক শক্তি, অপর স্বেচ্ছাশক্তি; ইহা ব্যতীত আর তৃতীয় শক্তিবিভাগ নাই। সুতরাং তুমি যাহাকে অদৃষ্টশক্তি বলিয়া থাক, তাহা হয় এই দুইয়ের একতরকে বুঝাইয়া থাকে, নতুবা তাহা কিছুই বুঝায় না। এক্ষণে প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে অনেক স্থানে বলিয়াছি, প্রাকৃতিক শক্তি আগে, স্বেচ্ছাশক্তি তাহার পরে; এবং স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অঙ্কশয়নশায়িনী। এই অঙ্কশয়নশায়ী ভাব দৃষ্টে এবং এতৎ হেতু তদুভয় শক্তির পৃথকত্ব উপলব্ধি করণে অসমর্থতা জন্য, অজ্ঞ মানব এই বিকৃত এবং দুর্দ্ধর্ষ অদৃষ্টবাদের কল্পনা করিয়া তুলিয়াছে। সে যাহা হউক, স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অঙ্কশয়নশায়িনী ও তদুৎপন্ন কার্য্য প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেই যে,প্রাকৃতিক শক্তি সহ তাহা সম্পূর্ণভাবে এক বা প্রাকৃতিক শক্তিতেই তাহা লীন হইয়া অস্তিত্বশূন্য হইবে, এমন কোন কথা নহে। স্বেচ্ছাশক্তি,প্রাকৃতিক

শক্তির অনুকূলে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবে সত্য, কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাচন ও কার্য্য-আচরণকালে তাহার স্বাধীনতাও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। স্বেচ্ছাশক্তির এই যুগপৎ স্বাধীন-পরাধীন ভাবই মঙ্গলকর, তদতিরিক্তে একেবারে স্বাধীন বা একেবারে পরাধীন উভয় ভাবই অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি, মানবচিত্ত বহির্জগৎ হইতে নানাবিধ ভাব সকল প্রাপ্ত হইতেছে; বহির্জগৎই কর্ম্মের উপকরণরাশি যোগাইতেছে এবং যখন উপকরণরাশি যোগায়, তখন ইহাও একরূপ আভাস দিয়া দিতেছে যে কিরূপ কিরূপ কর্ম্ম সেই সকল ভাব ও উপকরণযোগে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এখন সে সকলের মধ্য হইতে কর্ম্মবিশেষ নির্ব্বাচন এবং তাহা সম্পাদন করিবে কে? উপকরণ যোগান ও কর্ম্মাভাস দান করা পর্য্যন্তই অদৃষ্টহস্ত বলবান্ দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু তাহার পর? তুমি বলিবে করিবার জন্য যে ইচ্ছা, তাহারও প্রবর্ত্তক কথিত বহির্জগৎস্থ ভাব সকল ও ভাবোত্থ উত্তেজনা; এবং করণ যাহা, তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া সেই ইচ্ছারই বাহ্যবিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভাল, এখন দেখা হউক, তোমার এ কথা কতদূর সসার বা তদন্যতর।

কাষ্ঠে প্রস্তর সংঘর্ষে অগ্নির উৎপত্তি হইল; এখানে অগ্নির প্রকৃত উৎপাদক কে? আমরা জানি যে প্রস্তর বা তদীয় সংঘর্ষ, এ দুয়ের কেহই তাহার প্রকৃত উৎপাদক নহে। কাষ্ঠের স্বধর্ম্মবশে তাহাতে যে সূর্য্যতেজ নিহিত হইয়া থাকে,তাহাই অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ অগ্নিবৎ উপমেয় মানবের স্বেচ্ছাশক্তি যাহা, জাগতিক ভাব বা ভাবোত্থ উত্তেজনাকে তাহার উৎপাদক বলা যায় না। স্বেচ্ছার উদ্দীপনে এবং প্রকাশনে উত্তেজক জাগতিক ভাব সকল কেবল নিমিত্ত স্বরূপ হইয়া থাকে; নতুবা স্বেচ্ছা পদার্থের আদি মূল যাহা তাহা সে সকল হইতে অনেক দূরে। স্বেচ্ছাশক্তি মানবের স্বীয় স্বভাবান্তর্গত বিষয়; বহির্বিষয়ের ভাবোত্থ উত্তেজনায় তাহা উদ্দীপিত অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু সে উদ্দীপিত স্বেচ্ছাকে শমতাকরণ শক্তিও ত অল্পবিস্তর প্রায় সকল মানুষেতেই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

আরও দেখ, ইচ্ছা উদ্দীপিত হইবামাত্র এবং তাহার পোষক উপকরণরাশি সম্মুখে পাইলেও, মানব কলচালিতের ন্যায় তাহাতে কার্য্যপ্রবৃত্ত না হইয়া, অগ্রে তদ্বিষয়িণী ন্যায়ান্যায় ও হিতাহিতের কথা বিবেচনা করিয়া থাকে; সেই হিতাহিত বিবেচনা ও তাহার জন্য যে কালব্যাজ, তাহাই স্বেচ্ছার স্বাধীনতা পক্ষে একটি বিশিষ্ট পরিচায়ক বলিয়া জানিও। স্বেচ্ছা সমগ্রত পরপ্রভাবোৎপন্ন ও পরাপেক্ষী হইলে, সেরূপ কখনও হইতে পারিত না। এই সৃষ্টিতে মানবের নিজের যুগপৎ স্বাধীন-পরাধীন ভাব হেতু, তাহার স্বেচ্ছাশক্তিও সুতরাং তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জাগতিক ভাবে যে উদ্দীপিত হওন ও তজ্জন্য কার্য্যে যে প্রবৃত্তির উৎপাদন, ইহাই প্রাকৃতিকশক্তি সকাশে স্বেচ্ছাশক্তির পরাধীনতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে; তাহার পর সেই কার্য্যের যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ও তাহাতে যে প্রবর্ত্তনা বা অপ্রবর্ত্তনা, তাহাই সর্ব্বতোভাবে তাহার স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া দেয়।

মানুষ শরীর এবং আত্মা উভয়বিশিষ্ট হওয়ায়, শারীরভাগে মহাপ্রকৃতির অংশ-সম্ভবতা জন্য তাহার অধীনতা এবং আত্মিকভাগে, আত্মার অনাদি এবং শুদ্ধবুদ্ধাদি সত্তা হেতু, তাহার স্বাধীনতা। শরীর এবং আত্মা, উভয় উভয়ের অপেক্ষাশীল অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধিত হওয়ায়, অধীনতা এবং স্বাধীনতা, উভয় উভয়তঃ পরিচালিত হইয়া, বহুপরিমাণে স্বভাবান্তর সাধন পূর্ব্বক অধীনকে স্বাধীন এবং স্বাধীনকে অধীনবৎ দেখাইয়া থাকে এবং অধীনতা ও স্বাধীনতা ইহাদের কাহার অধিকার-সীমা কতদূরে, তাহা নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন করিয়া তুলে। এই কঠিনতাজন্য অল্পজ্ঞানীরা ভ্রমে পড়িয়া, কেহ বা কেবল অধীনতার প্রভাব অনুভবে, আলোচ্য বিকৃত অদৃষ্টবাদের ন্যায়, একমাত্র অদৃষ্টহস্তকে বলবান্ দেখিতে পায়; কেহ বা আবার তদ্বিপরীতে স্বাধীনতার সুন্দর প্রভায় মুগ্ধ হইয়া, অদৃষ্টকে একেবারেই উপেক্ষা পূর্ব্বক একমাত্র স্বেচ্ছাশক্তির অক্ষুণ্ণ অধিকার ঘোষণা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, অদৃষ্টবাদী এবং স্বেচ্ছাবাদী, উভয়ই ঘোর ভ্রমান্ধতায় পতিত।

অদৃষ্ট এবং স্বেচ্ছা, উভয়েরই ক্রিয়া যুগপৎ চলিতেছে, এবং এই মানবীয় সংসারে অধিকারও উভয়ের প্রায় সম পরিমাণে দেখা যায়।

দেখ,প্রাকৃতিক শক্তি,তাহার অনন্ত প্রবাহ্-আবর্ত্তনে,দিগন্ত প্রসারিত এক এক এবং পর পর এমন বিভিন্ন গুণ-তরঙ্গের আবর্ত্ত উপস্থিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে যে, তাহার ভাবে অতিশয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র মনুষ্যজগৎ, অথবা আরও সীমাসঙ্কীর্ণতায় কোন এক জাতিবিশেষ, কথন ম্রিয়মাণ, কথনও উদ্দীপিত ; কথন ভীরু, কথনও বলদৃপ্ত ; কথন স্বদেশপ্রিয়, কথনও তদন্যতর ; কথনও বা কার্য্যবিশেষ-শীল, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাব ধারণ করিয়া ; বিশ্বরঙ্গগৃহে কাল-সমক্ষে নানা অভিনয়ে কথনও হাঁসাইয়া কথনও কাঁদাইয়া, স্বীয় জীবনের সার্থকতা বা অসার্থকতা সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। কতই না অভিনয়-বৈচিত্র! নানা আবর্ত্তের আবর্ত্তন-পর্য্যায়ে, যথন আবার ধ্বংসাবর্ত্তের উপস্থিতি হইতেছে ; তথন হয় ত তাহা সমস্ত জগৎ বা দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এ সকল আবর্ত্তরঙ্গ ও তাহাদের দিগন্তব্যাপিনী ক্রিয়া দেখিলে, কে বল সহসা এরূপ মনে করিতে সাহস পায় যে একমাত্র অদৃষ্টশক্তি বলবতী নহে ; অথবা স্বেচ্ছাশক্তির ক্রিয়াও তাহার মধ্যে সমান পরিমাণে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে ? এই সকল কূটগ্রন্থিস্থলেই সাধারণতঃ মানুষ ভ্রান্তদৃশ্যে ভ্রান্তমতি হইয়া যায়। সে যাহা হউক, আবর্ত্তরঙ্গ আসিতেছে যাইতেছে বটে, কিন্তু জনে জনে প্রতিজন ধরিয়া তাহার ক্রিয়া কি সর্ব্বজনীন বলিয়া অবলোকিত হয় ? কই, একই স্থানে কতজনকে যেমন সে আবর্ত্তরঙ্গে মাতিতে বা ওতপ্লুত হইতে দেখা যায়, তেমনি আর কতজন আবার অনাস্থা-কেন্দ্রশায়িবৎ যথাপূর্ব্ব তথাপর অনুত্তেজিতভাবে তাহাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় ; যেমন ধ্বংসাবর্ত্তের বশীভূত হইয়া কতজন পৃষ্ঠভাসান দিতেছে, তেমনি আবার কতই না জন স্বচ্ছন্দে তাহাকে অটলভাবে উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে! এরূপ ফলভেদের কারণ ?—কেহ বা শুভকর আবর্ত্তরঙ্গ দেখিয়া, প্রধানতঃ স্বেচ্ছাশক্তির

পরিচালনে, তাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সুফলভাগী হয়; কেহ বা অশুভ আবর্ত্তস্থলে স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালন অভাবে তাহাতে ওতপ্লুত হইয়া পৃষ্ঠভাসান দেয়। অতএব স্বেচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অপ্রয়োগও এরূপ বিভিন্ন ফলভোগের অন্যতর কারণ। যাহা জগৎ বা জাতি সম্বন্ধে বলিলাম, তাহাই সঙ্কীর্ণায়তন করিয়া লইলে, ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হয়।

পুনশ্চ দ্রষ্টব্য, প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য শারীরভাগকে লইয়া, আর স্বেচ্ছাশক্তির কার্য্য আত্মিকভাগকে লইয়া এবং মন, শরীর ও আত্মা এ উভয়ের সংযোগস্থল। এজন্য বাহ্যজগৎ যখন স্বীয় ভাবোথ উত্তেজনায় ইন্দ্রিয় সকলকে উত্তেজিত করে, তখন সেই উত্তেজনা মনের দ্বারা আত্মিক-ভাগেও চালিত হইবাতে, আত্মিক ক্রিয়ার শমতা সাধন পূর্ব্বক মানুষকে নানা গণনাতীত অবস্থায় পাতিত ও কল্পনাতীত কার্য্যে লিপ্ত করিয়া দেয়। সেইরূপ আত্মিকক্রিয়া যাহা তাহা মনের দ্বারা শরীরের উপর পরিচালিত হইয়া, শরীরের উপর প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও নানা প্রকারে শমতা সাধন করিয়া থাকে। এখানে আত্মিকক্রিয়ার শমতা সাধন অদৃষ্টশক্তির কার্য্য, আর প্রাকৃতিক ক্রিয়ার শমতা সাধন স্বেচ্ছাশক্তির কার্য্য; কিন্তু তাহা হইলেও, এ উভয় স্থলেই, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছা-শক্তির কার্য্য এরূপ সংমিলিত হইয়া যায় যে, এক হইতে অপরকে পৃথক্ করিয়া লওয়া বাস্তবিকই বড় কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আবার এ উভয়তঃ শমতা সধেনেরও একটা সীমা আছে, যে সীমার অতীতে উভয় উভয়তঃ কেহ কাহারও শমতা সাধন করিতে পারে না এবং তাহাকেই শুদ্ধ অদৃষ্ট বা শুদ্ধ আত্মিক শক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, অথবা নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, মানুষ একক বা সমষ্টিভাবে নানা অবস্থার ভাগী হয়, এবং শারীর ভাগে নানাবিধ নির্যাতনে পাতিত হয়। ইহারই প্রভাবে দেশমধ্যে অতিবৃষ্টি, ম্যালেরিয়ার ন্যায় সর্ব্বজনীন রোগাদি, দুর্ভিক্ষ অথবা সুবৃষ্টি, সুভিক্ষ, সাধারণ স্বাস্থ্য ইত্যাদি ইত্যাদি অগণনীয় বহুতর ভৌতিক শুভাশুভের উপস্থিতি হয় এবং মানব ইচ্ছার অতীতে ও পাশবদ্ধবৎ

তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। এতাদৃক প্রাকৃতিক শক্তিকেই প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্টক্রীড়া বলা যায়, এবং যাহা কিছু মানব অন্ধভাবে অদৃষ্টের দাস তাহা এইখানে। প্রাকৃতিক শক্তি এখানে মানবের আধিভৌতিক ভাগকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে বলিয়া, উহার উপর মানবের স্বেচ্ছাশক্তির চালনা করিবার সম্বন্ধ অতি অল্পই; এজন্য মানব সে সকল বিষয়ে জবাবদিহিশূন্য, এবং জবাবদিহিশূন্য বলিয়াই ঐ ঐ বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নকস্থলীয় হয়। কিন্তু মানবের তাহাতে নিজপ্রকৃতি বা আত্মিক পক্ষে আসে যায় কি? সে যাহা হউক, বাঞ্ছারাম, ইহাই অদৃষ্ট, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় অদৃষ্ট নাই এবং ইহার সহিত শ্রুতিপ্রোক্ত অদৃষ্টেরও কোন বিরোধ দেখা যায় না; যেহেতু জন্মান্তরীণ কামকর্ম্মজন্য যে অদৃষ্ট, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের আকারেই কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এ আলোচনার মধ্যে তোমার কল্পিত ও অবলম্বিত অদৃষ্টের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না, ফলতঃ তাহা মূল্যশূন্য মিথ্যা অপবাদমাত্র। সে যাহা হইক, ইহাও যথেষ্ট দেখান হইয়াছে যে, অদৃষ্ট হইতে স্বেচ্ছাশক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব। স্বেচ্ছা-শক্তির অধিকার যতদূর লইয়া, ততদূরেই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য জ্ঞান, হিতাহিত-বোধ, সদসৎ-জ্ঞান, ইত্যাদি এবং সেই সকলের পুনঃ ভাব-অভাবে পাপপুণ্যের সঞ্চার ও জবাবদিহির উপস্থিতি হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাশক্তির উপলব্ধি এবং প্রয়োগে, অর্থাৎ আত্মিকবৃত্তির পরিচালনে, জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধির প্রয়োজন; সহজ জ্ঞানও সাত্ত্বিক হইলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু মানব প্রায় সর্ব্বদাই আত্মিকবৃত্তিপরিচালনে ঔদাস্য ও হীনতা বশতঃ, বিষম প্রত্যবায়ের ভাগী হইয়া অনর্থোৎপত্তি করিয়া থাকে। অতএব এখনও স্বেচ্ছাশক্তিতে প্রবুদ্ধ হও, আর বৃথা অদৃষ্টবাদ লইয়া আত্মধ্বংসে জগৎ-ধ্বংসনে রত হইও না। ইহাই দিব্য যুক্তি এবং ইহাতেই দিব্য মুক্তি।

৩। তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা।

সূর্য্যে ছায়া আছে, আলোকে অন্ধকার আছে, তাপে শৈত্য আছে, ধর্ম্মে অধর্ম্ম আছে, সত্যে মিথ্যা আছে, হাঁতে না আছে, সুতরাং আস্তিকতায় নাস্তিকতা না থাকিবে কেন? থাকাই অবশ্যম্ভাবী; না থাকা অসম্ভব, আশ্চর্য্যের বিষয় ও অস্বাভাবিক। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে, কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক উভয় জগতেই, চিৎ এবং অচিৎ বা সৎ এবং অসৎ, এই দ্বিবিধ গুণের নিরন্তর বিদ্যমানতা। অসৎ সতের বিরোধী এবং নিত্য বৈপরীত্যসাধনকারী; যেখানে ঈশ্বর স্বর্গ রচনা করিয়া থাকেন, শয়তান তথায় নরকের আবির্ভাব করিয়া থাকে; অহুরমজ্দ যথায় সুখরাশি বিতরণ করিয়া থাকেন, অংগ্রমইনু তথায় অসুখের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে। মূর্খ বাঞ্ছারাম, এ বড় ঠিক কথা, ইহাই নিত্য হইয়া আসিতেছে, ইহাই নিত্য হইতে থাকিবে। কিন্তু জান, সেই অন্ধকারে আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই অসতে সতের প্রভা বৃদ্ধি হয়; মেঘমুক্ত দিবাকরের কিরণমালা উজ্জ্বলতায় ও তেজে বড় খরতর! যে আজীবন সম্পন্নাবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সে সম্পন্নাবস্থার মূল্য কি তাহা জানে না; সে মূল্য জানিতে হইলে ক্ষণিক অভাবভোগের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ সংসারে যথায়, যে বিষে আমি মরিলে সংসারের আপৎ চুকিয়া যায়, সে বিষ পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে মিলে না; তথায় মূল্য জানাটাও নিতান্ত এবং আগে আবশ্যক। অতএব যদি আর কিছুরই জন্য না হয়, অন্ততঃ মূল্য জানার জন্যও, অসতের অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিনা বৈপরীত্যে কোন বস্তুর রূপ, প্রভা বা মূল্য প্রকটিত হয় না।

অতএব সতের পার্শ্বে অসতের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক, সুতরা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবিরূপে অসৎ সর্ব্বদাই সতের অনুসরণ করিয়া থাকে। যে জাতীয় সৎ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অসৎও সেই একজাতীয়

এবং সমশ্রেণীর, নতুবা বৈপরীত্যসাধনে পারক হইবে কিরূপে? সৎপদার্থ রূপ বা শ্রী, অসৎ পদার্থ প্রকার। অসৎ, বিকার বা বৈপরীত্য সাধনে, সতের অগ্রবর্ত্তী পর্ব্ববিশেষস্থ শ্রীবর্দ্ধন করিয়া, আপনি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সৎ পুনর্ব্বার নূতন অসতের সহযোগে নূতন শ্রীধারণে অগ্রসর হয়। সতের অস্তিত্ব এবং গতি নিত্য, অসতের অস্তিত্ব এবং গতি ক্ষণস্থায়ী—প্রতিপদে সৎকে অগ্রসারিত, প্রকটিত বা তাহার নব শ্রী বর্দ্ধন করিয়া, অসতের ধ্বংস হইয়া যায়। সৎ পদার্থই এ বিশ্বের পরিমাণ,অসৎ পদার্থ তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রম। সাময়িক কাল, অজ্ঞান-বিৎ বিজ্ঞানবিৎ সকল লোকেরই নিকট, সর্ব্বদা দুঃখসঙ্কুল এবং অসুখময় এবং মূর্ত্তিমান্ কলির রাজত্ব; তাহার কারণ, তাহার সৎ-ভাব ও অসৎ-ভাব উভয়ই আমরা চোখের উপর দেদীপ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া। কিন্তু গতকাল? সর্ব্বদাই মনোরম, সর্ব্বদাই পূজনীয়, সর্ব্বদাই তাহাকে দেববৎ দেখিয়া থাকি; গতকালের নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা যে সেও শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র হইয়া থাকে। তাহার কারণ, কাল সহ তাহার অসৎ-ভাব বিলয় পাইয়া গিয়াছে; নিত্যস্থায়ী একমাত্র সৎ-ভাব কেবল এখন নয়নপথে উদিত হইতেছে,—সৎ-ভাব কবে কাহার না পূজনীয়, কবে কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে? অসৎ পদার্থ অনিত্য এবং মিথ্যা; প্রতি কাল পরিবর্ত্তনে আবশ্যকতার পরিপূরণসহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই অসৎ পদার্থ, মানবীয় বিভিন্ন ধারণাশক্তির তারতম্য অনুসারে, জরথুস্ত্রের নিকট অংগ্রমইন্যু, মুসা ও মহম্মদের নিকট শয়তান, বৈদান্তিকের নিকট অবিদ্যা, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে।

জ্ঞানধর্ম্মাদি পর্ব্বে আস্তিকতা সেই সৎ, নাস্তিকতা সেই অসৎ; সুতরাং নাস্তিকতা না থাকিলে চলে কই? জ্ঞানসংসার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আস্তিকতা আধ্যাত্মিকগুণময়ী বটে কিন্তু উহাও, শরীরী আত্মার অবলম্বনভূত হওয়ায়, ভাবে এবং উৎকর্ষ-অপকর্ষাদির প্রকরণাদিতে ভৌতিকধর্ম্মী; অপরাপর পদার্থ বা মানবীয় চিত্তের

অপরাপর গুণ পদার্থের ন্যায়, উহাও শক্তিবশে গতিশীলতা, অগ্রগমন এবং শ্রীর বিষয়ীভূত। অতএব উহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা না থাকিলে, সেই সেই অগ্রগমন বা শ্রীধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন হইতে পারিত না। মানবীয় অপরাপর গুণ ও জ্ঞানের ন্যায় আস্তিকতারও, পর পর ঔৎকর্ষপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এ সকল প্রয়োজনীয়তা—এ সকল নষ্টামির মূল, দৃষ্টিরোধক কাল; কালের ধ্বংসে সমগ্র সৎ পদার্থ দৃষ্টিপথে জাজ্বল্যমান হইলে, আর অসৎ পদার্থের প্রয়োজন হইত না। অসৎপ্রয়োগই কালগর্ভ হইতে সৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়। যতক্ষণ আমাদের কালবক্ষে স্থিতি, ততক্ষণ অসতের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। বাঙ্গারাম, তুমি বলিবে সতের পার্শ্বে অসতের যদি এতই আবশ্যক, আস্তিকতার পার্শ্বে নাস্তিকতার যদি এতই প্রয়োজন, তবে তুমি কেন তজ্জন্য এত বকাবকি করিয়া মাথা ধরাইতে বসিয়াছ, কেনইবা নাস্তিকতার প্রতি এতটা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া থাক?

সকল সৃষ্টির আদি প্রবর্ত্তক, আদিকর্ত্তা জ্ঞান। মানবে সেই জ্ঞান অংশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে; এজন্য মানব স্বয়ং সৃষ্ট হইয়া এবং সৃষ্টিমধ্যে থাকিয়াও, নিজে সৃষ্টিক্ষম। এই কারণে, যে সকল কার্য্য অন্যত্র প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যায়, মানুষের মধ্যে সচরাচর তাহা হয় না। মানব কিয়দংশে স্বয়ং-ক্ষম বলিয়া, প্রকৃতি তাহাদের প্রতি সেই পরিমাণে শিথিল-যত্ন বলিলে অপ্রযুক্ত হয় না। অন্যত্র সৎ এবং অসতের উপর 'স্বয়ং-ক্ষম' ভাবের অভাব হেতু, প্রকৃতি তথায় স্বয়ং যথাবিধানে কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিতে সেরূপ নহে। মনুষ্য স্বয়ং-ক্ষম ভাব হেতু, স্বেচ্ছামত সৎ বা অসতের অপরিমিত সংগ্রহে পটু। বলা বাহুল্য যে, সৎসংগ্রহই উদ্দেশ্য, অসৎসংগ্রহ উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং অধিক অসৎসংগ্রহ অর্থাৎ সতের উপার্জ্জন অল্প হইতে দেখিলে, কাজেই গালিগালাজ করিতে হয়। অনুমান হয়, আমরা কেবল শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা করিতে

পাইলে, হয়ত নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা নিরবচ্ছিন্ন অসতের উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। কিন্তু ভৌতিক শরীরী হওয়ায় আমাদিগেতে, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তি জড়িত এবং আধ্যাত্মিক সদসৎ ও আধিভৌতিক সদসৎ মিলিত হইয়া যাওয়ায়; এবং প্রাকৃতিক শক্তি ও তদনুগামী সদসৎ স্বেচ্ছাশক্তির অতীত ভাবে কার্য্যশীল হওয়ায়; শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা অথবা একেবারে শুদ্ধ অসৎ বা একেবারে শুদ্ধ সতের উচ্ছেদ বা উপার্জ্জনে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া যথাসাধ্য সৎসাধন জন্য, প্রদত্ত শক্তির সম্যক্ সঞ্চালনে বিমুখ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহা হইলে ব্যতিক্রম হেতু আত্মিক অসতের সঞ্চার বা পাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আলোক হইতে অন্ধকার ছাড়াইবার সাধ্য নাই। সূর্য্যের আলোকে এবং প্রদীপের আলোকে তফাত কেন, যেহেতু প্রদীপের আলোকে অধিক পরিমাণে অন্ধকার মিশ্রিত থাকায়, তাহা সূর্য্যালোক অপেক্ষা মলিন। এখন জিজ্ঞাসা করি, আলোকপ্রাপ্তিই যথায় উদ্দেশ্য, তথায় ঔদাস্য বশতঃ যদি আলোকে আরও অপরিমিত অন্ধকার মিশিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সে আলোকের শ্রীবর্দ্ধন বা তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে? যদি তাহা না হয়, তবে এখন কর্ত্তব্য এই যে, আলোক হইতে অন্ধকার যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করিয়া, যথাসাধ্য সেই আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা। এতদর্থে দুইটি পরিমাণের আবশ্যক, প্রথম কোন্ পরিমাণে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন হইলে আলোক আকাঙ্ক্ষানুরূপ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহার আদর্শ; অপর যখন আলোক এবং অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন, তখন কত পরিমাণে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিব বা না করিব বা করিতে পারি, তাহার সীমাবধারণ। আদর্শমাত্রে তত্ত্ব এবং কাব্যের বিষয়ীভূত পদার্থ; আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সতের পরিবর্দ্ধন হেতু তন্মুখে প্রধাবিত হইব; এবং অসতের দূরীকরণে, প্রকৃতি আমাদিগকে যতদূর যাইতে দেয় ততদূর যাইব। মানব স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপূর্ণ হইলেও সে মহাপ্রকৃতির অঙ্কশয়নশায়ী, সুতরাং এখানেও সে

প্রকৃতির শাসনবহির্ভূত নহে;—মানবকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া প্রকৃতি একেবারে তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্যবিরত ও ছিন্নসম্বন্ধ হয়েন নাই; সুতরাং এ মুখে তাঁহার শাসনসীমা পর্য্যন্ত আসাই চূড়ান্ত, যেহেতু তদতিরিক্তে মানবীয় গতিচালনের চেষ্টা কেবল অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

সকল জ্ঞানের আদি সন্দেহের উৎপত্তি। সেই সন্দেহ পরিপক্ক হইলে, নাস্তিকতার আকার ধারণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির চালনে সন্দেহের উৎপত্তি হয়, পুনশ্চ সেই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির তদুত্তরতর চালনেই আবার তাহার নিবৃত্তি। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা শক্তি উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া আসিলে, যখন গূঢ়গুহ্যভেদের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা গূঢ়গুহ্যের সম্মুখীন হইবাতে,ঘোর অন্ধকারে পতিতবৎ সহসা পথ না পাইয়া ব্যাকুলিত হইতে থাকে; এবং সেই ব্যাকুলতা হইতে চিত্ত শ্রমক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখনই যে চিত্ত ক্ষীণ, সে ঘূর্ণাপতিতবৎ শ্রান্তি, তাপ ও বৈক্লব্যে দিশাহারা হইয়া ক্ষিপ্ত-উন্মাদবৎ হয় এবং যেন আস্তিকতার উপর প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ লইবার জন্যই, জেদ করিয়া নাস্তিকতাকে গতির সীমা জ্ঞানে তদবলম্বনে শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। যাহারা এই মধ্যপথে ভগ্নগতি হয়, তাহারাই এ জগতে নাস্তিক নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাতে বিষ তাহাতেই নির্বিষ এবং একদেশের চরম সীমায় উঠিলেই, ঠিক তথা হইতে অপর দেশের সূত্রপাত হইয়া থাকে। যে অনুসন্ধিৎসা শক্তির চালনে নাস্তিকতারূপ সীমায় উপস্থিত হইয়াছ, সেই অনুসন্ধিৎসা শক্তিকে তদতিক্রমী চালনা করিলেই আবার সেই সীমা ছাড়াইয়া, আস্তিকতারূপ নূতন দেশের শোভনতমা মোহিনী মূর্ত্তি পুরোভাগে দৃষ্টি করিতে পারিবে। তথায় বিচরণ কর, দেখিবে তাহা অপূর্ব্ব সুখের আকর; সন্দেহের পূর্ব্বগত আস্তিকতা অপেক্ষা তোমার এ আস্তিকতা অপরিসীম উজ্জ্বল ও চিত্তশান্তিকর,—তাহার কারণ ইহা বৈপরীত্যসমাবেশে উৎপন্ন। এ জগতে সকল বস্তুরই

সার্থকতা আছে, সুতরাং নাস্তিকতারও সার্থকতা আছে এবং সে সার্থকতা এইরূপ বৈপরীত্যসমাবেশস্থলে; নতুবা যখনই তাহা আপন অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া আপনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে শয়তানের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি বলা গিয়া থাকে।

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, এ জগতে যত প্রকার জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে বদ্ধমূল নাস্তিকের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ জীব আর কেহই নাই। আজীবন শ্রম করিয়া, আজীবন মাথা ঘুরাইয়া, আজীবন তর্ক কাটাকাটি করিয়া, শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন কি,—এ জগতের স্রষ্টা কেহ নাই এবং আমিও কাহার সৃষ্ট নহি; এ জগতও কিছুই নহে এবং আমিও কিছুই নহি! এক মাত্র এই 'না' জানিতে 'হাঁ' প্রতিরূপ সমস্ত জীবন যে স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন করিতে পারে, অজ্ঞানকে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানকে যে আজীবনযত্নে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলিদান দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ নরকানুগৃহীত জীব আর কে হইতে পারে? নাস্তিকশিরোমণিগণ, কত কি দুরুচ্চার্য্য দেড়গজি শব্দ খেলা, তর্কবিতর্ক, কার্য্যকারণ আলোড়ন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন কি?—এ জগতে নাস্তিকতাই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। অপূর্ব্ব বুদ্ধি! তর্ক-জালে সমস্তই আবদ্ধ করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত, ঋষি অগস্ত্য অপেক্ষাও অদ্ভুতকর্ম্মা! মূর্খ বাঞ্ছারাম, কত দিক ধরিয়া তর্ক টানিয়া শেষ করিবে? এই বিশ্ব সাক্ষাৎ অনন্তমূর্ত্তি, যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অপার অনন্তসূত্র বিস্তৃত ও তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রতি পদার্থে অনন্তের অসীম বিকাশ এবং সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বত্র শক্তির অনন্ত মহিমা প্রকাশ, বারেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? দেখ, সীমানিবদ্ধ ক্ষুদ্রাবয়বময় কোন একটি সামান্য অক্ষরবিশেষ; সেটিও কোটি বিভিন্ন হস্তভেদে কোটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকটিত হইয়া থাকে; পুনঃ একই হস্তে কোটিবার প্রসবিত হইলেও, কোটি পরিমাণে তাহাতে আকার ও প্রকারগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক এবং অসংখ্য পর্ব্ব পর্য্যায় ও শ্রেণীতে, অসংখ্য পদার্থ নিত্য উৎপাদিত হইতেছে; অথচ সকলেই অসংখ্য

রকমের পৃথক পৃথক, কেহ তাহার মধ্যে কাহারও সঙ্গে একাকৃতি ও একপ্রকৃতি নহে। তবু যে আমরা সে অনন্তদৃশ্যে এখানে সেখানে সসীমতা দেখিয়া থাকি, সে সীমা অনন্তত্বের সঙ্কোচ জন্য নহে; তাহা আমাদের যথা আবশ্যক ধারণা ও অবলম্বনের সৌকর্য্যার্থ আমরাই দিয়া থাকি; নতুবা মুছিয়া ফেল মানদণ্ডস্বরূপ তোমার চন্দ্র সূর্য্য ও তারকানিকর, এখনই দেখিবে তোমার এক মুহূর্ত্ত ও শত বৎসর সমান হইয়া গিয়াছে। অতএব অনন্তের মহিমা এবং তাহার অপার রচনা ও বিসারণ শক্তি কি অভাবনীয়, কি অচিন্তনীয়! পুনঃ ইহা কেবল একদেশব্যাপিনী নহে। ঊর্দ্ধ অধঃ পার্শ্ব সর্ব্ব দিকে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকালে সমান অভিনীত। তুমি কি মনে করিয়াছ যে তোমার অন্তময় তর্করজ্জুতে সেই অনন্তরাশি বাঁধিয়া আপন আয়ত্তে আনিবে? ভ্রান্ত, এ অসম্ভবে সম্ভববুদ্ধি তোমাকে কে দিয়াছে? তোমার চারিদিকে নিবিড় অনন্তরাশি বিস্তৃত, চারিদিকে তোমার নিবিড় অন্ধকারময় গূঢ়গুহ্য পরিবেষ্টন করিয়া অনন্তের রত্নভাণ্ডারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; মধ্যস্থলে জীবিকাহেতু সেই রত্নপ্রার্থী তুমি এবং চৈতন্য-রূপিণী বিন্দুমাত্র আলোককণা তোমার আধার-আধেয়ত্ব প্রদর্শিত ও প্রতিবুদ্ধ করাইয়া থাকে। সেই কণামাত্র আলোকে কণামাত্র স্থান আলোকিত দেখিতে পাইয়া ভ্রান্ত মনে ভাবিতেছ, সকল পদার্থই তাহাতে পরিচিত এবং পরিসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে; হাত বাড়াইলেই তাহা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হও! তুমি ক্রমাগত তর্কসূত্র প্রসব করিয়া, কিন্তু কেবল গুটিপোকার ন্যায় আপন জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া, ভাবিতেছ, এই বিশ্ব ও বিশ্বমূলও তোমার তর্কজালের সীমায় পড়িয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্ব্বোধ, তাহা নহে। তুমি চক্ষু বুজিয়া জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছ বলিয়া, সত্য সত্যই জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যায় নাই। জালে আবদ্ধ হইও না, জাল কাটিয়া বাহির হও, নিবিড় গূঢ়গুহ্য ভেদ করিয়া সঞ্চরণ করিতে শিখ, অপরিজ্ঞেয় অথচ অনুভবনীয় ঐশ্বরিক সত্তার সংস্পর্শে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে;

অন্যথা গুটিবদ্ধ থাকিয়া হত ও পর্য্যবসিত হইবে ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অসীম পদার্থ তোমার জন্য সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে আবশ্যকের পরিমাণ অনুরূপ কর্ম্মার্থে অবলম্বন পদার্থ দিবার জন্য ; সে আবশ্যকের অতীতে আর সে সম্বন্ধ নাই,—তোমার দোষ যে তুমি সে আবশ্যকাতীতেও সসীমতা দেখিতে ব্যগ্র হও।

কেবল তর্কে, আলোচ্য এ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হয় না। যে কোন তর্ক যে কোন পদার্থকে স্বীয় ব্যুৎপত্তিবাদের ভিতরে সসীম করিয়া না আনিতে পারিলে,অগ্রসর হইতে অক্ষম। প্রতি তর্কে প্রমাণের আবশ্যক, কিন্তু এই বিশ্বে কোন্ বিষয়টি এ পর্য্যন্ত জানিয়া শেষ করিতে পারিয়াছ যে তাহাতে পূর্ণ ব্যুৎপন্নতা হেতু, তাহাকে সন্দেহরহিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হও? আজন্ম জল যাহার অবলম্বন সে স্থলের অস্তিত্ব বুঝে না, অথচ মৃত্তিকাই জলের আধার। বাঞ্ছারাম, তাহার পর তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! কুকুরেরা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, অথচ ঐ দেখ কেমন ঊর্দ্ধলাঙ্গূল চারি পায়ের উপর ভর দিয়া মনের আনন্দে দৌড়িতেছে ; বলা বাহুল্য যে কুকুরবুদ্ধির নিকট মাধ্যাকর্ষণের কথা নিতান্তই হাস্যাস্পদ! যখন এ তর্কের উপর একটা সামান্য প্রাত্যহিক ব্যাপার মীমাংসা করিতে পাঁচটা এড়াইয়া যায় ; তখন এ গুরুতমেরও গুরু বিষয় সম্বন্ধে, চিত্ত বুদ্ধি শ্রদ্ধা প্রভৃতি আর সমস্ত নিরূপক শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, একমাত্র যুক্তিশক্তির উপর ইহকাল-পরকাল স্থাপন পূর্ব্বক, যাহারা তৃপ্ত ও শান্ত হইবার প্রত্যাশা করে, তাহারা কি ভ্রান্ত! ফলতঃ বাঞ্ছারাম, নাস্তিকের নিকট ঈশ্বর যে অস্তিত্বশূন্য এ কথা ঠিক নহে ; প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকই ঈশ্বরের নিকট শূন্য হইয়া থাকে।

বলি, তবে সত্য সত্য এবং নিতান্তই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ভিন্ন তোমার মন উঠে না এবং মন প্রত্যয় মানে না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ প্রত্যক্ষে এ পর্য্যন্ত তোমার মন উঠাইতে পারিয়াছ

এবং কিসেই বা এখনও উঠাইতে পার? বলিতে কি, মানুষ, বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত মানুষ, এমনই অসাব্যস্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত জীব যে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, কিছুতেই সে চিত্তকে সাব্যস্ত ভাবে সমাহিত করিয়া তৃপ্ত এবং স্থির রাখিতে পারে না। ভাল, তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষের প্রার্থী? যদি কৃত কার্য্যবিশেষের দ্বারা কর্ত্তৃত্বপক্ষে প্রমাণপ্রার্থী হইয়া বল যে, 'অবশ্য কোন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলে, কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব?' তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বিশ্বমণ্ডল, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টিমধ্যে যে সকল কাণ্ড প্রতিনিয়ত অভিনীত হইয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই ত অদ্ভুত, তাহাদের অপেক্ষা আবারও অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি আছে? যদি বল তাহা নয়, পূর্ব্বে যাহা কখন দেখা যায় নাই এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিব, আমি বলি তবে তুমি অন্ধ! এ সৃষ্টিতে এ পর্য্যন্ত কোন্ কাণ্ড, কর্ম্ম বা দ্রব্যটি হইতে দেখিয়াছ,যাহা অপূর্ব্ব বা নূতন নহে; যাহা পূর্ব্বগত পদার্থসমূহ সহ সর্ব্বপ্রকারে একমূর্ত্তি এবং পৃথকত্ব-পরিশূন্য? সকলেই ত অপূর্ব্ব,সকলেই ত স্বতন্ত্র,সকলেই ত নূতন নূতন—এক গাছের দুই ফল, এক ঘাসের দুই পাতা,তাহাও পৃথক্ পৃথক্; ইহার পর দেশ এবং কালগত পার্থক্য ও নূতনতার ত কথাই নাই! যদি বল, এ গুলি নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে, অপরিচ্ছেদ্য কার্য্যকারণযোগে যাহা অবশ্য হইবার তাহাই হইতেছে; অতএব আমি চাই, যাহা সেরূপ নিয়মের অতীত, যাহা নিয়মের ব্যত্যয়ে উৎপন্ন।—ইহার উত্তরে তোমাকে এই বলি যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না, যাহার মূলে নিয়মের অভাব; অনিয়মে নিয়মের উদয়ের নামই সৃষ্টি এবং কার্য্য, অতএব নিয়মশূন্য কার্য্য দেখা আর চাঁদকে উদয় হইতে না দিয়া চন্দ্রিকা দেখা,এ উভয়ই সমান। আজন্ম-পঙ্গুকে যিশুখৃষ্ট স্পর্শমাত্র সুস্থশরীর করিয়াছিলেন, —এখানেও যে কিছু অনিয়মের কার্য্য হইল তাহা নহে, এখানেও নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়াছে; কিন্তু তুমি যে তাহাকে তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মানিতেছ, তাহার কারণ কার্য্যটির অনিয়মসম্ভবতা জন্য নহে,

সেটা কেবল সেই নিয়মটির বোধ পক্ষে তোমার জ্ঞানের অভাব হেতু,—যেরূপ জ্ঞানাভাব হেতু আদিম আমেরিকগণ বারুদ ও বন্দুক দেখিয়া বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং তাহাদের ধারককে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিল! যদি যিশুখৃষ্টের পঙ্গুকে ভাল করাই আশ্চর্য্য কার্য্য বল, তবে তেমন এবং তাহা অপেক্ষা অপার গুণে গুরুতম কার্য্য সকল নিত্যই ত পৃথিবীতলে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। বাপু, 'আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য' করিয়া এত ক্ষিপ্ত ও উন্মাদগ্রস্ত এবং সকল বিস্মৃত হও কি জন্য? 'আশ্চর্য্য'অর্থে হাতিও নহে, ঘোড়াও নহে;—যাহার নিয়ম এবং কার্য্যকারণ এখনও আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত, তাহাই 'আশ্চর্য্য' বলিয়া গণিত হয়।

স্থূলশরীরবিশিষ্ট এবং সসীমতায় সমাবিষ্ট এই সৃষ্টি, বা সৃষ্টিস্থ একটা সামান্য পদার্থও যখন তোমার অভ্রমদৃষ্টিতে আয়ত্ত করিবার শক্তি নাই; তখন এই সৃষ্ট্যতীত সূক্ষ্ম বা অশরীরী এবং অনন্তস্বরূপ সৃষ্টিপতিকে কেমন করিয়া দৃষ্টি এবং আয়ত্তগত করিতে সাহসী হও? শরীরী, শরীরী পদার্থই কত কত যখন দেখিতে পায় না, তখন আর সূক্ষ্ম অশরীরী পদার্থের কথা কেন বল। কৈ,মানব অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মশরীর গ্যাস দেখিতে পায় না ত,অনুভব করিতেও পারে না; কেবল কার্য্য বা ফল দৃষ্টে বুঝিতে পারে যে এইটি এই গ্যাস। ভাল কথা,কার্য্যদৃষ্টে গ্যাসের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার এবং তাহার সম্বন্ধে ইহাও মনে উদয় হয় যে, হয়ত ইহার ভিতর আরও কত কি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে; কিন্তু কার্য্যদৃষ্টে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তবে অনুভব করিতে না পার কেন; এবং যে স্থানে অপরে 'গূঢ় তত্ত্ব নিহিত' বলিয়া মনে সন্দেহ হয়, এখানে সে স্থানে নাস্তিকতার উপস্থিতি করিয়া থাকই বা কি জন্য? একটা সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে মন বুঝাইতে পার, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে মন বুঝাইতে পার না? গ্যাসের কার্য্য কেবল রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে দৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য অবিচ্ছিন্ন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষবৎ; তথাপি সেই ঈশ্বরের নাম হইলেই,অমনি সেখানে ঘটপট, ষত্বণত্ব, তর্কতরঙ্গের ঝাঁকা নামাইয়া বসো,—তাই বলি তোমা অপেক্ষা আরও মূর্খ কোথায়! গ্যাসের সত্তা আর ঐশ্বরিক সত্তা,

এতদুভয়ের উপলব্ধিতে তোমার চিত্তক্রিয়ায় এতই বিভিন্ন ভাবান্তর ও তাহার এতই বিভিন্ন ফল দৃষ্ট হয় কিজন্য? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাংসারিক লাভালাভ খতানই কি তাহার প্রধান কারণ? অবশ্য সে পক্ষে উভয় উভয়তঃ প্রভেদ অনেক এবং একটা প্রধান প্রভেদ এই দেখিতে পাই যে,গ্যাসের সত্তাকে ইচ্ছামত খাটাইতে পার আর ঐশ্বরিক সত্তাকে তাহা পার না। কিন্তু চাকর কি কখনও মুনিবকে খাটাইতে পারে? তাহা যদি না পারে, তাহা হইলে সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্ত্তার কথা ত আরও অনেক দূরে। তবে চাকরও কখন কখন মুনিবকে যে একেবারে খাটাইতে না পারিবে এমন নহে, কিন্তু সে কেবল সুচাকরত্ব, ভক্তি এবং উপাসনার দ্বারা। তোমার প্রধান দোষ, তুমি অহঙ্কারমত্ততায় লঘুগুরু-ভেদশূন্য হইয়াছ; সুতরাং তোমার ইচ্ছা, সকলকেই মুষ্টিমধ্যে আনিয়া আয়ত্ত করিয়া লও!

এখন একবার তুমি কেমন অব্যবস্থিতচিত্ত জন্তু তাহা দেখা যাউক। সূক্ষ্ম বা অশরীরীর কথা ত গেল; এখন যদি বলি যে ঈশ্বর তোমাকে দেখা দিবার জন্য স্থূল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি বিশ্বাস করিবে? তাহা যদি করিতে তবে যিশুখৃষ্ট, দশ অবতার, এ সকল তোমার নিকট উপহাসের পদার্থ কি জন্য? যদি বল, ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন, সপ্রমাণ এরূপ বর্ণিত দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায়; তাহা হইলে বলি,বাইবেল আদিতে সেরূপ ত প্রভূত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে, চাক্ষুষ দর্শকের কথা-প্রমাণও তাহাতে অনেক আছে, কই তথাপিত তাহা বিশ্বাস করিতে চাহ না? তাহাতে বা তদ্রূপ যে কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেও ত অনেক কাজ হইত, যেহেতু একবারে বিশ্বাসশূন্যতা অপেক্ষা যে কোন বিষয়ে সদ্‌বুদ্ধিযুক্ত সাত্ত্বিক বিশ্বাস থাকিলে, তাহাতেও অনেক সুফল ফলিয়া থাকে। ভাল মনে কর,তোমাদের প্রত্যয়ের জন্য যদি ঈশ্বর ঘোষণা করেন,—'অমুক তারিখে আমি দ্বিতীয় সূর্য্যমূর্ত্তিতে আকাশে উদয় হইব;' এবং হইলেনও সেইরূপ, তুমিও তাহা দেখিলে এবং হয়ত মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রত্যয়ও

করিলে, কিন্তু পরক্ষণে? অসাব্যস্তচিত্ত জীব! পরক্ষণে তোমার আর সে প্রত্যয় থাকিবে না। পরক্ষণে, কেহ হয়ত তদ্রূপ উদয়কে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিশেষ জ্ঞানে তাহার ভৌতিক কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিজ্ঞান খুলিয়া বসিবে; কেহ বলিবে দৃষ্টিভ্রম; কেহ বা বলিবে সেদিন একটা নক্ষত্র জ্বলিয়াছিল; আবার উত্তর পুরুষেরা বলিবে, সকলেই সেই দিন উন্মত্ত হইয়াছিল, নতুবা এমন অদ্ভুত কথা রটাইয়া রাখিবে কেন? অথবা যদি সেই সূর্য্যমূর্ত্তি, সকল কালের এবং সকল দেশের সকল লোককেই প্রবোধ দিবার জন্য সর্ব্বদেশব্যাপী ও সর্ব্বকালীন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা নিস্তার কই? হয়ত লোকে দুই দিনের জন্য বিশ্বাস করিবে, কিন্তু তৃতীয় দিন হইতেই কিছু অধিক বুদ্ধিমান হইয়া বলিতে থাকিবে,—'ইহা আর একটা সূর্য্য, পূর্ব্বকার লোকে মূর্খতা বশতঃ বুঝিতে পারিত না এবং কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত।' আমি কিছু এ সকল অত্যুক্তি করিতেছি না, তুমি ত নিত্যই এরূপ নানা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাক। অতএব বাঙ্গারাম, আমি বুঝিতে পারি না, ঈশ্বর কিরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণযুক্ত হইলে তবে তোমার এবং তোমার বংশাবলীর মনঃপুত এবং বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন! বলিতে পার, এমন অসাব্যস্তচিত্ত যাহারা; তাহাদের কোন্ বস্তুতে প্রত্যয় জন্মান সম্ভব? প্রত্যয়প্রাপ্তি হয় তাহাদের, যাহারা স্বয়ং প্রত্যয়-প্রতিরূপ। কিন্তু তুমি? তুমি অপ্রত্যয়ের পুঞ্জ এবং রাশি, তোমার আবার প্রত্যয়!

স্বয়ং যাহারা প্রত্যয়-প্রতিরূপ, চিত্ত যাহাদের সাব্যস্ত, চেষ্টা যাহাদের সাত্ত্বিক, তাহারা সেই ঈশ্বরকে সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা কঠিন নহে; কঠিন প্রত্যয়-প্রতিরূপতা, সাব্যস্তচিত্ততা, সাত্ত্বিক চেষ্টা, ইত্যাদি সাধন দ্বারা তদর্থে প্রস্তুত হওয়া। সেরূপ প্রস্তুত না হইয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে যাওয়া, আর অক্ষরশূন্যের পক্ষে কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে অগ্রসর হওয়া, উভয়ই সমান। অক্ষরশূন্য ব্যক্তি ভাবে, কথা ত এই

'থাই, যাই, নাই' ইত্যাদি; ইহার মধ্যে আবার কালিদাস কি এবং কালিদাস লইয়া রকম রসই বা কি?—'কালিদাস' 'কলিদাস' যাহারা করে, তাহারা নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়াছে! সকল বিষয়েরই জন্য প্রস্তুত এবং অধিকারী হওয়া এবং সকল বিষয়েরই জন্য উপযুক্ত আয়োজনের আবশ্যক হয়; এ পৃথিবীতে এই দুই ভিন্ন কোন বিষয়ই যথাবাঞ্ছিত উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। বিষয় যতই উচ্চ উচ্চ, ততই ক্লেশকর চেষ্টা এবং ততই দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তি ও অপরিমিত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে ফল ও লাভ তাহা তোমার নিজেরই, অন্যের নহে। 'প্রত্যক্ষ' 'অপূর্ব্ব' 'অদ্ভুত', জ্ঞানচক্ষু যাহার আছে, তাহাকে এ সকল অন্যত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না; সকলই তোমার পার্শ্বে রহিয়াছে, তুমি কেবল অজ্ঞানান্ধতা হেতু, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। সকলই তোমার চক্ষুসমক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তে পরিক্রমণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তুমি অজ্ঞানতা ও অনাস্থাবশতঃ দেখিয়াও সে সকলকে দেখিতে পাও না। ইহাতে দোষ 'প্রত্যক্ষ' 'অদ্ভুত' বা 'অপূর্ব্বের' নহে; দোষ তোমার নিজের। তুমি অনাস্থাযুক্তচিত্ত, এ বয়স ধরিয়া রথ দেখিয়া আসিতেছ, তোমার আর রথ দেখায় কৌতূহল জন্মে না; কিন্তু বালক যে, যে কখনও তাহা দেখে নাই, তাহার তাহা দেখিতে কৌতূহল কত! অতএব অদ্ভুত অপূর্ব্বাদির অর্থ এখন জানিবে যে কেবল আপেক্ষিক মাত্র, নতুবা পদার্থাংশে যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাই। এখন দেখ তোমার আক্ষেপ, আকাঙ্ক্ষা, বা তর্কফলের যথার্থ অর্থ ধরিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, কেন তুমি বালকবৎ নিত্য অভিনবদর্শী হইয়া সৃষ্ট হও নাই। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও যে, তুমি কর্ম্মভূমিতে প্রেরিত হইয়াছ; এমন স্থলে তুমি যদি নিত্য অভিনব-প্রার্থী বালকবৎ হও, তবে আর তোমার দ্বারা কর্ম্মসাধন হইতে পারে কিরূপে?—বালকের দ্বারা কোন কর্ম্ম সাধন হয় না। দেখ, তুমি অনাস্থাদর্শী আর বালক অভিনবদর্শী; আবার তোমাদের ছাড়া আরও এক দল দর্শী আছে, যাহারা আজন্ম রথ দেখিয়া আসিয়া তথাপি

আবার দেখিবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়; ইহারা ভক্ত। তাহারা নিত্য রথ দেখিয়া আসিলেও, তথাপি যতবার দেখে, ততবারই সেই রথ তাহা-দিগের নিকট অভিনব, ততবারই তাহা চতুর্বর্গপ্রাপ্তির স্থল বলিয়া অনুভূত হয়। তুমিও সেইরূপ ভক্ত-দর্শক হও, দেখিতে পাইবে যে,এই নিত্যদৃষ্ট বস্তুতেই আবার কত কত অপূর্ব্ব ও অভিনব ভাব নিহিত হইয়া রহিয়াছে; তাহা হইলে এবং কেবল তাহা হইলেই, দৃশ্য এবং দর্শক উভয়েতে সার্থকতা অনুভব করিয়া আনন্দবান হইতে পারিবে।

কেবল এক সভক্তি চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বর অনুভূত এবং একমাত্র ভক্তিযুক্ত কার্য্যযোগে তিনি প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকেন। চেষ্টায় ভক্তিযুক্ত হওয়া, যে কোন সাধনার জন্যই একান্ত আবশ্যক হয়। রসায়নবিদ্যা শিখিতে গিয়া যে গোড়াতেই তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে, অথবা নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞান জন্য উহার বিবৃত বিবরণগুলি গোড়াতেই উল্লেখ মাত্রে অসম্ভব বোধ হওয়ায় যে উদ্যমশূন্য হয়, সে কখনও রসায়নবিদ্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পুনশ্চ, কেবল চেষ্টা হইলে হয় না, চেষ্টায় অধ্যবসায় চাই। অনেকে ক্ষেত্রতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া, কেবল রৈখিক মীমাংসা পর্য্যন্ত গিয়া, জীবনে রৈখিক মীমাংসার কি প্রয়োজন তাহা দেখিতে পায় না; সুতরাং পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত কোন রূপে তাহা স্মরণ রাখিয়া, পরে অনাবশ্যক বোধে তাহাতে জলাঞ্জলি দেয়। অবশ্যই, অনন্বিতভাবে, কেবল রৈখিক মীমাংসায় কিছুই প্রয়োজন বা ফল নাই; কিন্তু যদি তাহারা আরম্ভের সেই নিরাশকর-রূপে-প্রতীয়মান অংশ অতিক্রম করিয়া সফলতা যথায় সেই সীমা পর্য্যন্ত একবার যাইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা সকল দিকে সার্থকতা দেখিয়া চরিতার্থ ও আনন্দবান্ হইতে পারিত। অতএব অনেক চেষ্টাশীলেরও, অধ্যবসায় অভাবে চেষ্টায় নানা দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। আবার দেখ, অন্বেষণকারীর অন্বেষণ গভীর হইলেও, সে ব্যক্তি গভীরতার যতদূর সীমায় যাইতে সক্ষম বা যাওয়া উচিত ততদূর যদি না যায়, তবে একটু মাত্র ত্রুটিতে হয়ত সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবার কথা।

মনে কর, ৭০ ফুট বালি কাটিয়া মাটিপ্রাপ্তে নদীগর্ভে পুলের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে। সন্দেহবাদীদিগের কথা শুনিতে হইলে, হয়ত ১০ ফুট কাটিয়াই মাটি পাইলাম না ও পাওয়া যাইবে না বলিয়া, বালির উপরে ভিত্তি আরম্ভ করিতে হয়; এবং পুলও যে দৃশ্যতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সে ভিত্তির উপরে নির্ম্মাণ না করা যায় এমন নহে, কিন্তু বালির উপর সে কাণ্ড কয় দিন থাকে? তোমার কোম্‌তে আদি দার্শনিকনীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইলে, এই বালির উপর পুলের পত্তন হইয়া থাকে। যে পাকা ভিত্তি খুঁজিতে চায়, তাহার পক্ষে ৬৯ ফুট খুঁড়িয়া ক্ষান্ত হইলেও নিস্তার নাই; কারণ তোমার ৬৯ ফুটেও যে দোষ ১০ ফুটেও ত তাহাই! বাঞ্ছারাম, নিশ্চয় জানিবে, যেখানে আমার অনুসন্ধিৎসা শক্তির সীমা; ঠিক সেই খানেতেই, আমার ধারণার উপযোগী অবলম্বন পদার্থরূপী ঐশ্বরিক সত্তারও পূর্ণাবয়বে বিদ্যমানতা। উহা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই তদ্রূপ নিয়োজিত।

এই নাস্তিকতাবুদ্ধি, জ্ঞানপর্য্যায়বিশেষের বিপ্লবদশাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। উপার্জ্জনের কাল, বৃথা জল্পনে ব্যয় করিবার সময় নহে, তাহা পূর্ণ সাত্ত্বিক কাল; মানুষের তখন বাক্যাড়ম্বর থাকে না, মানুষ তখন ধীরে নিস্তব্ধে অথচ অধ্যবসায়পূর্ণ নিশ্চয়ভাবে উপার্জ্জনরত হইয়া থাকে। সর্ব্বকালেই নির্ব্বাকভাব কার্য্যক্ষমতার এবং বচনবাগীশী অকর্ম্মা ভাবের লক্ষণ। এ সাত্ত্বিক সময়ে চাতুরী, কাপট্য, অসত্য বা অপরিণামদর্শী প্রগল্‌ভ ভাব, বড় একটা স্থান পায় না; সুতরাং মানবও তখন প্রকৃত বলে বলী। সারল্য বলের চিহ্ন, কৌশল তাহার বিপর্য্যয়। উপার্জ্জনের পর ভোগের আরম্ভ, ভোগ হইতে স্বাভাবিক শক্তি ও ভাবাদির বিকার উপস্থিত এবং কৃত্রিম কৌশল বা অলঙ্কারের প্রতি রুচি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে; তখন আত্মিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষয় পায়, সকল কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইয়া উঠে এবং মহত্ত্ব ও গুণের প্রতি ভক্তি লোপ হইয়া যায়; তর্ক ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি এবং কৌশলসম্পন্ন বিষয় ও জটিলতাই প্রশংসাস্থলীয় হইয়া থাকে; অনুকরণপ্রিয়তা উপস্থিত হয়,

অথচ দিগ্বিদিক্‌কম্পিতকারী বাক্যাড়ম্বরের সীমা পরিসীমা থাকে না। আসল বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিরোধ হইয়া যায়,—নতুবা এই এক 'একতা', ইহার অর্থ বুঝিবার বা বুঝাইবার অভাবে সমগ্র ভারত ধ্বংস হয়! সত্যাবলম্বন ও স্বাভাবিক সরল বিষয় যাহা, তাহা প্রায়ই নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং তাহা বুঝাইতে কেহ আয়াস লয় না এবং বুঝিতেও কেহ মন দেয় না। সরল বলিয়াই সামান্য জ্ঞান; সুতরাং প্রকৃত বলের চিহ্ন যাহা, ঠিক তাহাই দুর্ব্বলের চিহ্ন বলিয়া উপেক্ষিত হয়। ভৌতিক সত্ত্ব ক্রমে ইন্ধন পাইয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু আত্মিক সত্ত্ব শীর্ণ হইয়া যায়। মানব সর্ব্বদা স্বাধীনচেতা হইবে বটে কিন্তু লাগামসংযুক্ত; কিন্তু এ সময়ে সে স্বাধীন-চেতা ভাবও নাই অথচ সে লাগামও নাই; স্বাধীনতা, তেজস্বিতা এবং আত্মসম্মানের নাম করিয়া কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব যদৃচ্ছা কোলাহলে যদৃচ্ছা তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া ধ্বংসরূপী ঘূর্ণাবর্ত্তের আবির্ভাব করাইয়া থাকে। শক্তি কখনও ধ্বংস হইবার নহে এবং নিষ্ফলও কখন হয় না; সুতরাং চালনার ফলে যখন যেরূপ তখন সেইরূপ ফল প্রসব করে মাত্র। সুপথগমনে যে শক্তি আগে যতটা সুফল প্রসব করিত,বিপথগমনে এখন তাহাই ততটা কুফল প্রসব করিয়া থাকে। যে হিন্দুশক্তি এতকাল সুশাসনস্থাপনে, শাস্ত্রপ্রকটনে, তত্ত্ব-উদ্ভাবনে এবং নানাবিধ মহৎ কার্য্যে অতিবাহিত হইত; এখনও সে শক্তি না আছে এমন নহে, এখনও তাহা তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু তাহা এখন প্রয়োগভেদে নিমকহালালী গোলামীকরণে, গোলামীর মহিমা-গানে, অলঙ্কারশাস্ত্রনিষ্পীড়নে, বটতলা উজ্জ্বল করণে, কাব্য নাটক ও নবেল লিখনে, বিলাতি দর্শনবিজ্ঞানের বচনবাগীশী বিলোড়নে এবং নাস্তিকতা ও পজিটিবগিরী বা পাষণ্ডতাকে মহত্ত্বের চিহ্নরূপে পরি-জ্ঞাপনে, পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। আশা কেবল এই, যথায় একের সীমা তথায় অপরের আরম্ভ;—বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের এ সকল উচ্ছৃঙ্খলতাও সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

নাস্তিকতা দুই প্রকার,এক ইচ্ছায় নাস্তিক,অপর বিপাকে নাস্তিক। ইচ্ছা-নাস্তিক যাহারা তাহারা ঈশ্বর না থাকেন, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি না থাকে, পাপ পুণ্য ও পরলোক বুদ্ধি না থাকে, ইহাই নিয়ত বাঞ্ছা করিয়া থাকে ;—ইহা হইলে তাহাদের কুকর্ম্মশীল জীবনের জন্য আর ভয় পাইতে হয় না, এবং এই হেতুই তাহারা নাস্তিক হইবার জন্য আগ্রহবান্। তাহারা আপন মনের স্বভাব অনুরূপ, মনঃপুত প্রমাণপদার্থাদি লইয়া মনঃপুত ফল আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অনেক কর্ম্মপশু আপন কর্ম্মভয়ে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা কায়িক বাচিক মানসিক বা সর্ব্বপ্রকার আপন কর্ম্মভয়ে, শান্তির আশায়, আগে এধর্ম্ম ওধর্ম্ম ও সেধর্ম্ম করিয়া এবং সকল ধর্ম্মেরই শাসন অল্প ইতরবিশেষে কঠোরতায় প্রায় সমান দেখিয়া,অবশেষে না-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বিপাকে নাস্তিকের ভাব সেরূপ নহে। ইহারা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অশেববিধ চেষ্টা করিয়া,শেষে চেষ্টাচালনায় ভ্রান্তগতি হওয়াতে অভীষ্ট বস্তুকে দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা নাস্তিকতার ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের উপর এখনও আশা করা যাইতে পারে, এবং এখনও ইঁহাদিগকে প্রকৃত ঈশ্বরের দাস বলিয়া গণনা করা যায়। ইহারা যে নাস্তিক হয়, তাহা পরিতাপের সহিত হইয়া থাকে। আরও এক শ্রেণীর নাস্তিক আছে, তাহা প্রধানতঃ কেবল আমাদের দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়,; এ নাস্তিকতার ভাব স্বতন্ত্র, ইহা কি বুদ্ধিচালনা, কি বিকৃত মতি, কি কর্ম্মদোষ,কি ভ্রান্তমতি, ইহার কিছুরই অনুসরণে নহে। ইহা সাময়িক সখ বা ফেসিয়ানের অনুসরণমাত্র। যে ফেসিয়ানের অনুসরণে কখন হিন্দু, কখন ব্রাহ্ম, কখন খ্রীষ্টান ; যাহার অনুসরণে দাড়ি চস্‌মা কোট পোষাকে নিত্য নূতন আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ; এ নাস্তিকতাও সেই ফেসিয়ান হইতে উৎপন্ন। কোন স্কুলপাঠ্য তর্কদর্শন, কোন শিক্ষকবিশেষের শ্লেষাত্মক বাক্যবিশেষ, বা ইয়ারগণের তদানীন্তন মতিগতি, তদ্রূপ মত পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট। বঙ্গসন্তান বাঞ্ছারাম যেমন সারশূন্য আস্তিকতায়

এবং ধর্ম্মপথে, তেমনিই সারশূন্য নাস্তিকতায় এবং অধর্ম্মপথে; অধিকন্তু উভয় দিকেই বচনের ছড়াছড়ি। বিপাক-নাস্তিক, ইচ্ছা-নাস্তিক ও ফেসিয়ান-নাস্তিক, এই ত্রিবিধ নাস্তিকের মধ্যে ফেসিয়ান নাস্তিকই সর্ব্বাপেক্ষা অধম। সত্য বটে যে, ইচ্ছা-নাস্তিক ঘোরতর কর্ম্মদূষিত, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভালয় হউক মন্দয় হউক, তাহার আত্ম-অস্তিত্ববোধ এখনও লোপ হয় নাই।

নাস্তিক-শিরোমণি বাঞ্ছারাম কথা কহিয়া, ইতিহাস খুলিয়া, নানারূপে সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকে যে, "তোমরা যে আস্তিকতাকে সকল মঙ্গলের নিদান বলিয়া থাক, তাহা বস্তুতঃ সকল মঙ্গলের নিদান নহে; কারণ এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম লইয়া যত বিগ্রহ বিপ্লব রক্তপাত ও নানা কুকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এত আর কোন বিষয় লইয়া হয় নাই; ধর্ম্ম যদি প্রকৃত মঙ্গলের নিদান, তবে তাহাতে এত অমঙ্গলের ঘটনা কেন? আর দেখ হিতবাদ বা সাম্যবাদ, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয়; তাহা হইলে এই পৃথিবী প্রকৃত স্বর্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় কি না?" ধর্ম্ম লইয়া যে এ পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, নাস্তিকতা লইয়া এ পৃথিবীতে যে কত কাণ্ড হইতে পারে তাহা এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নাস্তিকতা ভাল কি আস্তিকতা ভাল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে না। একবার, একবার এক মুহূর্ত্ত মাত্র,এ জগতে নাস্তিকতা,হিতবাদ, সাম্যবাদাদি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে ফরাসি-রাজবিপ্লব-রূপ কি ভয়াবহ ও রোমহর্ষণকর ফলই না উৎপন্ন হইয়াছিল!—ভীষণতায় সমগ্র জাগতিক ইতিহাসের কোথাও আর তাহার সমান তুলনা পাওয়া যায় না। জীবজগতের অপরাপর জীব সহ,মানবও একপ্রকৃতিবিশিষ্ট একটি জীববিশেষ; সুতরাং হিতাহিতশূন্য উন্মাদ ক্রূরবুদ্ধি ও পাশবভাব, অপরাপর পশুর ন্যায় মানবেও সমান অথবা মানব উচ্চ সৃষ্টি হেতু আরও অধিক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। পশু হইতে মানবের পার্থক্য কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্ম লইয়া;

এই জ্ঞান এবং ধর্ম্মই, স্বীয় শাসনবলে পাশবভাবকে প্রশমিত করিয়া, মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্বপথে লইয়া আসিতেছে। অবশ্য এমন প্রত্যাশা করিতে পার না যে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম, কাল ও ক্রমের অপেক্ষা না রাখিয়াই সহসা স্বীয় শাসনকে এমন প্রবলতর করিয়া তুলিবে যে, মানবের আত্মিক ক্রমোৎকর্ষের সহ সমতা ও সামঞ্জস্য অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারেই স্ব স্ব ভাবাধিপত্যের পূর্ণ ফল ফলাইতে সক্ষম হইতে পারিবে। আমরা দেখিতেছি, প্রকৃতি কোন কার্য্যই সহসা এবং সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া নিষ্পাদন করেন না;—তিনি করেন ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, অতর্কিত ভাবে এবং দেশ কাল ও ক্রমপরিণতি সহ গতির সমতা রাখিয়া। কালের গতি ও পরিণতি সহ যতই মানব পশুত্বত্যাগে মনুষ্যত্ব-পথে অগ্রসর হইতেছে, ততই জ্ঞান ও ধর্ম্মের শাসন দৃঢ় হইয়া আসিতেছে। এ সংসারে, আদিম অবস্থার শাসন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুখে যেমন ক্রমে শিথিল, পরবর্ত্তী অবস্থার শাসন উত্তরোত্তর মুখে তেমনি আয়ত্তকরী হইবাতে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ববিষয়ক অবস্থান্তর সকল সংঘটিত হইয়া আসিতেছে; এবং এই জন্যই, বাঞ্ছারাম, একজন আদিম অসভ্য ও তথা হইতে পর পর তোমা পর্য্যন্ত, মনুষ্যত্ব ভাবের এত তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পাশব বল সর্ব্বদাই অন্ধ এবং আত্মবলদৃপ্ত, সুতরাং সহসা শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে চাহে না; এই জন্য, ধর্ম্মের নামে এ জগতে কথিত যে সকল কুকাণ্ডের বিস্তার দেখিতে পাই, তাহা বস্তুতঃ ধর্ম্মের ফল নহে; তাহা ধর্ম্মশাসনের প্রতি পাশব ভাবের বিদ্রোহাচরণের ফল বা পাশব ভাবের যে অংশটুকু এখনও অশাসিত তাহার ক্রীড়া। জ্ঞান ও ধর্ম্মে মনুষ্যত্ব; এক্ষণে, তাহার অভাবে বা নাস্তিকতার প্রবর্ত্তনে কতদূর ও কিরূপ ফল যে ফলিতে পারে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা রাখে না। তবে সাম্য-বাদের সমতা যে তাহাতে পূর্ণভাবেই ফলিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই; কে বলিবে যে বানরমণ্ডলে ধনী আছে, দরিদ্র আছে, —চাবার ক্ষেত্র বা কলাবেগুনের গাছ সকলেরই নিকট সমান প্রাপ্য!

আর একটি কথা আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি

নাস্তিকতাই সত্য হয়, তবে এ সংসার চলিতে পারে কিরূপে? মানবের হিতাহিত-জ্ঞান না থাকিলে, পশুবংশের ন্যায় একরূপ চলিবার পক্ষে বাধা হইত না; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানের অস্তিত্ব যথায়, তথায় সেরূপ কোন মতেত চলিতে পারে না। পশুরা চলিয়া থাকে যথাপ্রকৃতি সহজ-বুদ্ধি অনুসারে; কিন্তু মানুষে বুদ্ধির আরোপাধিক্য হেতু, একমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা তাহা সুশাসিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এবং সে জ্ঞান ও ধর্ম্ম পুনঃ তখনই স্বপদে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়, যখন তাহার মূল উর্দ্ধদেশের সহিত সম্বদ্ধ হয়। ফলতঃ উর্দ্ধদেশের সহিত বন্ধনশূন্য হইলে, আমাদের সকল কার্য্য, সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল নীতি, সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম্ম, সমস্তই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। তখন ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা, হিত এবং অহিত, স্বদেশপ্রিয়তা, সহৃদয়তা, এ সকল অর্থহীন ও মনুষ্যনির্ম্মিত নির্ব্বোধের বন্ধনপাশ হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রতি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার প্রতি নূতন অসুখের কারণ স্বরূপ হয়, যেহেতু প্রতি আবিষ্কার নূতন অভাবের উৎপাদক এবং অভাবই এ সংসারে দুঃখের কারণ স্বরূপ হয়। তখন সভ্যতার বৃদ্ধি, প্রয়োজন-জালের বিস্তার হেতু কেবল কষ্টজীবনের বৃদ্ধি বলিতে হইবে। আর যদি বল যে তাহা নহে, সভ্যতার বৃদ্ধি অবশ্যই সুখজীবনের বৃদ্ধি; তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতে হয় যে, তুমি সে কথা বলিবে বটে কিন্তু তোমার শ্রেণীর অতীতস্থ আর কেহ সে কথা বলিবে না। প্রকৃত সুখজীবন তাহাকে বলা যায়, যাহা আপেক্ষিক বুদ্ধিজাত ধারণা জন্য নহে; কিন্তু তোমার সভ্যতাজন্য যে সুখজীবন, তাহা সম্পূর্ণই আপেক্ষিক বুদ্ধিজাত; —নতুবা ঐ দেখ, যে সুন্দর বসনে তুমি সন্তোষ লাভ করিতেছ, অসভ্য অরণ্যবাসী তাহা টুকরা টুকরা করিয়া হেয়-নিক্ষেপ করিয়া ফেলিতেছে; যে পানভোজনাদিতে তুমি অশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাক, অন্যে হয় ত তাহাতে ঘৃণায় নাকে হাত দিয়া অন্তরে সরিয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি। আসল কথা বাঞ্ছারাম,যদি এ জীবন ও জীবনব্যাপারের পরিণাম কিছু না থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলেই বাতুলালয়ে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছি। যে

ব্যক্তি প্রতিভাশালী এবং নূতনত্বের উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক, তাহাপেক্ষা সমাজের দ্বিতীয় প্রবল শত্রু ও অনিষ্টকারী আর কে হইতে পারে? যে ব্যক্তি তোমার স্বদেশপ্রিয়, যে সহৃদয়, যে পরহিতের জন্য কাতর, আমি বলি প্রথম নম্বরের পাগল সেই; কারণ এরূপ সংসার যথায়, তথায় স্বার্থপরতাই একমাত্র উপাস্য দেবতা হওয়া উচিত। তুমি বলিবে পরহিতও ভাল বিষয়, কিন্তু আমি বলি এই "ভাল বিষয়" কেবল তোমার কথায়, তদ্ভিন্ন উহার অন্য কোন মূল নাই; ওরূপ মতি ও মত তোমার মস্তিষ্কের শিরাধমনীর আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনের একটু এদিক ওদিকের ফল মাত্র এবং আমরা জানি তদ্রূপ আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। "অন্যের প্রতি সেইরূপ হিত আচরণ করিও যেরূপ তোমার প্রতি আচরিত হওয়ার বাঞ্ছা করিয়া থাক"—ইহাই যদি তোমার নীতিমূল হয়, তাহা হইলে দেখ ইহা দ্বারাও সেই আত্ম-স্বার্থের গৌরব সূচিত হইতেছে, যেহেতু প্রতিদানে যে টুকুতে আমার ভাল, কেবল সেই টুকুই অপরের জন্য করিব; নতুবা তদতিরিক্ত কিছু করিলে কেবল আমার নিজের লোকসান এবং তেমন স্থলে কে না বলিবে যে আমি অঘোর নির্ব্বোধ নহি। আমি আমার স্বার্থসুখ সহ বলি হইলাম, দেশ বা আর দশ জনে তাহাতে উপকার লাভ করিল; ইহাতে আমার লাভের অংশ কি? আমার অংশ জীবনান্ত বা জীবনান্তবৎ ক্ষতি স্বীকার! আরও প্রথম নম্বরের পাগল কাহাকে বলে? জীবনের অন্য পরিণাম না থাকিলে, একমাত্র সুখই জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং নাস্তিক্যজ্ঞানবাদিগণও তাহাই ঘোষণা করিয়া থাকে; এরূপ স্থলে পরহিতের জন্য যে আত্মসুখের হানি করে, তাহাপেক্ষা আরও পাগল কে? হিন্দু শাক্যসিংহ, হিব্রু যিশুখৃষ্ট, সামান্য লোকের মধ্যে গ্রীক লিওনিদা প্রভৃতির ন্যায় বোকা ভূভারতে নাই। জগতের অপরাপর হিতের জন্যও যাহারা জীবনের সাধারণ সুখাদিকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, যথা নিউটন, কলম্বস প্রভৃতি; তাহারাও সামান্য বোকা নহে এবং এ সকল বোকাও যদি চিরস্মরণীয় হইতে পারে, তবে

নিশ্চয়ই সে কেবল তাহাদের অসাধারণ বোকামিত্বের জন্য! কেহ কেহ হয় ত ভাবে, জীবন উৎসর্গ করার একটা প্রধান ফল ও প্রধান সুখ যশ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন আমার যশোগান করিবে, আমি তখন থাকিব কোথায়? তবু যদি আমি সেই যশের লোভে মজিয়া যাই, তবে আকাশকুসুমে অপরাধ করিয়াছে কি? ভোগী থাকিলেই ভোগ্যের মূল্য, অতএব আমি যখন থাকিব না, তখন আর সে যশের মূল্য কি এবং তাহার জন্য যে সুখ, তাহাই বা ভোগ করিবে ও ভোগ করিতে আসিবে কে? তাই বলি এরূপ যে যশের ইচ্ছা, তাহাও সেই মস্তিষ্কের শিরা ধমনী আদির বিকৃত আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চনের ফল; এবং তেমন স্থলে, তদ্রূপ সকল কর্ম্মের মূলদেশে বস্তুতঃ একমাত্র খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছুই দাঁড়ায় না। 'নিজের লোকসানে দশ জনের ভাল,' 'স্বকপোলকল্পিত ও মূলশূন্য ন্যায়-অন্যায় বুদ্ধির ভ্রমে সংযম ও সম্ভোগবিরতি,' এই সকল খেয়ালকে অবলম্বন করিয়া যাহারা আত্ম-বঞ্চনা ও নানারূপ চিত্ততৃপ্তিকর পদার্থভোগ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাদের তুল্য আরও অধিক দুর্ভাগ্যবান্ কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, এ জগৎ কেবল সেই খেয়ালী পাগল, বোকা বা দুর্ভাগ্যবানের দল হইতেই যাহা কিছু চির-উপকৃত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, সুবুদ্ধিদলের দ্বারা কখন হয় নাই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—দেখা যাইতেছে যে ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিয়াও, বুদ্ধিমানগণের সুখের অঙ্কে সঙ্কুলান হওয়া দূরে থাকুক, বরং পদে পদে লাঞ্ছনা সহ অকুলান পড়িয়াই গিয়াছে; আর পাগল যাহারা, তাহারা বুদ্ধিমানদিগকে ঋণ দিয়াও, হাসিতে হাসিতে উজ্জ্বল কোলাহলপূর্ণ আনন্দ সহ এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে!

নাস্তিক্যবুদ্ধি ব্যক্তি 'সুখ'রূপ ফলের জন্য কিছু অধিক আগ্রহবান্ এবং তাহার বিবেচনায় উহাই এ জগতে এবং এ জীবনে একমাত্র আকাঙ্ক্ষ-ণীয় পদার্থ; আস্তিক্যবুদ্ধিও যে সাধারণতঃ 'সুখ' পদার্থের জন্য কিছু

কম ব্যস্ত তাহা নহে। তবে কি না সুখ-ধারণা ও ধারণামূল, উভয়েতে স্বতন্ত্র। 'সুখ' পদার্থ কি ?—ইহাতে যাহার যেমন ধারণা, সকলে সেই স্ব স্ব ধারণা অবলম্বনে তদাশয়ে, নিজ-কৃত ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে বিঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছে; এবং সতে বা অসতে যথায় যখন স্বীয় কল্পিত সুখের ছায়াপাত দেখিতেছে তখন তথায়, সতে বা অসতে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কখন আত্মতৃপ্তি, কখন বা আমূলতঃ আত্মধ্বংস করিতেছে। সুখ পদার্থকে একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে এবং সুখপদার্থ কি তাহার ধারণা ও ধারণামূল প্রকৃত না হইলে, কাজেই এরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কেবল জীবনসুখান্বেষীদিগের সুখের ধারণা, সাধারণতঃ বাহ্য সম্পদ বা ভোগে নিহিত; লোকেও সদসৎ নানা পথে জীবন মন বিক্রয় করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হায়! তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাতে তাহাদের অসুখ-পদার্থের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। সুতরাং এরূপ সুখের ধারণা ও তদনুসরণপ্রণালী এ দুইই যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে তাহাতে এরূপ ফল ফলিবে কেন? এ দিকে কিন্তু প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকেন যে, অপার সম্পদে ও ভোগেও মানব অসুখী, অথচ অসম্পদে ও অভোগেও অনেক মানুষ সুখী। ইহার কারণ? বাঞ্ছারাম, সুখ বাহ্য সম্পদে বা ভোগে নহে, এবং সুখও ক্ষণিক চিত্তোন্মাদ নহে। চিত্তের যে তৃপ্তি,যাহাকে চিত্তপ্রসাদ বলে, তাহাই প্রকৃত সুখ। সে সুখ একমাত্র সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যসাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার জীবন, যথেষ্ট ধারণা অনুরূপ, আমূলতঃ সাত্ত্বিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ; তাহার চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বক্ষণ এবং সেই ব্যক্তি কেবল এ জগতে প্রকৃত পক্ষে সুখী। সুখ কর্ত্তব্যসাধনের মজুরীস্বরূপ। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া সুখের প্রার্থনা করা, আর মজুরের কার্য্য না করিয়া মজুরী প্রত্যাশা করা, উভয়ই সমান। জ্ঞানীরা সুখের মূল স্বরূপ কর্ত্তব্যসাধনকে জীবনের উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকেন, এবং সুখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তাহার অনুসরণ করেন; এই জন্য তাঁহাদের দ্বারা জগতও স্থায়িরূপে উপকৃত হয়, অথচ সুখও

তাঁহাদের অযাচিতের ন্যায় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাবে যে সুখের ধারণা, তাহা মূলশূন্য ধারণা সুতরাং যদৃচ্ছা-কল্পিত ও বিকৃত; এ নিমিত্ত তাহার অনুসরণক্রিয়া ও ফলও তদ্রূপ বিকৃত এবং পরিণাম-বিরস হইয়া থাকে। অতএব কেবল "সুখ" "সুখ" করিয়া মাতালের ন্যায় ভ্রান্তিমদে মাতিয়া বেড়াইও না। যেমন তোমার মূলশূন্য বিকৃত সুখচেষ্টা অনীতি ও অহিতাদির কারণ স্বরূপ হয়, তোমার যশের চেষ্টাও তদ্রূপ; কারণ উহাও কর্ত্তব্যসাধনের পুরস্কার বিশেষ বা সুখের অংশ-কলা, উহাও সুখের ন্যায় সুখেরই জন্য অনুসর্ত্তব্য নহে। পুনশ্চ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতীত, কেবল যশঃপ্রার্থী কখন এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না; যশ উপার্জ্জনে কোথাও না কোথাও তাহার গোল পড়িয়া যায়ই যায়। ভাল, আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যশ কত দিনের বস্তু? কাল যথায় অনন্ত, তথায় যশ দ্বিসহস্র বা দ্বিলক্ষ বর্ষ স্থায়ী হইলেও ত তাহা মুহূর্ত্তবৎ! মুহূর্ত্ত এবং বর্ষে প্রভেদ কি? ইহার ধারণা কি এতই কঠিন?

সুখের ধারণা নাস্তিকদিগের সর্ব্বদাই বিকৃত, তাহার কারণ ঊর্দ্ধ-দেশের সহ সংস্রব ছিন্নে তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব। সুখ-ধারণায় নাস্তিকের মূল,বাসনা মাত্র; আর আস্তিকের মূল, কর্ত্তব্যবুদ্ধি। যাহা হউক, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন নাস্তিক এখনও আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়ায়; কেহবা আপনার ক্ষতি করিয়া অন্যের হিত করে; এবং সকলেই গুরুর প্রতি ভক্তি, লঘুর প্রতি দয়া, সদাচার, সত্যাসত্য, ইত্যাদির মোহ একবারে ছাড়াইতে পারে নাই। সাধ্য কি? পথে হউক অপথে হউক, মানব স্বয়ং কর্ম্ম-ক্ষম বলিয়াই যে সে সকলকর্ম্মক্ষম তাহা নহে, তাহারও সীমা আছে। সুপথমুখে হউক বা কুপথমুখে হউক, তাহার সাধ্য কি যে প্রকৃতির যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডি তাহা একবারে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন হয়। অতএব নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়ায়,—যথায় অপরে জীবন্ত বৃক্ষের পুষ্পঘ্রাণে আমোদিত, ফলের রসাস্বাদনে তৃপ্ত, নবপত্র

পুঞ্জের শৈত্যে শান্ত, এবং বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমকুলকলে মোহিত হইয়া থাকে; তথায় নাস্তিকেরও সেইই বৃক্ষ আশ্রয় বটে কিন্তু বৃক্ষ এখানে ছিন্নমূল হেতু ফুল শুষ্ক নির্গন্ধ, ফল রসশূন্য বীতস্বাদ, পত্র শুষ্ক তাপোত্তেজক এবং কোন বিহঙ্গম আসিয়া সে বৃক্ষে আশ্রয় লয় না—যদি আসে ত সে দাঁড়কাক! কি সুখ! কি তৃপ্তি! ইহাদের নিকট বিশ্বস্থ তাবৎ বিষয় বন্ধনশূন্য এবং বিকৃত; তত্ত্বস্থলে তাবৎ বিষয়েরই মূল অনিরূপিত, অনির্দ্দিষ্ট বা কল্পনায় নিহিত; সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ও সামঞ্জস্যশূন্য; বহুত্বই সর্ব্বত্র, একত্ব কোথাও নাই। কিন্তু যথায় তদ্রূপ দুষ্ট বুদ্ধির অভাব, তথায়?—সর্ব্বত্রই বহুত্বের মধ্যে একত্ব বিরাজিত; সর্ব্বত্রই সকল বিষয় দ্বন্দ্ব-নিরাকৃত হইবাতে মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সমাহিত হইয়াছে। মধ্যবিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া তাবৎ বিষয় দিগন্ত-প্রসারিত হইতেছে, আবার সে সকলই পুনঃ পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সংমিলিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্য ও সুতানলয়ের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। কি অচিন্তনীয়! কি অনন্ত-বিকাশী লীলা-প্রকট!

যখন মানবীয় সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তি ও বৃত্তিজাত বিষয়, যথা বুদ্ধি বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি, পর পর পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয়; তখন বলা বাহুল্য যে, আস্তিকতা ও তাহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। যে কোন বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা এবং বিকারে, বস্তু ফলতঃ উভয়েতে এক; প্রভেদ কেবল অবস্থাদ্বয়ের ভাব-ভেদমাত্র। অতএব যখন যে প্রকৃতির আস্তিকতা, তখন নাস্তিকতাও সেইরূপ প্রকৃতির হয়। আস্তিকতা যখন উন্নত বা অবনত, নাস্তিকতাও তখন তাহাই। আস্তিকতা যখন দেবতত্ত্ব লইয়া, নাস্তিকতাও তখন দেবতত্ত্ব লইয়া। আস্তিকতা যখন জ্ঞানকাণ্ডের উপর, নাস্তিকতাও তখন জ্ঞানকাণ্ড-আশ্রয়ী। আস্তিকতা যখন বৈজ্ঞানিক, নাস্তিকতাও তখন বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই বৈজ্ঞানিক; বর্ত্তমান বঙ্গীয় আস্তিকতা

ও নাস্তিকতা উভয়ই ফেসিয়ান-প্রাণ। আমরা যে সময়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ের আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই আংশিক দেবতত্ত্ব এবং আংশিক জ্ঞান-কাণ্ড-আশ্রয়ী। গ্রীকের নাস্তিক-শিরোমণি এপিক্যুরস্; হিন্দুর নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাকদর্শন-প্রণেতা ধীবণ নামক ব্রাহ্মণসন্তান।—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

গ্রীকভূমে তত্ত্ববদ্ধ নাস্তিকতা আরিষ্টিপুসের সময় হইতে দৃষ্ট হয়। আরিষ্টিপুসের পূর্ব্বগত তত্ত্ববিদ্‌বর্গের মধ্যে যদিও বহু পরিমাণে নাস্তিকতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আরিষ্টিপুসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব কাণ্ডস্বরূপে শ্রেণীনিবদ্ধ হয় নাই। আরিষ্টিপুস্ তত্ত্ববিদ্যার ব্যবসায়ী ছিল। এই ব্যক্তি সক্রেতিসের নিকট তত্ত্বশিক্ষা করে, কিন্তু শেষে আত্মবুদ্ধির কৌশলে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিল। আরিষ্টিপুস্ প্লেটোর সম-সাময়িক লোক। ইহার বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যে যেমন সেইরূপ হইয়া মিলিত হইতে পারাই, তত্ত্বজ্ঞান-লাভের একটি বিশেষ ফল। ইহার মতে পরম পুরুষার্থ,—'যে কোন উপায়ে সুখ বা প্রমোদলাভ এবং তাহা যদি কোন অপকৃষ্ট বা ঘৃণিত উপায় দ্বারা সাধিত করার প্রয়োজন হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।' আরিষ্টিপুস্ বলিত, 'শারীরিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শারীরিক দুঃখ মানসিক দুঃখ অপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীতে সুখ এবং দুঃখ এই দ্বিবিধ পদার্থ আছে, লোকে যে কোন দ্রব্য সুখজনক তাহা আহরণ করিবে এবং সেইরূপ যে কোন দ্রব্য দুঃখজনক তাহা যে কোন উপায়ে পরিহার করিবে।'

আরিষ্টিপুস্ অতিশয় কুতার্কিক ছিল এবং কুতর্কযোগে অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ বলিয়া ভুলাইত। একদা প্লেটো তাহাকে অমিত-ব্যয়িতার জন্য ভৎর্সনা করায়, আরিষ্টিপুস্ প্লেটোকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিওনিস্যুস্ ভাল লোক কি না?"

প্লেটো। "ভাল।"

আরি। "দিওনিস্যুস্ আমার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করে

অথচ সে ভাল ; অতএব দেখ অধিক ব্যয় করা ও ভাল মানুষ হওয়া, এ দুইই এক সঙ্গে না হইতে পারে এমন নহে।”

একদা কোন ব্যক্তি আরিষ্টিপুস্‌কে একটা বেশ্যা লইয়া ঘরকন্না করার নিমিত্ত ভৎ'সনা করিলে,

আরি। “ভাল, একটা বাড়ী যথায় বহুলোক বাস করিয়া গিয়াছে তথায়, এবং যথায় কেহ কখন বাস করে নাই তথায়, এ দুই স্থানে বাস করায় কিছু প্রভেদ আছে কি না ?

উত্তর। “না।”

আ। “যে জাহাজে আগে বহু সহস্র লোক পার হইয়া গিয়াছে. এবং যাহাতে কেহ কখন পার হয় নাই, এই দুয়ে পার হওয়ায় কিছু প্রভেদ আছে কি না ?

উ। “না”।

আ। “এখানেও ঠিক তাহাই, একটা স্ত্রীলোক যাহার সঙ্গে বহুলোক সহবাস করিয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন উপগত হয় নাই, আমার পক্ষে এ উভয়ই সমান।”

এই স্ত্রীলোকটী গর্ভিণী হইলে, আরিষ্টিপুসের নিকট প্রকাশ করে যে তাহা কর্তৃক তাহার গর্ভ ধারণ হইয়াছে ; ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি আরিষ্টিপুসের উত্তর—“সেকি কথা বল, কাঁটাবন বেড়াইয়া কেহ কবে বলিতে পারে কি যে কোন কাঁটায় আঁচড় লাগিয়াছে!” এরূপ তর্ক ও বুদ্ধি খরচে আরিষ্টিপুসের শিষ্য থিওডোরুস্ আরও পণ্ডিত। এই ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী ছিল ; তজ্জন্য ইহার তর্ক এইরূপ ছিল ঃ—

থি। “যে স্ত্রীলোক শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না ?”

উ। “অধিক।”

থি। “যে বালক বা যে যুবা যে পরিমাণে শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না ?”

উ। "অধিক।"

থি। "এই নিয়ম অনুসারে যে স্ত্রীলোক বা যে বালক যে পরিমাণে সুন্দর, সে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কি না?"

উ। "শ্রেষ্ঠ।"

থি। "যে যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "ভাল, তাহা যদি হইল, তবে এখন দেখা যাইতেছে যে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহা অপরের দ্বারা সম্ভুক্ত হওয়া; আমিও সেই সম্ভোগ করিয়া থাকি মাত্র। প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজনীয় ভাব পালন করাই ন্যায়সঙ্গত, তদন্যতর অন্যায়, আমি সেই অন্যায় কার্য্য করি না।"

ইহারা অর্থপ্রাপ্তির জন্য যে কোন প্রকার নীচতা স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিল না। দিওনিস্যুসের নিকট আরিষ্টিপুস্ একদা অর্থ যাচ্ঞা করায়, দিওনিস্যুস্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল "তুমি বলিয়াছিলে না যে, জ্ঞানীদিগের কখন অভাব হয় না?"

আরিষ্টিপুস্,—"আগে আমাকে কিঞ্চিৎ দিউন, পরে যাহা বলিবেন তাহার উত্তর দিতেছি"।

দিওনিস্যুস্ কিঞ্চিৎ দান করিলে পর, অর্থ দেখাইয়া—"এই দেখুন আমার কথা সত্য কি না।" আর এক সময়ে,

দি। "কি জন্য তুমি এখানে আইস?"

আ। "যখন তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক ছিল, তখন সক্রেটিসের দুয়ারে যাইতাম; এখন অর্থের আবশ্যক, এখন কাজেই তোমার দুয়ারে আসিয়া থাকি।" আরও এক সময়,

দি। "তত্ত্ববিদেরা কি কারণে ধনীর দুয়ারে আসিয়া থাকে, কই ধনীরাত তত্ত্ববিদের দুয়ারে যায় না?"

আ। "তাহার কারণ, তত্ত্ববিদেরা আপন অভাব যাহা তাহা বুঝে; কিন্তু ধনীরা আপন অভাব কি, তাহা বুঝে না।"

ইহার মতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতে, ভাঙ্গা এবং আভাঙ্গা ঘোড়ায় যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। আরিষ্টিপুসের শিক্ষায়, 'ন্যায়' 'যশ' 'অযশ' বলিয়া বস্তুতঃ কোন পদার্থ নাই; লোকের মনের খেয়াল হইতে ঐ ঐ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন ও বদ্ধমূল এবং ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

থিওডোরুসের মতে,—'সুখ এবং দুঃখ, এই দুইটি মুখ্য বস্তু। সুখ জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়, দুঃখ অজ্ঞান হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। বন্ধুত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ তাহা কি নির্ব্বোধ কি জ্ঞানী কাহারই কোন কার্য্যে লাগে না; যেহেতু, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট কার্য্য উদ্ধার হইলেই বন্ধুত্বের কারণ লোপ হইল; দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানী যাহারা তাহারা আপনাতেই আপনি পূর্ণ-আত্মা, সুতরাং তাহারা অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। থিওডোরুসের মতে বিজ্ঞতাটা অতি প্রধান গুণ। যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, সে কখন স্বদেশপ্রিয়তার মোহে আশঙ্কার স্থলে পা দেয় না, কারণ কি জন্য সে পাঁচ জন মূর্খের মঙ্গল হেতু আপনার বিপদ জড়াইতে যাইবে;—বিশেষতঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানী, দেশ তাহার নিকট কোন সীমাবদ্ধ স্থান নহে, সমস্ত পৃথিবীই তাহার দেশ। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে স্বচ্ছন্দে চুরি, বেশ্যাগমন বা যে কোন অপকর্ম্ম সময় সুযোগ ও ইচ্ছামত করিতে পারে; কেবল এই পর্য্যন্ত তাহার দেখিয়া চলা আবশ্যক যে, যে সকল নির্ব্বোধমণ্ডলীর ধারণা অনুসারে ঐ ঐ গুলি অপকর্ম্ম বলিয়া গণিত, তাহাদের দৃষ্টিতে যেন সে না পড়ে, কারণ, সমাজ রক্ষা করাও একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানী ব্যক্তি দেশকালপাত্র বজায় রাখিয়া, যে কোন বিষয়ে মনের সাধ মিটাইতে পারেন। এইটি সত্য এইটি অসত্য, ইহা সৎ উহা অসৎ, ইত্যাদি যে ভেদবুদ্ধি, তাহা কেবল লোকের যদৃচ্ছা ধারণা ও চিরচলিত রীতি হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তদ্ভিন্ন উহাদের অন্য কোন অর্থ বা মূল নাই।' ইত্যাদি। ইহাই অল্প ইতরবিশেষে আরিষ্টিপুসের সাম্প্রদায়িক তাবৎ নাস্তিকের মত। আরিষ্টিপুসের সম্প্রদায় ব্যতীত, ইউক্লিড ও বিওন প্রভৃতি আরও বহুতর নাস্তিক তত্ত্ববিৎ ও তাহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে নাস্তিকতা-পর্ব্বে চার্ব্বাক-দর্শন, তৎপূর্ব্বগত বৃহস্পতিসূত্র, এবং তৎপূর্ব্বগত রামায়ণস্থ জাবালির উক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। জাবালির উক্তি রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। জাবালি রামকে বুঝাইতেছেন,—

"রাম, তুমি সুবুদ্ধি এবং তপস্বী, সামান্য মানবের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য-প্রতিপালন-বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। কিন্তু পিতা পুত্র সম্বন্ধই মিথ্যা ; এ জগতে কে কাহার বন্ধু, কাহার দ্বারা কোন পুরুষ কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, আর একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর, কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে গমন করতঃ কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, তেমনি পিতা মাতা গৃহ ধন সম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাস মাত্র। হে কাকুৎস্থ ! সজ্জনগণ এ বিষয়ে সংসক্ত হয়েন না।" পুনশ্চ,

"দশরথ তোমার কেহই নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ, রাজা স্বতন্ত্র, তুমি স্বতন্ত্র, অতএব আমি যাহা কহিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবগণের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ মাত্র ; ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উৎপাদনের কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে পুরুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি ? ভূত সকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে নিস্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে তৎপর হয়, আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি ; অন্যের জন্য শোক করি না, কেননা তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিতে যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, সে কেবল নিজ ভোগসাধন অন্নাদির হেতু ; দেখ মৃত ব্যক্তি

কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অপরের কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে গমন করে, তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক, কৈ এরূপ করিলে তাহাতে ত পথিকের পাথেয় হয় না। দেব-পূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, তপস্যা কর এবং সন্ন্যাস অবলম্বন কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায় স্বরূপ বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থসম্পাদন কারণ ও পামরগণ বঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। হে মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিতে ইহা বিজ্ঞাত হও, যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহারই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানাদিগম্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর।"[১]—উপরে উদ্ধৃত অংশ প্রক্ষিপ্ত বা যথার্থতঃই বাল্মীকির লেখনীনিঃসৃত কি না, সে মীমাংসা স্বতন্ত্র। সে মীমাংসার স্থান এখানে নহে।

এক্ষণে বৃহস্পতিসূত্রস্থ বুদ্ধিযোগে তর্কসমুদ্র মন্থনের ফল দেখা যাউক। "কামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ" কামশাস্ত্রানুসারে অর্থ এবং কামই পুরুষার্থ। চার্ব্বাকমতে "অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ" অঙ্গনাদিগের আলিঙ্গনাদি জন্য যে সুখ, তাহাই পুরুষার্থ। বৃহস্পতিসূত্র হিন্দুনাস্তিকগণের বেদস্বরূপ। হিন্দুদিগের মধ্যে সকল আস্তিক তত্ত্বই যেমন বেদের দোহাই দিয়া থাকে, তেমনি সকল নাস্তিক তত্ত্ব বৃহস্পতি-সূত্রের দোহাই দেয়। এখন দেখ বৃহস্পতির শেষ শিক্ষা কি[২], —"স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকগামী আত্মাও নাই। বর্ণ[৩] আশ্রমাদির ফলদায়িকা যে কোন ক্রিয়া তাহাও কিছু নাই। অগ্নিহোত্র,

---

১। বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীর প্রকাশিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৮ সর্গ; অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির অনুবাদ।

২। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-ধৃত বৃহস্পতিবাক্য। এ অবশ্যই নকল বৃহস্পতি, দেবগুরু নহেন।

৩। নাস্তিকদিগের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, এবং তাহারা স্বীকারও করে না। বর্ণাশ্রমাদি যে সিদ্ধ নহে, নাস্তিকের প্রদর্শিত তদ্বিষয়ক কারণ বা বিচার নৈষধকার চার্ব্বাকের মুখ দিয়া এরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শুদ্ধির্বংশ দ্বয়ী শুদ্ধৌ পিত্রোঃ পিত্রোর্যদেকশঃ।
তদনন্তকুলাদোষাদদোষা জাতিরস্তিকা॥"—নৈষধ, ১৭ সর্গ।

বেদত্রয়, দণ্ডধারণ, ও ভস্মগুণ্ঠন, এ সকল বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। জ্যোতিষ্টোমে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কি জন্য আপন পিতাকে সেইরূপে হিংসা না করিয়া থাকে? —(যেহেতু পিতাকে স্বর্গে পাঠানর পক্ষে উহা অতি সহজ উপায়)। যে সকল জীব মৃত, শ্রাদ্ধ যদি তাহাদের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে এথান হইতে দূরগামী ব্যক্তির পাথেয় কল্পনা করার আবশ্যকতা কিছুই নাই। এথান হইতে কৃত দানে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হয়, তবে এথানে প্রদত্ত দ্রব্যে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ না হইবে কেন? অতএব সে সকল কোন কাজের কথা নহে। যতকাল বাঁচিবে, সুখে কাটাইবে, এবং ধার করিয়াও যদি ঘৃতাদি সুখকর দ্রব্য খাইতে হয়, তাহাও খাইবে; কারণ এই দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে আর তাহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। যদি আত্মা এই দেহ পরিত্যাগান্তে পরলোকে যাইতে পারিত, তবে কি জন্য সে বন্ধুস্নেহসমাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ না আইসে? মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্যের আর কোন অর্থ দেখিতে পাই না,কেবল এক ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় বলিয়াই বিহিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ধূর্ত্ত ভণ্ড ও নিশাচর, এই তিন জন বেদের কর্ত্তা।"

চার্ব্বাক কেবল উক্ত মত, প্রমাণাদি প্রয়োগ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। ইহার মতে ভূত চতুর্ব্বিধ,ক্ষিতি,অপ্,তেজ ও মরুৎ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যসংযোগে মদ প্রভৃতি বিভিন্নগুণবিশিষ্ট এক একটি অন্যতর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগেও তেমনি চৈতন্যের উদয় হয়; আবার সেই সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলেই চৈতন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে পরলোক বা প্রেত কল্পনার কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহে দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে সে পক্ষে প্রমাণাভাব, সুতরাং তাহা অসিদ্ধ। প্রমাণ একমাত্র যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই গ্রাহ্য; অনুমানাদি প্রমাণ নহে। ইহার মতে ইষ্টানিষ্ট বা অদৃষ্ট নাই, জগদ্বৈচিত্র আকস্মিক এবং স্বভাব হইতে

উৎপন্ন। অঙ্গনা-আলিঙ্গনাদি জন্য সুখপ্রাপ্তিই একমাত্র পুরুষার্থ, মানব তাহারই অনুসরণ করিবে। সুখ প্রাপ্ত হইতে হইলে দুঃখও অপরিহার্য্য, যেহেতু সকল বস্তুই সুখদুঃখজড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া সুখানুসরণে ক্ষান্ত হইবে না। তাহা এইরূপ উপমা দ্বারা দেখান হইয়াছে, —দেখ মৎস্যে শল্ক কণ্টকাদি আছে, তাই বলিয়া কি কেহ মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে; অথবা ভিক্ষুকে জ্বালাতন করে বলিয়া কে বল অন্নাদি পাক করিয়া না খায়, ইত্যাদি। যদি কোন ভীরু দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করে,তবে সে পশুবৎ মূর্খ। "যদি কশ্চিৎ ভীরুঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।"

অতঃপর গ্রীক নাস্তিকচূড়ামণি এপিক্যুরসের নাস্তিকতার সারতত্ত্বগুলির কোন কোন অংশ, অগ্রে দিওগিনীস লেয়ার্টিয়স হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"যাহা তৃপ্তিকর এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, যাহা স্বয়ং ক্লেশাত্মক নহে বা অন্যের পক্ষেও ক্লেশকর হয় না; পুনশ্চ যাহা অন্যের ক্রোধ বা অকৃতজ্ঞতার কারণোদ্দীপক হয় না, তাহাই পরম পুরুষার্থ ও প্রকৃত সুখপদার্থ স্বরূপ।

"মৃত্যু কিছুই নহে; কারণ, যাহার ধ্বংস হয় তাহার অনুভবশক্তি রহিত হইয়া থাকে; যখন অনুভবশক্তি রহিত হয়, তখন তাহা অবশ্যই আমাদিগের নিকট কিছুই নহে।

"ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলিলে, প্রকৃত সুখসম্পৃক্তরূপে জীবনাতিবাহন করা অসম্ভব; অথবা প্রকৃত সুখসম্পৃক্তরূপে জীবনাতিবাহন করিতে গেলে, ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলে, সে কখন সুখী হইতে পারে না।

"যে কোন প্রকারে উৎপন্ন সুখ বস্তুতঃ মন্দ নহে; কিন্তু যে যে কারণযোগে সেই সুখের উৎপত্তি হয়, তাহার আনুষঙ্গিক ব্যতিক্রমগুলির প্রাচুর্য্য হেতুই তাহা দূষণীয় হইয়া থাকে।

"কেবল মনুষ্য-সম্ভব ও মনুষ্যসাধ্য সুখকর বস্তুর আয়োজন করিতে পারিলেই যে মানুষ সুখী হইয়া থাকে এমন নহে; যে পর্য্যন্ত পরলোক, নরক ও অপরাপর অদৃষ্টশক্তি প্রভৃতি ভয়ের কারণ সকল নিরাকরণ করিতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত সুখের সম্ভাবনা অতি অল্পই।

"অপরিমিত ক্ষমতা এবং ধন, মনুষ্য সম্বন্ধে মানবকে কিয়ৎ পরিমাণে নিঃশঙ্ক করিতে পারে বটে; কিন্তু যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইতে হইলে, আকাঙ্ক্ষার ক্ষান্তি ও আত্মার শান্তির আবশ্যক হইয়া থাকে।

"জ্ঞানী ব্যক্তি যাহারা, তাহারা প্রায়ই সৌভাগ্য দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের মনীষাশক্তি তাহাদিগকে যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট রত্ন সকল নিয়ত প্রদান করে, তাহাই তাহারা সর্ব্বদা সম্ভোগ করে এবং আজীবন করিতে থাকিবে।

"যে ব্যক্তি ন্যায়পথগামী সে সর্ব্বত্রই স্বাধীন এবং সে সর্ব্বদাই সর্ব্বলোক সমক্ষে শান্তি ভোগ করিয়া থাকে। অন্যায়কারী যে, সর্ব্বদাই সে তদ্বিপরীত ভাবের নিকট শঙ্কিত হয়।

"আমরা যুক্তিশক্তির সহায়তায় শরীরের পরিণাম এবং ধ্বংস সম্বন্ধে তত্ত্ব সুনির্ণয় পূর্ব্বক যদি পরলোক বা অনন্ত সম্বন্ধীয় ভীতি হইতে ত্রাণ পাই এবং পরলোকসম্বন্ধীয় কল্পনা হইতে যদি একেবারেই মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই কেবল এই জীবন যে কোন প্রকার সুখানুভব ও সুখপদার্থের সংগ্রহে পারক হইতে পারে। মনের ভাব এইরূপ অর্থাৎ ভয়শূন্য করিতে পারিলে, নানাকারণজাত ক্লেশ সকল জীবনের ক্ষয়করিরূপে যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, মানব তাহার মধ্যে সুখী হইতে পারে; এবং এরূপ অবস্থায় যে মৃত্যু, তাহা কেবল সুখ-জীবনের সীমাপ্রাপ্তি বা সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

" 'ন্যায়' ভাবের বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নাই; উহা পরস্পর লৌকিক অঙ্গীকার হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্লেশবিদ্ধ হইতে না পায় এরূপ অর্থেই উহার সংঘটন হইয়া থাকে।

"অন্যায়" ভাব বস্তুতঃ মন্দ নহে; তবে ইহা মন্দ এই জন্য যে ইহার সঙ্গে এরূপ ভয় সংযোজিত আছে যে, যাহারা অন্যায় নিবারণে ও শান্তিরক্ষণে নিয়োজিত, তাহাদের দ্বারা ধৃত হওয়া ও শাস্তি পাওয়ার দায় হইতে পলাইবার সম্ভাবনা নাই।

"অমুক বিষয় করিব না এবং পরস্পরের অহিতকর বা ক্লেশজনক অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না;—পরস্পরের সহ এরূপ যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া যায়, কোন মানব গোপনে গোপনে যেন তাহার অন্যথাচরণ না করে, যেহেতু সেরূপ করা উচিত নহে। কারণ, যদিও সে সহস্রবার এরূপ করিয়া সহস্রবার ফাঁকি দিতে সক্ষম হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় যে, সে বরাবর ফাঁকি দিতে সক্ষম হইবে; যেহেতু তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবিতকালের মধ্যে সে যে কখন ধরা পড়িবে বা কখন পড়িবে না তাহার কোনই স্থিরতা নাই।

"যে সর্ব্বজনসমক্ষে নিঃশঙ্কভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সকলেরই সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবে। যাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করা সম্ভব নহে, অন্ততঃ তাহাদের সহ শত্রুতা যাহাতে না জন্মে, এরূপ যত্ন করিয়া চলিবে। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সংস্রবে আসিবে না।

"সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুখী, যে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, যথায় পার্শ্ববর্ত্তী কোন বিষয় হইতেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এরূপ লোক, পরস্পরের উপর পূর্ণ বিশ্বাসবুদ্ধি সহ পরস্পরের বন্ধুত্বসুখ পূর্ণভাবে ভোগ করিয়া, অথচ কোন বন্ধুর অকাল মৃত্যু হইতে শোকসন্তপ্ত না হইয়া এবং সকল লোকেরই নিকট প্রীতিপূর্ণ থাকিয়া, নিজ জীবন অতিবাহন করিয়া থাকে।"

আমূলতঃ পর্য্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে, এপিক্যুরসের প্রবর্ত্তিত তত্ত্বের মূলমন্ত্র ভয়। কি লৌকিক কি পারলৌকিক যাবতীয় প্রকারের ভয়ের নিরাকরণ করিয়া, ইহলৌকিক সুখাদি যথাসম্ভব উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ। অন্যান্য নাস্তিকগণ, পরলোকবুদ্ধিকে একবার উড়াইতে

সক্ষম হইয়া, যেমন বন্ধনছিন্ন বাঁধা ঘোড়ার স্থায় একেবারে দিগ্বি-দিক্‌শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে; এপিক্যুরসে, যদিও সে পরলোক নিরাকৃত এবং ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান মূলশূন্য হইয়াছে বটে, তথাপি সে স্বাধীনত্ব ও যথেচ্ছাচারিত্ব তেমনটা পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ, ইহাঁর পরলোকের প্রতি ভয় এমন যে, তাহার নিরাকরণ করিতেই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে; তদতিরিক্তে উন্মাদিত হইতে আর অবসর হইয়া উঠে নাই। চিরভয়শূন্য গ্রীকচিত্তে, পরলোকবোধের নববুদ্ধি, সহসা জাগরিত হওয়াতেই, এতটা ভয় সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইয়াছিল!—অনভ্যাসমধ্যে সহসা অভ্যাস, সাধারণ অপেক্ষা সহজেই কিছু উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এপিক্যুরসের মানিত ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ, সত্য অসত্য ইত্যাদি বিষয়দ্বয়, কেবল ভয়ের যে কিছু কারণ তাহার বিভীষিকা ও উত্তেজনা হইতে গঠিত। দেখা যাইতেছে যে, ইহাঁর মতে সুখ যাহা তাহা ভয়ের নিরাকরণে এবং দুঃখ যাহা তাহা ভয়ের আধিক্যে। লৌকিক ভয়ের বিনাশ নিমিত্ত, নীতি ও বন্ধুত্বের প্রয়োজন এবং লোকাতীত ভয় দূর করিবার জন্য, নাস্তিকতাজ্ঞানের আবশ্যক। এপিক্যুরসের তত্ত্বব্যাখ্যান দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি নিতান্তই ভয়ভ্রান্ত ছিলেন। দুঃখের নিরাকরণ করিতে গিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ; আর ভয়ের নিরাকরণ করিতে গিয়া এপিক্যুরসের নাস্তিকতা। অনুসন্ধানে যতদূর পাওয়া যায়, তাহাতে এই জানা যায় যে, এপিক্যুরসের জীবন অপেক্ষাকৃত নীতিসম্পন্ন ছিল এবং মৃত্যুকেও ইনি সহাস ও সদানন্দ চিত্তে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইহাঁর পরবর্ত্তী শিষ্যবর্গে কিন্তু আর সেরূপ ভাব থাকে নাই; তাহারা বহু পরিমাণে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

এপিক্যুরস কহিয়া থাকেন, এই বিশ্ব অনন্ত; পরমাণু সহযোগে নির্ম্মিত। পরমাণু অনন্ত বিভাগে বিভাজ্য নহে; উহারা অবিরত গতিশীল এবং পরস্পর যোগবিয়োগে অনন্ত আকৃতি গ্রহণে পটু। পরমাণু সকল অনন্ত কাল হইতে যোগবিয়োগে সৃষ্টি রচনা ও ধ্বংসাদি

করিতেছে ও অনন্ত কাল করিতেও থাকিবে। পরমাণু ও তাহার স্বভাবের কখনও বিনাশ নাই। এপিক্যুরসের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলবান্, তবে অনুমানও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই; অনুমানের দ্বারা আকাশ ও দেশের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত এবং পৃথিবীও একটা নহে, বহুতর এবং অসংখ্য। বলিয়াছি, পরমাণু অবিরত গতিশীল; সেই গতিযোগে এবং পরস্পর সংযোগে রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরাদি বলিয়া আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ঐরূপ রূপবিশেষ। বহির্জগৎস্থ পদার্থনিচয়ের সহ ইন্দ্রিয় সকল সমগুণধর্ম্মাদিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাতে, শ্রবণ ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি সমুৎপাদিত হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান যাহা, তাহা শরীরের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি সূক্ষ্ম পরমাণুর সূক্ষ্ম সমাবেশ হইতে উৎপন্ন হয়। উহা যে যে শরীরে যে প্রকার ও যে পরিমাণে সমাবিষ্ট, তথায় সেইরূপ বিভিন্ন স্বভাব ও ক্রিয়া সকল প্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং ইহা হইতেই মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। পরমাণুর ক্রিয়াশক্তি দেহের সঙ্গে সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু সম্বন্ধবতী, এজন্য তাহার যে কিছু কার্য্য তাহা সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া থাকে। দেহঘটিত সেই সকল কার্য্য পুনঃ আত্মাকেও গিয়া স্পর্শ করে; এজন্য দেহ ও আত্মা, ইহারা পরস্পর পরস্পরের সুখে ও দুঃখে সুখদুঃখবান্। দেহের সহ তন্নিহিত আত্মা এবং চৈতন্যেরও ধ্বংস হইয়া যায়। পৃথিবীতে যে সকল জীব ও চৈতন্যপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার বীজ অন্য কোন পৃথিবী বা অনন্ত গর্ভ হইতে যে এখানে পৃথক্‌রূপে আনীত ও নিহিত হইয়াছে এরূপ নহে। এই পৃথিবীতেই সে বীজ নিহিত ছিল এবং এই পৃথিবী হইতেই স্বতঃ তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। মানব আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিদর্শনে বিস্ময়রসে মগ্ন হইয়া এবং তাহাদিগকে চৈতন্য-বিশিষ্ট কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের উপর দেবত্বের আরোপ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই লোকাতীত শক্তি ও স্বর্গনরকাদির ভয়

মানবের মনে বদ্ধমূল হয়। এইরূপে এপিক্যুরস দেখাইতেছেন যে, মানব আপনার কল্পনোদ্ভূত ভয়ে আপনি আবদ্ধ হইয়া, নিজের অসুখের কারণ নিজে উৎপাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর ও দেবতাবর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, যদি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা জীবনকে নীতিপথে লইয়া যাইতে পার, এবং তাহাদের উপাসনা ও অর্চ্চনাদির দ্বারা পরলোকের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাও, তাহা হইলে সেই দেবতত্ত্ব কল্পিত হইলেও, তাহাকে অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বরং দেবতায় বিশ্বাস করা ভাল, তথাপি মূঢ় প্রাকৃতিক তত্ত্বদর্শীর অপরিহার্য্য ও দুরতিক্রম্য এবং অপরিণামদর্শী ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য প্রয়োজনজালে জড়িত হওয়া ভাল নহে। এপিক্যুরস আরও বলেন যে, যদি দেবতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে চাও, তবে যতদূর পবিত্র ও দিব্য বিভূতি ঐ দেবত্বজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিতে পার ততই প্রার্থনীয়। যে দেবচরিতে সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে অবিশ্বাস করা ততটা দূষণীয় নহে ; যতটা সাধারণ লোকে, তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের অনুকরণে, দেবচরিতে যে অপকৃষ্ট বিভূতি আরোপ করিয়া থাকে তাহা। ফলতঃ এপিক্যুরসের উদ্দেশ্য এই,—যে কোন পদার্থ আদর্শ করিয়া হউক, নৈতিক ভাবে ও সুখে জীবনাতিবাহিত করিতে পারা এবং পরলোকের প্রতি ভয়শূন্য হওয়াই মনুষ্যজ্ঞানের মুখ্য ফল হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি বলিতেছেন,—যুবাও যেন ইহার অনুসরণ করিতে মনে না করে যে, তাহার এখনও সময় আছে ; অথবা বৃদ্ধও যেন এমন মনে না করে যে, তাহার সময় নাই। আত্মার শিক্ষাকল্পে কোন সময়ই অযোগ্য বা প্রতিকূল নহে।[৪]

এপিক্যুরসের প্রমাণপদার্থাদি এরূপে ব্যাখ্যাত হয়। পরমাণু সকলের সংযোগে রূপের সঞ্চার হয় এবং তাহাতেই সৃষ্টি প্রকাশমান হইয়া থাকে। পরমাণু অবিরত গতিশীল, এজন্য তাহাদের সংযোগজাত

৪। এপিক্যুরস হইতে মিনিকিওসের নিকট পত্র।

রূপ যাহা,তাহাও অনবরত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও, কতক অংশ পরমাণুবিক্ষেপ দ্বারা সেই 'রূপের' যে প্রতিভাস রাখিয়া যাইতেছে; এবং পরমাণু সহ আমাদের শরীর সমগুণধর্ম্মী হওয়ায়, যে প্রতিভাস শরীরে পতিত হইবাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া পদার্থজ্ঞানস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপে বিচারস্থলে অবলম্বিত হওয়া উচিত। চিত্তবৃত্তি সকলের অনুভূত বিষয়ও প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু অগ্রে তাহার প্রামাণ্যভাব, রূপপ্রতিভাস-জনিত জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। যদি সে পরীক্ষায় তাহা তিষ্ঠে, তবেই তাহা প্রমাণ; নতুবা ভ্রমের কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রম প্রধানতঃ এই দুই কারণে উৎপন্ন হয়; প্রথমতঃ যখন মনে এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, আমার এই মত প্রমাণ দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে; এরূপ স্থলে প্রকৃত প্রমাণ পদার্থ যখন না পাওয়া যায়, তখন আমাদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির প্রবর্ত্তনা সেই অভাবপূরণে সহায়তা করিয়া থাকে। সেই প্রবর্ত্তনা যদিও মূলে কোন রূপ-প্রতিভাস-সংস্রবে উৎপন্ন হইয়াছে বটে,কিন্তু পরে তাহার আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রূপ-সংস্রব না থাকায়, কাজেই তদ্দ্বারা ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যেরূপ রূপ-প্রতিভাস প্রত্যক্ষ এবং অনুভূত হইতেছে, চিন্তাশক্তি যখন তাহাকে তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধিতে লইয়া যায়। যে কোন বিষয়, উপযুক্ত প্রমাণ গ্রহণ ও কথিত-মত ভ্রান্তি নিবারণ পূর্ব্বক, যুক্তি দ্বারা স্থাপিত করিলে, তাহাই যথার্থ সত্য স্বরূপ হয়।

আশ্চর্য্য! মানব কি সামান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি গুরুতর বিষয় সকলের মীমাংসা বা তাহার নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে! চোখের উপরেই প্রতি কালপরিবর্ত্তনে প্রতি দর্শনমথিত মতাদি অকর্ম্মণ্যতায় পড়িয়া যাইতেছে, অথচ প্রত্যেক দার্শনিক ভাবিয়া থাকে যে আমি যাহা করিলাম, ইহা অভ্রান্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ। না হইবে কেন, নিত্য শত শত লোক মরিতে দেখিয়াও যে মানবুচিত্ত

আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে; সে মানবচিত্ত যে স্বকৃত মত অভ্রান্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি?

নাস্তিক-তত্ত্ববিদ্যার ভালমন্দ ভেদ অতি অল্পই, ইহা ফলে সর্ব্বত্রই সমান এবং শিষ্যবর্গও সর্ব্বত্র সমান পরিপক্ক যণ্ডা হইবার কথা। নাস্তিকতার গুণ এমনি যে, মানবকে পাষণ্ড হইতেই হইবে! নাস্তিকতার উদ্ভাবক বাল্যাভ্যস্ত আস্তিক্যশিক্ষার সংস্কারবশতঃ কোনরূপে ভাল থাকিলেও, নাস্তিকতার শিষ্যবর্গকে ভাল থাকিতে প্রায়ই দেখা যায় না।—এপিক্যুরসের সৎশিক্ষা সত্ত্বেও, এপিক্যুরসের শিষ্যবর্গের যথেচ্ছাচার জগৎপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ, গ্রন্থনসূত্রের অভাবে কখন মাল্য সুগ্রথিত ও সুসজ্জিত হইতে পারে না; বিক্ষিপ্ত ছন্ন ভাবই সেরূপ স্থলের নিয়ম। পুনশ্চ, প্রকৃতির মিথ্যা বা অচিৎভাগ যাহার মূল, সে তত্ত্ব কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। ফল সর্ব্বদা মূলেরই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া থাকে!

এক্ষণে দেখা যাউক নাস্তিকতত্ত্ব, বিভিন্ন জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে, কিরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে এবং কতদূর তাহা তত্তৎ জাতীয় জীবনের উপর আধিপত্য ও তাহাকে চালিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। গ্রীক নাস্তিকতত্ত্ব বহুলাংশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের আশ্রয়ে গঠিত; আর হিন্দু নাস্তিকতত্ত্ব, হিন্দুর আস্তিক্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বপার্শ্বে বৈপরীত্য সমাবেশ-স্বরূপ মাত্র; প্রথমটি বিজ্ঞান-প্রাণ, আর দ্বিতীয়টি স্বাত্ম-চিন্তা-প্রাণ। আরিষ্টিপুস ও তদীয় সাম্প্রদায়িক থিওডোরুস প্রভৃতির যে নাস্তিকতা, তাহা যণ্ডামির নাস্তিকতা এবং এপিক্যুরসের যে নাস্তিকতা, তাহা ভয়ের তাড়নে নাস্তিকতা; বলা বাহুল্য যে ইহারা সমস্তই গ্রীক প্রকৃতির সহ সমধর্ম্মী এবং ঐরূপ প্রকৃতি হইতে ঐরূপ ফলই আশা করা গিয়া থাকে। আরিষ্টিপুসের সময়ে লোকের মনে পরিষ্কার পারলৌকিক-অস্তিত্ব-জ্ঞান কেবল প্রতিভাত হইয়াছিল মাত্র। সক্রেটিসের দ্বারা পূর্ব্বে উহা পূর্ণভাবে উপলব্ধ হইয়া, প্লেটো কর্ত্তৃক যখন তর্কতত্ত্বাদি দ্বারা সম্প্রসারিত হইতেছিল; সেই সময়ে আরিষ্টিপুসের

নাস্তিকতা যেন তাহার প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে উত্থিত হয় এবং প্লেটোর দ্বারা যে পরিমাণে সতের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছিল, উহারা সেই পরিমাণে অসৎকে বাড়াইয়া তাহাকে আসন প্রদান করিতে থাকে। এপিক্যুরসের সময়ের ভাব ভিন্নতর; তখন কি পরলোকবুদ্ধি কি সামাজিক বুদ্ধি উভয়ই ঘোর বিশৃঙ্খল ও ভয়সঙ্কুল ভাব ধারণ করায়, তাহা হইতে যেন মুক্তির উপায় স্বরূপ এপিক্যুরসের নাস্তিকতার উৎপত্তি হয়। মত এবং কথায় ভয়ের হাত ছাড়াইলেও, ভয়হেতুক আজন্মবর্দ্ধিত যে সংস্কার তাহার হাত সহজে ছাড়াইতে পারা যায় না; এজন্য তাহার অনিবার্য্য প্রভাব, মানবকে তখনও বহুপরিমাণে ভয়-নম্র করিয়া রাখে। এপিক্যুরসে সেই ভয়-নম্রভাবের প্রবলতা হেতুই, তাহার বর্ণিত তত্ত্বে তেমন অমিশ্রিত অসতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার পর আরও এক কথা আছে। যে পদার্থ যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট, তাহার বিকারও সেই পরিমাণে অধিক বা অল্প মন্দ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের আস্তিকতা কখনই উচ্চ অঙ্গের ছিল না, সুতরাং তাহাদের নাস্তিকতাও অতিশয় বীভৎস আকার ধারণ করিতে পারে নাই। আরিষ্টিপুসের সাময়িক নাস্তিকতা আপাততঃ নিতান্ত বীভৎস আকারের বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু যেমন কোন প্রকার অসতেরই অবলম্বনে দোষ নাই বলিয়া আরিষ্টিপুসের দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে, তেমনি আবার কোন অসৎই, অন্ততঃ ক্ষতিকর অসৎ, সামাজিকতার খাতিরে যে অনবলম্বনীয় ইহাও তাহার দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে ত্রুটি হয় নাই। ফলতঃ সমগ্র ধরিতে গেলে গ্রীকের নাস্তিকতাকে তাদৃক্ প্রবল ও প্রচণ্ড বলা যায় না; নম্রতা এবং সংযতভাব তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় এবং মুখে যত ফলিত কাজে তত পরিণত হইত না। হিন্দুর ভাব কিন্তু সেরূপ নহে। গ্রীকের আত্মিক-বিষয়িনী চিন্তাশক্তি ক্ষীণ বটে, কিন্তু তাহার বাহ্যদর্শনশক্তি অতিশয় তীব্র এবং বৈজ্ঞানিক; সুতরাং আত্মিক সংসারে ইহাদের তত্ত্ব যদিও সঙ্কীর্ণায়তন এবং যদিও অসাধারণ সারপূর্ণ নহে বটে, কিন্তু যাহা কিছু

ইহাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও উপলব্ধ তাহা অতিশয় সুসজ্জিত, সুগ্রথিত ও মনোহর; এবং সেজন্য, ইহাদের নাস্তিকতার ভিতরেও যে নম্রতা, মাধুর্য্য এবং সংযতভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এ দিকে হিন্দুর চিন্তাশক্তি স্বভাবতঃই গগনভেদিনী। চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রিয়তা হেতু যদিও তাহার তীক্ষ্ণ বাহ্যদর্শনের আবশ্যক বটে, তথাপি চিন্তাশক্তির আতিশয্য হেতু ইচ্ছা সত্বেও তাহার মন তদ্বিষয়ে অন্যমনা ও অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়িয়াছে; এ নিমিত্ত হিন্দুর নাস্তিক তত্ব প্রবল ও প্রচণ্ড, শৃঙ্খলমুক্ত উন্মাদমূর্ত্তি, এবং অতিশয় বীভৎসভাবাপন্ন। হিন্দুর আস্তিকতাও যেমন উচ্চ অঙ্গের, উহার নাস্তিকতার যে শিক্ষা তাহাও তদ্বিপরীতে তেমনি অতিশয় বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দুর নাস্তিকতা গ্রীকের সহ সম শ্রেণীর কোন কারণ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; উহা প্রধানতঃ নিরাশা হইতে উৎপন্ন। মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পরলোক নির্ণয় ও তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য অপরিমিত চেষ্টা করিতে করিতে, হিন্দুনাস্তিকের ভাগ্যে তাহার সন্ধান না মিলায়, হিন্দু নাস্তিকতার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন উৎপন্ন হইল, তখন যাহার জন্য চেষ্টা হেতু এত ক্লেশ পাওয়া গিয়াছে সেই আস্তিকতার উপর যেন প্রতিশোধ লইবার জন্যই, নাস্তিকতা ওরূপ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল! অনেক যত্নের পদার্থে বিফলতা উপস্থিত হইলে, তাহাতে অনেক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ঘোর আস্তিকতাময় হিন্দুসমাজে, নাস্তিকতা বড় একটা পা মেলিতে ও আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বুদ্ধ শিক্ষাকে অনেকে নাস্তিকতা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু কি কাজে কি অনুষ্ঠানে তাহা পূর্ণ আস্তিকতায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; উহাদের মধ্যে বহুপরবর্ত্তী মাধ্যমিক নামক একটি সম্প্রদায়ই কেবল কতকটা নাস্তিকতার ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। যাহা হউক, এ দেশে নাস্তিকতার শিষ্যসংখ্যা যদিও সমাজমধ্যে বিশেষ গণনায় কখন আইসে নাই, তথাপি সমাজকে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে যে উক্ত নাস্তিকতা যথেষ্ট উত্তেজিত

করিয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। ধর্ম্মব্যবসায়ীরা যে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে জাঁকাল ও জটিলতর করিয়া তুলেন; তান্ত্রিক পঞ্চমকারের প্রবর্ত্তনা পূর্ব্বক, নাস্তিক যথেচ্ছাচারকেও যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-ভুক্ত করিয়া লয়েন; এবং শেষে লোকের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ও দর্শনশক্তি প্রভৃতি হরণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে যে ধর্ম্মকার্য্যের নানারূপ কল্পিত কঠোর বন্ধনে বন্ধন করেন; এই নাস্তিকতার উত্তেজনা তাহার একটি অন্যতর কারণ স্বরূপ। অনেকে ভাবিয়া থাকে যে, কেবল স্বার্থসাধন উদ্দেশেই ধর্ম্মব্যবসায়ীরা ঐরূপ ঐরূপ অনুষ্ঠান ও আচরণ সকল অবলম্বন করিয়াছিল; হইতে পারে অংশত তাহাই, কিন্তু কেবল তাহা নহে। যে বিধি, বা যে অনুষ্ঠান বহুলোকমধ্যে ব্যাপনশীল হয়, কেবল স্বার্থমূলকতায় তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। হইতে পারে এ সময়ে স্বার্থের কিছু আধিক্য হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইলেও এমন কতক-গুলি উপলক্ষ্যের আবশ্যক যে যদ্দ্বারা, স্বার্থসাধন করিতে করিতেও লোক সকলকে এমন বুঝাইতে পারা যায় যে, আমরা যাহা করিতেছি তাহা তোমাদেরই ভালর জন্য করিতেছি।

গ্রীকভূমে নাস্তিকতা বহুব্যাপিনী হইয়াছিল। সক্রেটিস ও প্লেটোর পূর্ব্বে পরলোকের ধারণা বা চিন্তা ততটা পরিস্ফুট না থাকায়, লোকে আস্তিকতত্ত্বকে সাধারণতঃ সংসারিক মঙ্গলোদ্দেশেই নিয়োজিত করিত; অতএব আস্তিকতা এখানে অতি ক্ষীণপ্রাণ ছিল বলিতে হইবে। এমন স্থলে, ভয়শূন্য অস্ফুট যে পরলোক, যাহার থাকা বা না থাকার প্রতি লোকে তত আগ্রহযুক্ত নহে, যদি বুঝাইতে পারা যায় যে তাহা বস্তুতঃ অস্তিত্বশূন্য এবং সাংসারিক মঙ্গল যাহা তাহা দেবার্চ্চনা না করিলেও পাওয়া যায় অথচ সামাজিকতারও কোন হানি হয় না; তাহা হইলে লোকে কেননা সে নাস্তিকতা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে? আস্তিকতার প্রতি লোকের অনপনেয় দৃঢ় সংস্কার হয় তখন, যখন পরলোকচিত্র এবং উর্দ্ধদেশের নিকট নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও পাপপুণ্য বোধ পরিস্ফুট ও পরিষ্কার হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রীকদিগের সে

বোধ তেমন ছিল না। ক্ষীণ পদার্থ সহজেই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে; গ্রীক নাস্তিকতা ও আস্তিকতা উভয়েই, গ্রীকচিত্তে সেইরূপ সহসা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিত।

এপিক্যুরসের নাস্তিকতা গ্রীসে অত্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল সে সময়ে গ্রীস ধ্বংসোন্মুখ।[৫] তখন গ্রীসের পূর্ব্বশ্রী বিগত, আচার ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খল, রাজ্যমধ্যে স্বার্থবিপ্লবে আত্মকলহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনীতিজ্ঞগণ ক্ষীণচেতা ও ঘুষখোর—অর্থলাভে স্বচ্ছন্দে স্বদেশ পরের নিকট বিক্রয় করিতেছে। তত্ত্ববিন্নামধারিগণ, পতনসময়ে যেরূপ হইয়া থাকে, কুতর্ক, বাক্যাড়ম্বর, টীকা, টিপ্পনি প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত। অজ্ঞান মোহ এবং অধঃপতনের বিপুল তরঙ্গ যেন স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে আগত হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। পূর্ব্বগত পদার্থনিকরের পরিপাচনে কালে যে নব পদার্থের উৎপত্তি হইবে, তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ সকলের রাসায়নিক বিয়োজন ও বিশ্লেষণ হেতুই যেন এপিক্যুরসের নাস্তিকতত্ত্বের প্রচার ও নাস্তিকশিষ্যগণের সমাজব্যাপী যথেচ্ছাচার। পুনশ্চ যে জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মবিপ্লব ও নীতিবিপ্লব পূর্ব্ব গগনে সমুদিত হইবে, তন্নিমিত্ত নবপ্রভাত আনয়নের জন্য, তাহা যেন পূর্ব্ব দিবার অবসান ও অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা স্বরূপ;—এখনও মধ্য-রাত্রির অপারক্লেশসঙ্কুল অন্ধতামস ও তাহার অতিক্রমক্রিয়া পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বর কি উপায়ে, কাহার দ্বারা, কোথায় দিয়া যে কিরূপ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন; মনুষ্যবুদ্ধির নিকট তাহা অপরিজ্ঞেয়; আমরা কেবল তাহার ছায়াকণা মাত্র অনুভব করিতে পাইয়া, অনাহূত বাগ্‌বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিয়া থাকি। "সহি ভূতানাং এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বাস্য প্রভবোপ্যসৌ।"

———

৫। এপিক্যুরসের জন্ম আনুমানিক ৩৪২ খৃঃ পূঃ, এবং মৃত্যু ২৭০ খৃঃ পূঃ। ইহার শিক্ষা সামোস ও আথেন্স এই উভয় স্থান হইতে প্রথম প্রচারিত হয়।

৩। তত্ত্ববিদ্যায় সামাজিকতা।

সামাজিকতা ও রাজনীতি অথবা মোটের উপরে সমগ্র সাংসারিক সৎ-বিষয়ের প্রতি, মানবীয় আগ্রহ, পারলৌকিক তত্ত্বের প্রতি যেরূপ, ধরিতে গেলে, সেইরূপ সম পরিমাণেই হওয়া উচিত; তাহা হইলেই উভয় দিকে সমান ওজন রক্ষা হইবাতে, সামঞ্জস্য ভাবের উৎপত্তি হেতু, নিষ্কলঙ্ক সুফল প্রসবিত হইয়া থাকে। মানব সামাজিক জীব; এই কর্ম্মক্ষেত্রে সে একাকী ঐশ্বরিক অভিপ্রায়-নিযুক্ত মহাকর্ম্ম সম্পাদনে অক্ষম, কেবল বহুজনের সহ মিলিত হইলেই তাহাতে পারক হইয়া থাকে। মানবীয় আত্মা এ পৃথিবীতে কেবল পরলোক চিন্তা করিতে আইসে নাই, কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে;—যে ব্যক্তি এ কথা ভুলিয়া গিয়া, কেবল পরলোকচিন্তায় রত হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় সামাজিকতা-পরিশূন্য জীবনাতিবাহন করে, সে যে কখন প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ হয়, এরূপ বোধ হয় না; কারণ ফলে ইহা কার্য্য না করিয়া পুরস্কারের প্রার্থনা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহলোককে আশ্রয় করিয়াই পরলোক এবং ইহলোক সেই পরলোকের ভিত্তিস্বরূপ; ইহলোকে যেরূপ আচরণ ও অনুষ্ঠান করা যায়, তদনুসারেই পরলোক নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কর্ম্মার্থে প্রাপ্তশক্তি মানবের পক্ষে, সেই শক্তির যথাবিহিত সৎ-ব্যবহার ভিন্ন, আর কি প্রকারে ইহলৌকিক জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে? পরলোক ভোগস্থান এবং একমাত্র কর্ম্ম জন্যই ভোগোৎপত্তি হয়; পুনশ্চ সুখ ইহলৌকিক হউক বা পারলৌকিক হউক, একমাত্র সৎকর্ম্ম-পরিণাম হইতেই তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সমাজই আমাদের কর্ম্মস্থলী এবং আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র সংসারক্ষেত্রে; অতএব যদি সেই সাংসারিক ভাবই পরিত্যাগ করিলাম, তবে আর আমার রহিল কি? সতের ন্যূনতাও যেমন অসৎ, সতের অতিরেক ভাবও তেমনি অসৎ, অথবা এক কথায় যাহা দ্বারা কর্ম্ম পণ্ড হইবে বা কর্ম্ম হইবে না, তাহাই অসৎ বলিয়া গণ্য হয়। ঈশ্বরচিন্তা

জন্য যে সন্ন্যাস, তাহা অবশ্য সদনুষ্ঠান, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি তদ্দ্বারা কর্ম্মশূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহা যে সতের অতিরেক জন্য অসৎ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং অসৎ, সতের অতিরেক বা ন্যূনতা যে জন্যই হউক, কালের অঙ্কে সমানই দূষণীয় হয়। অতএব পরলোক-বুদ্ধির জন্য সন্ন্যাসী হওয়া উদ্দেশ্য নহে; পরলোক-বুদ্ধি ও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা সুস্বভাবে আসিয়া, সত্য জ্ঞানে ও সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রস্থ কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হওয়াই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর যেমন প্রতি কার্য্য সহ তাহার পুরস্কার, আনুষঙ্গিক চিত্তপ্রসাদ বা চিত্ততৃপ্তি, সংযোজন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; তেমনি কর্ম্মজীবনরূপী সমস্ত কর্ম্মসমষ্টির জন্যও পুরস্কারসমষ্টি সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন। সাত্ত্বিক কর্ম্মসকলকে যেমন এক পক্ষে, অন্ততঃ ইহলোকে, অনন্তসত্ত্বস্থ হইয়া উত্তরোত্তর অনন্ত পরিণতিযোগে অনন্ত ফল প্রসব করিতে দেখা যায়; তাহার পুরস্কার-জনিত উন্নতি ও তৃপ্তিও অপর পক্ষে, যে লোকে হউক, সেইরূপ অনন্তবিসারণযুক্ত হইবার কথা। ঈশ্বরনিয়োজিত পদার্থ কখন বিফলে যায় না, সুতরাং এ তৃপ্তিরূপী অনন্তভোগ্য পদার্থের জন্য তাহার সফলতাসাধক অনন্তস্থায়ী ভোগীও একান্ত আবশ্যক,—ইহা দ্বারাও ইহলোকের পর পরলোকের অস্তিত্ব সূচিত হয়। এই অনন্ত-ভোগ্য পুরস্কারসমষ্টিকেই, লোকে স্ব স্ব ধারণার প্রকৃতি অনুসারে কেহ সুকৃতি, কেহ স্বর্গ ইত্যাদি নানাবিধ নামে জ্ঞান বা অজ্ঞান পূর্ব্বক অভিহিত করিয়া থাকে। স্বর্গাদি সুপরিণাম ভোগের যদি কিছু অর্থ থাকে তবে ইহাই সে অর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। এখন দেখ, জীবনকে যদি সংসারবিরতি দ্বারা কর্ম্মশূন্য করা যায়, তবে সেই পুরস্কারের প্রাপ্তি জন্য আশা এবং সেই আশা সুফলবতী করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

অতএব মানুষকে সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মানুগত হইতে হইবে এবং সেরূপ কর্ম্মানুগত মনুষ্যের পক্ষে, সমাজই কর্ম্মস্থলী এবং কর্ম্মার্থে এক-মাত্র অবলম্বন। সুতরাং সে সমাজকে পরিত্যাগ বা তাহার প্রতি

উপেক্ষা করিলে, আর কর্ম্মের, অন্ততঃ গণনীয় কর্ম্মের, সম্ভবতা রহিল কোথায়? এমন স্থলে কাজেই বলিতে হইবে যে একমাত্র সমাজকে অবলম্বন করিয়াই আমরা পারলৌকিক সুখে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হই। সমাজে করণীয় কার্য্য যেরূপ অশেষবিধ ও অগণনীয়, তদ্রূপ অশেষবিধ যোগ্যতা সহ কর্ম্মকারকও অগণনীয় যাইতেছে ও আসিতেছে। পুনশ্চ কর্ম্ম বলিলেই যে, যে সে কর্ম্ম লইয়া লিপ্ত থাকিলে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল তাহা নহে; তোমাকে যতটা কার্য্যশক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা যখন সম্পূর্ণতঃ ও সাত্ত্বিকভাবে কর্ম্মার্থে নিয়োজিত হইবে, তখনই কেবল তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল বলিয়া জানিও, নতুবা তোমাকে এতাদৃক অধিক কার্য্যশক্তি প্রদান করার অভিপ্রায় কি? বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি, পরমেশ্বর নিষ্ফলতায় ও বিনা অভিপ্রায়ে কিছুই প্রদান করেন না। স্বভাবতঃ, মানুষে প্রদত্ত কার্য্যশক্তির কিয়দংশ জাগ্রত ও কিয়দংশ সুপ্ত ভাবে মানবমনে তিষ্ঠে। জাগ্রত অংশ যাহা তাহা নিত্য কর্ম্ম জন্য এবং সুপ্ত অংশ যাহা তাহা নৈমিত্তিক এবং গুরু কর্ম্মের নিমিত্ত প্রয়োজন হয়। সুপ্ত শক্তির আভাস হইতে, দেশ ও ক্ষণ অনুকূল হইলে, সেই শক্তিসাধ্য কর্ম্মের নিমিত্ত মনে আকাঙ্ক্ষা ও সাহসের উদয় হইয়া থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা ও সাহসে যাহারা ভর করিয়া সুপ্তশক্তিকে চিনিয়া লইয়া ও তাহাকে জাগ্রত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এ জগতে ধন্য; যাহারা তাহা করে না, তাহারা অপদার্থ বা কাপুরুষ; আবার সেই আকাঙ্ক্ষা ও সাহসকে যাহারা পরিমাণাতিরিক্ত বিপুল ভাবে গ্রহণ করে, তাহাদিগকেই এ জগতে গোঁয়ার ও অপরিণামদর্শী বলা যায়। যাহা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, আপন আপন শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যে যে কার্য্যে পারক, সে সেই কার্য্য প্রাণপণে সংসাধন করিতে থাকে। যথায় যথায় এরূপ ঘটনা হয়, তথায় সমাজ মঙ্গলময় এবং কর্ম্মকারকও, ইহলোক, পরলোক, উভয় লোকে মঙ্গল-উপভোগী হয়। পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই

কর্ম্মসাধন কেবল যদৃচ্ছা বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত ও সংসাধিত হয় না। এতদর্থে অনলস পূর্ণ সাত্বিক বুদ্ধির প্রয়োজন; সেই সাত্বিক বুদ্ধি আবার ধর্ম্মবিদ্যা ও ধর্ম্মচর্য্যার অনুশীলন দ্বারা প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও তাঁহার নিয়ম চিন্তন দ্বারা কর্ত্তব্য স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপেই কেবল ইহলোক পরলোক, সামাজিকতা ও ধর্ম্মানুশীলন, ইহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই সামঞ্জস্যের বিপরীত হইলে, কর্ম্মফল, অথবা কর্ম্ম-প্রকরণ এবং তাহার ফল উভয়তঃ, দূষিত এবং ছন্নপরিণামযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্ম এবং কর্ম্মসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা এবং ধ্যান ধারণা আদি, তাহারা যে বিশেষ কোন কাজে আইসে এমনটা বোধ হয় না। প্রার্থনা ও ধ্যানধারণাদি অঙ্কশাস্ত্রীয় শূন্যের ন্যায় স্বয়ং এবং একাকী মূল্যশূন্য ; কিন্তু কর্ম্মরূপী অঙ্কের পার্শ্বে যখন বইসে; তখন তাহার মূল্য দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা সহ সামাজিকতার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, প্রয়োজনীয়তাও সেইরূপ উভয়ের উভয় দিকে সমান ; সুতরাং উভয়তঃ শ্রী এবং উৎকর্ষসাধন পক্ষে উভয় উভয়ের সাপেক্ষাপেক্ষী হয়। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, সামাজিকতা বা সামাজিকতার সারাংশ স্বরূপ রাজনীতি বিষয়ে, নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ। এ সকল বিষয়ে ধারাবাহিক কোন তত্ত্ব বা বিচারগ্রন্থ নাই, কেবল বিধিনিষেধপূর্ণ ব্যবহারগ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিধিনিষেধ এত উচ্চ উৎকৃষ্ট ও গাঢ় যে তদালোচনায় ও তাহাদের প্রকৃতিদৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে, হিন্দুরা সমাজ এবং রাজনীতি, বিশেষতঃ সমাজ সম্বন্ধে, যথেষ্ট গূঢ় এবং গাঢ় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সমাজনীতি এতই উৎকৃষ্ট যে, আজি পর্য্যন্ত ইহারা বহুবিষয়ে, জগতের অন্য তাবৎ জাতি হইতে, আপনাদের অপরিমিত শ্রেষ্ঠতা পরিজ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইতে পারিতেছেন।

গ্রীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় কেবল বিধিনিষেধ বিন্যাস করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এ দিকে হিন্দুর মধ্যে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব-গ্রন্থ একেবারে নাই, ওদিকে গ্রীকদিগের মধ্যে তেমনি তাহা পরিমাণ

অপেক্ষা প্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হয়। গ্রীকদিগের তত্ত্বজীবনের উদ্দেশ্যই যেন সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করা; সুতরাং তাহার মধ্যে যে ধর্ম্মবিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা, তাহা প্রায়ই যেন আসবাবের ন্যায় ব্যবহৃত ও আলোচিত।

সামাজিকতা-বিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা গ্রীকদিগের মধ্যে যত প্রকারের উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্লেটোর সাধারণতন্ত্র (Republic) নামে যে গ্রন্থ, তাহাই বহুবিখ্যাত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্লেটো ইহা আত্মিক মূল হইতে কল্পনা এবং স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর মতে মনীষা, শ্রদ্ধা এবং আকাঙ্ক্ষা এই তিনটি বৃত্তি মনুষ্যকে ন্যায়পথে চালনা করিবার প্রধান পরিচালক। আকাঙ্ক্ষা হইতে সকল প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হয়, মনীষা তাহার সদসৎ নিরূপণ করিয়া থাকে, এবং শ্রদ্ধায় সেই সদসৎ ভাবের মধ্যে সৎ-ভাবকে স্থাপনার্থে মনীষাশক্তির সহায়তা করে। এই তিনের সংমিলনে "ন্যায়"-রূপী আর একটি চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়।

যাহা ব্যক্তিবিশেষের পরিচালক, ব্যক্তিসমূহ দ্বারা সংঘটিত সমাজের পরিচালকও তাহাই। অতএব সমাজস্থাপন ও পরিচালনার্থে, মনীষার প্রতিরূপ রাজন্যবর্গ, শ্রদ্ধা প্রতিরূপ যোদ্ধৃবর্গ এবং আকাঙ্ক্ষা প্রতিরূপ শ্রমজীবিগণ। এই তিন সংমিলিত হইলে আর একটী চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা ন্যায়াধিকার (Law) অর্থাৎ রাজ্যমধ্যে সুবিচারের আবির্ভাব। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানে অন্ধ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর সমাজস্থগণ, তাহারা রাজন্যপদে অধিকার প্রাপ্ত হইবে না। যে শ্রেণী হইতে রাজন্যবর্গ মনোনীত হইয়া থাকে, যোদ্ধৃবর্গও তথা হইতে মনোনীত হইবে; অর্থাৎ একই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা এবং গুণের তারতম্য অনুসারে, কেহ রাজন্য, কেহ যোদ্ধৃশ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর এই ত্রিবিধ শ্রেণী যেরূপ পরস্পর সুসংমিলনে কার্য্য করিবে, রাজ্যের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য তাহার উপর নির্ভর করিবে।

ইহার পর প্লেটো সামাজিক জীবনযাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য,

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমিতি ও অনুষ্ঠান আদির প্রকরণ বর্ণন করিয়াছেন; এবং সেই প্রকরণাদির মধ্যে যাহাতে কখন কোন নূতনত্ব প্রবেশ করিয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে না পারে, তৎপক্ষে আশঙ্কা পূর্ব্বক, বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলের অবতারণা করিয়াছেন। প্লেটো বোধ হয় ভাবিতেন যে লোকচরিত্রের আর পরিবর্ত্তন নাই, একই ভাবে চির কাল চলিবে। বিশ্বের পরিবর্ত্তন-নীতিতে ইহাঁর তাদৃক দৃষ্টি ছিল না। সে যাহা হউক, প্লেটোর মতে লোকের সামাজিক জীবন ব্যতীত আর পৃথক জীবনের অস্তিত্ব না থাকে, এবং ব্যক্তিগত গৃহধর্ম্মও সামাজিকতার মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ সমস্ত সমাজ লইয়া যেন এক গৃহস্থের ন্যায় হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বার্থকে বলি দিবে, এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের হানি করিতে হইলেও, তাহা করিয়া সমাজের হিতসাধন করিবে। পুরুষেরা যে যে বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ও পারক, সে সেইরূপ বিষয়ে শিক্ষিত ও সেইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ সামাজিক একজন হইবে; এবং তাহাদের মতিগতি অনুসারে, সমাজের মধ্যে স্ত্রীসুলভ কাজের যে যাহাতে বিশেষ পারক হইবার সম্ভাবনা, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও সমানরূপে সমাজের পরিরক্ষক হইবে, প্রভেদ কেবল ইহারা কোমল শক্তি বশতঃ স্বল্পায়তনসাধ্য কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবে। ধন সম্পত্তি আদি ব্যক্তিগত না থাকিয়া সমাজিক হইবে। স্ত্রীগণ সাধারণভোগ্যা হইবে; সুতরাং পুত্র কন্যা একমাত্র সমাজের সন্তান স্বরূপে গণিত হইবে।[১] স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে, যাহার যাহাতে ইচ্ছা, পরস্পরের সম্মতিক্রমে, তাহাতে উপগত হইবে ও সন্তানোৎপাদন করিবে। কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার সন্তান, কিছুরই ঠিকানা না থাকে, কারণ তাহা হইলে সমাজের মধ্যে স্বার্থের অস্তিত্ব না থাকায় কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না; এবং সর্ব্বদাই তথায় শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে। বাঞ্ছারাম, মানুষ কি অদ্ভুত জন্তু! এমন

১। Plato, Rep. V & VII.

ফন্দিই নাই যে বাহির করিতে না পারে, এমন কাজই নাই যে যাহাতে পিছু-পা হয়। মনুষ্যহৃদয়ে স্বর্গ নরক উভয়েরই সমান রাজত্ব। সাম্যবাদীরা জানে না যে, যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সাম্য-বাদের ঘোষণা করিয়া থাকে, সে প্রকৃতি স্বয়ং অসাম্যবাদী; তাহার তুল্য অসাম্যবাদী আর দ্বিতীয় নাই! কি আধ্যাত্মিক, কি আধি-ভৌতিক, কি আধিদৈবিক, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসময়ে তাহার অসাম্যবাদ সমান দুরন্ত! বাঞ্ছারাম, সাম্যবাদীদের সাম্যবাদ স্বপ্ন; অসাম্যবাদের অতিরেক ভাব দূষ্য; অসাম্যবাদের সমতা বা পরিমিত ভাব এ জগতের প্রকৃত মঙ্গলাদায়ী হয়।

গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে আরিষ্টটল সর্ব্বাপেক্ষা সমতাবাদী। ইহার তত্ত্বগুলিও, যাহা যাহা প্রকৃত পক্ষে কাজে লাগিতে পারে, এবং হাওয়ায় দড়ি না দিয়া উপস্থিত বিষয়কে কিরূপে সংস্কার করিয়া কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়, তদর্থে সদুপদেশ-দায়ক। আরিষ্টটলের শিক্ষা এই যে[২], যে কোন বিষয় হউক, তাহার সৎ-ভাব অসৎ-ভাব, এ উভয় দিকের অতিভাব পরিত্যাগ করিয়া, সেই উভয়ের মাঝামাঝি যাহা তাহাই বুদ্ধিমানেরা গ্রহণ কবিয়া থাকেন; যেমন সাহস,—ভয় ও কাপুরুষের ন্যায় ভীরুতা এবং দিগ্বিদিকশূন্য উগ্রতা, এতদুভয়ের মাঝামাঝি যাহা তাহাই প্রকৃত সাহস। সেইরূপ মিতাচার,—অপরিমিতাচার এবং শূন্যাচার এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা মিতাচার। অর্থ সম্বন্ধে, কৃপণতা এবং মুক্তহস্ততা ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা দাতৃত্ব। নীচ ও বিনতচিত্ত এবং আত্মগরিমা,ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা মহানুভাবকতা। নীরাগ এবং কথায় কথায় রাগ ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা নম্রতা। হিংসা এবং ক্রূর বৈরতা ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা রাগ। গর্ব্ব এবং মুখচোরা ভাব ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা লজ্জা। ইত্যাদি। এই মধ্যম-ভাবরূপী সৎ-জ্ঞানে আসিবার নিমিত্ত আরিষ্টটল এই ত্রিবিধ উপদেশ দিতেছেন,—১ম; যে অতিরেক ভাব মধ্যম ভাবের বিরোধী তাহা

২। Aristot. Ethics II 7-9.

হইতে যতদূর পার দূরে যাইবে ;—২য় ; যে বিষয়টির প্রতি মন নিতান্ত ধাবিত, তাহা যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে। ৩য় ; আমোদের মোহে ভুলিও না। আরিষ্টটল বলিতেছেন যে, আমরা যে ঠিক সামঞ্জস্যময় মধ্যভাবে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতে পারিব এমন আশা করা যাইতে পারে না ; অতএব অল্প ইতর বিশেষ কিছু হইলে তাহা মার্জ্জনীয়। পুনশ্চ এরূপ মধ্যমভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য, কোন নিয়মও ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না ; এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এবং নীতিই সুন্দর পথ-প্রদর্শক। আরিষ্টটল বয়ঃ-বালককে বা বৃদ্ধকে, বালক বা বৃদ্ধ বলেননা ; জ্ঞানের তারতম্য অনুসারেই বালকবৃদ্ধাদি পৃথকত্ব হইয়া থাকে। ইহাঁর মতে সামাজিকতার শ্রীবৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে সাধনই পরম পুরুষার্থ ; এবং তজ্জন্য ইনি প্লেটোর ন্যায় নূতন সাধারণতন্ত্র কল্পনা করিতে প্রস্তুত নহেন ; উপস্থিত অবস্থার সংস্কার দ্বারা তাহাতেই যথাসাধ্য সৎ-ভাবের স্থাপন, ইহার উদ্দেশ্য। প্লেটোর সমাজ-তত্ত্ব সকলের সহ আরিষ্টটলের বড় একটা সহানুভূতি ছিল না। উপরে কথিত প্লেটোর সামাজিকতা, সামাজিক সম্পত্তি এবং সমাজিক স্ত্রীপুত্রবিষয়িণী তত্ত্ব, আরিষ্টটলের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত এবং উপহসিত হইয়াছে।৩ ফলতঃ সমস্ত গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে একমাত্র আরিষ্টটল যেরূপ সমাজের এবং জগতের উপকারে লাগিয়াছে, এরূপ আর কেহ লাগে নাই ; এবং সমগ্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আরিষ্টটলকেই সমগ্র গ্রীকতত্ত্ববিদ্বর্গের চূড়া বলিলে বলা যায়।

যাহা হউক আমাদের বাঞ্ছারামকে অতঃপর আর অধিক সংগ্রহ বা উদ্ধৃত করিয়া বিরক্ত করিব না। গ্রীকেরা যে বন্ধনশূন্য ভাবে সামাজিকতার দিকে কতদূর পর্য্যন্ত দৌড়াইতে প্রস্তুত ছিল, তাহা প্লেটোর সামাজিকতত্ত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সমাজতত্ত্ব লইয়া কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের এখানে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ফলের প্রতি

৩। Aristot. Polit. II. c. 2.

দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুরা যেমন একমাত্র রাজার উপর সকল বিষয়ের বরাত দিয়া, নির্ভাবনায় ও অনুত্তেজিতভাবে ঘরে বসিয়া, গৃহসুখ ভোগ করিত; গ্রীকদিগের মধ্যে তেমন নহে। ইহারা সকলেই, চর্ম্মকার হইতে লক্ষেশ্বর পর্য্যন্ত, পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক বিগ্রহে মাতিয়া, সমাজকে উত্তেজিত, এবং শাসনকর্ত্তা বা রাজন্যবর্গকে বিকম্পিত ও বিশোধিত করিয়া ফিরিত।—গ্রীক ইতিহাসের চাকচিক্য এবং উপকারিতাও, তাহাদের এই গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব।

পঞ্চম প্রস্তাব।

লোকবিদ্যা।

১। বিদ্যাতত্ত্ব।

বিদ্যা কাহাকে বলে, বিদ্যার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে আমাদের বাঞ্ছারাম বাবু বলেন যে, যে উপায়ের দ্বারা ওকালতি, ডিপুটী-গিরি, মুন্সফী, কেরাণীগিরি, অন্ততঃ রেলের চাকুরিটাও করিতে পারা যায়, তাহার নাম বিদ্যা। ইহাপেক্ষা বিদ্যার আর কি সদ্ব্যাখ্যা হইতে পারে! তাহার পর, বিদ্যা কি, তাহা যদি এরূপে স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে আর 'বিদ্যার আবশ্যকতা কি?' সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না।—বিদ্যার আবশ্যক অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, সময়ে সময়ে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া বাহবা লওয়ার জন্যও বটে; তবে কথাটা কি, অর্থ উপার্জ্জিত হইলেও বাবুগিরিটে যেমন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, বিদ্যা থাকিলে পাণ্ডিত্য ফলানও সেইরূপ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; উহা ঘটান, সময় এবং সুযোগের কাজ ও আয়েসের বিষয়। ইহার পর জিজ্ঞাস্য,—গ্রন্থ, পুঁথি, কেতাব, এ সকল কি? তাহার উত্তরে বাঞ্ছারাম বাবু বলেন, 'কালী-কলম লইয়া আঁচড় পাড়িয়া তাহা মুদ্রাযন্ত্র-যোগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারিলেই, গ্রন্থ, পুঁথি, কেতাব, সকলই হইতে পারে।' অতঃপর সেইরূপ কালির আঁচড় যাঁহারা পাড়েন, তাঁহারা গ্রন্থকার; যদি তাহাই না হইবে, তবে প্রত্যেক কালী-কলম-ব্যবসায়ী বঙ্গসন্তান "গ্রন্থকার," "প্রসিদ্ধ লেখক," "কবি," "মহাকবি" ইত্যাদি নামে একদিনের জন্য খ্যাত হয়েন কিরূপে, এবং কেনই বা তাঁহাদের প্রতি চটী-চাপাটী "প্রসিদ্ধ গ্রন্থ," "সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ" ইত্যাদি খ্যাতিতে বিখ্যাত হইয়া থাকে? এখন গ্রন্থাদির উদ্দেশ্য কি?—কথাটা কিছু গোলমেলে বটে, কিন্তু মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিলে

পর্য্যাপ্ত হইবে যে, গ্রন্থাদির উদ্দেশ্য ভাষার গায়ে গহনা পরান, ভাষার সম্পত্তি বৃদ্ধি করান,সঙ্গে সঙ্গে নিজের যশ খ্যাতি এবং বাহবা উপার্জ্জনও বটে। আমরাও বলি তাহাই, তবে কিনা নূতন কেতাব লিখিতে বসিয়া কথাটা একটু ফিরাইয়া ঘুরাইয়া নূতন করিয়া না বলিলে ভাল দেখায় না, এই জন্যই এখানে সে কথায় এ কথায় যাহা কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

এ সংসারে বিদ্যা এবং অবিদ্যার যুগপৎ রাজত্ব। বিদ্যা সত্যো-ভাসক, অথবা স্বয়ংই সত্যস্বরূপ; অবিদ্যা তাহার বিপর্য্যয়, মিথ্যা এবং ভ্রম। অথবা আরও সোজা কথায়, যাহা কিছু সৎ-শিক্ষার বিষয় তাহাই বিদ্যা, এবং যাহা কিছু অসৎ-শিক্ষার বিষয় তাহা অবিদ্যা। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মসাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াও, ততক্ষণ তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারেন নাই, যতক্ষণ না বিদ্যা-রূপিণী দেবী উমা-হৈমবতী তাঁহাদের সহায়তায় আগমন করিয়াছিলেন। মানুষ অনন্তহৃদয়ে দাঁড়াইয়াও, ততক্ষণ অনন্তকে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না এবং সত্য-সাযুয্য পাইয়াও ততক্ষণ সত্যকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে না, যতক্ষণ না বিদ্যা আসিয়া তাহাদের সহায়তায় সমাগত হয়। বিদ্যার স্বরূপতা, সত্য; শক্তি তাহার, অপরিজ্ঞাত প্রলয়াবর্ত্তকে নিয়মাধীন করিয়া জ্ঞাত সংসারে আনয়ন। ইহাগত মানবের পক্ষে লোকবিদ্যারই প্রথম প্রয়োজন; ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি যাহা, তাহা লোকবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মবিকাশে সক্ষম হয়।

কর্ম্মস্থলী পৃথিবীতে কর্ম্মসম্পাদনার্থে মানবের সমাগতি হইয়াছে। সংসার অনন্ত হেতু কর্ম্মও অনন্তায়ত। নিত্য-আবর্ত্তনশীল কালচক্র সহ কর্ম্মপদার্থের সংযোজন হেতু, তাহার প্রতি অভিনব রূপ যথাবিহিত সম্পাদনার্থে নিত্য এবং নব নব মুহূর্ত্তে মানবের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মানব তাহার সম্পাদনকার্য্যে নিযুক্ত, মানব কর্ম্মকারক। কর্ম্ম-কারক মাত্রে দ্বিভাগে বিভাজিত,—পরিচালক ও পরিচালিত। এ জগতে

অল্প বিস্তর সকল মানুষই পরিচালক, সকল মানুষই পরিচালিত; তবে বেশী আর কম। সাধারণতঃ বেশী কমেতেই বিভাগ বদ্ধ হয়। কাল ও কাল কর্ত্তৃক আনীত কর্ম্ম-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ও যাহাতে কালের সহ সমতায় স্খলিতপদ না হয় এরূপ সতর্ক হইয়া, পরিচালককে পরিচালনা করিতে হয়; ঐ নিমিত্ত পরিচালিতের অপেক্ষা পরিচালকের দৃষ্টি সর্ব্বদা দূর-প্রসারিত বা দূরদর্শনসম্পন্ন হওয়া উচিত। এই দূরদর্শন-শক্তি চালিত হইয়া, পরিণাম-অন্বয়ে অভিনব ও অনাগত সত্যস্বরূপ, এবং কর্ম্মক্ষেত্রগত অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহমধ্যে করণীয় কর্ম্মবিশেষের নির্ব্বাচক ও নির্ব্বাহক, যে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে,—যাহা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় লোক সম্বন্ধেই সত্ব এবং সৌন্দর্য্যশোভায় দ্যোতনশীল,—তাহার নাম বিদ্যা। দূরদর্শনশক্তির লঘুত্ব, গুরুত্ব এবং প্রকৃতি ও প্রকরণাদিভেদে, বিদ্যাও ধর্ম্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, লোকবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যা; এবং এই এক একটি বিদ্যার ভিতরেও আবার অংশ এবং শ্রেণিভেদে বস্তু-বিষয়-জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি নানাবিষয়িণী নানা বিদ্যা, ইত্যাদি নানারূপে প্রকটিত ও নানা নামে বিভাজিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিদ্যা যাহাদের অবলম্বন ও যাহারা তাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে বিদ্বান্; এবং যাহাদিগের হইতে তাহা উদ্ভাবিত হয়, তাহাদিগকে পরিমাণ অনুসারে ঋষি, গুরু, জ্ঞানী প্রভৃতি বলা গিয়া থাকে। কর্ম্মস্থলে পরিচালক ও পরিচালিত ভিন্ন, শারিগাহকের ন্যায়, আরও একদল ভেড়ুয়া, ভাঁড় প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে; যথা প্রমোদকর উপন্যাস এবং ছুট্‌লে কাব্য প্রভৃতি। এ সকলেরও মধ্যে ভাল মন্দ আছে, ইহাদিগেরও ব্যবহার আছে; কে না জানে কষ্টসাধ্য কার্য্যে শারিগাহক কতটা সহায়তা করিয়া থাকে। শারিগান প্রায়ই অকর্ম্মা অলস সময়ে গীতবদ্ধ হয়।

প্রতি পরিচালক ও পরিচালিতেরই, সংসারস্থলীতে কর্ম্মক্ষেত্রের পরিমাণ ও সীমা নিরূপণ করা রহিয়াছে; পরিচালকের দৃষ্টিদৃষ্ট বিষয় বা সহজ কথায় তাহার উদ্ভাবিত সত্য, সেই সীমান্তমধ্যে প্রচারিত ও

পরিজ্ঞাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সীমান্ত, বলা বাহুল্য যে, দেশ ও কাল—এক এবং উভয় ব্যাপিয়া প্রসারিত। সীমান্তবর্ত্তী স্থান ও কাল সঙ্কীর্ণ হইলে, একা বাক্যের দ্বারা সেই উদ্ভাবিত নব সত্যের প্রচারণা সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু যখন তাহা বহুবিস্তৃত ও বহ্বায়তন, তখন আর প্রচারকার্য্য একা বাক্যের দ্বারা সমাধা হইয়া উঠে না; তখন কাজেই নানা লোকমুখে প্রচার এবং প্রচারের আরও বহু বিস্তার আবশ্যক হওয়ায়, কালী কলমের আবশ্যক হয়। এরূপ প্রচারস্থলে, কালী কলমের ব্যবহার হইতে যে পদার্থের উৎপাদন হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ বলা যায়; তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত গ্রন্থ নহে, তাহাদিগকে গ্রন্থানুকারী ছায়ামাত্র বলা যায়। এরূপ সত্যোদ্ভাসক গ্রন্থের গ্রন্থকার যাঁহারা, তাঁহারাই এ জগতে বহুকাল জীবিত থাকিয়া জগদ্বাসীর নিকট হইতে স্বেচ্ছা ও ভক্তিপ্রদত্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নতুবা অপর যাহারা, তাহারা উৎপতিতবৎ একবারমাত্র কালের তরঙ্গকল্লোলে উঠিয়া, অমনি আবার বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃত গ্রন্থকার যাহাঁরা, তাহাদিগকে খোষ-আমোদ বা সখের গ্রন্থকার বলিয়া ভাবিও না। নিজের নিকট এ জগতে যাহা অকাট্য অভিনব এবং অনুসরণীয় সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, যাহার খাতিরে জীবনব্যয় করাও অতি তুচ্ছ কথা, যাহা নিজের বিশ্বাস্য এবং অনুষ্ঠেয় পূর্ণমাত্রায় এবং যাহা জগতে বিশ্বাসিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনুমিত, এরূপ গ্রন্থকার সকল, সেই সকল কথা গ্রন্থবদ্ধ করিবার নিমিত্তই, গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। লাঞ্ছনা, ক্লেশ, অনাদর, অর্থনষ্ট, কিছুতেই ইহাদিগকে বিমুখ ও বিচলিত করিতে পারে না, এবং সে পক্ষে উদাহরণও যে কিছু বিরল তাহা নহে। যাহা নিজে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহা অপরকে বিশ্বাস করাইব কিরূপে; যাহাতে নিজে চালিত হই নাই, তাহা দ্বারা অপরকে চালনা করিব কিরূপে? যে নিজে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অন্যকে বিশ্বাস করাইতে চায়, যে নিজে চালিত না হইয়া অপরকে চালাইতে চায়, সে

ধূর্ত্ত এবং ভণ্ড ; এ জগতে সে কখনই সফলতা ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না এবং যদি বা কখন কালের কুটিল গতিতে পারে, তবে সে দুই দিনের জন্য! দুর্ভাগ্যক্রমে এ জগতে ধূর্ত্ত এবং ভণ্ডেরই রাজত্ব ও প্রভুত্ব বেশী। ফলতঃ বাঞ্ছারাম, যদি তুমি এমন কোন সত্য তত্ত্ব বা নূতন বিষয় অনুভব করিতে পারিয়া থাক যাহা অন্যের নিকট এখনও অনাবিষ্কৃত, তাহাই প্রকাশ করিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিও ; পুনশ্চ যদি তাহা সহজ এবং অল্প কথায় প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পার, তবে আর বাঁকা কথা বা তদধিকে লেখার দিকে যাইও না ; ইহাই সৎপরামর্শ। আরও একটি সোজা কথা বলি, যাহা পদ্যে প্রকাশ করিতে পারিবে তাহাতে আর স্বর সংযোগ করিও না ; যাহা গদ্যে প্রকাশ করিতে পার তাহাতে আর পদ্য আনিয়া ফেলিও না ; এবং যাহা কথায় বলিলে চলিবে, তাহা গদ্য পদ্য কিছুতেই কখন লিখিও না। যদি সহজে হয়, তবে কেন মিছা উত্তরোত্তর পরিশ্রম স্বীকার ? লেখা পড়া বা গ্রন্থের সৃষ্টি, পৃথিবীতে একেবারেই আদি কাল হইতে হয় নাই, আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। যতদিন কথায় চলিত, ততদিন সঙ্কেতলিপি ছিল না ; যতদিন সঙ্কেতলিপিতে চলিত, ততদিন লেখা পড়া ছিল না ; যতদিন লেখায় চলিত, ততদিন ছাপার বন্দোবস্ত ছিল না ; আবার ছাপায় যখন না চলিবে, তখন হয়ত নূতন রকমের আরও কিছু নূতন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ প্রকৃতির এই নিয়ম, আবশ্যকাতিরিক্তে বিষয়োৎপত্তি হয় না ; ইহা দেখিয়া, ইহা বুঝিয়া, তুমিও কেন তাহার অনুকরণ না কর বা নিজের জবাবদিহিতে প্রবুদ্ধ না হও। তুমিও আবশ্যকাতিরিক্তে অনুষ্ঠানক্ষিপ্ত হইও না। পরন্তু যাহা কিছু তোমার করা প্রয়োজন এবং যাহা তুমি করিতে সক্ষম, আগে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তোল ; পরে যদি কাজ না থাকে ও সময় পাও, তখন তাহার অতিবৃদ্ধি ও আড়ম্বরে মাতিও, কেহ তোমাকে বারণ করিবে না। এ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত তেমন অবসর আছে কি ?

সকল পদার্থই এ জগতে দ্বৈতকার্য্যের সাধক হয়, প্রথম আত্মসার্থকতা

সাধন, দ্বিতীয় অপরার্থে নিয়োজন। বিদ্যাও সেই দ্বিবিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এক স্বসীমান্তর্বর্ত্তী উদ্দেশ্য বা কর্ম্মের পরিচালন, অপর অনাগত ভাবী মানবের নিকট স্বায় এবং স্বসময়ের প্রতিকৃতি প্রকটন। বিদ্যার এই দ্বিবিধ কার্য্য দুই দিকেই বিশালায়ত হওয়ায়, জাতীয় উন্নতি বা অবনতিরও উহা পরিচায়ক স্বরূপ হইয়া থাকে। কার্য্যকারক আরদ্ধ কার্য্যে হস্ত প্রদান করিলেই কার্য্য হয় না; পূর্ব্বে কতদূর কৃত হইয়া গিয়াছে এবং এখন যাহা করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি ও প্রকরণ কি, পূর্ব্বকৃত অংশের সহ তাহার সম্বন্ধ কতদূর এবং পূর্ব্বকৃত অংশ কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, পরিণামিত্ব কি প্রকার এবং ভবিষ্যৎ সহ সম্বন্ধে কিরূপ দাঁড়াইবে, এ সকল জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এ নিমিত্ত, শিক্ষা-স্থলে, পূর্ব্বগত ও অধুনাতন এবং ভবিষ্যদাভাস, এই সকলের উপলব্ধি ও অনুভূতির নিমিত্ত যথোপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। তদর্থে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন; তবে শিক্ষায় অবশ্য বহুত্ব ন্যূনত্ব আছে বটে, কিন্তু সে কেবল শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ লইয়া। যথায় যথোপযুক্ত শিক্ষার পক্ষে কোনরূপে হানি হয়, অথচ যথায় মানবে নিহিত কার্য্যশক্তি প্রয়োজনানুরূপ পূর্ণ শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত; তথায় কার্য্যশক্তি যে সেই পরিমাণে ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। অথবা যে স্থানবিশেষে, যাহাদের পরিচালিত হওয়া উচিত; তাহারা যদি সে স্থানে, স্বভাব ছাড়িয়া, পরিচালকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যায়, তাহা হইলেও সুমঙ্গলের সম্ভাবনা দূরগমন করিয়া থাকে। কালের আবর্ত্তন সহ কার্য্যও যেমন নব নব ও উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া আসিতেছে, শিক্ষারও নূতনত্ব ও গুরুত্ব পক্ষে তেমনি প্রয়োজন বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষাই মানবজীবনের একমাত্র পরিচালক। মানবজীবনের সার স্বরূপ ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম, উভয়ই এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বিদ্যারূপিণী দেবী উমা হৈমবতীর কৃপাকটাক্ষ হেতুই মানব, ব্রাহ্মীপ্রপঞ্চ স্বরূপ জীবনপ্রবাহ এবং তদুদ্দেশ্য ও তাহার পরিণাম সহ পরিচয় প্রাপ্তে, মনুষ্যত্ব ও কর্ম্ম-

পথে অগ্রসর হইয়া কৃতকৃতার্থতালাভে সমর্থ হইতে পারিতেছে; নতুবা মানব আজিও অকৃতার্থ এবং পশুবৎ থাকিয়া যাইত।

এক্ষণে বাঙ্গালামী ব্যাখ্যার আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন নহে, তবে সুখ উপার্জ্জন বলিতে পারা যায় বটে; কিন্তু সুখ অর্থে নহে, অর্থ ও সম্পদের সুখ যাহা তাহা সম্পূর্ণই আপেক্ষিক, স্বয়ং কখন পূর্ণ সুখ নহে। সুকার্য্য সংযত ও সাত্ত্বিক ভাবে সম্পাদন করিলে যে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তাহাই পূর্ণ সুখ। সুকার্য্যশ্রেণীগ্রথিত বা সুকার্য্যসমষ্টিস্বরূপ যাহার জীবন এবং যে সংযমী, সেই কেবল এ জগতে পূর্ণ সুখে সুখী হইতে পারে; কোন অবস্থা বা ঘটনা চক্র তাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার যেমন ইহলোক, পরলোকপরিণামও তেমনি সুখময় হইয়া থাকে। অর্থ সম্পদাদির সুখ ক্ষণিক উন্মাদনমাত্র, প্রকৃত তাহা সুখ নহে। অথবা যদি অর্থ উপার্জ্জনই বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য এত আয়াস ও আড়ম্বর কি জন্য?—অতি সামান্য বিদ্যাতেই অতি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হইয়া থাকে; আর অতি মহৎ বিদ্যাতে? বরং অতি সামান্য অর্থ উপার্জ্জিত হইতে দেখা যায়। অর্থ সামান্যতর কর্ম্ম সম্পাদনের মজুরী স্বরূপ। কর্ম্ম মহৎ হইলে, তাহার মজুরী কেবল অর্থে কুলাইয়া উঠে না, মহৎ বিদ্বান্ ও মহৎ কর্ম্মকারকেরা প্রায়ই অর্থহীন এবং সম্পৎসুখে দরিদ্র!

অথবা বিদ্যার অন্যতর ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাকে কর্ম্মতত্ত্ব বলিলেও সঙ্গত হয়। যে বিদ্যা প্রধানতঃ পারলৌকিক কর্ম্মবিষয়িণী, তাহাকে প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা বলা যায়; আর যে বিদ্যার সাহায্যে প্রধানতঃ ইহলৌকিক বিষয় সমস্ত নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকেই লোকবিদ্যা নামে আখ্যাত করা যাইতেছে। কিন্তু কি ইহলোক কি পরলোক, উভয়তঃ পূর্ণমনুষ্যত্বলাভ কেবল তখনই সম্ভবপর হইয়া থাকে, যখন ধর্ম্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও লোকবিদ্যা, এই ত্রিবিধ বিদ্যা আসিয়া একতায় এবং সামঞ্জস্যে সংমিলিত হয়। তদ্রূপ পূর্ণ মনুষ্যত্ববিধায়ক কর্ম্মক্ষেত্র

মধ্যে,ধর্ম্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা নিয়ামক স্বরূপ এবং লোকবিদ্যা যাহা তাহা প্রবর্ত্তক। লোকবিদ্যারও দ্বিবিধ প্রকৃতি হেতু আমরা এখানে তাহাকে দ্বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিতেছি, এক উপপাদ্য ও অপর আনুষ্ঠানিক। উপপাদ্য বিদ্যা যাহা, তাহা প্রধানতঃ অন্তর্জগৎকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন বা অন্তর্দর্শনে মুগ্ধ ও তদ্দিকে লীন। আনুষ্ঠানিক বিদ্যা যাহা, তাহা প্রধানতঃ বহির্জগৎকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন বা বহির্দর্শনে মুগ্ধ ও তদ্দিকে লীন। উপপাদ্য বিদ্যার লীলাভূমি প্রধানতঃ চিন্তাক্ষেত্র, আর আনুষ্ঠানিক বিদ্যার লীলাভূমি প্রধানতঃ ক্রিয়াক্ষেত্র।

এ পর্য্যন্ত আমরা এতদুভয়জাতীয় জীবন যতদূর আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দুর প্রকৃতি চিন্তাশীল, ভাবিতে যত পটু করিতে ততটা পটু নহে ; আর গ্রীকের প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, করিতে যতটা পটু, ভাবিতে তত পটু নহে। চিন্তা স্বভাবতঃ সাধারণ বিষয়কে অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতে ভালবাসে, কিন্তু ক্রিয়া যাহা তাহাকে স্বভাবতঃই উপস্থিত সংসার লইয়া ব্যাপৃত হইতে হয় ;—হিন্দু যে কিজন্য পারলৌকিক বিষয় লইয়া অধিক রত এবং গ্রীক যে কিজন্য ইহ সংসার লইয়া অধিক রত, উক্ত প্রকৃতি ভেদ দ্বারাই তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। সে যাহা হউক, জাতিদ্বয়ের এরূপ প্রকৃতিভেদ হেতু, যে বিদ্যা উপপাদ্য, তাহাতে হিন্দুদিগের এবং যাহা আনুষ্ঠানিক, তাহাতে গ্রীকদিগের উৎকর্ষলাভ করিবার কথা। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা যে কোন বিষয়ে যাহা দেখিতেন, তাহাই উপপাদিকা দৃষ্টির সাহায্যে ; গ্রীকেরা সেইরূপ যে কোন বিষয়ে যাহা দেখিত, তাহা আনুষ্ঠানিক দৃষ্টির সাহায্যে। ফলতঃ এ উভয় দৃষ্টি, এ উভয় জাতিকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, বিষয় আনুষ্ঠানিক হইলেও,হিন্দুর হাতে পড়িবামাত্র তাহা উপপাদ্য আকার ধারণ করে ; সেইরূপ যাহা উপপাদ্য তাহা গ্রীকের হাতে পড়িলে, আনুষ্ঠানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহার ফল এই যে, যে কোন বিষয় হউক, তৎসম্বন্ধে হিন্দুর তত্ত্বভাগ যেমন ভাল, কর্ম্মভাগ তেমন

সুসম্পাদিত নহে, বরং অনেক স্থলে কুসম্পাদিত বলিয়া বলা যায় ; আর গ্রীকের তত্ত্বভাগ যেমন ভাল নহে বটে, কিন্তু কর্ম্মভাগ অতি সুসম্পাদিত ও নয়নতৃপ্তিকর। হিন্দু ভাবিতেন উচ্চ, বুঝিতেনও উচ্চ, কিন্তু কার্য্যে তাহা তেমন পরিণত করিতে পারিতেন না ; গ্রীক ভাবিত অপেক্ষাকৃত সামান্য, বুঝিতও অপেক্ষাকৃত সামান্য, কিন্তু কার্য্যে তাহা ধারণার অতিরিক্ত সুসম্পাদিত করিত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। এই নিমিত্ত গ্রীকের চাকচিক্য এত অধিক এবং এই নিমিত্ত হিন্দু উচ্চ হইয়াও নিদর্শনশূন্য।

উপপাদ্যরীতি যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া, যখন যেখানে উপনীত হয় ও যাহা লক্ষ্য করে, তখন তদন্বয়ে পরিণামও শুভাশুভ গণনা পূর্ব্বক, ফলাকর্ষণ করিয়া থাকে। হিন্দুরাও তাহাই করিতেন ; তাঁহাদের নিকট, কি বিষয়স্থাপনে কি বিষয় সংশোধনে, ব্যবহার অপেক্ষা যুক্তিই অধিক বলবতী ছিল। হিন্দু শাস্ত্রাদি প্রধানতঃ এই যুক্তিতত্ত্বের উপর স্থাপিত। কিন্তু হিন্দু জ্ঞানিগণ সাধারণ লোকবর্গকে যুক্তিমার্গে বিঘূর্ণিত না করিবার অভিপ্রায়ে হউক বা যে কোন কারণে হউক, ফলাকর্ষণের আকর্ষণপ্রণালী অর্থাৎ যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, ফলটিমাত্র বিধিনিষেধ আকারে শাস্ত্রনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। [১] বিধিনিষেধ পালনে, কর্ম্মস্থলে দোষাদোষ পর্য্যবেক্ষণপক্ষে

১। আকর্ষিত ফল বিধিনিষেধে নিবদ্ধ হওয়ায়, আকর্ষণপ্রণালী সকল সময়েতেই যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, ঠিক তাহা নহে। অনেক বিষয়ে, আকর্ষণপ্রণালী ও তদানুষঙ্গিক তত্ত্ব সকল কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে, শিষ্যত্ব আচরণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকট জানিতে পারিত। পুরাকালে লিখনকার্য্য সংক্ষেপ করিবার জন্যই হউক বা লিখনপ্রণালীর বিরল প্রচার হেতুই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, ভিতরের কথা সকল গুরুমুখে শুনিয়া ও বুঝিয়া, মুখ্য কথা যাহা তাহা বিধিনিষেধস্বরূপে অথবা সূত্রাকারে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইত। সূত্র সকল, মুখে মুখে ব্যাখ্যাত বিষয়ের স্মারকলিপি মাত্র। ভিতরের কথা সকল গুরুমুখগত হওয়ায়, হিন্দুদিগের মধ্যে গুরুর এতটা মান ; যেহেতু

স্বাধীনতার ভাগ অতি অল্পই ;—বিশেষতঃ যথন হিন্দু বিধি-নিষেধ সকল দেবাজ্ঞাস্বরূপে প্রচারিত। আনুষ্ঠানিক রীতি, তদ্রূপ মার্গ ও প্রথা অবলম্বনে তদ্রূপ ফলাকর্ষণ না করিয়া এবং বিধিনিষেধে বাধ্য না হইয়া,পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা সকলের সামঞ্জস্য ও সমীকরণ এবং কার্য্য-কারণ নিরূপণে যে ফলাকর্ষণ করে, তাহারই দ্বারা আত্মপরিচালনা করিয়া থাকে এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা দোষাদোষ সংশোধন পূর্ব্বক, ক্রিয়াপথে অগ্রসর হয়। বলা বাহুল্য যে, এ পথে অনুষ্ঠাতার স্বাধীনতা-ভাগ অনেক অধিক। উপপাদ্য রীতির ফল, তত্ত্ব ; আর আনুষ্ঠানিক রীতির ফল, বিজ্ঞান। তত্ত্ব ভাবী পরিণাম এবং বিজ্ঞান উপস্থিত শুভা-শুভ লইয়া ব্যস্ত। তত্ত্ব ভাবী পরিণামব্যবসায়ী বলিয়া অপেক্ষাকৃত দূরদর্শনসম্পন্ন ; আর বিজ্ঞান তদ্রূপ কারণাভাব হেতু দূরদর্শনে অপেক্ষা-কৃত হীন। এই কারণ হেতু দেখা যায় যে, উপপাদ্যক্ষেত্রে, বিষয় সকল দূরদর্শনসম্পন্ন হওয়াতে, অনুষ্ঠানে হীনতা সত্ত্বেও, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। হিন্দুর জাতীয় জীবন ও কর্ম্ম এবং গ্রীকের জাতীয় জীবন ও কর্ম্ম, এতদুভয়ের দীর্ঘস্থায়িত্ব তুলনা করিলেও, তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারিবে।

উপরি-উক্ত বিবৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রকৃতিতে হিন্দু তাত্ত্বিক,

---

গুরু রুষ্ট হইলে অনেক কথা না শিখাইতে পারেন এবং তুষ্ট হইলে সকল কথাই শিখাইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ গুরুভক্তি : বিষয় বিশেষে বিশ্বাস স্থাপনেরও উপায়স্বরূপ বটে ; যেহেতু হিন্দুধর্ম্মে অনেক বিষয় আছে যাহা অকপট বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ভিতরের কথা সকল গুরুমুখগত হওয়ার প্রথম দোষ এই যে, তাহা সাধারণের অগোচর থাকায়, কার্য্যকারণ ও সোপাণ জ্ঞান জন্য যে বিষয়ের উত্তর উন্নতি তাহা হইতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ কালে উপযুক্ত গুরুর অভাবে তাহা একবারেই লোপ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ;— অনেক বিষয়েতে হইয়াছেও তাহাই, অনেক বিষয়েতেই এখন নেড়া বোঁচা বিধিনিষেধ মাত্র লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ দুষ্টগুরু ও দুষ্টমতের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং তাহাতে অপরিসীম অনর্থ সাধিত হয় ; বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ইহার ক্লেশকর দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না।

আর গ্রীক, বৈজ্ঞানিক।২ তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানে অনেক তফাত। তত্ত্বের কার্য্য, প্রাপ্ত পদার্থের যথাদৃষ্ট ভাবে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহার স্বরূপতা জ্ঞানের অনুসরণ। আর বিজ্ঞানের কার্য্য, যথাদৃষ্ট ভাবকেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া, পদার্থটির সাধ্যসাধন প্রক্রিয়া অবধারণ পূর্ব্বক তদবলম্বনে পদার্থান্তরের উপলব্ধি ও প্রাপণ। তত্ত্ব আধ্যাত্মিক পথে অধিকতর কার্য্যকরী হইলে হইতে পারে; কিন্তু সাংসারিক পথে, বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা অপরিসীম। তবে একটা কথা এই, তত্ত্বজাত জ্ঞান আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইলেও জিনিসটা খাঁটী এবং তাহা সামঞ্জস্য গুণে সক্ষম; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ন্যায় একের প্রশ্রয় দিতে গিয়া অপর দিকে বিপ্লব বাধাইয়া, ভূয়োদর্শনের বহুল প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে না। তত্ত্বের ফল স্থিরতা ও শান্তি, আর বিজ্ঞানের ফল অস্থিরতা ও অশান্তি; তদুভয়ের অনুসরণকারী হিন্দু এবং গ্রীক চরিত্রেও তাহা সুন্দরভাবে সুচিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ, তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে ধ্যান ও অনুভূতির ক্রিয়া যতটা, সাধ্যসাধন প্রক্রিয়ার কার্য্য ততটা দেখা যায় না এবং এই জন্যই বোধ হয়, হিন্দুচিত্তজাত বিদ্যা ও বিষয়াদি বিধিনিষেধ আকারে যতটা, সাধ্যসাধন প্রক্রিয়াক্রমে ততটা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নাই। যে কোন বিষয় প্রকট কার্য্যকারণাত্মক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রথিত, তাহার উপর উন্নতি চলিতে পারে; কিন্তু যাহার কার্য্যকারণজ্ঞান বিলুপ্ত, এরূপ বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রের উপর উন্নতি চলে না। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীকমূল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বিপুল উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছে; আর হিন্দুসন্তান আজিও সেই প্রাচীন ঋষিপ্রণীত বচন আওড়াইয়া কার্য্য সারিতেছেন!

২। বলিতে কি বাপ্পারাম, গ্রীকের বৈজ্ঞানিকতাটা এতই বেশী যে, তাহাদের উত্তরাধিকারী আধুনিক ইউরোপীয়গণ, এমন কি, মিথ্যাকথনকে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের পদবীতে উঠাইয়া তাহার অসীম শোভাসম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিজ্ঞান-পদবীতে উঠিয়া মিথ্যা কথা এখন 'ডিপ্লোমেসী', 'ভদ্রতা', 'সভ্যতা' ইত্যাদি নানা মোলায়েম নামে অভিহিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ফলতঃ উহার ব্যবহার ভিন্ন আজিকালি

হিন্দুর লোকবিদ্যা, গ্রীকের লোকবিদ্যার ন্যায়, উত্তর উন্নতি সম পরিমাণে প্রাপ্ত না হওয়ার পক্ষে অপরাপর কারণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, আদিতে হিন্দুকে চিন্তাশীল ও আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান এবং গ্রীককে কর্ম্মশীল ও আধিভৌতিক গুণপ্রধান করিবার পক্ষে, জীবনব্যাপার নির্ব্বাহকল্পে উপায়ে ইতরবিশেষ ভাব একটি অন্যতর কারণ। মনুষ্যের মন কখনও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না এবং যাহার জন্য মানসিক খাটুনি ও আকাঙ্ক্ষা অধিক, সেই পদার্থই স্বভাবতঃ মানুষের অধিক প্রিয় হইয়া থাকে। আহারীয়ের স্বচ্ছলতা হেতু হিন্দুর জীবনব্যাপার অতি সহজে নিষ্পন্ন হওয়াতে, প্রথমতঃ ইহ-লৌকিক বিষয় সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা হইতে ক্রমোত্তর চেষ্টাজাত ধারণা, উভয়ই সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আসিল; দ্বিতীয়তঃ ইহলৌকিক এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়াভিনিবেশে তাদৃশ প্রয়োজনাভাব হেতু, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি যাহা তাহা চিন্তা ও কল্পনা-ক্ষেত্র এবং পারলৌকিক বিষয়ে সমাহিত হইল;—সুতরাং পারলৌকিকবিষয়মূল ধর্ম্ম এবং চিন্তা ও কল্পনামূল বিদ্যা, ইহারাই হিন্দুর পরম প্রিয় পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীকের নিকট তৎপরিবর্ত্তে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ এবং লোকযাত্রাবিধায়ক কর্ম্মপন্থাই প্রধানতঃ প্রিয় পদার্থে পরিণত হইল; এবং অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি জন্য সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, ইহলোকের শ্রেয়োবিধায়ক লোক-বিদ্যাও পুষ্টতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হিন্দুর মধ্যেও লোকবিদ্যার

ইউরোপে লোকযাত্রা চলা দুষ্কর! বলা বাহুল্য যে, এই বিজ্ঞানপ্রসাদাৎ আধুনিক ইউরোপীয়গণ সর্ব্বদাই জগৎ-পয়মেলে সত্যবাদী; আর ভারতীয়ের পোড়া কপাল পোড়া! কেবল সেই বিজ্ঞানের অভাবহেতু, কুঁড়ের কোণে নির্ব্বাক বসিয়াও পাহাড়ে মিথ্যাবাদী!! কে না বলিবে, ছিটা ফোটা কালির দাগ অপেক্ষা সব কালীতে শোভা এবং গরব বেশী! ধন্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানশক্তি! ধন্য ডিপ্লোমেসী প্রভৃত উন্নতিশালিনী খ্রীষ্টীয় ইউরোপ!! বল-বোম্বেটেগিরীকে আরও ধন্য; যাহাতে দুর্ব্বল বা পরাধীনের প্রতি যদৃচ্ছা বাক্যপ্রয়োগে সাহস হয়!!!

প্রবর্ত্তনা ও উন্নতি না হইয়াছিল,এমন নহে; কিন্তু যে গুলির ধর্ম্ম সহ সম্বন্ধ আছে তাহারই এবং সে সকলেরও পুনঃ ধর্ম্মাতিরিক্ত গতি যেখানে, সেখানে আর হিন্দু অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। আবার যে সকল বিদ্যার ধর্ম্ম সহ প্রত্যক্ষে কোনই সংশ্রব নাই, সেখানে হিন্দু কেবল উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; আর উন্নতি কামনা করেন নাই। এই জন্যই হিন্দুর অনেক বিষয় সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে তাহাদের যে ভাব ছিল, এখনও তাহারা সেই একই ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত সহজপ্রাপ্য বিধায়, উল্লেখবিশেষের প্রয়ো..ন নাই।

যেরূপ চিন্তামার্গ হিন্দুরা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ীভূত পদার্থ অপ্রত্যক্ষ ও অনির্দ্দিষ্ট; সুতরাং এখানে চিন্তা বহুপথ অবলম্বনে বহু মত প্রসব না করিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু অনুষ্ঠানপ্রিয় গ্রীকের মধ্যে সেরূপ পৃথ ও মতবহুলতা ঘটিবার কথা নহে। এ কারণে, হিন্দুর শাস্ত্রসংসার অতিশয় বিপুল; তাহাতে নানা অভিনব কথা ও মত সকল লক্ষিত হয়, এবং ধর্ম্মে বিবিধ উপধর্ম্ম,তত্ত্বে বিবিধ পন্থা, বিধিনিষেধে বিবিধ প্রকারভেদ এবং বিষয় বিশেষে বিভিন্ন ও বিপরীত মত সকলের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারকগণ সেই সকল বিরোধ মীমাংসার নিমিত্ত নানা উপায় ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা যে সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন এমনটা বোধ হয় না।৩ দ্বিতীয়তঃ প্রোক্ত তত্ত্ব এবং মতবহুলতা হইতে, হিন্দুর শাস্ত্রসংসারও অতিশয় বিপুলায়তন প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীকের শাস্ত্রায়তনও অনেক কম এবং মতবহুলতা ও বিরোধিতাও তাদৃশ দৃষ্ট হয় না।

৩। এই সকল বিরোধ মীমাংসার নিমিত্ত,কখনও বা বিরোধী অংশকে 'কল্পান্তর বর্ণনা,' কখনও বা 'অধিকারিভেদে পৃথক ব্যবস্থা', ইত্যাদি ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা সকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আজি কালি বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাখ্যা উৎপন্ন হইয়া, সে পক্ষে বড় একটা কম সহায়তা করিতেছে না।

ইহা স্বাভাবিক যে, যেখানে অনুষ্ঠানপর্ব্ব সঙ্কীর্ণ, অনুষ্ঠানবহুলতা হইতে যে দূরদর্শন এবং সেই দূরদর্শন হইতে যে বিবিধ কার্য্যকরী ও কার্য্যোন্নতিকারী মতের উৎপত্তি হয়, তাহার সঙ্গে সেখানে বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। এরূপ স্থলের মতবহুলতা বস্তুতঃ কেবল প্রস্থানভেদের বিভিন্নতা মাত্র, নতুবা বিষয় এবং বিশেষ্য যাহা, তাহা প্রায় সকল মতেই এক প্রকার। হিন্দুদিগের শাস্ত্রসংসারের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সর্ব্বত্রই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তথায় কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি অন্য কিছু, সকলেরই স্ব স্ব বিভাগে আশয়, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য এবং মীমাংসা প্রায় একরূপ ও একঘেয়ে; কেবল ভিন্ন ভিন্ন চিন্তামার্গভেদে বিবিধ প্রস্থানভেদ হেতু প্রকারবহুলতা দৃষ্ট হয়, নতুবা তাহাতে উত্তরগতি বা উন্নতির চিহ্ন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,—উহা কূলে আবদ্ধ নৌকায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে দাঁড় বাহিয়া শ্রান্ত হওয়ায় যে ফল তদতিরিক্ত নহে।

চিন্তা যতই উচ্চ হউক, যেখানে অনুরূপ উচ্চ অনুষ্ঠানের সহ সামঞ্জস্যশূন্য, সেখানে এইরূপ দশাই হইয়া থাকে। ফলতঃ চিন্তা এবং অনুষ্ঠান, উভয়ই এক অপরের সহ সামঞ্জস্যশূন্য হইলে, নানাবিধ প্রকারে বিকৃত হইয়া অনর্থোৎপাদন করিয়া থাকে। ভারতে চিন্তার সহ যদি অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে ভারতের আজিকে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। ভারতকে আবার উন্নতমুখী করাইতে হইলে, চিন্তার সহ অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য ব্যতীত কখনই তাহা ঘটিবে না। বোধ হয়, সেই অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্যই, বিধাতা কর্তৃক ভারতে আজি পরাধীনতার এতদ্রূপ প্রগাঢ় নিয়োজন। আর এক কথা, যেখানকার উচ্চ শ্রেণী অনুষ্ঠানবিমুখতায় উচ্চ চিন্তামার্গ লইয়া ব্যাপৃত; সেখানকার নিম্ন শ্রেণী চিন্তাপ্রসূত বিষয়গ্রহণে অসমর্থ বিধায় দূরপতিত হইবাতে, প্রায় উচ্চতর জাতীয় বিষয় সমস্তে অতিশয় আস্থাশূন্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত, হিন্দু এবং গ্রীকের রাজনীতিক্ষেত্রের তুলনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়।

২। রাজনীতি।

গ্রীকের রাজনীতিক্ষেত্র সম্পূর্ণতঃ আনুষ্ঠানিক বুদ্ধির উপরে স্থাপিত; এজন্য সমাজের অতি উচ্চশ্রেণী হইতে অতি নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীস্থেরাই রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহবান্ এবং নিরন্তর তাহাকে আলোচনাপূর্ব্বক দর্শন ও বিচারাধীনে আনিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্বভাবতঃ যে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ হয়, তদ্দ্বারা উপস্থিত রাজনীতিকে সংশোধন, পরিবর্দ্ধন বা অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরে। ইঁহারা কি উপপাদ্য জ্ঞান, কি ভূয়োদর্শনের সহ অন্বয়শূন্য চিন্তা, এ সকলের কোন ধার ধারে না; প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও বহুদর্শনে যখন যাহা ভাল বোধ হইতেছে, তখন সেইরূপ করিতেছে। এই জন্য আমরা ইতিহাস আলোড়ন করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রীসে কখনও রাজতন্ত্র, কখনও সাধারণতন্ত্র, কখনও সম্ভ্রান্ততন্ত্র, ইত্যাদি নানাতন্ত্রীয় রাজশাসন পর পর আসিতেছে ও যাইতেছে এবং প্রত্যেকেই পুনঃ স্ব স্ব সাময়িক অভাবানুরূপ আকৃতি ধারণ করায়, তাহা ইতিহাসে এরূপ উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে যে, তাহার খণ্ডেকের সঙ্গেও ভারতীয় কোন এক সময় তুলনায় আসিতে পারে কি না সন্দেহ। এখানকার তত্ত্ববিদেরাও রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছে, তাহাও অনুষ্ঠানক্ষেত্রস্থ ভূয়োদর্শনকে অবলম্বন করিয়া; হিন্দুরাজনীতিজ্ঞের ন্যায় ভূয়োদর্শনশূন্য মনঃকল্পিত সম্ভবতা ও অসম্ভবতা প্রভৃতির অবলম্বনে নহে।

হিন্দুর রাজনীতিক্ষেত্র সম্পূর্ণতঃ উপপাদ্য জ্ঞানের উপরে স্থাপিত। হিন্দু রাজনীতিজ্ঞ ভূয়োদর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্বীয় পার্শ্বে মাত্র দৃষ্টি করিয়া এবং নিজ চিত্তজাত সদসৎ এবং সম্ভবতা ও অসম্ভবতা জ্ঞানের অবলম্বন দ্বারা, বিধিনিষেধাত্মক বুদ্ধিতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আবহমান কাল একই ভাবে রাজনীতি-স্বরূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়েতেও, যে যত

রাজনীতিজ্ঞ প্রাদুর্ভূত হউক না কেন, তাহারা রাজনীতি লইয়া যে কিছু আলোচনা করিয়াছে, তাহাও সেই যথা মীমাংসিত বিষয়ের বিভিন্ন দিগ্দর্শন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; সুতরাং তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটনা অতি অল্পই।

হিন্দুরাজনীতিজ্ঞের রাজনীতিধারণা স্বীয় পার্শ্বস্থ পারিবারিক দৃশ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। এরূপ রাজনীতিতে একঘেয়ে শান্তির সম্ভবতা অধিক বিধায়, ঐতিহাসিক চাকচিক্য অধিক ঘটিতে পায় না বটে; কিন্তু রাজনীতির প্রতি নিয়ত লক্ষ্য ও নিত্য পরিবর্ত্তন হেতু যে একটা ঘোর অশান্তি, তাহা বড় একটা অথবা আদৌ প্রজাবর্গকে ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ এরূপ রাজতন্ত্রে বাহ্য উন্নতি ও বাহ্য চাকচিক্যের সম্ভাবনা যতই কম থাকুক না কেন, প্রজারা নির্ব্বিরোধে যে শান্তিসুখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ অতুলনীয়। পরিবারের মধ্যে গৃহপতি যেমন সর্ব্বোপরি কর্ত্তা এবং পরিবারস্থ আর আর সকলের মধ্যে সম্বন্ধের ন্যূনেতর হেতু যেমন পর পর এক অপরের অধীন; হিন্দুরাজ্যও সেইরূপ একটি বিস্তীর্ণায়তন পরিবারবিশেষ এবং রাজা সেই বিশাল পরিবারের মধ্যে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতাশালী প্রবল গৃহপতিবিশেষ মাত্র। রাজা তাঁহার সমস্ত রাজ্যাধিকার নিজে চালাইতেন না; রাজ্যটি বিভিন্ন ও বহু ক্ষুদ্রাধিকারে বিভক্ত হইয়া, পুরপতি, শতগ্রামাধিপতি, দশগ্রামাধিপতি, গ্রামপতি, ইত্যাদি বহুতর বিভিন্ন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইত। কিন্তু ইহারাও আকারে ও ক্ষমতায়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গৃহপতি এবং অধিকারসীমা ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পারিবারিক অভিনয়ের অতিরিক্ত ছিল না। অতএব কোন এক পরিবার বিশেষ হইতে তাবৎ রাজ্যাংশ ও রাজ্য এবং রাজন্যপর্য্যায়ে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, কেবল এক পারিবারিক অভিনয়ই দৃষ্টিগোচর হইত; প্রভেদ যাহা কিছু তাহা রাজন্যপর্য্যায়ের উচ্চ নীচ শ্রেণী অনুসারে ক্ষুদ্রবৃহৎ আয়তনভেদ মাত্র। ইহাই হিন্দুর উপপাদিত রাজনীতি এবং উহাই বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুস্বাধীনতালোপের অব্যবহিত সময় পর্য্যন্ত

প্রায় একভাবে চলিয়া আসিয়াছিল;—কালপ্রভাবে পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা হেতু পরিবর্ত্তন তাহাতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, গণনায় তাহাকে অতি সামান্যই বলিতে হয়।

মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজা পার্শ্বস্থ রাজ্য সমুদয় পরাজয়পূর্ব্বক স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌম পদবী গ্রহণ না করিতেন, এমন নহে; কিন্তু তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজা বা রাজপরিবার স্বীয় অধিকারচ্যুত হইত অতি অল্পই। আগে তাঁহারা নিষ্কর স্বাধীন ভাবে কাটাইতেন, এখন পরাজয়ের পর হইতে সার্ব্বভৌম রাজাকে কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন, এইমাত্র যাহা কিছু তাঁহাদের অবস্থার প্রভেদ ঘটিত; নতুবা কি অধিকার, কি সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা, তাহা পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের তখনও সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিত। এরূপ স্থলে প্রজা যাহারা, তাহারা স্বীয় রাজার জয়পরাজয়ে, স্বীয় এবং স্বদেশের স্বাধীনতার বৃদ্ধি বা লোপ ইহার কিছুই অনুভব করিতে পাইত না; সুতরাং রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিলে, প্রজারা আপনা হইতে কখনই তাহাতে কিছুমাত্র উত্তেজিত বা আস্থাযুক্ত হইত না।

ফলতঃ রাজনীতি পাশ্চাত্য প্রকৃতির না হইলেও, প্রজা সকল কি গ্রীস কি আর সকল দেশ, সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। রাজ্যের নীতিদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা, রাজা ও রাজন্যবর্গ কেবল সেই নীতিই কার্য্যে খাটাইয়া রাজ্যচালনা করিতেন মাত্র। পুনশ্চ ব্রাহ্মণের সম্মান সর্ব্বত্র সমান বিধায়, একইবিধ নীতিবন্ধন প্রায় সকল রাজ্যে সমানভাবে প্রচলিত ছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগের যে নীতি এবং ধর্ম্মবল, সমাজের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া, লোক সকলকে নৈতিক ধর্ম্মভীরু এবং মনুষ্যত্বপূর্ণ করিয়াছিল; রাজা ও রাজন্যবর্গের মধ্যেও সেই নীতি এবং ধর্ম্মবল সমভাবে পরিচালিত হইয়া, তদ্রূপ সমান ফল প্রসব করিতে ত্রুটি করে নাই। বিশেষতঃ কোন রাজা দুর্ব্বৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মবলের কৌশলে, তাহাকে এরূপ শাসন করিতেন যে, অচিরাৎ তাহাকে আপন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া

যথাদিষ্ট নৈতিক পথে পরিবর্ত্তিত হইতে হইত। এই সকল কারণে, মোটের উপরে,হিন্দুরাজা ও তাহার প্রজাবর্গ উভয়ই নৈতিক, ধর্ম্মভীরু, ও মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং দেশ রামরাজ্যবৎ ছিল; পরিবারবৎ রাজত্বে রাজারা যথার্থতঃই আপনাদিগকে পিতৃস্থলীয় এবং প্রজাবর্গকে পুত্রস্থলীয় বলিয়া ভাবিতেন এবং আচার ও অনুষ্ঠানেও সেইরূপ চলিতেন। এজন্য রাজত্ব ও রাজনীতিকল্পে সুখে জীবনাতিবাহন সম্বন্ধে,প্রজাবর্গের কোনই অভাব পরিলক্ষিত হইত না বা কিছুই খেদের বিষয় থাকিত না। উপস্থিত রাজার স্বাধিকারচ্যুতিতে অন্য কোন রাজা রাজ্য গ্রহণ করিলে, সেও স্বজাতীয় এবং সেও সেই সমান এক নীতিতে রাজ্য চালাইত; সুতরাং রাজপরিবর্ত্তনেও প্রজাদিগের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধির বিষয় কিছুই ছিল না। এরূপ স্থলে,প্রজাবর্গের দৃশ্যতঃ কোনই অভাব না থাকা,রাজনীতি বিষয়ে তাহাদের আস্থাযুক্ত না হওয়া বা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না যাওয়ার পক্ষে অন্যতর কারণস্বরূপ। কাজে কাজেই ভারতীয়গণ ক্রমে রাজা ও রাজনীতি বিষয়ে এরূপ অসাড় এবং অনাস্থাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আজি পর্য্যন্ত তাহাদের বংশধরগণের চরিত্রে তাহার জাজ্বল্যমান প্রতিকৃতি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আবহমানকালব্যাপী ও বংশপরম্পরানুগত অনাস্থা, স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়া যাওয়ায়, এখনও, রাজনীতি বিষয়ে উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও, ভারতীয়গণ কিছুতেই উত্তেজিত হইতে চাহে না। ইংরেজরাজ্য ও ইংরেজরাজনীতি এখনও যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, ইংরেজরাজকে পিতৃমাতৃস্থলীয় জ্ঞানে উপাসনা করিতে উদ্যত হইয়া থাকে;—ফল তাহার ইংরেজপক্ষ হইতে ঘৃণা ও উপহাস বর্ষণ!

গ্রীকরাজনীতি শত শত লোকের দ্বারা শত মুখে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। অতএব ভারতীয় রাজনীতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক এবং সে আলোচনা একজন বিদেশীয়ের মুখ দিয়া হওয়াই ভাল, যেহেতু তাহা অধিক বিশ্বাসযোগ্য হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় রাজনীতি অল্প

ইতরবিশেষে আবহমানকাল একভাবেই চলিয়া আসিয়াছে; সুতরাং এখানে যে ছবি দেওয়া যাইতেছে, তাহা অল্প ইতরবিশেষে প্রায় সমস্ত হিন্দু সময়ের প্রতি বর্ত্তিতে পারে।

রাজা।—রাজা মদ্য বা অপর কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা উন্মত্ত হইতে পারিতেন না।[৪] দিবানিদ্রা নিষেধ। রাজার শরীর রক্ষার্থে স্ত্রী সেনানী নিযুক্ত থাকিত এবং ষড়যন্ত্র বিফল করিবার নিমিত্ত নিত্য রাত্রে শয্যাপরিবর্ত্তন করিতে হইত। রাজা নিজেও বিচারকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন। রাজগমনের সময় জনতা নিবারণের জন্য পথস্থ গম্যাংশের দুই ধারে দড়ি টাঙ্গাইয়া গণ্ডি দেওয়া হইত। রাজা পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের দ্বারা ঘোষণা হইতে থাকিত।[৫] রাজকার্য্য চালাইবার ও পরামর্শ দিবার নিমিত্ত নিয়মিত মন্ত্রিসংখ্যা নিযুক্ত থাকিত[৬]; তাহা ব্যতীত সম্বৎসর ধরিয়া সাধারণ রাজকার্য্য কিরূপ চলিবে, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত বৎসরের প্রথমেই দেশস্থ সমস্ত বিজ্ঞ জ্ঞানী এবং তত্ত্ববিদ্বর্গকে লইয়া এক মহাসভা বসান হইত।[৭]

রাজধানী ও পূর্ত্তকার্য্য।—পাটলিপুত্রের বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাজধানী পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত। পাটলিপুত্রের প্রাচীরে ৬৪ দরজা ও ৫৭০ প্রহরীমঞ্চ ছিল এবং প্রাচীরের গাত্র, ভিতর হইতে অস্ত্রচালনার জন্য, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ও ছিদ্রযুক্ত ছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরই হয় নদী নয় সমুদ্র তটে স্থাপিত এবং পাটলিপুত্রও গঙ্গার উপর স্থাপিত ছিল। নগর প্রায় সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত এবং অবশিষ্ট অংশ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।[৮]

সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষব্যাপী রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা রাজপথের এরূপ বর্ণনা আছে যে তাহা ভারতের পশ্চিম সীমা

৪। Kts. Frag. XXXII. ৫। Megasthenes Frag. XXVII.

৬ Arr. Ind XII. ৭। Megas. Fr. XXX III.

৮। Megas. Fr. XXV & XXVI.

হইতে শতদ্রুনদ পর্য্যন্ত, তথা হইতে যমুনা নদী, তথা হইতে গঙ্গানদী এবং পাটলিপুত্র এবং পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পথের প্রত্যেক ১০ ষ্টেডিয়া অন্তরে একটি করিয়া নিদর্শনীস্তম্ভ স্থাপিত ছিল, ঐ সকল স্তম্ভে পথের দূরত্ব এবং শাখাপথ সকলের দিঙ্‌নিরূপণ পরিজ্ঞাপিত হইত। রাজপথস্থ আড্ডা সকলের তালিকা রক্ষিত হইত। বিদেশীয় পথিকদিগের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত রাজ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত; পথে তাহাদিগকে পথদর্শক দেওয়া হইত, পীড়া হইলে তাহাদের যত্ন করা হইত এবং মরিলে, সম্পত্তি অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদের আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত।[৯]

রাজকার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত নিরূপিত বিবিধ অট্টালিকা, দেবমন্দির এবং বন্দর সকলের নির্ম্মাণ ও মেরামতের নিমিত্ত, সর্ব্বদা রাজকর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত থাকিত।[১০]

রাজকর।—ভূমিমাত্রই রাজার সম্পত্তি ছিল। যাহারা ঐ ভূমিতে কৃষিকার্য্য করিত, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ রাজকর দিতে হইত।[১১] রাজার পক্ষ হইতে চাষের নিমিত্ত জল বাঁধিয়া রাখা

৯। Megas. Frs. IV, XXXIV, LVI. রাজপথের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে হিয়াংসাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের দ্বিতীয় খণ্ডে কাণ্যকুব্জবর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত রাজপথেই প্রতি আড্ডায় যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ সহ চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিত। পথিক এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানীয় দরিদ্র যাহারা, তাহারা বিনা ব্যয়ে ও অতিযত্নের সহিত তথায় চিকিৎসিত হইত। ইহা ব্যতীত পান্থনিবাসে পথিকদিগের অন্নপানাদি পাইবার সুবিধা ছিল। স্থানান্তরে পুনর্লিখিত আছে যে, রাজপথের দুই ধারে ছায়া-দায়ক বৃক্ষাদি রোপিত থাকিত।

গ্রীক এক ষ্টেডিয়ায় ইংরেজী মাপের ৬০৬৸০ ফুট হয়, সুতরাং প্রায় ৮৷৷০ ষ্টেডিয়ায় এক মাইল।

১০। Megas. XXXIV.

১১। হিয়াংসাং তাঁহার ভারতীয় বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, ষষ্ঠাংশমাত্র রাজকর আদায় হইত। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়েও, এই ষষ্ঠাংশমাত্র কর নির্দ্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়।

হইত এবং তত্ত্বাবধারকের অধীনে আবশ্যকমত চাষাকে জলপ্রদান করা হইত। চাষারা শস্যের দ্বারা এবং পশুপালকেরা পশুর দ্বারা রাজকর প্রদান করিত।[১২] মুদ্রা সম্বন্ধে দেখা যায় যে স্বর্ণাদিমুদ্রা এবং পিত্তলের মুদ্রাও ব্যবহৃত হইত।[১৩] কেহ একাধিক ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, তাহাকে ডবল ট্যাক্স দিতে হইত।[১৪] কিন্তু যাহারা যুদ্ধার্থে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিত, যাহারা তোপ নির্ম্মাণ করিত এবং যাহারা নদীগর্ভে নৌকাচালনা করিত, তাহারা সর্ব্ববিধ কর হইতে নিষ্কৃতি পাইত।[১৫] বিশিষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য সকল, আগে ঘোষণা প্রদান করিয়া, তবে বিক্রয় করিতে হইত। পুরাতন দ্রব্য আলাহিদা এবং নূতন দ্রব্য আলাহিদা করিয়া বিক্রয় করিতে হইত; যেহেতু নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বিক্রয়স্থলে একত্র হইতে ও মিলিতে দেওয়া নিষেধ ছিল।[১৬]

আইন-আদালত।—গ্রামপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দশপতি, শতপতি প্রভৃতি সকলেরই হস্তে পর পর উচ্চ বিচারক্ষমতা বিন্যস্ত ছিল। সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা কেবল এক রাজা ও তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারের হাতে ন্যস্ত ছিল। নগর সকলে, এখনকার সিটী মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট এবং মিগাস্থিনিস কর্ত্তৃক ওবারসিয়ার নামে উক্ত নাগরিক পুলিশাধিপতি ছিল।[১৭] মিগাস্থিনিস্ সর্ব্বত্রই প্রশংসা করিয়াছেন যে, এরূপ সুশাসিত দেশ অতি কম দেখা যায়; সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত, চুরী ডাকাতি নিতান্ত বিরল এবং লোক সকল ঘরের দুয়ার খুলিয়া রাখিয়া দিলেও কোন দ্রব্য অপহৃত হয় না! এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রস্তাবে মিগাস্থিনিস্ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে,লোকের পরস্পর পরস্পরের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেহ কাহারও নিকট

১২। Megas. Frs. XXXII & XXXIV and Arr : Ind.

১৩। Peri. 6 and 63.

১৪। Megas XXXIV.

১৫। Arr. Ind XII.

১৬। Megas XXXIV.

১৭। Megas. XXXIII and XXXIV.

কোন বিষয় গচ্ছিত করিতে হইলে,তাহা ধর্ম্মসাক্ষ্য দ্বারা নিষ্পন্ন করিত, অথচ কখনও তাহাদের বিশ্বাসভঙ্গ হইত না। চুক্তিভঙ্গের মোকর্দ্দমা আদালতে কদাচিৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। মিগাস্থিনিস্ আড়ম্বরশূন্য আইন ও আদালতের প্রশংসা করিয়াছেন।[১৮] জন্মমৃত্যু রেজিষ্টরী করারও উল্লেখ দেখা যায়।[১৯] মিগাস্থিনিসের গ্রন্থে লেখা আছে বটে যে, সুদ লইয়া ধার লওয়া বা দেওয়ার রীতি নাই এবং সেরূপ ঋণ আদায়ের জন্য আদালত হইতে কোনই সাহায্য দেওয়া হইত না; কিন্তু এ কথা ত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না।[২০] কেহ কাহারও যামিন হওয়া বা কাহারও সঙ্গে কোন চুক্তি করা, পরস্পর পরস্পরের উপর বিশ্বাসের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত এবং লোক সকলও এরূপভাবে চলিত যে, কেহ কাহাকে কষ্ট না দেয় এবং নিজেও কোন ব্যক্তি হইতে কষ্ট না পায়।[২১]

কতকগুলি শাস্তির উল্লেখ করিয়া মিগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, সাক্ষ্যদাতার কোন এক অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইত। কেহ কাহারও কোন বিশেষ অঙ্গ নষ্ট করিলে, তাহার সেই অঙ্গ নষ্ট করা হইত। কেহ শিল্পকারের হাত কাটিয়া দিলে, তাহার বধদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিত। বিশেষ বিশেষ অপরাধে মাথা মুড়াইয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইত।[২২]

১৮। Megas. Fr. XXVII. ১৯। Megas. XXXIV.

২০। Megas. XXVII B and C. এই অংশ ঠিক মিগাস্থিনিসের কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। যেহেতু হিন্দুব্যবহারগ্রন্থে যখন সুদ লওয়ার বিধিনিষেধ যথেষ্ট দেখা যায়, তখন সুদ সমেত ঋণ আদায়ের সাহায্য যে আদালত হইতে দেওয়া হইত না, ইহা বড় বিশ্বাসযোগ্য নহে।

২১। Megas. XXVII B.

২২। Megas XXVII and XX VII D. হিয়াংসাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের সাধারণ বর্ণনাপ্রদানস্থলে লিখিয়াছেন যে, শারীরিক দণ্ড প্রায়ই ছিল না; সাধারণ অপরাধে অর্থদণ্ডই প্রচুর ছিল। অতি গুরুতর অপরাধে কেবল কারাবাস, শারীরিক দণ্ড বা নির্ব্বাসন আদিষ্ট হইত।

যুদ্ধবিদ্যা।—যুদ্ধার্থে রাজসৈন্য চতুর্ব্বিধ, হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি। সৈনিকদিগের প্রয়োজন সঙ্কুলান উদ্দেশে হউক আর যে কারণেই হউক, রাজ্যের যাবতীয় হস্তী ও অশ্ব আইন মত রাজার অধিকারাধীন[২৩]; সুতরাং অপরে উহা ব্যবহার করিলে, রাজ-অনুমতি অনুসারে করিতে হইত, তবে কি না তজ্জন্য কোন প্রকার কর লাগিত না। নৌ-সেনা, নৌ-সেনাধিপতি (ইংরাজী নামে যাহাকে আদমিরাল বলে), এবং রণতরী সমূহেরও উল্লেখ দেখা যায়।[২৪] সৈন্যগণ যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ব্যতীত, অপর সময় প্রাপ্য বেতনে যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত। ক্ষত্রিয় ভিন্ন বৈশ্য বা শূদ্র, ইহাদের মধ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহ হইত না। যুদ্ধসজ্জার বর্ণনায় দেখা যায় যে, হস্তীর শরীর অস্ত্রনিবারক আবরণে আবরিত থাকিত এবং দন্তদ্বয়ে শাণিত অস্ত্র সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। রথী রথের উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করিত এবং তাহার একটু নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া দুইজন সারথীতে রথচালনা করিত; রথ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে সংলগ্ন চারিটি অশ্বের দ্বারা বাহিত হইত।[২৫] অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে খড়্গ, ধনু, বল্লম, কুঠার প্রভৃতি। খড়্গ সকল এ দেশে এতই উত্তম নির্ম্মিত হইত যে, ইউরোপভূমে তাহার ভূয়সী প্রশংসা বশতঃ তথায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত।[২৬] একরূপ জলজ কীট হইতে অতিশয় অগ্ন্যুদ্দীপক তৈল পাওয়া যাইত এবং তাহা হইতে যুদ্ধার্থে আগ্নেয়াস্ত্র সকল প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত।[২৭] ঋষির শাসনে ভারতীয়েরা মনুষ্যত্বপথে এতই উন্নত হইয়াছিলেন যে, শত্রুরাজ ও মিত্ররাজ উভয়ে যখন যুদ্ধ চলিতেছে, তখনও চাষা তাহার ক্ষেত্রের কার্য্য এবং ব্যবসায়দার তাহার ব্যবসায়ের কার্য্য, যে যেখানকার সে সেখানে নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারিত; এমন কি তাহাদের কার্য্য যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটস্থ হইলেও, কোন পক্ষের কেহ তাহাদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করিত না।[২৮] ফলতঃ যুদ্ধ

২৩। Megas. XXXVI. and XXXIV. ২৪। Megas. XXXVI and Arr. Ind XII.

২৫। Megas XXXIII and XXXV and Arr. Ind XI and XII.

২৬। Pliny XXXIV 41. ২৭। Kts. Fr. XXVI. ২৮। Megas XXXIII.

জন্য সাধারণ প্রজাবর্গকে, লুটপাট বা কোন প্রকার অত্যাচারের ভয়ে, কিছুমাত্র আশঙ্কিত হইতে হইত না। যুদ্ধস্থলেও, ভারতীয়দের খল-কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতা বা গুপ্ত আক্রমণাদি প্রায় ছিল না। যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে যে নিয়ম স্থাপিত হইত, তদনুসারে ধর্ম্মযুদ্ধ চলিত। যুদ্ধস্থলেও ভারতীয়দের এতাদৃক্ সরলতা, সত্যপ্রিয়তা এবং ধার্ম্মিকতা! কিন্তু হায়! দগ্ধবিধির বিড়ম্বনায় সেই সরলতা প্রভৃতির জন্যই ; নীতিশূন্য, পশুবলদৃপ্ত যখন যে পাশ্চাত্য ডাকাইত ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তখনই ভারতীয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

কি যুদ্ধকার্য্য, কি অপর কোন প্রকার রাজার কার্য্যের নিমিত্ত, ব্যাগার ধরার রীতি ছিল না। কাজ পড়িলে লোককে কাজ করিতে বাধ্য হইতে হইত বটে, কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত মজুরী তখনই দেওয়া হইত। যুদ্ধদ্রব্যাদি বহনের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক গরুর গাড়ী সর্ব্বদা রাজসরকারে নিযুক্ত থাকিত।[২৯] মিগাস্থিনিসের সময়ে, ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা মগধেশ্বর। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—৬০০০০০ পদাতি, ৩০০০০ অশ্বারোহী ও রথী, এবং ৯০০০ হস্তী।[৩০]

শিক্ষাপ্রণালী।—প্রায় ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন চীন পরিব্রাজক হিয়াংসাং ভারতভ্রমণে আইসেন, তখন কাণ্যকুব্জেশ্বর শীলাদিত্য উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন। শীলাদিত্যের বিবরণে হিয়াংসাং লিখিয়াছেন যে, শীলাদিত্যের যাহা কিছু রাজস্ব আদায় হইত, তাহার এক-চতুর্থাংশ ধর্ম্মকার্য্য, দান ও শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত ব্যয়িত হইত। এখনকার ন্যায় বেতনগ্রাহী স্কুলকলেজ তখন ছিল না। ধনী বা রাজসরকার হইতে অধ্যাপকেরা সাহায্য পাইতেন এবং সেই সাহায্যবলে

২৯। Megar XXXIV.

৩০। Megas. XXXIV. মিগাস্থিনিস্ আরও অনেকানেক রাজার সৈন্যসংখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহারা অধুনাতন টোলের ন্যায় ছাত্রগণকে আহারীয়, থাকিবার স্থান ও বিদ্যা দান করিতেন। তদ্ভিন্ন রাজসাহায্যে অনেক মঠ স্থাপিত ছিল এবং সেই সকল মঠেও ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে থাকিতে ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পাইত। এইরূপ মঠ সকলের মধ্যে, মগধরাজ্যস্থ নালন্দার মঠ হিয়াংসাঙের দ্বারা প্রধান বলিয়া উক্ত এবং উহা বিদ্যাবিষয়ে অতি বিখ্যাত বলিয়া কথিত। এই মঠ রাজদত্ত একশত গ্রামের কর দ্বারা প্রতিপালিত হইত এবং তথায় পাঁচ শত অধ্যাপক ও দশ সহস্র ছাত্র প্রতিনিয়ত থাকিতে খাইতে ও প্রতিপালিত হইতে পাইত। হিয়াংসাং যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, অদ্যাপিও বর্ত্তমান টোলপ্রথা এবং মঠ সকলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সম্ভবতঃ হিয়াংসাঙের বর্ণিত প্রথা হিয়াংসাঙের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল।

মিগাস্থিনিসের বর্ণনাতেও অনুমিত হয় যে, বিদ্যা বিনা ব্যয়ে বিতরিত হইত; কারণ যাঁহারা বিদ্যা বিতরণ করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই সকলে সকল অভাবকে অতিক্রমপূর্ব্বক নগরসন্নিহিত বনে বাস করিতেন। তাঁহারা পর্ণকুটীরে পত্রশয্যায় শয়ন করিতেন, সংসারবিরহিত এবং ভিক্ষান্নভোজী ছিলেন; সর্ব্বদা তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং যে কেহ শিক্ষাপ্রার্থী হইত, তাহাকে শিক্ষা দান করিতেন। ব্রাহ্মণসন্তানেরা জন্মের পর হইতেই সাবধানে রক্ষিত ও নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইত। তাঁহারা সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে শিক্ষালাভ করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তৎকালে উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে, মিগাস্থিনিসের বর্ণনায় অনুমিত হয় যে, বেদান্ত বিদ্যারই প্রাধান্য ছিল এবং এই বিদ্যা অনুপযুক্ত স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া নিষেধ ছিল।[৩১] সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে মুনিদিগের যেরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, মিগাস্থিনিসের বিবরণে সেরূপ মুনিবৃত্তির যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়। পুনশ্চ, মিগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, যে যে বিদ্যা ও যে যে বিষয়ের চর্চ্চা গ্রীকভূমে হইত, প্রায় তৎসমস্তেরই প্রতিচ্ছায়া ভারতে দেখিতে পাওয়া

৩১। Megas XLI.

যায়।[৩২] ফলতঃ নানাবিধ বিদ্যার যে সে সময়ে অনুশীলন হইত; তাহা এতদ্দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

আর অধিক বিস্তারের স্থান এখানে নাই। এইত সেই প্রাচীনকালীয় হিন্দুরাজ্যের অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র এবং তাহারও অধিকাংশভাগ আবার বিদেশীয় গ্রীকের মুখ হইতে! তথাপি জিজ্ঞাসা করি, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে?

"যদুপতে! ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতে! ক গতোত্তরকোশলা"!!! সেই আর এই!!

৩। ব্যবহারশাস্ত্র।

এক্ষণে ব্যবহারশাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ব্যবহারশাস্ত্র, প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, স্বভাবে এবং প্রয়োগে, প্রায় সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক এবং লৌকিক। লোকযাত্রা নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রিত করা উহার উদ্দিষ্ট বিষয়; সুতরাং উহা দৈব এবং নৈতিক নিয়মের কোনরূপে বিরুদ্ধবাদী হইয়া সামঞ্জস্যচ্যুত হইতে না পায় কেবল এই পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া, দেশকালানুরূপ যথাসম্ভব লোকযাত্রা বিধায়করূপে উহার অবধারণা করিলেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। ব্যবহারনীতি ধর্ম্মনীতির ফলস্বরূপ, স্বয়ং ধর্ম্মনীতি নহে। অতএব ব্যবহারনীতি, পারলৌকিক গূঢ়ভাবসমাহিত ধর্ম্মনীতির পদবীতে কখনও উঠিবে না; অথচ ব্যবহারনীতি ব্যবহারনীতিই থাকিয়া, ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া বিকৃত হইতে পাইবে না; ইহা হইলে, সেই ব্যবহারনীতি, ধর্ম্মনীতির সহ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইবাতে, পূর্ণ সংসারহিতকর আকার ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দু এবং গ্রীকদিগের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারশাস্ত্র আলোচনা করিলে. সেই সামঞ্জস্যের বড়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্ব স্ব বিভিন্নগুণময় চিত্ত ও প্রকৃতি অনুসারে, একের হাতে যেমন উহা ধর্ম্মনীতির পদবীতে

৩২। Megas. XLI

উত্থিত এবং তাহার খাতিরে, প্রকৃত লৌকিক স্বার্থ যাহা, তাহা কখন কখন উপেক্ষিত; তেমনি অপরের হাতে উহা ব্যবহারনীতির অতিব্যবহার নীতিত্বে আনীত এবং তজ্জন্য ধর্ম্মনীতিও কখন কখন উপেক্ষিত, ইহাই দেখিতে পাইয়া থাকি। উভয়েতেই, সন্তনপর ও সাময়িক লোকাচারকে অতিক্রম করিয়া, বিধান প্রদানের ঘটায় কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই; এজন্য উভয় স্থানেই,ব্যবহারশাস্ত্রের কোন কোন অংশ লোকসাধ্যের সাধনাতীত হেতু, অননুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি জন্য—কোথায়—কি কি বিষয়ে সেই সকল অতিনীতি, যাহা অননুষ্ঠিত? এখানেও স্ব স্ব জাতীয় স্বভাব আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। হিন্দুদিগের ব্যবহারনীতিতে, ধর্ম্মনীতির প্রতি আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃষ্টিহেতু, নৈতিক জটিলতা দীনতা এবং চারিত্র সঙ্কোচ; আর গ্রীকদিগের মধ্যে লোকনীতির প্রতি আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃষ্টিহেতু, নীতিতে অতি ঋজুতা, আচারে ক্রূরতা এবং চরিত্রে স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্যবহারগুণে, হিন্দু যেখানে জীবনগতিতে প্রতিপদ বিধিনিষেধনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পদক্ষেপে সঙ্কুচিত; গ্রীক সেখানে ব্যবহার-উদারতায় স্বেচ্ছাসুখে প্রধাবিত। অভীষ্টপথে হিন্দু যেখানে দীনতাময়, কারুণ্যপূর্ণ এবং পাপোৎপত্তিভয়ে কুণ্ঠিত; গ্রীক সেখানে পাপপুণ্যজ্ঞানশূন্য কর্কশভাব ও ক্রূর কর্ম্মে উল্লাসিত। এমন কি, হিন্দুর অশন বসন আহার বিহার পর্য্যন্ত বিধিনিষেধের বিষয়ীভূত; কিন্তু গ্রীক ব্যবহার সেই সেই স্থলে মানুষকে যথেষ্টই স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে।

অতঃপর স্ব স্ব জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে, কাহার ব্যবহার কোন পথে ধাবিত হইয়া কিরূপ ও কতটা বাড়াবাড়ী করিয়া তুলিয়াছে তাহা, ভারতীয় প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র এবং সমপ্রাচীনতাযুক্ত স্পার্টাদেশীয় লাইকর্গসপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্র, এতদুভয়ের তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। লাইকর্গসের ব্যবহারশাস্ত্রের ব্যবস্থা, কিরূপে সমাজের লৌকিক সচ্ছন্দতা সাধিত হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ব্যবহারদাতার তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্যের আধিক্য হেতু, তাঁহার

নিরূপিত লৌকিক সচ্ছন্দতা ও তাহার প্রকরণ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে।

লাইকর্গসের চিত্তে যাহা লৌকিক সচ্ছন্দতা বলিয়া ধারণা, তাহা বড় সহজ পদার্থ নহে;—উহা একমাত্র সাংসারিক ও জাতীয় স্বাধীনতা সাধক দৈহিক বলদৃপ্ত ভাব। লাইকর্গসের উদ্দেশ্য, মানুষকে মনুষ্যত্বযুক্ত এবং সমাজকে লোকতা ও মৌলিকতায় পূর্ণ করণ, এ সকল নহে; মানবকে ক্ষিপ্ত-সৈনিক এবং সমাজকে বলমদ-উন্মাদিত সেনানিবেশে পরিণত করণ, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ; ইহাই তাঁহার নয়নে সামাজিক মঙ্গল বলিয়া প্রণোদিত হইত। এই সামাজিক মঙ্গলের জন্য, পারিবারিক স্নেহের দমন; অসুখকর, অখাদ্য, ও অরুচিকর খাদ্য ভোজন; ইচ্ছার অনভিপ্রায়ে ও মানবীয় প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে, বহুতর ও বহুসংখ্যক লোকের এক আখড়া ও এক গৃহে বাস; চৌর্য্যাদি অপকর্ম্মের সৎকর্ম্মভাবে পরিণতি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধানিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এই সমাজ-সচ্ছন্দতার খাতিরে, যে কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে যদি তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও অবিকৃতমুখে স্বীকার্য্য! লাইকর্গসের সকল বিধিরই অভিপ্রায়, সেই একমাত্র স্থির উদ্দেশ্যসাধন; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সামাজিক মঙ্গল সুপ্রকৃতিস্থ হইলে, ধর্ম্ম ও নীতির কখনও বিরুদ্ধাচারী হয় না; কিন্তু লাইকর্গসের সামাজিক মঙ্গলে সে বিরোধিতা যথেষ্ট, সুতরাং তাহা যে সুপ্রকৃতিস্থ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে হিন্দুদিগের ব্যবহারগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ঠিক উহার বিপরীত দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মবোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, পবিত্রতা ও ধার্ম্মিকতা যাহাতে সঞ্চয় হইতে পারে এবং ধর্ম্মবোধের পক্ষে যাহা ভুলেও কখন বিরোধী হইবার নহে; হিন্দুব্যবহারগ্রন্থসমূহে তাহার সংসাধন পক্ষেই অধিকাংশ বিধি প্রদানিত হইয়াছে। তজ্জন্য যদি লৌকিক হিত ও বাহ্যসম্পৎ বলি দিতে হয়, তাহাতেও ত্রুটি হয় নাই। বাহ্যসম্পৎ সমস্তই যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই;

কিন্তু যাহাতে পরলোকে সচ্ছন্দতা লাভ হইতে পারে, এরূপ পবিত্রতা সাধনে যেন ক্রটি না হয়। লাইকর্গস বাহ্যসম্পদের অনুরোধে, অসম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ শিশুহত্যায় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই; বা তাঁহার মনে তজ্জন্য, এমন কি, একটু বিষাদও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মানুষ দূরে থাকুক, কোন একটি ইতরজাতীয় প্রাণীর প্রাণবধজনিত নিমিত্তের ভাগী হইলে, তখনই কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহাকে পরলোকের পথপরিষ্কারক মন ও অঙ্গপবিত্রতা সাধন করিতে হইত। অথবা, গ্রীকমণ্ডলে যে, কাণাখোঁড়াকে শৈশবেই নিপাত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বিকারচিত্তে বিধি সকল প্রদত্ত ও পালিত হইয়াছে; হিন্দুর নিকট সেই কাণাখোঁড়াকে, এমন কি, কাণাখোঁড়া ডাকের দ্বারা মনে ক্লেশ প্রদান করিলেও, প্রায়শ্চিত্তযোগ্য মহাপাপের সঞ্চার হয়। এরূপ পাপোৎপত্তির বিরুদ্ধে, মনুসংহিতা ও অন্যান্য গ্রন্থে, একাধিক বিধিনিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে! এতদপেক্ষা বিভিন্নজাতীয় ব্যবহারশাস্ত্রদ্বয়ের প্রকৃতিবিভিন্নতা সম্বন্ধে সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

যথায় বিষয়টি তাহার সমগ্রত ধরিয়া আলোচ্য, তথায় অংশ-বিশেষের উদ্ধারপূর্ব্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিতে যাওয়া, বিশেষ সুবিবেচনার কার্য্য নহে। ইহাতে দ্বিবিধ জ্ঞানভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে জ্ঞান আমূলতঃ দর্শনের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত; তাহা অংশবিশেষের দ্বারা প্রদর্শিত হইবাতে, সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা। দ্বিতীয়তঃ, অংশবিশেষের উদ্ধারে, সমগ্রের গুণাগুণ পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করা সম্ভবপর নহে; এজন্য তাহা করিলে সমগ্রের প্রতি একরূপ অন্যায়াচরণ করা হয় বলিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আর একটি কথা, পাঠক মূর্খ হইলে, ওরূপ উদ্ধারে লেখককে কখন কখন একদেশদর্শী ও প্রতারকের নাম ও কলঙ্কও বহন করিতে হয়। যাহা হউক, তথাপি বাঞ্ছারাম বাবুর প্রীত্যর্থে, ব্যবহারশাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

নিম্নোদ্ধৃত লাইকর্গসকৃত বিধি সকলের তাৎপর্য্য, বিভিন্ন গ্রীক গ্রন্থ এবং প্লুটার্ক কৃত লাইকর্গসের জীবনী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

১। দেশমধ্যে অক্ষরপরিচয়াদির অতীত, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি অধীত হইতে পারিবে না; যেহেতু তাহা, লোকহিতে চিত্তনিবেশন এবং সাহস ও সামরিক প্রস্তুতির পক্ষে, প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে।

২। সন্তান বিকলাঙ্গ হইলে, তাহা পর্ব্বতগুহায় পরিত্যক্ত হইবে; যেহেতু যে সন্তান দুর্ব্বল, সে সমাজের উপর অকর্ম্মা ভারস্বরূপ হইবার কথা।

৩। সন্তান সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে পিতামাতার নিকট হইতে অন্তর করিয়া, সাধারণ বালকাগারে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত করিতে হইবে। নতুবা পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালনে স্বভাব-কোমলতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৪। সন্তান বয়ঃস্থ হইলে, দীয়ানাদেবীর উৎসবকালে, শারীরিক সামর্থ্যপরীক্ষার্থে তাহাকে অপরিমিত কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে।

৫। পুরুষ ত্রিংশ বর্ষ এবং স্ত্রীলোক বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পাইবে না।

৬। পুরুষ বিবাহের পরও ষাইট বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, সামাজিক হিতার্থে ও তৎসাধনের বশ্যতা হেতু, অবিচ্ছিন্নভাবে আপন স্ত্রী সহ সহবাস করিতে পারিবে না; যে কিছু সহবাস তাহা চুরি করিয়া করিবে, যেন অন্য কেহ তাহা জানিতে না পারে।[৩৩]

৭। স্ত্রীগণকে বিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অবিকল পুরুষের ন্যায়, স্পার্টার পুরুষোচিত কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে[৩৪] এবং

৩৩। পুরুষেরা ইচ্ছামত আথ্ড়া ছাড়িয়া গৃহে যাইতে ও স্ত্রীসহবাস করিতে না পারায়, তাহাদের কামিনীগণ পুরুষের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে আথ্ড়ায় আসিয়া স্বামি-সহবাস করিয়া যাইত।

৩৪। এই শিক্ষা ও শিক্ষাকালীন বেশভূষা সম্বন্ধে, গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা ইংরেজ গ্রোট এরূপ লিখিয়াছে;—"The Spartan damsels underwent *

তাহার পরে তাহারা বিবাহ করিতে পাইবে। বীরপ্রসবিনী ও বীরসঙ্গিনী হইবার নিমিত্ত,স্ত্রীজনোচিত কোমলতা পরিত্যাগ করাইবার জন্য এবম্বিধ শিক্ষার আবশ্যকতা।

৮। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে আসিলে, স্থান পাইবে না; যেহেতু তাহার আচারব্যবহার বিধর্ম্মী হইলে, সংস্রব হেতু অতিথি-সৎকারকের আচারব্যবহার কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা।

৯। মদ্যপায়ী এবং কুব্যবহারকারীর উপর সমাজস্থ যুবক-দিগের ঘৃণা উৎপাদন করাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে, হিলটদিগকে মদ্যপানে উন্মত্ত করাইয়া সেই উন্মত্তভাবের প্রতীকার স্বরূপ তাহা-দিগের উপর ক্রূরাচরণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।[৩৫]

১০। সন্তান বিকলাঙ্গ হেতু পরিত্যক্ত অথবা সামর্থ্যপরীক্ষায় বা রণে হত হইলে, তজ্জন্য পিতা মাতার চক্ষুজল মোচন লোকসমাজে নিন্দনীয় ও অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

---

bodily training analogous to that of the Spartan youth—being formally exercised, and contending with each other in running, wrestling and boxing agreeably to the forms of the Greecian agones. They seem to have worn a tight tunic, cut open at the skirts, so as to leave the limbs both free and exposed to view—hence Plutarch speaks of them as completely uncovered, while other critics in different quarters of Greece heaped similar reproach upon the practice, as if it had been perfect nakedness."

৩৫। লাইকর্গসের আদত বিধানমালা কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল প্লুটার্ক ও পরবর্ত্তী ইতিহাসবিৎদিগের দ্বারা যাহা কিছু লাইকর্গসের বলিয়া উক্ত হইয়াছে, একমাত্র তাহাই ঐতিহাসিকদিগের সম্বল। অতএব কোন্ নীতি ঠিক লাইকর্গসের এবং কোনটি বা তাহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত অথবা কোনটি প্রবাদমূলক, তাহা নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই। এই ৯ম সংখ্যক নীতি প্রকৃত লাইকর্গস কর্ত্তৃক প্রকাশ্যরূপে প্রচারিত হইয়াছিল কি না, তৎপক্ষে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। হইতে পারে উহা লাইকর্গসের নয়, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, ঐরূপ নীতি স্পার্টায় প্রচলিত ছিল। আমাদেরও ইহা হইলেই যথেষ্ট, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য লাইকর্গসের অনুসন্ধান লওয়া নহে, অনুসন্ধান লওয়া গ্রীক চরিত্রের।

এ সকল কিসের জন্য? সামাজিক স্বাধীনতা এবং সাংসারিক বুদ্ধিতে যাহা সৌভাগ্য ও সম্পৎ বলিয়া ধারণা, তাহা যাহাতে অটুট থাকে, তাহারই উপায় সংসাধন জন্য। এখন দেখ, ব্যবহারনীতির নিকট ধর্ম্মনীতি এবং অধিক কথা কি, যে মনুষ্যত্বের জন্য ব্যবহারনীতির আবশ্যক, সেই মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত, কিরূপ নৃশংসভাবে বলি প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাদাতার ব্যবস্থামালায়, আমরা যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বলি, তাহার সঙ্গে কোন কারবারই নাই; তবে হইতে পারে তাহার নিজের বিকৃত ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে এ সকল সামঞ্জস্যযুক্ত ছিল। কথিত আছে, এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, লাইকর্গস ডেলফিনগরস্থ আপলো দেবের সম্মতি গ্রহণ করেন। গ্রীকের দেবতারাও চতুর সংসারবিৎ, যখন যেরূপ ভক্ত দেখিতেন, তখন সেইরূপ অনুমোদন বা অননুমোদন করিতেন। এই ডেল্‌ফির দেবমন্দিরে আলেক্‌জাণ্ডারের এক টিপনে, কুদিন ঘুচাইয়া আলেক্‌জাণ্ডারের ইচ্ছামত সুদিন কৃত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ভাবিয়াছিলাম, ভারতীয় নীতির সঙ্গে উদ্ধৃত গ্রীকনীতির দুই একটা তুলনা করিয়া দেখান যাইবে যে, পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। কিন্তু ভারতীয় নীতিসমূহের মধ্যে এমন একটিও খুঁজিয়া পাই না, যাহা উহার কোন না কোনটির সহ সমজাতীয়ত্বহেতু তদ্রূপ তুলনায় আসিতে পারে।

গ্রীকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র তাহা, যাহা মিনো কর্তৃক ক্রীটদেশে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা কিরূপ, তদর্থে অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, লাইকর্গসপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্র উহাকেই অবলম্বন এবং ভিত্তি স্বরূপ করিয়া নির্ম্মিত। গ্রীকদিগের মধ্যে আর এক জন মাননায় ব্যবহারবিৎ ছিলেন, উহাঁর নাম সোলন। সোলনের বিধির প্রধান সুখ্যাতি এই যে, উহাতে মিনো এবং লাইকর্গসের ন্যায় মনুষ্যত্বকে একেবারে বলি দেওয়া হয় নাই; একটু মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষুলজ্জা ছিল এবং কথিত দুইটির ন্যায় ধর্ম্মনীতিতেও একেবারে দৃষ্টিশূন্য ছিল না। মোটের

উপর ধরিতে গেলে, তাৎকালিক গ্রীকসমাজের পক্ষে, সোলনের বিধিকে বহুলাংশে লোকহিতকর বলা যাইতে পারে।

সোলনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম বিধি অধমর্ণের স্বপক্ষে। পূর্ব্বে আথিনীয়গণকে ধার করিতে হইলে, পুত্র, কন্যা, গৃহিণী এবং আপনাকে পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া ধার করিতে হইত। নিয়মিত সময়ের মধ্যে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, উত্তমর্ণ যদি ইচ্ছা করিত, তবে ঐ ঋণী ব্যক্তির পুত্র কন্যা স্ত্রী বা তাহাকে, অথবা সর্ব্বমত সকলকেই, দাসরূপে চাই নিজে রাখিতে, চাই অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারিত। উত্তমর্ণ ইচ্ছা করিলে অধমর্ণকে কয়েদ করিতে ও বেগার খাটাইয়াও লইতে পারিত। সোলন ইহা রহিত করিয়া এই নিয়ম করেন যে, অধমর্ণকে কয়েদ করা, তাহাকে বা তাহার কোন পরিজনকে দাসত্বে বিক্রয় করা, অথবা তাহার ভূসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা, উত্তমর্ণ এ সকল কিছুই করিতে পারিবে না; ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, কেবল তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে উত্তমর্ণের অধিকার থাকিবে। এই বিধিপ্রদানের দ্বারা সোলন অত্যাচারী সম্ভ্রান্ত সমাজের নিকট নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; এই সম্ভ্রান্তবংশ অত্যাচার এবং লোকপীড়নে এদেশীয় জমিদারের অনুরূপ ছিল। যাহা হউক, সোলন নিজে এই বিধানের ফলে আপন পাওনা ঋণের প্রাপ্তি পক্ষে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, তাঁহার নিস্বার্থভাব প্রমাণ হইবাতে ও সাধারণ লোক সকল তাঁহার পৃষ্ঠপোষক থাকাতে, কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভারতে অধমর্ণের প্রতি, গ্রীসের প্রাচীনকালীয় কঠোরতা কখনই প্রচলিত ছিল না। অধমর্ণের নিকট ঋণ আদায় সম্বন্ধে, উত্তমর্ণের হস্তে মনু কেবল এইমাত্র ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, উত্তমর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য অধমর্ণকে বলাৎকার অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, আপনার গৃহে আনাইয়া তাড়নাদি করিতে পারিবে। তাহাতেও যদি আদায় না হয়, তখন রাজদ্বারে অভিযোগ দ্বারা আদায় করিতে হইবে। ভারতে

স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধক দেওয়ার বিষয় কেহ কখন অবগত ছিল না এবং ইহা যে সম্ভবপর তাহাও স্বপ্নে কেহ কখন ভাবে নাই। তবে দ্রব্যাদি বন্ধক দেওয়ার রীতি এখন যেমন আছে, তখনও তেমনি ছিল। কিন্তু বন্ধকী দ্রব্য উত্তমর্ণ গচ্ছিত ধনের ন্যায় না রাখিয়া যদি কোন রূপে ব্যবহার করে, তবে তৎসম্বন্ধে মনু এরূপ শাসন করিতেছেন যে, তেমন স্থলে উত্তমর্ণকে ঋণের বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ব্যবহারের দ্বারা বস্তুর যে মূল্য কমিয়া গিয়াছে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে; যদি সেরূপ পূরণ না করা হয়, তবে উত্তমর্ণ চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে।[৩৬]

সোলনের দ্বিতীয় প্রধান বিধি দায় সম্বন্ধে। সোলনের পূর্ব্বে আথিনীয়দিগের মধ্যে দায় সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না; পিতৃসম্পত্তি সন্তান থাকিলে পাইত, নতুবা তদভাবে প্রায়ই তাহা জাতীয় কোষভুক্ত হইত। সোলন তাহা নিবারণ করিয়া নিয়ম করেন যে,

১ম। সন্তানাদি না থাকিলে, মৃত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইতে পারিবে।

২য়। সন্তান থাকিলে, পুত্র বিষয়াধিকারী হইবে বটে কিন্তু তাহাকে অবিবাহিত ভগ্নীদিগের বিবাহের ভার লইতে হইবে; তদনন্তর সম্পত্তি বংশপরম্পরা চলিয়া আসিবে।

৩য়। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে ও যদি সে উইল না করিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে উত্তরাধিকার এরূপে বর্ত্তিবে;—প্রথমে মৃত ব্যক্তির পিতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃসন্তান, তদভাবে ভগ্নী, তদভাবে ভগ্নীসন্তান, তদভাবে পিতৃব্যের বংশ এবং তদভাবে মাতুলের বংশে বর্ত্তিবে। এখানে মিলাইয়া দেখার জন্য হিন্দুদায়ের উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ ঐ দায়তত্ত্ব হিন্দুসন্তানমাত্রে অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন।

সোলনের অপর বিধি এই যে, কন্যা বিবাহকালীন, পরিধেয় ধুতি,

৩৬। মনু ৮। ১৪৪।

বিছানা এবং অপর অপর তদ্রূপ দুই একটি সামান্য দ্রব্য ভিন্ন, মূল্যবান্ কোন সম্পত্তি বা অলঙ্কার কি যৌতুকস্বরূপ কি অন্য প্রকারে পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাইতে পারিবে না; এবং যাহাও বা লইয়া যাইবে, যদি সেই কন্যা পরে মৃত হয়, তবে জামাতাকে তাহা শ্বশুর-গৃহে ফিরাইয়া দিতে হইবে। বলিতে কি, উহা প্রকৃত পক্ষে ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যমমতাপূর্ণ গ্রীকনীতি! এক্ষণে হিন্দু ঋষি কি বলেন, দেখ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী ও দেবর প্রভৃতি, সতী স্ত্রীকে শক্ত্যনুসারে বসন, ভূষণ ও ভোজনাদি দ্বারা সম্মানযুক্ত করিবে।[৩৭] মনুও ঐ কথা বলিয়া আরও বলিয়াছেন যে, যথায় বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা স্ত্রী পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন এবং যথায় তাহা না হইয়া স্ত্রীর অনাদর হয়, তথায় সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যবস্থা-কারেরাও অল্প ইতরবিশেষে ঐ একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী মৃত হইলে স্ত্রীকে দত্ত ধন যে জামাতাকে ফেরত দিতে হয়, এ কথা তাঁহাদের মনেও কখন প্রবেশ করে নাই।

কোন স্ত্রীর উপর কেহ বলাৎকার করিলে, সেরূপ স্থলে সোলন ব্যবস্থা করিয়াছেন,—যে স্ত্রী কখন দাসত্বে বিক্রয় হয় নাই, তাহাকে বলাৎকার করিলে ১০০ ড্রাম অর্থাৎ ৪০৷৶০ টাকা এবং ভুলাইয়া হরণ করিলে ২০ ড্রাম অর্থাৎ ৮৶০ টাকা, অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবে। মনু এরূপ ব্যভিচারস্থলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিচারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন এবং সে সমস্ত দণ্ডই ইহা অপেক্ষা ঘোরতর কঠোরতাপূর্ণ। অকামা পরস্ত্রীগমনে লিঙ্গচ্ছেদনাদিরূপ বধদণ্ড; সকামাগমনে বধদণ্ড হইবে না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকার কঠোর শাস্তি বর্ণিত আছে। ব্যভিচারবিষয়ক শাস্তি সম্বন্ধে মনুর চূড়ান্ত বিধান, প্রজ্বলিত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া দাহ করা পর্য্যন্ত আছে। মনু যে কেন এখানে এত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন,

---

৩৭। সংহিতায় আচার অধ্যায়, ৮২।

তাহার কারণ মনুই বলিয়া গিয়াছেন,—"ব্যভিচার হেতু বর্ণসঙ্কর হয়, বর্ণসঙ্কর হইলে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া উঠে।[৩৮] পুনশ্চ পিতা পিতামহাদি পিতৃগণের পরলোকে পুত্রপিণ্ডের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু পুত্র সাঙ্কর্য্যোৎপন্ন হইলে সে প্রয়োজন নিষ্ফল হইয়া যায় এবং হিন্দুর বিশ্বাসে ইহপরলোকে তাহাপেক্ষা দুর্ভাগ্য ও ধর্ম্মভ্রষ্টতা আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব মনুর কঠোরতা, সকলের সার ধর্ম্মপথে ব্যাঘাত হয় বলিয়া!

সোলনের অপর বিধি,সামাজিক যে কেহ রাজকীয় চর্চ্চার অংশভাগী না হইবে, সে অসম্মানিত ও দেশমধ্য হইতে বহিষ্কৃত হইবে। হিন্দু ব্যবস্থাগ্রন্থে ইহার সহিত তুলনীয় বিধি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এতদ্দ্বারা কোন্ জাতি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কতটা লিপ্ত ও আস্থাযুক্ত ছিল এবং কোথায় কি পরিমাণে লোকে তাহাতে অংশভাগী হইত, তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মনুর বিধি, যদি কেহ কাণা, খোঁড়া কুঁজোকে, কাণা খোঁড়াদি শব্দে ডাকে তবে তাহার এক কার্ষাপণ দণ্ড হইবে। মাতা পত্নী ভ্রাতা পুত্র অথবা গুরু, ইহাদিগের যে গ্লানি করে ও গুরুকে যে পথ না দেয়, তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে। গ্রীক ব্যবস্থাগ্রন্থে এরূপ দয়াদাক্ষিণ্যপূর্ণ বিধি কোথাও পাওয়া যায় না; বরং তদ্বিপরীতে কঠোরতা ও ক্রূরতার একশেষ! উপরের বিধি যেমন গ্রীকচরিত্রের, এই বিধিদ্বয় তেমনি হিন্দুচরিত্রের সুন্দর নির্দ্দেশক বলিয়া জানিবে।

সোলনের পূর্ব্বে লোক, মৃত শত্রুর শরীর লইয়া নানা খণ্ডবিখণ্ড ও তাহার উপর নানাবিধ বীভৎস আচরণ করিত ও করিতে পাইত; এবং হত আত্মীয়ের জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ না করিয়াই, প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যাকারীকে হত করিতে পারিত। সোলনের সময়ে উহা রহিত হয়। হিন্দুর ব্যবস্থায়, মৃতদেহ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিধানে অসদাচরণ হইতে সুরক্ষিত; এবং প্রায় যে কোন গুরুতর অপরাধস্থলে, রাজদ্বার ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রতিশোধ লওয়ার নিয়ম ছিল না।

৩৮। মনু ৮। ৩৫৩।

ব্যবহারজীবীদিগের দণ্ডবিষয়িণী শিক্ষা দেখা গেল। এক্ষণে নীতি-বিষয়িণী শিক্ষা কিঞ্চিৎ দেখা যাউক।

পিতামাতা সম্বন্ধে সোলনের শিক্ষা, পিতামাতা যদি সন্তানকে তাহার শিক্ষার বয়সে কোন ব্যবসায় বা জীবননির্ব্বাহ-উপযোগী কোন বৃত্তিবিশেষ শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে সেই পুত্র পিতামাতার দুঃখ মোচন করিতে বা তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে বাধ্য নহে। মনুর এতদ্বিষয়ে শিক্ষা,—যদিও তাহাদের নিকট সুব্যবহার প্রাপ্ত না হইয়া থাকুক; তথাপি পিতা, মাতা, গুরু এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি কোনরূপে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না। পুনশ্চ, পিতা, মাতা ও গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, পুত্র তৎপক্ষে সর্ব্বদা যত্নবান্ রহিবে, যেহেতু ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফল পাওয়া যায়; যিনি ইঁহাদের সংকার করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হয়; আর যিনি ইহাদের অনাদর করেন, তাঁহার শ্রৌত স্মার্ত্ত সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।

মনুর শিক্ষা, "কেহ কোন অপমানজনক বাক্য বলিলে সহ্য করিবে, কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবে না, এই অস্থির ব্যাধিমন্দির দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বৈর করিবে না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া বরং সন্তোষ প্রকাশ করিবে; কেহ নিন্দা করিলে তাহার নিন্দা না করিয়া ভদ্র ও উত্তম প্রভৃতি মিষ্ট সম্ভাষণ করিবে।"[৩৯] থিওগনিসের নীতি সাধারণতঃ বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চনীতি বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। সেই থিওগনিসের মধ্য হইতে মনুর কথিত নীতিগুলির সহ এই সমজাতীয় উদাহরণ পাওয়া যায়—"যে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে, মিষ্ট বাক্য দ্বারা ভুলাইয়া তাহাকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিবে; এবং যেমন সে তোমার বশ্যতায় আসিবে, অমনি তাহার আর কোন কথাই না শুনিয়া যথাসাধ্য তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করিবে না"।[৪০] ইহার সহিত হেসিওদের

৩৯। মনু ৬।৪৭—৪৮। ৪০। Theog. 160—363.

নীতি মিলাইয়া দেখ। হেসিওদ একজন ধর্ম্মশিক্ষক। এই ধর্ম্মগুরু এরূপ স্থলে কেবল প্রতিশোধ নহে, দ্বিগুণ প্রতিশোধ লইতে উপদেশ দিতেছেন।[৪১] পুনশ্চ, মনু শিক্ষা দিতেছেন;—"পার্থিব সৌভাগ্য বিষবৎ অস্পর্শনীয় জ্ঞানে পরিহার করিবে"। এখানে থিওগনিস, নির্ধন এবং গৌরবশূন্য অবস্থার প্রতি বহু বিলাপের পর, শেষ শিক্ষা দিতেছেন, "হে প্রিয় কির্ণস, দরিদ্রতাতাপে তপ্ত হওয়া অপেক্ষা, নির্ধনের পক্ষে মৃত্যুই একান্ত শ্রেয়স্কর"। এখানে আর্য্যগুরু মনুর আর একটি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তুমি দরিদ্র হইলে হইলেই, তাহাতে কি যায়, আইসে?—"যে কোন আরব্ধ কার্য্যের শুভ ফল, অদৃষ্ট এবং মানবীয় চেষ্টা উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; যাহা অদৃষ্টের কার্য্য, তাহা মনুষ্যের আয়ত্তাতীত, অতএব তাহার প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিতেছ কি জন্য; তোমার সাধ্য যাহা তুমি তাহাতে কৃতকার্য্যতালাভের দ্বারা আত্মসার্থকতাসাধনে যত্নপর হও।" অতঃপর বলিতে কি, আর গ্রীকনীতি ভারতীয় নীতির সঙ্গে তুলনা করিতে যাওয়ায়, ভারতীয় নীতির অপমান করা হয়। ব্যবহারনীতি এবং ধর্ম্মনীতি, ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ করিয়া লওয়া দুষ্কর। ভারতীয়ের গর্ভবাস অবস্থা হইতে ধর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হয়, আজীবন তাহাতেই বাহিত হইয়া যায়, তাহার পর স্বতঃ পরতঃ মৃত্যুর পরেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

গ্রীকদিগের অতিনীতি লাইকর্গস্ প্রভৃতিতে দেখিয়াছ; এক্ষণে ভারতীয়দিগের অতিনীতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। এই অতিনীতির প্রাবল্য যদিও প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে, কিন্তু উহার ঘটাটা পাপক্ষালনকর প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্বেই কিছু অধিক। উহা কি অদ্ভুত ও হাস্যাস্পদ অতিসীমাতেই আনীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।—

১। চণ্ডালদর্শনের প্রায়শ্চিত্ত সূর্য্যদর্শন, তাহার সহ সম্ভাষণের প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণসম্ভাষণ, তাহার উচ্ছিষ্ট দর্শনে একরাত্র উপবাস, সংস্পর্শে ত্রিরাত্র, এবং সঙ্গে গমনে সবস্ত্র স্নান প্রায়শ্চিত্ত হয়।—বৌধায়ন।

৪১। Works and Days.

২। স্নাতকের ব্রতলোপে, উপবাস প্রায়শ্চিত্ত ; অগ্নিতে পাদনিক্ষেপে অহোরাত্র উপবাস, দেবতাগৃহের ইষ্টকাদি লইয়া গৃহাদিকরণে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত হয়।—মনু।

৩। চণ্ডালাদির ভুক্ত-উচ্ছিষ্ট কিম্বা রজস্বলা স্ত্রী অজ্ঞানপূর্ব্বক স্পৃষ্ট হইলে, অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্য-পানে প্রায়শ্চিত্ত হয়।—শাতাতপ।

৪। ক্রোধ হেতু ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছেদন করে, তবে মনস্তাপ, প্রাণায়ামত্রয় এবং উপবাস করিবে।—আপস্তম্ব।

৫। শূদ্রে যদি যজ্ঞোপবীত ছেদন করে, তবে ত্রিংশৎপণ দণ্ড দিয়া প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।—বৃহস্পতি।

৬। দিবাভাগে, শ্রাদ্ধদিনে, পর্ব্বদিবসে, স্ত্রীসঙ্গ করিলে, অহোরাত্র উপবাস করিতে হয়।—মনু।

৭। যদি ভোজনোত্তর আচমন না করিয়া, কুকুর, শূকর, অন্ত্যজ ইত্যাদিকে স্পর্শ করে, তবে সান্তপন ব্রত করিবে। তাহার অনুকল্প ধেনুদ্বয়।—কশ্যপ।

৮। বিড়াল কাক নকুলাদির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে একরাত্র উপবাস হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে ত্রিরাত্র উপবাস বিধি।—মনু।

৯। রোগাদি জন্য যে গো ক্ষীণ হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া যদি রোধ করিয়া রাখে ও সেই রোধ নিমিত্ত সেই গো যদি মরে, তবে তাহার জন্য প্রাজাপত্যের একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।—অঙ্গিরা।

১০। সর্পহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণকে তীক্ষাগ্র এক লৌহদণ্ড দান করিবে।—মনু।

১১। শূকর বধ করিলে ঘৃতপূর্ণ ঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে। তিত্তির পক্ষিবধে চারি আঢ়ক পরিমিত তিল প্রদান করিবে। শুক-পক্ষিবধে দ্বিবর্ষীয় বৎস এবং ক্রৌঞ্চনামক পক্ষিবধে ত্রিবর্ষীয় বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হংস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেন ও

ভাসপক্ষী, ইহার কোন একটি বধ করিলে, ব্রাহ্মণকে একটি গো প্রদান করিবে।—মনু।

১২। জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক, কাক, ইহার যে কোন একটিকে হত্যা করিলে, শূদ্রবধোক্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ মার্জ্জারাদি বধে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে ত্রিরাত্র এক যোজন পথ ভ্রমণ করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ত্রিরাত্র নদীতে স্নান করিবে এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে, ত্রিরাত্র আপোহিষ্ঠাদি সূক্ত মন্ত্র জপ করিবে। —মনু।

১৩। আমমাংসভক্ষণশীল ব্যাঘ্রাদির হননে পয়স্বিনী ধেনুদান করিবে, হরিণাদি পশু হনন করিলে বৎসতরী দান করিবে, উষ্ট্রবধে এক রতি স্বর্ণ দান করিবে।—মনু।

১৪। বাতকর্ম্মে, নিষ্ঠীবে, দন্তাশ্লিষ্টে, অনৃতে, ক্ষুতে এবং পতিত সম্ভাবে, জলস্পর্শ; তদভাবে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।—মনু।

এই সকল অপেক্ষা আর কি হাস্যাস্পদ অতিনীতি সম্ভবিতে পারে? অনেকের বিশ্বাস এবং অনেকে বলিয়া থাকে যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি যে সকল অতিনীতি, তাহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ পরতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস ও এরূপ বলার তুল্য, এমন মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা বলা আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা জানে যে মিথ্যা, কৌশল ও শঠতা অবলম্বন করিলেও সংসার নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে; কেবল তাহাদিগেরই ওরূপ বিশ্বাস ও ওরূপ বলা সম্ভবিতে পারে। ঐ সকল অতিনীতি প্রায়ই ব্রাহ্মণদের নিজের জন্য এবং নিজেকে নিজে মারায় অনেক স্বার্থ বটে! সে যাহা হউক, মনুষ্যস্বভাব আলোচনা করিলে,নীতিগুলির সমস্তই যে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি-পালিত হইয়াছিল, সে পক্ষে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি দ্বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ, সাময়িক চলিত লোকপ্রকৃতি এবং আচার ও বিশ্বাস যাহা, তাহা

বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাদের স্থায়িত্বসাধন; দ্বিতীয়তঃ, উপস্থিত সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার যথায় যথায় অপূর্ণতা ও হীনতা দৃষ্ট বা অনুমিত হইতেছে তথায় তথায় লোকরুচি সহ সামঞ্জস্যযুক্ত হইতে পারে এরূপ ভাবে,নববিধিযোগে অপূর্ণতার সংশোধন ও হীনতার পূরণ করিয়া দেওন। এই দ্বিপ্রকারের অন্যতর যে কোন বিধি বা উভয়ই সমাজের পরিচালক; এবং অল্প বা অধিক যে পরিমাণে হউক, সমাজের পক্ষে তাহারা মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। এই দুই রকমের অতীতে আর একটি তৃতীয় রকম সামাজিক ব্যবস্থা আছে,যাহা দেশ কাল ও পাত্র কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। "এরূপ হইলে ভাল হয়" কেবল এই বুদ্ধির উপর ভর করিয়া ও তর্ক খরচের সাহায্যে তাহা উদ্ভাবিত হয়; যেমন প্লেটোর সাধারণতন্ত্র রুষোর সোসিয়াল কন্ট্রাক্ট (সামাজিক সংস্থান), বেন্থাম ও মিল প্রভৃতির বিধিতত্ত্ব ও ইউটিলিটী, ইত্যাদি। এ সকল সর্ব্বসময়েই অসার অকার্য্যকর এবং ভ্রান্তিমরীচিকা স্বরূপ; কার্য্যে লাগাইতে গেলে, কেবল ঘূর্ণাবর্ত্ত ও বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যাহাহউক, গ্রীকদিগের বিধি যাহা তাহা প্রধানতঃ প্রথম রকমের; আর হিন্দুদিগের বিধি প্রধানতঃ দ্বিতীয় রকমের। হিন্দু ঋষিরা,সামাজিকতার অপূর্ণ ও হীন অংশ পূরণ করিতে গিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন; এই জন্য, তাঁহাদের অনেক বিধি লোকের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি, হিন্দু ঋষিরা যে সীমা অতিক্রম করিয়া কথিত তৃতীয় রকম বিধিদাতা-দিগের শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দুরা সেই সকল অতিবিধি পালন করিতে না পারিলেও, পালনযোগ্য জ্ঞানে সেই সকলের নিকট ভক্তিসংযুত ছিল;—ফলতঃ অতি-বিধি হইলেও, দেশ কাল ও পাত্রের সীমা বহির্ভূত হইয়া যায় নাই; স্বীয় স্বীয় সামঞ্জস্যপরিত্যাগে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল মাত্র। লাইকর্গস এবং সোলনের বিধি দেখিলে আপাততঃ উহা দ্বিতীয় রকমের বিধি বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

লাইকর্গসের বিধি বহুলাংশে দ্বিতীয় রকমে প্রসারিত বলিয়া যদিও ধরিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু সোলনের সম্বন্ধে সে কথা বড় একটা খাটে না। সোলনের বিধি প্রধানতঃ প্রথম রকমের এবং দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে রচিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। সত্য বটে সোলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল জনকয়েক স্বার্থসাধক লোকের দ্বারা; নতুবা সাধারণে তাহার প্রতি আগ্রহাতিশয়যুক্ত ও অনুকূল ছিল। বলা বাহুল্য যে লাইকর্গস এবং সোলনের বিধিও, স্বশ্রেণীর অতিনীতিতে অল্পবিস্তর প্রসারিত।

গ্রীকদিগের ও হিন্দুদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকলের দ্বারা যে সকল অতিনীতি অনুভূত হইতেছে, তাহার মধ্যে গ্রীকদিগের অতিনীতি যাহা, তাহা লোকযাত্রার অযথা অনুসরণফলে উৎপন্ন;—উহা ব্যবহারনীতির বিকৃতি প্রাপ্তি এবং সাংসারিকতার অতিসীমা। হিন্দু-দিগের অতিনীতি যাহা, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধির অযথা অনুসরণফলে উৎপন্ন; উহা ধর্ম্মনীতির বিকৃতি প্রাপ্তি এবং পারলৌকিক ভাবমুগ্ধতার অতি-সীমা। উভয়েতেই, ব্যবহারনীতি এবং ধর্ম্মনীতি, এতদুভয়ের মধ্যে যথাপরিমাণ সহানুভূতি ও সামঞ্জস্য গুণের অভাব। হিন্দুর ব্যবহারনীতি হিন্দুজাতির স্বাবলম্বনে এবং গ্রীকের ব্যবহারনীতি গ্রীকজাতির অত্যধিক বিজাতীয় সংস্রবসংঘটনে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতেই, বোধ করি ওরূপ সামঞ্জস্যগুণের অভাব ঘটিয়াছে। গ্রীকনীতি কর্কশ বা পৌরুষগুণময়ী এবং হিন্দুনীতি কোমল বা কমনীয়গুণময়ী। কিন্তু কি পৌরুষ, কি কমনীয় গুণ কেহই, পরস্পর অসংমিলনে, সম্বন্ধশূন্য ভাবে ও স্বাবলম্বনে, সুফল প্রসবে পটু নহে। এই নিমিত্ত উভয় নীতিই, উভয় স্থানে, উভয় জাতির জাতীয় বিকৃতি ও অধঃপতনের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। গ্রীকদিগের বাঞ্ছা, কেবল আত্মবলে, আমরা আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিব। ইহাদিগের নিকট দেহে বল ও মনে স্বার্থ, এ জগতে সর্ব্বস্ব; কিন্তু ইহারা জানিত না যে, বল এবং স্বার্থেরও এ জগতে সীমা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ই আছে। অন্য দিকে

হিন্দুদিগের ইচ্ছা, কেবল ধর্ম্ম ও কোমল মনুষ্যত্বগুণে আমরা এ জগৎ-যাত্রা কাটাইব এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব গুণই জগৎ ও জীবনের উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহা জানিত না যে কেবল কোমল গুণ, সহায়শূন্য হইলে, সর্ব্বদা আপন জালে আপনি জড়াইয়া হস্তপদবদ্ধ এবং নির্জীব হয়, সুতরাং যে কাহারও দ্বারা বিধ্বস্ত ও হৃতগৌরব হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের গৌরব-নিশান ততদিনই উড়িয়াছিল, যতদিন তাহাদের বলসর্ব্বস্ব ও স্বার্থ-ভাবের বহিঃপ্রচার হয় নাই। পারসিকেরা যখন দেখিল যে,তাহাদিগকে কেবল বলে পারিয়া উঠা দুষ্কর; তখন তাহাদের মধ্যে যে স্বার্থবিষয়ে নৈতিক হিতাহিতজ্ঞানের ন্যূনতা, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, গ্রীক-চরিত্রকে কলুষিতকরণের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফিলিপ এবং আলেকজাণ্ডারও, ক্রমান্বয়ে উৎকোচ এবং লোভ, উভয়ের দ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইয়া আত্মবশে আনিয়াছিল। যে সমতায় সকল রক্ষা, যদ্দ্বারা নিজের পরিমাণ করিয়া ন্যায্য বলচালনায় সমর্থ হইতে পারা যায়, বলগর্ব্বে কখন ইহারা সে সমতার দেখা পায় নাই; সেইরূপ যে নীতিতে সকল স্থায়িত্ব, যদ্দ্বারা আত্মসাবধান করিয়া চলিতে পারা যায়, স্বার্থ-বশ্যতায় কখন ইহারা সে নীতির দেখা পায় নাই। ইহাদের বলগর্ব্ব হেতু ইহাদের বহিঃশত্রু আকর্ষিত; এবং স্বার্থপরতা হেতু বহিঃ-শত্রু কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল। পুনশ্চ, যাহা অযথা দাম্ভিক গৌরবের নিদানভূত, তাহাই সর্ব্বদা সেই দাম্ভিক জনের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে;—বিধাতার এই নিয়ম যেন পুনরভিনীত করণার্থেই,যে বলগর্ব্বে গ্রীক কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না এবং যে স্বার্থে মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইত না, রোমক চাতুরীতে পড়িয়া, সেই বল ও সেই স্বার্থই তাহারা আপনাপনির মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রয়োগে, পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল,—মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মনীতি সহ সামঞ্জস্যপরিশূন্য এক-মাত্র পাশব বল ও পাশব স্বার্থ পরিচালনের ফল কার্য্যে পরিণত হইয়া-ছিল। আর হিন্দু? ইহাদের সৌভাগ্যধ্বজা অনেক দিন উড়িয়া-ছিল; তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মমূলক নীতি যতই

অতিনীতিবিশিষ্ট হউক, তাহার ফল, পাশব বল ও স্বার্থ মূলকনীতি অপেক্ষা অধিক স্থায়ী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ, ভারতলোলুপ বিজাতীয় লোকনয়ন তখনও উন্মীলিত হয় নাই; যদি হইত, তাহা হইলে অতিমনুষ্যত্বদোষে ভারত যে অল্পকালে ও অনায়াসে একেবারে ছারেখারে যাইত, তাহাতে অতি অল্পই সন্দেহ এবং শেষে যে গিয়াছে, তাহাও সেই জন্য। স্ত্রীলোক আত্মরক্ষণে অপটু; ভারত ধর্ম্মনীতিতে,কোমলগুণে,বিকৃত মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদিত্বে, স্ত্রী এবং জুজুবিশেষ; সুতরাং তাহার অধঃপতনের কারণ অধিক বলিতে যাওয়া সময় অপব্যয়মাত্র। এ বিষয়ে রূপক ভাবে বলিতে গেলে, ভারত শিক্ষিতা রূপসী স্ত্রী; আর গ্রীক বর্ণজ্ঞানশূন্য বোমবেটে। কে না জানে সুগুণা সুরূপা নিরীহ ও উৎপাতশূন্য স্ত্রীজীবন, স্বতঃ-পরতঃ উৎপাতসহচর অঘোর বোম্‌বেটে অপেক্ষা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

ভারতসন্তান! একা পৌরুষ গুণ বা একা কমনীয় গুণ কখনও ফলপ্রসবী হইতে পারে না। এতদুভয়ের সংমিলনে জগৎ সংসার; এতদুভয়ের সংমিলনেই যে কিছু প্রকৃত পদার্থ প্রসবিত হয়। তুমি তোমার এ দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গে যদি জাতীয় জীবনে আবার গৌরব-নিশান উড়াইতে ইচ্ছাবান্ হও, তবে ঐ উভয় গুণের সমাবেশ বা বিবাহ দিতে শিখ, তাহাদের সংমিলন সাধন কর। বিকৃতিপরিত্যাগে গ্রীকের যে পৌরুষগুণ এবং বিকৃতিপরিত্যাগে হিন্দুর যে কমনীয় গুণ, তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে শিক্ষা কর এবং সেই সামঞ্জস্যের ফল যাহা তাহা অনুষ্ঠান কর, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কেবল ধর্ম্মেও কিছু হয় না, কেবল মনুষ্যত্বেও কিছু হয় না, কেবল স্বার্থেও কিছু হয় না, বা কেবল বলেও কিছু হয় না।

বিদ্যাক্ষেত্রস্থ অপরাপর বিষয়ক শাস্ত্রালোচনার পূর্ব্বে,হিন্দুর কার্য্যগত অনুষ্ঠান বৃত্তিটা কতদূর, তাহা একটু দেখা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যই প্রধান লক্ষ্যস্থলীয়।

৪। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।

গ্রীকদিগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সবিস্তার আলোচনা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক, কারণ তাহা শত শত মুখে শত শত জন আলোচনা করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যে কোন বিস্তৃত গ্রীক ইতিহাস দৃষ্ট করিলে তাহা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অতএব একেবারে অনালোচিত যে ভারতীয় কৃষিশিল্পাদি, আমরা এখানে তাহারই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া যাইব; এবং যেহেতু আমরা ভারতসন্তান, আমাদিগের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্যও হইতেছে। বাঞ্ছারাম, যদি তুমি এ সঙ্কীর্ণ স্থানে কোন বিস্তৃত আলোচনার প্রত্যাশা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ভুল!

যে দেশে পবিত্র সপ্তসিন্ধু এবং পুণ্যসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা দুহিতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া, শতমুখে সাগরগামিনী হইয়াছেন; যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মীদেবীর প্রভব ও জন্ম; যে দেশের ভূমি রত্নপ্রসবিনী; সে দেশে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য, তাহা বলিতে যাওয়া দ্বিরুক্তিমাত্র। আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রদ ঋগ্বেদে ভূয়োভূয়ঃ কৃষিকার্য্যের উল্লেখ,তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং কৃষির জন্য "কুল্যা"[৪২] শব্দে জলপ্রণালীরও অস্তিত্ব এবং ব্যবহার সূচন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কৃত্রিম জলাশয়ে জল বাঁধিয়া তাহা হইতে আবশ্যক অনুসারে জলগ্রহণ পূর্ব্বক, কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলের দ্বারা অনুমান হয় যে, বৈদিক সময়ে তৎসময়োচিত ও আশানুরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন হইয়াছিল এবং আর্য্যগণ নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে, রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরা হইতে, বহুরত্ন দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজগণও কৃষিকার্য্যের পক্ষে যে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

৪২। ঋঃ বেঃ ১০-৩৪-১৩। ১০-১১৭-৭। ১০-৪৩-৭ ইত্যাদি।

অযোধ্যাকাণ্ডে (১০ম সর্গে) রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,— "সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য-প্রচুর, যথা নদীজলেই কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উহারা স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দেত কাল যাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্টনিবারণ পূর্ব্বক তুমিত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক?" ইত্যাদি। কৃষিকার্য্য, দেখিতে পাওয়া যায় যে কেবল জাতি বা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। সর্ব্বোচ্চজাতি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্যের অনুসরণ করিতেন।[৪৩] সে যাহা হউক, এটা কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, যে ভারত চিরকালই কৃষিপ্রধান ও কৃষিপ্রাণ দেশ, সে ভারতে কৃষিপ্রণালীর উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়ার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না; বরং তদ্বিপরীতে তাহার কোন কোন অংশে অবনতি ঘটনাই লক্ষিত হয়! বলিতে কি যে কৃষিপ্রণালী অতি প্রাচীনতমকালে অনুসৃত হইত এখনও অল্প ইতরবিশেষে প্রায় তাহাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃষিই যেখানকার জীবনোপায়, সেখানে এরূপ হওয়ার কারণ?—প্রথমতঃ ভূমি রত্নপ্রসবিনী হেতু, পেটের ভাত সঙ্কুলান হওয়ার পক্ষে সেই কৃষিপ্রণালীই যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইহলৌকিক সুখের প্রতি যথোচিত আসক্তি না থাকায় এবং উপস্থিত অবস্থায় প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হওয়ায়, বিপুল ও বিস্তৃত শিল্পবাণিজ্যাদির দ্বারা আত্ম অবস্থার উন্নতিসাধনপক্ষে সাধারণতঃ যত্নাভাব; সুতরাং পেটের ভাতের অতিরিক্ত শস্যোৎপাদন করিবার জন্য কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও অধ্যবসায় যেখানে কলিকাতেই এরূপ বিদলিত, সেখানে আর উন্নতির সম্ভব হইবে কাহাকে অবলম্বন করিয়া? সাংসারিক শ্রেয়োবিষয়ে অনাস্থাকেন্দ্রশয়নশায়ী এমন জাতি আর কি

৪৩। তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যাস্ত্রজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী॥—রামায়ণ ২।৩২।২৯।

কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে! ভারতভূমি যদি এরূপ দয়াশালিনী জননীর ন্যায় না হইয়া কিঞ্চিৎ বিমাতৃবৎ আচরণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকটা ভাল হইত।

কৃষিপ্রণালী যেমনই থাকুক এবং যে কারণবিশেষের কার্য্যবশতঃই ঘটনা হউক, প্রাচীন গ্রন্থপাঠে কিন্তু সেই প্রাচীন কালে যেরূপ অপরিমিত ধনশালিত্ব, সুশৃঙ্খল বিলাস এবং সুখস্বচ্ছন্দতা দেখা যায়, তাহাতে তাহাকে, সে সময় বিবেচনা করিলে, নিঃসন্দেহ অতি আশ্চর্য্য-জনক বলিতে হইবে। রামায়ণদৃষ্টে দেখা যায় যে, তখন ভারতে বহু ধনের সমাগম হইয়াছে এবং ধনিজনের বিলাস জন্য বহুতর শিল্পী সকল নিরন্তর নিয়োজিত হইয়া রহিয়াছে। ঋগ্বেদে স্বর্ণমুদ্রা, সুবর্ণ কোষ [৪৪], ধনাঢ্য অবস্থা [৪৫], সামুদ্রিক বণিক্ [৪৬], পান্থনিবাস [৪৭], ইত্যাদির উল্লেখে, তৎকালেও তত্তৎ বিষয়ের অস্তিত্ব এবং তজ্জনিত সৌভাগ্য বহুপরিমাণে সূচিত হয়। রামায়ণে মণিকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, শস্ত্রনির্ম্মাণব্যবসায়ী, মায়ূরক (ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা নানাবিধ বস্তুর নির্ম্মাণ-কারক), করাতি, বেধক (মণি মুক্তাদি বেধ করে যাহারা), দন্তকার (যাহারা গজদন্তের কার্য্য করিয়া থাকে), গন্ধোপজীবী (গন্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করে), সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপক (ধূপবিক্রয়কারী), শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায় (দর্জি), সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে), বাইজি ও ভেড়ো [৪৮], ইত্যাদি শিল্পী ও ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, ভূমিপ্রদেশজ্ঞ, শিবিরনির্ম্মায়ক, খনক, যন্ত্রক, স্থপতি, যন্ত্রকোবিৎ, মার্গিণ, বৃক্ষতক্ষক, [৪৯] ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার ব্যবসায়ীর উল্লেখ রামায়ণে রহিয়াছে। এই সকল শিল্পী এবং ব্যবসায়ীর নাম করিলে, সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের পরি-পোষক ও আনুষঙ্গিক অপরাপর অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সম্ভবতা ও

৪৪। ঋঃ বেঃ ৬।৪৭।২২। ৪৫। ঋঃ বেঃ ৪।৪৮।১১।
৪৬। ঋঃ বেঃ ১।১১৬।৩—৪। ৪৭। ঋঃ বেঃ ১।১৬৬।৯।
৪৮। রামায়ণ ২৮৩।১২—১৫। ৪৯। রামায়ণ ২। ৮০।

অস্তিত্ব আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এক্ষণে এই সমগ্র একত্র করিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে, যে সমাজ এতগুলি শিল্পী ও ব্যবসায়-দারকে খাটাইতে পারিত, তাহা অবশ্যই উন্নত সমাজ; এবং উন্নত সমাজ যে সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেয়, তাহা অবশ্যই উন্নত এবং উৎকৃষ্ট শিল্প ও ব্যবসায় হইবার কথা। কিন্তু এই সকল শিল্প ও ব্যবসায় যতই উন্নত বা উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহারা ব্যক্তি-বিশেষ ও বিলাসিবিশেষের অভাবপূরণ করিত মাত্র; জাতীয় সর্ব্ব-সাধারণের অভাব পূরণ করিতে কখনও কোন অংশে নিযুক্ত হইত কি না,তাহার কোনই নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় না। গ্রীকের শিল্প ও ব্যব-সায়ের ভাব ওরূপ নহে, উহা প্রকৃত জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল; এবং আজি পর্য্যন্ত তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান। গ্রীকেরা যেখানে কোন উচ্চ শিল্প বা বাণিজ্যজাত দ্রব্য, উপায় অভাবে ব্যক্তিবিশেষের আত্মসম্পত্তিতে পরিণত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিত না; সেখানে তাহাকে জাতীয় ব্যবহারে লাগাইয়া সকলেই তাহার ভোগ ও ব্যবহারের অংশভাগী হইত; সুতরাং অতি দরিদ্র গ্রীকেরও অতি উচ্চতর ও মূল্যবান্ তত্তৎ দ্রব্যে অনাস্থাযুক্ত এবং তাহার উৎ-পাদনে আগ্রহ ও অধ্যবসায় শূন্য হইবার কোন কারণ ছিল না। ভারতের ভাব অন্যরূপ, তথায় তদ্রূপ জাতীয় ভোগ ও ব্যবহারের রীতি ছিল না; সুতরাং সেরূপ মূল্যবান্ দ্রব্যের গমন ও গতি একমাত্র ধনি-বিশেষের নিভৃত কক্ষায়, সুতরাং সর্ব্বসাধারণ লোক তাহার উৎপত্তি ও উন্নতি বিষয়ে আস্থাযুক্ত হইবে কি, তাহার অস্তিত্বই তাহাদের জ্ঞাত-সারে আসিত কি না সন্দেহ। সাধারণ লোক কাজেই সহজোৎপন্ন দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিত এবং কোন একটা মূল্যবান্ বা বিলাসের পদার্থ সম্বন্ধে, উহা 'আমার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া' তাহার উপর যে একটা জাতীয়ত্বের মমতা তাহা ঘটিত না। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকল পদার্থই সমান চক্ষে দৃষ্ট হইত। জাতীয়ত্বে এই মমতার অভাব দীর্ঘকাল-ব্যাপকতায় স্বভাবে পরিণত হইয়া যাওয়াতে, অদ্যাপিও হিন্দুসন্তান

তাহার ছাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও বাবুজীর বাগানে, বৈঠকখানায়, বিলাস-উদ্দীপক বিলাতি অনঙ্গমঞ্জরী, রতিকাম, বা রসিক রসিকার ছবির অভাব নাই; কিন্তু কি দেশীয় ছবি, কি একটা স্বজাতীয় বা অভাবে যে কোন্ জাতীয় মহাপুরুষের ছবির সঙ্গে দেখা নাই। এইরূপ যাবতীয় বিষয়ে। যেমন অতি আশ্চর্য্য, তেমনি অতি বিড়ম্বনার কথা বলিতে হইবে। যাউক, আর বাজে কথায় কাজ নাই।

পুনশ্চ, রামায়ণদৃষ্টে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে,তখন ভারতবর্ষে বহু ধনের সমাগম ও বহু শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। স্ফাটিক-গবাক্ষযুক্ত [৫০] ইন্দ্রভবনতুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যানমালা, রথ শিবিকা প্রভৃতি যান, মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য সকল, বৃক্ষাবলী-শোভিত এবং কূপ ও পান্থনিবাসাদিযুক্ত, কাঁকর দিয়া বাঁধা, প্রশস্ত রাজপথ, ইত্যাদির ভূয়ঃ উল্লেখে কে না অনুমান করিবে যে, রামায়ণের সময়ে উত্তর ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া অভ্রান্তভাবে গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তবে মনুসংহিতা দেখ; তথায় বাল্মীকির বর্ণিত সমাজের ন্যায় অনুরূপ উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, এবং বলা বাহুল্য যে, সেই চিহ্ন বহুলাংশে রামায়ণের সময়ের উপর বিনা আপত্তিতে বর্ত্তিতে পারে।

কিন্তু উপরের চিত্র যতই তৃপ্তিকর বা যতই মনোহর হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহা সর্ব্বজনীন ছিল না। এ বিলাস, এ ধন, এ স্বচ্ছন্দতা, কোথায় প্রবাহিত হইত?—ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে; কিন্তু ধনী বা রাজা দেশশুদ্ধ লোক নহে। বিশ্বব্যাপী রোমরাজ্য, রাজ্যের শেষাবস্থায়, যেমন দুই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোৎপাদন করিত; এবং তথায় যেমন অপর লোক চীরমাত্র পরিয়া ও অখাদ্য

৫০। রামায়ণ ৪।১।৩৮। ইউরোপভূমে প্লিনীর সময় কাচের ব্যবহার আরম্ভ হইতে দেখা যায়।

খাইয়া জীবনকাল কাটাইত; ভারতেও তেমনি তাৎকালীক ঐশ্বর্য্য কেবল কয়েকটি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ঘটিবার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যেমন বুদ্ধিতে, লোক সকল ইহলৌকিক সুখে তাদৃশ আসক্তিযুক্ত ছিল না; তেমনি কাজেও, সহজোৎপন্ন দ্রব্য এবং এমন কি, পেটের ভাতমাত্রে যথেষ্ট অভাব পূরণ হইল বলিয়া বিবেচনা করিত। অথবা, অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যেথানেই অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকে অধিক বাহ্য সৌভাগ্যের আড়ম্বর, সেইখানেই কাঙ্গালের দশা সকল কালে সমান! রাজকর যদিও অতি সামান্য এবং রাজশাসন মোটের উপর যদিও শান্তিদায়ক ছিল বটে; কিন্তু যেখানে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত, সেখানে যে সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিত না; এমন হইতেই পারে না। তাহার পর, রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার বা প্রজার ধনরক্ষায় রাজার অমনোযোগিতা, ইত্যাদি ত্রুটিও প্রজার নির্ধনতার পক্ষে অপর কারণ। এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় সময়ে সময়ে বিশেষরূপে প্রবল হইত; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষক, আপন আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু বেশী ধন উপার্জ্জন করিলে, তাহা ভয়প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত।[৫১]

ফলতঃ সৌভাগ্যাদি যখন জাতিগত না হইয়া ব্যক্তিবিশেষগত হয়, তখন সেই সৌভাগ্য এবং শিল্পাদি, যতই উন্নতি প্রাপ্ত হউক না কেন, স্থায়ী কোন চিহ্ন এ জগতে রাখিয়া যাইতে পারে না। শিল্প সৌভাগ্যাদি জাতিগত হইলে, সাধারণতঃ এরূপ হয় না; তখন তাহাদের ফলস্বরূপ জাতীয় কীর্ত্তি প্রায়ই নানা রূপে স্থায়ী হইয়া, জাতীয় মহাপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই কারণে গ্রীক শিল্প ও সৌভাগ্যাদি, ভারতীয় শিল্প ও সৌভাগ্যাদির অপেক্ষা, কতই অপূর্ব্ব

৫১। অযোধ্যাকাণ্ডে, রাম বনে যাইবেন বলিয়া, লোকে দুর্ব্বৃত্তা কৈকেয়ীর পুত্রদিগের রাজত্বে বাস করিতে হইবে এই ভয়ে কহিতেছে,

"সমুদ্ধৃতানি ধনানি পরিধস্তাজিরাণিচ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্ব্বশঃ॥"

অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সকল কালসমক্ষে দণ্ডায়মান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। গ্রীকের ধনবত্তা ভারতের শতাংশের একাংশ নহে বটে, কিন্তু তথাপি গ্রীক তাহার ধনবত্তার যে মনোহর চিহ্ন সকল রাখিয়া গিয়াছে; ভারত তাহার শতাংশের একাংশ রাখিতেও সমর্থ হয় নাই। ভারত যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল পুঁথিগত খেয়ালপূর্ণ কতকগুলি বর্ণনাঘটামাত্র। মিসরও ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল, কিন্তু তথাপি ত অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে! সত্য বটে, কিন্তু মিসরের রাখা আর ভারতের না রাখা, এ উভয়কে সমশ্রেণীর ও সমকারণসম্ভূত বলিলে বলা যায়। মিসর কীর্ত্তি অনেক রাখিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় কীর্ত্তি নহে; তাহাও ব্যক্তিগত,—তাহা ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মোন্মাদ এবং মিসরীয় পরলোকবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। ভারতের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং পরলোকবুদ্ধি স্বতন্ত্র। একে স্বতন্ত্র; তাহাতে আবার যে পর্য্যায়ের ধর্ম্মোন্মাদে লৌকিক ঘোরঘটা ও আড়ম্বর উৎপন্ন হইতে পারে, ভারত তাহাকেও অনেকদূর অতিক্রম করিয়াছিল—"জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনং।" অতএব যে ধর্ম্ম ও পরলোকবুদ্ধি হইতে মিসরে কীর্ত্তি, তাহারই ফলে ভারতে কীর্ত্তিশূন্যতা। দ্বিতীয়তঃ, মিসর এবং ভারত উভয়ে,অল্প কয়েক জনের ঘরে অপরিমিত ধনসঞ্চয় হেতু সাধারণে দারিদ্র্য ও শ্রমসুলভতা ঘটিবাতে; ভারতীয় ধনী যেখানে বিলাস কল্পনা করিত, মিসরীয় ধনী সেখানে পরলোক জাগান কীর্ত্তি কল্পনায় সক্ষম হইতে পারিত, এইমাত্র প্রভেদ;—উভয়ে কারণ এক,কার্য্যে কেবল খেয়ালভেদ মাত্র। সে যাহা হউক, এখন সৌভাগ্য বল, সামাজিকতা বল, রাজনীতি বল, বা যাহাই বল, যতক্ষণ তাহা সর্ব্বজনীন না হইবে এবং যতক্ষণ তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোক অংশভাগী ও উৎসাহিত হইতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহা উজ্জ্বল ও স্থায়ী চিত্রপ্রদর্শনে এবং জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ়বন্ধনে কখন সমর্থ হইবে না। সকল স্থানেই, নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতা, সাধারণতঃ জাতীয় জীবনের দৃঢ়বন্ধন পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হয়; কিন্তু ভারতের পক্ষে, বিশেষতঃ আধুনিক ভারতের পক্ষে, তাহাত আছেই;

অধিকন্তু ভারতীয় অনাস্থাযুক্ত মানবপ্রকৃতি তাহাতে সোণায় সোহাগা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! একের জ্বালায় রক্ষা নাই, তাহার উপর এই যুগলসংযোগ! বাঙ্গারাম, যদি আবার জাতীয় সৌভাগ্যের প্রার্থী হও, তবে এরূপ নির্ব্বিবাদী ঔদাস্যপূর্ণ প্রকৃতি অগ্রে সংশোধন কর; তাহার পর সর্ব্বজনীন ভাবের অন্তরায় যাহা যাহা, তাহা কায়মনে নিপাত কর। সাধারণ লোককে অগ্রে উত্থিত কর, নতুবা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তুমি একা উঠিলে ফল কি, তোমার পৃষ্ঠবল কোথায়?

কৃষিশিল্পাদি সম্বন্ধে যে চিত্র দেখা গেল, বাণিজ্যবিষয়ক চিত্র যে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক মনোহর, তাহা নহে। ভাল দেখা যাউক। অন্তর্বাণিজ্য অর্থাৎ দেশমধ্যে যে বাণিজ্যের চলাচল হইয়া থাকে, তাহার বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যক রাখে না। যখন দেখা যাইতেছে যে, অসভ্য সমাজের মধ্যেও অন্তর্বাণিজ্যের চালনা রহিয়া থাকে, তখন এই সভ্য সমাজেও যে ছিল তাহা বুঝাইতে যাওয়া সময় অপব্যয়মাত্র। সমাজের সভ্যতা ও সৌভাগ্যাবস্থা, প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি, লোক এবং দ্রব্যাদি চলাচলের জন্য যান ও রাজপথাদি, এবং এরূপ নদীমাতৃক দেশে নৌকাগমনাগমনের বহুল উল্লেখ, এই সকলকে যদি সে কালের অন্তর্বাণিজ্যের বহুবিস্তৃতি পক্ষে বহিশ্চিহ্ন স্বরূপ ধরা যায়; তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহাদের এতই উল্লেখ আছে যে, তাহাতে ভারতের তাৎকালিক অন্তর্বাণিজ্য অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়াই বলিতে হয়। আমরাও এখানে তদ্রূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর বহির্বাণিজ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ দেখা যাউক।

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা, সেই প্রাচীন সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে প্রায়ই অন্ধকারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ-বাণিজ্য সম্বন্ধে "বণিজো দূরগামিনঃ" ইহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক অসংখ্য বার উল্লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ, রামায়ণে দ্বীপবাসী

এবং সামুদ্রিক বণিকের তত অধিক পরিমাণে উল্লেখ না পাওয়া যাউক, কিন্তু পাওয়া যায়। রামায়ণের এক স্থানে লিখিত আছে, "উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করুক।"[৫২]

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বহুদূরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও আছে। জলপথে গমন কেবল বাল্মীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১-১১৬,১-২৫,৭-৮৮) "নাব সামুদ্রীয়" বাক্যের উল্লেখে,অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু এখন কথা এই যে, এ সমুদ্র-গমন আর্য্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যকে গমনাগমন করিতে দেখিয়া "নাবসামুদ্রীয়" শব্দ মন্ত্রমধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন? যাহা হউক, এখানে একটি বিষয় কিন্তু নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আর্য্যেরাই জাহাজে চড়িয়া অন্যের দেশে যাউন বা অন্যেই জাহাজে চড়িয়া তাঁহাদের দেশে আসুক, এ দুয়ের যে কোন সূত্রে হউক, জাহাজী বাণিজ্যের তৎকালে দেশমধ্যে একেবারে অপ্রচার ছিল না। তাহার পর কথা এই, আর্য্যেরা যদি জাহাজে চড়িয়া না যাইতেন, তবে আসিত কাহারা? অথবা আর্য্যেরা যে সত্য সত্যই একেবারে জাহাজে চড়িতেন না তাই বা বলি কি করিয়া। পরবর্ত্তী গ্রন্থ মনুতে ভূয়োভূয়ঃ সমুদ্রগামীর কথার উল্লেখ এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত

"———সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ।

*   *   *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলৌ যুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

পূর্ব্বকালীন সমুদ্রযাত্রা-প্রথা সূচনা করিয়া, কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা, অল্প হউক বা অধিক হউক, সমুদ্রগমনে একবারে বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু

৫২। রামায়ণ ২। ৮৫।

আবার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্য্য বাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দ্দেশ এই করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ যেথানে যেথানে বিচরণ করে, তাহাই যাজ্ঞিক দেশ; তাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন, অন্যত্র কদাপি নহে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমন এবং বাসে সমর্থ।[৫৩] এ কথা সম্ভবতঃ বাল্মীকির সময়েও খাটে। আবার বাল্মীকির পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছুমাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherya (সম্ভবতঃ শর্ম্মণাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীক ভূমে গমনান্তর, ম্লেচ্ছদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জ্ঞান করিয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আথেন্স নগরে অগ্নিপ্রবেশ করে। ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজাণ্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada (পাসগর্দা) নগরে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিল। অতএব ধর্ম্মভীরু ভারতে, স্বদেশপরিত্যাগ এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন যথন এমন দূষণীয়, তথন কিরূপেই বা নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, ভারতীয়েরা সমুদ্রপথে পোতারোহণপূর্ব্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশবাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন। হিন্দু দাঁড়ী মাঝি লইয়া সমুদ্রযাত্রা যেন কোন মতে সমাধা হইল; কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছু দিনের জন্য ত বাস করিয়া থাকিতে হইবে। সে সময়ে সামুদ্রিক জলপথে গতিবিধি থাকিলেও, নিঃসন্দেহ উন্নত ভাবের ছিল না; সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে, সে কিছুদিন বাস নেহাত কিছুদিন নহে। আরও কথা, যদি এ কিছু দিনের বিদেশবাসে দোষ না পড়ে, তবে কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল? কিম্বা যদি বলা যায়, শূদ্রেরা যদৃচ্ছা গমনে সক্ষম, সুতরাং

৫৩। Hero. vii 65, 86. &c. গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমধ্যে ভারতীয় পদাতি ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জ্ঞাত নহি। হইতে পারে, ভারতস্থ পার্ব্বতীয় বা তদ্রূপ অপরাপর কোন নিকৃষ্ট জাতি হইবে।

তাহাদের দ্বারা বিদেশবাণিজ্য সমাধা হইত; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, শূদ্রেরা সমাজে তবে এত হীন ও নির্ধন হইল কেন? বিশেষতঃ দেখা যায়, শূদ্রেরা সমাজের মধ্যে সর্ব্বদাই সন্দেহের পাত্র; এমন কি, মনু তাহাদের সঙ্গে একাকী পথ চলাচল পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। অতএব এরূপ শূদ্রের হাতে যে ধনাগমের উপায় স্বরূপ বাণিজ্যভার অর্পণ করিয়া আর্য্যেরা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এই সকল কারণে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, আর্য্যেরা সমুদ্রযাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল; অর্থাৎ ভারতেরই অধিবেশিত উপকূলভাগ এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ তাঁহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা ততটা সঙ্কীর্ণদেশে আবদ্ধ ছিলেন না। শর্ম্মণাচার্য্য ও কল্যাণ শর্ম্মা ম্লেচ্ছদেশগমনে নিজেকে পতিত জ্ঞান করিলেও এবং মনু প্রভৃতিতে কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশের অতিরিক্ত গমনে বিধিবিধান না থাকিলেও, সে প্রাচীন কালে হিন্দুরা কার্য্যতঃ এতটা বিধিব্যবস্থা মানিয়া আপনাকে কুঞ্চিতপদ করেন নাই। শর্ম্মণাচার্য ও কল্যাণ শর্ম্মা, উভয়ই সংসারত্যাগী বানপ্রস্থাবলম্বী। সংসারত্যাগীর ধর্ম্ম ও বিধিনিষেধ হইতে, সংসারীর ধর্ম্ম ও বিধিনিষেধ হিন্দুসমাজের মধ্যে সকল কালেই পৃথক্। এজন্য অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে, যে আচরণ একের পক্ষে নিষিদ্ধ, অন্যের পক্ষে তাহা প্রশস্ত। অতএব শর্ম্মণাচার্য্য প্রভৃতি যেখানে পতিত জ্ঞান করিতেন, সংসারিগণ সেখানে সেরূপ পতিত জ্ঞান নাও করিতে পারেন। তাহার পর, মনুসংহিতা প্রভৃতিতে যত বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই যে সংহিতার সঙ্গে সমপ্রাচীন, তাহা নহে; কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত অংশও তাহাতে অনেক ঘুটিয়াছিল। এখন কে বলিতে পারে যে, দূরদেশগমনের নিষেধাত্মক বিধি সকল সেইরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশভূত নহে। ফলতঃ প্রাচীন কালের প্রচলিত ব্যবহার যাহা দেখা যায়, তাহা যেন সে সকল নিষেধকে প্রক্ষিপ্ত স্বরূপই প্রমাণ করাইয়া থাকে।

কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যে ম্লেচ্ছদেশগমনে শর্ম্মণাচার্য্য ও কল্যাণ পতিত জ্ঞান করিয়াছিলেন; সেই ম্লেচ্ছকন্যাকে আবার হিন্দুরাজ চন্দ্রগুপ্ত পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন অথচ পতিত হয়েন নাই। ফলতঃ তৎকালে বাক্ত্রিয়াদেশস্থ গ্রীকদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ অনেক হিন্দুরই ঘটিয়াছিল। পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক হিন্দু রাজা বা রাজপুরুষ, দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ বা তথাবিধ কারণে, সসৈন্য ম্লেচ্ছদেশে গমনপূর্ব্বক বহুদিন তথায় বিনা বাধায় অবস্থিতি করিতেছে। প্রাচীন গ্রীকগ্রন্থকার আরিয়ান কহেন যে, বহুপ্রাচীন কাল হইতে, এমন কি তাহার নিজ সময়ে পর্য্যন্ত, যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়দারগণ নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য গ্রীকভূমে আনয়ন করিত; তাহারা মুক্তারও ব্যবসায় চালাইত এবং তাহারা নানা বিদেশীয় বন্দর সকলে গিয়া মুক্তা বিক্রয় করিয়া আসিত। আরিয়ান আরও কহেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ধনবান্ গ্রীকেরা যেরূপ আগ্রহপূর্ব্বক মুক্তা কিনিত; বর্ত্তমান অর্থাৎ আরিয়ানের নিজ সময়ে রোমকেরা সেইরূপ আগ্রহের সহিত কিনিয়া থাকে।[৫৩ক] অতএব ভারতীয়েরা যে গ্রীস ও অন্যান্য বিদেশীয় বন্দর সকলে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক ব্যবসায় চালাইত, এইত তাহার ভাল ও অখণ্ডনীয় চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই যে, সকোট্রাদ্বীপের অধিবাসীরা অনেকে, গ্রীক ও ভারতীয়দিগের সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন;[৫৪] কাজেই এখানে ধরিতে হইবে যে তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতীয়দিগের তথায় গতিবিধি ছিল। জাবা ও বালী দ্বীপস্থ ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয় সমন্বিত হিন্দু অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। পুরাণে বলিতেছে বটে যে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি নিষেধ,[৫৫] কিন্তু তথাপি অধুনাতন কালে, প্রায়

৫৩ক। Arr. Ind. VIII. ৫৪। Peri. 30.

৫৫। সেই একই শাস্ত্রীয় বচনে, সমুদ্রযাত্রার ন্যায় অশ্বমেধও কলিযুগে নিষিদ্ধ। অথচ কিন্তু দেখা যায়, মুসলমানাক্রমণের অব্যবহিতপূর্ব্বে, কাণ্যকুব্জেশ্বর অশ্বমেধের

পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বেও, আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা নিজে জাহাজ চালনা করিয়া তমলুক হইতে লঙ্কা, লঙ্কা হইতে জাবা এবং তথা হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেছেন। যে জাহাজে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়াং জাবা হইতে চীনে গমন করেন, তাহা হিন্দুজাহাজ এবং তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পথিকও ছিল। ঐ জাহাজ একবার তুফানে পতিত হইলে,সেই ব্রাহ্মণেরা, ফাহিয়াং বিধর্ম্মী,সুতরাং তাহাকে অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ অনুমান করিয়া, তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে প্রস্তুত হয়; ফাহিয়াং দানপতি নামে একজন মুরুব্বীর অনুগ্রহে কেবল তাহাতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে,এখনও ব্রাহ্মণদিগের যদৃচ্ছা গমনাদি আচারে যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং বর্ত্তমানের ন্যায় সঙ্কীর্ণতা তখনও উপস্থিত হয় নাই। পারস্যদেশে হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিনা বাধায় যাতায়াত করিত;—পারস্যরাজ সভাসদ গ্রীকবৈদ্য ক্তিসিয়াস্‌ও অনেক হিন্দুর তথায় গমনাগমন দেখিতে পাইয়াছিলেন।[৫৭] হিরোদোতসের দ্বারাও ইহা উক্ত যে, পারস্যরাজের সৈন্যমধ্যে অনেক ভারতীয় সেনা ছিল।[৫৮]

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে হিন্দুরা আবশ্যকানুসারে যদৃচ্ছা বিদেশে গমন করিতেন এবং তাহাতে তাঁহাদের এখনকার ন্যায় জাতিচ্যুত হইতে হইত না। ফলতঃ

অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং সেই সূত্রে কাণ্যকুব্জেশ্বর ও পৃথুরাজের মধ্যে বিষম মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আর কিছু না হউক, এটা বেশ প্রমাণিত হয় যে. উক্ত নিষেধবিধি অতিশয় আধুনিক এবং প্রক্ষিপ্ত; নতুবা এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, কাণ্যকুব্জেশ্বরের সভায় শাস্ত্রজ্ঞ ছিল না, বা রাজা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। উক্ত নিষেধবিধি নারদীয় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ দুইটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত বিধি অনেক আছে এবং সে সকলের দ্বারা আচারপথে হিন্দুজাতির নানারূপেই পক্ষচ্ছেদ করা হইয়াছে।

৫৬। Beal's Budhist Records of the Western World V. 1 pp. XXXI.

৫৭। Kts. Fr. ৫৮। Hero. vii 65 and 86.

মুসলমান অধিকারের অব্যবহিতকাল পর্য্যন্ত, হিন্দুদিগের আচারে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। উচ্চ জাতিরা নিম্নস্থ জাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত। বিধবারা দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি করিত।[৫৯] উচ্চ জাতি নীচ জাতির অন্ন, স্থলবিশেষে গ্রহণ করিলে পতিত হইত না। মনুও এ সকল আচার-স্বাধীনতার পোষণ ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; তিনি অবস্থাবিশেষে আপন চাকরের অন্ন খাইতে বিধি দিয়াছেন এবং বৈশ্যজাতির পক্ষে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় সূপকার বৃত্তিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ সকলে উচ্চ নীচ জাতিভেদে, অন্নভেদ অতি কমই দেখা যায়;—ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের অন্ন খাইতেন[৬০] এবং গোপান্নভোজী কৃষ্ণবলরামকে ক্ষত্রিয় সমাজে উঠিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় নাই, ইত্যাদি। ভীম ও অর্জ্জুন রাক্ষস ও নাগকন্যা প্রভৃতি বিবাহ করিতেছেন এবং বিশেষ বিশেষ স্বয়ম্বরস্থলে, পণপূরণের দ্বারা যে কোন জাতি কন্যাগ্রহণের অনুমতি পাইতেছে। খৃষ্টীয় পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দির লিখিত নাটক মৃচ্ছকটিকে দেখা যায় যে, বেশ্যাকন্যা বসন্তসেনা স্বচ্ছন্দে ও অবিরোধে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের পত্নীত্বে গৃহীত হইয়াছে। মনুতে আছে বটে যে, কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশের অতীত স্থানে হিন্দুর থাকা নিষেধ; কিন্তু এ দিকে ত্রয়োদশ শতবর্ষ পূর্ব্বেও, চীন পরিব্রাজক হিয়াংসাং দেখিয়াছিলেন যে, তদ্রূপ দেশে এবং ভারতের সীমাতিরিক্ত স্থানে হিন্দুরা স্বচ্ছন্দে বসতবাস করিতেছে।[৬১] অতএব

৫৯। অদ্যাপিও উড়িষ্যাদেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে। তথায় জ্যেষ্ঠের বিধবা স্ত্রীকে কনিষ্ঠ স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিয়া থাকে। এজন্য বোধ হয়, উহার বিরুদ্ধবাদী আধুনিক বিধি যথাকালে উড়িয়াদের মধ্যে পৌছে নাই বা পৌছিয়াও স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই!

৬০। ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত স্বারস্বৎ ব্রাহ্মণেরা এখনও যজমানের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

৬১। Hiuen Tsiang—Si-yu-ki. Book I. মধ্য আসিয়াতে কুরুগ-ট্যাগ পর্ব্বতের নিকট কুচানামক প্রদেশ, কোহিস্তানের উত্তর কপিশা নামক প্রদেশ,

প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, এ উভয়ের বিরোধভঞ্জন ও মিলন করা বড়ই কঠিন। এজন্য কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুদের কি গমনাগমন, কি আহারব্যবহার, এ সকলেতে যথেষ্টই স্বাধীনতা ছিল এবং তাহার বিরুদ্ধবাদী বিধিনিষেধ যে সকল তাহা প্রায়ই আধুনিক এবং প্রক্ষিপ্ত।

হিন্দুর দূরদেশে গমনাগমনের পারগতা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। এক্ষণে হিন্দুর নিজের জাহাজ ছিল কি না তাহা দেখা যাউক। উপরে ফাহিয়াঙের স্বদেশগমন সম্বন্ধীয় ঘটনার উল্লেখে দেখান হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হিন্দু আপন জাহাজে তমলুক হইতে লঙ্কা, লঙ্কা হইতে যব (জাবা) ও বালীদ্বীপ, এবং তথা হইতে চীনে গমন করিত। ফাহিয়াং যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় দুই শত লোক ছিল, তদ্ব্যতীত তাহা যত দিন সমুদ্রে ছিল ও তাহার যেরূপ তুফানে পতিত হওয়ার বর্ণনা আছে, তাহাতে সে জাহাজকে সামান্য গঠনের এবং জাহাজচালনার কৌশলকে সামান্য ধরণের বলিয়া কোন মতেই বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও, হিয়াংসাং তমলুক হইতে উক্ত পথ সমুদায়ে, হিন্দু জাহাজ-গমনাগমের প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের পরিচয় যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ পেরিপ্লুসে লেখা আছে, ভারতীয়েরা জাহাজে করিয়া এডেনের বন্দর পর্য্যন্ত আসিত।[৬২] পুনশ্চ প্লীনির গ্রন্থে

কাবুল নদের উত্তরস্থ লামঘান প্রদেশ ও নগরহার বা জালালাবাদ প্রদেশ, ইত্যাদি ভারতবহির্ভূত স্থানে হিয়াংসাং কর্ত্তৃক হিন্দুজাতির বসতবাস দৃষ্ট হইয়াছিল। যে কাম্বোজবাসী মনুতে জাতিচ্যুত বলিয়া কথিত, সে কাম্বোজ ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা ভারতের অনেক নিকট,এবং সেখানেও হিয়াংসাং কর্ত্তৃক হিন্দুর অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যখন মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন আর ঐ সকল দেশ হিন্দু রহিল না।

৬২। Mc crindel's Peri PP 85.

উক্ত যে, ভারতীয় পশ্চিম সমুদ্রে জলদস্যুর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী থাকায়, ভারতীয় রাজারা তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা সমেত সমুদ্রে জাহাজ সকল প্রেরণ করিতেন। প্লীনি আরও বলেন যে, ভারতীয় জাহাজ সকল, ভারতীয় বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলস্থ বন্দর সকলে গমনাগমন করিত।[৬৩] অতঃপর আরও প্রাচীন পরিচয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, মিসরের রাজা প্তলেমী ফিলাডেল্‌ফোস্, ভারত ও মিসরের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলাচল সম্বন্ধে, আর্সিনোয়ের পরিবর্ত্তে মিওস্ হরমুজকে (বর্ত্তমান জিফাতান) বাণিজ্যবন্দর বলিয়া নিরূপণ করিতেছে। ঐ বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ে, ভারতে জাহাজনির্ম্মাণ-কারীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৬৪] আরও প্রাচীন পরিচয় অনুসন্ধান করিলে, রামায়ণ ও মনু এবং অবশেষে বেদের "নাবসামুদ্রীয়"[৬৫] প্রভৃতির উল্লেখে প্রাচীনকালীয় জাহাজযোগে সমুদ্রগমনাগমনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়।

সে যাহা হউক, ভারতীয় প্রাচীন সমুদ্রগমনাগমন যতই প্রমাণিত করা যাউক না কেন, বর্ত্তমান জাহাজী কালের তুলনায় তাহা যে অতি নগণ্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তথাপি, সেই অতি প্রাচীনকালে দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহ ভারতের জলপথে বাণিজ্য তাদৃশ বহুলতা-বিশিষ্ট না থাকিলেও, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য ভূভাগের তৎকালপরিচিত দূরতম দেশে পর্য্যন্ত, ভারতের ধনবত্তা ও গৌরব সর্ব্বদা ধ্বনিত হইত; এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্য দেশেই এরূপ নানা-প্রকার দ্রব্য সকল ব্যবহৃত হইত, যাহাদের জন্ম কেবল এক ভারতবর্ষেই সম্ভব এবং সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ষই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবে? ভারতের বিদেশগমন যথাযথ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীকদিগেরও সে প্রাচীন কালে তদ্বিষয়ে বিশেষ

৬৩। Pliny VI-XXVI. ৬৪। Arr. Ind. XII.

৬৫। ঋগ্বেদ ১।১১৬, ১।২৫, ৭।৮৮।

নিপুণতা দৃষ্ট হয় না। হোমারের সময়ে, লিবিয়া এবং মিসরদেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল; ইটালী একবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল; এমন কি, কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ হেসিওদের গ্রন্থে, সমুদ্রযাত্রা যেরূপ ভয়াবহ এবং জাহাজগঠন-প্রণালী যেরূপ কুৎসিৎ বলিয়া অনুমিত হয়;[৬৬] তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে, কি স্থলপথে কি জলপথে, গ্রীকদিগের গমনাগমন অতি সংকীর্ণই ছিল বলিতে হইবে। তথাপি, সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। ঐরূপ পুরাতন বাইবেল গ্রন্থের যবাধ্যায়ে বর্ণিত অফির দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রুদেশে আমদানী হইত, তাহাদের অবস্থাগত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমূলর বিবেচনা করেন যে, সে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে জাত এবং অফির দেশ সৌবীর দেশের নামের অপভ্রংশমাত্র।[৬৭] বাইবেল গ্রন্থের আর এক স্থলে[৬৮] টায়র নগরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনে জানা যায় যে, তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাসবস্ত্র এবং নানাবিধ সূচের কাজযুক্ত পট্টবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহাদের সকলেই যে ভারতে উৎপন্ন এমন নহে, কিন্তু সে সমস্ত যে ভারতবর্ষ ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য পূর্ব্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। এখন সেই সকল দ্রব্য যদি সত্য সত্যই পূর্ব্বদেশজ হয়, তবে সেই সূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্ব্বকাল হইতে এবং আমেরিকায় যতদিন পর্য্যন্ত তাহা আবাদ না হইয়াছিল তত দিন পর্য্যন্ত, কেবল ভারতবর্ষ হইতে যে আর সর্ব্বত্র নীত হইত, তৎপক্ষে বহুতর প্রতিপোষক প্রমাণাদি পাওয়া যায়।[৬৯] বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, সে নীলের সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে।

৬৬। Grote's Greece I-491.

৬৭। Max Muller's Science of Language, I-748.

৬৮। Ezekiel XXVII.

৬৯। উপরে যে সকল বাণিজ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ হইয়াছে, অন্ততঃ তাহাদের

টায়র নগরে নীত পূর্ব্বদেশজ বিবিধ দ্রব্য সম্বন্ধে পুরাতত্বজ্ঞ ইংরাজ বিন্‌সেণ্ট কহে যে, এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিল্পজাত পট্টবস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে;—যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, সেই

একটারও সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে, এতদ্বিষয়ক অনুমানের সত্যাসত্য কতদূর। নীলের কথা বলা যাউক। নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্‌মান বলেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে, আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল একা ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত; এবং উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good-Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ বাহির হওয়ার পূর্ব্বে উহা, ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহ, পারস্য উপসাগর হইয়া ও স্থলপথে ব্যাবিলন বা আরবদেশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত এবং তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইত। নীলের জন্মভূমি এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে উক্ত অধ্যাপক বলেন—"The proper country of this production is India; that is to say, Gudseherat or Gutscherad, and Cambaye or Cambaya, from which it seems to have been brought to Europe since the earliest periods. It is found mentioned, from time to time, in every century; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interruption." পুনশ্চ "I shall now prove what I have already asserted, that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India."—Johnston's Translation of Beckmann's History of Inventions and Discoveries, Vol. II. 260, 260. ঐ গ্রন্থে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই খৃষ্টের পরস্থ এবং অল্প অংশে পূর্ব্বস্থ এবং সে সমস্তই প্রায় অকাট্য। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ যত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেক্‌মান তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততদিন সে মত অখণ্ডনীয় এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সফল হইবেন, খণ্ডনে তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং এখনও তাহার উৎপাদকস্থানসমূহের মধ্যে ভারত যে নিতান্ত প্রধান, নীলের আমদানী ও রপ্তানীর বর্ত্তমানসাময়িক তালিকাতেও সে কথা কতকটা সমর্থন করিবে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson's Cyclopoedia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সভ্যতম দেশের নীলের খরচ এইরূপ দেওয়া আছে;—

সকল বস্তু ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, কাষেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত ;—সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত না। ইউফ্রেটিসতীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প-কৌশল বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না। ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে, ডিডন ও ইডুমিয়া নগর হইয়া আরবদেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্যস্রোতের মূলস্থান ভারতবর্ষ। পুরাতন বাইবেলের কোন স্থানে স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই; কিন্তু ঐ বাইবেলে, পূর্ব্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত বণিক্‌দিগের গতায়াত জন্য দূরগত বাণিজ্যপথের উল্লেখ আছে।[৭০] এক্ষণে এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায় যে, এই বণিক্‌গতায়াতের পথ নিঃসন্দেহ বহুপূর্ব্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল।

বাণিজ্যদ্রব্যের চলাচল সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিলে দেখিতে

বৃটনদ্বীপে	১১৫০০ বাক্স।
ফ্রান্সে	৮০০০ ঐ
জর্ম্মানি এবং ইউরোপের অপরাপর সমস্ত দেশে	১৩৫০০ ঐ
পারস্যে	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ নিজের	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেড ষ্টেট রাজ্যে	২০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশে	২০০০ ঐ
সমুদয়ে	৪৩২০০ ঐ

ইহার মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মান্দ্রাজ ও গোয়াটীমালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ উৎপন্ন ও রপ্তানী হইয়া থাকে। Page 385. art: Indigo.

৭০। "Murray's History of India" নামক পুস্তকে এই খবরের অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্ব্বক এ অংশ সঙ্কলিত হইল।

পাওয়া যায় যে, ভারতীয় মুক্তা অতি প্রাচীন কাল হইতেই গ্রীকভূমে নীত ও বিক্রীত হইত।[৭১] ভারতজাত চিনিও অতি প্রাচীনকাল হইতে গ্রীস ও রোমে নীত হইত এবং থিওফ্রাষ্টসের গ্রন্থে উহার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। পাথরের বাসন সকল ভারতবর্ষ হইতে রোম নগরে নীত হইয়া অতিশয় উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত।[৭২] বিদেশে রপ্তানী জন্য দ্রব্য কেবল যে ভারতের কোন এক স্থানবিশেষ হইতে,অথবা ইউরোপীয় ভূমির অপেক্ষাকৃত সন্নিকট ভারতের পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে প্রেরিত হইত,তাহা নহে; কারণ দেখা যায় যে,ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ বাঙ্গালাদেশ হইতেও, খস্‌খস্ এবং কার্পাসবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। [৭৩] পুনশ্চ, বাঙ্গালা দেশ হইতে "কলিত" নামে স্বর্ণমুদ্রারও রপ্তানী ছিল।[৭৪] চীনদেশের সঙ্গেও যে বাণিজ্যের চলাচল ছিল, তাহা ভারতভূমি হইতে পাশ্চাত্য ভূভাগে চীনদেশজাত চর্ম্মের রপ্তানীতে জানিতে পারা যায়।[৭৫] উপরে যে যে দ্রব্যের উল্লেখ করিলাম, অতি প্রাচীন-কাল হইতেই তাহাদের আমদানী ও রপ্তানী হইয়া আসিতেছে। অবশ্য, সেই প্রাচীন কালে যে আরও নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী চলিত, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু এক্ষণে সে সকলের নাম, লিপি অভাবে, বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে সকল দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত, তাহারা সংখ্যায় অনেক এবং আরব-সমুদ্র সম্বন্ধীয় পেরিপ্লুস্ গ্রন্থে তাহাদের লম্বা লম্বা তালিকা সকল দেওয়া আছে।

অতি প্রাচীন কালে, সামুদ্রিক বাণিজ্যপোত সকল কোন্ বিশেষ

৭১। Arr. Ind. VIII. ৭২। Pliny XXXIII 7 et. Seq.

৭৩। Peri. 48. 56. 63. রোমক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে কার্পাসশব্দেরই পরিষ্কার উল্লেখ আছে।—"Carpaso Indi Corpora "&c—Q. Curtius. VIII 9.

৭৪। "মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিবরতিজয়লেখং।"—জয়দেব। এই কলিত শব্দ কি সেই কলিত নামক স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ? কলিত শব্দে টীকাকারের ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যরূপ।

৭৫। Peri. 64.

বন্দর হইতে ভারত পরিত্যাগ করিয়া এবং সমুদ্রের কোন্ কোন্ অংশ দিয়া যে কোথায় গিয়া উপস্থিত হইত, তাহার আর কোনই নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ভারত, আরবদেশস্থ বর্ত্তমান এডেনের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং আফ্রিকার উপকূলস্থ বন্দর সকল, ইহাদের মধ্যে যে জাহাজ সকলের চলাচল হইত,ইহাই কেবল নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে,ঐ সকল স্থানের মধ্যে কোন্ কোন্ পথে যে জাহাজ চলাচল হইত, তাহা পেরিপ্লুস গ্রন্থে এরূপ নির্দ্দেশ করা রহিয়াছে;—ত্রিবিধ পথে সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। আরবের দিক হইতে নির্দ্দেশ করিতে হইলে; প্রথমতঃ, আরব, কার্ম্মান ও গিড্রোসিয়ার উপকূল বাহিয়া বরোচের বন্দরে আসিত; দ্বিতীয়তঃ, আরবের দক্ষিণ উপকূলস্থ আধুনিক ফার্টাকুই নামক অন্তরীপ এবং তৃতীয়তঃ, গার্ডাফিউ নামক অন্তরীপ হইতে যাত্রা করিয়া, সমুদ্র পাড়ী দিয়া মালাবার উপকূলস্থ মুসিরী ও নীলকুণ্ডা নামক বন্দরদ্বয়ে উপনীত হইত। প্রাচীনকালেও সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক পথে বাণিজ্যজাহাজ অধিকাংশ ভাগে যাতায়াত করিত এবং ভারতীয় জাহাজ সকল আরবীয় উপকূলমাত্রে আবদ্ধ না হইয়া, সকোট্রা প্রভৃতি দ্বীপ এবং মিসরীয় বন্দর সকলে গমনাগমন করিত। কারণ এরূপ গমনাগমন না থাকিলে, সকোট্রাতে ভারতীয় ও অপরাপর জাতির সাঙ্কর্য্যে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইত না; অথবা মিসররাজও মিওস্ হরমুজকে ভারতীয় বাণিজ্যের নিমিত্ত বাণিজ্যবন্দর বলিয়া নির্ণয় করিত না। প্রথমসংখ্যক পথে বোধ হয় ততটা চলাচল ছিল না; কারণ তাহা থাকিলে, নিয়ার্খোসের সমুদ্রযাত্রার পথ সকল যেন অনাবিষ্কৃতের ন্যায় নূতন বলিয়া বোধ হইবে কেন।[৭৬] পেরিপ্লুসে, ভারতীয় অন্তর্ব্বাণিজ্যের চলাচল সম্বন্ধে, ভারতস্থ অনেক বাণিজ্য-পথের তালিকা ও বর্ণনা দেওয়া আছে।

৭৬। প্রাচীন কালে বাণিজ্য জাহাজের চলাচল সম্বন্ধে "The Circumnavigation of the Erythraen" নামক প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জলপথে যে বাণিজ্য চলিত, তাহাতে জাহাজ-চলাচলের সীমা পর্য্যন্তই যেন ভারতীয় বণিকের গতায়াত-সীমা বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ইউরোপভূমে যে কখনও কখনও আমরা ভারতীয় বণিকের দেখা পাই, সে বোধ হয় যে কেবল স্থলপথ বাহিয়া যাহারা তথায় উপনীত হইত, তাহারাই। সমুদ্রপথে জাহাজ আরব বা আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছিলে, বাণিজ্যদ্রব্য সকল তথা হইতে স্থলপথে ভূমধ্য সাগরের বন্দর সকলে নীত হইয়া, ইউরোপের নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িত। এ দিকে স্থলপথ বাহিয়া যে বাণিজ্য চলিত, তাহার পথানুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতের পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া গান্ধার দেশ দিয়া পারস্যভূমে উপনীত হইত। পারস্য হইতে, গ্রীস এবং পারস্যের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলাচলের যে পথ ছিল, সেই পথ বাহিয়া বাণিজ্যদ্রব্য ইউরোপে যাইয়া পৌঁছিত। গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে প্রধান প্রধান বাণিজ্যস্থান, পাসগর্দা, পার্সিপোলিস, সুসা, ইপিসোস্, টায়র প্রভৃতি। অথবা সে প্রাচীনকালে বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা অনুসারে কতই যে বিভিন্ন বিভিন্ন পথ ও সহর অবলম্বিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, দ্রব্যাদি ভারত হইতে পশ্চিম মুখে পারস্যের ভিতর দিয়া ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ বন্দর সকল হইয়া, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিত এবং তথা হইতে সমুদ্রযোগে গ্রীসে যাইত।

কিন্তু ভারতীয়েরা স্বয়ং বিদেশগমনের দ্বারা বাণিজ্য নির্ব্বাহ করিলেও, ইউরোপভূমে এমন অনেক ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার ভারতীয় খ্যাতিলোপ হওয়ায়, প্রকৃত উহা কোন্ দেশজাত তাহা তথাকার লোকে বলিতে পারিত না। ভারতীয়েরা সর্ব্বদা নিজের দ্রব্য নিজ হস্তে বিক্রয় করিলে, এরূপ ঘটিবার কথা নহে। এতদ্দ্বারা এই বোধ হয় যে, গৃহসুখ ও জন্মভূমিভক্ত ভারতীয়েরা বিদেশে যাইতেন বটে, কিন্তু তত বেশী

পরিমাণে যাইতেন না, যতটা বিদেশীয়গণ ভারতে আসিয়া আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই চালাইত। ফলতঃ প্রাচীনকালীয় স্থলবাণিজ্যের আলোচনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূরব্যবধানস্থিত দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বণিজ্য করে না এবং হয় ত কেহ কাহাকে চিনেও না। এরূপ স্থলে ইহাই অনুমিত হয় যে, ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতিসমূহের দ্বারা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ব্যবসায়দ্রব্য নীত হইয়া দেশ-বিদেশে বিকীর্ণ হইত। অতি প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীকভূমে যদিও নানাবিধ ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ভারতীয় লোকের তথায় বড় একটা দেখা নাই; ঐরূপ ভারতেও আবার ঐ ঐ জাতির নাম কেহ শুনিয়াছে, কেহবা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী পহ্লব বা পারসিকগণ সর্ব্বদাই ভারতে গমনাগমন করিত এবং ভারতের অভ্যন্তরস্থ অনেক দূরদেশে পর্য্যন্ত যাইত। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন পারস্যবাসী ম্লেচ্ছেরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রোক্ত পরোক্ষস্থলবাণিজ্য সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, সেই পহ্লবজাতিরাই ভারতবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্য চালনায় প্রথম গ্রন্থি; তাহাদের হাত হইতে তদগ্রবর্ত্তী জাতি, তদগ্রবর্ত্তী হইতে তদগ্রবর্ত্তী, এইরূপ হাতপরম্পরায় দ্রব্যাদি ক্রমে দূর পাশ্চাত্যভূমে পৌঁছিত।

উপরে বলিয়াছি যে, ভারতীয়েরা যদিও ম্লেচ্ছদেশে গমন করিতেন বটে, কিন্তু ততটা নহে, যতটা ম্লেচ্ছগণ ভারতে আগমনের দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সত্য বটে তাহাতেও ধনবৃদ্ধি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই; কিন্তু কথা এই, বিদেশগমনে সর্ব্বদা স্বয়ং কৃতী হইলে যতদূর হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ লাভ ইহাতে অবশ্যই হইবে না। আডাম স্মিথ বলেন, যে, যখন বিদেশে দ্রব্যপ্রেরণ এবং বিদেশ হইতে দ্রব্যগ্রহণে স্বয়ং কৃতী হইতে না পারা যায়, তখন স্বদেশজাত বস্তু সকলের

অবথাভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্নে বিদেশে নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে; এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই নিয়ম হেতু প্রাচীন কাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ, স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্যবিমুখ হইলেও, বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, এই কারণেই,উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিমভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু এখন আর ভারতের ভাগ্যে সে কথা খাটে না। যাহাদের উৎপন্ন, তাহারা স্বহস্তে সেই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে এ কথা না খাটে, এমন নহে; কিন্তু যেথানে উৎপন্নকারক উদরান্নমাত্র লইয়া উৎপন্ন দ্রব্য মাথায় বহিয়া অপরকে দিতেছে, এবং যেথানে তাহাদের পরিবর্ত্তে বিদেশীয়গণ সেই সকল এখানেও বিক্রয় করিতেছে ও সেথানেও কিনিতেছে, সেথানে এ কথা কিরূপে খাটিবে? ঘরে ও বিদেশে উভয়তঃ বিদেশীয় হইলে,কাজেই লাভের অঙ্ক সমস্তই বিদেশীয়ের হস্তে গমন করিয়া থাকে। ভারতলক্ষ্মী এখন জলধিতলে, আবার যদি কখন সমুদ্রমন্থনের আয়োজন হয়, তবেই মঙ্গল। এখানে আমার রামা কৈবর্ত্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। বাঞ্ছারাম, শুন একটা গল্প করা যাউক।

একদা এক উদরান্নশূন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের চাকর রাখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। উমেদার রামা কৈবর্ত্ত উপস্থিত লইয়া বলিল, "ঠাকুর, তুমি নিজে খাইতে পাও না, তুমি চাকর রাখিবে কি দিয়া।"

ব্রা। "যা দিয়া হউক, বাপু, তোমার বেতন লইয়া কথা, তোমার বেতন পাইলেই ত হইল। তুমি চাকর হও, বেতন নির্ভাবনায় পাইবে; আর বাপু, আমি যাহা যাহা করিতে বলিব, তুমি চাকর যখন তখন তাহা বিনা আপত্তিতে করিবে।"

রা। "যে আজ্ঞে ঠাকুর, বেতন যদি ঠিক মত পাই, তবে না করিব কেন?"

ব্রাহ্মণের সঙ্গে রামার চুক্তি শেষ হইল। পরদিন রামা কার্য্যে

হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর কি করিতে হইবে।" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "বাপু, তোমাকে ভিক্ষায় যাইতে হইবে এবং ভিক্ষায় রোজ রোজ যাহা পাও তাহা আমাকে আনিয়া দিতে হইবে।" রাম তাহাই করিতে লাগিল।

ক্রমে ভিক্ষার চাউল অনেক জমা হইল এবং তাহার বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের টাকাও সংগ্রহ হইতে লাগিল অনেক ; সুতরাং রামারও নিয়মিত সময়ে বেতন পাওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইল না।

ব্রাহ্মণ ক্রমে বড় মানুষ হইয়া উঠিল ; এবং রামাও ক্রমে পুরাতন চাকর হইবায় নেমকহালালীর বৃদ্ধিতে, পূরা টানে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল।

ভিক্ষার পথ, বামনের চাকুরী স্বীকার করিলেও যেরূপ পরিষ্কার, না করিলেও সেইরূপ পরিষ্কার ; তথাপি জন্ম, কর্ম্ম ও বুদ্ধি গুণে রামার এমন সাহস নাই যে, স্বয়ং হইয়া ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়।

ভারতসন্তান ! আমাদিগের, আমাদিগের ব্যবসায়দারদের এবং পুঁজিপাটা দানে মুৎসুদ্দিগিরির জন্য উমেদার কলিকাতার পেটমোটা বাবুদিগের, অবিকল এই রামা কৈবর্ত্তের দশা। আমাদিগের পোড়া কপাল !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রীকদিগের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদির বিষয় বহু বিস্তারে এখানে আলোচনা করিব না, কারণ তাহাদের সেই সেই বিষয়ের আলোচনা শত শত রহিয়াছে। গ্রীকদিগের কৃষি বিষয়ে শিক্ষা হেসিওদের সময় হইতে বিধিবদ্ধ রূপে আরম্ভ হইয়াছে ; গ্রীকের শিল্প-স্থাপত্যাদি জগদ্বিখ্যাত, আজি পর্য্যন্ত নানা চিহ্ন দেদীপ্যমান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ; বাণিজ্য দিগন্তব্যাপী, বাণিজ্যার্থে স্বদেশের অসংখ্য লোক বিদেশে যাইতেছে এবং বিদেশের অসংখ্য লোক স্বদেশে আসিতেছে। ফলতঃ বাণিজ্যের উপরেই, গ্রীকদিগের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-উপযোগী দ্রব্যাদির প্রাপ্তি, প্রধানতঃ নির্ভর করিত। এই সকলের আবার গ্রীকদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে উন্নতি হইয়া

আসিয়াছে। ভারতে সে উন্নতি হয় নাই ; তথায় প্রায় যে কোন বিষয় একবার উদ্ভাবিত হওয়ার পর আর তাহার উন্নতি সাধিত হয় নাই,বরং উন্নতির পরিবর্ত্তে অনেক বিষয়ের অধোগতিই সাধিত হইয়াছে, যেমন সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি। হিন্দুচরিত্র যতদূর দেখিয়া আসা গেল, তাহাতে এইরূপই হইবার কথা। যে যে বিষয়ে লোকের বেশী আঁইট, তাহারই পর পর উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে ; আর যাহাতে তেমন আঁইট নাই এবং যদ্বিষয়ক অভাবও বৃদ্ধি না হইয়া স্থিরভাবে থাকে, তাহার উন্নতি চলিত আবশ্যক পূরণের অতিরিক্তে প্রায় যায় না। অতএব, সংসারসুখে বিরত এবং উদাসীন ভারতে যে সেই সেই বিষয়ের আর বিশেষ উন্নতি হয় নাই, বরং কালের গতিবশে তাহাদের যে অধোগতিই হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সন্ন্যাসভাবই এথানকার মানবীয় শ্রেষ্ঠ উন্নতি !

ভারতের সৌভাগ্য, সাধারণতঃ সাধারণের মধ্যে যে ব্যক্তি চতুর, কৌশলী এবং কর্ম্মশীল অথচ সুখাভিলাষী, তাহারই অঙ্কগত হইয়াছিল; এজন্য যেমন একদিকে সাধারণে দরিদ্রতা, তেমনি আর দিকে কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষে অসহ্য বিলাসের আড়ম্বর ঘটা। গ্রীসের চরিত্র সেরূপ নহে। গ্রীসের সৌভাগ্য এবং সৌভাগ্য-বৃদ্ধি কিরূপ সর্ব্বজনীন, তাহার একটি চিত্র প্রদর্শন করিব।—"যে জাতি বস্তুতঃ এত মহৎ; এবং বলিতে কি, যাহাদের আরব্ধ কার্য্য এরূপ বহ্বায়তন ; তাহাদের অন্যান্য বিষয়ে বাহ্যদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে কিন্তু, তাহার অনুরূপ কোনই বহ্বাড়ম্বর বা বিলাসযোগ্য অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের ব্যক্তিগত গৃহস্থলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের আহারীয়, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, বা গৃহস্থলীর যে কোন বিষয় বল, সমস্তই সাধারণ, আবশ্যকের অনতিরিক্ত, পরিমিত এবং সমস্তই পরিমিতাচারের পরিচায়ক। কিন্তু, যথনই আবার ইহাদের জাতীয় এবং রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তথন দেখিতে পাইবে যে, তাহা এতই সমৃদ্ধিশালী এবং জাঁকজমকযুক্ত যে তাহা

সর্ব্বতোভাবে দেশের গৌরববর্দ্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বারম্বার জয়লাভ, বিদেশাধিকার, ধনসম্পত্তি এবং আসিয়ামাইনরের লোক-দিগের সহ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, অসহ্য বিলাস, দুরাকাঙ্ক্ষা, বৃথা আড়ম্বর বা বৃথা জাঁক ইহাদিগকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেশ ভূষা দেখিলে, কে নাগরিক, কে দাস, এ চিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। বিপুলধনসম্পত্তিশালী ব্যক্তি বা দিগন্তজয়ী বীর সেনানায়কেরাও, স্বয়ং বাজার হাট করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না।"[৭৭] ইহা গ্রীকদিগের সৌভাগ্যসময়ের চিত্র,—অতি সুন্দর চিত্র; সাংসারিক সুখ এবং সৌভাগ্যের ইহা সদ্ব্যবহার। কিন্তু গ্রীকের অধঃপাতে যাইবার দিনে আর এ চিত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তখন স্বার্থ, জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ব্যক্তিগত আকার ধারণ করিয়াছিল।

৫। বিজ্ঞান সাহিত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় আনুষ্ঠানিক বিদ্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাস্ত্র অতি কমই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গ্রীকদিগের তাহা নহে। সেই দূরতম কালেও ইহারা যে সকল ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যাদির উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছে; আজি পর্য্যন্ত তাহা আলোচনা করিলে, আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে ইহারা যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, ইউরোপীয় এমন উজ্জ্বল আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি; এবং তাহাই ধরিয়া আজি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। আর ভারত? ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানের ফলে, আজি পর্য্যন্ত নবমীতে লাউ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ হয়; অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে মূর্খ হয়; ইত্যাদি উক্তপ্রকার বিধিনিষেধগুলি আজি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবুদ্ধিবিষয়ে ভট্টাচার্য্য

৭৭। Rollin's Ancient History, B. 10. C. 2, S. 5.

মহাশয়ের একমাত্র সম্বল!—উহাদের আণুবীক্ষণিক উপকার-অপকার দর্শাইয়া হিন্দুবৈজ্ঞানিকতার গৌরব উত্থাপন করিয়া থাকেন! আর চাই কি?

কিন্তু তাহা ছাড়িয়া উপপাদ্য বিদ্যাক্ষেত্রে নামিলে, আর সে নবমীতে লাউ খাওয়ার বন্দোবস্ত নহে। আবার তোমাকে আর্য্য-কীর্ত্তি ও আর্য্যবুদ্ধির অসাধারণ শক্তি দেখিয়া, আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হইবে। হোমার ও হেসিওদের সময়ে, যখন গ্রীকদিগের মধ্যে লিখন-প্রণালীরও উৎপত্তি হয় নাই, তখন এবং সে দূরতম কালেরও পূর্ব্বে, আর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি গগন স্পর্শ করিয়া ছুটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ এবং তদানুষঙ্গিক উচ্চশ্রেণীস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে, আর্য্যদিগের প্রাধান্য বারেক আলোচনা করিয়া দেখ। আয়ুর্ব্বেদ অংশতঃ আনুষ্ঠানিক বিদ্যা বটে; কিন্তু তথাপি উহার যে এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার কারণ শারীরিক স্বাস্থ্য লইয়া যেখানে কথা, সেখানে মানুষ-মাত্রেরই আনুষ্ঠানিক না হইলে চলে না। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এতদুল্লেখও অসঙ্গত নহে যে, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত, হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন হইতে পারিত না। ফলতঃ হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং এরূপ তীক্ষ্ণধী মন যাহাতেই সম্পূর্ণ ভাবে নিবেশিত হইবে, তাহাতেই অপার শ্রী এবং উন্নতি সাধিত হইবার কথা। আর্য্যবুদ্ধি কোন বিষয়ে অক্ষম ছিল না,যাহা ধরিবে তাহাই সাধন করিয়া তুলিবার উপযুক্ত ছিল; তথাপি যে বিষয়ভেদে ফলের তারতম্য ঘটিয়াছে, সে কেবল বিভিন্ন কারণাদিবশে চিত্ত নিবেশিত বা অনিবেশিত হওনের তারতম্যফলে। সে যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প দিনেই ইহাঁরা, অন্যত্র যাহা সম্ভব, তাহার অপেক্ষা বহুগুণে অতিরিক্ত ফল উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সূত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, পাশব ও উদ্ভিৎ তত্ত্বাদি খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উহারা এত প্রাচীন সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল যে, গ্রীকেরা হয়ত

তখনও পশুবৎ বনে বিচরণ করিয়া ফিরিত; অথবা মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা কর্জ্জ করিবে বলিয়া, তাহাদের মনে তখন তাহার অস্ফুট কল্পনামাত্র উদয় হইতেছিল। ভারতীয় এই আয়ুর্ব্বেদ ও ভৈষজ্যবিদ্যা, কালে আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত এবং অন্যান্য জাতি দ্বারা পরিগৃহীত হয়। গ্রাকভূমে ইহা একরূপ সর্ব্বাবয়বেই গৃহীত হইয়াছিল। যে দেশে যে যে রোগের উৎপত্তি, তাহার আরোগ্য-উপায়ও বিধাতা তদ্দেশে নিহিত করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের এই আয়ুর্ব্বেদ, হিন্দুর হীন দশা সহ মধ্যপথে ভগ্নপদ না হইয়া, যদি কালের সঙ্গে সমানপদে উন্নতিমুখে চলিয়া আসিত; তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে উপযোগিতায়, বোধ করি, আর যে কোন আয়ুর্ব্বেদ ইহার সমকক্ষতায় আসিতে পারিত না। হিন্দুচিত্তের যে কি অপরিমিত গভীর শক্তি, তাহার আর অধিক পরিচয় কি দিব,—কেবল ইহাই দেখিলে যথেষ্ট হইবে যে, এই আয়ুর্ব্বেদবিধানে সেই দূরতম কালেও যে সকল ঔষধতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, আজি পর্য্যন্ত তাহারা, নানা উন্নতিশীল নানাবিধ ও নানা শ্রেণীর আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা, বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইতেছে। আর তোমার রোমক, মিসরীয় ও গ্রীক আয়ুর্ব্বেদ? কবে তাহারা কালগর্ভে চিহ্নশূন্য হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে!

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতীয়েরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং জগতের প্রায় সকল জাতিকেই তাঁহারা গণিত শিক্ষা দিয়াছেন। যে জাতি ভাবুকতাপূর্ণ এবং কল্পনাপ্রিয় এবং চিত্ত যাহার নিয়ত নিসর্গসন্দর্শনে মুগ্ধ, তাহার নিকট জ্যোতিষ্কপিণ্ডপরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ অনন্তমূর্ত্তি আকাশ-পটের ন্যায় দর্শনীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? চিত্ত যে কোন পদার্থ আগ্রহাতিশয্যে দর্শন করিয়া থাকে, তাহারই তত্ত্ব উদ্ভাবনের নিমিত্ত গাঢ়তররূপে নিবিষ্ট হয়। পুনশ্চ, এ কথা যদি সত্য হয় যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহমণ্ডলীর বিস্ময়কর গতিবিধি এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ-দর্শনে আদি মানবের মনে যে বিস্ময়রসের উৎপাদন হয় এবং নিসর্গাতীত

শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতে কালক্রমে দেবতত্ত্ব প্রধানতঃ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই সকল চিত্তমোহকর পদার্থ দেবত্বব্যঞ্জক দেবপ্রতিমূর্ত্তিপদে বরিত হয় ; তাহা হইলে, স্বচ্ছলতাযুক্ত মানবচিত্ত যে আপন অবসরকালের কিয়দংশ, সেই সেই দেবতত্ত্ব ভেদ ও দেবত্বব্যঞ্জক দেবপ্রতিমূর্ত্তিগণের স্বভাব ও গতিবিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কালে যে যে দেশ স্বচ্ছলতাহেতু অতি অল্প দিনেই অবসর লাভ করিয়াছে, সেইখানেই মানবচিত্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের কোন না কোনরূপ চর্চ্চায় নিবিষ্ট হইয়া তাহাতে প্রতিপত্তি-লাভে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এ কারণে, প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনাস্থলে মিসর, ব্যাবিলন, চীন ও ভারতবর্ষের নাম যেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে, গ্রীস কি রোম কিম্বা তদ্রূপ অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের নাম সেরূপ গণনায় আসিবে না। ভাল, জ্যোতিষ বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, এ বিষয়ে কে, কোন্ কালে এবং কি প্রকার, সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এরূপ উক্ত যে, মিসর দেশে এতই প্রাচীন কালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশ রাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, মিসরীয়েরাই পাশ্চাত্যভূমে সর্ব্বপ্রথম সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে সাপ্তাহিক দিবস সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্বও তাহা-দিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়। ঐরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৬৯৭ বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংসির রাজত্বসময়ে,নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা অন্ততঃ এটা সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও ঐ তারিখ সন্দেহস্থলীয় হয় এবং ঐ

নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র ও সামান্য আকারের বলিয়া ধরা যায়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে, চীনেরা অতি প্রাচীন কালেই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্যাবিলনবাসী ও কাল্‌ডীয়াবাসীরাও, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-আলোচনায়, প্রাচীনত্বে ন্যূন নহে। তাহারাও বহু প্রাচীন কালে বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমণশীল, তাহাদিগের মধ্যে, সর্ব্বদা স্থানপরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হেতু দিক্ ও সময় নিরূপণ উপলক্ষে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা, অনেক অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত হইবার কথা; এবং বস্তুত পক্ষেও এই সূত্র হইতে প্রাচীনকালে সর্ব্বপ্রথম গ্রহ-নক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। এ কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ বন্য ও নিরক্ষর ভ্রমণশীল অবস্থায় আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত জ্যোতিষিক বিষয় সমস্ত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগের পর গ্রীকেরা অনাশ্রমী ভাবে যতকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয়দিগকে তাহার শতাংশের একাংশও ঘুরিতে হয় নাই; পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্কান্দিনেবীয়েরা আবার গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন স্থলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্কান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতিষিক জ্ঞানের উৎপাদন এবং উন্নতি ও বিস্তার সাধন হওয়া উচিত। কিন্তু কোথায়? ফলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্কান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষবিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিল না। গ্রীকদিগের মধ্যে, খৃষ্টের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে, জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও নগণিত ছিল। থেলিসের সময় উহা বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতে আরম্ভ হয়। কথিত আছে যে, থেলিস্ একটি সূর্য্যগ্রহণের আনুমানিক কাল গণনা করিয়া বলিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন। ঠিক কোন সময়ে হইবে ইহা বলিতে পারেন নাই, তবে অনুমান এই সময়ে হইবে ইহাই বলিয়াছিলেন। কথিত খৃঃ পূঃ সময়ের অব্যবহিত পর হইতে গ্রীকেরা মিসরীয় ও কাল্‌ডীয় জাতিদিগের নিকট হইতে জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং বলিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেই ইহারা তাৎকালিক গণনীয় জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষবিষয়ক প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা অতোলিক্ষ, সচল গোলক ও গ্রহগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে। তৎপরে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অরিস্তরিক্ষ এবং ইরতস্থিনিস্ ও আর্কিমিডিস্ জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয়দের প্রতি দেখ, তাঁহাদের ঋগ্বৈদিক গাথা সকল কোন্ দূরতম কালে প্রস্তুত ও গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই; অথচ তাহাতে জোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক এমন বহুতর গূঢ় ও সারতত্ত্বসমূহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে কোন কোনটার জ্ঞান অতি অল্প দিন হইল ইউরোপভূমে আবিষ্কৃত ও পরিচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোভিলীয় নবগ্রহশান্তিপরিশিষ্ট, অথর্ব্ববেদীয় নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্রগ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার, এবং ঋতুকেতুলক্ষণ, ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থ সকল সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্ব্বিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিত ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অবতরণ করিয়া, আর্য্যভট্ট ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।

ফলিত জ্যোতিষও সম্পূর্ণতঃ ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি কি না তাহা বলিতে পারি না; তবে এটা ঠিক যে ভারতে তাহার স্বাধীন উৎপত্তি এবং তাহাতে অপর কোন জাতির সাহায্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ইহার উৎপত্তি বৈদিক সময় হইতে ধরিতে হয়, কারণ তখন হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুভাশুভ তিথি নক্ষত্রাদি ভেদে যজ্ঞকার্য্য বিধেয় কি অবিধেয় তাহা নিরূপিত হইতেছে। যেখান হইতে

জ্যোতিষ্কগণের শুভাশুভ গুণ বিচারের আরম্ভ, সেইখান হইতেই ফলিত জ্যোতিষের উৎপত্তি ধরিতে পারা যায়। রামায়ণে রামের জন্ম-কোষ্ঠীই দেওয়া হইয়াছে এবং মহাভারতে আরও বিস্তার পূর্ব্বক,ফলাফল ভেদে অনেক প্রকার গ্রহযোগ বর্ণিত হইয়াছে। রাহুকেতুকে গ্রহমধ্যে গণিয়া, তাহাদের শুভাশুভকারকতা নির্দ্দেশ আধুনিক কালের কার্য্য; কারণ দেখা যায় যে, রামায়ণে রামের কোষ্ঠীতে রাহুকেতু একেবারে পরিত্যক্ত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও রাহুকেতুকে স্পষ্টতঃ গ্রহমধ্যে গণনা করে নাই; কিন্তু এ দিকে আবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মকোষ্ঠীতে রাহুকেতুকে গ্রহমধ্যে ধরিতে দেখা যায়। সে যাহা হউক, ফলিত জ্যোতিষের প্রাচীন কোন সংহিতা কিন্তু পাওয়া যায় না। যদিও বশিষ্ঠসংহিতা, পরাশরসংহিতা, ভৃগুসংহিতা, জৈমিনীসূত্র ইত্যাদি অনেক প্রাচীন-নামবিশিষ্ট সংহিতা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে গুলি দেখিবামাত্রই সহজে বোধ হয় যে, তাহারা বস্তুতঃ অতি আধুনিক গ্রন্থ। বর্ত্তমানে যে সকল প্রামাণিক ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে (উক্ত সংহিতাগুলিকে গণনাবহির্ভূত করিলে) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ যাহা তাহা বরাহমিহির কৃত। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বরাহমিহিরের সময় হইতে ১৪০০ শকের মধ্যে প্রাদুর্ভূত দৈবজ্ঞগণের দ্বারা বিরচিত।

আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমন হইতে, গ্রীক এবং মিসরীয় ফলিত জ্যোতিষের অনেকানেক বিষয় ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যেরূপ মুসলমানী জ্যোতিষ অবলম্বনে নীলকণ্ঠকৃত সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থ; সেইরূপ গ্রীক জ্যোতিষ হইতে যাহা সংগৃহীত, তাহা যবনসিদ্ধান্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আমাদের ফলিত গ্রন্থের নিজোক্তিতেই জানিতে পারা যায় যে, যবন এবং ময় ও মণিথ নামক ম্লেচ্ছ পণ্ডিত হইতে অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক ফলিত জ্যোতিষ হইতে অনেক শব্দ পর্য্যন্তও ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যথাঃ—হেলী, তাবুরী, লেয়, কেন্দ্র, দ্রেক্কাণ,

আপোক্লিম; পণফর; আকোকের ইত্যাদি। হিন্দু জ্যোতিষে গ্রহচক্রের দ্বাদশ গৃহে যে যে বিষয়ের ফলাফল নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, গ্রীক জ্যোতিষেও অল্প ইতর বিশেষে তাহাই করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক সময়ে এই ফলিত জ্যোতিষ পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল। এখন প্রায় সকল দেশ হইতেই তাহা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ভারতে এখনও তাহা লোপ হয় নাই; তাহার কারণ?—ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষ বহু পরিমাণে সত্যোদ্ভাসক সুকৌশল ও ভূয়োদর্শনের উপর স্থাপিত বলিয়া কি?

ভারতীয়দের জ্যোতির্ব্বিদ্যা সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধযুক্ত। কি প্রাচীন কালে, কি বর্ত্তমান কালে, ধর্ম্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ এতৎ-সাহায্যে নিরূপিত দিনক্ষণের উপর এরূপ নির্ভর করে যে, একের অভাবে অপরটি হইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র, এতদুভয়ের উৎপাদনমূল বহুলাংশে পৃথক্ হইলেও, প্রাকৃতিক-শক্তি-বিমোহিত প্রাচীন ভারতে উহারা অনতি-বিলম্বে এরূপ সংমিলিত হইয়াছিল, যেন একই বস্তুর উহারা দুই বিভিন্ন অংশদ্বয়রূপে প্রতীয়মান হইত। ভারতে যখনই জ্যোতিষবিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্যঠাকুরেরা তাহাকে বিজ্ঞান-বিষয়িণী জ্ঞানোন্নতি না বলিয়া, দেবপ্রসাদে যেন ধর্ম্মবিষয়ক একটি নূতন জ্ঞানলাভ হইল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ কেবল এই ধর্ম্মবোধের বশবর্ত্তী হইয়াই, ভারতে যত দিন উন্নতির কাল ছিল, ভারতসন্তানেরা ততদিন পর পর আরও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে রত হইয়াছিলেন। ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রথমে আরবদিগের কর্ত্তৃক দেশান্তরিত হয়; পরে কাল সহকারে উহা ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে;—অন্ততঃ লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরবর্ত্তী সময়ে যদিও সাহিত্যবিষয়ে ভারতীয়েরা অপরিমিত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; এবং এ পক্ষে তাঁহাদের সৃষ্ট বহুবিষয়, কালে যদিও অনেকের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল; তথাপি অতি প্রাচীনকালীয়

বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, কল্পনাবহুল ও প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল এক সেই জগদুজ্জ্বলকারক অতুলনীয় মহাকাব্য, অর্থাৎ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র আকারে, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যবিষয়ক স্বাতন্ত্র্য ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি রামায়ণে ধর্ম্ম এবং দেববিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে যে, কেবল আমরাই উহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বাতন্ত্র্যভাব নির্ব্বাচন করিলাম; নতুবা প্রগাঢ় গোঁড়ামী-সম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মাশ্রয়ী কোন ব্যক্তি কখনই তাহা করিবে না এবং অন্য কেহ করিলেও তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। উহা তাহাদের মনে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূরই প্রতীত যে, পুণ্যপ্রদ পবিত্র ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই কেবল উহাকে পাঠ ও সমাদর করিয়া থাকে; এবং তাহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, উহা পাঠ করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি এবং পুণ্যলোকে অবস্থান লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা রামায়ণকে কাব্য বলিয়াই ধরিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই রামায়ণ জগতের একখানি অতি অতুলনীয় মহাকাব্য, সর্ব্বত্র মহত্ত্ব এবং রসমাধুর্য্য ও রমণীয়তা ভাবে পরিপূর্ণ। এই কাব্যগ্রন্থ আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে এতই উচ্চে অবস্থান করে যে,তৎসম্বন্ধে ভাল কি মন্দ যাহাই বলিতে যাই না কেন, যেন তাহাতে কেমন একটু বাধ-বাধ ও লজ্জা-লজ্জা বোধ হয় এবং আপনাপনিই যেন ধৃষ্টতা বোধে কুণ্ঠিত হইতে হয়। ফলতঃ এই গ্রন্থ কাব্য-বিষয়ে চরমোৎকর্ষ। অতঃপর এই কাব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা অতি বিনীত ভাবে এবং আগে আদিকবি বাল্মীকির পদে বহু শত বার প্রণিপাতপূর্ব্বক।

বাহ্য ও অন্তঃপদার্থের যে সুসমাবেশভাব,তাহার মাধুর্য্য-সন্দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত ও চিত্ত বিকম্পিত হইলে, সেই মাধুর্য্য যখন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়,তাহা কাব্য। যে বিষয়ে কাব্য, সেই বিষয়ের উহা আদর্শ-আলেখ্য স্বরূপ। মাধুর্য্য অর্থে যে কেবল বাসন্ত দক্ষিণানিলের স্নিগ্ধ-স্পর্শ বা তথাবিধ

বস্তু, তাহা নহে; তমসাচ্ছন্ন নিশি, নিবিড় ঘনঘটা, বিদ্যুৎ, বজ্রাগ্নি বা কোন বীভৎস বস্তু, সকলেতেই এই মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। এ কথা শুনিয়া বাঞ্ছারামের ন্যায় পণ্ডিত হয় ত বলিবে যে মধু হইতে যখন মাধুর্য্য, তখন বীভৎস বা হিংসা প্রভৃতি ব্যাপারে, ভীষণ দৃশ্য বা কদর্য্য ঘটনাবলীর মধ্যে, মাধুর্য্যের সম্ভবতা কোথায়? কিন্তু বাঞ্ছারাম! জানিবে যে, চিত্ত যখন যে রসের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষাকে যাহা যাহা পূরণ করিয়া তৎস্থানে তদনুগামী অবশ্যম্ভাবী তৃপ্তির উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকেই সেই আকাক্ষিত বিষয়ের মাধুর্য্য বলা যায়। যদি ইংরেজী নাটককারের য়িয়াগোর খলচরিত্রপাঠে, তোমার মন কখন খলচরিত্রসম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হওয়ায় তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় যে সে দুরন্ত খলচরিত্রও মাধুর্য্যশূন্য নহে; বরং তথায় খলচরিত্রের পূর্ণ প্রতিভাসে, মাধুর্য্যগুণ সাধারণ পরিমাণের অতীত। চিত্তের বস্তুবোধ যখন বহির্জগৎ সংযোগে প্রতিভাসিত হইয়া স্বীয় স্বরূপতা প্রকাশে সক্ষম হয়, তখনই মাধুর্য্যের যথার্থতঃ সঞ্চার হইয়া থাকে। এই প্রতিভাসপূর্ণ স্বরূপতাভাব যত পরিস্ফুট ও যত পূর্ণভাবে প্রকটিত হইতে থাকে, বলা বাহুল্য যে, তথায় মাধুর্য্যও সেই পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন পূর্ণ এবং আদর্শস্থলীয় হয়। চিন্তা এবং কল্পনা-সাপেক্ষ বস্তুবোধ, যেরূপ যেরূপ পন্থা সকল অবলম্বনে বহির্জগৎ সহ সংযোজিত হয়, এবং চিত্ত যখন যে ভাবে আপ্লুত হইয়া তদীয় প্রতি-ভাসিত স্বরূপতা সম্বন্ধে দর্শনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; কাব্যও তখন সেইরূপ বৈচিত্রবহুল ও অনুরূপ মাধুর্য্যপ্রচুর এবং সেই সেই ভাবে পরিপূরিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, চিন্তা এবং কল্পনাদক্ষ ও ধর্ম্মভাবপরিপূরিত ভারত-ভূমিতে যে রামায়ণের ন্যায় সুন্দর চিত্রযুক্ত এবং দেবধর্ম্মসম্পন্ন, বিবিধ-বৈচিত্রশালী ও নানারসবিশিষ্ট মহাকাব্যের উৎপত্তি হইবে, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিলে বলা যায়। রামায়ণের সহ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে আর এক বিরাটমূর্ত্তিধর গ্রন্থ কখন কখন মহাকাব্যের গণনায় গণিত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য যে উহা মহাভারত। উহার বিষয় এখানে আর অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু উহাও যে কিরূপ স্বভাবের কাব্য, তাহা হিন্দুসন্তানমাত্রেই ক্ষণেক চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। যে প্রাচীনকালে রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে সময়ের অপর কোন শ্রেণীর কাব্য বা নাটক বা অপর কোন সাহিত্য পুস্তক কালের সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তবে প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে ঐ সকলের ক্ষণিক উল্লেখ সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহাদেরও তখন নিতান্ত অপ্রচার ছিল না। সে যাহা হউক, আমাদের হাতে অন্যান্য কাব্যাদি যাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা সে প্রাচীন কালের তুলনায় অতি অল্প দিনের। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ভারতীয় কাব্য নাটক ও প্রায় যাবতীয় সাহিত্য গ্রন্থ, প্রাচীনই হউক আর আধুনিকই হউক,সকলেই পুরাণাদি কোন না কোন ধর্ম্মপুস্তকের ঘটনা বিশেষ লইয়া নির্ম্মিত। যেখানে ইচ্ছানুরূপ পৌরাণিক ঘটনা না মিলিয়াছে, লেখক সেখানে অভাবপক্ষে পৌরাণিক ঘটনাবলীর অনুকরণে ঘটনা সকল কল্পনা করিয়া, আপনার অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

এক্ষণে একবার গ্রীকদিগের সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে দিব্য একখানি বড়বাজারের মণিহারীর দোকান সাজান রহিয়াছে; ইহাতে আছে অনেক বস্তু সন্দেহ নাই,কিন্তু ভিতরে কাহারও জন্য অনুসন্ধান করিতে হয় না; যাহা কিছু দেখাইবার ও দেখিবার, সকলই সম্মুখে থরে থরে সাজান আছে; সকলই দেখিতে চক্ মক্ ঝক্ মক্ করিয়া চক্ষু ঝল্সাইয়া দিতেছে, চটক-দৃশ্যে বাহিরের খরিদদার ভিতরে টানিয়া আনিতেছে, অথচ কিন্তু সকলেরই দাম কম। আর ভারতীয় সাহিত্য সংসার ?—উহা আমাদের দেশীয় অলঙ্কারব্যবসায়ী স্বর্ণকারের দোকান; নতুবা ঐ কালিঝুলি ছাইকয়লার মিশালে, বাঁকমল, পঁইচে, বাউটী, হাঁসুলি প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে কেন? মোটা-মোটা, ভারি ভারি, ঠসকশূন্য, চটকশূন্য, মণিহারীর দোকানের

শতাংশের এক অংশও ত নয়নরঞ্জক নহে! খরিদদার আপাততঃ দেখিবামাত্র হয়ত উপহাসে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু বাপু, তোমার আমার উহা নয়নরঞ্জন না করুক, তোমার আমার উহাতে দরকার নাই থাকুক; কিন্তু যে সোণার মর্ম্ম বুঝে, সে ঐ দোকান ভিন্ন সোণার তল্লাসে অন্য দোকানে যাইবে না। ঐ গহনাগুলি নমুনামাত্র, উহা দেখিয়া যদি কেহ দোকান চিনিয়া লয়, তখন তাহাকে কেমন খরিদদার তাহা বুঝিয়া তেমন তেমন গহনা সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া দেখান যাইবে। ভারত-সাহিত্যের ভাব এই যে, চিন্তনীয়কে অবলম্বন মাত্র করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত অনাবশ্যক বোধে, একেবারে অচিন্তনীয়তে লইয়া উপস্থিত করে; আর গ্রীকসাহিত্যের ভাব এই যে, যে চিন্তনীয় অপরের দ্বারা অনাবশ্যকবোধে বিনা দর্শনে পরিত্যক্ত, উহা সেই চিন্তনীয়কেই সর্ব্বাবয়বে সুদর্শন সুন্দর ও বৈচিত্রবহুলরূপে দেখাইয়া তৎপ্রতি তোমার মোহ উৎপাদন ও মনকে তাহাতে অনুক্ষণ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ভারতে রামায়ণ যে শ্রেণীর মহাকাব্য, গ্রীকভূমে হোমারের ইলিয়দও সেই শ্রেণীর মহাকাব্য। উভয়েরই মূল ঘটনা প্রায় এক ধরণের এবং উভয়েতেই কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া। উভয়েরই ভাব ও রসবৈচিত্র অপরিসীম। উভয়ই নবরসাধার, উভয়েতেই অপার ঐশ্বর্য্য-বিস্তার। এখন এ দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ, চিত্তে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। রামায়ণপাঠে, ক্রমান্বয়ে, বাসন্তী শোভা ও সাংসারিক সুখমাধুরীতে মোহিত হইলাম; সুখের দোলায় দুলিলাম; কিন্তু কোথায় তৃপ্তি? তৃপ্তির দেখা পাইতে না পাইতে অমনি হঠাৎ কে আবার এ দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত করিয়া স্নেহশৃঙ্খল ছিন্নে হৃদয় নির্য্যাতন করিতে দণ্ডায়মান? ক্রমে বিবাদের তুমুল তরঙ্গ, পরে হাহাকার, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে দারুণ দুঃখ-তরঙ্গে নিমগন।—কিন্তু সহসা একি শব্দ, এ রণশঙ্খ কোথায় বাজিতেছে! হৃদয় শব্দে শব্দে মাতিয়া উঠিল, তরে তরে শিরায় শোণিত বহিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল, হুঙ্কারধ্বনিতে দিক নিনাদিত; মার—মার,

ধর—ধর, রব!—"ভেদয় ভেদয়, ছেদয় ছেদয়, হন হন, দহ দহ, মারয় মারয়—" একি প্রলয়কাল উপস্থিত,না রুদ্রদেব মহারুদ্রমূর্ত্তিতে সংহার-শূল ধারণ করিয়াছেন? এ দিকে এ কে? বরাভয়খর্পরমুণ্ডহস্তা রণরঙ্গিণী উগ্রচণ্ডা!—কি প্রচণ্ড তাণ্ডব, প্রোৎক্ষিপ্তোৎক্ষিপ্ত দিগ্‌গজা বসুন্ধরা পদভরে ঘন টলটলায়মান! কাহারা পুনঃ ঐ অন্তকবদনে তাহাদের স্বগণ সহ দলে দলে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে,—ঐ ঐ! দেখিতে দেখিতে আবার ঐ দেখ, দেখিতে দেখিতে পলকপ্রমাণে সেই সকল কোথায় পলাইল, কোথায় সে রৌদ্র মূর্ত্তি—ছায়াবাজিপ্রায় কোথায় লুকাইয়া গেল। উহা লুকাইতেছে বটে,কিন্তু যেমন লুকাইতেছে,আবার ঐ দেখ, উহার পার্শ্বে ঐ স্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রবৎ ও কি উদয় হইতেছে?—আহা কি চিত্র, কি মধুর সুখচিত্র, কি মধুর সংসার-সুখচিত্র! কিন্তু হায়! উহার মাধুরীতে হৃদয় আপ্লুত হইতে না হইতেই আবার ঐ কালমেঘ কোথা হইতে আসিয়া সকল আবরিত করিয়া ফেলিল, স্বপ্নবৎ সে মোহন দৃশ্য সকল কোথায় লুকাইল, কি দারুণ তিমির-রাশি!—পতিদেবতা সীতা বনে? "রমা রসা সারমার," দিক শূন্য হইল, হৃদয় শূন্য হইল—কোথায় শান্তি! কোথায় শান্তি! এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মলীলার ত দেখিতেছি এই শেষ; তবে আর আমার এ শান্তি কোথায় মিলিবে, কোথায় এ শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবে,—বাঞ্ছারাম! বলিতে পার, কোথায় পূর্ণ হইবে?—সরযূনীরে? তাহাই হউক। তাই বলিতেছিলাম যে, রামায়ণ পড়িয়া নানা রসে নানা ভাব-তরঙ্গে দুলিলাম বটে, কিন্তু শেষে এমন অশান্তি জন্মাইয়া দিয়া গেল যে, শান্তির আশায় তখন টুকনি হাতে বনে যাইতে হয়।

এক্ষণে হোমারের ইলিয়দ-সংসারে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ। প্রবেশপথ দ্বারদেশেই সরক্ত খর্পরমুণ্ড ঝুলিতেছে; কিন্তু ভয় পাইও না, প্রবেশ কর। কে বলে ভয় পাইও না! সম্মুখেই এ কি, যুগান্তজ্বালাকর এ মহান্ কালাগ্নিকুণ্ড কোথা হইতে আসিল,—কঠোরকল্লোলে দারুণ প্রলয়াগ্নিবৎ দিগ্বিদিক মথিয়া লকলক্ জিহ্বায় যেন জগৎ গ্রাস

করিবার নিমিত্ত, আকাশ-লেলিহান লোহিত শিখায় ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে! কি দেখিতেছ? উহা প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নিকুণ্ড;—গ্রীসবাসিগণের দুরন্ত ক্রোধাগ্নি কালানলরূপে, দপ্ দপ্ করিয়া, গম গম্ শব্দে, তাপে উত্তাপে, যাহা স্পর্শ করিতেছে তাহাই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। উহা কি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ?—তাহা হইতেও উহা ভীষণতর! জন্মেজয়ের যজ্ঞে ইন্দ্র-সিংহাসনের আশ্রয়ে নাগরাজ তক্ষক পরিত্রাণ পাইয়াছিল, কিন্তু এ দারুণ যজ্ঞে সে পরিত্রাণেরও আশা নাই। বীরবর্গের উৎসাহবায়ুতে সমর-ইন্ধনে এ দারুণ অগ্নি নিরন্তর দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। হাস্য, বীভৎস অদ্ভুত, শান্তি, যে কোন রস সে অগ্নি সাম্য করিতে ঢালিয়া দিতেছে; তাহাতে কোথায় সাম্য? অগ্নি ক্ষণেক ম্লান হইতেছে যেমন, পরক্ষণেই পুনঃ রৌদ্র হইতে রৌদ্রতর ভাবে প্রজ্বলিত শিখায়, আকাশতল দহন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে। একা রুদ্রমূর্ত্তি সংহারশূল হস্তে দণ্ডায়মান; যে কোন মূর্ত্তি নিকটে আসিতেছে, তাহাই সে রুদ্রতেজে মিশিয়া রুদ্রশূলের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। ইলিয়দের রসমাধুর্য্য সর্ব্বত্র পূর্ণাবয়ব। কিন্তু এ প্রবল রৌদ্ররসের মধ্যে অপরাপর রসের সমাবেশ, ঠিক যেন সুষমা-কুসুম-কোমলা কামিনীগণ দুরন্ত শার্দ্দূলগুহায় নিক্ষিপ্তবৎ। রাবণকে সংহারার্থে মৃত্যুশর সঞ্চালনকালীন, সেই শরকে অব্যর্থ করিবার জন্য, তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে দেবতাবর্গের অধিষ্ঠান সাধন করা হইয়াছিল; ইলিয়দের দেববর্গ ও দেবশক্তির অবতারণাও তদ্রূপ। এই ইলিয়দ শিওরে করিয়া গ্রীকসন্তান জগজ্জেতা হইয়াছিল।—এই রামায়ণ শিওরে করিয়া ভারতসন্তান রামায়েৎ সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিতেছে!

যে কল্পনাশক্তি রামায়ণে নিরন্তর লৌকিককে অলৌকিকত্বে পরিণত করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই কল্পনাশক্তিই ইলিয়দে সর্ব্বদা অলৌকিককে লৌকিকত্বে আনিবার চেষ্টা পাইয়াছে। যদিও শেষোক্তের সে চেষ্টায় কোথাও ত্রুটি দেখা যায়, তাহা কল্পনা বা কবির দোষ নহে; লৌকিকের ন্যায় অলৌকিক সর্ব্বদাই আয়ত্তসাধ্য নহে

সেই জন্য। রামায়ণে লোকের রুচি অরুচির প্রতি বড় একটা বিশেষ খাতির নাই; কবির বাঞ্ছার সহিত সংমিলিত হইয়া কল্পনা যতদূর ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইলিয়দে তাহা নহে; সকলই সম্ভবের মধ্যে, সকলই সীমার ভিতর, এবং সর্ব্বত্রই লোক-রুচির সহ সামঞ্জস্য পক্ষে যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি পদে পদে। রামায়ণে নিহিত রত্নরাশি অমূল্য; কিন্তু গায় অনেক খনিজ আবরণ হেতু পূর্ণপ্রভ হইতে পারে নাই; পাণ্ডিত্য অদ্ভুত, কিন্তু যেন বিশ্ব আয়ত্ত করিতে হস্ত প্রসারিত, সুতরাং গাঁজাখুরীর আভাসও অনেক। ইলিয়দের রত্নরাশিও বহুমূল্য; যদিও রামায়ণের ন্যায় অমূল্য নহে বটে, কিন্তু এমন চাকৃচিক্যশালী যে তাহার কাছে অমূল্য রত্নও দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করে।—পাশ্চাত্যের পালিস চিরকালই চক্‌চকে; চিরকালই পাশ্চাত্যগণ পালিসসর্ব্বস্ব। পাণ্ডিত্যও অনেক, কিন্তু সীমান্তর্বর্ত্তী ও প্রকৃতি সহ সামঞ্জস্যযুক্ত, সুতরাং গাঁজাখুরীও কম। বাঞ্ছারাম! এখন জিজ্ঞাসিতে পার, রামায়ণ বড় কি ইলিয়দ বড়?—কেহই বড় নহে, কেহই ছোট নহে। আপন আপন ঘরে উহারা আপনি আপনার রাজা। যে যখন যাহার ঘরে প্রজাভাবে যাইবে, সেই তখন তাহাকে বড়ভাবে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, আমরা যাহা দেখিতে এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা ফেলিয়া অন্য কথায় সময় কাটাইতেছি। দেখ পুনর্ব্বার, ইলিয়দের অগ্নিকুণ্ডে কি দহিতেছে। ইলিয়দের বিংশ সর্গ বাহির কর। বহুতর রসপ্রক্ষেপ আহুতি স্বরূপে পরিণত হওয়ায়, অগ্নিকুণ্ড কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে! কেবল মানবীয় যুদ্ধে আর রণতৃষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে যুদ্ধার্থে দেবদল দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া মানব-সহযোগে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বার লক্ষবলি। আহুতি-পাতরূপে মহাসর্প সকল ধড়ফড় করিয়া, আসিয়া পড়িতেছে। বিশাল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া, সধূম অগ্নিশিখা, উন্মত্ত অট্টহাসের ন্যায় আলোকান্ধকারে গগন পরিব্যাপ্ত যুগান্ত-মূর্ত্তিবৎ সমুপস্থিত। আকাশে

অগ্নিবর্ষণ, ঘন বজ্রঘোষে দিগ্বলয় নিনাদিত, জীবজগৎ চমকিত, ভারভরে পৃথিবী টল্ মল্ করিয়া ঢুলিতেছে। সূর্য্যশশী কাল তিমিরে আচ্ছাদিত; থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির চমকবৎ কালাগ্নিশিখায় জগৎ আমূলতঃ ক্ষণে ক্ষণে লোহিতনীলাভায় আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। কি অদ্ভুত, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এইবার নাগরাজ তক্ষকের পতন,—ত্রয়-ভরসা হেক্তরের পতন হইবে। হেক্তর পড়িল। অভাবনীয় আহুতি লাভে, অভাবনীয় বল প্রাপ্তে, অগ্নিশিখা বিপুলবেগে ধাবমান হইল। স্বর্গে দেবদল, মর্ত্তে মানব, সকলেই সশঙ্কিত। কবি তখন সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায়—আত্মনাশের আশঙ্কায়—অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আন্দ্রমেকি, প্রিয়াম ও তৎপরিজনবর্গের করুণারস ঢালিতে লাগিলেন। অপরিমিত ভাবে ঢালিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু একবারে নির্ব্বাপিত হইল না। উপরে শীতল হইল, কিন্তু ভিতরে এখনও অগ্নি ধিকি ধিকি করিয়া আস্ফালন করিতেছে; একটু বাতাস পাইলেই ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। এখনও সেই চিতার মধ্য হইতে মার মার শব্দে হেক্তর ও পারক্লুসের আত্মা চীৎকার করিয়া, আপনাপন পক্ষকে প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। এখনও চীৎকার করিয়া সাবধান করিতেছে, দেখিও যেন গ্রীকসুন্দরী হেলেনা ও স্পার্টার রত্নরাশি হস্তান্তরিত হইতে না পায়। সুতরাং এ অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না, আবার জ্বলিয়া উঠিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। ইলিয়দও কিয়ৎকাল ধর্ম্মপুস্তকভাবে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের তুলনায় তাহা দুই মুহূর্ত্তের জন্য বলিলে হয়।

হোমারের পর আর্কিলোকুস হইতে পরবর্ত্তী সময়ের প্রায় সমস্ত কবি ও নাটককারগণের আর কেহই ধর্ম্মশাস্ত্র বা পৌরাণিক বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করে নাই। যদিও বা কেহ কোথায় দেবতাদিগের অবতারণা করিয়াছে, তাহা প্রায়ই দেবতাদিগকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যতে অধিক; এবং এই উপহাসের চূড়ান্তসীমা আরিষ্টফানিসের

গ্রন্থে সাধিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই সকল গ্রন্থকারের রচনা অধিকাংশই সামাজিক ও রাজনৈতিক; অথবা ব্যক্তিবিশেষের দোষাংশ হউক বা গুণাংশ হউক, তাহা লইয়া রচিত। যথায়ই দোষাংশ-বাহুল্যের অস্তিত্ব, তাহা কি রাজগৃহে কি অন্যত্র কি আপন ঘরে হউক, কোথাও কবির কটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইবার যো নাই। অর্কিলোকুসের প্রধান গ্রন্থ তাহার শ্বশুর লিকাম্বিসের বিপক্ষে। ঐ গ্রন্থ কটাক্ষ এবং ব্যঙ্গোক্তিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে, লিকাম্বিস তজ্জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রাজপুরুষ হইলেও যে কবির বাক্যবাণ হইতে নিস্তার নাই, তজ্জন্য কেবল আরিষ্টফানিসকৃত লিশিস্ত্রাতা নামক নাটকের নামমাত্র উল্লেখ করিলাম। এই আরিষ্টফানিসের বাক্যবাণ হইতে মানবগুরু সক্রেতিসেরও নিস্তার ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যসংসার বিলোড়ন করিলে, এতদ্রূপ শ্রেণীর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আধুনিক সংস্কৃতে থাকিলে থাকিতে পারে।

যে সকল গ্রীক-কবিদিগের নাম উপরে করা হইল, তাহারা যে সময়ে গ্রীকভূমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; তাহার সম-সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন, অপর কোন প্রকার সাহিত্য গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। যদি বলা যায় যে ছিল, তবে তাহা নিঃসন্দেহ লোপ হইয়াছে এবং আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই। ভারতীয় প্রভূত বিপ্লবরাশির মধ্যে লোপ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের নিম্নে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ মৃচ্ছকটিককে ধরিতে হয়। এই মৃচ্ছকটিক কথিত গ্রীক লেখকদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আধুনিক। উহা খৃষ্টের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এই গ্রন্থের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই, প্রধান উদ্দেশ্য প্রেমবর্ণনা;—গ্রীক-কবিদিগের সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনেক তফাত। সে যাহা হউক যদিও কথিত গ্রীক সাহিত্যগ্রন্থ সকলের ন্যায় সেকালের সাহিত্য গ্রন্থ বেশী পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অসীম প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ

বিবিধ বেদাঙ্গ ও তাহার ছায়াশ্রয়ী অপূর্ব্ব রত্নসমূহে পরিপূর্ণ অপরাপর-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ এত পাওয়া যায় যে, তাহাদের কি সংখ্যা, কি সারত্ব, এ সকলের তুলনে, গ্রীকের বিদ্যাগ্রন্থ সকল বহুলাংশে নগণিতের মধ্যে পড়িয়া যায়। গ্রীক বিদ্যাগ্রন্থ সকল সাধারণতঃ রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রা বিষয়ে; আর হিন্দুর বিদ্যাগ্রন্থ সকল সাধারণতঃ ধর্ম্মনীতি ও ব্যবহারনীতি বিষয়ে। এখানেও স্ব স্ব জাতীয় প্রকৃতির পরিচয়। যে কোন বিষয়ের সংশোধনে,—ব্যঙ্গোক্তি, রূপক; কটাক্ষ-পাত, দৃশ্যাভিনয় প্রভৃতি, সামাজিকসুখপ্রিয় গ্রীকের প্রধান অস্ত্র। তত্তৎ স্থলে, হিন্দুচরিত্র স্বতন্ত্র। হিন্দুর দৃক্‌পাতশূন্য নিষ্ঠা ও রুচি এমনিই কঠোর ও খরতর যে, তিনি যাহা কিছু সংশোধন করিতে চাহিবেন, তাহাই অনুশাসন—ধর্ম্মানুশাসন বাক্যে; ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি খোষ-পোষাকী উপায়ের ধার ধারিতেন না। বাঞ্ছারাম, খেদ করিও না; কেবল আলো চাউল আর কাঁচকলায় খোষপোষাক আসিবেই বা কোথা হইতে!

যে সকল বিদ্যা এবং বিজ্ঞান আনুষ্ঠানিক বা যাহার আশু ফল পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ, এরূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য, খণ্ড ভাবে ভারতে অনেকই উদ্ভাবিত এবং আবশ্যকতা অনুসারে নিয়োজিতও দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক সমজাতীয়-গণের পৃথক ভাবে শ্রেণীনির্ব্বাচন, ধারাবাহিকরূপে সংযোজন ও বিজ্ঞান-পদবীতে সংস্থাপন, ইহা কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই এক স্থানে বলা গিয়াছে যে, অন্যান্য বিষয়ানুসন্ধান উপলক্ষে ভারতে ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পাশবতত্ত্ব ইত্যাদি, যাহারা অধুনা উচ্চ-বিজ্ঞান শব্দে খ্যাত; তাহাদের বহুল তত্ত্ব, এমন কি গূঢ়তম সত্য পর্য্যন্ত, খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত ও কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও তাহাদের কেহ ধারাবাহিকরূপে শ্রেণীবদ্ধ বা বিভিন্ন শাস্ত্র-পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমনও ঘটিয়াছে যে, তত্তৎ শাস্ত্রাদিবিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের যে ফল, কার্য্যতঃ তল্লাভে ভারতীয়েরা হয়ত অনেক

সময়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা জিতিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাহা হইলেও, তজ্জন্য, গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়া, ভারতীয়দিগকে জয় দিতে পারা যায় না। কারণ, ভারতীয়েরা যখন যাহা লাভ করিতেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় এবং ভারতীয়েরা সে সকলকে বিধি-নিষেধাতীত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া একত্র করিতে জানিতেন না। ভারতীয়েরা সেই সকল বিষয়ে, কি কার্য্যকারণ পন্থাক্রমে কোন ফললাভ করিব এবং সেই ফল আমাদের কার্য্যে—কেবল উপস্থিত কার্য্যে নহে,—অন্য কার্য্যেও কতদূর আসিতে পারিবে, তৎপক্ষে এবং কেবল তাহারই নিমিত্ত, কখনও চেষ্টা বা চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের যাহা প্রিয় অনুসন্ধান ও প্রিয় আলোচনা, সেই বিষয়বিশেষ উপলক্ষে যদি অন্যবিধ কোন তত্ত্ব অভাবনীয় ভাবে উদয় হইল, ভালই ; কিন্তু তাহাকে যে আবার সুগ্রন্থনে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদবলম্বনে তজ্জাতীয় নূতন তত্ত্বের আশায় হস্ত-প্রসারণ এবং তৎসূত্রে এক নূতন বিদ্যাবিশেষের উদ্ভাবন করিব, সে অভ্যাস বড় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ইহারা যাহা কিছু তদ্রূপ তদ্রূপ জ্ঞান লাভ করিতেন, সে জ্ঞান যতই উচ্চ হউক, তাহা দৈব-প্রেরিতবৎ এবং তাহা খণ্ড ও বিস্তারশূন্য রূঢ়ি জ্ঞান। বলা বাহুল্য যে, অসাব্যস্ত সূত্র বা দৈবের উপর যে যে জ্ঞানের জন্য যাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সেই সেই জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা দুঃখী ও অসাব্যস্ত মানুষ পৃথিবীতে আর নাই। গ্রীক-জীবনে এরূপ নহে ; ক্রিয়াক্ষেত্রে কথিত বিষয়সমূহে যখন যে জ্ঞান নূতন লাভ করিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাজাইয়া এবং যথোপযুক্ত তাহার শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিজ্ঞানপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং তাহাকে আবার অবলম্বন করিয়া নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, এবম্প্রকারে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ব্বাচন সহ উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল শ্রেণীবদ্ধ আকারে পরিণত হওয়াতে ; তাহা পৃথক শাস্ত্ররূপে গণিত ও অধীত এবং কার্য্যকালে অনুসৃত

হইত এবং তজ্জন্য তত্তৎবিষয়ক যে কিছু সম্ভবপর উত্তর উন্নতি, গ্রীকেরা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক, জ্ঞানপূর্ব্বক এবং আত্মগণনার অভি- মতরূপ লাভে সমর্থ হইতে পারিত। অতএব গ্রীকদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত ও শ্রেণীবদ্ধ তত্ত্বসমূহ, কোন কোন অংশে অপেক্ষাকৃত সামান্য হইলেও, তাহা সাব্যস্ত এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া তত্তৎ বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল খণ্ডাকৃতি হেতু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে গ্রন্থনরজ্জুর অভাব হওয়ায়, তাহাদের অবলম্বনে যথাযোগ্য অগ্রপশ্চাৎ অবলোকন অথবা তাহাদের উপরে কোন প্রকার উন্নতি-বীজ বপন করিতে পারা যায় না। এমন স্থলে হিন্দুদিগের মধ্যে সেই সকল খণ্ড তত্ত্ব থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান; এবং জগতের প্রয়োজন অনুরূপ ধরিতে গেলে, একেবারে ছিল না বলিলেই চলে। হিন্দুদের বোধ অনুরূপ যতদূর হইলে উপস্থিত জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারে, হিন্দুরা তাহাই ধারাবাহিকরূপে সাধন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যে জাতির জগতের প্রতি বৈরাগ্য এত যে, পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপ্রতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে; সে জাতির মধ্যে যে এ সকল লৌকিক বিদ্যা বা বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আশ্যকতা রাখে না। পুরাণে এই লোমশ মুনির ইতিহাস বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, ইহার সর্ব্বাঙ্গ মেষবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটি করিয়া খসিত। এই হিসাবে একটি একটি করিয়া খসিতে খসিতে সমস্ত অঙ্গ যে দিন একেবারে নির্লোম হইবে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যুদিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ হিসাবে তাঁহার আয়ু ব্রহ্মার অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি এই ঋষি, কেন যে আপনার আশ্রমকুটীরের উপরি জলবায়ুনিবারক আচ্ছাদন দিবেন, এবং এই অল্প কয়দিনের জন্য তাহার আবশ্যকতাই বা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ফলতঃ ভারতীয়দিগের ভূ-বিদ্যার ধারাবাহিক জ্ঞান, স্বর্ণচূড় সুমেরু, কনকপদ্মশোভিত মানসসরোবর, লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি প্রভৃতি সমুদ্র, ত্রিকোণময়ী পৃথিবী, ইত্যাদিতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যায় জ্ঞান—বাসুকীর মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথা ঝাড়াতেই ভূ-কম্পনের উপস্থিতি হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি—কোন গাছ ব্রাহ্মণ, কোন গাছ চণ্ডাল, কোন গাছ পুরুষ, কোন গাছ স্ত্রী, এবম্ভূত বিভাগবোধ। পাশবতত্ত্ববিদ্যা—আত্মার কর্ম্মসূত্রবশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্ত্যর্থে চৌরাশী লক্ষ যোনির সৃষ্টি, ইত্যাদি। কিন্তু এক কথা। হিন্দুরা চিরকাল আত্মদেশমধ্যে আবদ্ধ-প্রায়, গ্রীকের তুলনায় অপারাপর দেশীয় লোকের সহিত সংস্রবে অল্পই আসিয়াছিল বলিতে হয়; অন্য দিকে গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে অপরিমিতভাবে অপরাপর দেশীয়দিগের সংস্রবে আসিয়াছিল। সুতরাং ইহারা একই বিষয়ে পাঁচদেশীয় পাঁচরূপ বুদ্ধির সঙ্কলনে এবং তাহার সহিত নিজবুদ্ধির সামঞ্জস্যসাধনে, বিষয়বিশেষ লইয়া যে ভারতকে অনেক অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কারণ একে সেই সেই বিষয় হয়ত হিন্দুদিগের প্রকৃতিযুজ্য নহে, তাহাতে আবার বাহ্য সাহায্য তাহাতে কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু আবার যে যে বিষয়, গ্রীক এবং হিন্দু উভয়েরই প্রকৃতি কর্তৃক সর্ব্বাংশে অনুমোদিত, এবং যাহা উভয়কেই বিনা সাহায্যে অনুসরণ করিতে হইয়াছে, তথায় একবার সেই অনুসৃত বিষয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ, কে কতদূর দৌড় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে; তাহা হইলে মনীষা-চালনায় কে কতটা উচ্চতর, তাহা স্পষ্টতঃ জানিতে পারিবে। তেমন স্থলে ভারতকে ঊর্দ্ধে ভিন্ন নিম্নে দেখিতে পাইবে না।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আনুষ্ঠানিক বিদ্যাদিতে হিন্দুরা বিশেষ কিছুই উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। ব্যবহারগ্রন্থাদি ধর্ম্মবিষয়ক অতিনীতিবহুল। সাহিত্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে পরিপুষ্ট ও অতি উচ্চ। কৃষি, বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা, শিল্প

প্রভৃতি বিদ্যার ভারতে আবশ্যক অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু ইহারাও সর্ব্বাংশে অনুষ্ঠানপ্রধান বিষয় হওয়াতে এবং উপপাদ্য জ্ঞানের সান্নিধ্যে ইহারা বহুলাংশে প্রকৃতিবিভিন্নতাযুক্ত থাকাতে, ইহাদের যতদূর উন্নতি সাময়িক জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে হইতে পারে তাহা হয় নাই। অতিদূরতম কালেও, কৃষি, সমুদ্রযাত্রা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীকভূমে যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং লোকের শিক্ষার্থে তাহা যেরূপ ও যতটা যত্ন এবং সাবধানতার সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভারতসন্তান, যে সময়ে তুমি কৃষ্ণসার মৃগের অবিচরিত দেশ অনার্য্যনিবাস ভাবিয়া, পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে ঘনীভূত হইয়া বসিতেছ ; সেই একই সময়ে, দূরবিচরণকারী গ্রীকসন্তান তোমার সেই গঙ্গারই তট হইতে ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া, গৃহ এবং গৃহলক্ষ্মীকে সজ্জিত ও ইহলৌকিক সুখের চূড়ান্ত করিয়া তুলিতেছে। তোমার তাহা দেখিয়া ধিক্কার বোধ হইত না ! তখনও কি তোমার গৃহলক্ষ্মীগণ আদরিণী হইয়া সম্মার্জ্জনী ধরিতে শিখিয়াছিলেন ? তুমি কি তখনও রাগ হইলে ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিতে ?

ইতি পঞ্চম প্রস্তাব।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

লোকনীতি।

১। নীতিবিচার।

প্লেটো হইতে রুষো পর্য্যন্ত, যুগে যুগে উদ্ভূত খ্যাতনামাবর্গ, কি জানি কি সূত্র ধরিয়া, বিশ্বাস করিতেন যে, যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও তর্কাদিযোগে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা বা তথাবিধ বিষয় সকল স্থাপিত হইয়া থাকে; লোকসমাজ ও লোকনীতিও সেইরূপ প্রকরণে স্থাপিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। হইত, তাহা না হয় সম্ভবপরও ছিল, তদ্রূপ স্থাপিত লোকনীতি দ্বারা লোকযাত্রাও বর্দ্ধিত ও পরিচালিত হইতে পারিত এবং আমরাও তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিতাম না; কিন্তু এক কথা, যদি তাবৎ লোক প্লেটো বা রুষো হইত! দুর্ভাগ্যক্রমে এ জগতে তাবৎ লোক প্লেটো হইয়াও কখন জন্মায় না, বা রুষো হইয়াও কখন জন্মায় না। এ অবনী যেমন অনন্তবহুলা, মানবপ্রকৃতিও তেমনি অনন্তবহুল; সুতরাং কে একা-প্রকৃতি তোমার বা একা-প্রকৃতি আমার তর্কপ্রসূত আড়্গড়ার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লোপ করিতে স্বীকৃত হইবে; এবং একা-প্রকৃতি তুমি আমিই বা কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারি যে, মৎকৃত রজ্জুতে অনন্ত প্রকৃতি আবদ্ধ করিয়া মম বুদ্ধি-অনুরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্ব্বক তাহাদিগকে চালাইতে সমর্থ হইব? বিশেষতঃ আমাতে যে দিব্য আত্মা, অন্যেতেও সেই দিব্য আত্মা বিরাজ করিতেছে; সমান সমান সম্বন্ধ; তখন কেন অন্যে মৎকৃত সূত্রে বিনত হইয়া আবদ্ধ হইতে যাইবে? কোন মানব তাহা হয়ও না। শিষ্য অবশ্য গুরুর নিকট আবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সে ওরূপ আবদ্ধ নহে; গুরুকৃতপাশে নহে, গুরু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার জন্যও নহে; গুরুতে

যে জ্ঞানালোকটুকু আছে তাহাই মাত্র লাভ করিবার জন্য। যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এ বিশ্বে কেবল একটিমাত্র সূত্র আছে যাহাতে সকলেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সর্ব্ব প্রকারে আবদ্ধ হয় এবং সাত্বিক প্রকৃতির লোক হইলে আবার ভক্তি-ব্যাকুলতায় আবদ্ধ হয়; সে সূত্র তাহা, যাহাতে সকলেরই উৎপত্তি। কিন্তু এ সূত্র যেমন একদিকে একতায় সম্বদ্ধ করে, তেমনি অন্য দিকে কিছুমাত্র বহুত্বের বিলোপ করে না। তোমার মনুষ্যকৃত সূত্রের ধর্ম্ম তাহা নহে; একা-প্রকৃতি হইতে উৎপত্তি হেতু একমুখী একতাই উহার সম্বল, অতএব কেন বা কেমন করিয়া উহাতে বহুত্বপূর্ণ লোকনীতি আবদ্ধ হইবে? হয়ও নাই কখন! সুতরাং আমরাও এখানে, যে লোকনীতি সূত্র কেবল বচনে মাত্র স্থিত, কার্য্যে কখনও আনীত হয় নাই, তাহা লইয়া আর বাক্‌বিতণ্ডায় অধিক সময় অপব্যয় করিব না। যাহা লোকপ্রকৃতি অনুরূপ স্বতঃ হইতেছে ও হইবে, এ এক নীতি; আর যাহা তর্কফলে এরূপ হইলে ভাল হয়, সে এক নীতি; এ দুয়েতে অনেক তফাত। প্রথমোক্ত নীতিই স্বাভাবিক, যেহেতু তাহা স্বতঃ প্রকৃতি-উৎপন্ন বিষয়ের সততা স্বচ্ছন্দতা ও পরিচ্ছিন্নতা সংসাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয়; তদতিরিক্তে যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর খ্যাতনামা আছে, যাহাদের বিশ্বাস—"তোমার উপর যেরূপ কৃত হইতে অভিলাষ কর, অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিও"—এই নীতিই লোকনীতির মূল এবং উহার উপর নির্ভর করিয়াই সাধারণ লোকযাত্রাবিধান নির্ম্মিত হইয়াছে। এ নীতিতে, অঙ্কশাস্ত্রের আর সমস্ত ফেলিয়া দিয়া, কেবল এক জমা খরচের বিপুল প্রয়োজন দৃষ্ট হয়;—যেমন দেবে তেমনি পাবে, যেমন পাবে তেমনি দেবে। কিন্তু ইহা হইলে, এ জগতে আর নিঃস্বার্থ মহত্বের অস্তিত্ব এবং আবশ্যকতা থাকে না; কারণ মহত্বের এখানে অবলম্বন-স্থল কোথায়?—অবলম্বন ব্যতীত কোন পদার্থ এ স্থূল জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। আত্মসুখ ও স্বার্থ যখন জীবনের উদ্দেশ্য, তখন

কেন আমি পরের জন্য প্রতিদানের অতিরিক্ত খাটিয়া মরি? হয় ত এরূপ স্থলে বলিবে, মহত্ত্বের দরকার নাই! তাহা যেন হইল, কিন্তু তথাচ আমরা দেখিতেছি, মহত্ত্বের কৃপা ও করুণা ব্যতীত এ জগৎ ত একদিনও চলে না। সুতরাং কাজেই বলিতে হইবে যে, কথিত লোকনীতির মূল অলীক এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব উহা লইয়া সময় অপব্যয় করিবার আবশ্যক নাই।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, লোক যে যেমন অবস্থায় পতিত, তাহার লোকযাত্রাবিধানও সেইরূপ। যে কথা লোকবিশেষে প্রযুক্ত, জাতিবিশেষ এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। যে যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, তাহার লোকযাত্রাবিধান ও লোকনীতিও সেই কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী হইবার জন্য, সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং যে জাতি যেরূপ, তাহার নীতিমার্গ তদনুসারী এবং তাহার কর্ম্মপ্রবাহও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। সমগ্র মানব এক-প্রকৃতি, তাহার উপর আবার বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকৃতি; আবার জাতির মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন মানব ভেদে আরও বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। এ বিশ্বপ্রপঞ্চের এক মুখে একত্ব, আর মুখে বহুত্ব; উহা তাহারই পরিচায়ক ও অভিনয় মাত্র। ঐশ্বরিক একই কার্য্যবিশেষ এবং তাহার পুনঃ পর্য্যায় অংশ, কলা প্রভৃতি সাধনের নিমিত্ত, মানব-সৃষ্টিতে একত্বের উপর এরূপ প্রকৃতি-বিভিন্নতা সৃষ্ট। এই নিমিত্ত মানবসাধারণ, জাতিবিশেষ, সমাজবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষে, এরূপ সাধারণ এবং বিশেষ ভেদ অনুসারে, এ জগতে যেমন মূলনীতির একতা, সেইরূপ বিশেষ নীতির বিভিন্নতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গারাম, দেখ এখানে, একত্ব এবং বহুত্বে কেমন চমৎকার সুসমাবেশ এবং কেমন চমৎকার সুসংমিলন! এখন বুঝিলে, লোকনীতি কেবল আমাদের মনের কল্পনা বা কেবল আমাদের যুক্তি-সম্ভূত প্রয়োজন হইতে উৎপন্ন হয় নাই; উহাও সর্ব্বস্বরূপ মহা উৎস হইতে নিঃসৃত; উহাও সেই ঐশ্বরিক প্রয়োজনবশে

উৎপন্ন, মানবের উহাতে কোন হাত নাই। উহাও কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্রবশে উদ্ভূত ; আমাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইবার বিষয় নহে ;—তবে মানব সহ সম্বন্ধযুক্ত অপরাপর বিষয়ের ন্যায়, সংস্কার প্রাপ্ত হইবার বিষয় বটে।

যে কিছু আচার ও অনুষ্ঠান সমূহ মানবকে ইহলোকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ; তত্তাবতের উন্নতি বা অবনতি,ঔৎকর্ষ বা অপকর্ষতা-প্রাপ্তি,মানবীয় আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত বা অবনত,উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই লোকনীতিও সে নিয়মের বহি-র্ভূত নহে। কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, যখনকার আধ্যাত্মিক জীবন যেরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাবযুক্ত ; তখনকার লোকনীতিও সেইরূপ ঔৎকর্ষ বা অপকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন যখন যে পর্য্যায়ে আছে, লোকনীতি যদি সে সময়ে নিম্ন পর্য্যায়ের দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, আধ্যাত্মিক জীবন তাহাকে সংস্কৃত ও স্বানুরূপ করিয়া লইয়া, নিজ পর্য্যায়ে উঠাইয়া লইবে ; অথবা লোক-নীতি যদি উচ্চতর পর্য্যায়ের দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ তাহার অপকর্ষতা সাধনপূর্ব্বক আপন পর্য্যায়ে নামাইয়া লইবে। অতএব লোক-নীতির উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে,কেবল বহিঃসংস্কার অবলম্বনে কোন ফল হয় না ; সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসংস্কার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনই প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। পুনশ্চ, লোকনীতির পবিত্রতা বা দুষ্টভাব, সুরুচির বা কুরুচির ভাব, ন্যূন বা অতিরেক ভাব, কর্ম্মক্ষম বা কর্ম্মধ্বংসী ভাব, উহাও আধ্যাত্মিক জীবনের তত্তৎ অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ফলতঃ আধ্যাত্মিক জীবনকেই প্রকৃতপক্ষে ও সর্ব্বতোভাবে লোকনীতির নিয়ামক ও সংস্কারক বলা যায়। আরও দেখ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের প্রবর্ত্তনা ; অথবা কর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের প্রকট সংসারলীলা স্বরূপ। লোকনীতি যখন আধ্যাত্মিক মূল সেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনকে অবশ্য অনুসরণ করে, তখন কাজেই ইহা স্থির যে উহা কর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনেরও অনুরূপ, অনুকূল ও পরিপোষক

স্বরূপ হয়। অতএব লোকনীতিও সম্পূর্ণরূপে, কি অধ্যাত্ম কি অধিভূত অথবা কি ধর্ম্ম কি কর্ম্ম, উভয় সম্বন্ধে জাতীয় উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

উপরে লোকনীতির ঔৎকর্ষ ও অপকর্ষতার কথা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়া লোকনীতির আর একটি অবস্থা আছে যাহাকে ব্যতিক্রম বলা যায়। প্রাকৃতিক উন্নতিপথে আধ্যাত্মিক জীবন, উন্নত বা অবনত, যখন যেমন পর্য্যায়ে; তাহার উপর নির্ভর হেতু, লোকনীতির প্রোক্ত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাব, উভয়ই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যতিক্রম যাহা, তাহা উহা হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহা অস্বাভাবিক; তাহা কি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, উভয়বিধ লোকনীতিতেই ঘটনা হইতে পারে। প্রথমটিতে সাত্ত্বিকতার অস্তিত্ব ও ক্রীড়া অসম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অসম্ভব। নীতিপালকের অসৎ বুদ্ধিবশে নীতিমূল বিকৃত হইলে, নীতিতে বিকৃতি জন্য এবং তাহাতে সাত্ত্বিকতার অভাব হেতু ব্যতিক্রম ঘটনা হয়। ব্যতিক্রম জন্য পাপোৎপত্তি হয়।

লোকনীতির নিয়ামক যাহা, উপরে তাহা যথাযথ দেখিয়া আসিলাম; এক্ষণে সেই লোকনীতির প্রবর্ত্তক যাহা যাহা, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। আমাদের সমধিক নিকট সম্বন্ধ, যাহা যাহা প্রবর্ত্তক ও মূল সূত্র, তাহাদের সঙ্গে; কারণ তাহাদের যথাভাবে স্থিতি বা বিকৃতির উপর আমাদের পুণ্য বা পাপের সঞ্চার, অথবা অন্য কথায় কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয়বিধ শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। যে লোকনীতি সাত্ত্বিকতাপূর্ণ, যাহার কার্য্যফল প্রকৃতি অনুকূলে, সুতরাং এ সংসারে যাহা হিতকরী এবং যাহার সেই কার্য্যফল ভূতকালকে পদস্থাপক করিয়া ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত শুভদায়করূপে প্রসারিত হয় এবং যাহা অপর ভাবী সুকার্য্য ও কার্য্যফলের ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে; তাহার একমাত্র মূল, পূর্ণ ধর্ম্মপ্রাণতাপ্রসূত সদ্বুদ্ধি এবং ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্ম-নিয়োজন বোধ অর্থাৎ যাহাকে ঈশ্বর সকাশে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলিয়া বলা যায়। এতদ্ভিন্ন আর যে কোন প্রকারের নীতি ও তাহার

কার্য্যফল, তাহা সমাজাদিষ্ট কর্ম্মনিয়োজন বোধ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত মূল যতক্ষণ সুভাবে এবং সর্ব্বসামঞ্জস্যক্ষম উদার বুদ্ধিতে দৃঢ় ধৃত হয়, ততক্ষণ কোন মতে ব্যতিক্রম ঘটনার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত মূলে সর্ব্বদাই ব্যতিক্রম ঘটনার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়োক্ত মূল হইতেই প্রধানতঃ পাপতাপের উৎপত্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অধঃপতন সৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রথমোক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরকৃত নিয়োজনবোধরূপী যে নীতিমূল, বলা বাহুল্য যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সৎ ও মহৎ, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়। ইহার মূল স্থানে দিব্য স্বার্থ; ইহারই শাসনে কেবল, মানুষ সাত্ত্বিকভাবে আত্মপ্রকৃতিবান্ হইতে পারে। দিব্য স্বার্থ তাহাকে বলা যায়, যাহা পার্থিব স্বার্থকে দূরে ফেলিয়া, কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা সমাজহিত ও ঈশ্বরপ্রীতিমাত্র খুঁজিয়া থাকে এবং এরূপ খোঁজে যে কিছু ফলাফল বা শুভাশুভ, তাহাই যাহার লক্ষ্যস্থলীয় হয়। তাহার যে কিছু অনুষ্ঠান তাহা বিষ্ণুপ্রীতিকামে কৃত হয়। অতএব মনুষ্য ইহার শাসনে নীতিবান্ হইয়া থাকে এই ভাবিয়া যে, 'আমার এ নীতি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট; যে কার্য্যরাশি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমার কর্ম্মভূমিতে আগতি, ইহা তাহারই নিয়ামক এবং প্রবর্ত্তক; ইহার সুপালন বা কুপালনের উপর আমার ভাবী জীবন ও জীবনের সার্থকতা যাহাতে সেই কর্ম্মপ্রবাহ এবং তদূর্দ্ধে আমার ঈশ্বরের রোষ বা তোষ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব যথাজ্ঞান কেবল এক কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনুসারে চলিব এবং তাহাতে লোকের কথা বা রোষতোষে কিছুমাত্র বিচলিত বা চঞ্চলপদ হইব না।' ফলতঃ, লোক বা সমাজ অনেক সময়েই অন্ধ, কখনও ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় করিয়া থাকে এবং যখন এ জগতে সৎ বা অসৎ এমন লোকই দেখিতে পাই না যে, সমাজমধ্যে যাহার শত্রু এবং মিত্র উভয়ই নাই; তখন এরূপ অন্ধ ও বুদ্ধিবিকল্পবিশিষ্ট যে লোক বা সমাজ, তাহার সুখ্যাতি বা অখ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফল কি? সমাজের সঙ্গে কেবল জীবনান্ত পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, কিন্তু

আদিষ্ট কার্য্য যাহার তাহার সহ সম্বন্ধ অনন্ত। পুনশ্চ, কর্ত্তব্যসাধনে জীবনান্ত যথায় পণ এবং জীবনই যখন তদুদ্দেশে, তখন সমাজের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি দৃষ্টে রতি বা বিরতির বিষয় কি হইতে পারে?

ফলতঃ যাহা ঈশ্বর সকাশে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত ও অবধারিত, ডাহিনে বামে না তাকাইয়া অক্লিষ্টচিত্তে তাহা সম্পাদন করিয়া যাইবে; তাহাতে সমাজ অনুকূল বা প্রতিকূল যাহাই হউক, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হইতে পারে, সমাজ এখন তোমার প্রতিকূল; কিন্তু যখন তোমার কার্য্য সমাজের হিতকারিরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে এবং যখন সমাজ তোমার কার্য্য ও কার্য্যমূল বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারিবে, তখন সমাজের সঙ্গে তোমার আপনা হইতেই মিলন হইয়া যাইবে। সাত্ত্বিক নীতিপ্রসূত সাত্ত্বিক কার্য্য সহ আখেরে সমাজের এইরূপ মিলনই ঘটনা হইয়া থাকে, কখনও তাহাতে ব্যতিক্রম হয় না। ওরূপ মিলনের জন্য কিছুমাত্র যত্ন বা চিন্তা করিতে হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা আপনা হইতেই ঘটনা হইয়া থাকে। সুপথ সর্ব্বদাই সহজ, তাহাতে চিন্তা কৌশল বা কূটকচাল কিছু নাই;— সে সকল বিপরীত পথের সম্পত্তি। পুনশ্চ, ব্যক্তিবিশেষ যেরূপ, সেই-রূপ সমাজও যখন কর্ত্তব্যবুদ্ধিযুক্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়, তখন সমাজস্থ-গণের পরস্পরের মধ্যেও আর অমিল ঘটনা হয় না; তখন পরস্পরের কার্য্য, পরস্পরের সহায়তাসাধক হওয়াতে, অতি মহৎ সামাজিক কার্য্য সকলের উৎপাদন করিয়া থাকে। সমাজস্থগণ, অন্ততঃ তাহাদের অধি-কাংশভাগ, সুনীতিসম্পন্ন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেই, সমাজকে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত বলা যায়।

এই জগৎ যাহাদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত স্থায়িভাবে উপকৃত হইয়া আসিয়াছে, সে সমস্ত মহাপুরুষেরই নীতি এবং কর্ম্মমূল এই ঈশ্বরকৃত নিয়োজন-বোধ। ফলতঃ যেমন মহৎ বা মহত্তর হউক, এই নীতিমূলের অবলম্বন ব্যতীত, কখনও তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। এ পথের পথবাহকদিগের মধ্যে উচ্চতম আদর্শ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি। মানব-

মণ্ডলীতে ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ আজি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজকৃত নিয়োজনবোধ। ইহার মূলস্থানে পার্থিব স্বার্থ। এই স্বার্থের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ. ক্রিয়াভেদে, এ পথ দ্বিবিধ ভাগে বিভাজিত হয়। এ দুয়ের মধ্যে স্বার্থের পরোক্ষ ক্রিয়াপথই শ্রেষ্ঠ। পরোক্ষ স্বার্থের অধীনে, মানুষ এরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মপ্রবৃত্ত হয়,—'সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যতীত, আমার ও আমার নিজজনের উন্নতি কখনও পূর্ণ ও স্থায়ী হইতে পারে না; অতএব সামাজিক মঙ্গলসাধনের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করা বিধেয়। সামাজিক মঙ্গল সাধিত হইলে, আমারও যে কিছু মঙ্গল সাধ্য, তাহা সম্ভবপর, সুসাধিত ও বদ্ধমূল হইতে পারিবে।' পুনশ্চ, "যদি তোমার আপনাতে হিত বাঞ্ছা থাকে, তবে যথাসাধ্য পরহিতসাধনে ব্রতী হও" এবং "যেরূপ আপনাতে কৃত হইতে বাঞ্ছা কর, সেইরূপ অন্যের প্রতি করিও",—এ কথাগুলির প্রভুত্বও এখানে বিপুল। যদিও গণনায় গুরুতর নহে, কিন্তু সামাজিক কার্য্য-প্রবৃত্তির আরও একটি সূত্র আছে;—কতকগুলি লোক আছে, যাহাদের প্রধান সুখ নিজ নিজ মতের প্রকাশে ও প্রশ্রয়ে; এখন সে উদ্দেশ্য, সামাজিক কার্য্যে লিপ্ত না হইলে, পূর্ণভাবে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই মতামতপ্রিয় লোকেরাই সাধারণতঃ সমাজের নেতা হইবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে তাহাদিগকে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতে দেখা যায়।

সে যাহা হউক, এই পরোক্ষ স্বার্থমূলক নিয়োজনে অনুষ্ঠান ও যত্ন এতদুভয়ে আন্তরিকতার অভাব না হইলেও, মূলস্থানে সাত্ত্বিকতার পরিবর্ত্তে রাজসিক বুদ্ধির প্রাবল্য হেতু, কর্ম্মধারণা যতই বিস্তৃত ও বিপুল হউক না কেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যক্ষম হইতে পারে না। রাজসিকতার বাহ্য চাকচিক্যে যদিও তাহা আপাততঃ সম্পূর্ণ ও পরিণামদর্শিত্বপূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণামদর্শিত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং এরূপ কর্ম্মধারণা,

ফলেও সর্ব্বদা সুফল প্রসব করে না; প্রত্যুত অধিক বাড়াবাড়িতে, সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, তথাপি এ মূলোৎপন্ন নীতি ও কার্য্য একেবারে বিফলে যায় না। এ নীতিমূল প্রথমোক্ত নীতিমূলের নিম্নপর্য্যায়ে। বেশী বাড়াবাড়ি না করিলে, এ মূল ধরিয়াও একরূপ মন্দ চলে না।

কিন্তু অপরোক্ষ স্বার্থ অতি ভয়ানক পদার্থ। প্রথমোক্ত মূলের লক্ষণ, সাত্ত্বিকতা, ঈশ্বরপ্রীতি ও দিব্য স্বার্থ বা চলিত কথায় নিঃস্বার্থ ভাব; দ্বিতীয়োক্ত মূলের প্রথম বিভাগ অর্থাৎ পরোক্ষ স্বার্থমূলকতার লক্ষণ, রাজসিকতা, সমাজপ্রীতি ও উচ্চ সাংসারিক স্বার্থ; আর দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ অপরোক্ষ স্বার্থমূলকতার লক্ষণ, তামসিকতা, পাঁচজনপ্রীতি ও নীচ সাংসারিক স্বার্থ বা চলিত কথায় যাহাকে আত্মম্ভরিতা বলা যায়। এই তুলনা দ্বারা এখন বুঝিতে পারিবে যে, অপরোক্ষ স্বার্থমূলক নীতি কিরূপ নীচ, কেমন ভয়ানক ও কতটা দুষ্টপথাবলম্বী হইবার কথা। অপরোক্ষ স্বার্থমূলকতা অনুসারে আত্মস্বার্থই সর্ব্বস্ব, সামাজিক বা আর যে কোন স্বার্থ তাহার নিকট তুচ্ছানুতুচ্ছের মধ্যে গণ্য হয়। এতদনুসারে মানুষ আত্মাতীতে দৃষ্টিশূন্য; এজন্য অন্যের হানি করিয়া, অন্যের লুটপাট করিয়া যদি নিজের ভাল করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। পাঁচজনের হানি হয় হউক, সমাজ ও লোক সকল উড়িয়া পুড়িয়া যায় যাউক, আমার তাহাতে কি?—আমার ভাল হইলেই যথেষ্ট! সকলে কমিয়া যাউক আমি বৃদ্ধি পাই, সকলে ছোট হউক আমি বড় হই, ইহাই এ পথের প্রার্থনা; সুতরাং সমাজের হিত ত দূরের কথা, প্রকারান্তরে সমাজের অহিতই অন্তরের নিভৃত বাসনায় পরিণত হয়। এ পথে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকে না; জাতীয় বা সামাজিক সহানুভূতি থাকে না; চক্ষুলজ্জা মমতা এবং আনুরক্তি, এ সকলও পরিত্যক্ত হয় এবং পরমাত্মীয়ও পরমাত্মীয়ের শত্রুতা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজে, কেবল নিজে কেমন করিয়া বাড়িব, কেমন করিয়া সুখে থাকিব, ইহাই একমাত্র জীবনের অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য

হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু হায়! কার্য্যে তাহার কিছুই ঘটে না; সে সকল বাসনার কিছুই পূরে না; অধিকন্তু পরস্পরের শত্রুতায় পরস্পর অধঃপাতে যায় এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও অধঃপাতে যাইতে হয়। লোক সকল এমনই অন্ধ হইয়া পড়ে যে এ সামান্য জ্ঞানটুকুও তখন অনুভবে আইসে না যে, দশজন লইয়া যেখানে সমাজ,সেখানে দশজনই যদি পরস্পর এরূপ নীতির অনুসরণ করে, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে প্রত্যেকের শত্রু নয়জন; সেইরূপ অন্য দিকে, দশজনই যদি পরস্পরের হিত চেষ্টা পায়, তাহা হইলে প্রত্যেকের হিতকারী দাঁড়ায় নয়জন; ফলও সুতরাং পরস্পরের শত্রুতা ও মিত্রতা ভেদে অনুরূপ ঘটনা হয়। যাহার নয়জন শত্রু, সে নিজের সহস্র ভাল চেষ্টা সত্ত্বেও, কেননা দশ জনের সঙ্গে সমান অধঃপাতে যাইবে?[১]

১। এই সূত্রে একটা কৌতুককর ঘটনার কথা মনে হইল; তাহা প্রকৃত এবং তাহা ঘটনা হইয়াছিল কোন এক পল্লিগ্রামবিশেষে। গ্রামটি সামান্য এবং কথিত অপরোক্ষ স্বার্থ যতদূর জঘন্য পদবীতে নামিতে পারে, তথায় তাহা নামিয়াছিল। লোক সমস্তই নিঃস্ব, কিন্তু ভাত না হউক, তথাপি দুধের প্রয়োজনটা যেন কিছু বেশী; এজন্য প্রায় সকলেরই একটি বা একাধিক গাইগরু ছিল। এখন বেশী দুধের আশায়, গরুটি যাহাতে খাইয়া খুব পুষ্ট হয় এই অভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই রাত্রে লুকাইয়া গরু ছাড়িয়া দিত, উদ্দেশ্য—মাঠ হইতে লোকের ফসল খাইয়া আইসে। প্রত্যেকেই প্রতিদিন এইরূপ করিত; অথচ প্রত্যেকেই ভাবিত, "আমি যে কৌশল খেলিতেছি, অন্যে তাহা জানে না।" কিন্তু শেষে জানিল সকলে এবং ফলও হইল এই, যে, সেই প্রত্যেক কৌশলী ব্যক্তিকে সে বৎসর নিজ নিজ ফসল বড় একটা আর ঘরে উঠাইয়া আনিতে হয় নাই। আরও ফল,—আগামী বর্ষে কাহারও কাহারও চাষ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গেল এবং অন্য স্থানের চাষী যে দুই একজন তাহাদের মধ্যে ছিল, তাহারা সে মাঠের জমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল; এ দিকে আবার সুতরাং, জমির খাজনার উপর যাহাদের নির্ভর, তাহারাও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু হায়! তথাপি তথায় গরু ছাড়ার পক্ষে আশু চৈতন্য হইতে দেখি নাই। কিন্তু বাঙ্গারাম, মনে করিও না যে, কেবল এই গরিব গ্রাম একাই নিন্দার ভাগী। তাহা নহে। বাঙ্গলাদেশের প্রায় সকল গ্রাম ও সকল লোকাচার কারবারেই ওরূপ ঘটনার এখন প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়!

এই অপরোক্ষ স্বার্থমূলক সামাজিক নিয়োজনকে প্রোক্ত নামে না ডাকিয়া, উহাকে শয়তানী বা মহাপ্রলয়-নিয়োজন বলিয়া ডাকিলেই সঙ্গত হয়। এই শয়তানী তৃতীয় মূল, জাতীয় জীবনের অধঃপতন অবস্থা, বা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর পরিগ্রহের প্রাক্‌কালে, অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সময়টি তদ্রূপ অধঃপাতিত জাতীয় জীবনের পক্ষে কলিযুগ স্বরূপ। এ সময়ে ধর্ম্ম যথার্থতই ভগ্ন-ত্রিপদ, পয়স্বিনী বসুন্ধরা খিদ্যমানা, দেবদল নিদ্রিত; একমাত্র পাপাশয় কলি সমস্ত জগৎ মথিত করিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। উর্দ্ধ-অধঃ-পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে মানবের স-আশ-দৃষ্টিস্থলে একমাত্র শূন্যপাত। প্রতি সহচর তখন মেফিষ্টফিলির অবতার। ফষ্টকে ভ্রমপাতিত করিতে এক মেফিষ্টফিলিতে রক্ষা ছিল না; কিন্তু এখানে প্রতি সামান্যপ্রাণ মানবকে ঘূর্ণাচক্রে ফেলিতে, শত শত মেফিষ্টফিলি নিয়তঃ দণ্ডায়মান। এ সময়ে দেবগুরুর প্রতি ভক্তি হ্রাস হয়; মানব সকল পরস্পর সমক্ষে জ্যেষ্ঠত্ব অবলম্বন করে; সর্ব্বপরিচালক জ্ঞান, সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়ায়; আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং অবলম্বন মানবের কোন বিষয়েতেই থাকে না; সুতরাং সমাজমধ্যে সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত সুপরিচালকের অভাব সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। এ সময়ের বুদ্ধিপরিচালক স্থলে, একমাত্র বঙ্গসন্তানের চির-প্রসিদ্ধ "পাঁচজন" আসিয়া দাঁড়ায়; লোকে একক কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিতে অস্বীকৃত, অথচ "পাচ জনের" অনুমোদন বা অননুমোদনের দাসানুদাস। কিন্তু সেই দাসানুদাস ভাব কি সর্ব্বান্তরীণ ভাবে, তাহা নহে;—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনে পাঁচজনকে ভুলাইব, অথচ তাহারা সুখ্যাতি করিবে! সুখ্যাতির কার্য্য নাই, অথচ সুখ্যাতির বাসনা অনেক! লোক সকলও প্রয়োজনানুরূপ সুখ্যাতি বা অখ্যাতি বর্ষণ করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, তাহাও অনুরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শী। সেই "পাঁচজনের" নিকট বাহিরে আত্মপ্রকৃতির বলিদান; ভিতরে পুনঃ জ্যেষ্ঠত্ব এবং আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ; ইহাই সে কালে পরম পুরুষার্থরূপে স্থিরীকৃত হয়। বাহ্যদর্শনে "পাঁচজনের" যাহা রুচিকর

তাহা কর্ত্তব্য, যাহা অরুচিকর তাহা অকর্ত্তব্য; অথচ এ বিবেচনাশূন্য যে, তাহারই মত সারবান ব্যক্তি সকল লইয়া "প্যাচজন" গঠিত হইয়াছে। ফলতঃ এ সংসারে যাহারা অপাত্র এবং অখ্যাতির কারণশীল, তাহারাই সুখ্যাতির জন্য বেশী লালায়িত হয়; এমন কি অর্থযোগেও সুখ্যাতিক্রয়ে তাহাদের ত্রুটি হয় না। কালধর্ম্মে সকলেরই নীতি এখন কণ্ঠগত এবং বচনে মাত্র পরিচিত, সুতরাং দূরদর্শনশূন্য; পুনশ্চ, যে অন্তর্দ্দর্শন দূরদর্শনের নিদান, তাহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত এখন অবিশ্বাস! দর্শন অভাবে মানব অন্ধ; অন্ধ প্রায়ই খানা ডোবায় পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে।

আরও দেখ, এ সংসারে মানুষের প্রতি মানুষের যত কিছু ক্রূরাচরণ এবং সমাজমধ্যে যে কিছু সামাজিক অবনতি ও অধঃপতন, তাহাও এই তৃতীয় মূলক নীতি হইতে সংঘটিত হয়। ইহার প্রভাবে মানুষের শত্রু মানুষ এবং মানুষ পুনঃ মানুষের যেরূপ ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর শত্রু হইতে পারে, সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর শত্রুতা তাহার সঙ্গে তুলনাতেই আইসে না। পশ্বাদি শত্রুতা করে প্রাকৃতিক বুদ্ধিবশে, সুতরাং একই প্রকার ও প্রকরণে; কিন্তু মানুষে নিজবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির অস্তিত্ব হেতু, মানুষ শত্রু হইতে মানুষ যে ক্লেশ ও যন্ত্রণা পায় তাহা তরবতর ও অদ্ভুত, অসহনীয় ও অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতের শূল; মুসলমানের জীবিতের ত্বগুন্মোচন, জীবন্তে কবর দেওন, কুকুর দিয়া খাওয়ান; রোমক-মণ্ডলে ক্ষুধিত সিংহব্যাঘ্রাদির মুখে নিক্ষেপণ; মধ্যকালিক ইউরোপে দূরভূগর্ভনিহিত গুহায় সুড়ঙ্গযোগে নিক্ষেপণ, খৃষ্টীয় অগ্নিকুণ্ড ও নানাবিধ যন্ত্রণার প্রকরণ, খৃষ্টীয় প্রধান ধর্ম্মযাজক পোপকর্তৃক ডিউক উগোলিনো প্রভৃতির হত্যাপ্রকরণ এবং ইউরোপীয়গণ কর্তৃক আদিম আমেরিকগণের পশুবৎ শিকার ও নানাবিধরূপে নির্যাতন;—এ সকল কি রোমহর্ষণকর ব্যাপার! স্মরণে শরীর সিহরিয়া উঠে এবং ভোগীর যন্ত্রণাভোগ ভাবিতে গেলে খেদ আতঙ্ক ও হুতাশে হৃদয় ফাটিয়া যায়। অধুনাতন ফাঁসির প্রথা এবং ফাঁসির প্রত্যাশায় অপরাধীর কালযাপনের

কথাটাই বা বারেক ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখনা কেন? ২ ভাবিতে ও ধারণা ধরিতে হুতাশে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, অথচ বলিব কি, এ সকল এই মানুষেই করিয়াছে ও করিতেছে এবং এই মানুষেই সহিয়াছে ও সহিতেছে! তাই মানুষ, অনেক সময়ে লোকালয় অপেক্ষা হিংস্রপশুর আলয় অধিক নিরাপদ জ্ঞান করে এবং অনেক সময়ে, হায়! দেখিতেও পাওয়া যায় যে, বরং হিংস্র পশুর কাছে নিস্তার আছে, তবু মানুষের কাছে নিস্তার নাই! এ সকল সামাজিক শক্রতা, ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত শক্রতা ত আছেই—হায়! মানুষে দেবত্বও যতটা, দানবত্বও ততটা বা তাহার অধিক। মানুষ শক্রর মধ্যেও আবার বিজাতীয় অপেক্ষা স্বজাতীয় শক্র, পর অপেক্ষা ঘরের শক্র, আরও ভয়ানক ও আরও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। ভারতসন্তান, এখন বুঝিবে কি, কিজন্য বিদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয়ের আশ্রয়প্রাপ্ত স্বজাতীয়ের দ্বারা তুমি অধিক লাঞ্ছিত হইয়া থাক? হিংস্র পশু শক্র হওয়ায় পার আছে; কিন্তু মানুষশক্রর কাছে পারাপার নাই, মানুষশক্র মন্ত্রৌষধি মানে না। অতএব হিংস্র পশুকে শক্র করিতে হয় করিও, কিন্তু যেন মানুষশক্র করিও না।

তাহার পর সামাজিক অবনতি ও অধঃপতন;—তৎসম্বন্ধে এই নীতি পথকেই একমাত্র মূলকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না। স্বার্থবশে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার দ্বিবিধ পরিণাম দেখা যায়;—এক নিকট অপর গৌণ।

২। এরূপ শাস্তির কার্য্যকারিতা আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাস্তির নিত্য সম্ভবতা সত্ত্বেও, প্রতিবৎসরের অপরাধ ও শাস্তিসংখ্যা অল্প ইতরবিশেষে প্রায় একরূপ। যেখানে ফলের অঙ্কে অপরাধ ও শাস্তিসংখ্যার কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না, সেখানে সে শাস্তির কার্য্যকারিতা ও সফলতা অবধারিত হইতে পারে কিরূপে? ফলের অঙ্কে কেবল অবৈধ ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা মাত্র সার হয়। মুহূর্ত্তে জীবননাশ অপেক্ষা, জীবনব্যাপী যন্ত্রণা ও অনুতাপ ভোগে অধিক ফল;—কিন্তু আশ্চর্য্য! লোকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ও দেখিয়াও তাহা বুঝে না।

নিকট পরিণামে, পীড়িতের অবস্থা বা ভাবব্যতিক্রম ; আর গৌণ পরিণামে, পীড়িতের মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা বা দীর্ঘশ্বাস যাহা, তাহা অবিলম্বে ঊর্দ্ধে উত্থিত এবং ঈশ্বরের সিংহাসনতলে নীত হইয়া তথায় সঞ্চিত হইতে থাকে. অথচ কিন্তু অত্যাচারকারী তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না এবং কেহ বুঝাইয়া দিলেও, অসম্ভবজ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। এই সঞ্চয় ক্রমে এবং কালে স্তূপীকৃত হইয়া যখন চারিপোয়ায় পরিপূর্ণ হয়, তখনই তাহা বিভীষিকাপূর্ণ ঘোর বিপ্লববাত্যার আকারে প্রত্যাগত হইয়া এবং বেগ ও বলে দিগন্ত মথিত করিয়া, অত্যাচারীকে বিলোড়িত বিধ্বস্ত ও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। এই বিপ্লববাত্যাই মহিমাপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডিত, নিত্য ও অনন্তসূক্ষ্ম বিচার-মাহাত্ম্য এবং উহাই পাপের প্রতিফল আখ্যায় ঘোষিত হয়। এই বিপ্লববাত্যাই দুষ্কৃতিসমূহের বিনাশ ও হরণ পূরণের দ্বারা, পুনর্ব্বার জগতীতলে সুকৃতি সঞ্চার করিয়া থাকে এবং ইহারই প্রভাবে পীড়িতের যে আর্ত্তনাদ তাহা পীড়াদায়কের শাস্তি স্বরূপ হয়। বাঞ্ছারাম, দিনের পর দিনের উদয়ও যেমন সত্য, উক্ত বিপ্লববাত্যাদ্বারা দুষ্কৃতির হরণ পূরণও তেমনি অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া জানিও।

এই নীতির প্রাবল্য সময়ে, সমাজমধ্যে উচ্চ নীচ সমস্ত পর্য্যায়ে মানবীয় চরিত্র প্রবল স্বার্থপূর্ণ, আত্মম্ভরী, অথবা এক কথায় সর্ব্বপ্রকারেই যে দূষিত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সবল এখন দুর্ব্বলের উপর নানা অত্যাচারপ্রয়োগে তাহাকে পেষণ করিয়া আত্মপরিপোষণ করিতে চায়; দুর্ব্বলও, সময় ও সাময়িক নীতিবশে স্বশ্রেণিতে পরস্পর অমিল হেতু, তাহাতে কি একক কি সংমিলিত, কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিতে পারে না। সুতরাং দুর্ব্বলে যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহার অধিকাংশ সবলের হস্তে বা অন্য উপসর্গযোগে অন্য প্রকারে অন্য দিকে চলিয়া যায়। ক্রমে দুর্ব্বলগণ, যথোচিত শ্রম ও উপার্জ্জন করিয়াও, যেমন এক দিকে পেটের ভাতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে থাকে ; তেমনি অন্য দিকে তাহাদের উপর প্রবলগণের অত্যাচার

ক্রমে আরও প্রবলতর হইতে আরম্ভ হয়। দুর্ব্বলকে মুমূর্ষু, সহনশীল এবং সর্ব্বতোভাবে পদানত দেখিয়া, প্রবল বা কেহই সে সময়ে এমন মনে করিতে পারে না যে, ইহাদেরই দ্বারা না কি আবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও কোন ব্যাক্যস্ফূর্ত্তি সম্ভব হইতে পারে! কিন্তু মানুষ যতই ধীর, যতই দুর্ব্বল, যতই শান্তিপ্রিয় ও যতই নিরীহ হউক; দুর্ব্বলতা ও সহনশীলতা, মুমূর্ষু ও পদানত ভাব, এ সকলেরও একটা সীমা আছে, যে সীমায় উত্তীর্ণ হইলে বিপরীত মুখে প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তখন দুর্ব্বলে আর দুর্ব্বলতা থাকে না; ধীর, শান্ত ও নিরীহ প্রভৃতি ভাব পূর্ব্বে যতটা অধিক ছিল, এখন সেই পরিমাণে বিপরীত দিকে সে সকলের বিপরীত গুণে পরিবর্ত্তন হয়। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরি অতিশয় ঠাণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। যে দুর্ব্বলের পক্ষে কোন প্রকার বাক্যস্ফূর্ত্তি অসম্ভব বোধ হইত; সেই দুর্ব্বল শরীরে এখন সহস্র মত্ত হস্তীর বল প্রবিষ্ট হয়। আগে কাণামেঘ, ক্রমে শন্ শন্ শব্দ, পরে বিদ্যুৎ চকমকি, পরে সেই প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া প্রলয়কাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। সে প্রবল বাত্যায় তোমার সাধের সমাজ ছারখার,সামাজিক সবলগণ ও তাহাদের ধনপ্রাণ প্রবল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। সমস্ত দুষ্কৃতির এইরূপে ধ্বংস হইয়া গেলে,তখন সমাজে সাত্ত্বিকতা ও ঐশ্বরিক সত্ত্বা পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়াতে, আবার নূতন শ্রীধারণে সমাজের নূতন গঠন আরম্ভ হয়। ইহাই অপরোক্ষ স্বার্থের চূড়ান্ত পরিণাম। কখনও কখনও বা বহিঃস্থ রাজশক্তি বা অনুরূপ শক্তিবিশেষের সহায়তা অথবা অপরবিধ নীতিপ্রভৃতির সময়কালে মধ্যবর্ত্তিতা হেতু, প্রবল বাত্যা ও পাপ উভয়েরই অপেক্ষাকৃত ধীর ভাবে শান্তি ও সমতা হইতে দেখা যায়; কিন্তু সকলের ভাগ্যেই যে সে সুযোগ ঘটিবে তাহার সম্ভবতা কোথায়?

এক্ষণে কথিত ত্রিবিধ মূলোৎপন্ন নীতিগুলির প্রয়োগপক্ষে উদাহরণের একটু আলোচনা করা যাউক। তৃতীয়মূলোৎপন্ন নীতির

জাজ্বল্যমান উদাহরণ, অধুনাতন ভারতীয় সমাজ। লোক সকল নীচ, স্বার্থপর, জ্যেষ্ঠ, বিশ্বাসবিহীন, এবং শত্রুতায় একগৃহস্থলীস্থিত এক অপরের নামে এমন কি ফৌজদারী পর্য্যন্ত করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না। জাতীয় সহানুভূতির কথা না বলাই ভাল। অনেকের বিশ্বাস, ইংরেজেরা আমাদের উপর বেশী অত্যাচার করে। আইনকানুনে বাধিয়া কোন অত্যাচার থাকিলে সে স্বতন্ত্র কথা; তদ্ভিন্ন অন্যান্য অত্যাচার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি যে, ইংরেজ মুষ্টিমেয়, আর তুমি সংখ্যায় অনন্ত বলিলেই হয়। মুষ্টিমেয়ের কার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি অনন্ত আয়তনে ব্যাপনশীল হইতে পারে? এক নীলকরের এলাকায় একটি ইংরেজ, এক জেলাপুলিশের মাথায় একজন ইংরেজ, এক জেলার ভিতর একজন ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট্, ইত্যাদি। এখন এই এক এক জন ইংরেজ কতই অত্যাচারের মতলব আঁটিয়া কতই তাহা কার্য্যে খাটাইতে পারে, যাহাতে দেশের ছোট বড় নির্ব্বিশেষে অসংখ্যসংখ্যক সকলেই সর্ব্বপ্রকারে জ্বালাতন হয়? ইহা অসম্ভব। তুলনা করিয়া দেখিলে, ইংরেজ নিজে অত্যাচার করে না তত; অত্যাচার ইংরেজের আশ্রয়ে হইয়া থাকে যত। নীলকরের এলাকায়, প্রকৃতপক্ষে তুলনা করিলে, নীলকর নিজে অত্যাচার তত কিছু গুরুতর করে না, করে যতটা নীলকরের আমলা ও চাকরে। একা পুলিশ-ইংরেজ কতই করিতে পারে? লোকের উপর পুলিসের অত্যাচার যাহা, তাহা করে পুলিশের বাবু ও কনষ্টেবলে। সেইরূপ মাজিষ্ট্রেট্পক্ষ হইতেও অত্যাচার প্রধানতঃ করে, মাজিষ্ট্রেটের আমলা ও চাকরে। এখন জিজ্ঞাস্য, নীলকরের আমলা ও চাকর, পুলিশের বাবু ও কনষ্টেবল, মাজিষ্ট্রেটের আমলা ও চাকর, ইহারা কোন্ দেশীয়? তোমার স্বদেশীয় নহে কি? অতএব ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র, অত্যাচার যাহা কিছু তাহা আমরাই আমাদের উপর করিয়া থাকি। অধিকাংশ অত্যাচারস্থলে ইংরেজ কেবল আত্মারাম-সরকার-স্থলীয় হয়। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ব্যতীত, ছোট বড় সকলেতে ও সর্ব্বাভ্যন্তরে অত্যাচার চালান কি

বিদেশীয়ের সাধ্য, না তাহারা তাহার সন্ধানই জ্ঞাত আছে? আরও দেখ, তোমার ফৌজদারীর নৃশংস শাস্তি,—একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ তত দেয় না, যত দেয় তোমার ডিপুটী বাবু; একজন দেশীয় সম্ভ্রান্তকে হতমান করিতে ও কায়দায় ফেলিতে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ততটা আহ্লাদিত বা অগ্রপদ নহে, যতটা তোমার ডিপুটী;—আহ্লাদে অধীর হইয়া তাহার সে কাজপানে ছুটিয়া যাওয়ারই বা ঘটা কত! জেলে কয়েদীর উপর নৃশংস আচরণ, অধিকাংশই তোমার জেলবাবুর কার্য্য! আপাত-ব্যাপারে দেশীয় প্রজাগণ কাহার দ্বারা অধিক পেষিত, পদদলিত, উৎপীড়িত ও পেটের ভাতের জন্য লালায়িত হয়? গবর্ণমেণ্ট না তোমার দেশীয় জমীদার প্রভুর দ্বারা? অন্য দিকে ছোট লোকের অত্যাচারও সুযোগমতে পাল্টাপাল্টী;—খান্‌সামাজীর থট্‌খটী ও লাঞ্ছনা, পেয়াদাজীর পয়জার-পট্‌পটী,—দূর হউক, অতঃপর 'ইত্যাদি' বলাই ভাল! তাই বলি, আবার বলি, আমরাই আমাদের প্রধান শত্রু। চাকুরের সাফাইতে তুমি বলিবে, তাহারা বেতনভোগী; কাজেই মুনিবের হুকুম না মানিয়া, হুকুমে অত্যাচার না করিয়া বাঁচিতে পারে না। এ কথায় প্রথম প্রত্যুত্তর,—বেতনভোগীতে যদি কিছুমাত্র জাতীয় সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বেদনদাতাও তাহাদিগকে সেরূপ হুকুম দিতে সাহস করিত না। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা যেন চাকর, তোমরা ত নহ; কিন্তু তোমাদেরই বা স্বজাতি-সহানুভূতি কই? যাহার যে সদ্‌গুণ আছে অথবা যে যে গুণের প্রতিষ্ঠা করে, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে, তথায় সে নেহাতপক্ষে বিমুখ হইয়াও চলিয়া যায়। অতএব তোমাদেরও যদি কিছুমাত্র স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে তোমরাও, স্বজাতিদ্রোহীর সঙ্গে বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক তাহার প্রতি ফিরিয়া কখনও তাকাইতে না; এবং স্বজাতি-দ্রোহীও, সমাজের এরূপ বিরুদ্ধ বদন দেখিলে, অবিলম্বে স্বজাতি-দ্রোহিতা পরিত্যাগ করিতে পথ পাইত না। জাতীয় সহানুভূতি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। ইহার পর আর অন্যান্য গুণের কথা তুলিয়া কাজ

নাই। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই তৃতীয়মূলক নীতি যতদূর অধম সীমায় নামিতে পারে, তাহা আধুনিক ভারতীয় সমাজে নামিয়াছে। দেশের দুর্ব্বল ও ইতরশ্রেণীকে যতদূর পদ-দলিত, পেষিত, পীড়িত ও পেটের ভাতের জন্য লালায়িত হইতে হয়, তাহা হইতেছে। এখন কোথায় গিয়া যে এ অবস্থার সীমান্ত প্রাপ্তি হইবে, তাহা এক ঈশ্বরই বলিতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

তৃতীয়মূলোৎপন্ন নীতির উদাহরণ উপরে বলিলাম। আর দুই মূলোৎপন্ন নীতির আদর্শস্থল প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তমূলোৎপন্ন নীতিপালক ছিলেন প্রাচীন হিন্দু এবং দ্বিতীয়োক্তমূলোৎপন্ন নীতিপালক ছিল প্রাচীন গ্রীক। কিন্তু উভয়েতেই উভয়নীতি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুর নীতিমূল যদিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু হিন্দুর ইহলৌকিক সমাজ ও সংসারের প্রতি তাদৃশ আসক্তি না থাকাতে, সমাজদর্শনোৎপন্ন বহুদর্শনসিদ্ধ প্রয়োগে যে প্রসারতা ও উদারতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অভাব হেতু হিন্দুনীতির অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে; আর গ্রীকের অসম্পূর্ণতা, ঈশ্বরসকাশে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব জন্য। লোকনীতি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং জাতীয় জীবন সর্ব্বপ্রকারে মহত্ত্বপূর্ণ হইবে তখন, যখন প্রথমমূলোৎপন্ন নীতিতে ইহলৌকিক সমাজ ও সংসারদর্শনও আসিয়া যথাযোগ্যমাত্রায় যোগদান করিতে পারিবে। সেরূপ সাত্বিকতাময়ী সর্ব্বসম্পূর্ণ নীতি আজিও এ জগতে প্রচলিত ও অনুসৃত হয় নাই।—আসিবে কি সে দিন ভারতে?

২। নীতি সমন্বয়।

গ্রীক এবং হিন্দু, উভয়েরই অবলম্বিত নীতি, স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রস্থ তাৎকালিক কর্ম্মরাশি সমুৎপাদনের পক্ষে অনুপযোগী ছিল না। কোন একটি উদ্দেশ্যভূত বিষয় নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে তাহার এক

একটি উপকরণপদার্থ পৃথকরূপে আয়োজন ও নির্ম্মাণ করিয়া আনিতে হয়। উত্তরকালে যে সর্ব্বসম্পূর্ণ ও মহত্ত্ববিশিষ্ট জাতীয় জীবনবিশেষ সমাগত হইবে, যেন তাহার উপকরণপদার্থস্বরূপ হিন্দু এবং গ্রীক চরিত্র, সেইরূপ. পৃথক্‌রূপে এবং পৃথক্‌ভাবে নির্ম্মিত হইবার আবশ্যকতা হেতুই; তৎ তৎ নীতি ও কর্ম্ম-নিয়োজন তদুভয় জাতির পক্ষে উপযোগী স্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দুলোকনীতির উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করণ, লোকেও যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হইল ভালই; যদি না হয়, তবে লোকের দোষ এবং সেই দোষে সন্তোষ উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাওয়া দুষ্টের কার্য্য; লোকে বিরূপ হয় হউক, তথাপি প্রাণান্ত-পণে কর্ত্তব্যপথে স্খলিত হইব না। গ্রীকলোকনীতির উদ্দেশ্য লোককে সন্তুষ্ট করণ, ইহাতে যদি দেবতারা কোন অংশে সন্তুষ্ট না হন, তবে সে দেবতাদের দোষ; সে দোষে সন্তোষ উৎপাদন করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য, যেহেতু দেবতাকর্ত্তৃক অহিত অনিশ্চিত, কিন্তু লোক কর্ত্তৃক যে অহিত তাহা নিশ্চিত এবং হাতে হাতে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকের তুলনায় বলিতে গেলে, সাংসারিক জীবনে হিন্দু উদাসীন; সংসারস্থলীতে যাহা কিছু সাংসারিক দৃষ্টিতে দ্রষ্টব্য, তাহাও দেখিয়া থাকেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। পুনঃ সেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তথায় যাহা কিছু নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ দেখিতেছেন, তাহারই সন্তোষার্থে বিনত হইয়া পড়িতেছেন; এবং উন্নত-বিনতই জগতের নিয়ম দেখিয়া, অন্য দিকে আবার বিনতের উপর তেমনি বিষম নৈতিক আধিপত্য চালাইতেছেন। কিন্তু গ্রীক সাংসারিক জ্ঞানে পূর্ণদক্ষ এবং তদ্বিষয়ক বহুদর্শনফলে সমত্ব-বিকশিত উদারচিত্ত; প্রয়োজন-পূরকতা অনুসারে যে যেমন মূল্যের, তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রতি সপ্রেম ব্যবহার বা সমশাত্রবভাব প্রদর্শন করিতেছে। হিন্দুর যেখানে ভক্তি, গ্রীকের সেখানে ভদ্রতা; হিন্দুর যেখানে প্রণয়, গ্রীকের সেখানে উপহাস; হিন্দুর যেখানে বিনয়, গ্রীকের সেখানে মিষ্টভাষ; হিন্দুর যেখানে ক্ষমা,

গ্রীকের সেখানে নিষ্ঠুরতা; হিন্দুর যেখানে নৈতিকতা, গ্রীকের সেখানে পাষণ্ডতা; হিন্দু যেখানে বিজ্ঞ, গ্রীক সেখানে গোঁয়ার; হিন্দু যেখানে বুদ্ধিমান্, গ্রীক সেখানে চতুরচূড়ামণি; হিন্দুর যেখানে করুণা, গ্রীকের সেখানে ঘৃণা; হিন্দু যেখানে সঙ্কুচিত, গ্রীক সেখানে স্ফূর্তিমান; হিন্দুর যেখানে অত্যাচার, গ্রীকের সেখানে শক্রতা; হিন্দু যেখানে হস্তপ্রসারণে কুণ্ঠিত, গ্রীক সেখানে সপ্রতিভ রাজরাজেশ্বর গৃহপতি সদৃশ। ইহাই হিন্দু এবং গ্রীকের সাংসারিক বা লোকনীতি বিষয়ে ভাবপ্রভেদ।

হিন্দুর নীতিমূল ও কর্ম্ম-নিয়োজনবোধ ভাল বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অসম্পূর্ণতা হেতু, সাংসারিক ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে দেখিতে গেলে, ফল তেমন লোভনীয় হইতে পায় নাই, যেমন গ্রীকের নীতি ও নিয়োজন-বোধের অপকর্ষতা সত্ত্বেও লোভনীয় হইয়াছে। তাহার কারণ আছে। নিয়োজনবোধে অনেক করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু সকল নহে। নিয়োজনবোধ সৎ হইলে কেবল এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে, কার্য্যধারণা ও কার্য্যটি সৎ ও সাত্ত্বিক ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যটি কিরূপ প্রকৃতির, মহৎ কি ক্ষুদ্র, এবং তাহার ব্যাপকতা কতদূর, তাহা নিয়োজনবোধের বিষয়ীভূত নহে; তাহা তত্তৎ কার্য্য-বিষয়ক বিস্ফারিত জ্ঞান ও বহুদর্শনের বিষয়ীভূত। বিস্ফারিত জ্ঞান ও বহুদর্শন যাহার যে প্রকারের, তাহার কার্য্যধারণাও সেইরূপ উদার বা তদন্যতর হয়। হিন্দু ভুলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবাত্মাও যে ঈশ্বরে সৃষ্টি, সেই জীবাত্মার পালক এই লোকসমাজও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি; সুতরাং উভয়ই সমান যত্নের এবং উভয়েরই প্রতি সমান আগ্রহ হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত ইহাঁরা আত্মিক নীতিতে যদিও নিপুণতাশূন্য নহেন, কিন্তু লোকনীতিতে ইহাঁদের নিপুণতাশূন্য খেয়ালের ভাগ বেশী; এবং অযথা ক্ষমাবান্ ও বিনীতস্বভাব হেতু ইহাঁদের সংসারধর্ম্ম পরিমাণের অতিরিক্ত হিতরত ও বিনয়পূর্ণ এবং তদুভয়ের ফলস্বরূপ সঙ্কীর্ণতাযুক্ত হইয়াছে। গ্রীক আত্মিকনীতি বড় একটা

বুঝিতেন না ও তাহার ধার ধরিতেন না; কিন্তু লোকনীতি বুঝিতেন ভাল। মূল দুষ্ট হইলেও, লোকনীতির কার্য্য ও ফল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হওয়ায়, অনুসৃত বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের লোকনীতিতে সঙ্কীর্ণতা দূরে থাকুক, বরং উহা সীমা ছাড়াইয়া অতিরেক ভাবে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এরূপ অতিরেক ভাবের কারণ, নীতিতে ঐশ্বরিক মূলশূন্যতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একে অতিরেক ভাব, অপরে ন্যূনতা, সুতরাং উভয়ই অংশতঃ দুষ্ট। হিন্দুর দুষ্ট ভাব, ধারণায় সঙ্কীর্ণতা হেতু; গ্রীকের দুষ্ট ভাব, মূলের দুষ্টতা ও ধারণায় অতিরেক ভাব হেতু। যথায় দুষ্ট ভাবের এই সকল কারণ বিদূরিত হইয়া সামঞ্জস্য সাধন হইবে, তথায়ই জানিবে লোকনীতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া জগতে শোভা বিস্তার করিতে থাকিবে। ভারতসন্তান, এই উভয়জাতীয় সংমিলনে তোমার পক্ষে সেই সামঞ্জস্য সাধনই কর্ত্তব্য হইতেছে; ইহাতেই তুমি প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।

সে যাহা হউক, সমাজের প্রতি সম্যক্ দর্শনের অভাবে, হিন্দুর কর্ম্মধারণা সঙ্কীর্ণ হইলেও; হিন্দুপ্রকৃতি যে ফলে কতদূর সৎ, সাত্ত্বিকতাপূর্ণ এবং কতদূর ফলাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থত্যাগী তাহা একবার ভিক্ষোপজীবী অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনুভব করিয়া লও। ইঁহারা অরণ্যমধ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, গাছের বল্কল পরিয়া, মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর পালিয়া যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন; তাহা স্মরণ করিলে আনন্দ ও আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। আজি পর্য্যন্ত যে আমরা সিংহের বংশ বলিয়া বিজাতীয়দিগের নিকট গৌরব করিয়া থাকি, এবং বিজাতীয়েরাও যে আমাদের প্রাচীন অবস্থার খাতিরে আজি পর্য্যন্ত আমাদিগের কিছু কিছু গৌরব করিয়া থাকে, সেও সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদাৎ। অনেক মূর্খ বলিয়া থাকে ব্রাহ্মণেরা অযথা আপন গণ্ডা চাহিয়া আত্মস্বার্থে দেশ উৎসন্ন দিয়া গিয়াছেন এবং আপন স্বার্থসাধনের জন্য অযথা ক্রিয়াকলাপের বিস্তার

করিয়া লোক সকলকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতই মূর্খ ভিন্ন, জ্ঞানান্ধ ভিন্ন আর কেহ এরূপ বলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বিলাসপ্রিয় হইলে পতিত হইবে বলিয়া যথায় বিধানিত; এবং ক্রিয়াকলাপ সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইলেও প্রাপ্য অংশ যাহাদের কেবল কিঞ্চিৎ আতপ চাউল ও দুই কাঁচকলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; বলিতে পার বাপু বাঞ্চারাম, তথায় আত্মস্বার্থের অস্তিত্ব সম্ভবপর কোন জায়গায়? মুষ্টিভিক্ষা, গাছের বল্কল এবং গাছের তলায় এমন কোন্ স্বার্থ যাইয়া আশ্রয় লইতে পারে, যাহাতে তোমার, তোমার বংশাবলীর এবং তোমার জাতির যথাসর্ব্বস্ব হৃত হওয়ার সম্ভাবনা এবং যাহার জন্য আজি পর্য্যন্ত তোমাকে লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হয়? ফলতঃ নরাধম ভিন্ন আর কেহই প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিন্দাঘোষণায় অগ্রসর হইতে পারে না।—

"কো ধর্ম্মঃ কশ্চ দেবেতি কিং কর্ম্মেতি তথাপরে,
বদন্তি দুর্জ্জনা মূঢ়াঃ ব্রহ্মহিংসাপরায়ণাঃ।"

মহতের অবমাননাই শয়তানী সময়ের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। পিতৃপুরুষগণ, তোমাদিগের প্রতি ভক্তির দিন উদয় হইতে এখনও অনেক বিলম্ব! ব্রাহ্মণগণ নিজগঠিত সমাজের প্রতি নিজে এক সময়ে অনিষ্টকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্থাদি স্বার্থবশে নহে, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ও তদুৎপন্ন ভ্রমান্ধতা হেতু; এবং তাহাও, যখন পার্শ্বস্থ মানবগণের অবাধ্যভাবোৎপন্ন মূর্খতার সংস্পর্শে ভ্রমান্ধকার আসিয়া স্বতঃ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক তথাপি ব্রাহ্মণেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, বাঞ্চারাম, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট এখনও ভক্তি-বিনত হও; এবং কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম এখনও যদি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া না থাকে, তবে তোমার ইংরাজীনবিশী ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়া, সেই ব্রাহ্মণের সন্ততিবর্গকে তাহাদের উত্তরাধিকারস্বরূপ সেই ভক্তির অংশ এখনও কিঞ্চিৎ প্রদান করিও;—ব্রাহ্মণ-দেবত্বের প্রতি নহে, ব্রাহ্মণ-মনুষ্যত্বের প্রতি। ভারতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ নিঃস্বার্থ

ও যাহা করিয়া গিয়াছেন, জাগতিক ইতিহাসের কোন স্থলেই তাহার তুলনা দেখা যায় না। *

কিন্তু, হিন্দুদিগের দ্বারা সেই নিঃস্বার্থ লোকহিতকর কার্য্য যাহা কিছু কৃত, তাহা যে কোন উদ্দিষ্ট মহৎ হিতের ধারাবাহিক পর পর ক্রম সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহা নহে। ধারণায় যে সঙ্কীর্ণতা, এরূপে তাহা লীলায়িত হইয়াছে।—হিন্দুদের কর্ম্মধারণায় প্রধান ত্রুটি এই যে, সমগ্রের সহিত ইহাঁরা আপন সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেন না; সমগ্র বিশ্লেষণ করিলে খণ্ড এবং খণ্ড সমষ্টি করিলে সমগ্র হয়, এ কথা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকটা বুঝিলেও, সাংসারিক বিষয়ে বড় একটা তাঁহারা বুঝিতেন না; সুতরাং খণ্ড ভাবে কার্য্য করিব বটে অথচ সে কার্য্য সমগ্র সহ সমষ্টি বাঁধিবে, ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। সাংসারিক তাবৎ বিষয়কে ইহাঁরা খণ্ডমূর্ত্তিতে অবলোকন করিতেন। ইহাঁরা যেমন ভাবিতেন, এই যে কার্য্য করিতেছি ইহা ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন অনুসারে; তেমনি এটাও ভাবিতেন যে, আমার কর্ম্ম-নিয়োজন মত কার্য্য আমি করিয়া যাই, তাহাতে ধারাবাহিক কোন গঠন নিবদ্ধ হয় ভালই, না হয় নাই। অতএব ইহাঁরা খণ্ড মূর্ত্তিকেই সর্ব্বস্ব ভাবিতেন, সমাজের ভিতরে থাকিয়াও সমাজকে দেখিতে পাইতেন না, দেখিতে পাইতেন কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে। হায়! সত্য সত্যই কি হস্তী তবে আপন অবয়ব দেখিতে পায় না? দেখিতে পাইলে কি না করিতে পারিত! অতঃপর হিন্দু এবং গ্রীকের সাংসারিক কার্য্য ও নীতি বিশ্লেষণ করিলে, এরূপ রূপক রচনা করিতে পারা যায়। একজন মুক্তারাশি উপার্জ্জন করিয়াছে মালা গাঁথিবার খাতিরে এবং মালা গাঁথিয়াছে; আর সেই উপার্জ্জন আর একজন করিয়াছে কেবল সেই মুক্তারই খাতিরে, সুতরাং উপার্জ্জনান্তে তাহা পরিত্যক্তবৎ পতিত রহিয়াছে। কে না বলিবে যে যদৃচ্ছাবিক্ষিপ্ত মুক্তারাশি হইতে মুক্তার মালা অধিক শোভাকর। গ্রীকের লোকহিত সেই মুক্তামালায় দাঁড়াইয়াছে; আর হিন্দুর তদ্রূপ শত শত মালার

উপযুক্ত মুক্তারাশি, এমন কি অপেক্ষাকৃত শত শত গুণে বহুমূল্য মুক্তারাশি, স্তূপীকৃত পড়িয়া রহিয়াছে এবং যেমন সুযোগ পাইতেছে, তেমনি এক একটি করিয়া ইন্দুর ও ছুঁচোতে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কি পরিতাপ! ভারতসন্তান, দেখ দেখি তোমারই মুক্তা দাঁতে ধরিয়া, ছুঁচোর ছুঁচোমী ও আস্ফালন, কি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে! আর তুমি? হেলায় তোমার রত্নরাশি হারাইয়া, মাথায় হাত দিয়া পথে বসিয়া কাঁদিতেছ!

হিন্দুসন্তান জানিতেন যে, ব্যক্তি হউক বা জাতি হউক, উভয়-নির্ব্বিশেষে, মানবের যে সাংসারিক জীবন, তাহা যখন এত ক্ষণস্থায়ী; তখন তাহার আবার মূল্যই বা কি; আর তাহার জন্য হিসাব রাখা-রাখিই বা কি। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছি কর্ম্ম করিতে, কর্ম্ম করিতেছি; —ইহা বিদেশ ও বাসাবাড়ী। কর্ম্ম শেষ হইলেই যখন বাড়ী যাইতে হইবে, নিত্যবাস যখন অন্যত্র; তখন বাসাবাড়ীকে বালাখানা ও বিদেশীয়কে প্রাণের কুটুম্ব কে করিয়া থাকে, অথবা তাহার জন্য পাগলই বা হয় কে?—করিতে পারে কেবল সেই, হইতে পারে কেবল সেই, যাহার অর্থ রাখিবার আর জায়গা নাই অথবা যে উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল লৌকিক মোহে মজিয়া বেড়ায়। বিশেষ যখন বিদেশে মান কেনার অপেক্ষা দেশে মান কেনা শ্রেয়ঃ; তখন দেশে যাইয়া যাহাতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, সেজন্য, যতদিন বিদেশে থাকিবে, ততদিন এদিক ওদিক না ভুলিয়া, এদিক ওদিক না তাকাইয়া, কোন রূপে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সেইরূপ উপার্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। হিন্দুসন্তান পৃথিবী-প্রবাস দূরে থাকুক, সামান্য বিষয়কার্য্যোপলক্ষে বিদেশ-প্রবাসী হইলেও; প্রবাসস্থান সম্বন্ধে, জাতীয় আত্মিক স্বভাবের ছায়ায় আজি পর্য্যন্ত অবিকল এইরূপ ভাবনা ভাবিয়া থাকেন এবং দেশে ঠাকুরালীর আশায়, মলমূত্র মধ্যে কুঁড়েঘরে কোন রকমে ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া বিদেশে কুকুরালী পূর্ব্বক কাল কাটাইয়া দেন। এখন দেখ একবার, সেই প্রবাস-ক্ষেত্রে প্রাচ্য প্রবাসী ও পাশ্চাত্য প্রবাসীতে

কত প্রভেদ। পাশ্চাত্য প্রবাসী যেখানে যায় সেইখানেই আড়ম্বর ও আসবাবের ঘটা, যেন কত কালের ঘরবাড়ী এবং কত পুরুষ তথায় কাটিয়া যাইবে,—এ দিকে যদিও রসদের রস একটু ঘুচিলেই ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিতে হয়! আর তোমার প্রাচ্য প্রবাসী? বিদেশে সে কুকুরালীর কথা উপরেইত উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রকৃতিভেদে, সাংসারিক সুখরতি বিষয়ে ইহাপেক্ষা আর কি সুন্দর দৃষ্টান্ত সম্ভবপর? পাশ্চাত্য জগদ্বাসী, আর প্রাচ্য সে জগতে পথভ্রান্ত পথিক—অতিথি! সে যাহা হউক, তোমার আমার চোখে পাশ্চাত্যের বিদেশ-বাবুগিরিতে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতা দৃষ্ট হইলেও, তবু ছেঁড়া কাঁথা জড়ানর চেয়ে যেন দেখায় ভাল! আরিষ্টটলের ধরণে বলিতে গেলে, যথার্থ ভাল তখন হয় যখন ছেঁড়া কাঁথা ও আড়ম্বর এত-দুভয়ের মধ্য পথ অবলম্বিত হইয়া থাকে। হিন্দুসন্তানের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা এবং কর্ম্মধারণা যতদূর, তদনুসারে সংসারমদে না মাতিয়া ধর্ম্ম-চর্য্যা দ্বারা পরলোকের পথ পরিষ্কার করাই কেবল যুক্তিসিদ্ধ। যে জাতি মানবীয় ইহ জীবনের মূল্য এইরূপ ভাবে অবধারণ করে, চিন্তা এবং কল্পনাপ্রসূত বিষয় যাহার নিকট প্রধানতঃ পরম আদরের বস্তু,সে জাতির মধ্যে জাতীয় ইতিহাস বা লোককীর্ত্তিগাথাও বড় একটা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য জাতির কথা কি বলিব, মেক্‌সি-কোর নরমাংসভোজী আদিম অধিবাসীরাও এ জগতে আপনাদের প্রাচীন পুরাবৃত্ত প্রদান করিয়া গিয়াছে; কিন্তু হিন্দুসন্তান এত সুসভ্য, এত ধর্ম্মশীল এবং এত বিদ্যাবান্ হইয়াও তাহা পারিয়া উঠেন নাই হিন্দু বিদ্বানেরা ইতিহাস লিখিতে বসিলে যে লিখিতে পারিতেন না এমন নহে, বরং উৎকৃষ্টরূপেই লিখিতে পারিতেন;—কিন্তু আদৌ ইতিহাস বলিয়া যে একটা বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে বা তাহার কোন মূল্য আছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণার ভিতরে আইসে নাই। ইহাঁরা যেরূপ ইতিহাস লিখিতে পটু এবং ভালবাসিতেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, যথা;—অষ্টাদশ পুরাণাদির গাদা।

এক্ষণে গ্রীকজাতির প্রতি নিরীক্ষণ কর; কেমন বিভিন্ন চিত্র দেখিতে পাইবে। আধ্যাত্মিকতা তিলক ছাপাতেই শেষ; বাকী,—রসের তুফানে যেখানে থাকি সেই বাড়ী। পরলোক বলিয়া পিছুটানের মমতা বড় একটা নাই, সুতরাং কেন ও কাহার জন্য অধিক সঞ্চয় করিব? এই পৃথিবীই স্বর্গ, এই পৃথিবীই মর্ত্ত; এইখানেই নাম, এইখানেই পরিণাম; অতএব যাহা পাই, যতদূর সাধ্য খাইয়া পরিয়া আমোদ করিয়া লই, পরে আমার তা কে খাইবে! দেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই অথচ দেশের কথা এক একবার মনে হইলে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু সে উদ্বেলন ও তদুৎপন্ন কার্য্যফল অধিকক্ষণ ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না;—পরলোক ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত উপার্জ্জন সম্বন্ধে গ্রীকদিগের ঠিক এইরূপ ভাব। যেমন করিয়াই দেখ, দেখিতে পাইবে ইহারা সর্ব্বতোভাবে সংসারী ও সামাজিক এবং সাংসারিক সুখে পূর্ণভাবে মগ্ন। তাহা না হইলে দেশহিতার্থে, সমাজের প্রতি স্নেহে, আপন সন্তানকে ইঙ্গিতমাত্রে বলি দিতে পারিত না;—স্পার্টান জননী প্রকৃতিদত্ত পুত্রস্নেহত্যাগে, বিকলাঙ্গ পুত্র পরিত্যাগ বা ক্ষীণাঙ্গ পুত্রের শরীরনাশে, কান্নার বদলে হাঁসির লহর উঠাইতে পারিত না। ইহারা সন্তান রণে হত হইয়াছে শুনিলে শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিত।[৩] ফলতঃ সামাজিকতার খাতিরে এখানে কুলকামিনীগণ পর্য্যন্ত যেরূপ আগ্রহ ও নির্ম্মায়িকতা দেখাইত, বীরপিতা দশরথও তাহা পারেন নাই। ব্রহ্মদ্বেষিণী তারকা রাক্ষসীর বিনাশার্থে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতে চাহিলে, দশরথ কাঁদিয়াই আকুল![৪] এই সামাজিকতার

৩। Cecero Lib. I.

৪। রামায়ণ ১।২০।১—১৪। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে রাজপুত রমণীতে বহু পরিমাণে গ্রীক রমণীর ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে ফলের অঙ্কে তাহাতে বিশেষ কিছুই ফলে নাই। ফলতঃ কি প্রাচীন কি পরবর্ত্তী সময়ে, হিন্দুর বীরত্ববুদ্ধি বস্তুতঃ যে কিছু কম ছিল তাহা নহে। কিন্তু সে

প্রতি স্নেহ হেতুই হেক্টরজননী, হেক্টরকে সহসা রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যজ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—

"হেক্টর! কেমনে কহ, কোন গূঢ় হেতু,
মম পুত্র এবে এথা ত্যজি রণস্থল,
প্রাচীর চৌদিকে গ্রীস্ ঘেরিতেছে যবে?"৫

পুনশ্চ, যে পারিসকে হেলেন জগতের লোভনীয় পুরুষ জ্ঞানে, স্বামী, সন্তান, ঐশ্বর্য্য এবং রাজভোগ তুচ্ছ জ্ঞান ও পরিত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল; সেই পারিসকেই সেই হেলেন যখন আচরণে ভীরু ও কাপুরুষ দৃষ্টি করিল, তখন রতিদেবীর নিকট ভৎর্সনাবাক্যে পারিসকে এরূপ তীব্রভাবে নিগৃহীত করিয়া আপনার অসীম ও জ্বলন্ত মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল।—রতিদেবী হেলেনকে মোহিত করিয়া পারিসের অঙ্কগত করিবার জন্য লইতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু হেলেন রাগে ফুলিয়া ও ঝালে ঘাড় বাঁকাইয়া রতিদেবীর আহ্বানের উপর উত্ত্যক্ত ফণিনীর ন্যায় এরূপ উত্তর করিল—

ভিরু সে বর্ব্বর! ঘৃণি তারে, ঘৃণি আমি
তার আলিঙ্গন। নহে যদি, কে বহিবে
শিরে—কে বহিবে শিরে চির অখ্যাতির
ডালি; কে সহিবে পুনঃ ফ্রাইজিয়াব্যাপী
রমণীমণ্ডলে যবে দিবে টিটিকারী,

বীরত্বে সত্যনিষ্ঠা ও সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ হেতু, গোঁয়ারগোবিন্দ গ্রীকবীরত্ব বা যে কোন পাশ্চাত্য বীরত্বের নিকট তাহাকে হারি মানিতে হইয়াছে। সত্য সত্যই বন্দুকের বলের অপেক্ষা সিংহব্যাঘ্রাদির বল কিছু বেশী নহে; কিন্তু তথাপি তাহাদের সে বলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পশুত্ব হেতু, সমসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বন্দুকের বলকে প্রায়ই হারি মানিতে হয়।

৫। "O Hector! Say, what great occasion calls
My son from fight, when Greece surrounds our walls!"

Pope's Homer's Illiad, VI., 318-19.

দহিতেছে দেহ যবে, দহে চিত্ত তাপে
সময় কি, হ্যাঁলা! সেই প্রেম আলাপনে।৬

এক কথা। ইহার পর কি আর বলিতে হইবে যে কি কারণে হিন্দুর ঘরে বা অপর যে কোন জাতির ঘরে ইতিহাসবিদ্যার জন্ম না হইয়া গ্রীকের ঘরে সর্ব্বাগ্রে হইয়াছে? পুনশ্চ, এই স্থলে গ্রীকের বীর-প্রকৃতি কিরূপ এবং কি মেয়ে কি পুরুষ উভয়েতেই কেমন তাহার স্ফুরণ ও বিকাশ, তাহাও একবার এই সুযোগে দেখিয়া লও। আর হিন্দুর ঘরে?—দশরথের কান্নার কথাত উপরে বলিয়াছি; পাণ্ডবদলের পাশায় স্ত্রীহারাণর কথা বলিতে এখনও বাকী আছে। কবির ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে বড় বীর করিয়া দেখান; কিন্তু বীরপুরুষেরা বড় বীর হইবার আগে ধর্ম্মধ্বজিতা ও দ্যূতচুক্তির খাতিরে স্ত্রী হারাইয়া বসিয়া আছেন। আবার এ দিকে অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া রণস্থলে বসিয়া যোগের কথা শুনিতেছেন। গ্রীকবুদ্ধিতে যাহা বীরত্ব বলিয়া আদরের জিনিস, হিন্দুবুদ্ধির নিকট তাহাই ঠিক নিন্দা এবং ঘৃণার পদার্থ। যে রাবণ প্রভৃতিকে হিন্দুকবি পাষণ্ডতা পক্ষে নিম্নতম উদাহরণরূপে চিত্রিত এবং তাহাদের আচরণকে পাষণ্ডতার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিরূপে বর্ণিত করিয়াছেন; গ্রীকচক্ষে দেখিতে গেলে, ঠিক সেই সকল লোকই বীরপুরুষ ও সেই সকল আচরণই বীরাচরণ বলিয়া দৃষ্ট এবং আদৃত হয়। হিন্দুর বীরেরা সত্যবীর, সুরবীর, ধর্ম্মবীর; আর গ্রীকের বীরেরা, ধৃষ্টবীর, রৌদ্রবীর, অসুরবীর। এ উভয় বীরত্বই গত কালের; উপস্থিত কালের বীরত্বেও আমাদের আবশ্যক নাই; কিন্তু দেখিতে বাঞ্ছা বড় অনাগত বীরত্ব। বিধাতঃ, সে বীরত্বে যেন সত্যবীর,

৬। I scorn the coward, and detest his bed:
Else should I merit everlasting shame,
And keen reproach from every Phrygian dame.
Ill suits it now the joys of love to know
Too deep my anguish, and too wild my woe.

Pope's Homer's Illiad, III, 508-512.

য়োদ্ধবীর; ধর্ম্মবীর, ধৃষ্টবীর; উভয় উভয়ে আসিয়া সামঞ্জস্য-সংমিলিত হয়। ভারতসন্তান! সে বীরত্ব?—রাম রাম! মিছা জল্পনে সময়-ব্যয়। ইতিহাসের কথাটা সারিয়া লই।

যেখানে লোকচরিত্র এরূপ এবং যে জাতি এতদূর সাংসারিক-গৌরবপ্রিয় যে, যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরও তেজ এত প্রখরা; সে জাতি যে ঐশ্বর্য্য ও অনুষ্ঠানের মর্ম্ম পূর্ণভাবে বুঝিবে এবং তাহাকে জীবনের প্রধান-ক্রিয়া-পদস্থ ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ ও তাহার বিভব রক্ষা করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন উপপাদ্য বিষয়সমূহ অনুসরণ করিতে হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপার্জ্জিত জ্ঞানের সুগ্রন্থন আবশ্যক; তেমনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অনুসরণ করিতে গেলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুষ্ঠিতের অবগতি ভিন্ন, তাহা সুশৃঙ্খলে বা পূর্ণাবয়বে সম্পন্ন হয় না। অতএব ইতিহাসবিদ্যার চর্চ্চা গ্রীকদিগের মধ্যে যদৃচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই। তথায় উহা উৎপন্ন না হইলে চলে না, এই জন্য হইয়াছিল। ভারতীয় জীবনক্রিয়ায় তদ্রূপ আবশ্যকতাপক্ষে প্রয়োজনাভাব। আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত, ভারতীয়েরা যেমন এ জগতে একাদিক্রমে ধারাবাহিকরূপে ও বহুকাল ব্যাপিয়া স্বাধীনত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তেমন আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত ঘটনাবলীর যে সত্য ইতিহাস, তাহার টুকরামাত্রও পাওয়া যায় না বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গ্রীকদিগের ইতিহাসের বাজারের প্রতি বারেক লক্ষ্য করিয়া দেখ,—কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসজ্জিত! ফলতঃ গ্রীকেরা মানবীয় ইহ জীবনের এরূপ স্থির মর্ম্মজ্ঞ ও তাহাতে এত মমতাশীল যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহারা, এমন কি প্রস্তরফলকের সাহায্যেও, তাহার স্মৃতি-রক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল[৭] ও তাহাতে যত্নশীল হইয়াছিল। কোন প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে

৭। The stone shall tell your vanquished heroes' name,
And distant ages learn the victors' fame.
Pope's Homer's Illiad, VIII 103-104, পুনশ্চ *Odyssey* XI.

এরূপ অনুষ্ঠানের কথা বা উল্লেখ আছে কি না তাহা শুনিতে পাই না। বোধ হয়, নাই।

অতঃপর ইচ্ছা, জাতিদ্বয়ের লোকাচার, দেশাচার, লোকব্যবহার, ইত্যাদির আলোচনা করি; কিন্তু আরম্ভস্থলেই দেখিতেছি যে, উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় তাহাদের চিত্র প্রদর্শন করিতে যাওয়া, একরূপ পণ্ডশ্রম ও স্থানের অপব্যয়মাত্র। সেরূপ ক্ষুদ্র তুলনায়, এরূপ বৃহৎ জাতীয় জ্ঞান কখন পর্য্যাপ্ত, সম্পূর্ণ বা তৃপ্তিকর হইতে পারে না। তত্তৎ বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তত্তৎ জাতীয় ইতিহাস মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সদুপায়। যাহা হউক, তথাপি, এই উভয় জাতি, যে যে পুস্তককে ধর্ম্মপুস্তক এবং যাহা যাহা লোকনীতিবিধায়ক বলিয়া গ্রহণ করিত; সেই সেই পুস্তক হইতে দুই একটি মুখ্য নীতিমূলক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে আর কিছু না করুক, অন্ততঃ তত্তৎ জাতির সেই সেই বিষয়ে চিত্তগঠন এবং চিন্তনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। হেসিওদ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ৮।—

"নির্ব্বোধ পার্সেস, এক্ষণে আমি সদুদ্দেশ্য-পরতন্ত্র হইয়া এই উপদেশগুলি প্রদান করিব। অসৎ সংগ্রহ তুমি অনায়াসে রাশি রাশি করিতে পার, যেহেতু তাহার পথও সহজ এবং সে পথ অনায়াসে অবলম্বনযোগ্যও বটে। সত্য বটে সতের অগ্রে অমর দেবগণ, অধ্যবসায়ের স্থাপনা করিয়া রাখিয়াছেন, এ নিমিত্ত ইহার পথ আপাততঃ অতি উন্নত ও দুরারোহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু যে একবার ইহার সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে সে দেখিতে পাইবে যে, যদিও ইহা আগে এত কঠিন বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহা কত সরল।

"সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে নিজের উপায় নিজে করিয়া লয় এবং যাহার সেই উপায় ভবিষ্যতে এবং শেষ পর্য্যন্ত মঙ্গলদায়ক হয়; এবং সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে সুপরামর্শদাতার পরামর্শ শুনিয়া থাকে। কিন্তু

৮। Hesiod. *Works and Days.*

অসার ও হেয় সেই ব্যক্তি, যাহার নিজেরও কোন বুদ্ধি নাই অথচ অপরের সুপরামর্শেও যে কখন কর্ণপাত করে না। অতএব হে পার্সেস, আমার সদুপদেশের প্রতি চিত্ত স্থির রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও এবং ভাণ্ডার পূরণ কর,যাহাতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া তোমাকে দলিত করিতে না পারে; তাহা হইলে সুকেশা দেমিতুর দেবীও তোমার প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া, তোমার ভাণ্ডার পূরণে সহায়তা করিবেন। জানিও দুর্ভিক্ষ কেবল অলস ব্যক্তির সহচর হইয়া থাকে।

"যে ব্যক্তি অলস ভাবে, অপরের গলগ্রহ হয়; কি দেবতা কি মানুষ, উভয়ই তাহার প্রতি রোষযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার যে কার্য্য এবং শ্রমেই কেবল তৃপ্তি এরূপ দেখাও, যেহেতু তাহা হইলে তোমার ভাণ্ডার যখনকার যে দ্রব্য তাহাতে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। শ্রম হইতে লোকে ধনধান্য-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং যে ব্যক্তি শ্রমশীল, মানব এবং দেব উভয়েরই নিকট সে প্রিয়পাত্র হয়। শ্রমে মানব হতমান হয় না, আলস্যেই হতমান হইয়া থাকে। তুমি যদি শ্রমরত হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, অলস ব্যক্তিরা তোমাকে ধনী হইতে দেখিয়া হিংসারত হইতেছে, কারণ সম্মান এবং শ্রেষ্ঠতা এ দুই সৌভাগ্যেরই অনুগমন করে।

"যে ব্যক্তি শরণাগত বা আতিথির প্রতি অসদাচরণ করে[৯]; যে

৯ ৯ কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রাক মহাশয়েরা অতিথি গ্রহণ করিতেন না, তবে নিতান্ত কেহ যদি আসিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকেও আর তাড়াইয়া দিতেন না। গ্রীসীয় কোন লোকপাল কোন অতিথি গ্রহণ করিলে, বা অতিথিকে কোন উপহার দিলে, লোকবর্গের নিকট হইতে বাজে আদায়ের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। ইংরেজ গ্রোট ইহার প্রমাণস্থলে Odyss. xiii 14; xix 197; xvii 383 উদ্ধৃত করিয়াছে। গ্রীকের আতিথ্য এইরূপ! পরবর্ত্তী সময়ে ইহার ভাল ও মন্দ উভয় দিকেই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আটিকাপ্রদেশের লোক আতিথ্য-পরায়ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তেমনি অন্য দিকে আবার স্পার্টার ভিন্নস্থানীয় লোক একদণ্ডও তিষ্টিতে পারিত না। তবে আমাদের দেশের ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা, পয়সাভিক্ষা, উদরভিক্ষা, বাসভিক্ষা, এরূপ তরবতর যে ভিক্ষা বা আতিথ্য, গ্রীসে তাহার নাম গন্ধও জানিত না।

আত্মীয় স্বজনের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার-পরায়ণ হয়; যে জ্ঞানমূঢ় হইয়া পিতৃমাতৃহীনের অনিষ্ট করিয়া থাকে; এবং যাহারা বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে, দেবরাজ তাহাদের প্রতি ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি ঐ সকল কার্য্য হইতে আপনার চিত্তকে অন্তরে রাখিবে। যথাসাধ্য সুভাবে ও পবিত্রমনে উপহারদানের দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে; এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ধূপাদিদানে, তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে; কারণ তাহা হইলে তোমার উপর তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবেন যে, তুমি অনায়াসে অন্যের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে কিন্তু অন্যে কেহ তোমার সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে না। যে তোমাকে ভালবাসে তাহাকে তোমার ভোজস্থলে নিমন্ত্রণ করিবে, কিন্তু যাহারা তোমার হিতকারী নহে তাহারা যেন তফাতেই থাকে। বিশেষ যে লোক তোমার আত্মীয় তাহাদিগকে আগে নিমন্ত্রণ করিবে; কারণ জানিও, তোমার বাড়ীতে কোন বিপদ পড়িলে, প্রতিবেশীরা আগে বদ্ধপরিকর হয় না, আগে আত্মীয় স্বজনেই হয়। অসৎ প্রতিবেশী কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু সৎ প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্যস্বরূপ বলিয়া জানিও। যখন প্রতিবেশীর নিকট হইতে ঋণ করিবে, শোধ দিবার সময় যে মাপে লইয়াছিলে যেন ঠিক সেই মাপে শোধ দেওয়া হয়, বরং কিছু বেশী দিয়াও দিবে; কারণ তাহা হইলে ভবিষ্যতে আবার যদি অভাব হয়, তবে চাহিলেই যে পাও এরূপ আশা থাকিবে।

"নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার দিকে যাইও না; নীচ প্রবৃত্তি হইতে যে লাভ তাহাকে লোকসান বলিয়া জানিও। যে তোমাকে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিবে: যে তোমাতে অনুরক্ত, তাহার প্রতি অনুরক্ত হইও। যে দান করিয়া থাকে, তাহাকে দান করিবে; যে দান করে না, তাহাকে দান করিবে না। যে ব্যক্তি দান করিয়া থাকে, সে অবশ্য অন্যত্র দান পাইয়া থাকে; যে দান করে না, সে কোথাও দান পায় না। * * * * বন্ধুবর্গের প্রতি প্রতিদান যেন

অপর্য্যাপ্ত হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে কোন কাজ করিতে হইলেও যেন, উপহাসচ্ছলে বা প্রকারান্তরে, তাহার সাক্ষ্য রাখা হয়; কারণ নিশ্চয় জানিও, 'বিশ্বাস' এবং 'অবিশ্বাস,' এ দুইটি বিষয় অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। (এবং এই অপূর্ব্ব পাশ্চাত্য নীতি, আজিকে আর এক বেশে সোণার ভারতে প্রবেশ করিয়া, আইন-আদালত মূর্ত্তিতে নিত্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ভারতের আধুনিক অপূর্ব্ব সাক্ষ্য আইন এবং তদুৎপন্ন মিথ্যা মোকর্দ্দমাদি,—এ সকলের উৎপত্তিমূল এই পাশ্চাত্য নীতিটির ভিতর নিহিত।) বেশভূষা-শালী স্ত্রীলোকে যেন তোমার মন ভুলাইতে না পারে; স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা আর দারুণ শঠ জুয়াচোরকে বিশ্বাস করা, এ উভয়ই সমান। একটিমাত্র পুত্রকে পিতৃগৃহের রক্ষণাদি করিতে দিও, তাহা হইলে অর্থ বিভাগ না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। স্মরণ রাখিও, অনেক সন্তান থাকিলে অনেক যন্ত্রণা ও অনেক উপার্জ্জনের আবশ্যক হয়। (ভিটামাটি বিক্রয়ে বিবাহ এবং পুত্রপ্রার্থী হিন্দু এ কথায় কি বলেন? সন্তানভূমিষ্ঠের অন্য নাম যেখানে 'গোলামের সংখ্যাবৃদ্ধি;' সেখানে উপায়শূন্য অবস্থায় এ অজস্র গোলাম গোলাম্নী—শেয়ালের বংশবৃদ্ধির ফল?) এক্ষণে তোমার অন্তঃকরণ ও চিত্ত যদি সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে, তবে কেবল শ্রম করিবে, শ্রমের উপর শ্রম করিবে।"

ইহার পর, কিরূপে কৃষকার্য্যাদি সমাধা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, হেসিওদ তাহার সবিস্তার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উপদেশ সকলের মধ্যে, যে কোন প্রকারে সাংসারিক স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ হয়, সেইরূপ উপদেশেরই প্রাধান্য। তাহাদিগের কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আর মিছামিছি প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। অতঃপর সেই সকল উপদেশ অনুসারে অর্থসংগ্রহ হইলে, হেসিওদ বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বিবাহের পর, আরও নিম্নমত কয়েটি উপদেশ প্রদান করিয়া গৃহধর্ম্মের সমস্ত কর্ত্তব্য দেখানর শেষ করিয়াছেন।

"দেবতারা যাহাতে শত্রু না হয়েন, সর্ব্বদা সেরূপ কার্য্য করিবে। বন্ধু ব্যক্তির সঙ্গে যেন ভ্রাতার ন্যায় সমান ব্যবহার করিও না; এবং যদি কর, আগে যেন তুমি তাহার অনিষ্টে রত হইও না ও তাহার প্রতি বাক্যচ্ছলেও মিথ্যা কহিও না। কিন্তু যদি সেই বন্ধু তোমার অরুচিকর কোন কথা বলে, বা তোমার বিরুদ্ধে কিছু করে, তবে তুমি দুনাদুনি সেইরূপ করিয়া তাহাকে তাহার প্রতিশোধ দিবে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি আবার তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপন করিতে চাহে, তবে তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইও ও বন্ধুত্বস্থাপনে অসম্মত হইও না। সেই ব্যক্তি নিতান্তই অসুখী, যে এখন একজনের সঙ্গে, তখন আর এক জনের সঙ্গে, বন্ধুত্ব করিয়া থাকে। মনের কথা যেন মুখের ভাবে প্রকাশ না পায়। কখন অধিক লোকের ভোজদাতা হইও না; কাহাকেও একেবারে ভোজ দিবে না, যেন এমনও হইও না। অসতের সঙ্গী হইও না, বা সতের অবমাননা করিও না। যে ব্যক্তি দুর্দ্দশাপন্ন, নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে ঐ দুর্দ্দশার জন্য তাড়না করিও না; যেহেতু ঐ দুর্দ্দশা তাহার উপর দেবতাদের কর্তৃক নিয়োজিত। তাহাকেই সকলের অপেক্ষা প্রধান সম্পত্তি বলা যায়, যাহাকে লোকমধ্যে আপন জিহ্বাকে স্ববশে রাখা বলে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সৌন্দর্য্য তাহা, যাহাকে আগু পাছু ভাবিয়া চলা বলিয়া থাকে। যদি তুমি কাহাকে মন্দ কহ, তাহা হইলে হয়ত তোমাকে একদিন সেইরূপ মন্দ শুনিতে হইবে। যেখানে চাঁদা করিয়া বহুলোকে সমবেত হইয়া আমোদ করিতেছে, তথায় অভদ্রতা করিও না; কারণ এরূপ স্থানে, যথায় খরচের ভাগ কম ও আমোদের ভাগ বেশী, তথায় সেরূপ করা অন্যায়।

উপরে গ্রীক গৃহস্থের গৃহধর্ম্মব্যবস্থা দেখা গেল। এক্ষণে হিন্দুর গৃহধর্ম্মব্যবস্থা দেখা যাউক; কিন্তু অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। মহাভারত, যাহা সমগ্র হিন্দুনীতির রত্নাগারবিশেষ, তাহা হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত

করিয়া দেখান যাউক। গৃহস্থলে চারি বর্ণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এরূপ লিখিত হইয়াছে ১০ ;—

"দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপঃক্লেশসহিষ্ণুতা এবং যাহাতে অপর সাংসারিক কার্য্য সকলের সমাপ্তি হয়, এতাদৃশ বেদাধ্যয়ন করাই ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম। এইরূপ শান্তপ্রকৃতি ও প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্ম-রত না হইয়া স্বীয় কর্ম্মে রত থাকিলে, যদি অর্থ সকল স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি সন্তানোৎপাদনবাসনায় দার-পরিগ্রহপূর্ব্বক নিয়ত দান এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম করিবেন। অপিচ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, সেই অর্থ স্বজনগণের সহিত সমভাগে ভোগ করিবেন। বেদাধ্যয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

"হে ভারত! ক্ষত্রিয়গণের যে সকল পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ! ক্ষত্রিয় দান করিবেন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবেন না; যজ্ঞাদি করিবেন, কিন্তু যাজকতা করিবেন না; অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু কাহাকেও অধ্যাপনা করাইবেন না; প্রকৃতিপুঞ্জকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন; নিয়ত দস্যুবধে নিযুক্ত থাকিবেন; এবং রণভূমিতে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। যে ভূপতি অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভূমণ্ডলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিলোকবাসী লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় অক্ষতশরীরে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলে, দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করেন না; সুতরাং ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী নৃপতি বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবেন। ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ অধম ক্ষত্রিয়গণের প্রধানতঃ এই পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, পরন্তু দস্যু নিবর্হণ ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই ইহাদের কর্ত্তব্যতম বলিয়া

১০। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়।

অভিহিত হয় না। দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞই রাজগণের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ভূপতি প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থাপিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে সমভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ প্রজা-পালন দ্বারাই ভূপতির সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কার্য্য করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রধান রাজন্য বলিয়া অভিহিত হয়েন।

"যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যে সকল শাশ্বত ধর্ম্ম আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ উপায় অব-লম্বন দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং অনুরাগ সহকারে পিতার ন্যায় পশুগণ পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবে না। কারণ ইহা ভিন্ন অপর সমস্ত কার্য্যই তাহার অকর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টির পর ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণকে সর্ব্বজাতীয় প্রজা ও বৈশ্যগণকে পশুসকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্য তদনুসারে পশুরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেই সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে. এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। যে বৈশ্য ছয়টি ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতন স্বরূপ একটী ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে; শত গো-রক্ষক স্বীয় বার্ষিক বেতন রূপ একটি গোমিথুন প্রাপ্ত হইবে। শৃঙ্গ ও ক্ষুর ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে লব্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাহার সাংবৎসরিক বেতন। বৈশ্য পশুপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে, অপর কোন বর্ণেরই পশু সকল রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

"হে ভারত! শূদ্রগণেরও যে সকল পৃথক ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি শূদ্রগণকে অপর বর্ণ সকলের দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সকল বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের কর্ত্তব্য, তাহাদের শুশ্রূষা করিলেই শূদ্র সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়।

শূদ্র পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু কখনই ধনসঞ্চয় করিবে না, কারণ তাহারা ধনবান্ হইলে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগণকে বশীভূত করিতে ও অকার্য্য সকল করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু নৃপতির আদেশ অনুসারে লোভপরবশ না হইয়া ধর্ম্মপ্রধান কার্য্য সকল করিবার নিমিত্ত সামান্য ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে। শূদ্র যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; তাহাও বলিতেছি। শূদ্র, ব্রাহ্মণ আদি বর্ণত্রয়ের অবশ্যভরণীয়; উশীর-বেষ্টন, জীর্ণ ছত্র, উপানৎ এবং ব্যজন সকল পরিচারক শূদ্রকে প্রদান করিবে। অপরিধেয়, বিশীর্ণ বসন সকল শূদ্রকে প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা তাহাদেরই ধর্ম্মধন। ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র শুশ্রূষু হইয়া দ্বিজাতিগণের মধ্যে কাহারও নিকট গমন করিলে তিনি তাহার উপযুক্ত বৃত্তিকল্পনা করিয়া দিবেন। প্রতিপালক দ্বিজাতি অপত্যবিহীন হইলে শূদ্র তাহাকে পিণ্ড প্রদান করিবে এবং বৃদ্ধ অথবা দুর্ব্বল হইলে তাঁহার ভরণাদিও করিবে। অধিকন্তু যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কর্ত্তব্য নহে। প্রভুর দীনদশা উপস্থিত হইলে স্বীয় কুটুম্বগণ অপেক্ষা অধিকতররূপে তাঁহার ভরণাদি করা শূদ্রের কর্ত্তব্য; কারণ শূদ্রের যে কিছু ধনাদি থাকে, তৎসমস্তই প্রভুর, তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই।"—বর্দ্ধমানের রাজখরচে অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

শূদ্রের প্রতি আর্য্যদিগের এরূপ আচরণ, আর্য্যদিগের চির-অনপনেয় কলঙ্ক। ভারতের আদিম অধিবাসী শূদ্রদিগকে এখনও ভাল করিয়া বশ্যতায় না আনিতে পারার জন্যই বোধ হয় তাঁহারা তাহাদের উপর এরূপ কঠোর আচরণ করিতেন। মনু দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এখনও তাঁহারা তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, কারণ মনু এক স্থানে বলিতেছেন,—অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত কোথাও যাইবে না, একাকী কোথাও যাইবে না, অথবা শূদ্রের সহিতও

কোথাও যাইবে না ১১। সত্য সত্যই যদি শূদ্র এতটা অবিশ্বাসের স্থল থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আর উপরি-উক্ত কঠোর বিধিগুলিকে নিতান্ত দূষণীয় বলা যায় না। তবে গ্রীকদিগের সঙ্গে তুলনায় মন্দের ভাল এই যে, গ্রীকশূদ্রের ন্যায় ইহাদিগকে পালে পালে পশুবৎ শিকার ও বিনাশ করা হইত না ১২। পুনশ্চ গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—

"অপর-বল-পীড়িত শরণাগত জীবগণকে পরিত্রাণ করিলে গার্হস্থ্য-লভ্য পদ লাভ হইয়া থাকে। চরাচর ভূতগণের সর্ব্বপ্রকার রক্ষা এবং যথাযোগ্য পূজা দ্বারা গার্হস্থ্য পদ লাভ হয়। জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠ, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র এবং নপ্তৃগণের সময়ানুরূপ নিগ্রহ বা অনুরূপ কার্য্যই গার্হস্থ্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে পুরুষশার্দ্দূল! বিদিতাত্মা অর্চ্চনীয় সাধুগণের পূজা প্রভৃতি নির্ব্বাহ করাই গার্হস্থ্য কর্ম্ম। হে ভারত যুধিষ্ঠির! আশ্রমস্থ ভূতগণকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া ভোজ্যাদি দান করাই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যে পুরুষ বিধাতৃসৃষ্ট ধর্ম্মে রীতিমত অবস্থান করেন, তিনি সর্ব্বাশ্রমলভ্য মঙ্গলময় স্থান লাভ করিয়া থাকেন।" ১৩ পুনশ্চ

"আচার্য্য পিতা সখা আপ্তজন ও অতিথিকে, আমার গৃহে অদ্য এই খাদ্য দ্রব্য আছে, গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ নিবেদন করিবেন। তাঁহারা যাহা বলিবেন, গৃহস্থ ব্যক্তি তাহাই করিবেন, এইরূপ ধর্ম্ম বিহিত আছে। হে কৃষ্ণ! গৃহস্থ মানব সতত সকলের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। রাজা, ঋত্বিক, গুরু ও শ্বশুর সম্বৎসর কাল গৃহে বাস

১১। মনু ৪।১৪০।

১২। Plutarch, Lycurg. C. 22, Myron of Priene, Af. Ath. xiv., Plato Leg. I. গ্রীকদিগের মধ্যে অধমদিগকে যে পশুবৎ বিনাশ বা কঠোর শাসনে শাসিত করা হইত, তদর্থে এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে শূদ্র যদিও অতি নিকৃষ্ট ও প্রপীড়িত জাতি ছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহ গুণবিশিষ্ট হইলে, উচ্চ জাতিত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারিত। তদর্থে আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে,—"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবর্ত্তৌ, অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ।"

১৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১।৬৬।

করিলেও তাঁহাদিগকে মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। কুকুর শ্বপচ ও পক্ষিগণকে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভূতলে অন্নদান করিবে। যিনি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে বরলাভ করিয়া পরলোকে সুরপুরে বসতি করেন।" ১৪

এক্ষণে লোকাচার বিষয়ক নীতি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাউক। গ্রীকের নীতি—"তাহাকে ভালবাসিও, যে তোমাকে ভাল বাসিয়া থাকে ; এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হইও, যে তোমাতে অনুরক্ত হয়। সেইখানেই দান করিবে, যেখানে প্রতিদান পাইবার প্রত্যাশা আছে ; এবং সেখানে দান হইতে হস্ত গুটাইও, যেখানে প্রতিদানের সম্ভাবনা নাই।"—হেসিওদ।

"তোমার শত্রুকে মিষ্টবাক্য দ্বারা ভুলাইবে এবং যখন সে তোমার কথায় ভুলিয়া হাতে আসিবে, তখন আর কোন কথা না শুনিয়া উপযুক্তরূপে তাহার উপর প্রতিশোধ লইবে।

"হে কীর্ণো, তোমার বন্ধু বা পরিচিতবর্গের মধ্যে যাহাকে যেরূপ প্রকৃতির দেখিবে,তোমার আত্মস্বভাবকেও সেইরূপ স্বভাবের দেখাইয়া, তোমার সহ যাহাতে তাহাদের সহানুভূতি হয় সেইরূপ করিবে।

"সামুদ্রিক পলিপের যেরূপ ধর্ম্ম—আশ্রয়ের নিমিত্ত উদ্দিষ্ট শৈলকে বহু দিকে বিক্ষিপ্ত বহু হস্তের দ্বারা এরূপ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে সংলগ্ন হয় যে, আর তাহার পৃথকত্ব অনুভূত হয় না ; তুমিও সেইরূপ হইও। যখন যেমন দেখিবে, তখন সেইরূপে ভাব পরিবর্ত্তন করিবে।

"হে কীর্ণো, প্রত্যাগত নির্ব্বাসিত প্রভৃতির এখনও আশা আছে, ইহা ভাবিয়া যেন কখনও তাহাদিগের প্রতি সকরুণভাবে ব্যবহার করিও না ; কারণ, প্রত্যাগত হইলেও, সে যেরূপ ব্যক্তি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।"—থিওগনিস্।

এক্ষণে সমানার্থবোধক হিন্দুর নীতি দেখা যাউক ;—

"দানশূন্যকে দানের দ্বারা, অসত্যবাদীকে সত্যের দ্বারা,ক্রোধান্ধকে

১৪। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৯৭।

ক্ষমার দ্বারা, এবং অসৎকে সততা দ্বারা, এইরূপে যে যে ব্যক্তি দুষ্ট, তাহার দোষরাশিকে পরাজয় করিবে।

"শ্রেষ্ঠ এবং সৎ যাঁহারা, তাঁহাদের নীতি এরূপ। ইঁহারা বাক্য মন ও কার্য্যে কাহার অনিষ্টে রত হয়েন না এবং সর্ব্বভূতেই ইঁহাদের দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রচুর। ইঁহারা আত্মস্বার্থের প্রতি লক্ষ্যশূন্য, অপরের শুভতেই আনন্দিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যাহার প্রতি যে দয়া ও যাহার যে উপকার করিয়া থাকেন, তাহার জন্য কিছুমাত্র প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না।

"যদি সমস্ত সংসার তোমার বিপরীতাচরণ করে, তথাপি যথার্থ পথ হইতে কখনও স্খলিতপদ হইও না।"—মহাভারত, বনপর্ব্ব।

"কোন ব্যক্তি একান্ত পীড়িত হইলেও, কাহারও মর্ম্মপীড়াদায়ক কোন দোষ উল্লেখ করিবে না; যাহাতে পরানিষ্ট হয় এমন কর্ম্ম বা তাহার চিন্তা করিবে না, অথবা যে কথা বলিলে অন্য ব্যক্তি মনে ব্যথা পায় এমন মর্ম্মপীড়াকর স্বর্গলাভের বিরোধী কোন কথা বলিবে না।

"যে ব্যক্তি অঙ্গহীন, যাহার অধিকাঙ্গ, যে একান্ত মূর্খ, প্রাচীন, কুরূপ, নির্ধন ও কুৎসিৎ জাতি, তাহাদিগকে কাণা বৃদ্ধ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নিন্দা করিবে না।"—মনু।

গ্রীক জাতির স্বভাবসুলভ স্বার্থপরতার ভাগ পরিত্যাগ করিলে, হেসিওদ, থিওগণিস্ প্রভৃতিকে মোটের উপর বাস্তবিক সুনীতিবিৎ বলিতে হয়; কারণ ইহাদের সৎশিক্ষার ভাগও বিস্তর,—যদিও সেই সকল সৎশিক্ষা কথিত স্বার্থপরতা প্রভৃতির সহিত জড়িত হওয়ায় কখন প্রস্ফুটিত হইতে পায় নাই। লোকচরিত্রেও ইহারা প্রভূত দূরদর্শনসম্পন্ন ছিল; তৎপক্ষে ইহাদের শিক্ষা সমস্ত অতি সুন্দর।

লোকাচারের বিষয় এই পর্য্যন্তেই পর্য্যাপ্ত হউক [১৫]।

১৫। ইতিহাসবিৎ গ্রোট ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভ বা হোমারিক সময়স্থ গ্রীক চরিত্রসম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছে, "When however among the Homeric men we pass beyond the influence of the private ties above enumerated, we find

৩। গৃহাচার ও স্ত্রীচরিত্র।

গৃহাচার কিরূপ, তাহা একটু দেখা যাউক। এই গৃহাচারের সর্ব্বপ্রধান মূল ও মহাভিত্তি স্ত্রী-সতীত্ব, যেহেতু উহারই উপর গৃহধর্ম্মের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। এখন দেখ, এই স্ত্রী-সতীত্ব উভয় জাতির মধ্যে কিরূপ এবং কি জন্য ও কতটা পরিমাণে আদরের পদার্থ ছিল। হিন্দুর নিকট স্ত্রীসতীত্ব রক্ষার প্রথম প্রয়োজন,—পুত্রপ্রদত্ত জলপিণ্ড পরলোকে দুঃখনিস্কৃতির একটি অতি প্রধান উপায়; সুতরাং যে সন্তানের উদ্দেশ্য এত গুরুতর, তথায় সে সন্তান যাহাতে যথার্থতঃ পিতৃজাত হয় এবং তাহার উৎপাদনকার্য্য কোনরূপে দুষ্ট হইতে না পায়, বা তাহার ক্ষেত্র কোন প্রকারে দুষ্ট না হয়, তদর্থে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত[১৬]। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী নিত্যকালের নিমিত্ত সঙ্গিনী এবং

---

scarcely any other moralising forces in operation. The acts and adventures commemorated imply a community wherein neither the protection nor the restraints of law are practically felt, and wherein ferocity, rapine, and the aggressive propensities generally, seem restrained by no internal counter-balancing scruples. Homicide, especially, is of frequent occurrence, sometimes by open violence, sometimes by fraud: expatriation for homicide is among the most constantly recurring acts of the Homeric Poems: and savage brutalities are often ascribed even to admired heroes, with apparent indifference. * * * * Moreover, celebrity of Autolykus, the maternal grandfather of Odysseus, in the career of wholesale robbery and perjury, and the wealth which it enabled him to acquire, are described with the same unaffected admiration as the wisdom of Nestor, or the strength of Ajax. * * * * The vocation of a pirate is recognised and honorable, so that a host, when he asks his guest what is the purpose of his voyage, enumerates enrichment by indiscriminate maritime plunder as among those projects which may naturally enter into his contemplation," etc.—*Grote's History of Greece* II. বলা বাহুল্য যে কি প্রাচীন কি মধ্যসাময়িক, সমস্ত হিন্দুসংসার খুঁজিয়া এরূপ ছবি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

১৬। মনু, ৯।৭ ও কুল্লুকভট্ট-কৃত তাহার টীকা। পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য,

"লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ কর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥"

সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপথের একমাত্র সহায়; সুতরাং মানুষের কেবল ইহ-জন্মের নহে, জন্মান্তরবাহী ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মাচরণ পর্য্যন্তও যাহার সহায়তা এবং সঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা-কল্পে আর কি অধিক ও গুরুতর কারণ কল্পিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে? তৃতীয়তঃ, স্ত্রী গৃহস্বামিনী এবং প্রণয়িনী; দেহমনের পবিত্রতা ভিন্ন, অকপট গৃহকর্ত্তৃত্ব ও বিশুদ্ধ প্রণয় প্রসূত হওয়া অসম্ভব। একা স্ত্রী বা একা পুরুষ কেবল অর্দ্ধ মনুষ্যপদে গণ্য, উভয় সংযোগেই পূরা মানুষ বলা যায়। অতএব যে স্ত্রী এরূপ সহধর্ম্মিণী এবং দেহ-মনার্দ্ধভাগিনী; সে যাহাতে স্বীয় স্বামীতে অনন্যগতি ও অনন্যমতি হয়, তদুদ্দেশে হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও এমন সকল বিধি প্রদান করিয়াছেন যে, "ব্রত, জপ, হোম, বা শত শত উপবাস, ইহার কিছুই কোন কার্য্যে আসিবে না; কেবল একমাত্র পতিশুশ্রূষা যে করিবে, সেই স্বর্গে যাইতে পারিবে"[১৭]। প্রোক্ত কারণপরম্পরার আধিপত্যে এবং বিষয়টিরও

পুনশ্চ ভগবান্ মনু বলিতেছেন,

"প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়া শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষারতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥"

স্কন্দপুরাণস্থ কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে,

"ভার্য্যা ধর্ম্মফলাবাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে।
পরলোকস্ত্বয়ং লোকো জীয়তে ভার্য্যয়া দ্বয়ং।
দেবপিত্রতিথীজ্যাদি নাভার্য্যঃ কর্ম্মচার্হতি॥"

১৭। প্রায় সকল স্মৃতিকার ও সকল শাস্ত্রকারই এতদর্থে কিছু না কিছু শাসন করিয়া গিয়াছেন;—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"—বিষ্ণুসংহিতা।

নিজগুণে বটে, এই স্ত্রী-সতীত্ব ক্রমে এ সংসারক্ষেত্রে হিন্দুচিত্তের নিকট অমূল্য রত্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং আজিও তদ্রূপ দাঁড়াইয়া আছে এবং সেরূপ থাকা প্রার্থনীয়ও বটে। গ্রীকের কিন্তু সেরূপ নহে; এখানে স্ত্রী-সতীত্ব বিষয়ের শাসন,সাংসারিক দান-প্রতিদান এবং পরস্পরের আত্মস্বার্থ ও তদতিরিক্তে ধর্ম্মোদ্দেশ্যশূন্য ইহলোক-বদ্ধ দৃষ্টি, এই সকলে যতদূর করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই। স্বামী ভাবিতেছে, আমি যখন খাইতে পরিতে দিতেছি, তখন কেন সে অন্যের সহবাসে সতীত্ব ভঙ্গ করিবে; স্ত্রী ভাবিতেছে যে, যখন এই ব্যক্তি আমার সমস্ত অভাব পূরণ করিতেছে, তখন প্রতিদানে তজ্জন্য সতীত্বটা রক্ষা করা উচিত। পুনশ্চ, বিবাহবন্ধন যত দিন, পথান্তরগমনে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ হইয়া, ততদিন সতীত্ব রক্ষা করিলেই যথেষ্ট। সে যাহা হউক, এতদ্রূপ চুক্তিমূলক সতীত্বটুকুরও আবার, আরও একটু প্রাচীন কালে, তত আঁটাআঁটি ছিল না; সুতরাং সতীত্বও তখন সেই পরিমাণে শিথিলবন্ধন ছিল বলিতে হইবে। হিন্দুর নিকট সতীত্ব ভাল, ধর্ম্মবুদ্ধিতে; গ্রীকের নিকট সতীত্ব ভাল, দানপ্রতিদানের বাঁধাবাঁধিতে। সুতরাং হিন্দু স্বামী নানা দোষে দূষিত হইলেও, হিন্দু স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষণীয় সতীত্বের খাতিরে; আর গ্রীক স্বামী একটু এদিক

"পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমাং গতিম্॥"—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

"ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা তীর্থব্রতানিচ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমার্চ্চয়েৎ॥"—
ভৃগুভারতীয় কর্ম্মবিপাকে।

"গয়াদীনাং সুতীর্থানাং যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদপি॥"—পদ্মপুরাণে, ভূমিখণ্ডে।

"গুরুবিপ্রেষ্টদেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যশ্চ পতিগুরুঃ।"
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

বেদেও পতিব্রতার বহুশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অগ্নি কিরূপ শুদ্ধ হয়েন, তাহার উপমাস্থলে কথিত হইয়াছে, "অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী"—ঋঃ বেঃ।

ওদিক হইলে, গ্রীক স্ত্রীর সতীত্বরক্ষা পক্ষে কারণাভাব। এরূপ স্থলে, গ্রীক রমণীর সতীত্ব ভঙ্গ হইলে, কিয়ৎপরিমাণে তাহা সমাজে অযশস্কর হইত বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া যে সে হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় একেবারে হেয় এবং সমাজ ও কুলবহিষ্কৃত হইয়া যাইত, বা মিটাইয়া দিলে মিটিত না, এমন নহে। হয় স্বামী ক্ষমাগুণে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারিত এবং তাহাতে কিছুমাত্র উপহাসের বিষয় হইত না; নতুবা সে স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিত এবং তাহাতে সে বিবাহে কিছুমাত্র বাধকতা জন্মিত না। আরও দেখা যায় যে, স্বামী, যখন ইচ্ছা, আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত; এবং সেরূপ ত্যাগ করিতে হইলে, যথাসম্ভব কিছু অর্থ দিয়া সেই কামিনীকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইত [১৮]। মানিলস্ স্বচ্ছন্দে হেলেনকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিল; হেলেনও আপনার সতীত্বভঙ্গ ও বহুকাল পরসহবাস হেতু স্বামীর নিকট যে কিছু বিশেষ অপ্রতিভ হইয়াছিল, তাহা নহে। ওডিসী কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে, যেখানে টেলিমেকসের নিকট হেলেন ট্রয়বৃত্তান্তের উল্লেখ করিতেছে, তথায় তাহার ভাবভঙ্গী অনুধাবন করিলে বড় একটা সেরূপ অপ্রতিভ ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইউলিসিস্‌পত্নী পেনিলোপিকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত, ইথেকাদ্বীপে বহু প্রণয়প্রার্থীর সমাগম বিখ্যাত। গ্রীকেরা এ বিষয়ে সময়ে সময়ে এতই উদারতা দেখাইয়াছে যে, আপন হইতে অপর বীরপুরুষের প্রতি অনুরাগ দেখিলে, স্ত্রীকে স্বচ্ছন্দে তাহার

১৮। Odyssey II., 113—131. এণ্টিনোস কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া টেলিমেকস বলিতেছে,—"সন্তান হইয়া কিরূপে পুনর্ব্বার বিবাহার্থে স্বাধীনতা দিয়া, মাতাকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইয়া দিব।" বিশেষতঃ তাহার মাতাকে তদ্রূপ ফেরত পাঠাইলে যে অর্থদণ্ড দিতে হয়, মাতামহ ইকারিয়সকে তদ্রূপ অর্থদণ্ড দেওয়া তাহার সামর্থ্যের অতীত বলিয়া টেলিমেকস্ প্রকাশ করিতেছে। এতদ্দৃষ্টে স্কলিয়াষ্টমতে এরূপ কথিত যে, গ্রীসীয় নিয়মমতে, স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইলে, স্ত্রীর পিতাকে অর্থ দণ্ড দিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

সহবাস করিতে অনুমতি দিয়াছে; তাহাতে যদি কোন সন্তান জন্মিত, তাহা হইলে সেই সন্তানকে তাহার জনকের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেই সে ঘটনার সকল চিহ্ন লোপ পাইত; স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধের উপর অতঃপর উহাতে আর কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা করিত না। দুই ঘর গৃহস্থের এক গৃহিণী, দুই বংশের বংশধরের একই জননী হইতে উৎপত্তি, ইহা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত ১৯। এরূপ ঘটনার ঘটনাস্থলী স্পার্টা প্রদেশ, ফলতঃ তথায় সতীত্ব কাহাকে বলে, তাহা বড় একটা জ্ঞাত ছিল না। স্পার্টাদেশে, স্বীয় স্ত্রী যথাপ্রথা অপর কাহারও অঙ্কগত হইলে, স্বামী যদি তাহাতে ঈর্ষ্যা বা কোনরূপে বিরক্তি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে সে সমাজস্থগণের নিকট উপহাসের পাত্র হইত। কেহ কাহার সুন্দরী বা গুণশালিনী স্ত্রী দেখিয়া তাহার সহবাসে উৎসুক হইলে, স্বামীর নিকট তজ্জন্য আবেদন করিতে হইত এবং স্বামীও সামাজিক নিয়মে সে আবেদন বড় অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। স্ত্রীর উপর তদ্রূপ কাহারও নজর পড়িলে, অসূয়ার পরিবর্ত্তে তাহাতে বরং স্বামী গৌরব অনুভব করিত। উদারতা বটে! গ্রীক দেবমণ্ডলে প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি আফ্রোদিতি, তিনি ব্যভিচারিণীর শিরোমণি। সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি দীয়ানা, তাঁহার ক্রমান্বয়ে এণ্ডিমিয়ন, প্যান এবং ওরিওনের প্রতি আসক্তি ও রতি! ইহার পরে আর অন্য কথা কি আছে! সীতা বা সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় সতী, অথবা বনগমনকালীন স্ত্রী সঙ্গে লইবার জন্য রামের অমত হেতু তৎপ্রতি সীতার বাক্য ২০,

---

১৯। Grote's History of Greece, II 520. "No personal feeling or jealousy on the part of the husband found sympathy from any one—and he permitted without difficulty, sometimes actively encouraged, compliances on the part of his wife," etc. etc.

২০। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ২৭ হইতে ৩০ সর্গ,—রামসীতার উক্তিপ্রত্যুক্তিতে সীতা বলিতেছেন;—

"ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ,
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।

—সমস্ত গ্রীকসংসার খুঁজিয়া কোথাও সে সকলের তুলনা পাইবার সম্ভাবনা নাই; অন্ততঃ আমার চক্ষে কোথাও পড়ে নাই। যে সতীত্ববুদ্ধি গ্রীকমণ্ডলীতে ছিল, অল্প ইতরবিশেষে পাশ্চাত্যভূমিতে আজিও প্রায় সেই বুদ্ধি বিরাজ করিতেছে; তথাপি জাঁক কত! তবে কি না, স্ববিষয়ে জাঁকই এ সংসারে দারুণ বোধাভাবস্থলেও প্রবোধ ও শান্তিদায়িনী।

স্ত্রী-স্বাধীনতাও গ্রীসে অপরিমিত ছিল[২১]। স্ত্রীপুরুষে সংমিলিত

যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব,
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্।"

কি অপূর্ব্ব! কি অপূর্ব্ব! বিধাতঃ, ভারতকন্যার আদর্শরূপিণী লোকমাতা জানকীর এই কথাগুলি কি মধুর ও অমৃতপূর্ণ! দেবীর সেই প্রেম ও সতীত্বগর্ব্বিত মুখে বাক্যস্ফুরণ, কর্ণে কর্ণে এখনও যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং তাহাতে হর্ষিত ও বিমোহিত হইতেছি!—যে রত্নগর্ভাগর্ভে এবম্ভূত সাধ্বীগণ, যে রত্নগর্ভাগর্ভে এবম্ভূত সাধ্বীমুখনিঃসৃত বাক্য, উৎপাদন করিয়াছিলে; বলিতে পার, কোন প্রাণে আবার তাহাকে এরূপ অধঃপাতিত ও বিড়ম্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছ। মাতঃ ভারতলক্ষ্মি. মা কোন পাপে তোমার এ বিড়ম্বনা? তোমার এ কুসন্তান মহলে যে, 'তপশ্চরণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব' এ সান্ত্বনাবাক্য বলি, সে সাহসও আমাদিগের নাই। এ টিকটিকীর বংশ নিপাত না হয় কেন!

২১। হোমারিক সময়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইতিহাসজ্ঞ গ্রোট লিখিতেছে; "She even seems to live less secluded and to enjoy a wider sphere of action than was allotted to her in historical Greece."—Grote's, II. ইংরাজচিত্ত চিত্রিত বলিয়াই, ঐতিহাসিক কালের গ্রীক স্ত্রী-স্বাধীনতাও আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলিয়া অবধারিত ও বর্ণিত হইয়াছে। নতুবা সে স্ত্রীস্বাধীনতা ফলতঃ কতদূর প্রশস্ত ছিল, তাহা ঐ পুস্তকের ৫১৬ হইতে ৫২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টে বিবেচ্য। উদ্ধৃত অংশে "Secluded" শব্দ দৃষ্টে যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, ঐতিহাসিক সময়ে গ্রীসে জেনানা ঘোমটা বা অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহা নহে। স্ত্রীগণ স্বচ্ছন্দে বাহির হইত, প্রায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পাইত, পর্ব্বাহে মাতামাতিও প্রায় সমান ছিল এবং তদুৎপন্ন কুক্রিয়াসক্তিরও ন্যূনতা ছিল না; অতএব ঐ "Secluded" শব্দ পূর্ব্বাবস্থার তুলনে, আপেক্ষিক অর্থবোধক মাত্র।

বাহু কুস্তিকুন্দন পর্য্যন্ত করিত; আবার পর্ব্বাহস্থলে, স্বাধীনতা ছাড়াইয়া, স্বাধীন প্রেমাদিরও চলাচলি পক্ষে ত্রুটি হইত না। ভারতে তাহা ছিল না; অল্প ইতরবিশেষে, ভারতললনা চিরকালই গৃহমধ্যে আবদ্ধা ও "অসূর্য্যম্পশ্যরূপা"; তবে স্থানবিশেষে এবং ধর্ম্মকর্ম্মকালে, পতি পুত্র বা তদ্রূপ আত্মীয়াদির সহযোগে কখন কখন বাহির হইতেন। মুখাবরণের ঘটা সে সময়ে তাদৃক্ ছিল না, সুতরাং স্ত্রীলোকে কিছু দেখিতে পায় না বলিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার স্বপক্ষে এখন যাহা কারণ স্বরূপ দর্শিত হইয়া থাকে, সে কারণের অস্তিত্ব তখন বড় একটা ছিল না। গুরু, ঋষি, আত্মীয়বর্গ, ইহাঁদের সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহিবার অধিকার ছিল। ইহার অতিরিক্ত আর কোন স্বাধীনতা ছিল না।

কিন্তু স্ত্রীদিগের তদ্রূপ স্বাধীনতা এখনই কোন্ কম আছে?—তবে বিলাতি ধরণে পুরুষের সঙ্গে সামাজিক-সংমিশ্রণ ও গলাগলি অবশ্য নাই বটে। সামান্যজাতীয়া স্ত্রীলোকের যথাতথা গমন ও যাহার-তাহার সঙ্গে বাক্যালাপে, বড় একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না। ভদ্রকুলজাতাগণের মধ্যেও, গ্রামস্থলীতে চলাফেরায় স্বাধীনতা কত, গ্রামবাসিমাত্রে তাহা অবগত আছে। প্রৌঢ়াগণ সাধারণতঃ গা মেলিয়া ঘাটে মাঠে পথে ও তীর্থ প্রভৃতিতে কোথায় না যায় ও কাহার সঙ্গে না কথা কয়?—যুবতী সম্বন্ধে অবশ্য সেই সেই বিষয়ে অনেকটা বাঁধাবাঁধি আছে বটে এবং গুরুতর সম্পর্কীয় আত্মীয় পুরুষের সঙ্গেও বাক্যালাপ নিষিদ্ধ; কিন্তু তাহা অকর্ত্তব্য বা অবিবেচনার কার্য্য নহে। যুবতীর প্রতি যে বাঁধাবাঁধি, তাহাও শ্বশুরালয়ে এবং তথায় অন্য কারণে তত নহে, যতটা সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে; নতুবা এদিকে আবার পিতৃ বা মাতুলালয়াদিতে সে সকল বাঁধাবাঁধি কত কম; নাই বলিলেও চলে। ইহার উপরেও যাহারা বলিয়া থাকে যে, ভারতীয় স্ত্রীলোকগণ অতি শোচনীয় ভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ ও কয়েদীয় ন্যায়; তাহারা হয় অন্ধ, নতুবা জ্ঞানপূর্ব্বক ও মতলববাজীতে মিথ্যারটনা করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষের যদৃচ্ছা-সংমিশ্রণে, স্বীয় স্বীয় সততা রক্ষাকল্পে যে নৈতিক ও

মানসিক শক্তির কার্য্যকারিতা রটিত হয়, আমার বিবেচনার তাহা কষ্টকল্পনা ও উপন্যাসাতিরিক্ত নহে। কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, অথবা বলিতে দিউক বা না দিউক, উভয়তঃ আত্মসভ্যতা তাহাতে অতি অল্পই রক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার পর যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া পথে ঘাটে যে বর্ত্তমান আঁটাআঁটি, তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়। বাপু বাঞ্ছারাম, অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, স্ত্রীলোক লইয়া গা মেলিতে যাওয়া, বিশেষতঃ পথে ঘাটে, অতি নির্ব্বোধের কার্য্য! যেমন আছে তেমনি থাকুক। জীবনে তোমার সকল গিয়া এখন গৃহসুখটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহারও মূলে স্বেচ্ছায় কুঠারাঘাত করিও না।

ভারতকন্যা আজি কালি এল,এ, হইতেছেন; বি,এ, হইতেছেন; মন্দ কি? ঘর করিতে সকল রকমই থাকা ভাল। গ্রামের মধ্যে একজন বা খুব খাইয়ে থাকে, একজন বা খুব পলোয়ান থাকে, একজন বা খুব নকুলে থাকে, হলো বা একজন বিদ্যাবাগীশও থাকিয়া থাকে। এ সকলে বিশেষ কাহারও কোন কাজ হউক বা না হউক, কিন্তু ইহারা গ্রামের শোভা, গ্রামের আসবাব; ঘর করিতে গুমরের স্থল। এল, এ, ভারতকন্যা, বি, এ ভারতকন্যা, ইহারাও সেইরূপ দেশের আসবাবের স্বরূপ; বহুজনকে গুমর করিয়া দেখাইবার পদার্থ! সুতরাং ইহাদের স্বাধীনতাও অনেক, স্বাধীনতার আবশ্যকও অনেক। কিন্তু সংসারশুদ্ধ সকলেই আসবাব হইলে বিধাতার সৃষ্টি চলে না; বা সবাই যদি গুমরের স্থল হয়, তবে গুমরের গুমরত্ব থাকে না। সুতরাং গুমর ও আসবাবের স্বাধীনতাও অপর সকলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। গৃহকামিনীগণ, স্বামীসন্তানাদি লইয়া গৃহকার্য্য যাহাদিগের নিত্য ব্রত, দেখা যাউক তাহাদিগের স্বাধীনতা কি পরিমাণে উপযুক্ত এবং আবশ্যক হইতে পারে। ইংরেজেরা করিতে বলে এবং ইয়ং-বেঙ্গলেরা করিতে উদ্যত,—আয়া! ইয়ংবেঙ্গলদিগের ইহাতে কি

বিশেষ লাভ আছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইংরেজদিগের লাভ ইহাতে অনেক;—স্বামী গোলাম, স্ত্রী আয়া, ইহা অপেক্ষা সুখের প্রভুত্ব আর কি হইতে পারে? সে দিন একটী ইংরেজ মেয়েমানুষের সঙ্গে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটী বাঙ্গালী স্ত্রী দেখিলাম। গোলাম কেরাণী স্বামীর মত; বাঁদী আয়াবৎ স্ত্রীলোকটীর কুঞ্চিত শরীর, নিম্নদৃষ্টি ও অবনত মস্তক দেখিয়া, আমার চক্ষুকে মনের খেদে বলিলাম, বলি তুমি এক ফোঁটা জল ফেল! কামিনীসুলভ কোমল ঠসক, বামনয়নের চটুল চাহনী, ভুবনভুলানী কমনিয়তা, যেন বাপ্ বাপ্ করিয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছে! জগজ্জয়ী সাধ্যসদয় কামিনীহৃদেও কুটিল হীনতার কালিমাচ্ছায়া!!—বলিতে কি বাঙ্গারাম, রাগ ঝাল ও তাপে সে রাত্রিতে আমার ঘুম হয় নাই। এ পরভাগ্যোপজীবী গোলামের জাতির ঘৃণাপিত্তি কিছুই নাই। স্ত্রীমহলেও যদি গোলামীবুদ্ধি প্রবেশ করে, তবে আমাদের আর আশা ভরসা বা উপায় রহিল কি?—মান অপমান ত দূরের কথা! এ হীনতা অপেক্ষা ঘরে থাকে, বাহিরে না দেখে, কিছু না বুঝে, স্বীয় ক্ষুদ্র আয়তনে অধীশ্বরীবোধে নিত্য চটুলতা ও আনন্দময়ী মূর্ত্তি;—ইহাতে অনেক সুখ, অনেক পবিত্রতা, অনেক উচ্চতা। কিন্তু হায়, এ পাগলের হাটবাজারে বুঝে কে, বুঝায় কে!

বাপু ভারতকুপোষ্য বাঙ্গারাম, আগে নিজের মাথা একটু নিজে তুলিতে, নিজের মান একটু নিজে রাখিতে, নিজের স্বাধীনতা একটু নিজে সাধিতে শিখ; তাহার পর তোমার গৃহলক্ষ্মীর স্বাধীনতা ও সহজ প্রবৃত্তির বিষয় লইয়া ভাবিও। তুমি গোলামস্য গোলাম, পুরুষত্ব তোমার "যেআজ্ঞা ও যো হুকুমে," আর স্ত্রী তোমার স্বাধীন?—শুনিবার কথা, হাসিবার কথা বটে! পেটের ভাত যাহার লাথিঝাঁটার এবং মুনিবতোষ যাহার আত্মবিক্রয়ে, তাহার আবার স্ত্রীস্বাধীনতা! পোড়ার মুখ আর কি!! বাপুহে, ভারত-উদ্ধার ভাল কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি ধরিবে পায় আর তিনি ধরিবেন হাতে, কেবল তাহাতে ভারত উদ্ধার হয় না; অত ব্যস্ত হইও না, একটু ধৈর্য্য

ধর। তুমি পায়ে ধরিয়াছ সেই ভাল, তাহাতেই ভারত এখন আধাপথে উঠিয়া অবস্থিতি করিতে থাকুক; আর অর্দ্ধেক উঠাইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পুরুষত্ব ও হৃদয়বল যাহাতে হয়, তাহার যত্নে যত্নবান্ হও।

শাসনফলে জগৎ, শাসনময় জগৎ। উদ্দেশ্য শুদ্ধ সত্তা। এ জগতে বা এ বিশ্বে পর পর সকলেই শাসনের অধীন, স্বাধীন কেহ নাই; অথচ অধীনতাতেই স্বাধীনতা। বিনা অধীনতায় স্বাধীনতা অসম্ভব। খৃষ্টের না শিক্ষা,—সেই মানুষই প্রকৃত স্বাধীন যে উর্দ্ধতন ইচ্ছার নিকট অধীনতাযোগে বিনত হয়? ফলতঃ এ সংসারে সবাই অধীন; ভূত আত্মার, লঘু গুরুর, নীচ উচ্চের, ছোট বড়র, অজ্ঞানী জ্ঞানীর, অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য, অধম যে সে শক্তিন্যূনতায় বিপথে বিচলিত না হয়; শ্রেষ্ঠ যে সে আপন শক্তির ভার দানে সেই শক্তিন্যূনতার সমতা সাধন করে। ইহা দ্বারাই অধমের শুদ্ধসত্তা রক্ষা হয়। ন্যূন শক্তির সমতা সাধিত হইলে, তখনই কেবল সে শ্রেষ্ঠ শক্তির সহ সংমিলনে পারক হয় ও সংমিলিত হইয়া থাকে। এই সংমিলন হেতু ফলের উৎপত্তি; সেই ফলেই এই সৃষ্টিলীলার প্রবাহ বাহিত হয়। নতুবা সেই সমতায় যখন যখনই অভাব দৃষ্ট হয়, তখন ন্যূন শক্তি স্বীয় ন্যূনতা হেতু মতিভ্রান্ত এবং শ্রেষ্ঠ শক্তি স্বীয় শক্তির আধিক্য হেতু উন্মাদদৃপ্ত হইয়া থাকে; এবং তখন তখনই শ্রেষ্ঠ শক্তির সেই উন্মাদ-ঘূর্ণাতে ন্যূনশক্তি আহুতি হইবায়, উচ্ছৃঙ্খলতা বা সৃষ্টিনাশে প্রলয়কাণ্ডের সমুপস্থিতি হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, স্ত্রী এবং পুরুষ, ইহার মধ্যে ন্যূন শক্তিই বা কে, আর শ্রেষ্ঠ শক্তিই বা কে? যুগধর্ম্মে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, নতুবা ইহা নিত্য নিয়মে নিয়মিত ও স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিক ও ইউরোপ ভূমের অনেক ললনা, কখন কখনও বা ভারতললনাস্থলীয় এবং বুদ্ধি বাহু ও ব্যবহারে ললনাবৃত্তি দুই একটি অনুকরণকারী অতিগামী পুরুষ, বলিয়া থাকে যে, পুরুষ এবং স্ত্রী ইহাদের মধ্যে শক্তির প্রভেদ কোথায় এবং কেনইবা স্ত্রী, সমাজমধ্যে

পুরুষের সহ সমানাধিকারযুক্ত এবং সমানরূপ ক্ষমতাভূষায় ভূষিত ও ক্ষমতাগৌরবে গণনিত ও মাননিত না হইবে? বাঞ্ছারাম, আরও কি অবিশ্বাস আছে যে, কলিযুগে তাবৎ বিষয় উল্টা হইয়া দাঁড়াইবে? ভাল, পশুসৃষ্টিতেও ত পুরুষ-স্ত্রী-ভেদ আছে, সেখানেত প্রাকৃতিক শাসন এবং সে শাসনে ন্যায্য ভিন্ন অন্যায্য কথনও হয় না। সেখানে কি দেখ,—তাহা দেখিয়াও কি জ্ঞান জন্মে না? অথবা হয় ত বলিবে, বাঘ শিকার করে বাঘিনীও শিকার করে, আনাচ-কানাচ খোঁয়াড়-খোলা বাঘ বাঘিনীর ত সমানই অধিকার; তবে আর তায় প্রভেদ কোথা!—হারি মানিলাম!

বিধাতা রমণীগণকে ক্ষীণশক্তি ও কোমলপ্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বাহুচালনে কি বুদ্ধিচালনে, পুরুষের কোন অংশেই তাহারা সমকক্ষ নহে। পুরুষ চলে বুদ্ধিবশে, কিন্তু স্ত্রীলোক চলে চিত্ত বা হৃদয়বশে; সুতরাং ভালয় হউক মন্দয় হউক, পুরুষ এক পা চলিতে দুই পা ভাবে, কিন্তু স্ত্রী একবার চলিতে আরম্ভ করিলে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া যায় এবং সীমায় না গিয়া ক্ষান্ত হয় না। তাই সতে বা অসতে, স্ত্রী যতটা উচ্চগমন বা অধঃপতনে সক্ষম, পুরুষ ততটা পারে না। পুরুষে বুদ্ধিপ্রাবল্য হেতু, সে পতিত হইলে তাহাকে ফিরান যায়; কিন্তু চিত্তাধিক্য হেতু, স্ত্রী একবার পতিত হইলে আর তাহাকে ফিরান দায়। অতএব যদি আর কিছুর জন্যও না হয়, অন্ততঃ স্ত্রী-চিত্ত এবং হৃদয়ের অতিগমন নিবারণের জন্য, পুরুষবুদ্ধির নিকট স্ত্রী-বশ্যতার একান্ত ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন। ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম যে, তত্তৎ বিষয়ে এবং রমণীজনোচিত যাবতীয় বিষয়ে, তাহারা পুরুষের মুখাপেক্ষী। যাবতীয় প্রাণিসৃষ্টিতেও তাহাই সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত স্ত্রীগণ শ্রেষ্ঠশক্তি পুরুষের অধীন থাকিবে, ইহাই বিধাতার নিত্য নিয়ম; ইহার অতিরিক্তে যাহারা যায়, তাহাদের 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা' ভিন্ন তাহার অন্য কোন নাম প্রদান করিতে পারা যায় না এবং আমরা জানি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাহা কথনও

সুফলপ্রদ হয় না, কুফলেরই প্রভূতরূপে উৎপাদন করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের অধীন হইবাতে, পুরুষের এক্ষণে কর্ত্তব্য হইতেছে এই যে, তাহার শ্রেষ্ঠশক্তিপরিচালনের দ্বারা ন্যূনশক্তি স্ত্রীর শুদ্ধসত্তা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা; এবং স্ত্রীশক্তি সহ স্বীয় শক্তি মিশাইয়া উভয় শক্তির সমতা সাধন করা। এই শক্তিসমতা হেতু পূর্ণমনুষ্যত্বের সম্ভব হয় এবং এই হেতু উভয় সংযোগে পূরা, নতুবা পুরুষ হউক স্ত্রী হউক একক ভাবে অর্দ্ধ মানুষ বলা যায়। সে যাহা হউক, সকল কথার উপর শুদ্ধসত্তা রক্ষা যাহা তাহাই অতি গুরুতর। এক্ষণে বিবেচ্য, সেই শুদ্ধসত্তা কি ও কিভাবে পরিরক্ষণীয় হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের এ সংসারে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, কোন উপযুক্ত পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হইয়া স্বামী শুশ্রূষণ, সন্তানাদি পালন ও আভ্যন্তরিক গৃহধর্ম্ম সংসাধন। পুত্র ষষ্ঠীদাস, স্বয়ং ষষ্ঠীদাসী এবং স্বামীকে ষষ্ঠীর চেলা না করিয়া; অথবা পুত্র ক্রীড়াপুতুল, স্বয়ং কার্পেট-লক্ষ্মী এবং স্বামীকে ভেড়ো না বানাইয়া; যে স্ত্রী স্বয়ং শক্তিরূপা এবং সেই শক্তির উত্তেজনে পুত্রকে যে মানুষ এবং স্বামীকে যে কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে পারে, সেই স্ত্রীই এ জগতে সার্থকজন্মা, সেই কামিনীই এ জগতে যথার্থতঃ কামিনীপদবাচ্য;—"যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।" এ জগতে প্রত্যেক কামিনীর পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে এবং এই পথই অক্ষুণ্ণভাবে অবলম্বন করা উচিত; না করিলে প্রত্যবায় আছে। স্ত্রীলোকেতে যে কিছু মহত্ত্ব, তাহা কেবল এই পথে রক্ষিত, স্ফুটিত ও ফলশালী হইতে পারে। বৈধব্য হেতু যাহার সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে, বা যাহার যত্ন সত্ত্বেও স্বামীপুত্রসংশ্রব অপ্রাপ্য, তাহার জন্য কেবল অন্য ব্যবস্থা বা অন্য পথ। যাহাহউক অতঃপর, স্ত্রীলোকের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা কথিত হইল, দেখা যাউক তাহা কিরূপ প্রকরণ ও আচরণযোগে সুভাবে ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্নরূপে সুসাধিত হইতে পারে। প্রকরণ ও আচরণের মধ্যে মূল সূত্র যাহা, তাহা স্বামীর প্রতি

অকপট প্রণয় ও পূর্ণ আসক্তি। স্ত্রী প্রণয় ও আসক্তির দ্বারা স্বামীকে আকর্ষণ করিবে; স্বামীও তাহাকে যথোপযুক্তরূপে পরিচালন দ্বারা সেই প্রণয় পরিপোষণ করিবে এবং তাহার গৃহকার্য্যাদি সংসাধন ও সে সকলে সুমতি সংস্থাপন পক্ষে, প্রতিকূল কারণ যে কিছু, তাহার নিরসন করিয়া দিবে। ইহার দ্বারা উভয় শক্তির সমতা সম্পাদিত হইবাতে, সুসংমিলন হেতু ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ, স্বামীকে স্ববশে আনিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে, স্ত্রীলোকের একমাত্র মহান্ অস্ত্র,——সর্ব্বদা সুমুখে স্ফূর্ত্তিযুক্ত প্রণয় প্রক্ষেপণ; নতুবা তাহা রাগ ঝাল বা স্বাধিকারঘোষণা দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না। স্বামী স্ববশে আসিলে, তখনই স্ত্রীলোকের প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোমুখী কার্য্যক্ষমতা জন্মে এবং তখনই স্ত্রীলোক, স্বামীর হাত দিয়া, সংসারস্থলীর অতীত সামাজিক ও জাগতিক কার্য্যসকলেও এতটা হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হয়, যাহা এককভাবে কোন ক্রমে তাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারিত না। ফলতঃ এরূপ বিধান ও ক্রিয়াযোগেই কেবল স্ত্রীজীবনের সর্ব্বতোভাবে মহত্ত্ব ও সার্থকতা সাধন সম্ভব হইতে পারে। যে হতভাগ্য স্ত্রী বা পুরুষের ভাগ্যে সেরূপ স্ত্রীত্ব বা স্বামিত্ব ঘটে নাই, তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র বা সময়ানুরূপ যে কোন ব্যবস্থা। তাহারা বিধাতৃনিয়মভঙ্গ হেতু যথানুরূপ দণ্ডযোগ্য, অতএব তাহাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থাই সমতুল্য সুখের বা শুভকরী হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে যে, যাহারা বিধবা, অথবা বালবিধবা, তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা কি? বৃদ্ধার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য এবং বালিকা ও যুবতীর পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ, এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইলে যে বড় ভালই হইত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষতঃ যেখানে ব্যভিচারের সম্ভাবনা, সেখানে বিধবাবিবাহে যদি ব্যভিচার থামে তবে তাহা সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। কিন্তু বিধবার সেরূপ পুনর্ব্বিবাহ কি সম্ভবপর? এরূপ বিবাহ অনুমোদিত হইতে হইলে, এ দুইটির একতর অবশ্যই প্রয়োজনীয়;—প্রথম, হয় উপযুক্ত পুরুষসংখ্যা; দ্বিতীয়,

তদভাবে পুরুষের বহুবিবাহ। কিন্তু উপযুক্ত পুরুষসংখ্যাত নাই; আর বহুবিবাহটা যে অতিশয় অনুচিত, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। এ দেশে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান; এজন্য বিধবার বিবাহ হইতে হইলে, অনেক অবিবাহিত বালিকাকে অনূঢ়া থাকিতে হয়। কিন্তু সেটাও অতি অবিবেচনার কার্য্য;—একজন পুনঃ পুনঃ বিবাহের সুযোগ পাইবে, আর একজন কিছুই পাইবে না, ইহা যুক্তি ও ন্যায় উভয়তঃ বিরুদ্ধ এবং তাহা হইলে, সমাজ পাশ্চাত্য ইউরোপীয় সমাজের অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইবে; কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব ইহাই বরং উপযুক্ত ও ন্যায় বিবেচনার কার্য্য যে, সকল স্ত্রীলোককেই জীবনে এক এক বার বিবাহের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহার পর যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে, সেইই তাহার গতি। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আর বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের অপ্রচলনে দোষের কথা কোথায়? বিধবা-বিবাহ অপ্রচলনের আরও একটা প্রধান ফল এই যে, তদ্দারা অযথা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পায় না। ভারতীয় দৈন্যসমাজ এখনই যে শোচনীয় অবস্থায় উঠিয়াছে তাহা প্রচুর, তাহার উপর আবার অযথা লোক বৃদ্ধি হইতে পাইলে, কি দুর্দ্দশাই না ঘটিত! তাহার পর ব্যভিচারের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ;—যে যে দেশে সর্ব্বপ্রকারের বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সেখানেও ত ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই, বরং বেশী; অতএব ব্যভিচারনিবারক বলিয়া যে বিধবাবিবাহের বৈধতা সমর্থন করিবে, তাহাও করিতে পার না। যতদিন পৃথিবীতে পাপ তাপ ও বিশৃঙ্খলা থাকিবে, ততদিন তদানুষঙ্গিক ব্যভিচার ঘটনাও অনিবার্য্য।

বিধবাবিবাহের অনুকূলে কেবল এই একটি কথা দেখিতে পাই;—যে সকল পুরুষ পূর্ব্বস্ত্রীর মৃত্যুজন্য অসময়ে দ্বিতীয় বা ততোধিক বার দারপরিগ্রহ করে, তাহাদের পক্ষে অনূঢ়া অপেক্ষা বিধবার সঙ্গে বিবাহ হওয়াই প্রশস্ত। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার সমতা হেতু, উপরে যেমন

স্ত্রীলোকের একাধিক বিবাহ দূষিত হইয়াছে; পুরুষের পক্ষেও সেইরূপ একাধিক অনূঢ়া বিবাহ দূষিত বলিলে সুবিচার ও সমতা রক্ষিত হয়। সুতরাং প্রথম বিবাহের পর, যে কোন মৃতদার পুরুষ বিবাহ করিবে, তাহার পক্ষে বিধবাবিবাহই যুক্তিযুক্ত। এরূপ বিবাহে একটা পরম লাভ এই যে, তদ্দ্বারা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা বৃদ্ধের হাতে নিক্ষেপ-জন্য জীবন্মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় এবং বয়ঃস্থ পুরুষও বিধবাবিবাহ দ্বারা উপযুক্ত বয়স্কা গৃহিণী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ কথাগুলি বলিতে যত সহজ, কাজে তত সহজ নহে; প্রথমতঃ, মৃতদার বিবাহ-ইচ্ছুক হইলে, বিধবা ভিন্ন অন্য বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার আশা নাই; এবং সেরূপ নিষিদ্ধ না হইলে, যথেচ্ছাচার নিবারণ হওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়তঃ, সেরূপ বিবাহ স্থিরীকৃত হইলেও, মৃতদারের সংখ্যান্যূনতা হেতু, বিবাহপ্রার্থিনী সকল বিধবারই গতি হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সে যাহা হউক, সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে, যদি বিধবাবিবাহ বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সে কেবল মৃতদার পুরুষের দ্বারা যতদূর হইতে পারে তাহাই, তদতিরিক্ত নহে। তাহার পর বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, সকল দিক ও আগুপাছু বিবেচনা না করিয়া, যাহার ভাগ্যে যাহা থাকুক ও যে যেমন কাজ হাত করিতে পারে করুক, এরূপ বুদ্ধিতে যদৃচ্ছা বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন দ্বারা, বিবাহ বিষয়ে স্ফূর্ত্তি-খেলা উপস্থিত করা অপেক্ষা; বিধবাবিবাহের অপ্রচলন ও হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান রীতি ও অনুষ্ঠান বহুগুণে যে শ্রেয়স্কর তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা সকল স্ত্রীলোকই জীবনে অন্ততঃ একবার করিয়া বিবাহের সুযোগ পাইয়া থাকে এবং বিধবাবিবাহবহুল ইউরোপীয় দেশের ন্যায় অনেক স্ত্রীলোককে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয় না।

তাহার পর, তোমার কোর্টসীপ! তাহার ভাল মন্দ যত কম বিচার করিতে যাওয়া যায় ও তাহার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। উহা নানা দোষ ও নানা মনস্তাপের নিদান। যেখানে উহা

প্রচলিত আছে, কই সেখানে ত উহার প্রভাবে ভাল বাছুনী ও ভাল গৃহসুখের অস্তিত্ব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না? সাধারণতঃ ইউরোপীয় গৃহে যত অমিল, যত অসুখ, যত কলহ, যত দাঙ্গা-ফেসাদ; যে কেহ মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক প্রতি সপ্তাহে ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে, সেই তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবে এবং সে যে সেরূপ পাঠের পর আর ইউরোপীয় বিবাহপ্রথার বিশেষ পক্ষপাতী হইবে এমন বোধ হয় না। সুমিলে বয়ঃস্থাবিবাহ ঘটিলে, বড়ই সুখের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল সময়ে তাহা ঘটে কই? স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই চরিত্র, বয়স হেতু একবার পাকিয়া গেলে, আর তাহা একে অপরের জন্য আনত হওয়া বা উভয় উভয়তঃ ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হইয়া দাঁড়ায় না। পুনশ্চ, যাহারা ভাবে যে, অতি অল্প সময়ের দেখা শুনাতেই স্ত্রী-পুরুষ উভয় উভয়ে সমপ্রকৃতিত্ব চিনিয়া লইতে পারে; অথবা সংসারে অনভিজ্ঞ বালিকা অল্প দিনের কোর্টসীপেই মনের মত সমধর্ম্মী পুরুষ বাছিয়া লইতে সক্ষম হয়, তাহারা হয় লোকচরিত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, নতুবা স্বেচ্ছাক্রমে অন্ধ। যখন একজন দক্ষ লোকেরই একটা লোক চিনিতে বহুদিন গত হয় এবং তথাপি তাহাতে ভ্রান্তি একেবারে ছাড়ায় না, তখন সংসারে অনভিজ্ঞ যুবা ও বালিকার পক্ষে, অপরিচিত এবং অনেক সময়ে অজ্ঞাতকুলশীল লোক একজনকে চিনিয়া লওয়া কত কঠিন! তবে ইউরোপে আজি কালি লোকচেনার আর এক সহজ উপায় বাহির হইয়াছে, তাহা যদি কাহারও পছন্দ হয়ত হউক; অর্থাৎ পাত্র বা পাত্রী কাহার কত টাকা আছে। ইহার ফলে ঘটিতেছে এই, বালক বৃদ্ধাকে এবং বালিকা বৃদ্ধকে প্রায়ই বিবাহ করিয়া থাকে! ইহাতে সুখ শান্তি ও সুপরিণাম যতটা সম্ভবিতে পারে তাহাই অবশ্য ঘটন হয়!

এরূপ কোর্টসীপ ও বয়ঃস্থাবিবাহ অপেক্ষা, বাল্যবিবাহ অনেক ভাল। বাঘ ও ছাগলে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ; কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে যে, শৈশব হইতে উভয়ে একত্র পালিত হইলে, উভয়ের মধ্যে প্রণয়

ও সখ্যতা জন্মিয়া থাকে। বাল্যসহচারিতার এতই গুণ! সেই বাল্যসহচারিতা হেতু, পাত্রকন্যা উভয় উভয়ের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া গঠিত হয়; বালিকা যেমন সংসারস্থলীতে আগত হয়, তদুপযুক্ত হইবার জন্য বাল্যকাল হইতেই তাহাতে অভ্যস্ত হইতে থাকে; এ দিকে আবার অপাত্রী বা অপাত্রগত হওয়া হইতে রক্ষার নিমিত্ত, গোড়ায় পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতা প্রায়ই উভয় উভয়তঃ বংশ বিভব আচার ও উপযুক্ততা বিচারপূর্ব্বক বিবাহ সংঘটন করিয়া দেয়। ইহার ফলও অতি উৎকৃষ্ট হয়; যেহেতু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় স্বামী স্ত্রীতে যত মিল ও যে পরিমাণে তাহারা শান্তিপূর্ণ নিরাবিল গৃহসুখ ভোগ করিয়া থাকে, সেরূপ অন্য কোথাও কদাচিৎ ঘটনা হয়। অবশ্য ভাল মন্দ সকল স্থানে, সকল সমাজেই আছে; তবে কি না পরিমাণে অধিক যেটা, তাহা লইয়াই বিচার। গৃহসুখপূর্ণ ভারতীয় পরিবারের সংখ্যা অনেক অধিক। আর এক কথা, স্ত্রী যখন বাল্য হইতেই স্বামীর সহচারিতায় শিক্ষিত হয়, তখন তাহার শিক্ষায় ন্যূনতা বা আধিক্য, দোষ বা গুণ, স্বামীর উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে এবং তাহার ভাল বা মন্দের জন্য, স্বামীকেই অধিক পরিমাণে দায়ী বলিতে পারা যায়।

অনেকের বিশ্বাস, বাল্যবিবাহই ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের একটা প্রধান কারণ। কিন্তু মন্বাদি শাস্ত্রের প্রমাণে জানা যায় যে, বাল্যবিবাহ ভারতে চিরকালই আছে; অথচ কিন্তু এই ভারতে, অন্য তাবৎ জাতীয় জীবন ও ইতিহাসের তুলনে, অতি দীর্ঘকাল ধরিয়াই মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব ও বীরত্বাদি বিরাজ করিয়াছিল এবং বাল্যবিবাহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা করে নাই। ফলতঃ বাল্যবিবাহ ভারতীয় অধঃপতনের মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ, ধর্ম্মপথে পতন এবং নৈতিক পথে ভ্রষ্টাচার। আর ইদানীন্তন কালে শারীরিক হীনতাও যথেষ্ট ঘটনা হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রধান কারণ, উচ্চশ্রেণীতে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এবং উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীতেই

পেটের ভাতের অতিশোচনীয়তর অভাব এবং অভাবজন্য নিত্য অস্থিরতা ও অশান্তি।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য কি, এ বিষয়ে হিন্দু ঋষিগণ যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন অংশে ত্রুটি বা অতিরেক ভাব কিছু থাকিলেও, অন্য তাবৎ বিভিন্নজাতীয় ব্যবহার হইতে যে তাহা অধিক সমীচীন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। স্ত্রীর পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত, স্ত্রী তাহা পালন করিবে এবং স্বামীও তাহা পালন করাইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও স্বীয় কর্ত্তব্যাভিনিবেশে ত্রুটিশূন্য হইবে; এতদতিরিক্তে পুনঃ উভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণপূর্ব্বক একমিল হইয়া কর্ম্মপথের অনুসরণ করিবে। এক্ষণে পরস্পর সম্বন্ধে, স্ত্রীর স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে সক্ষমতা ও স্থিরশক্তিমত্তা কতদূর, তাহা অবধারিত হইলে, স্বামীর শাসন কিরূপ ও কি পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

ইতর জীব হইতে মনুষ্যে পর্য্যন্ত, কি শারীরিক কি মানসিক উভয়তঃ, স্ত্রীর প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি অপেক্ষা স্বভাবতঃ অনেক ক্ষীণ। মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পুরুষের চিত্ত কিরূপ দৃঢ় বা কত পরিমাণে পাপবিরত ও নীতিপথগামী এবং কি পরিমাণে বা তাহা নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যসম্পন্ন। ফরাসিস্ মণ্টেইন কহিয়া গিয়াছে যে, 'প্রত্যেক মানুষ যদি সরলভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে জীবনে অন্ততঃ পাঁচ ছয় বার ফাঁশিকাঠে ঝুলিতে হয়।' ঠিক কথা! পাষণ্ডপণা, কদাচরণ বা সকলবিধ কুচিন্তাই, সবল ও সুস্থকায় মানুষের মন দিয়া যে প্রতিনিয়ত কত গতায়াত করিয়া থাকে, যে কেহ সতর্কভাবে আপন মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, সেই তাহা অনুভব করিতে পারিবে; উত্তম, মধ্যম, অধম, অতর্কিত অবস্থান্বিত সকল চিত্তেই, তাহা সমান। সেই কুচিন্তা-

রাশিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে আত্মিক শক্তি প্রয়োগের যে ন্যূনাতিরেক ভাব, তাহা হইতেই জ্ঞানসংসারে মানবের উত্তম, মধ্যম, অধম, ইত্যাদি পর্য্যায়ভেদ হইয়া থাকে। পুরুষের প্রকৃতি সবল, চিত্তশক্তি দৃঢ়, বিবেচনাশক্তি পুষ্ট, আত্মিক শক্তিও উন্নত; তথাপি দেখ, জগতে পুরুষ কত দুষ্কর্ম্মশীল এবং কি সামান্যসংখ্যক লোক সে কুচিন্তারাশিকে দমনে সক্ষম এবং পরিপোষণে বিরত হয়! তবেই জিজ্ঞাস্য, পুরুষের যদি এই দশা; তখন ক্ষীণপ্রকৃতি, ক্ষীণ-মতি ও ক্ষীণ-শক্তি স্ত্রী যদি পুরুষের সহ সমস্বাধীনতা পায়, তাহা-হইলে তাহাদের আরও কত অধিক পরিমাণে দুষ্কর্ম্মশীল ও অধঃপাতিত হওয়ার সম্ভাবনা? তাহার পর, স্বার্থ ধরিয়া দেখিতে গেলে, সে পথেও অনর্থ দৃষ্ট হয়; পুরুষ দুষ্ট হইলে অপরের ঘরে জঞ্জাল উৎপাদন করে, কিন্তু স্ত্রী দুষ্টা হইলে জঞ্জাল আনিয়া উপস্থিত করে আপন ঘরে। বস্তুতঃ কথিত ক্ষীণতা হেতু, স্ত্রীর শুদ্ধসত্তা যাহা তাহার রক্ষা এবং শুদ্ধসত্তার অভিপ্রেত কর্ত্তব্যসাধন, কেবল স্বাবলম্বনে যথোপযুক্ত সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পুরুষের অপেক্ষা যে পরিমাণে স্ত্রীর প্রকৃতি, চিত্ত ও শক্তি ক্ষীণ; পৌরুষশক্তির প্রবলতা দ্বারা সেই পরিমাণে তাহার সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা লোপ ও সমতাসাধন কর্ত্তব্য। পুনশ্চ অন্য দিকে, যে প্রণয় ও আসক্তি স্বামীকে আকর্ষণ করিবার সূত্র এবং যদ্দ্বারা যুগলসংযোগসাধনে ফলের উৎপত্তি হয়, স্ত্রীসতীত্ব প্রধানতঃ তাহার মূল; অতএব সেই স্ত্রীসতীত্ব যে কোন উপায়ে রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইয়ংবেঙ্গল-দিগের প্রার্থিত স্ত্রীস্বাধীনতা কখনই অবলম্বনীয় নহে, বিশেষতঃ আমা-দিগের এই পরাধীন অবস্থায়! এ পরাধীন অবস্থায় তাহা আরও বহু বিড়ম্বনা ও নানা ভাবী দুঃখের কারণ স্বরূপ হইবে। বাঞ্ছারাম, কেবল হাটের লেড়া হুজুগ চাহিয়া বেড়াইলে, তাহাতে নানা দুর্ঘটনারই ঘটনা হয়! অতঃপর বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই, স্ত্রী-অধীনতাই বস্তুতঃ পদার্থ। তাহার মধ্যে কেবল এই

টুকু প্রভেদ যে এ অধীনতা, স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ সাময়িক শিক্ষা ও শক্তি ও আত্মিক উৎকর্ষ-অপকর্ষতা অনুসারে, কখন কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও হওয়াও উচিত।

উপরে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা বা স্ত্রী-অধীনতার বিষয় বিবেচিত হইল, অধুনাতন ইউরোপ ও আমেরিকভূমে তাহা, নিজ সীমা অনেক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; অন্য দিকে অধুনাতন ভারতে, তাহা সেই সীমার অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে, স্ত্রীর উৎকর্ষ সহ সমতা রাখা হইতেছে না। তবে বিষয়টি যেরূপ তাহাতে নিম্নে থাকা বরং ভাল, সীমার উপরে উঠিয়া যাওয়া কোনমতেই ভাল নয়। গ্রীক সিমন্তিনীবর্গেও, স্বাধীনতা সাধারণতঃ সীমার উপরে উঠিয়াছিল। কিন্তু যেমন এক দিকে সীমা-অতিক্রমী স্বাধীনতা ছিল, তেমনি আবার অন্য দিকে ভগিনী ও কন্যাদিগকে দাসীত্বেও বিক্রীত হইতে হইত। স্ত্রী-গণকে দাসত্বে বিক্রয়শক্তি, সোলনের বিধি [২২] দ্বারা নিবারিত হয়।

মন্বাদি ব্যবস্থাগ্রন্থে যে অষ্ট প্রকার বিবাহ বিধানিত আছে, তাহার মধ্যে কেবল এক আসুর বিবাহে শুল্ক লইয়া কন্যা সম্প্রদান ভিন্ন, আর কোন প্রকার বিবাহে শুল্ক লওয়ার বিধি ছিল না; এবং সেই শুল্ক লইয়া কন্যাদানও, সাধারণতঃ ইতরশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত [২৩]। গ্রীকভূমে তাহা নহে; হিন্দুর মত এরূপ নানা বিবাহবিধান ছিল না, বিবাহ করিতে হইলে কেবল এক শুল্ক দ্বারা কন্যা গ্রহণ করিতে হইত [২৪]। আবার সোলনের বিধি অনুসারে বিবাহিতা কন্যা, সামান্য বিবাহযৌতুক ভিন্ন, অপর কোন অর্থ বা পদার্থ বা অলঙ্কার পিত্রালয় হইতে স্বামিগৃহে লইয়া যাইতে

২২। Grote's Greece, Vol. III, P. 188.

২৩। কন্যাদানে শুল্কগ্রাহকের প্রতি মনু এরূপ উক্তি করিয়াছেন—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।।"

২৪। Grote's Greece, Vol. II, P. 113.

পারিত না। বিবাহযৌতুকও, স্ত্রী যদি মৃত হইত, তবে স্ত্রীর পিতাকে তাহা সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হইত। হিন্দুর ব্রাহ্ম্যাদি বিবাহে, ধনরত্নাদি অলঙ্কার সহ কন্যাদান করিতে হইত এবং বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহা ফেরত দিতে হইত না। প্রাচীন হিন্দুর কিন্তু বহুবিবাহপক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। গ্রীকের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না। সমস্ত গ্রীক ইতিহাস খুঁজিয়া, কেবল ট্রয়রাজ প্রিয়াম[২৫] ও স্পার্টার অধিপতি অনক্ষন্দ্রিদিস[২৬] এই দুই জনের বহুবিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঘটিয়াছিল। হিন্দুর বিবাহ জীবনের একটি প্রধান ধর্ম্মসংস্কার; গ্রীকের বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব ছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না। হিন্দুর গৃহিণী ধর্ম্মপত্নী ও সহধর্ম্মিণী; আর গ্রীকের গৃহিণী গৃহপত্নী ও গৃহসঙ্গিনী।

হিন্দু রমণীগণ প্রভূতরূপে শিক্ষিতা হইতেন। গার্গী, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, বাগ্‌দেবী প্রভৃতি, এমন কি, বেদসূক্তের রচয়িত্রী; এবং মনু বলিয়াছেন কন্যাগণ, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ",—পুত্রের ন্যায় পালনীয়া ও শিক্ষণীয়া হইবে। এরূপ আরও শিক্ষা ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষা যে সকল জাতিতে সমান ছিল, তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এখনকার ভদ্রকুলোদ্ভবা স্ত্রীগণ অপেক্ষা, তখনকার ভদ্রকুলোদ্ভবা অর্থাৎ দ্বিজকামিনীগণ অনেক অধিক পরিমাণে শিক্ষিত এবং এমন কি, অনেকে ব্রহ্মবাদিনীও হইতেন, অথচ ঘরে আটক থাকিতেও আপত্তি করিতেন না। গ্রীক স্ত্রীগণ অতি

২৫। Illiad, XXI.

২৬। Herodotus, V, 39-40. আরও কথিত আছে যে, এক সময়ে বহুতর লোকে এবং সক্রেটিসও দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ সেই সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আথেন্‌স নগরে পত্ন্যন্তর গ্রহণের জন্য একটি বিধি প্রচারিত হয়। Deog. Leart. Socrates X. এমনতর উল্লেখ আরও দু একস্থলে দু একটি দেখা যায়।

প্রাচীন কালে কিরূপ শিক্ষিত হইত বলিতে পারি না; কিন্তু ঐতিহাসিক সময়ে শিক্ষিত ও বিবিধ বিদ্যাশালিনী রমণীর অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। আরিষ্টিপুসের কন্যা ও শিষ্যা আরিতে, প্লেটোর শিষ্যা লাস্থিনিয়া ও অক্ষিওথিয়া; পীথাগোরাসের শিষ্যা থিয়ানো ও পীথাগোরাসের কন্যা দামো,ইত্যাদি; এ সকল স্ত্রীগণ কেবল শিক্ষিতা ছিল না,বহুশ্রমসাধ্য তত্ত্ববিদ্যা ও অপরাপর বিদ্যারও অনুশীলন করিত। তাহার পর সাধারণতঃ, গ্রীককামিনীগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রভূতরূপে শিক্ষিত ছিল এবং তত্তৎ বিষয় তাহাদের দ্বারা বহু-পরিমাণে উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইত। স্পার্টার রমণীগণের সাহস ও দেশহিতৈষিতা বিখ্যাত; তদর্থে তাহারা স্বামীসন্তানগণের প্রতি যেরূপ উৎসাহবর্ষণ ও উত্তেজনা করিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রে অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। লিউক্ট্রার যুদ্ধে যাহাদের যাহাদের স্বামী ও সন্তানাদি হতাহত হইয়াছিল, তাহাদের আর আনন্দের সীমা ছিল না; কিন্তু যাহাদের স্বামীসন্তানাদি সেই স্পার্টার পরাজয়কারী যুদ্ধ হইতে জীবন লইয়া ফিরিয়াছিল, সুতরাং রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল, তাহারা খেদে অধীর হইয়া গিয়াছিল এবং সমাজে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই। ভারতে, ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে, রাজপুতবংশে, স্পার্টার রমণীগণের সহ সাদৃশ্যযুক্ত বীর-প্রসবিনী ও বীরত্ববিধায়িনীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন?—সে রাজপুতানা আছে, কিন্তু আর সে দৃষ্টান্ত নাই! রাজপুতরমণী এখন ধনীর ঘরে বিলাসিনী, কাঙ্গালের ঘরে ময়দা-পেশিনী; অথবা দোকানের দাঁড়ি-পাল্লা হাতে ধরিয়া মায়া মমতা ও করুণা কোমলতায় কাটিয়া আটখান; কোথায় বীরপ্রসবিনী আর কোথায় নাকেকাঁদুনীর চূড়ামণি;—ভারতভাগ্যে আগুন এক রকমে নহে! আথিনীয় কামিনীগণ যদিও স্পার্টার রমণীগণের ন্যায় বীর ও পুরুষপ্রকৃতি ছিল না বটে, কিন্তু সংসার, সমাজ ও লোকচরিতজ্ঞতায় অতিশয় পটু ও প্রতিষ্ঠাযুক্ত ছিল; এমন কি ইতর ঘরের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সে সকল

গুণে সামান্য ছিল না। গ্রীকপণ্ডিত থিওফ্রাস্তস্ নিজে যে মূলে বিদেশী, বহুযত্ন করিয়াও তাহা একটা সামান্য মেছুনীর কাছে ছাপাইতে পারে নাই; দৃষ্টিমাত্র ব্যবহারের খুঁতে ধরা পড়িতে হইয়াছিল[২৭]। স্পার্টার রমণীগণ বড় একটা গৃহকার্য্যের ধার ধারিত না। সূতা কাটা, কাপড় বোনা, গৃহকার্য্য করা, যাহা অন্যত্র গ্রীকরমণীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য স্বরূপ ছিল; স্পার্টায় তাহা ক্রীতদাসীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। স্পার্টাবাসীরা ভাবিত যে, রমণীগণ যদি তদ্রূপ হীন কার্য্যে নিয়োজিত হয়,তবে কেমন করিয়া তদ্রূপ হীনকার্য্যচেতা জননী হইতে সমাজের হিত ও শোভাকর পুত্রোৎপাদনের আশা করা যাইতে পারে? স্পার্টার রমণীগণের যেন প্রধান কার্য্যই ছিল তদ্রূপ সন্তান উৎপাদন করা[২৮]। কিন্তু হোমারিক সময়ে, কি স্পার্টা কি অন্যত্র, স্ত্রীবিষয়ে এরূপ বুদ্ধি ঘটে নাই; তখন সর্ব্বত্র, কি ধনী কি দরিদ্র, সকল স্ত্রীলোকই রন্ধন, গৃহকার্য্য সাধন ইত্যাদি, স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিত। হেলেন, পেনিলোপি, ইহারা রাজকুমারী বা রাজগৃহিণী হইয়াও, কখন তদ্রূপ কার্য্যনির্ব্বাহে কাতর হয় নাই। ভারত-রমণীগণের নিকট গৃহকার্য্য চিরকালই একচেটিয়া।

পিতামাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে, হিন্দুর জ্ঞান "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।" আর গ্রীকের, "পিতামাতা যদি বাল্যে সুশিক্ষা দিয়া থাকেন, তবেই সন্তান পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় পালন করিতে বাধ্য, নতুবা নহে।" ইহা আথিনীয় ব্যবস্থাপক সোলনের বিধি।

সেই প্রাচীনকাল পর্য্যালোচনায়, হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয়-জাতীয় লোকনীতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংঘটনে বিজাতীয় সংস্রব কতদূর আসিয়া সংযোজিত বা তাহার উত্তেজক স্বরূপ হইয়াছিল;

২৭। Quint I. 8 c 5. থিওফ্রাস্তস্ নিজে বিদ্বান্ তত্ত্ববিৎ ও চতুরচূড়ামণি ছিল এবং অনেক দিন হইতে আথেন্সবাসী হইয়াছিল, তথাপি তাহার বিদেশজাতজনিত যে কিছু অজ্ঞতা তাহা মেছুনীর নিকট ছাপা থাকিতে পারে নাই।

২৮। Xenoph. Rep. Lac. I.

তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিমাদ্রিবেষ্টন এবং সমুদ্রপরিখায় হিন্দুগণ, বহিঃস্থ জাতিসমূহ হইতে আত্মরক্ষণ ও আত্ম-গোপন করিয়া,প্রায়শঃ অসংশ্লিষ্টভাবে জীবনাতিবাহন করিয়া গিয়াছেন। কোন বহিঃস্থ জাতিই সে কালে প্রবল হয় নাই এবং হইলেও, কোন শত্রু সহজে সাহস পাইত না যে সেই প্রাকৃতিক দুর্গপরিখাদি ভেদ করিয়া তাহাদের শান্তিভঙ্গ করে। অতি প্রাচীনকালে আসুর-দেশের রাণী শমিরমা এবং মিসরদেশের রাজা সিসস্ত্রি কর্তৃক ভারত-আক্রমণের কথা রটনা আছে বটে, কিন্তু সে সকল প্রকৃত ঘটনা কি না তাহাতে সন্দেহ। তবে বাণিজ্যসূত্রে ভারতীয়েরা কখনও বিদেশে এবং বিদেশীয়েরা কখনও ভারতে আসিত বটে, কিন্তু সেও গণনায় এত সামান্য যে, তদ্দ্বারা প্রচুরবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এতবড় একটা বৃহৎ ভারতীয় সমাজ বিশেষ উত্তেজিত হওয়ার কথা নহে। তাহার পর, জাতিভেদরূপ যে সুদৃঢ় দুর্গের দ্বারা ভারতীয় আচার সকল রক্ষিত হইত, তাহাতে বিজাতীয় কোন কিছু সহজে আসিয়া প্রবেশ করিতে পাইত না। এই সকল কারণে, ভারতীয় রীতি নীতি আচার ও ব্যবহার স্বজাতীয় মূল হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া, বহুলাংশে নিষ্কলঙ্ক স্বাধীনভাবে ও স্বাবলম্বনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

গ্রীকের অবস্থা অন্যরূপ। অতি দূরতম কাল হইতেই তাহাদিগকে বিবিধ বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবে আসিতে হইয়াছে। প্রাচীনকালীয় ইও, ইউরোপা, মিডীয়া প্রভৃতি গ্রীক কামিনীদিগের হরণবৃত্তান্ত, ট্রয়যুদ্ধ এবং আর্গনটিক সমুদ্রযাত্রাদি সে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহার পর, গ্রীকের ঐতিহাসিক সময়ে ত বিজাতীয় সংস্রবের তরঙ্গতুফান। গ্রীকেরা যাহাদের সহ এই বিজাতীয় সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহারা যে আবার কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ প্রকৃতির লোক; এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, উক্ত কামিনীত্রয়ের হরণবৃত্তান্ত এবং তাহার আনুষঙ্গিক দৌরাত্ম্যের গল্পই সে পক্ষে পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক প্রভৃতি

জাতিরা সর্ব্বদা সমুদ্রপথে গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঐ সকল জাতির ব্যবসায়,—বাণিজ্য, বোম্‌বেটেগিরি ও লুটপাট। ইহাদের সঙ্গে সংস্রব, দুষ্টে দুষ্টে কোলাকুলির ন্যায়। অতএব,সংস্রবে আগত বিজাতীয়-গণ প্রায় সকলেই, গ্রীকদিগের ন্যায় সমবল ও সমান বোম্বেটেগিরিতে পটু এবং প্রায় সমধর্ম্মী লোকনীতিবিশিষ্ট ছিল। সেই সময়ে পৃথিবীর সেই খণ্ডে গ্রীকের প্রতিবেশী স্বরূপে আরও এক অদ্ভুত লোকনীতি উপস্থিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ এবং বিজাতীয় বিপাকে পতিত হইবাতে, তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত বা গণনায় গণিত হইত না। উহা হিব্রু লোকনীতির কথা বলিতেছি। উহা গ্রীক-লোকনীতির সহ অসমধর্ম্মী অথচ উচ্চ, কিন্তু কিরূপ কর্ম্মসূত্রবশে, বলিতে পারি না, তাহা গ্রীকদিগের নয়নে পতিত হয় নাই; এবং গ্রীকেরাও কখন তাহার অতর্কিত সংস্রবে আসিয়া পড়ে নাই। সুতরাং গ্রীক-দিগের যাহা কিছু সংস্রবে আইসন এবং সংমিলন, তাহা সমধর্ম্মী দুষ্ট লোকনীতির সহ; বরং গ্রীকলোকনীতি হইতেও, সে সকলের কোন কোন অংশ অতি অপকৃষ্ট ও ভ্রষ্ট। এই সকল কারণে গ্রীকলোকনীতি আকার প্রকার ও ব্যবহারে, স্বজাতীয় ও বহুবিজাতীয় লোক-নীতির সমষ্টিমূর্ত্তি স্বরূপে পরিণত এবং অপকৃষ্ট ও ভ্রষ্টনৈতিক বিজাতীয় সংস্রব জন্য নানা প্রকারে দূষিত ও কলুষিত হইয়াছিল। মূল গ্রীকচরিত্র, সংস্রবশূন্য স্বাধীনভাবে ও স্বাবলম্বনে বর্দ্ধিত হইলে হয় ত এতটা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না,কিন্তু কর্ম্মসূত্রের অনিবার্য্য নিয়োজনবশে তাহা ঘটিতে পায় নাই। উক্ত দূষিত ও কলুষিত লোকনীতিই, হিন্দু অপেক্ষা গ্রীক জাতীয় জীবনের শীঘ্র অধঃপতন বিষয়ে, মুখ্য কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। গ্রীকলোকনীতির যে কিছু ত্রুটি, তাহা দোষের নানারূপ আধিক্য জন্য, এবং হিন্দুলোকনীতির যে কিছু ত্রুটি, তাহা সদ্‌গুণ সকলের সমাবেশে একদেশদর্শী অতিরেক ভাব জন্য, সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। পূর্ব্বানুস্মৃতি।

এক্ষণে একবার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয়েরা আত্মদেশবহির্ভাগে পরধনলোলুপ হইয়া কখনও অনধিকারপ্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই; এবং তদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষাও বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যে কখন স্থান পায় নাই। ইহাঁরা আপনাদের স্বদেশকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, পার্শ্বস্থ বিভিন্ন অধিকার সকল আত্মবশে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত অতি বিরল এবং তাহাও ভারত আয়তনমধ্যে আবদ্ধ। যাহা হউক, তদ্রূপ কোন ঘটনা ঘটিলে এবং দস্যুদিগকেও কখন কখন দমন করিতে হইলে, কেবল সেই সকল সময়ে যে কিছু অস্ত্রচালনা করিতে হইত। সে সকল অস্ত্রচালনা বস্তুতঃ যে গণনায় নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, তবে কি না যে স্থলে ও যে ভাবে ও যে জাতির তুলনায় তাহাদের কথা বলা যাইতেছে, তাহাতে তাহা গণনায় অতি সামান্যই বলিতে হইবে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুরাকাঙ্ক্ষান্বিত রাজার দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ প্রবর্ত্তিত এবং এমন কি জয়শ্রী পর্য্যন্ত কবলিত হইলেও, প্রতিপক্ষ রাজ্যকে প্রকৃতপক্ষে তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত অতি অল্পই; যেহেতু অধীনতা সহ কিঞ্চিন্মাত্র কর স্বীকার করিলেই, পরাজিত রাজা স্বপদে স্বচ্ছন্দে ও সম্পূর্ণভাবে সংস্থাপিত থাকিতে পাইতেন। আর প্রজাগণের ত কথাই নাই; যখন দুই প্রতিকূল রাজায় যুদ্ধ চলিতেছে তখনও এবং এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্বে বসিয়াই তাহারা স্বচ্ছন্দে কৃষিবাণিজ্যাদি স্ব স্ব বৃত্তি সাধন করিতেছে, অথচ তাহাদের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে পায় না। ফলতঃ, একধা দৃষ্টিতে সমগ্রত অবলোকন করিলে মোটের উপর বলিতে পারা

ষায় যে, দেশাধিপতিগণ সকলেই, একধর্ম্ম এবং একজাতিত্ব নিবন্ধন এবং বিশেষতঃ জাতীয় স্বভাবজাত তাহাদের চরিত্রমাধুর্য্য হেতু, পরস্পর সুখ-সংমিলনে বসতি করিতেন। পুনশ্চ, দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গপরিখাদির দ্বারা বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি, পশ্চিমে পরিখারূপে শতশাখাময় সিন্ধু, পূর্ব্বে পর্ব্বত ও অগম্য বনভূমি, দক্ষিণে তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র;—বিশেষতঃ আবার সেই দূরতম কালে পার্শ্বস্থ জাতি সকল যেরূপ অসভ্য, বর্ব্বর এবং পশুবৎ ছিল; তাহাতে বহিঃশত্রু হইতে স্বদেশের স্বাধীনতালোপ বা কোনরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা না থাকায়, তাহাদের সেই সুখসংমিলনে বাস ও আভ্যন্তরীণ শান্তিপ্রবাহ, প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই প্রবাহিত হইতে পাইত বলিতে হইবে। এই সকল কারণবশতঃ,ভারতবর্ষীয়দের রাজনীতি এরূপ শান্তপ্রকৃতি এবং ঘাতপ্রতিঘাতের অভাব হেতু পরিবর্ত্তনবিরহিত ছিল; এই জন্যই ইহারা কখনও যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল না এবং বোধ হয় এই কারণেই, তাহাদের বীরকীর্ত্তি স্বয়ং বিপুল হইলেও,অন্যান্য পুরাতন জাতির তুলনায় অতি সামান্য, সুতরাং তাহাদের সমকক্ষতায় আসিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন অতি অল্পই; তবে কেহ আহ্বান করিলে, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

তাহার পর, যে জাতি এক পা হাঁটে, আর এক একবার উচ্চলোকের স্মরণে আকাশ পানে তাকাইয়া দেখে; যে জাতি জাগতিক ব্যাপার দেখিয়া আপনাতে আপনি জ্ঞানশূন্য এবং তাহার সূত্র অনবগতে সতত চিন্তাকুল; তাহার পক্ষে কোনরূপে উদর পোষণ ও কলেবর ধারণ হইলেই সাংসারিক ব্যাপার যথেষ্ট সাধিত হইল। সুতরাং ইহারা লোকসাধারণনির্ব্বিশেষে কেন রাজনীতির ধার ধারিবে? তুমি রাজা হইতে চাও হও, আমি তাহাতে সম্মত আছি; কিন্তু দেখিও, আমি যে শান্তি চাই তাহার হানি করিও না, তাহা হইলে আর কোন গোল হইবে না, নতুবা গোলমাল বাধিতে

পারে। এরূপ গোলমাল পরিহার করা সহজ। সুতরাং হিন্দু রাজারা কেবল শান্তিভোগ করিতেন না, শান্তির উপর অধিকন্তু আবহমান কাল যথেচ্ছাচার এবং একাধিপত্যও নিরুদ্বেগে করিয়া আসিয়াছেন। গ্রীক-দিগের ঘরে তাহার বিপরীত। যখন যেমন লোক ও লোকের মনোভাব, শাসনতন্ত্রকেও তখন তেমনি পরিবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইতে হইয়াছে।

হিন্দুদিগের ইহলোকবিতৃষ্ণা ও সাংসারিক বিষয়ে আস্থাশূন্যতা, পরলোকে দৃষ্টিবদ্ধ ভাব ও জাগতিক নশ্বরতাবুদ্ধি, যাহা কালপরম্পরায় তাহাদিগকে ক্রমে জুজুর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এক সময়ে একবারমাত্র কিয়ৎ পরিমাণে ভঙ্গ হয়। ঐ সময় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল। এই সময়ে ভারতবর্ষ, জাগতিক পুরাবৃত্তমধ্যে এবং সাংসারিক ব্যাপারে অনেকটা গৌরবলাভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম দ্বারা লোকের পুরাতন মনে পুনর্ব্বার নূতন প্রকারের তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। কালে কূটক্রিয়াবহুলতা হেতু হিন্দুধর্ম্মে বহুবিকৃতি সংঘটন হওয়ায়, লোকের মন যে পারলৌকিক এবং ছন্ন মায়াবাদ বা তথাবিধ বিষয়ে মোহাভিভূত হইয়া জড়প্রায় হইয়াছিল; এই নবোদিত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে তাহার বহুলাংশ অপনীত হইয়া যায়। এই সময়ের রাজা অশোক, সমগ্র পরিজ্ঞাত ভারতের অধীশ্বর। লোক সকল এখন সাংসারিক আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ। বিদেশবাণিজ্যের অভ্যুদয় এবং ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের বিস্তারবহুলতা হওয়ায়, স্থলপথ ও জলপথে বহু স্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে শুধু নানা দেশ-বিদেশে গমন ও ভ্রমণেই মানবীয় শক্তি পর্য্যবসিত হয় নাই, সে সকলের ফলস্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলেরও বহুল আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষি ও বাণিজ্য উভয়বিধ উপায়দ্বারা বহুধন সঞ্চয় এবং শিল্পবিদ্যারও বিশেষ উন্নতিসাধন হইয়াছিল। এই সময়ে আর্য্য-জননী ভারতের নাম পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হয় এবং ধর্ম্মবীর বৌদ্ধ প্রচারকগণ না গিয়াছিল এমন স্থানই প্রায় বিরল। লৌকিক সুখস্বচ্ছন্দতা ধরিলে,

সে বিষয়েতেও ভারতের এই সময়ের মূর্ত্তি অতি মনোহর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ মূর্ত্তি বহুস্থায়ী নহে—ফলতঃ ইহার প্রকৃতিও বহুক্ষণস্থায়ী হইবার নহে। যাহা হউক, ভারতের পূর্ব্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল পলকবৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

উপরি-উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, লৌকিক বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত উন্নতি সহ স্থায়ি-কীর্ত্তি বড় বেশী সাধন করিতে পারেন নাই। জীবনযাত্রা যাহাতে সহজ সুখে অতিবাহিত হয়, তৎপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন মাত্র এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তুলনীয়ের অভাবহেতু, তাহা তখন অতুলনীয় হইয়াও দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিকে এরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন নৈতিক উন্নতির মোহিনী শক্তি, বহু বিপ্লব গতেও অস্তিত্বশূন্য না হইয়া, বরং পূর্ণভাবে দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুর জীবন আমূলতঃ পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইবে যে, উপপাদ্য এবং নৈতিক বিষয়ে এরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই। কালের কঠোর আবর্ত্তনে সে সকল বিষয় যদিও বহুতর প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যদিও সেই পূর্ব্বতন নৈতিক জীবন এক্ষণে ফসিল (Fossil) ভাব প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্যের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং যদিও তদুপরি অজস্র মলরাশি জন্মিয়াছে, তথাপি তাহাদের জ্যোতি ও মাধুর্য্যশক্তি এখনও অপরিসীম। যে বল অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করণার্থে ব্যয়িত হইত, সে বল এখানে অপরের বিপদুদ্ধারে নিযুক্ত। যে অর্থ অন্যত্র খেয়াল পরিপূরণ ও বিলাস বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা সাধারণতঃ দরিদ্রের দারিদ্র্যনিবারণ এবং বিধবার চক্ষুজলমোচনের নিমিত্ত পর্য্যবসিত, যে বুদ্ধি অন্যত্র নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বিভব ও বিলাস বিস্তারের উপায়

উদ্ভাবনে নিযুক্ত, এখানে তাহা ধর্ম্ম মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত। ইহাদের জাতীয় জীবন আমূলতঃ নৈতিক ও কোমল মনুষ্যত্বপূর্ণ। ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল,—যে সময়ে লোক সরল, লোক সাধু, এবং লোক সত্য-রত; যে সময়ে লোকের ভিতর বাহিরে প্রভেদপরিবর্দ্ধক কাপট্য ছিল না;—ইহা কেবল সেই সময়ে শোভা পাইয়াছিল। আবার যখন এই পৃথিবী, ইহার দুরাকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি পাপরাশি বিনিবারিত হইবাতে, নৈতিক ও আর্য্য আকৃতি ধারণ করিবে; তখনই আবার ভারত গৌরবের সর্ব্ব উচ্চ গগনে শোভা পাইতে থাকিবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে বড় একটা নহে। লৌকিক বিষয়ে চিত্ত-নিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়ে চিত্তের ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তিযুক্ত জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, পরাধীনতায় পদদলিত হইবে, হয়ত প্রায় লোপ হইলেও হইতে পারে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত ও অল্পস্থায়ী হইলেও, লৌকিক দর্শনে বলিতে হইবে যে, তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে চটক ও চাকচিক্যতা লাভ করিয়াছিল; এবং এই জন্যই অধুনাতন কালে, ভারতসন্তান বহুশত বর্ষ ব্যাপিয়া পরের জুতা মাথায় বহিয়া আসিতেছে।

এক একটী নদীর অববাহিকা মধ্যে, একটী করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ঐ মূল প্রবাহ প্রথমে মূল উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া, তথা হইতে জল সংগ্রহপূর্ব্বক যেমন গন্তব্য পথে গমন করে এবং গমন করিতে করিতে যেমন শাখানদীসমূহের দ্বারা পুষ্টতা প্রাপ্ত হয়; শাখানদীরাও আবার তদ্রূপ; ইহারাও তদনুরূপ নিয়মে তাহাদের পারিপার্শ্বিক নদী দ্বারা পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক নদী পুষ্ট হয় খালী জুলী বা নালার দ্বারা; খালী জুলী আদি পুনঃ ঘাট মাটের জলের দ্বারা;

ইত্যাদি। এইরূপে, যতই নগণ্য হউক, যেখানকার যাহা, সমস্ত জল আসিয়া যখন মূল প্রবাহে নিপতিত হয়, তখন উহা শাখা-প্রশাখার নামবিলোপী বৃহৎ কলেবরে ও গণনীয় ভাবে, পথমধ্যে বালুকালুপ্ত হইবার ভয়শূন্য, হইয়া, যথাস্থানে গমন করিতে থাকে। বাঞ্ছারাম! বাঁশবাগানে বাঁশপাতা বহিয়া ঝির-ঝির করিয়া জল চলিয়া যাইতেছে, তাহা অনেকবার দেখিয়াছ; কিন্তু ইহা কি কখনও তোমার মনোমধ্যে চটক লাগিয়াছিল যে, এই জলই শেষে যাইয়া তোমার গঙ্গা বা পদ্মার কলেবরের পুষ্টতা সাধন করিবে, এবং এই জলই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনে হয়ত তোমার দেশ ভাঙ্গিয়া ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? বোধ করি, পদ্মা বা গঙ্গার সেই বিষম কলেবর, আর বাঁশপাতাস্থ এই ক্ষুদ্রপ্রাণ জলধারা, এতদুভয়ের বৈষম্য তুলনে, সে ভাব তোমার মনে কখনও উদয় হয় নাই; অথবা হইলেও হয়ত তাহাকে মনোমধ্যে দাঁড়াইতে কখনও স্থান দেও নাই। কিন্তু তুমি মনে দাঁড়াইতে স্থান দেও বা না দেও, কার্য্য যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে; এবং ঐ যে সামান্য জলের ধারাটী, উহাই ঘাটমাঠ ও খাল বীল বহিয়া এবং আখেরে পারিপার্শ্বিক নদী, শাখানদী, বা যে কোন সূত্রে যাইয়া, তোমার পদ্মা বা গঙ্গার পুষ্টতাসাধন করিবে। এখন দেখ, সেই যে বৃহৎ গঙ্গা, তাহা কোথাকার ও কত দূরের সামান্য সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ হইয়া আসিতেছে। মানবের বা মানবীয় জাতিবিশেষের জীবন-প্রবাহও তদ্রূপ। তাহারও কারণ, উপাদান, আয়োজন, উপকরণ ও প্রতিষ্ঠা অবিকল তদ্রূপ; একমুখে অনন্ত সূত্রে বিচ্ছুরিত, অপর মুখে একত্বে আসিয়া পরিণত। কি মানবীয় জীবন, কি মানবের জাতীয় জীবন, কায়িক, বাচিক, মানসিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা যে কোন প্রকারে, নিরন্তর গতিরত, তাহাতে তিলার্দ্ধের জন্য বিরাম নাই। অতএব মানবীয় বা মানবের জাতীয় জীবনকে প্রকৃতপক্ষে সেই গতিসমষ্টি বলিলেই সঙ্গত হয়। কর্ম্ম উহার উদ্দেশ্য। কর্ম্মক্ষেত্ররূপ অববাহিকামধ্যে সাধারণ জীবন-ক্রিয়া মূল প্রবাহ। বৃত্তি, প্রবৃত্তি, মনীষা, দর্শন, দেশ,

কাল, পাত্রাপাত্র সংস্রব,ইত্যাদি তাহার শাখা প্রশাখা। শাখাপ্রশাখার জন্য আবার কোন্ বাঁশপাতা ঝরিয়া জল আসিতেছে, তাহা যাহার চক্ষু আছে সে দেখিয়া লউক। আমরা এতদুভয় জাতীয় জীবনের সেই মূল প্রবাহ মাত্র দুইটি ধরিয়া, যথাকথঞ্চিৎ পরিদর্শন করিয়া আসিলাম এবং কোন্ উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া, কোন্ দেশ দিয়া বহিয়া আসিতে আসিতে, কোথাকার স্থানের গুণে কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কেবল তাহাই কিয়ৎপরিমাণে দেখিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার আবার শাখা প্রশাখা কোনগুলি এবং শাখা প্রশাখার আবার শাখা প্রশাখা কাহারা; সেই তাবৎ আবার কি উপায়ে ও কত পরিমাণে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, মূল প্রবাহের কেমনে ও কতটা পুষ্টতা সাধন করিয়াছে; পুনঃ প্রত্যেকের গন্তব্যপথস্থ বিভিন্ন বিভিন্ন গুণে তাহারা নিজে নিজে কিরূপ গুণলিপ্ত হইয়া, প্রাপ্ত গুণ-সমষ্টিদ্বারা মূল প্রবাহের কিপ্রকার ও কতটা গুণরূপান্তর সাধন করিয়াছে; তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলি নাই। কেবল দুই একটি শাখা প্রশাখার উপর অমনস্ক দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছি মাত্র। যিনি শাখা প্রশাখা এবং শাখাপ্রশাখারও আবার পরিপোষকদের আমূলতঃ দৃশ্য দেখিতে চাহেন, তিনি আত্মযত্নসিদ্ধ দৃশ্যে দেখিয়া লইবেন। যে নিয়মে মূল প্রবাহ অবলোকিত হইতে পারে, শাখা প্রশাখাও সেই নিয়মে অবলোকিত হয়, কেবল সূক্ষ্মেতর ভেদ মাত্র। কিন্তু ইহাও মনে থাকে যেন যে, যে বস্তু যত অধিক সূক্ষ্ম হয়,ততই তাহা দৃশ্যের অতীত হইয়া থাকে; শেষে অত্যধিক চেষ্টায় চক্ষের ব্যত্যয়ে স্থূল দৃষ্টিতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয়। সূক্ষ্ম পদার্থমাত্রে অনুভবশক্তির বিষয়ীভূত।

এ জগতে, গ্রীক এবং হিন্দু এই দুই বিভিন্ন জাতীয় জীবন-প্রবাহ, এক উৎস হইতে বিনির্গত দুই বিভিন্ন পথগামী দুইটী ধারাস্রোতোনদীর ন্যায়। যখন উৎস হইতে বাহির হইতেছে, তখন উহাদের জল একই রূপ; কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিবার কথা নহে, ছিলও না। পরে যখন ইহারা উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া, আপনাপন নির্দ্দিষ্ট পথ বাহিয়া

গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে লাগিল; তখনই ইহারা স্ব স্ব গন্তব্যপথস্থ দেশ কাল ও স্বভাবের সংলগ্নে আসিবাতে, সেই সকলের বহুবিভিন্ন গুণ-সংস্রবে অনুরূপ গুণরূপান্তরিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিল। যতই পথ অতিক্রম করিয়া দূরপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যতই পার্শ্বস্থ স্থানীয় শাখা প্রশাখা সকল আসিয়া তাহাতে সংমিলিত হইতে থাকিল; ততই তাহাদের গুণান্তরপ্রাপ্তি ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়া আসিল যে, তখন স্থূল দৃশ্যে তাহাদিগকে দেখিলে ও তদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে, আর তাহাদিগকে সহোৎপন্ন বা সমজাতীয় নদী বলিয়া বোধ হয় না। তখন প্রত্যেককে সম্পূর্ণই পৃথক প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয় এবং প্রত্যেকে তখন সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতিরই বটে। যাহা হউক তথাপি, তদ্রূপ হইলেও, যাহার চক্ষু আছে, যাহার অনুসন্ধান আছে; সে তখনও স্বচ্ছন্দে দেখিয়া লইতে পারে যে, স্রোতস্বতী দুইটীকে আপাততঃ যতই বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহাদের অন্তরে অন্তরে মূল-উৎস-জনিত যে একতা, আজি পর্য্যন্ত তাহা সমভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, এবং যাইবে। পুনশ্চ, এ দুই প্রবাহের বাহ্যদৃশ্যের প্রতি অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দু প্রবাহের পরিসর বড় অধিক নহে, কিন্তু তরঙ্গ ও গভীরতা উহার অনেক; আর গ্রীক প্রবাহ,—তরঙ্গ ও গভীরতাতে অনেক কম, কিন্তু পরিসর উহার বড়ই বেশী। এখন কেনা জানে, গভীরতাহীন গলা জলে, গাঢ় প্রতাপে বাণের বড় বিষম বেগ,—প্রতিবেগেই কুল প্লাবিয়া, সকল ভাসাইয়া, নৌকা নেয়ের প্রাণ সশঙ্কিত করিয়া দেয়; কিন্তু অগাধ জলে সে ভয় নাই। সে যাহা হউক, সেই কিন্তু না জানি কি সুন্দর প্রবাহ, যেখানে পরিসরতা, গভীরতা, তরঙ্গ, সকলে আসিয়া সুসংমিলিত এবং সংমিলনহেতু পরস্পরের প্রসাধনে প্রত্যেক প্রতি-কূলাংশের সমতা সাধন হইয়াছে; সাক্ষাৎ যেন সুরসরিদ্বরা প্রবাহাদর্শ জাহ্নবী! এখন বিধাতঃ, কতকাল আর কোপে তোমার এ দগ্ধভারতকে আরও দহন জ্বালায় জ্বালাইবে?—যে দেশে স্রোতস্বতী জাহ্নবীর জীবন

উপসংহার।

১। কর্ম্মক্ষেত্র।

হিন্দুও এখন আর সে হিন্দু নাই; গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। যে ভারত বিধাতার পুণ্যভূমি, জগতের গৌরব, আর্য্যের মাতৃদেবতা, ভবরঙ্গভূমে নৈতিক মনুষ্যত্বের যে একমাত্র রঙ্গগৃহ, আজি তাহা নির্ব্বাণদীপ; আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিষাদভরায় চতুর্দ্দিক হাহাকার-মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান। আর ইহার অদৃষ্টক্ষেত্রে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আদি বিশ্বপূজনীয় প্রজাপতিগণ উজ্জ্বল তারকারূপে আলোক দান করেন না; জ্ঞান-গগন তমসাবৃত, সপ্তঋষি অস্তমিত, বুদ্ধদেবও আর পাতকীর পাতকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে আইসেন না। সে রাম নাই, সে কৃষ্ণার্জ্জুন নাই, লোকমাতা জানকীর সে গগনভরা অনন্ত সুন্দর আদর্শ রমণীমূর্ত্তি নাই। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ, সকলেই বিগত; সকলেই যাইতেছে,—একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, নৈশ তিমিরজালে মিশাইয়া ভূতসাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কালদৃশ্য, প্রেতনিবাসিত চিতাভস্ম-বিলিপ্ত শ্মশানভূমি, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ; কেবল নষ্টসুপ্তির উন্মত্ত অস্ফুট আরাববৎ, শান্তিশূন্য, ক্লেদমথিত, নৈরাশ্যতপ্ত, ভগ্নোদ্যম, বঙ্কুরপদ পিশাচকুলের কিলি কিলি শব্দমাত্র শ্রুতিবিষয়ীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে ভারত নাই; বেদমহাভারতগীত ভারতে ভারত-সন্তানেরা এমন পশ্চিম-সাগর-পার-নিবাসী বিধর্ম্মী ধর্ম্মযাজক বা কৌশলী জুয়াচোরের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণে উদ্যত! আর গ্রীক? সে থার্ম্মাপিলি, সে মারাথন ক্ষেত্র, সে হোমার, সে থেলিস্, সে পেরিক্লিস্, সে লিওনিদা, সে সক্রেটিস্, সে প্লেটো, সে আরিষ্টটল, তাহারা কোথায়? কাল!

কাল!—সর্ব্বনাশক, সর্ব্বসংহারক, কুটিলকালিমাময় কালকন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। বনপর্ব্বতনিবাসী নরশোণিতলোলুপ যে নরপশুদিগকে বর্ব্বর জ্ঞানে গ্রীক স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাহাদের পদলেহন করিতেছে! যে দিব্যবিভূতি ভারত বিভবে জগন্মোহিনী, আজি তাহাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইয়াছে! হা দিবা! হা সংবৎসর! হা যুগ! সে সকল কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সূর্য্য, তুমিত ত্রিকাল-সাক্ষী, কালের মানদণ্ডরূপে তুমি দণ্ডায়মান, বলিতে পার কি, সর্ব্ব-নাশীর দল সে সকল কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে? আর তুমি—তুমি তাহাই আছ, তোমার সেই বাসগৃহও ত তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন, সে সকল মহার্হ রত্ন তুমিই বা কোথায় ফেলিয়া আসিলে! কালগর্ভে? তুমিও তথায় না যাইতেছ কেন?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,—এক যায়, আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন অবস্থাই স্থায়িনী নহে। বাসন্তী শোভা, প্রিয়মুখ, প্রণয়সম্ভাষণ, সুন্দর দিবা, চাঁদের আলো, সকলেই থরে থরে সজ্জিত, ঝলসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এমন সময় দপ্ করিয়া দীপ-নির্ব্বাণ; অমনি কে কোথায় লুকাইল, সকল ফুরাইল; সবাই রহিল, আমিই চলিলাম? অথবা আমি রহিলাম, সবাই চলিল! আজি যেখানে বিজন কানন, কালি তথায় বিলাসভবন; পরশ্ব আবার চিতার আগুনে দগ্ধভূমি, গগন অন্ধকার করিয়া ঘন ঘোর মণ্ডলাকারে স্তর স্তবকে ধূঁয়ার ঘটা উঠিয়াছে। হায় হায়! কেবল আসে যায়, যায় আসে। সকলেই সেই শক্তিস্রোতে উঠিতে পড়িতে অনন্ত হইতে আসিতেছে, আবার উলটি পালটি অনন্তমুখে অবিশ্রান্তগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে; স্রোতোবেগে পাথর গলিয়া বালি, আবার বালি জমিয়া পাথর বাঁধিতেছে। নৈসর্গিক নিয়মের একতা এবং অখণ্ডনীয়ত্বে, হিন্দু এবং গ্রীকও আজি সেই মহাস্রোতে স্রোতায়মান।

গতি যথায় যাহার যেরূপের হউক, পথ কিন্তু সকলের এক; পরি-ণামও তাহাই। এই দৃষ্ট এই অদৃষ্ট, এই এক এই আর; কিন্তু

উপসংহার।

১। কর্ম্মক্ষেত্র।

হিন্দুও এখন আর সে হিন্দু নাই; গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। যে ভারত বিধাতার পুণ্যভূমি, জগতের গৌরব, আর্য্যের মাতৃদেবতা, ভবরঙ্গভূমে নৈতিক মনুষ্যত্বের যে একমাত্র রঙ্গগৃহ, আজি তাহা নির্ব্বাণদীপ; আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিষাদভরায় চতুর্দ্দিক হাহাকার-মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান। আর ইহার অদৃষ্টক্ষেত্রে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আদি বিশ্বপূজনীয় প্রজাপতিগণ উজ্জ্বল তারকারূপে আলোক দান করেন না; জ্ঞান-গগন তমসাবৃত, সপ্তঋষি অস্তমিত, বুদ্ধদেবও আর পাতকীর পাতকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে আইসেন না। সে রাম নাই, সে কৃষ্ণার্জ্জুন নাই, লোকমাতা জানকীর সে গগনভরা অনন্ত সুন্দর আদর্শ রমণীমূর্ত্তি নাই। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ, সকলেই বিগত; সকলেই যাইতেছে,—একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, নৈশ তিমিরজালে মিশাইয়া ভূতসাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কালদৃশ্য, প্রেতনিবাসিত চিতাভস্ম-বিলিপ্ত শ্মশানভূমি, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ; কেবল নষ্টসুপ্তির উন্মত্ত অস্ফুট আরাববৎ, শান্তিশূন্য, ক্লেদমথিত, নৈরাশ্যতপ্ত, ভগ্নোদ্যম, বন্ধুরপদ পিশাচকুলের কিলি কিলি শব্দমাত্র শ্রুতিবিষয়ীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে ভারত নাই; বেদমহাভারতগীত ভারতে ভারত-সন্তানেরা এমন পশ্চিম-সাগর-পার-নিবাসী বিধর্ম্মী ধর্ম্মযাজক বা কৌশলী জুয়াচোরের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণে উদ্যত! আর গ্রীক? সে থার্ম্মাপিলি, সে মারাথন ক্ষেত্র, সে হোমার, সে থেলিস্, সে পেরিক্লিস্, সে লিওনিদা, সে সক্রেটিস্, সে প্লেটো, সে আরিষ্টটল, তাহারা কোথায়? কাল!

কাল!—সর্ব্বনাশক, সর্ব্বসংহারক, কুটিলকালিমাময় কালকন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। বনপর্ব্বতনিবাসী নরশোণিতলোলুপ যে নরপশুদিগকে বর্ব্বর জ্ঞানে গ্রীক স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাহাদের পদলেহন করিতেছে! যে দিব্যবিভূতি ভারত বিভবে জগন্মোহিনী, আজি তাহাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইয়াছে! হা দিবা! হা সংবৎসর! হা যুগ! সে সকল কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সূর্য্য, তুমিত ত্রিকাল-সাক্ষী, কালের মানদণ্ডরূপে তুমি দণ্ডায়মান, বলিতে পার কি, সর্ব্ব-নাশীর দল সে সকল কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে? আর তুমি—তুমি তাহাই আছ, তোমার সেই বাসগৃহও ত তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন, সে সকল মহার্হ রত্ন তুমিই বা কোথায় ফেলিয়া আসিলে! কালগর্ভে? তুমিও তথায় না যাইতেছ কেন?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,—এক যায়, আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন অবস্থাই স্থায়িনী নহে। বাসন্তী শোভা, প্রিয়মুখ, প্রণয়সম্ভাষণ, সুন্দর দিবা, চাঁদের আলো, সকলেই থরে থরে সজ্জিত, ঝলসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এমন সময় দপ্ করিয়া দীপ-নির্ব্বাণ; অমনি কে কোথায় লুকাইল, সকল ফুরাইল; সবাই রহিল, আমিই চলিলাম? অথবা আমি রহিলাম, সবাই চলিল! আজি যেখানে বিজন কানন, কালি তথায় বিলাসভবন; পরশ্ব আবার চিতার আগুনে দগ্ধভূমি, গগন অন্ধকার করিয়া ঘন ঘোর মণ্ডলাকারে স্তর স্তবকে ধূঁয়ার ঘটা উঠিয়াছে। হায় হায়! কেবল আসে যায়,যায় আসে। সকলেই সেই শক্তিস্রোতে উঠিতে পড়িতে অনন্ত হইতে আসিতেছে, আবার উলটি পালটি অনন্তমুখে অবিশ্রান্তগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে; স্রোতোবেগে পাথর গলিয়া বালি, আবার বালি জমিয়া পাথর বাঁধিতেছে। নৈসর্গিক নিয়মের একতা এবং অখণ্ডনীয়ত্বে, হিন্দু এবং গ্রীকও আজি সেই মহাস্রোতে স্রোতায়মান।

গতি যথায় যাহার যেরূপের হউক, পথ কিন্তু সকলের এক; পরি-ণামও তাহাই। এই দৃষ্ট এই অদৃষ্ট, এই এক এই আর; কিন্তু

সৌভাগ্য এই, ধ্বংস কাহারই হইতেছে না; অথচ তথায় আত্ম-সহায় ও আত্ম-সর্ব্বস্ব হইয়াও কেহ চলিতে পারিতেছে না। মূলে বিধর্ম্মী পদার্থ-পরমাণুর যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগক্রিয়া সৃষ্টিসঞ্চারের কারণ, সৃষ্টির উত্তরগতি বা উত্তরবৃদ্ধিতেও আজ পর্য্যন্ত সেই একই কারণ অভিনীত হইয়া আসিতেছে; এবং এইরূপ অভিনয় আবহমান কাল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেও থাকিবে। পুষ্ট ক্ষীণ—পৌরুষ কমনীয়—ধর্ম্মাধর্ম্মী—স্বজাতীয় বিজাতীয় বিভেদক্রমে পদার্থনিকরের এক অপরে গুরু হইতে গুরুতর মিশ্রণ, গুরুতর হইতে গুরুতম মিশ্রণ, এবং তাহাদের পুনঃ যথোচিত সংযোজনবশে পূর্ব্ব পদার্থ হইতে পদার্থান্তর বিরচন; পুনশ্চ সেইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমে পদার্থান্তর হইতে আবার গুরুতর এবং সেই গুরুতর হইতে আবার গুরুতম পদার্থান্তরের ক্রমোত্তর সম্ভাবনা, এতদ্দ্বারা এই সৃষ্টির অগ্রসরত্ব, সৃষ্ট পদার্থের ক্রমোত্তর অভিনব ভাব, বিপুলতা এবং উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে এবং এইরূপ হইয়া যাইতেও থাকিবে। কিন্তু মিশ্রণ এবং যথোচিত সংযোগে সংযোজনযোগ্য পদার্থনিচয়ের মধ্যে, পরস্পর-সংযোজন-উপযোগী গুণ-বিনিময় এবং সামঞ্জস্য-সাধন-উপযোগী অমেলক ভাগের বিকার আবশ্যক। বাঞ্ছারাম, মিশ্রণ এবং যথোচিত সংযোগে সংযোজনযোগ্য মনুষ্য-পদার্থনিচয়ের মধ্যেও, সেইরূপ পরস্পর গুণ-বিনিময় এবং সামঞ্জস্যসাধক অমেলক ভাগের পরিত্যাগ উদ্দেশে, গুণবিকার ভাবের সমুপস্থিতি হওয়ার প্রয়োজন হয়। কালস্রোতে হিন্দু এবং গ্রীক এমন স্থানে এখন আনীত হইয়াছে, যথায় তাহাদের পূর্ব্বমূর্ত্তির লোপ এবং নব-সংযোগে নবমূর্ত্তি ধারণ এ বিশ্বরঙ্গগৃহে একান্ত অপরিহার্য্য ও আবশ্যক। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীকের এখন সেই গুণবিকার-প্রাপ্ত অবস্থা; এবং এই জন্যই ইহাদের অবস্থা এখন আমাদের চক্ষে এমন অসৎ, অধঃপাতিত, হীন ও শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়—বিকার অবস্থা কবে কোথায় নয়নতৃপ্তিকর বা চিত্তের তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে? গ্রীকদিগের অবস্থা, গুণবিকারের পূর্ণতা

প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী; অর্থাৎ যথায় গুণবিকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, পদার্থান্তরের নির্ম্মাণক্রিয়া আরম্ভ হয়। আর হিন্দুদিগের অবস্থা এখনও গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে।

যখন দেখিতেছি যে, এই সৃষ্টি, এই সৃষ্টিস্থিত বস্তুনিকর, ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাৎ হটিতেছে না; সকলেই সম্মুখ গতিতে ছুটিতেছে, নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ মুখে যাইতেছে, নিম্নে কেহ পতিত হইতেছে না; তখন অবশ্যই একদিন এমন আশা করিতে পারা যায় যে,এই জাতি-দ্বয়েরও যখন গুণবিকার ও গুণবিনিময় ভাব শেষ হওনান্তে উদ্দেশ্যভূত উত্তর অবস্থান্তর নির্ম্মাণ প্রাপ্ত হইবে, তখন সেই অবস্থান্তর পূর্ব্বান্বয়ে আরও উৎকৃষ্ট, আরও উন্নত এবং নিরতিশয় লোভনীয় ও সুন্দরমূর্ত্তিতে মোহিত করিতে থাকিবে। বাঞ্ছারাম, এ কথায় কি সন্দেহ হয়? হইবারই কথা বটে; কিন্তু কখনও কি বিগতপূর্ব্ব ও আগামি-পরকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিয়াছ?—দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বের জগৎ এবং দ্বিসহস্র বর্ষ পরের জগতে একবার মিলাইয়া দেখ না কেন,তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত উক্তির অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ হইতে পারিবে। এ দীর্ঘকালে কত কতই না উদয় বিলয় বিপ্লব ও বিনাশ সাধন হইয়াছে.তথাপি কিন্তু পূর্ব্ব হইতে পর জগৎ কত উন্নত এবং সে উন্নতি অপেক্ষাকৃত কি বিপুল, বিশাল এবং বিস্তারেতে ব্যাপনশীল! কিন্তু এক কথা, পদার্থমাত্রের উন্নত-গতি অবশ্যম্ভাবিনী হইলেই যে প্রতি পদার্থ উন্নত-মূর্ত্তিতে অথচ স্বীয় পৃথকত্ব রক্ষিয়া দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া থাকে, তাহা নহে। উন্নত-গতিতে পদার্থের এই দ্বিবিধ পরিণাম। এক, বহু পদার্থ সহ সংমিলনে এবং স্বয়ং বিলুপ্তে পদার্থান্তর বিরচন; অপর, তদ্রূপ সংমিলন সত্ত্বেও স্বয়ং অবিলুপ্তে স্ফূর্ত্তিময়ী সুসংস্কৃত নবীনমূর্ত্তি পরিগ্রহণ। অর্থাৎ, ইহাতে পদার্থবিশেষের পূর্ব্বরূপ, সামান্যপ্রাণ হইলে, উন্নতি সত্ত্বেও বহুসংযোগে বিলুপ্ত-স্বাতন্ত্র্য হইয়া, সাধারণ দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া থাকে; এবং তাহাতে সংযোজিত পদার্থগুলিই, আয়তন-গুরুতা হেতু, বিশেষ এবং দৃশ্যমানরূপে ভাসমান হয়। কিন্তু যথায় মূল পদার্থ বিশেষ গুরু এবং

তাহাতে সংযোজনীয় পদার্থগুলি লঘু, সেখানে বহুসংযোগেও মূল পদার্থের পূর্ব্বরূপ, সংরক্ষিত উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য সহ, উন্নত ভাবে এবং দিব্য প্রভায় পরিলক্ষিত হইতে থাকে। উত্তরকালীয় গ্রীস্ এবং উত্তরকালীয় ভারতের দৃশ্যও, এদুয়ের দুইতর বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীকভাগ্য এখন সমগ্র ইউরোপীয় স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে; সুতরাং ক্ষেত্রবহুলতায়, তাহার ভাবি-মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ মোহকরী হইলেও, আপাত দৃশ্যে নগণ্যমধ্যে নিক্ষেপিত হইবার কথা। রোম গ্রীস হইতে মানুষ হইয়াছে, এবং সমগ্র ইউরোপ রোম ও গ্রীস উভয় হইতে মানুষ হইয়াছে; অতএব প্রকৃতপক্ষে উত্তরকালীয় গ্রীস দেখিতে হইলে, সমগ্র ইউ-রোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ভারতের ভাগ্য কিন্তু আজিও সেরূপ কোন সর্ব্বগ্রাসি-স্রোতে মিশে নাই এবং ভারতের ক্ষেত্রভূমিও পরিসর প্রাপ্ত হইতে পায় নাই; পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে, অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গুণবিনিময়েরও পূরা বাজার বসিয়াছে। যদি এই সময়ে আমরা সেই বিনিময়কার্য্য যথাযোগ্য পরিমাণে সংসাধন এবং তাহার সুব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে হইতে পারে, এই জগতীতলে ভারতের যে পূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য তাহা লোপ না হইয়াও, ভারতের জন্য গৌরবের এক অনাগত অপূর্ব্ব মহাদিন সমাগত হইবে। ভারতীয়দের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যলোপ বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, এ উভয়ই ভারত-সন্তানবর্গের নিজ নিজ কার্য্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

ভারতসন্তান, এই সময়ে কয়েকটি কথা আছে। বিকার বা বিপদের সময় চিরকালই শোচনীয়; সে দিনে এমন বোধ হয় না যে এ দিন আর কখনও ফুরাইবে; চিরকালই তাহাতে নৈরাশ্যপ্রবাহ ঢালিয়া দেয়; কিন্তু এটাও নিশ্চয় যে, বিকার বা বিপদ চিরকাল কখনও তিষ্ঠে না এবং যত চেষ্টা ততই তাহা ত্বরিতপদে তিরোহিত হইয়া থাকে। অতএব নৈরাশ্যপ্রবাহে ডুবিও না; অথবা অন্য দিকে, যাহা হইবার তাহা কর্ম্মসূত্রবশে ও প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় আপনা হইতে হইতেছে এবং

হইবে, ইহা ভাবিয়াও স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। নৈরাশ্য এবং ক্ষিপ্ত অদৃষ্টবাদিত্ব, এ উভয়ে অনেক দিন ধরিয়া তোমার, সকলের এবং ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; ক্রমান্বয়ে তাহাদের এই বিষময় ফল দেখিয়া আরও কেন তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও। তুমি যদিও জড়প্রকৃতি-সম্ভূত বটে, কিন্তু তুমি নিজে জড় নহ। জ্ঞানশক্তি, স্বেচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তিতে তুমি শক্তিমান্; সুতরাং তুমিও স্বয়ং প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের উপর আর এক কর্ম্মসূত্র এবং নৈরাশ্যের উপর আর এক আশানির্ম্মায়ক কৃতী বলিয়া আপনাকে জানিও। প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র এবং তুমিরূপ কর্ম্মসূত্র, উভয়েরই কর্ম্মগতি যদিও একই মুখে, তথাপি তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে স্বীয় স্বীয় কার্য্য-স্বাধীনতাশূন্য নহে। ভারতসন্তান, এ কথা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

কেমন করিয়া বুঝাইব? তুমি যদি সামঞ্জস্য-সমুৎপন্ন মধ্যম গতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে, তাহা হইলেও কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারিতাম। কিন্তু তুমি হয় হুজুকে হাটের লেড়া, নতুবা অনড় অসাড় চেষ্টাশূন্য জড়পিণ্ডবৎ। তোমার কর্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হইল যদি, কর্ম্ম যত হউক না হউক, চীৎকারে দেশ তোলপাড়; আবার কর্ম্মবুদ্ধির ক্ষীণতা হইল যদি, তবে একেবারে অস্তিত্বশূন্য, জীবনীর চিহ্নমাত্রের চিহ্নও পাইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি হইল যদি, তবে তুমি হয় ত-একেবারে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বিরাগীর চূড়ামণি—পুত্রপরিবারাদি অনাথ পথের ভিখারীতে পরিণত; নয় ত অন্য দিকে ঘেঁটু মনসা পর্য্যন্ত পূজিয়াও তোমার ক্ষান্তি নাই! আর ধর্ম্মবুদ্ধি না হইল যদি, তবে একেবারে কাঠ-নাস্তিক, ওরফে ঘোর বৈজ্ঞানিক বা 'ফিলোজফার।' কোন দিকেরই তোমার ভাব ও অন্ত পাওয়া বড় কঠিন। তাহার পর আর যেমন হউক, সকল অবস্থাতেই কিন্তু অদৃষ্টবাদিত্বের উপরে নির্ভরটা কিছু বেশী বেশী; অদৃষ্টবাদিত্ব—'কপালে যা আছে তাই হবে!' বাঞ্ছারাম, তুমি কি জন্য এমন বদ্ধমূল অদৃষ্টবাদী,—তোমার

এ অদৃষ্টবাদিত্ব কোথা হইতে উঠিয়াছে বলিতে পার? আমি যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে তোমার এ অপূর্ব্ব অদৃষ্টবাদিত্বের এই দ্বিবিধ কারণ লক্ষিত হয়, এক তোমার শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শাস্ত্রের বিকৃত অর্থগ্রহণ,—তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অপর, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তি, এতদুভয় শক্তির সন্ধিস্থল দেখিয়া তাহাদের পৃথকত্ব অনুভব করিতে না পারা এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রাবল্য হেতু তাহার মোহে অভিভূত হওয়া। সন্ধিস্থলমাত্রে সংমিলিত বস্তুদ্বয়কে সাধারণতঃ পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া যে দুষ্কর তাহা মানি; কিন্তু বাপু, তোমার চক্ষু কেবল সন্ধিস্থল দেখিবার জন্য নহে; যদি তাহাকে অতিক্রম করিয়া, বস্তুদ্বয়ের দিগন্তভাগাভিমুখ পর্য্যন্ত দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, প্রাকৃতিক শক্তি পৃথক এবং স্বেচ্ছাশক্তি পৃথক। যে অংশে একমাত্র প্রকৃতির ক্রিয়া, তাহাতে অবশ্য তুমি স্বেচ্ছাশূন্য এবং তাহাকে তুমি 'অদৃষ্ট' বা যে নামে ডাকিতে ইচ্ছা ডাকিতে পার; সেরূপ স্থলে যে কিছু পরিণাম বা ফলাফলের উৎপত্তি, তাহাতেও অবশ্য তুমি নির্দ্দোষ। কিন্তু তোমার জবাবদিহী সেইখানে, যথায় ক্রিয়া তোমার জ্ঞান ও স্বেচ্ছাশক্তিসম্ভূত। মানবীয় জ্ঞান ও স্বেচ্ছা-শক্তি হইতে সম্ভূত যে সকল কার্য্য, তাহা যখন যথাস্বভাব প্রকৃতির অনুগামী এবং প্রকৃতির সাহায্যবর্দ্ধক হয়; তখনই সেই কার্য্যের সার্থকতা, তখনই তাহা সতের অভিপ্রেত, সুতরাং তাহাতে মঙ্গলের উৎপাদন হয়। তদ্বিপরীতে তদ্বিপরীত ফল;—নিয়ন্তার কর্ম্মহানি, নিজের কর্ম্মহানি, উভয় হানি তখন একত্র সমবেত হইয়া, কর্ম্ম-কারককে ব্যাকুলিত এবং ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। জ্ঞান ও স্বেচ্ছাশক্তি-সম্ভূত অথচ প্রকৃতির অনুকূলে যে কার্য্য এবং তদর্থে যে অনুষ্ঠান, তাহাই এ জগতে মানবের আত্মসম্বন্ধে সৎ, তদ্বিপরীতে অসৎ। জ্ঞান ও স্বেচ্ছার অপ্রতিহত গতি অথচ সে গতিতে প্রাকৃতিক শ্রেয়ঃ যাহা তাহার অনুসরণকল্পে বাধ্যবাধকতা, এতদুভয়ের

দ্বারা মানুষে যুগপৎ স্বাধীন ও পরাধীন ভাবের বিদ্যমানতা সুস্পষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব দেখ, তুমি যে আপনাকে অদৃষ্টের অধীন এবং পরাধীন বলিয়া জানিতে, তাহাও অলীক নহে,—তুমি পরাধীন, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলে যে, তুমি পরাধীন হইয়াও স্বাধীন।

তুমি বা তোমার কামনা, অদৃষ্ট বা মহান্ কামনার নিকট পরাধীন হইয়াও স্বাধীন,—এ কথা কোন পাষণ্ড মূর্খ শুনিলে হয়ত অপন্যায় জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইতে প্রস্তুত হইবে। কিন্তু হইলে হাত কি?—তথাপি উহা তাহাই। পুনশ্চ, কর্ম্মের প্রোক্ত প্রাকৃতিক উপযোগিতাকল্পেই যে কেবল মানুষের অধীনতা তাহা নহে; কর্ম্মাভাস ও কর্ম্ম-উপকরণ সকলের প্রাপ্তিকল্পেও মানুষের অধীনতা সম্পূর্ণ। ভাল, ইহার একটু আলোচনা করিয়াই দেখ না কেন। বাপু বাঞ্ছারাম, কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, তিলে তিলে, প্রতিক্ষণে মানব কর্ম্ম সকল নিষ্পাদন করিয়া যাইতেছে; অথচ দেখিতে গেলে একটাও তাহাদের নূতন নহে। অথবা নূতনত্ব সত্ত্বেও পুরাতন; নূতন-পুরাতনের যুগপৎ একত্র সমাবেশ;—নূতন হইয়াও অনুকরণমাত্র। আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, অগ্রে তাহার আভাস বাহ্যজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া লই, সেই বাহ্যজগৎ-প্রদত্ত উপকরণসাপেক্ষ হই, নতুবা কোন কর্ম্মই সুসম্পাদন করিতে পারিতাম না। তুমি এখন বলিতে পার যে, আমি যে এই সুন্দর বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি, ইহা কি নূতন নহে?—তোমার জাগতিক মূর্ত্তির কোন মূর্ত্তিবিশেষ এরূপ আছে যে আমার এই বাড়ী যাহার প্রতিরূপ স্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা দেখিয়া আমি এই বাড়ী নির্ম্মাণের আভাস প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হই? মিথ্যা নহে, তুমি যে কথাগুলি বলিতেছ তাহা সত্য বটে; বিশেষতঃ যেরূপ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, যত বাটপাড়ি করিয়া এই বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহাতে তাহার নূতনত্ব-হানিকর কোন বিরূপ কথা বলিতে যাওয়াও নিষ্ঠুরতার কার্য্য। কিন্তু আবার না বলিলেই বা চলে কই? তুমি যে কথাগুলি বলিতেছ এক অর্থে তাহা সত্য বটে,

কিন্তু আর এক অর্থে তাহা সত্যও নহে; একটু ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখ দেখি মূলে তোমার পাকাবাড়ীর বুদ্ধি কি দেখিয়া উঠিয়াছিল,—কাঁচাবাড়ী! কাঁচাবাড়ী দৃষ্টে যে বাড়ী বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার উপর বুদ্ধিযোগে আরও অপরাপর বহু বিষয়ক সত্ত্বাভাস আরোপিত হওয়াতে, তোমার পাকাবাড়ীর কল্পনা সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পাকাবাড়ীর মুখ্য আভাস যাহা তাহা কাঁচবাড়ী হইতে প্রাপ্ত। আবার কাঁচাবাড়ী?—টাটীর ঘর দেখিয়া। টাটীর ঘর?—লতাপাতার ঘর দেখিয়া। লতাপাতার ঘর?—সংগৃহীত তালপাতার নির্ম্মিত আবরণ বা তথাবিধ কিছু দেখিয়া। সেই তালপাতার আবরণ আবার কি দেখিয়া হইয়াছে? বিশ্বাস করিবে কি, গাছতলা বা বৃক্ষকোটর দেখিয়া! গাছতলা বা বৃক্ষকোটর কি দেখিয়া বা কাহার?—উহা কিছু দেখিয়াও নহে এবং উহা তোমারও নহে, আমারও নহে। আদিতে স্বভাব আপনা হইতে টানিয়া মানুষকে উহার সংলগ্নতায় আনিয়াছিল; অথবা তত্ত্বকথায় বলিতে গেলে, সেই সংলগ্নতায় আগমন, 'তুমি' 'আমি' বহির্ভূত পরিচালিকা মহাশক্তির কার্য্যবশে উৎপন্ন। মূলে গাছতলার আভাস হইতে যেমন তাহার উত্তরোত্তর বিবর্ত্তন ও পরিণাম ফলে পাকাবাড়ীর উৎপত্তি; সেইরূপ জগতের তাবৎ বিষয় সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে।—মানবীয় কৌশলকৃত সকল পদার্থই, প্রকৃতির অনুকরণে, বিবর্ত্তনবশে ও পরিণামিতায়, সহজ হইতে কূটতায়, লঘু হইতে গুরুতায়, একক হইতে মিশ্ররাশিমুখে এবং আভাস হইতে রূপ, রূপ হইতে আভাস, এরূপ কার্য্যকারণপ্রণালীক্রমে, উত্তরোত্তর নানাবিধ ও নিত্য নব আকৃতি গ্রহণ করিয়া ছুটিতেছে।

সে যাহা হউক, এখন দেখিলে, তোমার পাকাবাড়ীর মূল কোথায়? তুমি যে বিক্ষিপ্ত উপকরণরাশিকে সংগৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিয়াছ এবং বহুতর আভাসের সদ্ব্যবহারে তুমি তোমার বাড়ীর যে এরূপ আকার প্রকার দিতে সক্ষম হইয়াছ, তাহাই তোমার নূতন; কিন্তু উপকরণরাশি যাহা তাহা জগদ্গর্ভে এবং

আভাস সকল যাহা তাহা জাগতিক রূপ-পদার্থে এবং তাহার মধ্যে পুনঃ মুখ্য আভাস যাহা তাহা মূলে গাছতলা বা বৃক্ষকোটর হইতে সংগৃহীত; সুতরাং এখানে আবার তোমার কার্য্য নূতন হইয়াও নূতন নহে, বস্তুতঃ উহা পুরাতন এবং কার্য্যতঃ উহা মহাপ্রকৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ। একটি তোমার স্বাধীনতার এবং অপরটি তোমার .অধীনতার পরিচয়। একটি তোমার স্বেচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান-শক্তির সম্পত্তি, অপরটি খাস মহাপ্রকৃতির সম্পত্তি। এইরূপ আমাদের সকল কার্য্য, সকল বিষয় ও সকল বস্তু সম্বন্ধে, এবং এইরূপেই ঐশ্বরিক মহান্ কামনার নিকট, মানবীয় কামনা স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। আরও দেখ, বাড়ীটি যেখানে ও যে যে পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা সমস্তই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল; এরূপ পদার্থ এই সঙ্গে এরূপ যোগ করিলে এরূপ পদার্থান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারও নিয়ম এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল; তাহাদের আভাস যাহা, তাহাও এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল; এখন, সেই সকল যে ছিল এবং তাহাদের না হইলে যে তোমার অবস্থায় চলে না এবং তুমি তাহাদিগকে অবহেলা করিলে যে অসুখ বা অনর্থের বিষয়ীভূত হও এই পর্য্যন্তে তোমার অধীনতা; কিন্তু তুমি যে সেই গুলির যোগাযোগ সাধন করিয়া এরূপ আকৃতি সংঘটন করিয়াছ, এবং তদ্দ্বারা অনর্থের পরিবর্ত্তে যে অর্থকে উপার্জ্জন ও অগ্রসারিত করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার স্বাধীনতার পরিচয়। পুনশ্চ, এ পৃথিবীতে অনন্ত কর্ম্ম, কিন্তু তাহার মধ্যে কর্ম্মবিশেষের যে নির্ব্বাচন, তাহাতেই তোমার স্বাধীনতা, কিন্তু সেই কর্ম্ম যে প্রকৃতির অনুকূলে সম্পাদিত না হইলে অনর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাই তোমার অধীনতার পরিচায়ক হয়। আমাদিগের কৃত সকল কর্ম্মেই এইরূপ ব্যবস্থা এবং কি আত্মিক কি ভৌতিক যাবতীয় বিষয়েই আমরা এইরূপ স্বাধীন ও পরাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। এখন তুমি হয়ত বলিবে, প্রকৃতির নিকট উপকরণ ও আভাসের নিমিত্ত বশ্যতায় যেরূপ সৎকার্য্য করিতে হয়, অসৎ কার্য্যেও ত অবিকল সেইরূপ বশ্যতা এবং আরও দেখা

যাইতেছে যে, সে অসৎ কার্য্যও ত প্রকৃতিবক্ষে বৃথা যায় না;—ফলতঃ প্রকৃতিপোষক হইলেই যদি কার্য্য সৎ হয়,তবে সেরূপ কার্য্যকেও সৎ না বলিয়া অসৎ বলি কেন? অসৎ বলি এই জন্য যে তাহাতে পরিণামে অনর্থের উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ, এই প্রশ্ন ও তর্কসূত্রে আরও এ দুইটি বিষয় এখানে সুন্দররূপে উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ এক তোমার ক্ষীণ ও বিকৃত শক্তিমত্তা, অপর প্রকৃতির সর্ব্বশক্তিমত্তা। তোমার ক্ষীণ ও বিকৃত শক্তিমত্তাতে তুমি অসতের উৎপত্তি করিয়া যাইতেছ; কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাতে সে অসৎকেও কাজে লাগাইয়া হরণপূরণ করিয়া লইতেছেন;—কিন্তু সেই সঙ্গে,এটাও এখানে প্রকৃতির জমাখরচ বহিতে নিশ্চয়রূপে তোমার বিপক্ষে লিখিত হইয়া রহিতেছে যে, তোমার দ্বারা প্রকৃতির যতদূর সহায়তা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইল না। সুতরাং তুমিও সেই পরিমাণে অপরাধী ও প্রত্যবায়ের ভাগী হইয়া রহিতেছ। ফলতঃ বাঞ্ছারাম, সৎ অসতের বিভাগ কিছু কঠিন নহে; সতের সমক্ষে অসৎ স্বতঃই বিভাজিত রহিয়া থাকে। কঠিন, সতের সমাদরে অসৎকে পরিহার করা। যে কার্য্য আশু সরস হইয়াও পরিণামে বিরস, তাহা অসৎ; আর যাহা আশু বিরস হইয়াও পরিণামে সরস, তাহা সৎ। তাহার পর, অসতের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে,অন্তে হরণপূরণ সহ প্রকৃতিতে সংমিলিত হইয়া গেলেও, আগে একটা ব্যাপক অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া তদ্রূপ সংমিলিত হয় না, কিন্তু সতের লক্ষণে সেরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অতঃপর বাঞ্ছারাম, তোমার এরূপ জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি এবং স্বাধীনতা সত্ত্বেও, আরও কি বলিয়া দিতে হইবে যে, যে অদৃষ্টভয়ে তুমি নিরন্তর ভীত হইয়া থাক,তুমি নিজেই অনেক সময়ে সেই অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। যে কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে এবং তোমার কার্য্যসহায়তা যে কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে, সেই কর্ম্ম যাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রধাবিত হইয়াছে; তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার এ কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগও তাঁহারই। তাঁহারই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ

করিবার জন্য তোমাকে জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি এবং স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি কেবল যন্ত্র নহ, যন্ত্রপরিচালকও তুমি, অতএব এই কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে তুমিও কর্ম্মকারক ; তাই বলি, স্রোতে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য, অথবা যদৃচ্ছা স্বেচ্ছাক্ষিপ্ত হইয়া বিচরণ করিবার জন্য, সংসারক্ষেত্রে আইস নাই।

বাপু বাঞ্চারাম, তুমি তর্কে ন্যায়পঞ্চানন, এবং বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতিও তোমার কাছে হারি মানিয়া থাকেন। তুমি বলিবে কর্ম্মই বা কি, কর্ম্মক্ষেত্রই বা কি, তাহার জন্য এত আড়ম্বর, এত মাথাব্যথা কেন ? আগে তাই সাব্যস্ত কর,তাহার পর ত জ্ঞান, ক্রিয়া ও স্বেচ্ছাশক্তি লইয়া টানাটানি। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমিও যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র যাহা তাহা চাকুরীক্ষেত্র, কর্ম্ম যাহা তাহা উদর-পূর্ত্তি, এবং পরম পুরুষার্থ যাহা তাহা সুখ-শয়ন। ইহা ভিন্ন আবার কি কর্ম্ম আছে ? যদি আর কিছু থাকে,এই কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে তাহারা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে পড়ুক, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক নাই। বাপু, আমার তর্কশক্তি নাই ; কিন্তু তুমি বারেক মানস-নেত্র প্রসারিত করিয়া দেখিয়াছ কি ?

এই পরিদৃশ্যমান, অথচ ধারণার অতীত, অনন্ত গগনসমুদ্রে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কপিণ্ড নিরন্তর ভাসমান হইয়া ফিরিতেছে; এবং আমরা এই কণিকাবৎ যে ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর অবস্থান করিয়া মোহপ্রমাদে বিশ্বের ঈশ্বরত্বে পর্য্যন্ত হস্ত প্রসারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি; সেই পৃথিবীতে আবার কীট হইতে কীটাণু, অণু হইতে পরমাণু, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, যে সকল জীবন বা জড় পরমাণু লক্ষিত বা লক্ষ্যাতীত ভাবে অবস্থান করিতেছে ; সেই সমগ্র দৃশ্য, সে দৃশ্য যদি কাহারও একধা দেখিবার,ধারণা করিবার,বা অনুভব করিবার শক্তি থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে তাহা কি মহান্, কি অপার, কি অচিন্তনীয়! ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম; বৃহৎ হইতে বৃহত্তম , অথবা নিম্ন হইতে নিম্নতম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম ; যে দিকে দেখিতে চাও, সকল দিকেই তাহা অনন্তপ্রসারিত

আয়তনে ব্যাপিত হইয়া রহিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর, কোন দিকেই কোন বস্তুর অন্ত পাইবার সাধ্য নাই। মনুষ্য-জীবনেও যাহা কিছু কৃত,কথিত, কল্পিত; আমাদেরই দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, অথচ আমরাই তাহার অন্ত পাইয়া উঠি না। আমরা আপনাদের অন্তই আপনারা পাই না। আশ্চর্য্য! অতঃপর এই নিবিড় অনন্ত পরিবেষ্টিত ও তাহাতেই পরিবর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়াও, যাহারা আপনাকে অন্তানুবর্ত্তী রূপে কল্পনা করিয়া, আত্ম-অতিবাহিত করিয়া থাকে; এবং বিশ্ব-আত্মা সহ আত্মিক নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা দেখিতে না পায়, তাহারা কি ভ্রান্ত!

এখন বিশ্বাস করিবে কি, এই অনন্ত দেশ লইয়া তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ব্যাপ্ত; এবং তোমার কৃত কর্ম্মসমূহ সেই বিশাল আয়তক্ষেত্রে অনন্ত-প্রসূত কর্ম্মরাশি সহ সম্বন্ধবান্? এই নিবিড় অনন্ত সাগরদেশে বৃহৎ এবং দূরতম জ্যোতিষ্ক হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত, জীবিত অজীবিত যে যাবতীয় পদার্থনিকর, আমূলতঃ কালবক্ষ বাহিয়া, কখন ডুবিয়া কখন ভাসিয়া, ভাসমান হইয়া চলিয়াছে; তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরি-চালিকা-মহাশক্তি-রূপী যে ঐশ্বরিক নিয়ম, তাহা সর্ব্বত্র এক। ঐশ্বরিক নিয়ম এবং ঐশ্বরিক সত্তা, ইহারা নিত্য পদার্থ; সুতরাং সর্ব্বদেশে ও ও সর্ব্বকালে একইরূপে অবস্থান করিতেছে। তবে যে আমরা তাহাতে নানারূপে বিভিন্নতা অবলোকন করি, বা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ তাহাদের ব্যাখ্যা করে, তাহা তৎ তৎ পদার্থের দোষ নহে; দোষ যদি কোথাও থাকে তাহা আমাদের। মানব তাহাকে সহসা ধারণা করিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; তাই নানা জনে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি অনুরূপ নানাবিধ জল্পনা করিয়া থাকে।

"উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপিহ বিষ্ণো!"

দেখ, এক চাঁদের কলঙ্ক বুঝিতে মানব, 'বুড়ির কদমতলায় কাট্‌না কাটা' হইতে 'অন্ধতম গভীর গুহা' পর্য্যন্ত, কত কথাই বলিয়া আসিতেছে এবং এখনই কি সে বলার শেষ হইয়াছে ?

এখানেও সেইরূপ। ঐশ্বরিক নিয়ম ও ঐশ্বরিক সত্তা সেইরূপ এক ভাবে চিরকালই সমান থাকিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; কেবল মানব তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, নানা-দেশজ নানা প্রকৃতি এবং স্বীয় স্বীয় জ্ঞানোন্নতির বিভিন্ন পর্য্যায় অনুসারে, নানা স্থানে,নানা সময়ে, নানারূপে ব্যাখ্যা প্রকটন করিয়া ফিরিতেছে। এই ব্যাখ্যাই, সেই নানাদেশজ নানা প্রকৃতি ও জ্ঞানোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় অনুসারে ; নানা স্থানে, নানা সময়ে; অবনত বা উন্নত; ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্র, নানা মত, নানা গ্রন্থ, নানা কথা, ইত্যাদি আকারে এ জগতে ক্ষণে উদয় ক্ষণে বিলয় হইয়া যাইতেছে। সেই সেই ধর্ম্ম এবং তত্ত্ব শাস্ত্রাদি, কোথায় ও কিরূপে এবং কোন্ সময়ে ও কি পরিমাণে মানব সেই সেই নিত্য পদার্থগুলি বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছিল এবং তাহাতে কতদূর বা সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই নিদর্শক স্বরূপ। পুনশ্চ, সেই সকল শাস্ত্র যে দেশে যে প্রকৃতির লোক ও যে জ্ঞানপর্য্যায় হইতে সম্ভূত, সেই দেশে সে প্রকৃতির লোক অথচ যাহারা সে জ্ঞানপর্য্যায়ে এখনও উঠে নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্য তাহারা পরিচালকস্বরূপ হয়। এ হিসাবে সকল দেশেরই ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহারা অধিকতর উন্নত জ্ঞানের উদয়ে অর্থশূন্য না হয়, তাবৎকাল তত্তৎ দেশের লোকের পক্ষে উপযোগী ও তন্নিহিত বিধানাদিও তাহাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বলিতে হইবে। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বী অথবা প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বীই ভাবিয়া থাকে যে, 'তাহাদের হইতে বিধর্ম্মী যাহারা, হায় ! তাহাদের আর উপায় নাই, সুপন্থা অভাবে নরকে ডুবিয়া তাহারা নষ্ট হইবে বা যে কোন রূপে অধঃপাতে যাইবে।' অবিকল এইরূপ, যাহারা রোগে সদা ডাক্তারের সাহায্য পায়, তাহারা ভাবে

যে ডাক্তার যেখানে নাই, সেখানকার লোক বাঁচে কি করিয়া। অথচ ঈশ্বরের কৃপায় যেখানে ডাক্তার আছে সেখানেও যেমন, যেখানে নাই সেখানেও তেমনি জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। তোমার অবস্থায় ডাক্তার না হইলে চলে না, তাহার অবস্থায় গোবেদে হইলে চলে এবং তাহাতেই তাহার রোগের প্রতিকার হয়;—এ হিসাবে মোটের উপর সকল স্থানেই সমান হরণপূরণ সাধন হইয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, ধর্ম্মপদার্থও, তাবৎ গূঢ় পদার্থের ন্যায়, বাহির হইতে আইসে না, ভিতর হইতে উদয় হয়। হৃদয়ের যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং পূর্ণ ভক্তি, এই দুইকে তাবৎ ধর্ম্মপদার্থের উপাদান বলিয়া জানিবে। এই দুইই মানুষের ধর্ম্মপথে মুক্ত্যুপায়। নতুবা, দেবতার রূপ অরূপ, পুতুল অপুতুল বা এ দেবতা সে দেবতায় কিছুমাত্র যায় আসে না; এ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় এবং সে ধর্ম্মশাস্ত্র যে ভিন্ন ভিন্ন দেশজ প্রকৃতি ও জ্ঞানোন্নতির পর্য্যায় অনুসারে কিরূপ ক্ষণে উদয়, ক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা ক্ষণে বিলয় হইয়া থাকে, তাহা উপরে বলিয়া আসিলাম। যাহারা এখন চাঁদের কলঙ্ক দেখিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বলে উহা লুপ্তসমুদ্রের তলদেশ, তাহারা চাঁদের যে চন্দ্রিকা উপভোগ করে; তাহাপেক্ষা, যাহারা বলিত উহা বুড়ির কদমতলায় কাট্‌নাকাটা, তাহারা যে কিছু কম উপভোগ করিয়াছিল তাহা নহে। যে যে ভাবে ও যেরূপে ডাকিতে পারে, তাহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; নতুবা সে দুর্জ্ঞেয় পুরুষের স্বরূপজ্ঞানে কে সমর্থ, বলিতে পার? শ্রুতি বলেন,—

"যস্যাবেদং তস্য বেদং বেদং যস্য ন বেদ স।"

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই স্বীয় স্বভাবে অসম্পূর্ণ; নিত্য পদার্থগুলির যখন অন্ত নাই, মহিমা যখন তাহাদের অপার, এবং জ্ঞানও যখন ক্রমোন্নতিশালী, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিরও এ জগতে পূর্ণতা এবং তাহাদের উদয় বিলয়ের অন্ত হইবে কি প্রকারে? অতএব একবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বীর অপরবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বীর প্রতি যে বিদ্বেষ ও নরকভয় প্রদর্শন প্রভৃতি, সে কেবল গোঁড়ামী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে!

আরও দেখ, ঐশ্বরিক নিয়ম যাহা, যাহা সত্ত্বরজস্তমঃ-ত্রিগুণবিশিষ্ট ও যাহা বিশ্ব পরিচালনা হেতু সাধারণতঃ বিশ্ব-নিয়ম নামে খ্যাত; তাহা, দেশ কাল এবং পরিচালনীয় উপকরণ পদার্থাদি ভেদে তদ্বৎ বাহ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ হেতু, লোকনয়নে আপাততঃ বিভিন্ন বিভিন্নরূপে যেন ততগুলি বিভিন্ন নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্ধহস্তিন্যায়বৎ মানুষ যে যে ভাবে তাহাকে অনুভব করে, সে তাহাকে সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ভাবিয়া'ও দেখিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। শুক্লকৃষ্ণ নেমিবিশিষ্ট শাশ্বত সেই নিয়মচক্র, 'আহ্নিক' এবং 'বার্ষিক' গতিতে আবর্ত্তমান হইয়া; জগৎ সংসার সমস্তকেই, নিত্য শুভাশুভ, নৈমিত্তিক শুভাশুভ, উভয় শুভাশুভের সমান অধীনে ফেলিয়া; তাহাদের নিত্য রূপান্তর এবং নৈমিত্তিক রূপান্তরের উৎপাদন করিতে করিতে, অগ্রসর হইয়া ধাবিত হইতেছে। প্রতি পদার্থেরই শুক্ল কৃষ্ণ দ্বিবিধ গতি; শুক্লগতিবশে সত্ব বা একত্বমুখে এবং কৃষ্ণগতিবশে বিকার বা বহুত্বমুখে গতায়াত করে। যে নিয়মে কেন্দ্রবাহী বায়ুব্রজ উপশমিত ও অপশমিত হইতেছে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই একই নিয়মে উপশমিত ও অপশমিত হয়। আরও দেখ, যে শক্তিস্রোতের স্বাভাবিক গতিবশে নদীস্রোত আঁকা-বাঁকা হইয়া চলিতেছে, রেখাকৃতি সাপও তাহার বশে হিলিবিলি করিয়া যাইতেছে; আবার মানবও পর পর দক্ষিণ ও বাম পদদ্বয় বিক্ষেপে সেই আঁকা বাঁকা গতিরই অনুকরণ করিতেছে। অথবা যে নিয়মে অসীম আকাশে মহীয়ান্ সূর্য্যদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছেন, তোমার হস্ত-নিক্ষেপিত ঢিলটিও অবিকল সেইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে ছুটিতেছে; অথবা যে নিয়মে নর ও নারী সংযোজিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিতেছে, সেই একই নিয়মে উদ্ভিজ্জসংসারে ফলোৎপত্তি এবং বায়বীয় সংসারে পুষ্ট তাড়িত ও ক্ষীণ তাড়িত একত্র হইয়া বজ্রাগ্নির উপস্থিতি করিতেছে। পুনশ্চ, যে তাপ ও শৈত্য জড়জগতে যৌগিকাকর্ষণের ন্যূনাতিরেক ব্যবস্থিত করিয়া, জড়কে শিথীলবন্ধন বা জমাটযুক্ত করিয়া থাকে; তাহারাই

পুনঃ চৈতন্যসংসারে রাগ বা বিরাগ, আসক্তি বা অনাসক্তি, তরলতা বা গভীরতা, ইত্যাদির উৎপাদনপূর্ব্বক জীবকে অসার বা সসার, দুঃস্থ বা সুস্থ করিয়া দেয়। অর্থাৎ জড় পরিচালনে যে নিয়ম, জীবজগৎ নির্ব্বিশেষ পরিচালনে তদপেক্ষা ন্যূনাতিরেক কিছুই নাই।

তাহার পর তোমার আঁকাবাঁকা, দক্ষিণ বাম, পুষ্ট ও ক্ষীণ বা তদুভয় ভেদে পুরুষ ও নারী, শৈত্য ও তাপ, ইহারা আবার কি পদার্থ? এখানে এ পৃথক্‌ভাব ও পৃথক্ মূর্ত্তিধারী গুণগুলি কাহারা? ইহারাও পৃথক নহে। আলোক এবং অন্ধকার, ভাব এবং অভাব, অস্তি এবং নাস্তি, সত্ত্ব এবং ব্যতিক্রম, সৎ এবং অসৎ, পাপ এবং পুণ্য, শুভ এবং অশুভ, ইত্যাদির গুণভেদ হেতু সত্তার বিভাগবোধ যাহা, ইহারাও তাহাই। এ বিভাগবোধ আবার কি ও কেন? পূর্ণত্ব এবং ন্যূনতা, স্বভাব এবং বিকার;—শক্তিস্রোতের যে গতি, শুক্লকৃষ্ণভেদে তাহার দুই বিভিন্ন দিকের দুইটি সংজ্ঞামাত্র, একই বস্তুর উভয় দিক; কেবল দেশকাল ও অবস্থা অনুসারে, সংজ্ঞাদ্বয় প্রোক্ত নানাবিধ বিভিন্ন নামে বিজ্ঞাপিত হয়। শক্তিস্রোতের অপ্রতিহত বেগ, সুতরাং শুক্লকৃষ্ণ গতিদ্বয়ও পর পর অবশ্যম্ভাবিরূপে আসে যায়, তাহাতে বিরাম নাই, ব্যত্যয় নাই, বিঘটন নাই; একের পর আর, আরের পরে এক। এই শুক্লকৃষ্ণ গতিবশেই বৈচিত্র-প্রকট এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ। কিন্তু শ্রুতি কি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব্বদর্শী!—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লবর্ণাং
বহ্বীপ্রজাসৃজমানাং স্বরূপাং॥"

এই শুক্লকৃষ্ণ গতি এ বিশ্বের সর্ব্বাবস্থা, সর্ব্বপদার্থ, সর্ব্ববিষয়ে গুহ্যতম অন্তরভাগ পর্য্যন্তে সন্নিবিষ্ট; অথবা উহারই পরিণাম যখন সৃষ্টি, তখন এ কথা বলাই অধিক। মানুষ তাস খেলে, পড়তা পড়ে, বিপক্ষেরা পড়তা ভাঙ্গিতে কত কাণ্ডই করে; অথচ পড়তাও ভাঙ্গে না, বদ্ পড়তাও ঘুচে না। ঐরূপ মানুষের ভাগ্যচক্রে যখন বদ্‌পড়তা উপস্থিত হয়, তখন কত সাবধান, কত চেষ্টা, তবু পোড়া শইল মাছ

জলে যায় ; আর পড়্‌তার সময় ডুবো আংটীও ভাসিয়া উঠে! কিন্তু মানুষ চিনির বলদ, বুঝিতে পারে না উহা কেন হয়। ঐরূপ যেটায় বড় আশা তাহা নিষ্ফল, এবং যাহাতে আশা আইসে না তাহা যেন কোথা হইতে আসিয়া সফল হয়। একের পূর্ণতায় অপরের আগতি, গতাগতির ইহাই কাজ।

শক্তিস্রোত, ঈশ্বরের কামনাপ্রবাহ। কামনাপ্রবাহ এক এবং অখণ্ডিত, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া সেই কামনাপ্রবাহের আশু উদ্দেশ্য এবং ফল। প্রোক্ত বিভাগবোধ বা সংজ্ঞাদ্বয়ই, ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়াকে প্রকটমান করিয়া থাকে; নতুবা তাহাদের অভাবে সমস্তই অব্যক্তে বিলীন হইয়া থাকিত। ভাবে উৎপত্তি, অভাবে নিবৃত্তি এবং সত্তা যাহা তাহাই স্থিতিরূপে কল্পিত হয় ; নতুবা অবিরত গতিশীল বা চলায়মান জগৎসংসারে, লৌকিক অর্থে যে স্থিতি তাহা কোথাও কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রে এই উৎপত্তিকে রজোগুণ, নিবৃত্তিকে তমোগুণ এবং স্থিতিকে সত্ত্বগুণের আখ্যা প্রদান করা হয়। সত্তার সদা রূপান্তর হেতু, কি রজঃ কি তমঃ, একতর ইহাদের কখনই সত্ত্ব-গুণের সংস্রবশূন্য হয় না ; এবং সেই জন্যই এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন অপকৃষ্ট বা উত্তম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়ই, শক্তিস্রোতের অস্তিত্ব বোধে একমাত্র পরিচয় ; তদ্ভিন্ন অপর পরিচয় নাই। গুণত্রয় পরিচয়ে মহাশক্তির অবিরতক্রিয়াশীলতাও উপ-লব্ধি হয় এবং মহাশক্তির অবিরতক্রিয়াশীলতা হেতুই, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ কাহার পলক প্রমাণে বসিয়া থাকিবার সাধ্য নাই ; সকলেই অবিশ্রান্ত আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনে ভাসমান হইয়া চলিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে, ব্রহ্মাণ্ড-ক্রিয়ার কর্ত্তা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপতাকে এই গুণত্রয়েরই অভিমানভেদে পৃথক্ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাখ্যাত ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় গূঢ় তত্ত্ব ও গূঢ় ধর্ম্ম আর কি কোথাও সম্ভব হইতে পারে?

অতঃপর বলা বাহুল্য যে, একই নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থকে

পরিচালনা করিয়া, একই উদ্দেশ্যমুখে, যথাগতিতে নিয়ন্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। একই নিয়মে যথায় যতগুলিকে আবদ্ধ করা যায়, তথায় উদ্দেশ্যসিদ্ধিও ততগুলি সম্বন্ধে কখনও এক ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকারের হইতে পারে না। সেই একই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সাধন করিতে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা সুতরাং সকলে এক সম্বন্ধসূত্রে সুগ্রথিত; তবে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে অর্পিতভারের পৃথকত্ব হেতু, তাহাদের মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। একই নিয়মাধীন অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সুতরাং সকলেই অনন্তায়ত এক সম্বন্ধসূত্রে সুগ্রথিত। ঐ যে আকাশস্থিত দূর দৃষ্টমান এবং দৃষ্টাতীত যাবতীয় ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কপিণ্ড এবং তাহাদের অভ্যন্তরে আবার বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে, তৎসমস্ত যে নিয়মবশে এবং বিশ্বনিয়ন্তার যে অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে; আমি যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতলে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত কার্য্যরাশির সমুৎপাদন করিতেছি, বা আমার দ্বারা যাহা কিছু সম্পাদিত হইতেছে, তাহাও সেই একই নিয়মবশে এবং নিয়ন্তার সেই একই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য, ইহা জানিও। পর্ব্বত ভাঙ্গিতেছে, সাগর উথলিতেছে, মেদিনী কাঁপিতেছে, পিপীলিকা হাঁটিতেছে, কীটাণু খেলা করিতেছে, তটিনীর মৃদুল তরঙ্গে তর তরে বালুকাকণাটি কাঁপিতেছে এবং তুমিও যে ঐ মাথামুণ্ডু কি লিখিতে বসিয়াছ (কৃতকার্য্য তাহাতে কতটা হইতেছে বা না হইতেছে, সে পরের কথা), তাহাও সেই একই অভিপ্রায়ের সুসিদ্ধির জন্য। সকলেই আত্ম-উপযোগিতা ও শক্তি অনুসারে, সেই মহান্ উদ্দেশ্যভূত কার্য্যের অংশ কলা প্রভৃতি যাহার পক্ষে যেমন নিয়োজন, সে তাহার অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই সকল এখন পরস্পর সম্বন্ধে কি দূরস্থানে, কি দূর-অন্তবাহী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত ও নির্ব্বাহিত! যেন কেহ কাহার সহিত কোন সংস্রবযুক্ত নহে, সকলেই সম্বন্ধশূন্য পৃথক্ পৃথক্ দূরতম দেশ ও কাল

ব্যাপিয়া অবস্থিত ;—কে বলিবে যে ইহারা এক সংসারের, কে বলিবে যে ইহাদের একতামুখে গতি এবং কখনও ইহারা একতায় আসিয়া সংমিলিত হইবে কি না। ইহা বুদ্ধির অতীত, দর্শনের অতীত, এবং ধারণারও অতীত। কিন্তু ইহারা আসিবে। অদৃষ্টচক্র সকল সময়েতেই এইরূপ দূর-অন্তবাহী হইয়া আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সময় পূর্ণ হইলে, আয়োজন পূর্ণ হইলে, ঘনীভূত হইয়া এবং একতায় আসিয়া, যথাকালে যথাকার্য্যের সমুৎপাদনে দৃষ্টিপথে সমাগত হয়। আয়োজনমাত্রের আদি মূল আদি-নিহিত, তথা হইতে অদৃষ্টভাবে দৃষ্ট মুখে, কার্য্যকারণযোগে, ধীরে ধীরে, তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া, কাল বুঝিয়া রাক্ষস বা দেব মূর্ত্তিতে একতাকেন্দ্রে সংগৃহীত হইয়া যথানিয়তি ফলের সংঘটন করিয়া দেয়। আজিকে যাহা হইতেছে, যুগযুগান্ত হইতে তাহার আয়োজন এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়া আসিয়াছে; এবং যুগযুগান্ত বাদে যাহা হইবে, আজিকে তাহার আয়োজন হইতেছে। এখন যাহার সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ দেখিতেছি না, বা এখন যাহা তোমার আমার অথবা তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধেও একেবারে লক্ষ্যাতীত রহিয়াছে, কালে তাহারাই ক্রমে উভয়ে উভয় মুখে আনত হইয়া একতায় আসিবে, উভয় উভয়ে সংমিলিত হইয়া সংমিলনের পরিণামস্বরূপ লক্ষিতব্য ঘটনাবিশেষে পরিণত হইবে, এবং পরক্ষণে সেই ঘটনাবিশেষ আবার আপন পালার আগতিতে, কর্ম্মপথে নব সংমিলনে নব কার্য্য সম্পাদনার্থে কারণরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিবে। ঐ যে ব্যক্তি বজ্রপতনে হত হইল, মনে করিও না যে হঠাৎ বা দৈবাৎ ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। বহুকাল বা অনাদিকাল হইতে চৈতন্য এবং জড় উভয় জগতে যুগযুগান্ত বাহিয়া উহার জন্য, হন্তা এবং হত উভয় দিকে আয়োজন হইয়া আসিতেছিল; আজিকে সে আয়োজনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়াতে, তাহাদের ঐ সংমিলন এবং সংমিলনের পরিণামস্বরূপ ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। হঠাৎ বা দৈবাতের নামগন্ধও উহাতে নাই।

অতএব বাঞ্ছারাম, ঐ যে আকাশক্ষেত্রের গভীরগর্ভনিহিত গণনাতীত দূর নীহারিকাপুঞ্জ, অথবা সংসারক্ষেত্রে সেই যে অলক্ষিত বা পরিত্যক্ত পদার্থনিকর, যাহা দেখিয়া ভাবিতেছ যে তোমাদের সঙ্গে পরস্পরের কোন সম্বন্ধ নাই; তোমাদের সঙ্গে কোন কালে সংস্রবে আসিবার সম্ভাবনা নাই; অথবা কোন কালে ছিলও না; তাহা তোমার ভ্রম। উহাদের সঙ্গে তোমাদের সকল সম্বন্ধই আছে, এবং এক সময়ে অবশ্যই সকলে একতায় এবং ঘনিষ্ঠতায় আসিবে। সকলেই তোমরা এক ক্রিয়াবাটীর কর্ম্মকারক, প্রত্যেকে এখন বিভিন্ন সহরে বিভিন্ন বাজারে বাজার করিয়া ফিরিতেছ মাত্র। যখন বাজার পূর্ণ হইবে, বহির্ভ্রমণের আবশ্যক শেষ হইবে, তখন ক্রিয়াবাড়ী না যাইয়া, আর কোথায়,—আর কোন বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইবে? এখন তোমার বাজার সে জানিতেছে না, বা তাহার বাজার তুমি জানিতেছ না; কিন্তু সকল বাজার যখন কর্ম্মকর্ত্তার বাড়ী আসিয়া একত্র মিলিবে, তখন যদি দেখিবার উপযুক্ত হও, দেখিতে পাইবে কাহার বাজার কি জন্য, কাহার বাজার কি জিনিস লইয়া, এবং সেই বাজার সমষ্টি কি পূর্ণ, কি অপূর্ব্ব! এই বিশ্বদেশে তোমরা জড় ও অজড় সকলে সেই একই কর্ম্মকর্ত্তার এক শ্রেণিভুক্ত কর্ম্মকারক, এবং একই কর্ম্মের অংশ ও পর্য্যায়াদি সুসম্পাদনের নিমিত্ত এই বৈচিত্রময়ী সৃষ্টিতে তোমাদের উৎপত্তি; তোমরা সকলে একপরিবারস্থ, কার্য্যবশে এখন বিভিন্ন দেশে বাস করিতেছ এই মাত্র বিভিন্নতা।

এখন দেখ, মানবীয় কর্ম্মক্ষেত্র কি অনন্ত-প্রবাহী, কিরূপ দিগন্ত-প্রসারিত, এবং বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও কি সম্বন্ধনৈকট্য। আরও দেখ, আমরা যে বৃহত্তমের নিকট ক্ষুদ্রতমকে বসাইতে বা সংস্রবে আনিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকি, তাহাই বা কি ভ্রমপ্রমাদের কার্য্য। যে আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে সামান্য একটী কীটাণু এই মূহূর্ত্তে এই পৃথিবীতলে শক্তি সঞ্চালন করিয়া গমন করিতেছে, জানিও, বৈজ্ঞানিক বিবিধ প্রকরণেও জানিতে পারিবে, সেই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন-

বেগ কেবল সেই কীটাণুপার্শ্বেই পর্য্যবসিত নহে, তাহা সমস্ত পৃথিবী, সৌরমণ্ডল ও সৌরজগৎ, তদতীতে দূর আকাশস্থ নীহারিকা, এবং তাহার পরেও যাহা কিছু আছে, তাহাকে পর্য্যন্ত যথা পরিমাণে শক্তি-বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে।. তারে তারে আকাশপিণ্ডগণ, পিণ্ডস্থ-গণ, অথবা এক কথায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কি সুদৃঢ় গ্রন্থনেই গ্রথিত। এই অপার অপরিসীম অথচ একসূত্রে গ্রথিত বিরাট বিশ্বক্ষেত্র, যাহা বিরাট পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মক্ষেত্র, ইহা কি আশ্চর্য্য, কি অচিন্ত-নীয়! সমগ্রতঃ মহাশক্তি এবং তদংশাবতার স্বরূপ তাবৎ খণ্ড শক্তি, মহাকর্ম্ম এবং তাহার কর্ম্মাংশ সম্পাদনে নিয়োজিত; যে যেরূপ কালে ও যেরূপ ক্ষেত্রদেশে পতিত, সে সেইরূপে স্বীয় স্বীয় আত্মসার্থকতা সাধন করিতেছে। তুমিও সেই শক্তিখণ্ডসমূহের মধ্যে একটি খণ্ড অবতার স্বরূপ, সুতরাং তোমারও এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মাংশ সম্পাদন হেতু উদ্ভব। অনন্ত কালের এই খণ্ডে তোমার আবশ্যক, এই জন্য তুমি এখন উদিত; এখানে কর্ম্মপ্রবাহ মধ্যে গত আয়োজনবিশেষে আহুতি প্রদান ভিন্ন, তোমার উদয়ের আর কি উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিব? বস্তুতঃ তাহাই। যেমন অনন্ত আয়োজনফলে তোমার উৎপত্তি, তেমনি আবার অনাগত অনন্ত উৎপত্তি তোমার আয়োজনফলের উপর নির্ভর করিতেছে। তুমি তাবৎ বিগত কালের সন্ততি স্বরূপ, এবং তাবৎ অনাগত কালের জনক স্বরূপ; অতীত ও অনাগত এই যুগ-দ্বয়ের সন্ধিস্থলে তোমার অবস্থিতি। সমস্ত বিগতকাল,—তাহার সেই আদি সৃষ্টি, জগৎসৃষ্টি, সমস্ত উদয় বিলয় আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন, সমস্ত লোক ও লোকাচার, সমস্ত আবিষ্কার, শিল্পসাহিত্য কলকৌশল ক্রিয়া কর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি ও কল্পনা, একা তোমাতে মূর্ত্তিমান; সেইরূপ সমস্ত অনাগত কালের তত্তৎ তাবৎ বিষয়ের সূক্ষ্ম বীজ সকল একা তোমাতে বর্ত্তমান। সমস্ত বিগত কালের তুমি অবতার স্বরূপ, সমস্ত অনাগত কালের তুমি অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ সদৃশ;—এবম্ভূত বুদ্ধিতে ক্ষণেক আপনাকে আপনি আত্মপরিজ্ঞাত হও, তখন বুঝিতে পারিবে যে, এই

গুরুভার যাহার উপর ন্যস্ত, তাহার আত্ম-জীবনের উপর কতটা অনুধ্যান করিয়া, কতটা ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া, চলা উচিত। এরূপ অপরিমিত নির্ভর যাহার উপরে, সে যদি এখন মিথ্যাকে অবলম্বন ও কর্ম্মহানি দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহার পুরস্কার বা তিরস্কারের জন্য ঈশ্বর যে কি তুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। মিথ্যার অর্থ, শূন্য—অসৎ বা পাপ। প্রাকৃতিক অসৎ যাহা, তাহা হইতে এ অসৎ স্বতন্ত্র, যেহেতু ইহা স্বেচ্ছাশক্তি-সম্ভূত, সুতরাং স্বেচ্ছাবান্ অবশ্য ইহার নিমিত্ত দায়ী। প্রাকৃতিক অসৎ যাহা তাহা কার্য্য-অগ্রসারক, আর স্বেচ্ছাসম্ভূত অসৎ যাহা তাহা কার্য্যের হানিকারক। এই মিথ্যা, শূন্যতা বা অসৎকে আশ্রয় করিলে, কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পরিমাণে আশ্রয় করা যায়, সেই পরিমাণে কর্ম্ম পণ্ড হয়,—"না বস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ"; এবং সেই পরিমাণে জীবনের উদ্দেশ্য,সুতরাং জীবনও পণ্ড হইয়া থাকে। প্রোক্ত অনন্ত পরিণামিতা হেতু,পাপ ও পুণ্য এবং তাহাদের যে ফলাফল, কেমন করিয়া বলিব যে তাহারাও অনন্ত নহে? কিন্তু মহাপ্রকৃতিকৃত তজ্জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত এবং হরণপূরণ তাহাও ত অনন্তপ্রসারী!—তবে কি এরূপ কৌশলক্রমেই বিশ্ববিধাতার সেই মহান্ আদালতে বিচার এবং দয়া, কাঠিন্য এবং করুণা, শাস্তি এবং শান্তি, উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ সাধন হয়? কে বলিবে? কি বলিব? জানি না,—"যস্যাবেদং তস্য বেদং বেদং যস্য ন বেদ স।"

কিন্তু বাঞ্ছারাম, তাই বলিয়া মনে ভাবিও না এবং কীট, কীটাণু, ঢিল, পাটকেল দর্শাইয়াও বলিও না যে,আমি মিথ্যার আশ্রয় লইলেও, নিঃসন্দেহ তাহাদের অপেক্ষা, আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে; সুতরাং আমার জীবনও যে একেবারে বৃথা তাহা কেমন করিয়া বলিব; অতএব কেন আমাকে স্বচ্ছন্দ আহার বিহার হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ? রাম, রাম, বাঞ্ছারাম! সে চেষ্টা যেন কেহ না পায়।

তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, কিছুমাত্র তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার পরিমাণ করিও; এবং সুভাবে ও স্বচ্ছন্দে আহার বিহার সঞ্চয় ও সম্ভোগ করিতে পারিলে, তাহাও মহাকর্ম্ম মধ্যে গণনীয় বলিয়া জানিবে;, অধিকন্তু, অবসরকাল অপব্যয় করিও না। এ কর্ম্মক্ষেত্রে কে কত কর্ম্মরাশি সমুৎপাদন করিল, তাহা লইয়া কর্ম্মের পরিমাণ নহে; কে কর্ম্মার্থে কতখানি নিজ নিজ প্রাপ্ত শক্তির সদ্ব্যয় করিল, তাহা লইয়াই পরিমাণ। কণ্ট্রাক্টের বন্দো-বস্ত এখানে নাই; মুনিবে যতটা দেয় তাহারই হিসাব লইয়া থাকে, এবং চাকরও সেই হিসাব দিতে বাধ্য, নহিলে শাস্তি আছে।

তোমার আরও এক অতি প্রিয়তম এবং চিরপোষিত কুতর্ক আছে।—তুমি বলিয়া থাক, এরূপ না করিয়া, আমাদিগকে এরূপ ছাঁদেবাঁধে না ফেলিয়া, এরূপ দীর্ঘকাল-সাপেক্ষতার অপেক্ষা না রাখিয়া, এরূপ এরূপ করিলেই, ঈশ্বর ত তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন; এবং তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তাঁহার তাহা করিবারও ত কোন বাধা ছিল না; বাড়ার ভাগ আমা-দিগের, এই ক্লেশময় সংসারে, এতটা উঠা পড়া হইতে অব্যাহতি হইতে পারিত। বাঞ্ছারাম, ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে যে, মন্দ কারিগর যাহারা, তাহারাই আপন আপন অস্ত্রের সঙ্গে কোন্দল করিয়া থাকে। যাহারা আলস্য-পরায়ণ এবং অকর্ম্মা, তাহারা পার্শ্বস্থ সকল পদার্থকেই অসুবিধাপূর্ণ বলিয়া দেখিয়া থাকে, ইহ জন্মে তাহাদের সুবিধা এবং সুখের দিন একদিনও আইসে না। বেকুবের আশ্রয়স্থান অদৃষ্ট; কাপুরুষের আশ্রয়স্থান দৈব; অকর্ম্মার আশ্রয়স্থান আগু পাছু বিবেচনা; আলস্যপরায়ণের আশ্রয়স্থান দিনক্ষণ; এবং এই চতুর্ব্বিধ পুরুষত্বের পুনঃ যেখানে একাধারে সমাবেশ, তথাকার আশ্রয়স্থান অসম্ভবতা এবং অভাব,—সুসাধ্যবোধ ও সাধনের দেখা কখনই ইহারা পায় না। প্রকৃত মনুষ্যনামের উপযুক্ত যে, তাহার স্বভাব ওরূপ নহে। কর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থই অনিয়ম স্থলে নিয়ম

প্রকটন, অসুবিধায় সুবিধাস্থাপন, অপূর্ণতায় পূর্ণতাসাধন। সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মক্ষম যে, সে অনিয়ম, অসুবিধা, অপূর্ণতা দেখিয়া, কন্দোল করিবে কি জন্য? বরং অনিয়ম, অসুবিধা, অপূর্ণতা যে পরিমাণে অধিক হয়, সে সেই পরিমাণে স্রষ্টার নিকট এতদর্থে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে যে, তাহাকেও এতদ্রূপ সুমহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এবং নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহা তাহার দুঃখ ও প্রলাপের স্থল না হইয়া আত্মগরিমার স্থল হয়,—যদি কখন এরূপ লোকের আত্মগরিমায় প্রবৃত্তি জন্মে। সাধারণতঃ প্রকৃতি যেখানে যত উচ্চ, আত্মগরিমার সেখানে তত অভাব। কিন্তু এক কথা, সংসারক্ষেত্রে ধর্ম্মের ষাঁড় স্বরূপ এবং পরভাগ্যোপজীবী ভাক্ত যোগী পুরুষ যেরূপ আত্মগরিমাশূন্য হইতে বলেন, তাহা অতি নৈরাশ্যকর ও আত্মধ্বংসকর পদার্থ। হয়ত সেরূপ আত্মগরিমা ও অহংবুদ্ধি পরিত্যাগে সাধু এবং যোগী হইতে পারা যায়, হয়ত সেরূপ যোগী হইলে মোক্ষও লাভ হয়, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, সেরূপ যোগী পুরুষের দ্বারা পৃথিবী এ পর্য্যন্ত কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও গণনীয়রূপে উপকৃত হয় নাই, হইতেছে না, এবং হইবে যে এমন আশাও দেখা যায় না। গর্ব্বিত আত্মগরিমা অবশ্য নহে,—কিন্তু আত্মসম্মানবোধ ও স্বীয় প্রকৃতির অটুট সংরক্ষণই, এ সংসারে উন্নতিপথের পরম নিদান। তুমি যাইতেছ, অহংত্যাগে নাহং বা সোহহং ধরিয়া যোগী হইতে; আর তোমার স্বজাতি যাইতেছে নানা ব্যতিক্রমে ধ্বংস ও লোপ পাইতে;—এরূপ যোগ যোগী ও তাহার নীতি, এ তিনেরই পোড়া কপাল!

সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সৃষ্টি যদি এরূপ না হইত এবং তোমার সম্পাদ্য কর্ম্ম তাহাতে যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সেটা আয়েসের বিষয় অনেকটা হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে তোমার উৎপত্তিপক্ষে প্রয়োজন রহিত কোথায়, সুতরাং তুমিই বা থাকিতে কোথায়?—অকারণে কিছু তোমার সৃষ্টি প্রত্যাশা করিতে পার না। তাহার পর, কে বলিল যে

এ সংসারে কেবল উঠা পড়া করিতে সৃষ্টি? যদি উঠা পড়া কর,তবে সে আপন দোষে। কোথায় দেখিয়াছ, নিষ্কর্ম্মা আলস্য-পরায়ণের নিমিত্ত সুবিধা এবং সুখরাশি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে? সত্য বটে, ঈশ্বর অনায়াসে সেইরূপ, তোমার মতলব মত, সৃষ্টি করিতে পারিতেন, এবং পারেনও তিনি সকলই;—তথাপি করেন নাই কি জন্য? করিতেছেন না কি জন্য?—এখানে একই উত্তর, তাঁহার ইচ্ছা। ইহাও বোধ করি, স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না যে, তুমি সৃষ্ট, আর ঈশ্বর যিনি তিনি স্রষ্টা; সুতরাং তোমার ইচ্ছা অপেক্ষা, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য অনন্ত পরিমাণে উন্নত এবং পরিণামদর্শী হইবার কথা। ভাল, তাহাও না হউক। এখন এরূপ করিলে ভাল হইত, ইহা তোমার যুক্তি এবং ইচ্ছা; সেরূপ সেরূপ করিলে যাহা হয়, হইতেছে এবং হইবে ইহা তাঁহার ইচ্ছা; অতএব এখন প্রভেদ দেখা যাইতেছে কেবল ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে। ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যত এ সংসারে জনে জনে পৃথক, তবে তাহার জন্য কেন এত গণ্ডগোল? বাঞ্ছারাম, তোমার আরও একটা প্রধান ভুল, সৃষ্টির সময় ঈশ্বরকে পরামর্শ দিবার জন্য তুমি উপস্থিত ছিলে না। যাহা হউক, যখন পরামর্শ অভাবে তিনি একটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আর হাত পথ কি? বিশেষতঃ তুমি যখন সৃষ্ট এবং তিনি যখন স্রষ্টা, তখন তোমাকে কাজেই এখন তাঁহার ইচ্ছামত চলিতে হইবে; ইহা ভিন্ন আর উপায় কি আছে? অথবা বলিতে পার, এমন কোন কালে কখন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার কিছু লেখাপড়া ছিল কি না যে যাহাতে তোমার যুক্তি এবং ইচ্ছা অনুসারে ঐশ্বরিক যুক্তি ও ইচ্ছাকে শাসিত ও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে? মূর্খ! যদি না থাকে, তবে ক্ষান্ত হও, তোমার তর্কদর্শন দূরে ফেলিয়া দেও। লম্ফযোগে উর্দ্ধগমনশক্তি আছে বলিয়াই, চন্দ্র লোকে যাইতে সমর্থ নহি! আত্মকর্ম্ম বুঝিতে যে যুক্তিশক্তি পাইয়াছি, তদ্দ্বারা ঐশ্বরিক কর্ম্মও যে বুঝিতে সমর্থ হইব, তাহা সম্ভব হইতে পারে কিরূপে? অতএব ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডায়

রত হইও না। আত্মশক্তির পরিমাণ কি এবং তাহার সামর্থ্য ও সার্থকতা কতদূরে ও কোথায়, তাহারই অবধারণে রত হও। তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকারক মজুর, মজুরের সঙ্গে কর্ম্ম-উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে কবে? অতএব শেষ কথা এই,—যদি অনাহারে ধ্বংস পাইতে না চাহ, যদি বেতন বা খোরাকীর প্রত্যাশা রাখ, তবে কার্য্যরত হও; তোমারও উদরপূর্ত্তি হইবে, কার্য্যস্বামীরও কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এবং প্রতিবেশিবর্গও তোমার জ্বালাতন হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু খুব ভাল কার্য্য করিতে পার, কার্য্য-স্বামীর প্রিয় হইতে পার, তাহা হইলে একদিন এমনও আশা করিতে পার যে, কার্য্য-স্বামী হয়ত তাঁহার কার্য্যতত্ত্বমধ্যে কিছু কিছু প্রবেশাধিকার তোমাকে প্রদান করিলেও করিতে পারেন।

আর এক কথা। সংস্কৃত কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকারের কর্ম্মভোগ আছে, তাহার মধ্যে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য ক্লেশকর কর্ম্মভোগ আর নাই। অবুঝের জ্ঞান এবং দর্শন সমস্তই বচনগত বা লাক্ষণিক, অন্তর বা মূলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; এবং কুতর্কের অস্ত্রশস্ত্র যাহা কিছু তাহাও হাতের উপর, অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করিতে বড় একটা হয় না। তুমি আজীবন শ্রম এবং জীবনব্যয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া একটা কথা বল; সে মুহূর্ত্তমাত্রের খেয়ালী তর্কে তাহা উড়াইতে অগ্রসর হইবে, মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার ভিতরে অনুধাবন ও অনুধ্যান করিয়া দেখিবে না। চুরি করিও না;—অবুঝ বলিল উহা পাপ নহে, যেহেতু অভাব হইতে চুরি;—সমাজ কেন তাহার সে অভাব দূর করে নাই? উচ্চ নিসর্গতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণতত্ত্বে তুমি উত্তর দেও—"যে লোকধর্ম্ম আপত্তিহীন ভাবে সর্ব্বসাধারণতঃ গৃহীত হইতে না পারে, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপকারক হইলেও সাধারণতঃ অপকারক, তাহা পাপ।" অবুঝ হাঁসিয়া উড়াইল—"উহা কেবল কথার রাশি মাত্র।" যে নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরকে কেবল কালী বা কয়লার আঁচড় বলিয়া দেখিয়া থাকে, তাহাকে বেদ-বচনের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করাইতে যাওয়া

বড় সহজ ব্যাপার নহে। বাপু বুদ্ধিমান্, এ বিশ্বসংসার ক্রীড়ার বস্তু নহে, মূর্ত্তিমান অচিন্তনীয় ঈশ্বরপ্রতিরূপ। তর্ক করিও না; সেই গুহ্য দর্শনীয় বিষয় দেখিতে তাহারই উপযুক্ত মানসিক ভাবে দর্শন ও অনুধ্যান করিতে চেষ্টা কর, তাহাতেই কেবল জ্ঞানপথে সফলতার সম্ভাবনা, নতুবা নহে। আধ্যাত্মিক আদি ত্রিবিধ জগতের কোথাও, কি ধনে কি জ্ঞানে, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনা হইতে স্বয়ম্বরা কাহাকে হয়েন না; তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি? এ সংসারে বিনা মূল্যে বা বিনা প্রায়শ্চিত্তে কোন বস্তুই লাভের সম্ভাবনা নাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, এক্ষণে তোমার সঙ্গে বক্কেশ্বরী ক্ষণেকের জন্য ক্ষান্ত হউক, আমি মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

আমরা ভারতসন্তান, গ্রীকভাগ্য পর্য্যবেক্ষণে আমাদিগের আর তত আবশ্যকতা দেখিতেছি না। ভারতভাগ্য সমালোচন এবং পর্য্যবেক্ষণই আপাততঃ আমাদিগের উদ্দেশ্য, এবং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উহা কর্ত্তব্যও বটে। সুতরাং তাহারই যথাকথঞ্চিৎ অনুসরণ করা যাউক। তাহাতে ফল আছে।

আমরা যথাযথ সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ইহ সংসারে গ্রীক্ এবং হিন্দু, স্ব স্ব সীমান্তমধ্যে, বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কারণমূহের সমবায়ে, কিরূপ বিভিন্ন স্বভাবে গঠিত, বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতি পারলৌকিক-গুণ-প্রধান হইয়া নৈতিক মনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কোমলতাতেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; সেইরূপ গ্রীকেরা ঠিক তাহার বিপরীত দিকে লৌকিক-গুণ-প্রধান হইয়া, বীর-মনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কাঠিন্যেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু স্বভাব পারলৌকিক-গুণ-প্রধান, গ্রীক স্বভাব লৌকিক-গুণ-প্রধান। হিন্দু ব্রাহ্মণ, গ্রীক ক্ষত্রিয়। কালবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, অবস্থাবিপ্লবেও, তাহাদিগের এই স্ব স্ব স্বভাবের অপলোপ হয় নাই; এবং নিস্তেজও একেবারে হইয়া যাইতে পায় নাই। ইহারা তত্তৎ

বিষয়ে এতদূর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল যে, এখনও, পতিত হইয়াও, জগৎকে স্বভাসে প্রতিভাসিত ও জগতের নিকট হইতে গৌরব আকর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। গ্রীক অধঃপাতিত হইয়াও, সমগ্র ইউ-রোপ ও আমেরিক খণ্ডকে জ্ঞানবিজ্ঞানাদির সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে এবং দিতেছে; এবং সাময়িক প্রভুরা গ্রীককে পদদলিত করিলেও, গ্রীকের শিক্ষা-পদার্থকে মস্তকে স্থাপিয়া বেড়াইয়াছে। আর ভারত? ঘৃণিত, নিন্দিত, উৎপীড়িত, দীর্ঘকাল পরপদে দলিত; তথাপি ভারত আজি পর্য্যন্ত জগতের এক তৃতীয়াংশ মানববর্গকে ধর্ম্মশিক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে। ঘরে আজিকালি ভারতেত ছুচোর কীর্ত্তন চলিতেছে বটে, কিন্তু বাহিরে স্বার্থত্যাগী পরহিতকারী ভারতের বহিঃশিষ্যগণ আজি পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মাপেক্ষা, সুখসাধ্য ধর্ম্মালোচনায় জীবনাতি-বাহিত করিতে সক্ষম হইতেছে। সেই গ্রীক এবং হিন্দু, যাহারা এত দিন স্বতন্ত্রভাবে সংস্রবশূন্য হইয়া, পরিবর্দ্ধিত বা পতিত হইয়া আসিতেছিল; বিশ্বনিয়ন্তা এবং স্রষ্টার অপরিজ্ঞেয় অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে আজিকে পাশ্চাত্য দ্বার দিয়া পরস্পর গুণ-বিনিময় ইত্যাদি হেতু, উভয় উভয়তঃ সংমিলিত হইতে আসিয়াছে। গ্রীক একা আইসে নাই, সমগ্র ইউরোপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র আজি দূরত্ববিহীন হইয়াছে; সেখানকার সেখান এবং এখানকার এখান আজি এক হইয়া গিয়াছে। কালে এইরূপই হইয়া থাকে!

কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এই অদ্ভুত, অভূতপূর্ব্ব গুণ-বিনিময়ে, গুণগ্রহণে এবং গুণত্যাগে, তাহাদের মধ্যে স্বভাবেরও কি না পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? অথবা আর সকলের কথায় এখন কাজ কি, ভারতের কথাই হউক।—তবে কি এখন, এই বিনিময় প্রভৃতিতে, ভারতের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইবে? তাহা কিরূপে সম্ভবে? উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভারত পতিত, পদদলিত, বলতাড়িত হইয়াও এ পর্য্যন্ত আত্মস্বভাব পরিত্যাগ করে নাই। যদি এতদিন না করিয়া থাকে,

তবে এখন যে করিবে এটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সংসারে যাহা কিছু লোভনীয় ও প্রার্থনীয়, তাহা যখন সকলেই প্রায় একে একে যাইতেছে, দুর্দ্দশার ঘোর তরঙ্গ যখন চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া ফিরিতেছে; তখনও যে ভারত, সে সকলে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া, মৃত্যুতেও জীবিতবৎ কেবল স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম ও নৈতিক আলোচনা লইয়া ফিরিতে পারে এবং তাহার মধ্য হইতেও জীবনকে পুষ্টিদান করিতে সমর্থ হয়, সে ভারতের যে কখনও আত্মলোপ ও স্বভাবলোপ ঘটিয়া উঠিবে, এমনটা সহজে বিশ্বাস হয় না। নানা বিপ্লবের মধ্যেও যেখানে চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্ম-শিক্ষকের উদ্ভব; যেখানে বর্ত্তমান সময়েতেও সমাজমধ্যে নানাবিধ ধর্ম্ম ও নৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গ তুফান চলিয়াছে; যে জাতির গৃহনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি, ধর্ম্মনীতি এবং আরও যে কিছু নীতি, সমস্তই তামসিক লোকনয়নকে তুচ্ছ করিয়া, যথাস্বভাব দেশকালপাত্রানুরূপ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে; তুমি কি মনে কর, আজিকে এই পাশ্চাত্যসংস্রব হেতু তাহাদের সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটনা হইবে, না কখনও হইতে পারে! রক্ত পরিবর্ত্তন করিতে পার যদি, তবে পরিবর্ত্তন কথঞ্চিৎ সম্ভবিতে পারে, নতুবা নহে।

স্বভাব অপারবর্ত্তনীয়, অথচ এই মিশামিশি হইতে চলিয়াছে। এমন স্থলে এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি,—আমরা কি ইংলণ্ডগামী নবীন যুবকদিগের ন্যায় এখন হিন্দু ঘুচিয়া রংদার মেটে ফিরিঙ্গী হইব এবং গৃহলক্ষ্মীদিগকে রংদারিণী ও ফিরিঙ্গিয়াণী সাজাইব; অথবা আমরা যেমন নবীন সভ্যতা বা কুকুরবৃত্তির খাতিরে খানসামার সাজে ভূষিত হই, তেমনি গৃহলক্ষ্মীদিগকেও আয়া করিয়া তুলিব; অথবা গতিশীল কালের বিরুদ্ধে যথাস্থিত তথাভাবে অবস্থান জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, অব্যবহিত পূর্ব্বগত হিন্দুভাবে হিন্দু থাকিতে চেষ্টা করিব? কিন্তু এ কয়েকটীর একটীও যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, হিন্দুসন্তান ফিরিঙ্গী এবং গৃহলক্ষ্মী ফিরিঙ্গিয়াণী উভয়ই

প্রকৃতির গর্ভস্রাব; ভবরঙ্গভূমে অন্তঃসারশূন্য সং-বিশেষ, সংসারকর্ম্ম-ক্ষেত্রে অকার্য্যকর ও রং-মাখান মাখাল ফল। দ্বিতীয়তঃ, অব্যবহিত পূর্ব্বগত হিন্দুভাবে থাকিতে যাওয়া, সেও কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মাত্র; এবং এরূপ অসম সংগ্রামে কেহ কখনও জয়লাভ করিতে পারে নাই, বরং তদ্বিপরীতে ধ্বংস হইতেই দেখা যায়। বিশেষতঃ এই প্রাকৃতিক কর্ম্মকটাহে, নিত্য এবং অভাবনীয় পাচনক্রিয়ার বিষয়ীভূত যে, তাহার পূর্ব্বভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। যে নিয়মে, যে প্রণালীতে, প্রাচীন ভারতে জীবনযাত্রা ও সামাজিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইত; যাহা কিছু সাবেক ধরণের; তাহারা সকলেই একে একে বিগত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; সকলেই একে একে পক্ষীর জীর্ণ পালকবৎ অঙ্গচ্যুত হইয়া আপনাপনি খসিয়া পড়িতেছে; সকলেই ধ্বংসোন্মুখ। যে দিকে তাকাইবে, সে দিকেই প্রাচীন রীতি নীতি প্রভৃতি তাবৎ, কালপ্রবাহে বিলীনোন্মুখ ভাসমান হইয়া চলিয়াছে; আরও দৃষ্টি প্রসারিত করিলে আরও দেখিতে পাইবে, ঠিক সে বিলয়ের কোলে কোলে আর এক সমজাতীয় কিন্তু অভূতপূর্ব্ব ও নূতন পদার্থরূপের নব উৎপত্তির সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাই স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে যে, ভারতের প্রাচীন জীর্ণ বেশের ধ্বংস ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন বেশের আবির্ভাব অনিবার্য্য এবং তাহা আগতপ্রায়। সর্ব্বত্রই, প্রাচীন বেশের ধ্বংস এবং নূতন বেশের আবির্ভাব-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। এ সময়ে যে প্রাচীন রীত্যাদি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিবে এবং অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে চাহিবে না, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এবং পূর্ণমাত্রায় বাতুল! আমাদের এ বর্ত্তমান অসার হিন্দুয়ানী ভাব নিপাত হইবে; তাহাতে আটক করিতে যাওয়া বৃথা উদ্যম ও বৃথা চেষ্টা, ফলে তাহা সময়ের অসদ্ব্যবহার মাত্র!

বাঞ্ছারাম, তোমার চিরশ্রুত নৈয়ায়িকের উপন্যাস স্মরণ আছে কি? নৈয়ায়িকের প্রত্যহ লেবু চুরি যাইত, নৈয়ায়িক আজি চোর ধরিবেন। অতএব ন্যায়যুক্তিতে সিদ্ধান্ত হইল যে, চোর পালাইবার

পথ মাত্র তিন দিকে, তাহার এক দিকে তিনি দাঁড়াইবেন, সুতরাং সে দিক্ বন্ধ; অপর দিকে ভ্রাতৃবধূ—একে পরদার তায় ভ্রাতৃবধূ, সুতরাং অস্পর্শনীয়া, কাজেই সে দিকও বন্ধ; তৃতীয় দিকে আঁস্তাকুড়, অশুচির আকর, সুতরাং সে দিকের ত কথাই নাই; এইরূপে তিন দিকই আবদ্ধ; এখন চোর যাইবে কোথায়!—চোর এমন সময় আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। চোর পলাইয়া যাউক, কিন্তু নৈয়া-য়িকের ন্যায়ের দোষ কি? তাহার জ্ঞানদর্শনে ন্যায় ঠিকই হইয়াছিল, এবং চোরও অনুরূপ নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলে ধরা পড়িলেও পড়িতে পারিত। কিন্তু চোর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল না; এ সংসারে কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করে না। এখানে দোষ ন্যায়ের নহে, দোষ নৈয়ায়িকের বহুদর্শিতায় যে ত্রুটি, তাহার। নৈয়ায়িকের জানা উচিত ছিল যে,চোর অধ্যাপক ব্রা হ্মণপণ্ডিত নহে, এবং পরস্ত্রী ভ্রাতৃবধূ অথবা আঁস্তাকুড়ও মানে না; ইহা জানিয়া তাহার উপরে যদি ন্যায় খাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। আর এক উপায়ে চোরধৃতির সম্ভাবনা ছিল,—আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া চোরের সঙ্গে দৌড়, কিন্তু তাহাতে ফল যত হউক না হউক, চোরের সঙ্গে সম অপবিত্রতা এবং অনভ্যস্ত দৌড়ে শারীরিক ক্লেশাদির প্রাপ্তি, অপরিমিত ঘটিত সন্দেহ নাই। ভারতসন্তান, তুমিও তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় আপনাকে এই নৈয়ায়িকের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া জানিও। তোমাকে বলি, অপবিত্রতা এবং অনভ্যস্ত দৌড় জন্য ক্লেশাদি প্রাপ্তি, তুমিও পারতপক্ষে পরিহার করিবে; তুমি যে পবিত্র আর্য্য হিন্দু সেই হিন্দুই থাকিবে, অথচ করিবে কি?—তোমার হিন্দুয়ানীকে সঙ্কীর্ণ দর্শন এবং সঙ্কীর্ণ কর্ম্মভূমি হইতে উঠাইয়া বহুদর্শনভিত্তির উপরে এবং বিশ্বকর্ম্মভূমিতে স্থাপন করিবে। আপন রন্ধনগৃহের চৌকায় আবদ্ধ না হইয়া, বিশ্বগৃহচৌকায় বিচরণ করিতে শিখিবে। তাহা হইলে লেবু চুরীর চোরও পলাইতে পারিবে না, ফিরিঙ্গীও সাজিতে হইবে না, অথচ তোমার হিন্দুজাতিত্ব রক্ষা এবং কার্য্যসিদ্ধি উভয়ই হইবে।

এই বিজাতীয় মিশামিশি হইতে তদুদ্দেশে উপরকণ সংগ্রহ এবং তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাই, এই জাতীয় কার্য্যে আপাততঃ তোমার কর্ত্তব্য ; এবং তদর্থেই বিশ্বনিয়ন্তার নির্দেশ অনুসারে সেই বিজাতীয় সংমিলন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

এ কর্ম্ম অতি দুরূহ, অথচ এ কর্ম্ম অতি সহজ। বাপু, এ কর্ম্ম তোমার মিল বেন্থাম আদি ন্যায়দর্শনের কথা কাটাকাটি করিলে, স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহা সম্পন্ন হইবে। ন্যায়দর্শন ইহার সংস্রবেও আসিতে পারে না। ইহার নিমিত্ত, পূর্ব্বনির্ম্মিত তোমার আপন জাতীয় ভিত্তির উপর, ভক্তিনিবিষ্টচিত্তপ্রসূত চিন্তার সহিত জ্ঞান ও দর্শনের সংস্থাপন একমাত্র আবশ্যক। ইহাতে সমগ্র আত্মস্বভাবের পরি-স্ফূর্ত্তি ও সঞ্চালনের প্রয়োজন। যাহার আত্মস্বভাব প্রকৃতিস্থ, তাহার পক্ষে, চেষ্টা-সম্ভব তাবৎ কার্য্যের ন্যায়, এ কার্য্যও নিতান্ত সহজ। কিন্তু যাহার আত্মস্বভাব বিকৃত, তাহার পক্ষে আবার এ কার্য্য তেমনই দুরূহ। এ কার্য্য, বা যে কোন যথার্থ কার্য্য, সভা করিয়া, সমাজ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, কেহ কখনও সাধন করিতে পারে না। জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্র ও জাতীয় স্বভাব ও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ না হইলে, কেবল প্রতিজ্ঞায় কখনও কোন যথার্থ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। স্বধর্ম্মচ্যুতি এবং অনুকরণে কেবল অধঃপাতের পথ প্রশস্ত হয়। কোন যথার্থ কর্ম্মই এ পর্য্যন্ত রাজসিক বা তামসিক চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। তজ্জন্য সাত্ত্বিক চেষ্টার আবশ্যক। সাত্ত্বিক চেষ্টা বাচাল নহে, সাত্ত্বিক চেষ্টা নির্ব্বাক্। রাজসিক এবং তামসিক চেষ্টার ইচ্ছা রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া ; সাত্ত্বিক চেষ্টার ইচ্ছা, ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যথাবুদ্ধি এবং যথাশক্তি প্রকৃতিকে অনুসরণ করা। দুরাকাঙ্ক্ষার ফল দূরে গত, তন্নিপাতে তাহা সত্বর এবং স্বতঃই হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাত্ত্বিক চেষ্টার নিমিত্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির আবশ্যক।

২। বিকার।

এক্ষণে উপযুক্ত কার্য্যোপযোগী আমাদিগের সামাজিক জীবনী কতদূর; কি পরিমাণে আমরা কার্য্যনিরত হইতেছি; এবং তদর্থে আমাদিগের আত্মপ্রকৃতি কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারিয়াছি; তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেরূপ আলোচনা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব বাঞ্ছারাম, ইহাতে দিক্‌দারি বিবেচনা করিও না।

অযথা আত্মঘোষণা করিতে এবং শুনিতে যে নিতান্ত চিত্ত এবং শ্রুতি-সুখকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সেইরূপ আবার অন্য দিকে ইহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সেই আত্মঘোষণা সর্ব্বদাই পরিণামে নিপাতনের কারণ হইয়া থাকে। যে দেখিবে আত্মকৃত কার্য্যের প্রতি সাহঙ্কার-দৃষ্টিপ্রক্ষেপে গরিমায় স্ফীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই নিশ্চয় জানিবে, তাহার অধঃপাতে যাইবার দশা, অন্ততঃ সেই সেই কার্য্য সম্বন্ধে অধঃপাতে যাইবার দশা অদূরে এবং দিনও তাহার সন্নিকট। সপদার্থের আত্মগরিমা যখন এরূপ দূষণীয়, তখন অপদার্থের আত্মগরিমা ও তাহার পরিণামের ত কথাই নাই,— তাহার পরিণাম যে কি দারুণ ও কত ভয়ঙ্কর তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। তাই বলিয়া রাখি,বাঞ্ছারাম,যদি এই প্রস্তাবমধ্যে আত্মগরিমার পরিবর্ত্তে, আত্মধিক্কারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাও, তাহাতে তোমার রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ এবং প্রকৃত যে আত্মধিক্কার, তাহা শুভ লক্ষণ। যেখানেই তাহার উৎপত্তি, সেইখান হইতেই সুপথ-গমনের সূচনা। যে মুহূর্ত্তে 'কু'কে 'কু' বলিয়া পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, নিশ্চয় জানিবে, মানবের সে বিষয়ে চিত্তপরিবর্ত্তনের কাল সে মুহূর্ত্ত হইতে অতি নিকট। ভারতসন্তান, এ পর্য্যন্ত তুমি অযথা আত্মগরিমায় অনেক দূর আত্মধ্বংস করিয়া আসিয়াছ, আর কেন? যদি তোমার গুণভাগ প্রকৃতই কিঞ্চিৎ উপার্জ্জিত হইয়া থাকে,

তাহা হইলেও শূন্য হাঁড়িতে কেবল দুইটি ঘুঁটী ফেলিয়া কড় কড় শব্দে কাণ ঝালা-পালা ও লোক হাসাইবার আবশ্যক কি? প্রকৃত গুণ যাহা, তাহা নির্ব্বাক্; প্রকৃত পূর্ণতা যাহা, তাহা নিস্তব্ধ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাত্বিক প্রকৃতি সাত্বিক চেষ্টার পূর্ব্বগত। উৎসস্থল যেরূপ, প্রসূত ফলও সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে, বহু চেষ্টাতেও সে প্রকৃতি হইতে চ্যুত করিবার সম্ভাবনা নাই। যদি তাহা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সুতরাং শ্রমবিধ্বস্ত ও বহু বিভীষিকাবিঘূর্ণিত হওয়া, ইহাই লাভ হইয়া থাকে; কার্য্যফলে সুফল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণের শান্তি ভিন্ন, লক্ষণের শান্তিতে রোগ নিরসন হয় না। অতএব যে কোন সমল পদার্থের মলসংস্কার, বা যে কোন নির্ম্মল পদার্থের উৎপাদন, সাধন করিতে হইলে; সর্ব্বাগ্রে উৎসস্থানের নির্ম্মলতা সাধন অপরিহার্য্য ও তাহাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। উৎসস্থানকে একবার নির্ম্মল করিতে পারিলে, তাহার পরবর্ত্তী আর যে কিছু উত্তর কার্য্য তাহা নিতান্ত সহজ হইয়া আইসে; এবং লক্ষণ চিকিৎসার শতাংশের একাংশ শ্রমেই সমস্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া যায়।

সাত্বিক চেষ্টায় সাত্বিক প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে না; সাত্বিক প্রকৃতিই সাত্বিক চেষ্টাকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রকৃতি সাত্বিক হইতে আরম্ভ করিলে, সাত্বিক চেষ্টাও অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাহাতে আসিয়া সংমিলিত হয়; এবং সেই স্থান হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মানুকূলে কার্য্য ও কার্য্যফলের আশা করিতে পারা যায়। যথায় প্রকৃতি এখনও অসাত্বিক সেখানে যে কোন সাত্বিকরূপধারিণী চেষ্টা, জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, পরসমক্ষে হউক বা আত্মসমক্ষে হউক, ফলতঃ উহা কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুনশ্চ "আমি যাহা বলি তাহা করিও" আমি যাহা করি তাহা করিও না"—ইহা ধূর্ত্তের কথা; এবং যে যাহা করে না, সে যদি তাহা করিবার উপদেশ দেয়, তবে তাহাকে তস্কর

বলিয়া জানিবে; এরূপ প্রকৃতিমাত্রেরই পরিণাম বিশ্বাসবিপর্য্যয়-সাধক। এরূপ প্রকৃতির এবং এরূপ প্রকৃতিশিষ্যের যে চেষ্টা, তাহা সর্ব্বদাই অন্ধ এবং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্বার্থপূর্ণ, সুতরাং তাহার কার্য্য-ফলও বিকৃত হইয়া থাকে; চেষ্টাকারকও আত্মকর্ম্মবিপাকজালে জড়িত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হয়, এবং আত্মজীবনকে পরিণামে কর্ম্মহীন ও আত্ম-দাহক অশান্তির আধারস্থল করিয়া তুলে। অতএব আবার বলিতেছি, এমন স্থলে একমাত্র সদুপদেশ এই যে, যে কোন বিষয়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্ব্বে, হস্তকে তদুপযোগী সফল-সাধকতায় অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা কি আমাদের হইয়াছে, না সঞ্চিতই আছে? দেখা যাউক।

যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, বাহ্য দৃশ্য ধরিয়া তাহার কারণের অনুভবকরণ অতি প্রশস্ত এবং হৃদ্বোধক, সুতরাং আকাঙ্ক্ষাপূরক। এখানে বাহ্য দৃশ্য ধরিয়াই কারণের অনুভব করিতে হইবে,—সামাজিকতা দেখিয়া সমাজের অন্তর্নিহিত পরিচালক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে। এখন দেখ, তোমার সামাজিকবর্গের প্রতি-বারেক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ। কি অদ্ভুত দৃশ্য! দ্বারদেশেই সর্ব্ব-গুণবিধ্বংসী বিকটদৃশ্য কপটাচার উন্মাদবৎ কি অঘোর নৃত্য করিতেছে! বলিতে কি?—তোমার ভারতভরসাগণ একমুখে দংশন করেন, আর মুখে ঝাড়াইয়া থাকেন; এক মুখে তোষামোদ, আর মুখে তেজ; এক মুখে ভীরুতা, আর মুখে বীরত্ব; এক গালে চড়, আর গালে কথা; কাপট্য ও দ্বৈমুখ ভাবের আধারস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাপট্যে ইহার অস্তিত্ব, কাপট্যে ইহার বসত-বাস, কাপট্যে ইহার ভক্তি, কাপট্যে ইহার প্রণয়, এবং কাপট্যেই ইহার সর্ব্ব কর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং লোকাচারে ইনি ঘরে হিন্দু, বাহিরে ব্রাহ্ম, হোটেলে ফিরিঙ্গী এবং আবশ্যকের অনুরোধে কখন কখন মুসলমানও হইয়া থাকেন। ইহাদের জীবনের ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের সার সংগ্রহ করিলে, মোটের উপর এই কয়টি বিষয়মাত্র পরিলক্ষিত হয়;—ইহাদের দেবতা, উদর; বেদ,

পেনালকোড; নীতি, সম্মুখে 'ভাই ভাই' ও পশ্চাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন; কর্ম্ম, উদরপূর্ত্তিতে। অভ্যন্তরে অকথ্য অশ্রাব্য যাহা কিছু থাকুক এবং শয়তান যতই পূর্ণভাবে বিরাজ করুক, বাহির সাফ ও বাহির চটক যদি থাকে, তাহা হইলেই গণ্য মান্য মনুষ্য—সভ্য মনুষ্যমধ্যে গণনিত হইতে পারা যায়। সভ্যতার বলিহারি মহিমায় চরিত্রও এখন দ্বিবিধ, বাহির চরিত্র ও ভিতর চরিত্র; তাহার পর সকল ক্লেদে বার্ণিস্ দিতে আছেন আদালত, সে বার্ণিসে সকলই ঝক্‌ঝকে হইয়া যায়। হায় হায়, বাঞ্ছারাম! নিজেও ঠকিলে, লোককেও যেন মুখ চাপিয়া ঠকাইলে; বলি, ঈশ্বরকেও কি সেইরূপ ড্যামেজের ডর দেখাইয়া ঠকাইবার আশা রাখিয়া থাক?—জানি না তোমাদের সভ্যতার অনন্ত মহিমায় তাহাও সম্ভবপর কি না। তোমরাই আবার মানুষ! কেবল মানুষ নহ, দেশের আলোক—জোনাকী জ্যোতিতে ফটিকচাঁদ! আর সমস্ত?—আর সমস্ত অন্ধকারের গুব্‌রেপোকা! অন্ধে তাবৎ অন্ধকার দেখে বলিয়া, সত্যই কি সমস্ত জগৎ অন্ধকারবিশিষ্ট হয়?

যে কেহ এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী ও সভ্য ভব্য হইবে, তাহারই সহিত কেবল ইহাদের সুসংমিলনের সম্ভাবনা, নতুবা অন্য কোন রূপে সে সম্ভাবনা নাই। সময় দুরন্ত! স্বভাব এমনই দুরন্ত হইয়া আসিয়াছে যে, যে কোন ব্যক্তি সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে প্রকৃতিবান্, তাহার পক্ষে অধুনাতন ভব্য সমাজ হইতে দূরে অবস্থান ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। তাহাদের মধ্যে সেরূপ ব্যক্তি পড়িলে, হাস্যাস্পদ, পশুবৎ ব্যবহৃত এবং ঘোর বাতুলের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে; সর্ব্ব প্রকারেই সে দারুণ ঘৃণার পাত্র! তাহাদের কি আত্মিক জীবনের উন্নতি, কি সামাজিক জীবনের উন্নতি, যাবতীয় উন্নতি কেবল বচনচাতুরী ও পোষাকাদি বাহ্য দৃশ্যে পরিসমাপ্ত। সভ্যতা বিকাশে বাবু চীনাকোট ব্যবহার করিতেছেন; দেখা দেখি ফরাসডাঙ্গার সুতারেরাও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। মহা বিপদ! মান যায়, সম্ভ্রম যায়, ভদ্রতা

পর্য্যন্ত লোপ পায় ; ছোট লোক সমকক্ষ হইতে চলিল, উপায় ?—কোটের আকার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন! দেশের ছোট লোকেরাই বা কি দুষ্ট! আবার সে পরিবর্ত্তনেরও অনুকরণ করিল। এইরূপে পরিবর্ত্তন অনুকরণ, অনুকরণ পরিবর্ত্তন, হইতে হইতে তাহাদের জ্বালায় একটু একটু করিয়া চীনা কোট শেষে বিলাতি কোটের কাছাকাছি আসিয়া লাগিয়াছে! কোথাও বা বেশভূষা স্পষ্টতঃ ফিরিঙ্গিয়ানায় পরিণত হইয়াছে ; সুতরাং প্রাচীন ও পবিত্র আর্য্যবংশজ-খ্যাতির পরিবর্ত্তে চুনোগলীর কৃষ্ণবর্ণ ফিরিঙ্গীবংশজ-খ্যাতি এখন আদৃত হইতে চলিয়াছে! ফলতঃ তাবৎ ভদ্র এবং ভদ্রসন্তানগিরি আজি কালি যতদূর দেখিতে পাই, দাড়ি চসমা এবং কোট-পোষাকে আসিয়া সমাহিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ সুবেশকর পদার্থ, বেশকারকের ত্রিবিধ গুণের পরিচায়ক যথা—কোট পোষাকে, উন্নত ভদ্র বা মিষ্টরখ্যাতি ও সৌখিনভাব; দাড়িতে,তথা বীরপুরুষত্ব; চসমায়, তথা জ্ঞানিপ্রবরত্ব। এই ত্রিবিধ গুণের গুণবিস্তার ক্ষেত্রও ত্রিবিধ—কোট-ভদ্রতা, গুণ-জ্ঞানশূন্য মূর্খতা আবরিতে ; দাড়ি-বীরত্ব, ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিতে ; চসমা-জ্ঞানিত্ব, মকারাদির গুণ বিচারিতে!

ভাল, কোট প্রভৃতির ব্যাপার যে সে একরূপে নির্ব্বাহ হইল যেন, হউক ; কিন্তু ঐ যে সুতার, অথবা আরও নিম্নতম ঐ যে চর্ম্মকারপুত্র, তোমার সঙ্গে সমকক্ষভাবে যে বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে, চাকুরীক্ষেত্রেও যে দুদিন পরে হয় ত কেরাণীগিরিতে তোমার শীর্ষদেশে বসিবে,—তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার কি কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছ? বাঞ্চারাম, আমি অনেক দিন হইতেই জানি, তুমি সাধারণ শিক্ষার উপর দারুণ চটা ; লেখা পড়া শিখিয়া ধোপায় কাপড় কাচিবে না, ক্ষৌরকার ক্ষৌর করিবে না, তাহারা সমকক্ষ হইবে, এই তোমার প্রধান আশঙ্কা এবং আপত্তিরও ইহা প্রধান কারণ। নির্ব্বোধ, মানবজীবনপ্রবাহ অনন্ত, সুতরাং তাহার গতি অনন্ত এবং জ্ঞান ও উন্নতিও অনন্তপ্রসারিণী। পথ ত কাহার

কোন দিকে বন্ধ নাই; বন্ধ করিবার সাধ্যও কাহার নাই। অতএব, তাহারা যখন আত্মিক উন্নতিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তখন তুমি কেন নিস্পন্দভাবে বসিয়া তাহাদের অগ্রসারিত্ব অবলোকন-পূর্ব্বক, এরূপ বালকের ন্যায় বিলাপরত ও মুহ্যমান হইতেছ? প্রথমতঃ, ছোট লোক সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে সে ত ভাল কথা,—যথায় একঘর মানুষের মত ছিল তথায় দশঘর মানুষের মত হইয়া উঠিতেছে,ইহাপেক্ষা আহ্লাদের কথা আর কি আছে? দ্বিতীয়তঃ, সত্য সত্যই তাহাদের উত্থানে তোমার যদি এত ভয়, তবে ক্রন্দনপর নিস্পন্দভাবে বসিয়া কেন? বেগ যাহা তাহা গমনপর, চালনা করিয়া লইয়া যাইতে পারিলে সুখদ পথে গমন করে; নতুবা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইলে, ভগ্নবাঁধ স্রোতকল্লোলস্বরূপ উৎ-পতিতমুখে চালককে অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। ছোট লোক এবং তোমার মধ্যে, চিরন্তন পরিচালিত ও পরিচালক ভাব বজায় রাখিয়া; এবং আপনার পূর্ব্বতন ব্যবধানে সমান থাকিয়া; তুমিও কেন না অগ্রসর হইতে থাক? তাহা হইলে ছোট লোক লেখা পড়া শিখিয়াও, যদি সে গুণে বা পৌরুষে তোমার সমতায় আসিতে না পারে; তবে কাজেই সে ধোপা সেই কাপড় আবার যদি না কাচে, সে ক্ষৌরকার যদি সেই ক্ষৌর না করে, তবে খাইবে কি? অবশ্য কাপড় কাচিবে, অবশ্য ক্ষৌর করিবে,—বরং লেখা পড়া শিখার ফলে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর ভাবে এবং তুমি যে উন্নত হইতেছ, তোমার উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও উন্নত অভাবের পরিপোষক ও পূরকরূপে। কিন্তু কই, সেরূপ অগ্রসর হওয়ার কি কোন চেষ্টা হইতেছে? কিছু-মাত্র নহে; সে চেষ্টা কেবল নিস্পন্দ, পুরুষার্থশূন্য বিলাপে পরিণত! যে সমাজে ইতর লোক অন্ধ এবং অনুন্নত, সে সমাজের ভবিষ্যৎ পক্ষে আশা করিবার বিষয় অতি অল্পই; এবং যথায় ইতর লোক সচল, আর ভদ্রলোক নিশ্চল কাপুরুষ, তথায় ভদ্রগণ শিক্ষিতা রমণীর মূর্খ-স্বামীবৎ লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা গ্রস্ত হইয়া থাকে।

কেবল এ দেশে নহে, সকল দেশে ও সকল কালেই, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি—সকল বিষয়েতেই, ইতরগণ ভদ্রগণের অনুকরণ করিয়া থাকে; এবং ভদ্রগণও, এই ইতরগণকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া, যে কোন জাতীয় কার্য্য ও জাতীয় মহত্ত্বে পারক হয়। কিন্তু এ দেশের দগ্ধ অদৃষ্টে, এখানেও তাহার বিপরীত;—ইতরগণের অনুকরণীয় মাত্র দাড়ি-কোট এবং ইতর ও ভদ্রের পরস্পর ব্যবহার যাহা, তাহাতে দা-কুমড়া সম্বন্ধ! যাহা হউক, তথাপি একটা সুখের বিষয় এই দেখিতে পাই যে, ভারতীয় ইতরগণ এখনও ততটা অধঃপাতগত হয় নাই, যতটা ভদ্রশ্রেণীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে। নিম্নশ্রেণী এখনও বল বীর্য্য সাহস সরলতা ধর্ম্ম-ভীরুতা উদ্যোগিতা ও কর্ম্মচেষ্টা হইতে সম্যক্ বঞ্চিত হয় নাই। এখনও ব্যবহারগুণে, তাহাদিগকে আপন করিয়া এবং নিয়মে আনিয়া ও সমষ্টি বাঁধিয়া, পৃষ্ঠবলে পরিণত করিতে পারিলে, এমন জাতীয় কার্য্য কমই আছে যাহা সংসাধন করিতে না পারা যায়। কিন্তু দেখে কে, করে কে?—করিবে যাহারা, তাহারা ত আশাবিলুপ্ত অধঃপাতগত!—করিবার ক্ষমতা হইতে দিন দিন দূরে পতিত হইতেছে: তাহারা ব্যবহারে অন-ভিজ্ঞ, নীতি ধর্ম্ম ও কর্ম্মবুদ্ধিতে চণ্ড পাষণ্ড, আত্মগরিমায় স্ফীত, আত্মস্বার্থে পরিপূরিত এবং আত্মম্ভরিতার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ; ব্যবহারগুণে তাহাদের নিকট হইতে ইতরশ্রেণী ক্রমেই অন্তর হইতে অন্তরতর হইয়া যাইতেছে। এমন কি, ইতরগণ অনেক সময়ে, স্বজাতীয় ভদ্রের ক্ষমতা ও হস্তের অপেক্ষা, বিজাতীয়গণের ক্ষমতা ও হস্তের প্রতি অনুকূলতা ও অনুরাগিতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয় না। কি শোচনীয় দৃশ্য! কি শোচনীয় অবস্থা! ভদ্রগণের সভা হয়, সমিতি হয়, কংগ্রেস হয়, আরও বা কত কি হয়, অথচ কিন্তু সাধারণলোক দূর হইতে দূরতরে স্থিত; সভা প্রভৃতিতে আলোচ্য বিষয় যাহা, সাধারনের সঙ্গে তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই; অথচ এই মহাপুরুষগণ স্বীয়ঘোষণায় সেই সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি! ভদ্রগণ এখন কর্ম্মদোষে নিজে ধ্বংসতরঙ্গে ভাসমান, কিন্তু হায়! সংস্রবদোষে নিম্নশ্রেণীও তাহাতে না

ডুবিয়া বাঁচে কই! ভদ্রগণ নিজে মজিতেছে, দেশকেও সেই সঙ্গে মজাইতেছে। এখনও বাঁচিতে আশা থাকিলে, তাহাদিগের পক্ষে অতি সুমহৎ প্রথম প্রয়োজন,—নিজেতে নিজে প্রকৃতিস্থ হওয়া এবং ইতরগণের প্রতি ব্যবহার শিক্ষা করা, যদ্দ্বারা ইতরগণকে স্বপ্রয়োজনানুরূপ সমষ্টি বাঁধিতে পারা যায়। যতদিন ইতরগণকে পৃষ্ঠবল করিতে না পারিবে, ততদিন উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম সমস্ত ভারতীয় ভদ্র একত্র হইলেও, কিছুমাত্র ফলের সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ বাঙ্গারাম, নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন ও পৃষ্ঠবলে পরিণতি ভিন্ন, কোন কালে কোন দেশেই কখনও কেহ গণনীয় কিছু সাধন করিতে পারে নাই ও পারে না।

অপরাপর দেশে সৌভাগ্য ও সজীবতা অর্থে, সাধারণতঃ অত্যধিক কর্ম্মক্ষমতা এবং চিত্তের নিশ্চিত উৎসাহ। আমাদের দেশে তদ্বিপরীতে, সৌভাগ্য অর্থে ধারণার অতীত কর্ম্মপণ্ডতা এবং সজীবতা অর্থে চিত্তের নিশ্চল ভোগবিলাসী অলসতা। অপরাপর দেশে সুখ, অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া; কিন্তু এখানকার সুখ, অর্থের অসদ্ব্যবহারে। প্রতি ব্যক্তিই নিশ্চেষ্ট বা আড়ম্বরচেষ্ট, আত্মঘাতি জীবন অতিবাহিত করিতেছে; আড়ম্বরমুগ্ধ অজ্ঞ তাহাতে করতালিঘোষে বাহবা দিতেছে। ধনী হুঁকা ছাড়িয়া সভা, সভা ছাড়িয়া হুঁকা—সভায় বসিয়া, হাই তুলিয়া, ইংরাজতোষস্থলে চাঁদা দিয়া, রাজদ্বারে ও মূর্খমণ্ডলে বাহবা লইতেছে; হইল বা রায়বাহাদুরী বা রাজাগিরীটা কিনিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে; নির্ধন নির্ব্বাক, ধনীর তদর্থে ধন যোগাইতে হস্তপদবদ্ধভাবে তাহাতে রক্তারক্তি হইতেছে; আবার সাম্যসাধক মধ্যবিত্ত, আপন কার্য্য ভুলিয়া গিয়া, তাহাতে হাততালি দিয়া ছন্ন ও বিকট নৃত্য করিতেছে। বৃদ্ধ বায়াত্তুরে প্রাপ্ত, প্রাচীন বিদায়গ্রহণের পন্থা দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতেও মুরুব্বিবৎ তাঁহার শেষ উত্তম শিক্ষা, "ইহ সংসারে স্বচ্ছন্দতালাভের বাঞ্ছা থাকিলে, যে কোন উপায়ে হউক, সাহেব সুবোকে বা ক্ষমতা যথায় তথায় সন্তুষ্ট বিধান করিও। ক্ষতি কি? যথায় জল তথায় ছাতি ধরিয়া নিজের কার্য্য

যদি হাসিল হয়, তবে এ সংসারে বাকী রহিল কি? সমাজ এবং দেশ?--উহাত বাতুলের স্বপ্ন! পেটে খাওয়ার আশা থাকিলে পিঠে খাইতে কিছুমাত্র দোষ নাই।" অর্দ্ধবয়স্ক নিস্পন্দ, উদরপূর্ত্তি এবং বিহারাদিকেই জীবনের মোক্ষধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহার আয়োজন-শ্রমে জীবন উৎসর্গিত করিতেছে,—কে জানে লাঞ্ছনা খাইয়া, কে জানে সৎ কি অসৎ কোন্ বিশেষ উপায়ে? এই শ্রেণী বিশেষতঃ, এ সংসার বাগিচায় কুষ্মাণ্ড ফল! ইহাদের বিশ্বাস, উদরপূর্ত্তির যে চেষ্টা তাহা হইতে আর যে কিছু উন্নতি তাহা আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পর আরও উন্নতি চাও?—সভা করিতেছি, বক্তৃতা দিতেছি, নবেল লিখিতেছি, নাটক লিখিতেছি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেছি; আরও চাই কি!—বিশেষতঃ নবেলের ন্যায় গূঢ়তত্ত্বভেদী সংস্কারক যন্ত্র আর কি আছে? অবশ্য, তায় আবার বাঙ্গালা নবেললেখকের নবেল! এই শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস, জাতির মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ নমুনা; এবং ভারতভাগ্যের যে কিছু ভাবী ফলাফল তাহা সম্পূর্ণতঃ ইহাদের নবেল লিখনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাদের পর, নব্যদল; লক্ষ্যশূন্য, অভিপ্রায়-শূন্য বাতুলবৎ চেষ্টা-ঘূর্ণনে বিঘূর্ণিত। এই সমস্তের পুনঃ রাজনীতিপ্রাণতা ত্রিবিধ;—রাজাবাহাদুরাদির ক্রেতা যে সে ভাবে 'ওহো! ইংরেজচক্রে যে কিছু পদার্থ তাহাই স্বর্গীয়।' ক্রয়োপায়শূন্য অক্রেতা যে সে ভাবে, 'দূর দূর! ইংরেজ মুহূর্ত্তে বিতাড়িত হইলেই পরম মঙ্গল!' নির্ব্বাক নির্ধন যে সে ভাবে 'যে রাজা হয় হউক, আমি যে এত রাতদিন খেটে মরি, তবু এই পোড়া পেটের ভাতে কেন এত অনাটন? তবে বুঝি বাবুবেটারাই লুটপাট করে খায়!!' এই ত তোমার সমাজের ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণ।

এক্ষণে ব্যক্তিত্যাগে সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ সমাজে সকলেই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ কেহ নাই; সকলেই তর্ক করিতে উদ্যত, তর্ক শুনিতে কেহ নাই; সকলেই উপদেষ্টা, উপদেশপালক কেহ নাই; সবাই গুরু, শিষ্যত্ব করিতে কেহ

নাই; অথচ পরস্পর সকলেরই সমাজকে রাজী রাখিতে কি আগ্রহ। সকলেই নেতৃত্ব-অবলম্বী; সকলেই নেতৃত্ববোধক আড়ম্বরের দ্বারা অপরকে বিমোহিতকরণে উদ্যত; সকলেই প্রশংসা আকর্ষণে লালায়িত; অথচ কাজে কিন্তু প্রকৃত নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষী একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু দ্বন্দ্বী পদার্থের একত্র সমাবেশ হইলে যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিতেছে। আশ্চর্য্য! বাঞ্ছারাম, এ সমাজে প্রতি ব্যক্তিতেই জ্যেষ্ঠত্ব ও প্রতিভাস্বাতন্ত্র্য এত বেশি যে, কখনও, এমন কি, পাঁচ জনকে একজাতীয় বসন ভূষণ পরিতে দেখিলাম না; কখনও পাঁচ জনকে একজাতীয় আহারীয় আহার করিতে দেখিলাম না! পাঁচজনেই পঞ্চ বিধর্ম্মী, কেহ কিছুতে ও কাহারও সঙ্গে মিশে না; এ দিকে কিন্তু আবার পাঁচ জনেই পঞ্চ 'ফ্রেণ্ড'—মদের বোতলে ও খানার ডিশে, নতুবা আপদ বিপদ বা প্রয়োজনে পঞ্চ-দিগন্তগামী পঞ্চপক্ষী—কে কার!

আমাদের এই জ্যেষ্ঠত্ব, প্রত্যেকের এই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যভাব, ইহা কি মানবীয় প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণে উৎপন্ন? তাহা নহে। প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ অনুসরণ-ক্রিয়ার ধর্ম্ম ওরূপ নহে। লোক জগতে কতকগুলি বিষয়সাধারণ কোন বিশেষ সীমান্তমধ্যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বজনীন ভাবে পরিচালিত হইলে, সেই সীমান্তগত লোকসমূহ হইয়া জাতীয়ত্ব বিশেষ সংঘটিত হয়। তাহাতে পুনঃ বিশেষত্ব হেতু, বিভিন্ন পর্য্যায় এবং সমাজ এবং আরও বিশেষত্ব হেতু বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তি নিরূপিত হয়। এ বিশ্বকর্ম্মক্ষেত্রে জাতিবিশেষে ন্যস্ত কার্য্য যাহা তাহাই সাধারণ কার্য্য; তাহার পুনঃ অংশ কলা প্রভৃতি সংসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন সমাজ ও ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যকতা। সুতরাং কর্ম্মপথে যথায় যেমন বিশেষত্ব,তদনুসারে সমাজ এবং ব্যক্তি প্রভৃতিতেও অনুরূপ প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। করণীয় কার্য্যমাত্রের আবার আয়োজন এবং সম্পাদন, এই দুই দিক আছে। যাহারা আয়োজন করে,তাহারা সমাজে কনিষ্ঠপদবীস্থ; আর যাহারা সম্পাদন ও কনিষ্ঠকে

পরিচালন করিয়া থাকে, তাহারা জ্যেষ্ঠ। আয়োজন ও সম্পাদন স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য; সুতরাং কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধও সেইরূপ এ সংসারে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য। এ বিশ্বকর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্যবিভাগে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম, সকল কার্য্যই কার্য্যকারকবর্গের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে দেখিতে পাইবে যে, বিশেষভেদে প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য বহুত্বযুক্ত হইলেও, সাধারণ সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বদাই একত্ব-সূত্রে আবদ্ধ;—বহুত্বমধ্যে সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে একতার তার অতি গূঢ়ভাবে পরিচালিত হইয়া রহিয়াছে। যে সামঞ্জস্যগুণের প্রভাবে জগৎব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যে সামঞ্জস্য-গুণের প্রভাবে প্রকৃতির শ্রী, সেই সামঞ্জস্য গুণ আসিয়া যখন মানবেতেও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তখনই মানবকে যথার্থ প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়। তখনই একত্ব এবং বহুত্ব, জ্যেষ্ঠত্ব এবং কনিষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব এবং নীতত্ব. উভয় আসিয়া প্রণয়সংমিলনে সংমিলিত হইয়া সামঞ্জস্যগুণের বিকাশ করিয়া থাকে; সেখানে প্রতি মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সে সামাজিকতা এবং জাতীয়ত্বে এক এবং মৌলিকভাবাপন্ন; কনিষ্ঠের নিকটে জ্যেষ্ঠভাব এবং জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠভাব,নীতের নিকট নেতা এবং নেতার নিকট নীত, সমাজরক্ষা, সমাজতুষ্টি, জাতীয়ত্বরক্ষা, অথচ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবশে স্বতন্ত্র কর্ম্মানুসরণ,এ সকলের কিছুতেই তখন কোন প্রকারে এক অপরের প্রতিবন্ধকতা করে না। সর্ব্বদাই সুরুচির সঙ্গীতবৎ চিত্ত-মোহকরভাবে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; কোথাও কোন বিষয়ের নিমিত্ত কাহারও নিকট লাঞ্ছিত বা উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইতে হয় না। জ্যেষ্ঠ সেখানে কনিষ্ঠের প্রতি মমতাবান্ এবং কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের নিকট সর্ব্বদা ভক্তিবিনত হইয়া থাকে। এক্ষণে এক কথা, উপরে যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম তাহা সকলই সম্ভব বটে, কিন্তু কেবল এই একমাত্র সর্ত্তে অর্থাৎ নিজ জীবন এবং জাতীয় জীবন উভয়েরই যথার্থ অর্থ এবং উদ্দেশ্য যথায় স্থিরীকৃত, নির্দ্দিষ্ট এবং হৃদ্গত হইয়াছে। কিন্তু যথায় তাহা না

হইয়াছে, তথায় যাবতীয় বিষয় ছিন্নমূল বৃক্ষশাখাসমূহের দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত, উভয়তঃই জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য এক্ষণে অস্থিরীকৃত, অনির্দ্দিষ্ট, এবং অহৃদ্গত। সুতরাং এরূপ দশা না হইবে কেন?

তবে আমাদের এ জ্যেষ্ঠত্ব, এ স্বাতন্ত্র্যাদি কোন্ শ্রেণীর, বলিতে পার? আর যে কেহ উহাকে যে শ্রেণী ইচ্ছা সেই শ্রেণীর বলিয়া ধরুক, আমি উহাকে মহাপ্রলয় শ্রেণীর বলিয়া থাকি;—যে শ্রেণী হইতে মুসলমান ও খৃষ্টীয় শয়তানের উৎপত্তি হইয়াছে। যথায় বন্ধনী অভাবে নিয়মশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য, দর্শনশূন্য পদার্থনিকর যদৃচ্ছা আলোড়িত, বিক্ষিপ্ত, বিলোড়িত, তরঙ্গায়িত, উৎক্ষিপ্ত এবং বিলুপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সেই শ্রেণীর। ইহার প্রভাবে পদার্থ সকল সর্ব্বত্রই বেগবিক্ষিপ্ত, বেগবিলুপ্ত, স্বপদে সুস্থির রাখিবার জন্য কোথাও কিছুমাত্র আভ্যন্তরীণ একতা-সূত্রের অস্তিত্ব নাই। লোকচিত্ত এখানে তরঙ্গনিক্ষিপ্ত মলরাশিবৎ যখন যে দিকে ধাক্কা পাইতেছে, তখন সেই দিক অভিমুখে ছুটিতেছে; অবলম্বন-দণ্ডের সর্ব্বত্রই অভাব। পাঁচ জনের পাঁচরূপ মূর্ত্তি, পাঁচরূপ ভেক ধরিয়া উপস্থিত হইল, পাঁচ জনের প্রত্যেকের মূর্ত্তি নূতন নূতন, নীতি-সূত্রের অভাবে পাঁচ জনের মধ্যে কোথাও বিষয়-সাধারণ ভাবের চিহ্নমাত্র নাই, সুতরাং পাঁচ জনই পাঁচ জনের নিকট পঞ্চবিধর্ম্মী হওয়ায় পরস্পরের উপহাসাস্পদ হইল; অতএব সুসংমিলনও ঘটিল না, পঞ্চশক্তি একত্র হইয়া মহদুদ্দেশ্যসাধক সমষ্টি বাঁধিতেও পারিল না। কেবল বাহ্য দৃশ্যে এরূপ নহে, অন্তর্দৃশ্যেও অবিকল এরূপ। কার্য্য ও আচারের মূল এখন জ্ঞান ও বুদ্ধি নহে, অথবা নিয়ামকও তাহাদের নীতি নহে; মূল তাহাদের ফেসিয়ান্ এবং নিয়ামক তাহাদের প্রশংসাপ্রাপ্তির অভিলাষ। আজি তুমি বলিলে এইরূপ করিলে ভাল হয়, অমনি সেরূপ মতে না হউক, কিন্তু মত পরিবর্ত্তিত হইল। কালি তিনি আবার তাহা দেখিয়া নিন্দা করিয়া কহিলেন, এরূপ নহে সেরূপ হইবে, আবার পরিবর্ত্তন।

এইরূপে যে যাহা বলিতেছে, অমনি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পর পর উপর্য্যুপরি ক্রমাগত মুহুঃ পরিবর্ত্তনে ছুটিতেছে, অথচ কাহাকে কখনও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। অন্যের কথাও শুনিব না, নিজেরও নূতন করিবার শক্তি নাই অথচ নূতন করিব, আবার নানা জনের নানা কথা রটনার কারণকেও অপসারিত করিব, এরূপ ভাবে কে কবে কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকে? অধিকন্তু দেশীয় মহলে গালি এবং বিদেশীয় মহলে হাততালি, লাভের মধ্যে কেবল এই টুকু। ইহা সমাজ-ভ্রষ্টতা বা মিথ্যা সমাজের ফল। এ সকলেরই মূল কারণ, মূলে মূলের অভাব। এরূপ সমাজ ছিন্নসূত্র মালিকাবৎ এবং সমাজস্থ জনগণের কার্য্যসমূহ সূত্রচ্যুত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত. স্তূপীকৃত, ধূলিধূসরিত, পদদলিত, কোনটা বা লোপ-পথে অগ্রসারিত, বিবিধ বিকার ও দুর-বস্থাপ্রাপ্ত মালাগুটিকা পুষ্পসমূহ স্বরূপ।

কেন এরূপ হইল? সকল সৃষ্টির আদি সত্য, অথবা সৃষ্টি সত্যেরই বহির্বিকাশমাত্র। প্রতি কার্য্য এক এক পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি স্বরূপ; সুতরাং প্রতি কার্য্য, সত্যকে তাহার মূল না করিলে সুসম্পন্ন হইবার কথা নহে। সকল সত্যই ঈশ্বরের প্রতিরূপ। যখন সাত্বিকভাবে সেই সত্যকে অবলম্বন করা হয়, তখনই প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল বলিয়া বলা যায়, এবং সেইরূপ কার্য্যই কেবল ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও সেইরূপ কার্য্যই কেবল ঈশ্বরপ্রীতিকামার্থে উৎসর্গীকৃত হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। সত্যকে অবলম্বনের বাহ্য পরিচয় এই যে, যাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত তাহার সেই কর্ত্তব্যতাভাবের সততায় সর্ব্বান্তরীণ বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসকে অবলম্বনপূর্ব্বক ডাহিনে বামে কোন দিকে প্রতিরুদ্ধ না হইয়া যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি করণীয় কার্য্যের অনুসরণ করা। এরূপ সাত্বিকভাবপূর্ণ মানবজীবনে কর্ম্মসমূহ বিবিধ শোভাময় কুসুম-সমূহ, আত্মাতীত শক্তি বা পাতৃসমক্ষে কর্ত্তব্যবোধ তাহাদের অভ্যন্তর-পরিচালিত গ্রন্থিসূত্র। এই গ্রন্থিসূত্র, কৃত কার্য্যসমূহকে সুতান-লয়ে সম্বর্দ্ধিত করিয়া যে সমষ্টি নির্ম্মাণ করে; তদ্দ্বারাই কেবল জীবনের

সার্থকতা সাধিত হয়। ফলতঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধিই কেবল এ সংসারস্থলে জীবনো-দ্দেশ্যদর্শী দূরদীপালোকশিখা স্বরূপ; উহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে, মানুষ সাফল্য ও স্বচ্ছন্দতা সহ জীবনপথাতিক্রমপূর্ব্বক সুখপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ নিরাপদ স্থানে নীত হইয়া পরমানন্দভাগী হইতে পারে; কিন্তু হায়! নানা বিজাতীয় পদার্থসংঘর্ষে হিন্দুসন্তানের জীবনে এখন সেই কর্ত্তব্য সূত্র ছিন্ন! সুতরাং ইহাদিগের জীবনও মহাপ্রলয়-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ব্যাতা-বিঘূর্ণিত জীর্ণ তরণীবৎ। যে কোন বিষয়ে গাঢ় আগ্রহস্থৈর্য্য এবং স্থিতিশীল চেষ্টার অতিশয় অভাব। নিস্পন্দ,—তথাপি যে কিছু স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কালপ্রবর্ত্তিত প্রয়োজনজালের অপরিহার্য্য তাড়নে উদ্ভূত, জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিজাত নহে; সুতরাং তাহা (যেমন এরূপ অবস্থায় হওয়া উচিত) সুপ্তমনীষার নষ্ট স্বপ্নবৎ ছিন্ন ভিন্ন, বিকট বা বিভীষিকাময়। হিন্দুসন্তানের বিশ্বাস এখন আর কোন বিষয়ে নাই, সকল বিষয়েতেই তাহা ছিন্নমূল এবং ভগ্নপদ; যাহার পর নাই দাম্পত্য সম্বন্ধ ও সুখ, তাহাও পূর্ণ বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে কি না সন্দেহ! তবু যে ইহারা কখন কখন অথবা নিয়ত বাতুল চেষ্টায় বাতুলবৎ কার্য্যারম্ভ ও তৎসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূল কর্ত্তব্যবোধ নহে; বিশ্বাস নহে; তাহা সাময়িক হুজুক। অথবা উপরে যাহা বলিয়াছি, কালপ্রবর্ত্তিত প্রয়োজনজালের তাড়না। সামান্য প্রয়োজনজাত কার্য্যও, জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অথবা কর্ত্তব্যবুদ্ধির যথাপরিমাণ প্রয়োগাভাবে, ছন্ন বিকট ও বিভীষিকা-ময় হইয়া থাকে।

যে প্রাচীন ভারত, যাহার কীর্ত্তি এবং গৌরব প্রভাবেই কেবল আজি পর্য্যন্ত আমরা গৌরবান্বিত,—যে কীর্ত্তি ও গৌরব নব্যভারত কর্ত্তৃক নিত্য তুচ্ছীকৃত, উপহসিত এবং তাহার কর্ত্তা পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ-গণ নিরন্তর নিন্দিত,—সেই প্রাচীন ভারতে এক সময়ে, যে সময়েতে সেই কথিত কীর্ত্তি ও গৌরবরাশির সমুদ্ভব হইয়াছিল, সকল কার্য্যই ধর্ম্মশাসনে বা কর্ত্তব্যশাসনে সুসম্পাদিত হইত। ব্যক্তিগণ তখন

প্রতি কার্য্যে নিয়ন্তার হস্ত, নিয়ন্তার নির্দ্দেশ দেখিতে পাইতেন; শাস্ত্র-কার ও বিধানকর্ত্তারাও, যে কিছু কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও আদিষ্ট জ্ঞানে তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। লোকেও, যাহা যাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সুতরাং কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত, নিরন্তর প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিত;—এরূপ প্রাণপণে, যেন তাহাদিগের জীবন মরণ ও তদানুষঙ্গিক শুভাশুভ পর্য্যন্ত সেই কার্য্য সুসম্পাদনের উপর নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ তাহাদের পক্ষে, সেই-রূপই নির্ভর করিত। যাহারা এরূপ সর্ব্বান্তরীণ ভক্তিসংযুত কর্ম্ম-কারক, তাহাদের প্রতি কর্ম্ম-নিয়োজক ঈশ্বরের করুণাও যে অপরি-সীম হইবে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ফলেও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন জগতে প্রাচীন হিন্দুরা কি না করিয়া গিয়া-ছেন! প্রাচীন পৃথিবীর ইহাঁরা সর্ব্বোত্তম রত্ন। অধিক কি, যুগযুগান্ত গত, তথাপি আমরা, বলিতে কি, আজি পর্য্যন্ত কেবল এক তাঁহাদিগের দোহাই দিয়া খাইতেছি। তাঁহারা সেই দূরতম কালেও যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন ও যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সে সকলের ভিতর এমন অনেক বিষয় আছে যে, যাহার অভ্যন্তরে আধুনিক জগৎ আজি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহারা ছিলেন সেই, আর আমাদের দশা এই! তথাপি, তাঁহাদিগের উপযুক্ত বংশধরেরা তাঁহাদেরই মাথায়—সেই ভিক্ষাভোজী ব্রাহ্মণগণের মাথায়, নিরন্তর গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া থাকে। কি অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা!—তাহাই যদি না হইবে, তবে পোড়ার মুখই বা এমন করিয়া পুড়িবে কেন! বংশধরদের পক্ষে অবশ্যই এটা তত অনুসন্ধানের বিষয় নহে যে, পিতৃপুরুষগণ কি উন্নতি করিয়াছিলেন বা না ছিলেন বা তাঁহাদের কৃত-বিষয়ক পরিণামে কি উন্নতি সম্ভবপর; যেহেতু সে পক্ষে কি ঊনবিংশ কি ঊন-এক, কোন শতাব্দীরই উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ধার তাহারা ধারে না,—বাহান্তরেও ঘাসজল ছেয়াত্তরেও ঘাসজল! তাহাদের প্রধান অনুসন্ধেয় ও আক্ষেপ এই যে, কেন আধুনিক ভ্রষ্টানুকরণজাত

যথেচ্ছাচারের পথ তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া রাখেন নাই, যদ্দ্বারা আমাদের তাকিয়া ঠেস এবং আয়েস উভয়ই এককালে এবং নিরাপদে চলিতে পারিত। যিনি যুগপৎ জগদীশ্বরক্ষিপ্ত এবং নাস্তিকতাবিক্ষিপ্ত, যিনি ভারত-উদ্ধারের প্রথম পাণ্ডা এবং মস্তিষ্কের বিকার হেতু ভারত-উদ্ধারের আশাভঙ্গে কাঁদিয়াছেন ও কাঁদাইয়া গিয়াছেন, যিনি বিষম বোম্‌বেটে স্থূলেথক এবং সর্ব্ববিদ্যায় সম্ভাবিতবুদ্ধি কিন্তু স্খলিতশুদ্ধি, সেই—সেই আমাদের রসময় অক্ষয় দত্ত, তিনি বড়ই আক্ষেপ করেন যে, পিতৃপুরুষদের মধ্যে তাঁহাদিগকে মানুষ করিয়া আনিতে কেবল এই একটী বিষয়ের বড়ই শোচনীয় অভাব ছিল—"সেটী বেকন! সেটী বেকন! সেটী বেকন!" বেকন একজন ঘুষখোর ও দূষিত-চরিত্র ইংরেজ দার্শনিক। পাষণ্ড বাঙ্গারাম, আমি বলি, সেটী বেকন নহে,—সেটী তোমার ন্যায় গুণবান্ উপযুক্ত বংশধরগণের গর্ভেই বিনিপাত হওয়া! গর্ভেই বিনিপাত হওয়া! গর্ভেই বিনিপাত হওয়া! ভো উন্মাদ, বেকন কালিকার লোক, তুমিও যে দিনের সেও প্রায় সেই দিনের। যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া বেকনের উৎপত্তি, তোমার ভিত্তি তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু বানরীয় বর্ব্বর ভিত্তি অবলম্বনে বেকন যেমন হউক একরকম মানুষ হইল, আর তুমি? মানবীয় ভিত্তি অবলম্বনে তুমি বানর হইলে! ইহাতে পিতৃপুরুষের দোষ কেন দাও? দোষ আর কাহার দিব, দোষ ভারতের পোড়া ভাগ্যের। বাপু হে, ব্যাপক দর্শনের অভাব হইলে, কাজেই শাকের ক্ষেতে বড় বাগান, তালপুকুরে মহাসমুদ্র আসিয়া উপস্থিত হয়; অথবা তুমি চোখ বুঁজিয়া অন্ধকার দেখিলে সত্য সত্যই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না। কাঙ্গালকে রাজা করিলে, সে তাহাতে স্বচ্ছন্দে এক ধামা মুড়িমুড়কী খাইতে পাওয়ার অতিরিক্ত আর কোন ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায় না! মানবের অসারতার প্রধান লক্ষণ, যখন সে পরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়; এবং সেইরূপ চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান লক্ষণ, যখন সে পিতৃপুরুষের নিন্দাবাদে

প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃত সারবান্ নিন্দার অবসর পাইয়া উঠে না। আবার বলি, আর কোন্ দেশে কোন্ জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তরপুরুষদিগের জন্য, হিন্দু আর্য্যগণের অপেক্ষা, কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ সুন্দর জমি প্রস্তুত রাখিয়া গিয়াছে? কিন্তু হইলে কি হইবে, কেহ বা তৈয়ারী জমি পাইয়া শেয়ালকাঁটা লাভ করে; আবার কেহ বা অকর্ষিত জমি পাইয়াও নিজের শ্রমে কর্ষণপূর্ব্বক সুফসল যোল আনায় গৃহ পূর্ণ করিয়া থাকে। আমাদের ভাব প্রথমোক্ত। বাঞ্ছারাম, অন্য কাহারও নহে, দোষ আমাদের নিজের।

যাহা হউক, এ অনন্ত অথচ কালবাহী জগতে সকলই থাকিবে অথচ কেহ একস্থায়িনী স্ব-মূর্ত্তিতে থাকিতে পাইবে না, তাহা বলিয়া হউক বা ব্যক্তিগণের স্বাত্মনিমিত্তভূত কারণের প্রবলতা বশতঃ হউক, অথবা উভয়েরই যুগপৎ সমাবেশ বা অপরাপর যে কোন কারণসমূহের সমুপস্থিতিতেই হউক, পূর্ব্ব অবস্থায় ক্রমে অবস্থান্তরের উপস্থিতি হইতে চলিল। পূর্ব্ব সমস্ত যেন ভাবী নব-নির্ম্মাণের উপাদান স্বরূপে নৈসর্গিক নিয়মবশে পুনর্ব্বার জাগতিক কর্ম্ম-কটাহে নিক্ষেপিত হইতে লাগিল।

যে শুভ-সূর্য্য এতদিন ভারত অদৃষ্টক্ষেত্রে সমুদিত থাকিয়া কর-প্রসারণে সমস্ত পদার্থকে প্রদীপ্ত ও আলোকিত করিতেছিল, সেই সূর্য্য এখন নিয়তিলীলায় মধ্যাহ্ন গগন পরিত্যাগে অস্তশিখরমুখে অবতরণ করিতে লাগিল। সময় পাইয়া অন্ধকার ধীরে ধীরে পদ প্রসারিত করিয়া জগৎ আবরিত করিতে আসিল। দুর্নীতির দারুণ ঝটিকায় জীবজগৎ চমকিত এবং স্বার্থের বিষম বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতে লোকসংসার প্রদাহিত। আচারশূন্য উদ্যমশূন্য ভারতসন্তানেরা ক্রমে পথ হইতে বিপথগত হইতে আরম্ভ করিল। নব উপার্জ্জনে বিরতি, সুতরাং সর্ব্বাত্মনা একমাত্র পূর্ব্ব উপার্জ্জিত বস্তুবিষয়ক ভোগসুখের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; তাহা হইতে আলস্যজনিত জড়তার উৎপত্তি; জড়তা হইতে মানবের আনুষ্ঠানিক জীবন ক্ষীণবল এবং তাহার পুনঃ অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে

শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিল। স্বভাব,সৎ-উৎসাহ এবং কর্ম্মশীলতার উপর,শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তিরই বহিঃস্ফূর্ত্তি ও বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের ইতরে ইতর, উৎকর্ষে উৎকর্ষ ভাব। জড়িমাজড়িত স্পন্দহীন মানবচিত্ত এখন আত্মদোষোৎপন্ন ফল অদৃষ্টের প্রতি আরোপ করিয়া, আভ্যন্তরিক উত্তেজনা হইতে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে শিখিল;—যদিও সে চেষ্টায় সফলতা কখনও আইসে না। ছন্ন অদৃষ্টবাদ ও মায়াবাদের সৃষ্টি হইল। ধর্ম্মের যে কিছু উত্তেজক ও উৎসাহবর্দ্ধক বিমলজ্যোতিঃ তাহা লোপ হইয়া আসিল। পরে ধর্ম্মকেও প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, আশঙ্কায় ও আকুলতায় চৌকিদার ব্রাহ্মণেরা বহুযত্নে তাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্ম এমন স্থানে থাকিবেন কেন? তিনিও, মন্ত্রপ্রকরণাদিরূপ কিঞ্চিৎ ছিন্ন বসনাংশ তাহাদের হস্তে পরিত্যাগ করিয়া, অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইলেন। এখন কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাজ্য, অথবা কর্ম্মকাণ্ড এখন কিঞ্চিৎ আলোচাউল ও কাঁচকলা উৎসর্গে বা আলস্য-ঠেস হরিণামে। সংসার হইল দারুণ দুঃখের মূল; যাহার পর নাই সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত রাক্ষসী এবং ধর্ম্মপথে কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত, এবং সহধর্ম্মিণীও ক্রমে যথার্থই রাক্ষসীমূর্ত্তিতে পরিণত হইতে চলিল। এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা মোক্ষই একমাত্র কি ইহজীবন, কি পরজীবন, উভয় জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনুষ্ঠেয় বলিয়া সমাদৃত হইল। ইহলোকেও তাকিয়া ঠেস, পরলোকেও তাকিয়া ঠেস! ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা শেষে এই বলিয়া স্থির হইল যে, যে কেহ কর্ম্ম-শূন্য ও সর্ব্ব-উদ্যম-বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিতে বা অপরের গলগ্রহ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে, সেই জীবন্মুক্ত। ভারতে পর-অন্ন-জীবী ভিক্ষুকের সংখ্যা যত,বিশেষতঃ নষ্টধর্ম্ম-ভিক্ষুকের সংখ্যা যত অধিক, এত আর ভূভারতে কোথাও নাই। ইহা সেই অপূর্ব্ব অভিনব ধর্ম্মশিক্ষার ফল। ফলতঃ জীবন্মুক্তের জ্বালায় সদাই অস্থির, সে উন্মুক্ত ভিক্ষার

ঝুলী কিছুতেই পূরে না। অকর্ম্মশীল এতগুলি লোক, ইহারা কেবল নিজের আত্মধ্বংস সাধন করিতেছে না; যাহাদের গলগ্রহ হইতেছে, তাহাদের পর্য্যন্ত আত্মধ্বংস করাইতেছে। যদি ইহারা নির্ব্বুনিয়াদ হইয়া কিঞ্চিৎ করভারের বৃদ্ধি হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। প্রকৃত দানের পাত্র যে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বাঞ্চারাম, অকর্ম্মশীলতায় দান লওয়াও যে দোষ, দান দেওয়াতেও সেইই দোষ; এরূপ দানে যাহার ধর্ম্ম নিহিত, গ্রহীতার সঙ্গে সেও সমান দুষ্ট—উভয়ে সমান পতিত। মোক্ষ! মোক্ষ! আর শ্রম করিতে না হয়; কেবল এখন নহে, ভবিষ্যতেও যেন আবার কর্ম্মস্থলীতে যাইতে ও শ্রম করিতে না হয়; ইহাই তোমার মোক্ষ! তবে কি ঈশ্বর তোমার সৃষ্টিশ্রমহেতু যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এই জড়প্রায় মাটির ঢিবি হইয়া বসিয়া থাকিবে বলিয়া? কর্ম্মশূন্য যে ঈশ্বরপ্রার্থনা বা যে কোন ধর্ম্মফল-কামনা, তাহা নষ্টামী এবং ফেরেবী। পাষণ্ড বাঞ্চারাম, তুমি কে যে তাই তোমাকে মোক্ষ দিবার জন্য ঈশ্বরের ঘুম হয় না? বিশ্বেশ্বরকেও কি তুমি তোমার ইংরাজ মুনীব পাইয়াছ যে, কেবল 'অনার' 'লর্ডসীপ' ইত্যাদি চাটু বচনে অভীষ্ট সাধন করিয়া লইবে। যেমন তুমি সামান্য-প্রাণ, যেমন তুমি সামান্য-মন, তোমার ধ্যান, ধারণা বা কামনা, বা তোমার মোক্ষবাঞ্ছাও সেইরূপ সামান্য! তোমারই বা দোষ দিব কি, দোষ তোমার মাতৃভূমির কপালের!

অতঃপর বিকৃত মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ উচ্চ হইতে অধমতম সমাজের সকল পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিবর্গেরই হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল; এমন অবস্থায়, কোন রূপে উদরপূর্ত্তিতে দেহভার বহন ভিন্ন, আর কি কার্য্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? শাস্ত্রসকলও তদনুসারী হইতে লাগিল। এই নিশ্চেষ্ট অলসভাব এবং সেই তদনুরূপ শাস্ত্রশাসন, উভয়ে একত্র মিলিয়া, লোকচরিত্রকে কিরূপ অকর্ম্মণ্য এবং হত-চেতন করিয়াছিল, তাহার উদাহরণের কি আবশ্যক হইবে? যদি হয়, তবে আদি উদাহরণ লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নের

কথা মনে কর। সে পলায়ন একা লক্ষ্মণ সেনের নহে, তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রেরই, লক্ষ্মণ সেন কেবল প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এইমাত্র তাহার দোষ। তাহার পর আরও দেখিতে চাও, বীভৎস তন্ত্রঘটার প্রতি বারেক নিরীক্ষণ কর। আর এখন?—ভারতে ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, উৎসাহ গিয়াছে, উদ্যম গিয়াছে, সকল গিয়াছে, আছে কেবল? —আছে এক ধর্ম্মবিপ্লবের তরঙ্গতুফান! প্রতি সময়ে, প্রতি স্থানে, নিত্য নূতন ধর্ম্মবিপ্লব; এবং বিপ্লবও এমন যে প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে ভারতের এক এক ঝলক রক্ত শোষণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মে প্রাচীন হিন্দু গৌরবান্বিত হইয়াছিল, ধর্ম্মে বৌদ্ধ জগৎ ব্যাপিয়াছিল, ধর্ম্মে মুসলমান পৃথিবী অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু সেই ধর্ম্মবিপ্লবের ধর্ম্মে হিন্দুসন্তান?—উচ্ছৃঙ্খল হইতে উচ্ছৃঙ্খলতর, অবসন্ন হইতে অবসন্নতর, সঞ্চিত বুদ্ধি ও সঞ্চিত পুরুষত্বটুকুরও বিনাশে ধ্বংসতরঙ্গের লহরীলীলায় ভাসমান! অন্য দিকে লক্ষাধিক অত্যাচারেও মাথা তুলিবে না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে একেবারে ক্ষিপ্ত—সুধু ক্ষিপ্ত নয়, উন্মাদক্ষিপ্ত! নীত এবং নেতা, উভয়েই মোহান্ধ হইয়া, একই তরঙ্গে নিপাতিত; ভাসিয়া চলিয়াছে। দোষ কেবল নেতার নহে; নীতের অবস্থা-প্রলোভনেই অনুরূপ নেতার সাধারণতঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখনই কি ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ভ্রান্ত ধর্ম্মপিপাসা এখন পর্য্যন্ত ভারতসন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতেছে। যতদিন যে জাতিতে সজীব ধর্ম্মের অবস্থান, ততদিন সে জাতির কখনই অধঃপতন সম্ভব হইতে পারে না। যখন দেখিবে যে জাতি অধঃপাতিত, তখন নিশ্চয় জানিবে, প্রকৃত ধর্ম্ম সে জাতি হইতে অনেক দূরে পলায়িত। অধঃপাতগত মনুষ্যের আবার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মচর্য্যা, শুনিবার কথা ও হাঁসির কথা বটে! খড়গোবরপ্রবিষ্ট মৃতব্যাঘ্রচর্ম্মে রচিত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি যেমন সজীব বাঘ, অধঃপতিত জাতির ধর্ম্মও তেমনি সজীব ধর্ম্ম! কথাগুলি অলঙ্কার নহে, ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে।

অথবা এত ধর্ম্মবিপ্লব যেখানে, সেখানে সত্য সত্যই কি তবে

ভারতসন্তান, আর সকল জাতি ধর্ম্মধ্বজিতায় তোমার নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে?—অন্ততঃ তোমার বিশ্বাস তাহাই, ধার্ম্মিকতা ও নৈতিকতায় তোমাব বড়ই আত্মগৌরব! কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণতার প্রধান পরিচয় কর্ম্ম এবং নীতি। তোমার কি তাহা আছে? কিন্তু কই?—কর্ম্ম ত তোমার উদরপূরণে, কিন্তু তাই বা কোন্ ভালরূপে পূরণ করিতে পার, তাহা পারিলেও ত সে সূত্রে অনেক কাজ হইত! আর নীতি? কি ব্যবসায় কি ব্যবহারে, এক পয়সা অন্যকে দিয়া বিশ্বাস করিতে পার কি?—এমনই তোমাদের সত্যপ্রিয়তা! ওদিকে ঘরের কথাটী পরকে না লাগাইলে বা পরের হইয়া স্বজাতিদ্রোহিতা না সাধিলে, অন্ন তোমার পরিপাক হয় না; ক্ষমা ও দান তোমার দায়ে পড়িয়া, দয়া ও দাক্ষিণ্য তোমার পদস্থের প্রীতিকামে; নরমের তুমি বাঘ এবং গরমের তুমি গোলাম; স্বার্থে মূর্ত্তিমান কলি এবং শত্রুতায় পিতাপুত্রেও ফৌজদারী ঘটনা হয়! তাই বলি, বল বল, কোন্ নীতিটা তোমার আছে, কোন্ নীতিটা তোমার অক্ষুণ্ণ আছে, কেবল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তোমাকে ধার্ম্মিক ও নৈতিক বলিতে সক্ষম হই? তোমার যদি ধর্ম্ম, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে? তুমি যদি স্বর্গে যাও, তবে বল স্বর্গ নরকের নাম বদলে পরিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছে! আর জাতীয়ত্ববুদ্ধি?—স্বজাতি-প্রিয়তায় তুমি মনুষ্যত্বহৃদয়ে দুরপনেয় কলঙ্ক। জেলা হইতে জেলান্তর তোমার বিদেশ, দক্ষিণ হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা তোমার নিকট বিভিন্ন জাতি, ভারতের অপরাপর প্রদেশ তোমার দূরশ্রুতি, আর আপন বেলা ছাড়া পর তোমার সকলেই;—পরও বিপদে পরের মুখ তাকায়, কিন্তু তুমি তাহারও অতীত, সুতরাং তুমি পরের উপরও পর, পরাৎপর! হিন্দুসন্তান স্বজাতিমধ্যে থাকিয়াও নির্জ্জন মরুকান্তারবাসী অপেক্ষা নিরুপায়; অরণ্যে পশু হইতে যে সাহায্য প্রত্যাশা আছে, লোকালয়ে থাকিয়াও সে প্রত্যাশা তাহার নাই; আপন দেশে থাকিয়াও বিষম বিদেশী এবং পড়িয়া খুন হইতে থাকিলেও কেহ ফিরিয়া তাকাইবার নাই, বিশেষতঃ যখন খুন বিদেশীর

হাতে![1] ইহার পর আরও কি তোমার মহিমাঘটা দেখিতে চাও, তবে আরও একটু পরদা অপসারিত কর।

অতি বিকৃত দৃশ্য! বিজাতি-প্রসাদে রেলওয়ে,টেলিগ্রাফ চলিতেছে, সুখের সাগরে ভাসিতেছি; ঊর্দ্ধবাহু উনবিংশ শতাব্দীর,—উনবিংশ শতাব্দী যাহার হউক না কেন,—ঊর্দ্ধবাহু উনবিংশ শতাব্দীর মহিমা-গানে উন্মাদিত হইতেছি; কিন্তু এ দিকে কি হইয়াছে তাহা দেখিয়াছ? ঈশ্বরের বিশ্বাসরূপী যে এক গাছি অবশিষ্ট রজ্জু এতক্ষণ নরক-নিপতন হইতে রক্ষা করিতেছিল,তাহাও এখন ছিন্নপ্রায়! কর্ত্তব্য কাহাকে বলে, কর্ম্ম কাহাকে বলে, জীবনের সার্থকতা কাহাকে বলে? এ সুখ সময়ে, বাহ্য সম্পদের বহ্বাড়ম্বরে, স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি এবং সুখের বিলাস ভিন্ন আর কি শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য, কর্ম্ম এবং জীবনের সার্থকতা হইতে পারে! ঈশ্বর, ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন, এ সকল কাহাকে বলে?—দুর্ব্বলচিত্তের খেয়াল ও শান্ত্যুপায়, বাতুলের স্বপ্ন, অথবা কি তা, তাহা জানি না, আর জানিয়াই বা তাতে ফল কি; কেহ কখন তাহা জানিতে পারে নাই, পারিবেও না, তবে বৃথা কচ্‌কচিতে মাথা ধরাণর আবশ্যক কি? তোমার ঈশ্বর, ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন,

---

১। শুন বাঙ্গারাম, স্বজাতি-প্রিয়তার একটা প্রকৃত ঘটনা বলি। একদা এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক রেলের গাড়ীতে সেকেণ্ডক্লাশে যাইতেছিল। কোন এক ষ্টেশনে লোকটি কার্য্যগতিকে অবতরণ করে এবং সেই সুযোগে তিন জন গোরা তাহার গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীলোকটীর প্রতি নানা অনিষ্ট আচরণ করিতে থাকে। বেগতিক দেখিয়া স্বামী দৌড়িয়া স্ত্রীর সাহায্যে আসিল বটে, কিন্তু গোরা একজন গাড়ীর দুয়ার চাপিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না। শেষে বিষম অনুপায়ে লোকটি ফাষ্টক্লাশস্থিত একটী ইংরেজ স্ত্রীলোকের স্মরণাপন্ন হওয়ায়, তাহারই সাহায্যে স্ত্রী উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল। এদিকে যখন সেই ঘটনা হইতেছিল, ওদিকে তখন অসংখ্য বাঙ্গালী জমা হইয়া কেহবা অবাক্‌দৃষ্টিতে মজা দেখিতেছিল,কেহ বা হাসিতেছিল, কেহ বলিতে-ছিল,—'খুব হইয়াছে, সেকেণ্ডক্লাশ না হইলে চলে না, যেমন তার তেমনি।' বুঝিলাম, লোকটির প্রধান অপরাধ সে সেকেণ্ডক্লাশে যাইতেছিল। অতঃপর বল দেখি, বাঙ্গারাম, স্বীয় জাতিত্বস্মরণে গৌরব না ধিক্কার, কোন্‌টা আসিয়া উপস্থিত হয়?

এ সকল না হইলেও, আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। পাঠশালার পাঠ্য দর্শন ও বিজ্ঞান লেখকগণ এ যুগের ধর্ম্মগুরু। মিল ও বেন্থাম ইহাদিগের পোপ। এই দর্শনপেষিত মিল, যে ধর্ম্মতত্ত্ব তর্ক করিতে গিয়া ত্রিসহস্রবর্ষপূর্ব্বগত জরথুস্ত্রের শিক্ষার অংশতঃ সমর্থন ভিন্ন, নূতন আর কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই; সে যে ত্রিসহস্রবর্ষ পরে উদ্ভূত ও অগ্রগামী কালবক্ষোবাহী মানবকে কিরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে, তাহা কেবল মিল-শিষ্যেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারে। এখন হইতে 'ইউটিলিটী' আদর্শ। মিলবেন্থামাদির লেখায় মানুষ জড়যন্ত্র হইতে বড় একটা অধিক পৃথক নহে; অতএব এখন হইতে সমস্তই, আত্মিক বিষয় পর্য্যন্ত, কলে নিষ্পাদিত কেন না হইবে? সকলেই সমান সুখী, সমান ভোগী হইবে। যে কিছু অসমতা যোগের এবং রোগের। বাপু বাঞ্ছারাম, যে প্রকৃতির তুমি সন্তান, যাহার অবলম্বনে তোমার স্থিতি, যাহার অবলম্বনে তোমার গতি, তাহাকে কিঞ্চিৎ ইউটিলিটী শিখাইতে পার? সে বড়ই ইউটিলিটী-জ্ঞান-পরিশূন্য। মরুক না হয়, ইউটিলিটীই যেন আদর্শস্থলীয় হইল; কিন্তু তোমার তাহাতে কি, তুমি কেন তাহাতে মাথা ঘামাইয়া দেয়ালে খেয়ালে আপনার কর্ম্ম পণ্ড কর? সাড়ে সাতশ বৎসরের পুরাতন জুতা মাথায় বহা যাহার নিত্য ব্রত, যাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে গোলামের সংখ্যা ভিন্ন আর কিছুই বৃদ্ধি পায় না, তাহার এ ইউটিলিটী বিলাসে ফল? সম্ভব যাহা, আগে তাহার লাভে সমর্থ হও; অসম্ভব লাভের খেয়াল তাহার পরে।

দেখিতে পাওয়া যায় যে কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, পিতা মাতা, সন্তানগণ পাঠশালা হইতে গৃহে আসিলে, সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে লইয়া, দেবচরিত, লোকচরিত, বংশাবলী-জ্ঞান, কি করা কর্ত্তব্য, কি করা অকর্ত্তব্য, এই সকল যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি এবং যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিত; এবং দেবতাদির প্রতি ভক্তি, সংসারের প্রতি সন্নীতি ও সদনুরাগ, সুযোগ পাইলেই যত্ন সহকারে বালকের মনে সমুদিত করিতে

চেষ্টা পাইত। বালকও, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ম্ম-পথে যদিও অবশ্য বলদ বিশেষ, তথাপি কথিত সৎশিক্ষায় কথঞ্চিৎ অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায়, সংসারে যাবেদা মত একরূপ চলিতে পারিত ; এবং এখনকার ন্যায় সভ্য ভব্য না হইলেও, তাহাদের অভ্যন্তরে এমন একটি সারল্য ও সহজ বুদ্ধি এবং উন্নতের প্রতি ভক্তি বা বিনত ভাব অবস্থান করিত যে, আধুনিক সভ্য ভব্যের সমগ্র জীবন অনুসন্ধান করিলেও তাহার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এখন তাহাও নাই। পিতা মাতা এখন সৌখিন ; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদানে তাহাদিগের অবসর হইয়া উঠে না ; আফিসের কাজে, ফ্রেণ্ড আহ্বানে, দাড়ির তদ্বিরে, চস্‌মা পরিষ্কারে, গহনার চিন্তায় এবং গৃহিণীর ঝাঁটায়, তিল মাত্র ফুরসৎ হইয়া উঠে না। কর্পেটলক্ষ্মী জননী যিনি, তিনি এখন ঘোষ বসু মিত্র মুখোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া, জ্ঞান-গম্ভীর-বদনা, উপন্যাসহস্তা, 'ডিসেণ্ট'-পোষাক-উদ্ভাবন চিন্তায় চিন্তাব্যাকুলা ; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদান, কখন কখন বা স্তন্যদান পর্য্যন্ত, তাহাদিগের নিকটে হেয় ; এগুলি অবশ্য মহাশয়ার মহান্ আশয়ের মধ্যে স্থান পাইতে অযোগ্য। পুনশ্চ, ঝকড়ায় যিনি ঝড়ের আকার, অথচ রন্ধনশালায় যাঁহার মাথা ধরে, পরিজনসমক্ষে যিনি ননীর পুত্তলী, কার্পেট হস্তেই কোমলাঙ্গুলিতে যাহার শোভা বৰ্দ্ধন হয়, এবং স্বামী দেখিলেই নানা রোগে যাহার শরীর খসিয়া যায়, তাহাকে সে সকল কার্য্য সাজেই বা কি করিয়া! সব ভাল, কিন্তু একটী কথা, গৃহলক্ষ্মী কার্পেট বুনেন বুনুন, কথা নাই ; কিন্তু যে স্বামীর এ শেয়াল-কুকুরের জীবনে (পদে পদে যার গলায় হাত ও মাথায় লাথি) সে কার্পেট পরিতে সাধ যায়, তাহার গলায় দড়ী! আবার কথা আছে স্ত্রীজাতি শক্তিরূপিণী ; অতএব যে কামিনী স্বামীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া কর্ম্মরত করিতে না পারে এবং সমস্ত শক্তিমত্তা যার কেবল কার্পেট বুননে ব্যয়িত হয়, সে কামিনীরও গলায় দড়ী! সে যাহা হউক, যেমন পিতা তেমনি মাতা, দেশের

হাওয়াও ততোধিক অনুকূল ; সুতরাং শিক্ষকের হস্তে সন্তান নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে পিতৃমাতৃত্ব দায় হইতে আপনাকে মুক্ত বিবেচনা না করিবে কেন ? না হইবে কেন ?—যে দেশে ধর্ম্ম এবং পুণ্য পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায়; সেখানে যে পিতৃমাতৃত্বও কিনিতে পাওয়া যাইবে না, এ কথন হইতেই পারে না ! সাধারণ শিক্ষাস্থান আবার, বিজাতীয় রাজ-শাসনে এবং বিজাতীয় প্রথায়, ধর্ম্মশিক্ষা এবং চিন্তায় চিত্তপরিচালনাদি শিক্ষা, এ সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। নীতিশিক্ষার কথন কথন চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তাহা মূলশূন্য নীতি। নীতিই হউক বা যে কোন বিষয় হউক, যতক্ষণ তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে, আবশ্যকতা কি, পরিণাম কোথায়, ইত্যাদি তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারা যায়, ততক্ষণ তাহাতে কখনও আস্থা জন্মিবার কথা নহে। যদি জন্মায়, তাহা পরগাছা নীতি, তাহা স্থূলপণ্ডিতা নীতি ;—এ দিকে ভ্রষ্টাচারের চূড়ান্ত অথচ ওদিকে আমোদে দুটাকা ব্যয় করিতে দেখিলেই মনে করে, অপ-ব্যয়ের চূড়ান্ত হইয়া গেল;আবার অন্য দিকে তদ্বিপরীতে কেহ বা একে-বারে অনাস্থা সমুদ্রশায়ী, সমস্ত পুঁজিপাটা ব্যয় করিয়া, সমস্ত শরীর নষ্ট করিয়া, তবু আমোদের শেষ হয় না, অনীতি কাণ্ডের অন্ত পায় না। সুরার স্রোত, গুলির তুফান, তরঙ্গে তরঙ্গে তাক লাগিয়া যায় ; অথচ সুরা-নিবারক, গুলি নিবারক, ইত্যাদি ইত্যাদি,—কত সভা, কত বক্তৃতা, কত ঘটা,—হরি, হরি ! হায়, হায় !

এখানকার শিক্ষাও অপূর্ব্ব শিক্ষায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ কি ভাবিয়া ওরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব তাহারাই জানে। কিন্তু আমরা কি ভাবিয়া সেরূপ শিক্ষা ইচ্ছা ও আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা তাহা জানি না ! শিক্ষাস্থলে মধ্যবিত্তের প্রধান উদ্দেশ্য, চাকুরীযোগে অর্থলাভ ; আর ধনিসন্তানের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রজা-হায়রাণি পক্ষে প্রচুর মামলাবাজী বুদ্ধি আদায় করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-উপাধির চটকে আত্মদৌরাত্ম্যের উপর পরদা ঢাকা দেয়াও বটে। এ দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য,প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ গুণ

ও জ্ঞান শিক্ষা নহে ;—উদ্দেশ্য সাধারণতঃ, চাকুরীর বাজারে চটক-লাগান উপাধিরূপ উচ্চ ট্রেডমার্ক হাত করা।

এ হেন শিক্ষার আকরভূমি আমাদের সর্ব্বসাধের বিশ্ববিদ্যালয়, বিপুল মহিমা তাহার বলিব কত? চাই উচ্চ শিক্ষা, লও উচ্চ শিক্ষা ; —কিন্তু ফল? বালক অকালে বৃদ্ধ, রুগ্নশরীর, ভগ্নমন ; বুদ্ধিবৃত্তি কলিকায় কীটদষ্ট, কুটীল মন্থনে কুঞ্চিতকেশর ছিন্নপত্র, পরিণাম নষ্ট এবং শুষ্ক সটায় ম্রিয়মাণ। দেখিয়াছিলাম, বালকবুদ্ধির সে প্রভাতোদয়,—কি রমণীয়,কতই আশাপ্রদ; কিন্তু হায়,মধ্যাহ্ন না হইতেই তাহাতে রাহুর গ্রাস, গ্রহগ্রস্তে অকালে অস্ত ; সেই আশাপ্রদ এমন প্রভাতালোকের কি না শেষে এই পরিণাম, অনেক আশায় অনেক ছাই! বাল্যের সে প্রখরবুদ্ধি, যৌবনে এখন জুজু, বয়সেতে জড়প্রায় ; বাল্যের সে বিপুল আশা অনাস্থাসাগরে এখন নিমজ্জিত ; বাল্যের সে বিপুল উদ্যম, বিপুল উৎসাহ, জড়িমাকবলে এখন কবলিত ;—আগু পাছু কালের তুলনে কে বলিতে পারে যে এই সেই, বরং মনের খেদে ইহাই বলিতে হয় সেই আর এই! আর তোমার পাঠ্য এবং পরীক্ষা?—পাঠ্য একে বিজাতীয়, তায় ভারের ভরে ধোপার গাধায় হারি মানে ; পরীক্ষা অপেক্ষা বরং ফাঁশির আসামীরও কপাল ভাল, যে জ্বালা যন্ত্রণা হউক একেবারে মিটিবে! রহিয়া রহিয়া এ ঘন দহন-জ্বালা কেন? বৃদ্ধও সে ভারে পেষিত এবং এ ঘন দহনে বিলুপ্ত-জীবনী হইয়া যায়, বালকের তো কোন্ কথা? তথাপি যে বালক বাঁচে, সে কেবল বাল্যসুলভ স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা গুণে। উচ্চ-শিক্ষাই বটে! শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনীশক্তি ও মনীষাশক্তি, উভয় শক্তির স্ফূর্ত্তিসাধন। কিন্তু যে শিক্ষার বিপরীত ফলে উদ্দেশ্য যাহা তাহাই যদি সর্ব্বাগ্রে পীড়িত পেষিত ও দলিত হয়, সে শিক্ষার প্রয়োজন? এরূপ উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা নিচুশিক্ষা বা অশিক্ষা সহস্র গুণে ভাল ; অন্ততঃ তাহাতে তদুভয় শক্তির বিলোপাশঙ্কা নাই, অন্ততঃ তাহারা তাহাতে স্বতঃ সমুজ্জ্বল হইয়া স্বীয় অভাব হয়ত কখনও পূরণ করিয়া

লইলেও লইতে পারে। কিন্তু যেখানে পীড়ন ও পেষণে মূল বিদলিত এবং দগ্ধ, সেখানে কোন্ আশা তোমার ঠাঁই পাইতে পারে, বল দেখি? তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত ছাত্র?—জীবনশূন্য মনীষাশূন্য হট্টগোলপাকানে, ছন্ন জীবন্ত অভিধানাতিরিক্ত নহে;—মানসিক শক্তি বিষয়ে চোখে-ঠুলি ঘানির গরু! মানুষ কোথায় মানুষ হইবে, এবং শিক্ষা যে সে মানুষ হওয়ার সহায়তা করিবে, তা না হইয়া উল্টা উৎপত্তিতে কি বিষম পরিণাম!

কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে দৈহিক বলচর্চ্চা সমপ্রয়োজনীয় সত্য বটে, কিন্তু এরূপ পরিপেষণের পরে তাহা গোদের উপর বিষফোড়া। পরিমিত পরিমিতে উভয় উভয়ের সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু একের অপরিমাণে অপর জুটলে, একের দ্বারা ক্ষীণীকৃত আয়ু আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়! ইহার পরও ব্যায়ামচর্চ্চা? মনে মারিতেছ সেই অনেক, আবার প্রাণেও মারিবে! এরূপ মানসিক শ্রমের উপর অতি অল্প ব্যায়ামই শোভা পায়। যাহারা মানসিক শ্রম অত্যন্ত বেশী করে,তাহারা শারীরিক চর্চ্চা বেশী করে না; করে না, করিতেও চায় না এবং করে না যে সে ভালই করে; করে না বলিয়াই বাঁচিয়া থাকে, নতুবা বাঁচিত না।

কিন্তু এরূপ শিক্ষা ও পরীক্ষা আসিল কোথা হইতে? কেহ করাইতেছে মতলববাজীতে, কেহ তদনুগমন করিতেছে বোকামীতে। বোকামীর কথা বলিব কত? বাঙ্গালাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালীর দ্বারা পরিপালিত, অধিকাংশভাগে বাঙ্গালীর দ্বারা শাসিত, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় বাঙ্গলাভাষার দেখা নাই। প্রথম কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্য গুণ ও জ্ঞান, ভাষা তাহার বাহক; কিন্তু এখানে বিজাতীয় ভাষায় সমস্ত নিহিত, আর সেই বিজাতীয় ভাষায় প্রবেশ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষাকাল পর্য্যন্ত ব্যয়িত হয়; সুতরাং সে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন গুণজ্ঞানে শিক্ষা হইতেই বা পারে কতদূর, মনীষাই বা তাহাতে খেলিবে কি এবং ফলের আশারই বা তাহাতে কি সম্ভাবনা হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, যে জাতির দেখাইবার উপযুক্ত ভাষা নাই,

সাহিত্য নাই, শিক্ষা নাই, তাহারা সর্ব্ববাদিসম্মতিতে বর্ব্বর ও বন্য। কিন্তু হায়, এ জাতি এমনই অধঃপতিত ও নির্ঘৃণ যে, সে অভিমানটুকুও ইহাদের মনে স্থান পায় না! ভাষায় যদি সত্য সত্যই কিছু না থাকে, তথাপি এই জাতিয়ত্ব অভিমান, এই আত্মাভিমানের খাতিরেও তাহার চর্চ্চা ও প্রবর্ত্তনা বিধেয়। কিন্তু বাঙ্গালাভাষা সত্য সত্যই সেরূপ সার-শূন্য নহে; বিশেষতঃ কথা আছে, প্রয়োজনেই পূরক-উৎপত্তি হয়। কিন্তু কাহাদিগকে বলিতেছি,—যাহাদের, যে বাঙ্গারামসম্প্রদায়ের কর্ম্মদোষহেতু এই পরিচ্ছেদের অবতারণা? দুর্ভাগ্য বালক-জীবনের প্রবেশপথ বস্তুতঃ কি শোচনীয়,—একে এই বিজাতীয় ভাষা, তাহার উপর বিষম চাপ, তাহার উপর সেই কঠোরতা, কঠিনতা, অস্থিরতা এবং উন্মাদ! এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব! ফলতঃ এরূপ অপক্কমতি, অপরিণামদর্শী অপকারক শিক্ষাস্থলী সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেলে, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

তাহার পর শিক্ষার অবলম্বনীয় পাঠ্য পুস্তক দেখ। যে সকল গ্রন্থ অভিনব, সারগর্ভ বা শিক্ষাদয়ক, তাহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ অতি অল্পই এবং সে সকলের খবরও বড় থাকে না; সুপারিশ, আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতের বা নিজের নিজের ছাই পাঁশ ভস্ম, অপাঠ্য গ্রন্থনিচয় তৎপরিবর্ত্তে পাঠ্যস্থলে নির্ব্বাচিত; সুতরাং পাঠ্য বিষয়ও, কেবল শ্রমসাধ্য ও ভারভূত নহে, আবার মেকি! তাহার পর শিক্ষা;—প্রথমতঃ শিক্ষকের সহ সম্বন্ধ দেখ, যে হিন্দুবালকের নিকট একসময়ে গুরুভক্তি মহাব্রত ছিল, শিক্ষকের গুণে এখন সেই গুরুর সঙ্গে দাকুমড়া বা সাপে-নেউলের সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাকার্য্য; শিক্ষকের অভিপ্রায়, যে কোনরূপে ছাত্রকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওন; ছাত্রের অভিপ্রায়, যে কোনরূপে উত্তীর্ণ হওন; শিক্ষক নোট লিখিয়া দিতেছে, বালক নোট মুখস্ত করিতেছে, শেষে পরীক্ষাস্থলে তাহা উগরাইয়া খালাস এবং সেই খানেই শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষানবিশের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ; সুতরাং শিক্ষা বিষয় ফাঁকি! তাহার পর পরীক্ষা; নির্ব্বাক্ তিরস্কার ইহার একমাত্র উপযুক্ত বর্ণনা;

বলিতে কি এখানে পরীক্ষা ভণ্ডামি! তাহার পর শিক্ষিতের ভাবী ফল?—শিক্ষা-গুরুরা প্রায়ই জগতের অদ্বিতীয় নিউটন, সেই নিউটন-গণের কাছে আমার শিক্ষা; তাহার পর আমি নিজে বিদ্যোপাধির চরম সীমায় উপস্থিত; ইহার পর আবার কি? বিদ্যাসমুদ্রের পর পারে উপনীত, অতঃপর আয়েস আরাম; সুতরাং ভাবিকলে ষণ্ডামি! অতএব যাহার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত বোকামী, মেকি, ফাঁকি, ভণ্ডামি ও ষণ্ডামি এই কয়টি পর পর পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট; সে শিক্ষা যে কিরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না।

আর একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিক্ষাবিভাগে এত অসংখ্য নিউটন, তথাপি কিন্তু এমন কোন একটি নিউটনকে দেখিতে পাই না যে, চোখে-ঠুলি ঘানির গরুর স্বভাব ভুলিয়া বাঁধা পথের বাহিরে যাইতে পারগ হয়। ইংরেজ নিউটনগণের কথায় দরকার নাই। তোমার দেশী নিউটন? চিত্ত ও বুদ্ধিপ্রসূত এমন কোন গণনীয় অভিনব কার্য্য দেখি নাই, এই বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কোন অভিনব গণনীয় গ্রন্থ দেখি নাই, যাহা শিক্ষাবিভাগের কোন নিউটনের দ্বারা রচিত বা সম্পাদিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু গণনীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই শিক্ষাবিভাগের বাহিরে। ইহা দ্বারা নিউটনগণের নিউটনত্বের বিষয় কিরূপ অনুমান হয়? তবে কি না ইহারা, পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় চলিত হইবার আশায়, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ অপার এবং অসংখ্য সংখ্যায় লিখিয়াছে ও লিখিতেছে, ইহা সত্য! যে দেশের বিদ্যাবুদ্ধির সীমা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে অথবা অপাঠ্য উপন্যাসে, এবং কর্ম্মসীমা সেই সকলের প্রণয়নে, সে দেশের ভাগ্যে আশা করিবার বিষয় অতি অল্পই! কোন নিউটনকে আবার এমনও বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন অপেক্ষা, বাৎসরিক রিপোর্ট লেখা অতি কঠিন এবং মহৎকাজ; বলা বাহুল্য যে, ইহারাও প্রাণ ভরিয়া বাৎসরিক রিপোর্ট লেখায় উপর

জীবন মন উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই! শিক্ষার উপরেই, কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, কি বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ, কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক, সমস্ত জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। সেই শিক্ষাদায়ক বিভাগ যেখানে এরূপ দশায় দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেখানে আর কি অধিক ভাগ্য, সৌভাগ্য আশা করা যাইতে পারে; বা সেখানে আর অধিক বক্তব্যই কি থাকিতে পারে?

এই অপূর্ব্ব শিক্ষাস্থলে শিক্ষা লাভ করিয়া, বালক যখন শিক্ষালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তাহার কি আত্মিক কি সাংসারিক,উভয় জীবনই কর্ষণ অভাবে এবং নিয়ত বিষম প্রতিকূল কারণের সংঘর্ষে নিদারুণ মরুকান্তার সদৃশ হইয়া উঠে। প্রায় এমন উষরত্বে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বহু কর্ষণেও আর তাহা হইতে ফসল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। আমার সৃষ্টি কি জন্য,কোথা হইতে, আমার কর্ত্তব্য কি, কি করিতে এ সংসারে আসিয়াছি, কি কর্ম্ম করিতে আমি ক্ষমবান্, কর্ম্ম আচরণের প্রয়োজন প্রকরণ ও পরিণাম কি, অথবা কর্ম্ম কাহাকে বলে, সে সকল বিষয়ে একেবারে ভ্রূক্ষেপশূন্য; জ্ঞানশক্তি, স্বেচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি স্পন্দহীন এবং উদ্ভাবনী শক্তি সমূলে দগ্ধ; এ পৃথিবী, এ সংসার যে কেবল আহার বিহারের স্থল নহে, আরও কিছু আছে, সে বিষয়ে নিরতিশয় অন্ধ। এ দিকে প্রবেশদ্বারে তাহার ন্যায় অনুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের দ্বারা সংগঠিত উন্মত্ত নব্য সামাজিকতা এবং সেই সামাজিকতার উন্মত্ত শাসন। প্রাচীন সামাজিকতার প্রতি ইহারা কুঞ্চিতনাসিকায় বিমুখ ও শূন্যসম্বন্ধ, সুতরাং তাহার সংস্পর্শে যাহা কিছু সাম্যসাধন সম্ভাবনা ছিল তাহাও বিলুপ্ত। অন্য দিকে প্রাচীন সামাজিকগণ তাহাদিগকে ছাড়িতে না পারিয়া ও কোলে টানিতে গিয়া, সেই সূত্রে ও সঙ্গদোষে তাহারাও বহুপরিমাণে অধঃপাতগত হইতেছে। উন্মত্ত শাসনের ফলও উন্মত্ত হইবে না ত কি হইবে? এই সকল কারণ হেতুই প্রধানতঃ পূর্ব্ববর্ণিত অদ্ভুত লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্রের উৎপত্তি। প্রাচীন সামাজিকতার নাম ধরিয়া,

এখনও যাহারা হিন্দুনামে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারাও আর হিন্দু নহে; মুখে হিন্দু, মনে দিশাহারা, প্রকৃতি দৈন্যতায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যাহা তাহা অনেক দিন বিগত; তাহার যে বহিরাবরণ টিকিদারেরা এতদিন ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও এখন দগ্ধ; এখন তাহার বীভৎস দৃশ্য ও চিতাভস্ম মাত্র লোকের অবলম্বন হইয়াছে; সে চিতাভস্মও যে ব্যবহৃত হয়, সে কেবল আত্মবিকৃত বদনকে আর একরূপ করিয়া দেখাইবার জন্য। হিন্দু হিন্দুয়ানীবহির্ভূত হইয়া করিতেছে সমস্ত, অথচ চক্ষু ঠারিয়া সকলই ঢাকা দিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; আবার অনেকের হিন্দুয়ানী আচরণ কেবল লোকরক্ষা ও আইনরক্ষার খাতিরে! আর নব্যগণ, কি হিন্দুয়ানী কি যে কোন ধর্ম্ম বা শ্রেণী, কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না; অথবা যদি কেহ রাখে, তবে সে সৌখীন ব্রাহ্মগিরিতে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ অন্য ধর্ম্মে দ্বেষ, পরনিন্দা, পিতৃপুরুষনিন্দা, আত্মঘোষণা ও আত্মগৌরব, সুতরাং তামসিকতাই প্রধান বিভূতি। আপন উৎপত্তিক্ষেত্র নরকে পরিণত করিতে এমন আর দুইটি নাই। আর আত্মঘোষণা, আত্মগৌরব কেমন যেন একটা আমাদের জাতীয় স্বভাব,—এমন কি মাতৃভাষা বাঙ্গালা না জানিলে বা জানি না বলিয়াও এখানে আত্মগৌরব করিতে পারা যায়! মনুষ্যত্ব, বীরত্ব এবং সভ্যতা এখন দর্জ্জীর হাতে। বাঙ্গারাম হ্যাটকোট ও চুনাগলী সাজে সাজিয়া ভাবে, আমি কি সভ্য, কি ভব্য, কি মানুষ, কি বীরপুরুষ! বীরপুরুষই বটে! বাপুহে, বীরত্ব তোমার আইন আদালতে, বল তোমার মিমোরিয়ালে। মারিবে তুমি, নালিশ করিব; তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিবে, নালিশ করিব; ইংরেজ তুমি গালি দিবে, ইস্তফা করিব; জুলুম করিবে, মিমোরিয়াল লিখিব। পাহাড়িয়া কুকুর নির্ব্বিবাদে মারি খায়, কিন্তু বিশ হাত অন্তরে তাহার খেউ খেউ শব্দের ধূম বড়! হায় হায়, সেই না জানি কেমন দিন, যে দিন ভারতসন্তান বিজাতীয় বাহ্যিক অশন বসন, চাল চলনের মাথায় ঘৃণাকুঞ্চিতবদনে সগর্ব্বে পদাঘাত

করিয়া, অগ্নিদীপ্ত, বিদ্যুৎপরিচালিতবৎ, তেজে ও সাহসে, সারল্য ও বল সংমিলিত করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে শিখিবে; এবং 'রোদনং বলং' ভারত হইতে তিরোহিত হইবে।—বৃথা স্বপ্ন, সে দিন এখনও অনেক দূরে! সে যাহা হউক, ইহার পর এক শত কি দুই শত টাকা বেতনভোগী বা ডিপুটীবাবু হইতে পারিলে ত আত্মগৌরবের কথাই নাই। সমাজমধ্যে কি ভয়ঙ্কর আত্মগৌরবের ঢেউই খেলিতেছে,—যে শত টাকার মালিক সে দশটাকার মালিকের সঙ্গে কথা কহিবে না, যে সহস্রপতি সে শতপতির সঙ্গে, যে জমিদার সে মধ্যবিত্তের সঙ্গে, যে রাজা সে জমিদারের সঙ্গে, যে চাকুরে সে অচাকুরের সঙ্গে, যে বড় চাকুরে সে ছোট চাকুরের সঙ্গে, কোনমতে সদ্ভাব করিবে না। কেহ কেহ বা পদপ্রাধান্য ও গৌরব অনুসারে আহ্বানার্থে,বাড়ীতে ছোট বড় মধ্যম মোড়া চৌকী প্রভৃতিও রাখিয়া থাকে। এ সকলের উপর আবার সবারই ইচ্ছা, ছোট লোকেরা ছোট থাকিয়া পশুপালের ন্যায় দাসপাল রহুক। এই ত জাতীয়ত্ব ও জাতীয় সুসংমিলন, অথচ ইঁহারা সকলেই ভারত উদ্ধারের প্রধান পাণ্ডা! সমাজে যখন স্ব স্ব গৌরব হেতু সকলেই পৃথক্ পৃথক্, এক অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবপূর্ণ, তখন কখন পরস্পরের প্রতি কার্য্যসাধক সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে পারে না। তবে কিন্তু ইহার মধ্যে একটি মাত্র মহাতীর্থ আছে, যথায় সকলের সমান সমবেত হেতু যা কিঞ্চিৎ সুমিলনের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। সে মহাতীর্থ?—সাহেবের রাঙা পদ! বাঙ্গারাম, উহা তোমার গয়া-তীর্থ এবং এ তীর্থের এমনই মহিমা যে, এখানে ছোট বড় সবাই ভাঙ্গিয়া সমান গতি প্রাপ্ত হয়। চাষা, ধনী, মধ্যবিত্ত, রাজা, ফকীর, চাকুরে, অচাকুরে,যিনিই যেমন ছোট হউন বা যিনি যতই বড়ত্ব জাহির করুন, এ পদপঙ্কজে কিন্তু সবারই সমান গতি, সমান মুক্তি। এই অপূর্ব্ব তীর্থই ভারতীয়ের পক্ষে এখন যাহা কিছু বর্ত্তমান একতাসূত্র! রুদ্রদেব, তুমি কোথায়! কল্কিদেব, আর কত দিন?—এ অপদার্থের দল আর কতকাল ধরিয়া এ পৃথিবী কলঙ্কিত করিতে থাকিবে?

ভাল, সে যাহা হউক, আর এক বড় আশ্চর্য্য! ছন্ন এ পদদলিত জীবনসমষ্টির ভিতর এত আত্মগৌরব, এমন সাহেবানা, এমন খোষ মেজাজী আসে কি করিয়া! জগতে যাহার সুখের কিছুই নাই, প্রতিপদক্ষেপে যাহার নিগড়-ঝঞ্ঝনা, শিওরে যাহার বিনামা টাঙান, স্বদেশে থাকিয়াও যে অপরিচিত ঘৃণ্য বিদেশীর অধম; আগে ভাবিতাম, কেমন করিয়া সে মুখে এত হাসি, এত আমোদ, এত আত্মগৌরব আসে, কেমন করিয়াই বা সে মুখে ভাত উঠে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তদপেক্ষাও গুরুতর মর্ম্মাবনতির কথা আছে, যে কথার তুলনে সে সকল কথাত তুচ্ছানুতুচ্ছের মধ্যে পড়িয়া যায়। তবে কথাটা কি,যে কোন বিষয় যতই ক্লেশদায়ক হউক, বহুদিনের অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তাহাতে ততটা ক্লেশ বোধ থাকে না বা অন্য ধিক্কারবুদ্ধিও বাধা বড় দেয় না। বাঙ্গারাম, আত্মগৌরবেরও ব্যবহার আছে; কিন্তু সেই আত্মগৌরবের, যাহা সর্ব্বদাই বিনতের নিকট বিনত থাকে,কেবল উদ্ধত দেখিলেই উন্নত হয়, এবং শ্রেষ্ঠতা যাহার কেবল এক দুঃসাধ্য কার্য্যসম্পাদনে প্রকাশ পায়। সেই না জানি কেমন দিন, যে দিনে ভারতসন্তান সে আত্ম-গৌরববোধে প্রবুদ্ধ হইবে; পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবে; ধনী নির্ধনের চক্ষুজল মুছাইবে, নির্ধন ধনীর পৃষ্ঠবল হইবে, দরিদ্র এবং রাজা একার্থসংযুক্ত হইয়া জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। কিন্তু এখানেও আবার সে দিন এখনও অনেক দূরে! সে দিন একটি জমিদার আমাকে বলিল,—প্রজার প্রতি ভদ্রতা দেখাইতে যাওয়া বা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, কেবল অনর্থক প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র, 'দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পোষা।'

এক্ষণে আর এক বার ভারত-ভরসাগণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখ। বৃদ্ধ, অৰ্দ্ধবয়স্ক এবং যুবা, বর্ত্তমান সমাজে ইহারা কে কি রকম তাহা উপরে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের কর্ম্মকারিত্বের বিষয় একবার আলোচনা কর। পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ বা প্রাচীনের শিক্ষা-নুযায়ী জীবন মিথ্যার আধার, মিথ্যাই উহার ভিত্তিভূমি। ঐ শিক্ষার

স্থূল মর্ম্ম, আত্মপ্রকৃতিতে আত্মঘাতী হইয়া, যখন যে দিকে যেরূপ দেখিবে, তখন সেইরূপে চলিয়া নিজের কাজ সাধিয়া লইবে। এ বড় দুরন্ত শিক্ষা! কিন্তু সহজ দৃশ্যে ইহা বড় মনোহর উপদেশ, এবং ইহাতে আপাততঃ সুখও অনেক দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, শয়তান যদি মিথ্যাকে এরূপ লোভনীয় আবরণে আবৃত না করে, সত্য হইতে যদি তাহার বেশী বাঞ্ছনীয় মূর্ত্তি দেখাইতে না পারে, তবে সত্য হইতে লোক ভুলাইয়া আত্মপথে লইবে কি করিয়া। দৃশ্যতঃ সত্য হইতে মিথ্যার পথ বেশী লোভনীয় হইবারই কথা। সত্য যাহা তাহা স্বয়ং নিত্য, ক্ষয়-রহিত, অপরিবর্ত্তনীয়; যথানিয়মে যথাকালে ও যথাফলে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, কাহারও অপেক্ষা করে না; সময় অনুসারে বা লোক অনুসারে মূর্ত্তিও পরিবর্ত্তন করে না। সত্যই সকলের অবলম্বনীয়, সত্য কাহাকেও অবলম্বন করে না। কিন্তু নানা মায়াধারী শয়তানের ভাব অন্যরূপ। উহা অবিকল গবর্ণমেণ্টের প্রলোভক রোডসেসের রাস্তার ন্যায়; সহর হইতে যখন বাহির হও, তখন কেমন বাঁধান রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুই ধারে নিবিড় গাছের আলি। তাহার পর যত অগ্রসর হইতে থাক, তত ক্রমে বাঁধা ঘুচিয়া কাঁচা, কাঁচা ঘুচিয়া ময়দান, গাছের আলি দূরে গত, ক্রমে উচু নিচু, পরে ধূলা কাদা, পরে কাঁটাবন, শেষে খানা ডোবা; পথিক হাত পা ভাঙ্গিয়া, কাঁটায় পড়িয়া, পথ ভুলিয়া, শেষে নিরাশ্রয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া ব্যাকুলিত। শয়তানের পথও অবিকল সেইরূপ ঠিকানায় লইয়া উপস্থিত করিয়া দেয়। অৰ্দ্ধবয়স্কের জীবনও মিথ্যার উপর নির্ম্মিত, কিন্তু মিথ্যার এখানে চূড়ান্ত ভাব; মিথ্যা ক্ষিপ্তবৎ, আত্মশোণিত আপনি পানে রত। সুতরাং ইহার ফলাফলের বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। তবে কি এ পৃথিবীতে ইহাদের অস্তিত্ব অনর্থক? তাহা নহে; এ পৃথিবীতে যে বস্তু স্বীয় দোষে বা যে কোন কারণে যতই হেয় অবস্থায় নিপতিত হউক, একেবারে অনর্থক কেহ যায় না। ঈশ্বর শয়তানকে দিয়াও সতের উৎপত্তি করাইয়া

থাকেন! বাঞ্চারাম, ইহা বোধ করি জ্ঞাত আছ যে, ক্ষেত্রের শক্তি একবার লোপ হইলে, তাহার সেই শক্তি পুনর্ব্বার উদ্দীপনে ভাল ফসল উৎপন্ন করাইবার জন্য ভূমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয়। সার সাধারণতঃ অব্যবহার্য্য ময়লামাটি ও পরিত্যাগযোগ্য বস্তু পচিয়া হইয়া থাকে, এবং সেই ময়লামাটি প্রভৃতি আবার যত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য হয়, সারও তত উত্তম হইয়া থাকে। ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে উক্ত অর্দ্ধবয়স্কেরাও সেই উত্তম সারনির্ম্মায়ক উপকরণসমষ্টি। ভারতের ভাগ্যে যে একদিন মহান্ সৌভাগ্যের উদয় হইবে,ভারতক্ষেত্রে আবার এক দিন যে অতিশয় সুফসল জন্মিবে, তাহা উহাদিগকে দেখিয়া স্বচ্ছন্দে নিরূপণ ও আশা উভয়ই করিতে পারা যায়, কারণ মনুষ্য-মণ্ডলীতে উহাদিগের ন্যায় নামের অযোগ্য অপকৃষ্ট জীবন ভূভারতে আর নাই। পুনশ্চ, যে স্থান যত হীনতায় নামে, সে স্থান হইতে তত মহত্ত্বের সূত্রপাত হয়।

নব্যের জীবন এই মিথ্যার প্রতি বিরক্তি ও তৎসহ সংগ্রামভাব, অথচ এখনও সত্যের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যে সত্য, তাবৎ বিধর্ম্মী বস্তুকে আপন আয়ত্তে আনিয়া ও নিয়মে ফেলিয়া তাহাদের বিধর্ম্মী গুণকেই প্রকারান্তরে বৈচিত্রময়ী শোভার আধার করিয়া, অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে, এখনও ইহারা সে সত্যের দেখা পায় নাই। তদভাবে, বিধর্ম্মী পদার্থনিকর, আয়ত্তক-শাসনশূন্যে, দ্বন্দ্বঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছে; আকর্ষণে আরও বহুবিধ পদার্থ আসিয়া তাহাতে সংযোজিত হইতেছে; অথচ সংযোজনে দ্বন্দ্ব কেবল ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর করিয়া তুলিতেছে মাত্র। কিন্তু সাবধান, এইরূপ সময়েতেই অনেক বচনসর্ব্বস্ব দুষ্ট গুরুর উপস্থিতি হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই নব্যেরা পূর্ব্বগত দুই শ্রেণীর ন্যায় নিস্পন্দ নহে; তবে গতি এখনও অস্থির, দৃষ্টি অপ্রসারিত, কোন উচ্চ আদর্শ-ভিত্তিও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান মোহপ্রাপ্ত ও আত্মঘাতী অবস্থা হইতে যে আমাদিগকে অবস্থান্তরে যাইতে হইবে, ইহা তাহাদের

অন্তরাত্মার মধ্যে সুপ্তোত্থিতবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রবুদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, কোন্ পথ দিয়া, কিরূপে, তাহার কোন নিদর্শনী আলোক এখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং ইহারা পূর্ব্ব দুই শ্রেণীর কর্ম্ম, অথবা প্রকৃত কথায়, অকর্ম্মসংসারকে আপন কর্ম্মসংসার-রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহারই প্রকারান্তরকল্পিত আদর্শে এবং তাহারই পাঁচ দ্রব্যের পাঁচ মসলা দিয়া, আর এক নূতন দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছে; অথচ মনোমত হইতেছে না,—হইবে কিরূপে? সৎ-ইচ্ছা অসৎ সংমিলনে কবে সফলতা বা কবে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? মনোমত হইতেছে না, আবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে; এইরূপে কোন দিকে কিছুই সাব্যস্ত হইতেছে না। এইই কারণ হইতে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, ইহারা সময়ে সময়ে নানা কার্য্য উপস্থিত করিতেছে; নানা কথা কহিতেছে; আত্মসফলতা, অনুষ্ঠানমাত্রেই গণনা করিয়া, চীৎকারে গগন ভেদ করিতেছে; আবার পরক্ষণেই সকল নিস্তব্ধ, ছায়াবাজিপ্রায় তাহাদের আরম্ভিত সকল কার্য্য ভিত্তি-শূন্য হইয়া কোথায় মিশাইয়া গেল, পশ্চাতে চিহ্নস্বরূপ কেবল অস্পৃশ্য ক্লেদরাশিমাত্র নিপতিত। আবার ক্ষণ বিলম্বে উঠিতেছে, আবার ক্ষণ বিলম্বে ডুবিতেছে;—সৃষ্টিসংবোধক ইন্দ্রধনু এইমাত্র উঠিতেছে, আবার উঠিতে না উঠিতেই ভগ্নরতি কালমেঘে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। ইহারই দৃশ্যমান অভিনয়রূপে দিনত্রয়জীবী সভা-সমিতি, বিবিধ সংস্করণ, বিবিধ বক্তৃতা, বিবিধ অনুষ্ঠান-সূচনা, পরে তুষানল-ধূম, শেষে পৃষ্ঠভাসান, নিত্য নয়নসমক্ষে দর্শকের শোকাকর্ষণপূর্ব্বক যাতায়াত করিতেছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি? তথাপি আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাদের জীবন, পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর জীবনের ন্যায় নিস্পন্দ, তরঙ্গশূন্য, স্বচ্ছ-কাচবৎ এবং অনাস্থাকেন্দ্রশয়নশায়ী নহে। ইহাও প্রলয়বাত্যা-বিতাড়িত নিয়মশূন্য তরঙ্গবিশেষ সন্দেহ নাই এবং দেখিতে যদিও বড় ভয়ঙ্কর, বড় রোমহর্ষণকর; এবং ইহাতে ভুক্তভোগী যাহারা

তাহাদের অবস্থা যদিও করুণা-উত্তেজক; তথাপি তাহা আশাশূন্য নহে। প্রলয়মাত্রেই সৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ।

এতক্ষণ সমাজস্থ: বিভিন্ন লোকচরিত্রের বিষয় আলোচনা করা গেল, এক্ষণে আর এক বার সাধারণ সমাজচিত্রের প্রতি তাকাইয়া দেখা যাউক। মাথামুণ্ডু আর দেখিবই বা কি! আর সে আর্য্য লঘুত্ব গুরুত্ব নাই; আর সে আর্য্য নেতৃত্ব নীতত্ব নাই; আর সে আর্য্য গাম্ভীর্য্য নাই; আর সে আর্য্য নীতি, ধর্ম্ম, বীর্য্য, বল, সাহস, তেজ, অধ্যবসায় কিছুই নাই; সকলই বিগত, সকলই ভূত-সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আগে লঘু, গুরুর নিকট বিনত হইত; এখন গুরু নিজে বিনত হইয়া এবং তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াও লঘুর মন ও নিজের মান রাখিয়া উঠিতে পারেন না। আগে কবিরাজ ছয়দণ্ড নাড়ী টিপিয়া, হাল শুনিয়া, নানা চিন্তার পর তবে রোগীর ব্যবস্থা করিত; আর এখন ডাক্তার বাবু দরজার দুয়ারে পা দিয়াই প্রেসক্রিপ্সন করতঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়া থাকে। ডাক্তার বাবু একটি দৃষ্টান্ত মাত্র; নতুবা সকল হিন্দুসন্তানের সকল কার্য্যেই প্রায় এইরূপ তরলতা ও চপলতা ঘটিয়াছে; স্থির-প্রয়োগ কোন বিষয়েই নাই। আগে বল ঊর্দ্ধে, দয়া নিম্নে থাকিত; এখন দয়া চাটুকারিতা-বেশে ঊর্দ্ধে এবং বল নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে। এখন পুরুষের নাম রমণী, সজনী; স্ত্রীর নাম নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র; মেয়েও মেয়ে, পুরুষও মেয়ে! অথবা পুরুষ মেয়ে, মেয়ে পুরুষ হইতে চলিয়াছে; কি বিপরীত ঘটনা! বাঞ্ছারাম, কেবল স্ত্রীগুণেও ফল ফলে না, কেবল পুরুষগুণেও ফল ফলে না; স্ত্রীগুণ পুরুষগুণ সংমিলন হইলেই ফলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু পুরুষগুণ? তাহার সাহস এবং তেজ এখন তোষামোদে, মান ও চরিত্র এখন আদালতে, আর অধ্যবসায় এখন আত্মধ্বংসনে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অভাব হইলে সুকর্ম্মে আলস্য, আলস্যে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে পাপ, পাপে মৃত্যু; আমাদের সমাজে এখন সেই মৃত্যুর অভিনয় চলিতেছে।

অকর্ম্ম এবং আলস্যে জড়তার বৃদ্ধি হয়, জড়তায় স্ফূর্ত্তি লোপ

পায়, স্ফূর্ত্তিলোপে মানসিক বিকার, মানসিক বিকারে শারীরিক বিকার ও বীর্য্যহানি, শারীরিক বিকারে রুগ্নতা, রুগ্নতায় মৃত্যু। অতএব মনে করিও না যে, তোমার নিত্যরোগ, নিত্য মৃত্যু, কেবল নৈসর্গিক কারণবশে অথবা বাল্যবিবাহ, অথবা বৈধব্যমোচন অথবা কন্‌সেণ্ট আইনের অভাব জন্য সংঘটিত হইতেছে। এ সকল কারণ পূর্ব্বেও ছিল, অথচ লোকে স্বচ্ছন্দে খাইত, স্বচ্ছন্দে থাকিত ও স্বচ্ছন্দে স্ফূর্ত্তির উপর বেড়াইত। দেখ, তোমাদের ন্যায় অবস্থা ও কারণের অভাব যে যে বিজাতীয় জাতিতে, তোমার রোগ ও মৃত্যু সর্ব্বজনীন হইলেও এবং তাহারা সে রোগাদির অধিকার-ভূমির মধ্যে থাকিলেও, তথাপি তাহারা কেমন সে সকলের অতীত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছে! অতএব এমন স্থলে কেবল নৈসর্গিক কারণের দোষ কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নৈসর্গিক কারণ সকলকেই সমান আয়ত্তাধীনে আনিয়া থাকে। দেখিতে পাইতেছ কি, তোমার বীর্য্য ও জীবনী হানি কতদূর ঘটিয়া আসিয়াছে; দুই তিন পুরুষের মধ্যে তোমার আকার ও চেহারা অর্দ্ধহস্তেরও অধিক কমিয়া গিয়াছে, তুমি তোমার দেহের আয়তন এবং পরিমাণে যাত্রাদলের বালকের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছ। বস্তুতঃই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, পরিমাণ দেহের মানুষ দেখা এখন একরূপ আশ্চর্য্য ও নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের এই অপূর্ণ দেহ এবং ক্ষীণ বীর্য্যে আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহারা কতই না গুরুতর দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যত শীঘ্র এবং যে পরিমাণে দেহের হ্রাস সাধন হইয়া আসিতেছে, সেই হ্রাস যদি সেই পরিমাণে অপ্রতিহতভাবে হইতে থাকে, তবে আর কে বলিবে যে বেগুণ গাছে আকর্ষি দেওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হওয়ার দিন অধিক দূরবর্ত্তী? এ দিকে দেখ, সদ্বংশ ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহারা যাইতেছে, তাহাদের স্থান আর পূরণ হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের জনসংখ্যায় যেরূপ ফল দাঁড়াইয়া থাকে দাঁড়াক, কিন্তু আমরা

প্রতি পল্লিতে প্রতিনিয়ত যাহা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আশান্বিত হওয়ার কারণ অতি অল্পই। হায়! হায়! তথাপি, এরূপ বিপ্লববিশিষ্ট দ্রুতপদ ধ্বংসাভিনয় দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। বালক স্বভাবতঃ চপলস্বভাব, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে বালকও এখানে সে চপলতা ত্যাগে, স্ফূর্ত্তির অভাবে যেমন জুজু; বৃদ্ধও তেমনি জুজু। আগে বারোয়ারীপূজা দুর্গোৎসব ইত্যাদি নানা উপলক্ষে, লোকে কতই স্ফূর্ত্তির আধিক্য প্রকাশ করিত; তাহা-দিগের যে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি তখনও ছিল, উহা তাহারই চিহ্ন-স্বরূপ। সুতরাং তাহাদের শরীরও তেমন হীন ছিল না, আহারও ন্যূন ছিল না, ছিল কেবল তাহারা অজ্ঞানান্ধ ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণকারী। আর এখন? হৃত-সুনীতি, ভাক্তনীতির বশ্যতায়, আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি উদয়ের ন্যায় সে সকল আমোদ, সে সকল স্ফূর্ত্তি দূষণীয়। দৈহিক ক্রীড়া বা দৌড়ান পর্য্যন্ত দূরে থাকুক, দ্রুতপদে চলিলেও গাম্ভীর্য্যের হানি ও লজ্জার বিষয় বলিয়া বোধ হয়। স্বাভাবিকী চপল স্ফূর্ত্তি এবং গাম্ভীর্য্যশীল কর্ম্মপরায়ণতা, জীবন সুভাবে অতিবাহন করিতে হইলে, উভয়েরই সমান আবশ্যক। জীবনী শক্তির সহ স্বভাবসম্ভূত স্ফূর্ত্তি যাহা তাহা এখন বিগত; স্ফূর্ত্তি এখন যাহা কিছু তাহা কৃত্রিম, মাদকতায় ও উন্মাদনে উৎপন্ন। স্বভাবসম্ভূত স্ফূর্ত্তির ন্যূনতা হেতুই, কৃত্রিম স্ফূর্ত্তির এত প্রাবল্য এবং আবশ্যকতা। কৃত্রিম স্ফূর্ত্তির ফল হীনতা ও ক্ষীণতা; হীনতায় ও ক্ষীণতায় রোগের উৎপত্তি, রোগে অপর রোগ টানিয়া আনে। কথা আছে, নগর দগ্ধ হইলে দেবালয় এড়ায় না; সুতরাং একের রোগে অপরে রুগ্ন, তাই আজি দেশের উচ্চ নীচ সকলেই এক দহনজ্বালায় সমান দগ্ধ। উপযুক্ত নিয়োগ, শ্রম, অধ্যবসায়াদির অভাবে, ওদিকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নিয়ত অন্নকষ্ট, নানাকষ্ট প্রভৃতিতে রোগ আরও ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। এ সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা যাহা পরিদর্শন করিয়া আসিলাম,

তাহা পূর্ব্বোক্ত জাতীয় হীনতারই প্রায়শ্চিত্তমাত্র। কিন্তু এখন পরিণাম ?

এ ধ্বংসাভিনয়ের পরিণাম বাস্তবিকই বড় ভয়ঙ্কর, বাস্তবিকই বড় রোমহর্ষণকর। ধ্বংসাভিনয়ের যেরূপ প্রবল বেগ তাহাতে এ জাতি, এ লোক, একে একে সকলই সর্ব্বসংহারক মৃত্যু দেবতার অঙ্কগত হইবে। ভারতের ভাবী ভরসা এবং ভাবী নব জীবন যাহা তাহা, ইহাদিগের অতীতে এবং ইহাদিগের চিতাভস্ম হইতে যে অভিনব মানবজীবন অঙ্কুরিত হইবে, তাহাদের হস্তে অবস্থান করিতেছে। ভারত নিশ্চয়ই আবার পুনর্জীবিত হইবে বটে, ভারতে আবার নব জাতীয় জীবনও অঙ্কুরিত হইবে বটে,—যেরূপ আমেরিকায় হইয়াছে, যেরূপ অন্যান্য স্থানে হইয়াছে,—কিন্তু তাহাতে আমাদের এ জাতীয় জীবনের লাভালাভ ? এ জাতীয় জীবনের আমিত্ব তাহা হইলে কোথায় রহিবে ? সে ভাবী জাতীয় জীবনে এ জাতীয় জীবনের সুখের আশা বা হর্ষোল্লাস, আর হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পূর্ব্বস্মৃতিশূন্য পুনর্জন্মে আত্মার নিতান্ত-বিষয়িণী আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ, এ উভয়ই সমান। তবে এখন উপায় কি ?—এ ধ্বংসাভিনয়ের বেগ কি তবে এখনও ফিরাইতে পারা যায় না ? জাতীয় জীবনের আমিত্ব এখনও কি রক্ষা করিতে পারা যায় না ?

কিন্তু আগে একটী কথা। এ ধ্বংসাবর্ত্তের ঘোর তরঙ্গ, এতকালের পর কেবল এই দুই তিন পুরুষ কাল ধরিয়া এরূপ খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে কেন ? কথা আছে জীবন সংগ্রামে যোগ্য জনেরই জয়, অযোগ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথা মিথ্যা নহে। যথায়ই যোগ্য ও অযোগ্যে বিদ্বেষভাব, যথায়ই যোগ্য অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, দেখা যায়, তথায়ই ক্রমশঃ অযোগ্যের ক্ষয়প্রাপ্তি সাধন হইয়াছে। সবলসংঘর্ষে শক্তিসঞ্চালনমূঢ় ক্ষীণ-বলের ক্ষয়প্রাপ্তি, প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদিগের এখানেও সেই সবলসংঘর্ষ—আমাদিগের এখানেও যোগ্যাযোগ্যে সংগ্রাম চলিয়াছে।

একে মানব অকর্ম্মণ্যতা ও অলসতা প্রাপ্ত, তাহার উপরে পুনঃ যাহা কিছু কর্ম্মেচ্ছা ছিল সে ইচ্ছারও গতি উক্ত সংগ্রামে অবরুদ্ধ; সুতরাং কেন না ধ্বংসাবর্ত্তের বেগ খরতর হইয়া দাঁড়াইবে। যোগ্যাযোগ্য সংগ্রাম আরম্ভ হইলেও, যতদিন অযোগ্যের বোধশক্তি কম এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্র তাহার সঙ্কীর্ণ থাকে, সুতরাং স্বীয় জীবনকার্য্যপ্রবাহের পক্ষে যতদিন সে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিতে না পারে; ততদিনও বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানবের জ্ঞান হইতে থাকে যে আমি অযোগ্য, এবং যখন তাহার বিস্ফারিত দর্শনজাত জ্ঞান হইতে সম্ভূত যে কর্ম্মেচ্ছা তাহাও প্রতিপদে অবরুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, অথচ যখন তাহার প্রতীকারে শক্তি সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা উদ্ভূত হয় নাই, তখনই মানবচিত্ত ম্রিয়মাণ এবং অবসন্ন হইতে থাকে; এবং নিতান্ত অযোগ্য হইলে, হয় ত শক্তিসঞ্চালনক্ষমতা উদ্ভিন্ন হইবার পূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়া যায়। পুনশ্চ, এই অবসন্ন ভাবের উপর আবার প্রকৃতিগত স্বীয় পূর্ব্ব বিকৃতি যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই;—আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এই অবস্থা। যাহারা অভিজ্ঞ হইয়াছে, তাহাদিগের হইতে এ ধ্বংসা-বর্ত্তের উৎপত্তি; অনভিজ্ঞ যাহারা, সংস্রবে তাহারা ফলভাগী হইতেছে, যেমন জ্বলন্ত প্রদীপের সংস্রবে অন্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আমরা যে অযোগ্য এবং আমাদের যে কর্ম্মেচ্ছা প্রতিপদে অবরুদ্ধ, তাহা আমরা গত দুই তিন পুরুষ হইতেই বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি; এবং এই কারণেই গত দুই তিন পুরুষ হইতে আমরা এরূপ অবসন্ন, এবং এরূপ নানা কষ্টে ও বিশৃঙ্খলতায় ও নানা দুরবস্থায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি;—কে জানে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যে আরও কি দারুণতর পরিণাম লিখিত রহিয়াছে। বেগ যত আকর্ষণ-কেন্দ্রাভিমুখে আসিতে থাকে, ততই তাহার গতি খরতর হয়; আমরাও যে ধ্বংস-কেন্দ্রের অতি নিকটবর্ত্তী, তাহা ধ্বংসাবর্ত্তের খরতর বেগের দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাই আবার জিজ্ঞাসা

করি, এ ধ্বংসাভিনয়ের বেগ কি তবে এখনও ফিরাইতে পারা যায় না?

ফিরাইতে না পারা যাইবে কেন? যখন দেখা যাইতেছে যে এ ধ্বংসাবর্ত্ত কেবল নৈসর্গিক নিয়মের ফল নহে, মানবের আত্মদোষও ইহাতে বিস্তর; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে যোগ্যাযোগ্য সংগ্রামে বিপৎপ্রতিকার হেতু কর্ম্মপথে শক্তি সঞ্চালন করিতে উদ্যমশীল হইতে পারিলেই আবার নবজীবনীর সঞ্চার হয়, তখন অবশ্যই ইহা নিশ্চয় যে আত্মদোষ পরিহার এবং কথিত শক্তি সঞ্চালনে উদ্যোগী হইলে, সে বেগ ফিরাইতে সমর্থ হইতে পারা যায়। কিন্তু কে তাহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে, কে তাহার পথ দেখায়? কেইবা এ প্রলয়বিক্ষিপ্ত দ্বন্দ্বঘূর্ণিত পদার্থনিকরের মধ্যে নিয়মের সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় এবং কেইবা তাহার নেতা হইবে? সমাজ যখন যথার্থ পথ হইতে গতিচ্যুত হয়, তখন সমাজের মধ্যে যে কোন সাত্ত্বিক ব্যক্তি থাকেন, এবং থাকেনও অনেক তাহাতে সন্দেহ নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে সমাজের জীবনী শক্তির তাৎকালিকী পরিমাণ বুঝিয়া; তাহার জ্ঞানপথে দর্শন কতদূর, আত্মিক শক্তির অবস্থা কিরূপ, এবং অন্তর্দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত, তাহা নিরূপণ করিয়া; সেই অবস্থায় যেরূপ পরিচালনা শুভপ্রদ হয়, সেইরূপে পরিচালন করেন। কিন্তু এ পোড়া দেশের ভাগ্যে কাঠের দেবতাও হা করেন;—এ পোড়াদেশে কখনও তেমন শুভ দিন সংঘটন হইবে কি? এখানে স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা পড়িলে, কে সাত্ত্বিক কে অসাত্ত্বিক, কে হিতৈষী কে অহিতৈষী, কিছুই অনুভব করিবার সাধ্য নাই। যাহাদের উপর অধিক আশা, অধিক ভরসা; সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ বলিয়া যাহাদের আশ্রয় গ্রহণে সফলমনোরথ হইব বলিয়া আশা করা উচিত; দেখা যায়, তাহারাই যেন সতত ও সবার আগে, চখে চখে চারি চক্ষু চাহিয়া, নৃশংস ও নিষ্ঠুর ভাবে, মাতৃভূমির গলায় ছুরিকা প্রদানে অগ্রসর! তবে কিনা আশাতেই মানুষ বাঁচে, আশাই জীবনের পরিমাণ, তাই এখনও একেবারে নিরাশ হইতে পারি না।

যদিই সেরূপ সাত্ত্বিকপ্রাণ পরিচালক মহাপুরুষ আপাততঃ কেহ বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে অবতারিত হইবারও ত সম্ভাবনা আছে; বিশেষতঃ যখন "কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

৩। সাধনা।

সাধনা মাত্রে অসাধুর নিকট যেমন জটিল এবং দুঃসাধ্য, আবার সাধুর নিকট তাহা তেমনিই সরল এবং সুসাধ্য। যে যাহার অধিকার সীমা কখন স্পর্শ করে নাই এবং করিতেও অনিচ্ছুক, সে তাহার সাধনে অপরিমিত শ্রম, ক্লেশ এবং দুঃসাধ্য ভাব নিত্যই অবলোকন করিয়া থাকে। সুমনেও সাধনা দুঃসাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া থাকে এমন নহে, কিন্তু সে যতক্ষণ সাধনাকে দূর হইতে দৃষ্টি করা যায়; নিকট হইলে বা নিকট হইতে থাকিলে, আর তাহার সে দুঃসাধ্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে দুঃসাধ্য ভাবকে দূর আকাশে বিলীন হইতে হয়। সাধনানিচয়ের দুঃসাধ্য ভাব সাধারণতঃ ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার আয়ত্তীকরণে হস্ত প্রসারিত করা না যায়। বিশাল অরণ্য দূর হইতে দারুণ দুর্গমের ন্যায় অবলোকিত হইতে থাকে, বোধ হইতে থাকে যেন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাহারও তাহাতে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই; অথবা পর্ব্বতগণ দূর হইতে বড়ই দুরারোহ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু একবার নিকটে যাইতে পারিলে আর সেরূপ দেখায় না, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে সকলেরই জন্য শত শত প্রবেশপথ পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। মানব মিছা আতঙ্কে অনেক কার্য্যের ধ্বংস করিয়া থাকে। যাহারা আতঙ্কে কার্য্য নষ্ট করে, প্রকৃতি তাহাদের সাধু হইলেও, ফলে তাহারা অসাধুর সঙ্গে সমান। যথায় ফল লইয়া কথা, তথায় সেই ফলের ব্যতিক্রম ঘটিলে, দুষ্ট অসাধু এবং সাহসশূন্য ভগ্নপদ সাধু, এ উভয়ে প্রভেদ রহিল কি? সক্ষম অসাধু আর অক্ষম সাধু, প্রভেদ অতি অল্পই।

যথার্থ সাধু আতঙ্কে ভগ্নপদ হয় না; ঘটনাচক্রে তাহাদের সাধনা সিদ্ধ না হইলেও চেষ্টার ত্রুটি থাকে না, অন্ততঃ সংস্কারের ভাবী সিদ্ধির পথ তাহারা অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে। এরূপ সাধু যাহারা, তাহাদেরই সিদ্ধিমন্ত্র সেই নিত্যশ্রুত অথচ নিত্য-বিস্মৃত মহামন্ত্র—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন।' এ মহামন্ত্র সাধনার মূল, সাধকের সুমনস ভাব; সুমনস ভাবের মূল, সত্যে রতি; সত্যে রতির মূল, নিষ্কাম কর্ম্মানুসরণ অর্থাৎ স্রষ্টার সকাশে আত্মকর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুসরণ। এই সাধনা সম্বন্ধে, যে যে কথা ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কথিত,' জাতীয় জীবনের প্রতিও অবিকল তাহা বর্ত্তে।

কিন্তু মা ভারতলক্ষ্মি, কথা ত সব শুনিলাম, বুঝিলামও সকলই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ কঙ্কাল-মূর্ত্তি, আমি এই রুগ্ন সন্তান; তুমি ঐ রুক্ষকেশা ভিখারিণী, আমি এই অস্থিসার হাড়ের মালা; তুমি ঐ ভগ্নদণ্ড ধূমাবতী, আমি এই ক্ষুধিত 'কা—কা' শব্দ-সম্বল; আমি ভগ্নপদ, ভগ্নহৃৎ, লোলচর্ম্ম, সমলদেহ, উদরান্ন যাহার আকাশে, আহা করিতে যাহার কেহ নাই, পদদলিত করিতে যাহার সবাই আছে—আমি কি করিয়া, কোন্ উৎসাহে, কোন্ সাহসে, দেবি! কোন্ সাহসে সাহসী হইয়া, তোমার সাধনামন্ত্রে দীক্ষিত হই? তোমার যে দিকে যাই, সেই দিকেই নিবিড় মরু-কান্তার; যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই জীবনশূন্য বিকট-মূর্ত্তি কঙ্কালদৃশ্য; আকাশে কাল মেঘ; নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারপুঞ্জ দৃশ্যের দূর প্রান্ত অতিক্রম করিয়া ধাবিত; ওদিকে কাল সমুদ্রের তরঙ্গ-আস্ফালন গভীর গর্জ্জনে গ্রাস করিতে অদৃশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; আমি একাকী, সহায়শূন্য,সম্বলশূন্য; আমি এখন আপনা রাখি, না সাধনারত হই? পরিতাপবিলাপে দিক পরিপূরিত, হাহা-কার প্রতিধ্বনিতে প্রতিনাদিত। কিন্তু শুন, ঐ শুন, ঐ অস্ফুট শব্দ-কল্লোলের মধ্য হইতে ধীর নিনাদে কি ঐ স্ফুট শব্দ আসিতেছে;—নিশীথ শ্মশান, শনিবার, অমাবশ্যা, আকাশে মেঘ বিদ্যুৎ, টিপ্ টিপ্

জলের ধারায় বায়ুতুফানের সন্ সন্ শব্দ; শবের দন্ত কড়মড়ি, কুকুরের খেউ খেউ, শেয়ালের ফেউ ফেউ, কঙ্কাল ঠক্ ঠক্ করিয়া প্রেতগণ বিকট নৃত্য করিতেছে; ডাকিনীর হুঙ্কার, যোগিনীর ঝঙ্কার, অট্ট-হাসিনী সমুণ্ডখর্পর চামুণ্ডামূর্ত্তি গ্রাসব্যগ্র লোল রসনায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; এই স্থল, এই অকাল কাল, মহাসাধন শবসাধনের আর কোন্ সময়? ভয় পাইও না, শব যদি—শবাকারেই শবের উপর বসিও। "মা ভৈঃ মা ভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"। ঐ শুন, ঐ শুন, 'ঐ গগন কম্পিত করিয়া আবার কি দেববাক্য আসিতেছে—"মা ভৈঃ মা ভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা", এবমস্তু। যদি হঠাৎ বিনষ্ট বিপদে আনন্দবান্ হইতে চাও, তবে আবার বলি, বারেক এই ঘোর ঘূর্ণনে শবাসনে বইস। ভয় কি, তুমি জানিতেছ না তুমি সুরক্ষিত? তোমার এক দিকে, "মা ভৈঃ মা ভৈঃ—শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী, হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ শূলধারিণী;" অন্য দিকে "কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" এ পথে তুমি একা নহ! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনবান্ তোমার আগে, এই ভাবে, এ অবস্থায়, এ পথ বাহন করিয়া গিয়াছে;—এ পথে তুমি একা নহ! আরও কি 'আহা,' আরও কি 'উৎসাহ' খুঁজিতেছ? তোমার 'আহা' স্থলে 'সর্ব্বতঃ শূলধারিণী'; 'উৎসাহ' স্থলে বিগত মহাজনগণ। তুমি সৌভাগ্যবান্ যে, এ মহাসাধনাস্থলেও তুমি উপযুক্ত জ্ঞানে আমন্ত্রিত হইয়াছ। 'কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা', এ মহামন্ত্র-সাধকের নিকট স্বয়ং দেবতারাও বিনতশির হইয়া থাকেন;—অন্য আপদের কথা কি কহিতেছ? লঙ্কাপতি রাবণ কুপথচারী হইলেও, এ মহামন্ত্রসাধনবলে স্বয়ং ইন্দ্রকে মালাকর, সূর্য্যকে ছত্রধর করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

দিগ্বিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারে, অদৃশ্যভাবে যে অনর্থসমুদ্র তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সাধনা ব্যতীত তথায় তোমার আত্ম-রক্ষার আর কি উপায় থাকিতে শুনিয়াছ? যে বিপন্ন অবস্থাকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে আত্মরক্ষার জন্য ভীত হইতেছ, তুমি কি জান না

যে তুমি নিজেই সেই বিপন্ন অবস্থা স্বয়ং! যে সাধনাকে বিপন্ন অবস্থার উপর গলগ্রহরূপে অবলোকন করিয়া, তাহাকে হেলনপূর্ব্বক তফাত হইতেছ, তুমি কি জান না যে তাহাই তোমার সে অবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি একমাত্র সেই সর্ব্ব-রক্ষক অর্থকে গলগ্রহরূপে উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞাতে ঘোর অনর্থসমুদ্রের দিকে তোমার কল্পিত অর্থের আশাভ্রমে ধাবমান হইতেছ; বুঝিতে পারিতেছ না যে যাহাকে পরিহার করা তোমার উদ্দেশ্য ও আবশ্যক, তুমি তাহারই করাল বদন অভিমুখে আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ। পথ সহজগম্য,ইহাই তোমার এ পথের প্রলোভন; অধঃপাতের পথ চিরকালই সহজগম্য রূপে দৃষ্ট হয়। যে যে নর আপনার স্বনিহিত শক্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, পরশক্তি সমক্ষে উদ্ধার, সৌভাগ্য বা শুভলালসা করিয়া থাকে; তাহাদিগকে বস্তুতঃ এই অনর্থসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য লালসাবান্ বলিয়া বলা যায়। ইহাদিগের নিকট আত্ম-শক্তিচালনা নিতান্ত দুঃখসঙ্কুলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আলস্য, অনাস্থা, এবং পরশক্তিতে তোমার মুক্তি! আলস্য এবং অনাস্থা কবে কোথায় ভাগ্যের দেখা পাইয়াছে? পরশক্তি!—বোধশূন্য বাতুল, তুমি পরশক্তি-মোহে কেন এতটা মোহপ্রাপ্ত হইতেছ? বারেক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি নিজে কবে কতটা আত্মশুভ সংসাধনান্তে, পরশুভ সংসাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছ? আমি দেখিতেছি, পরশুভ দূরে যাউক, তোমার আত্মশুভই কিছুমাত্র সাধন করিয়া উঠিতে পার নাই, কত রকমেই না তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহারই পূরণ জন্য, হরি হরি! তাহার আবার সম্পূর্ণ পূরণ জন্য তুমি অন্যের নিকট লালায়িত হইয়া ফিরিতেছ! নির্ব্বোধ, তুমি নিশ্চয় জ্ঞান হারাইয়াছ, নতুবা ইহাও কি তোমার নিকট একেবারে অপরিজ্ঞাত যে, তুমি যাহার নিকট সেরূপ লালায়িত হইতেছ, সেও ত তোমার মত মানব? যে নিজের অভাবই পূরণ করিয়া উঠিতে পারে না, সে আবার তোমার অভাব পূরণ করিয়া দিবে? অথবা তোমার অভাব পূরণ

করিবে বলিয়া সেত পৃথক সৃষ্ট হয় নাই! তবে যে তুমি সে লোকে তোমাপেক্ষা কিছু অধিক চটুলতা দেখিয়া থাক, সেও তোমার খরচে। তোমার সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই, তুমি মূর্খ, সে চতুর; তুমি স্বনিহিত শক্তিতে অজ্ঞ, সে স্বনিহিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ; তুমি আপন অর্থ সাধিতে পার না, সে তাহা পারে। কিন্তু তোমার কাণ ধরিয়াও সে যখন তাহার আপন অর্থে সঙ্কুলান বোধ করিতেছে না, তখন তুমি তাহার পা ধরিয়া আপন অর্থ সঙ্কুলান করাইয়া লইবে! বুদ্ধি বটে!—এ বুদ্ধি অপেক্ষা মানবমণ্ডলীতে মূর্খতার অতিসীমা আর কি হইতে পারে? সাধারণতঃ পরের নিকট পরের আশা আর সংস্কৃত কবির জীর্ণ তরুর নিকটে পথিকের আশ্রয় প্রত্যাশা, উভয়ই সমান।—"পথিকহৃদয়ঘর্ম্মং সোঽপি বাঞ্ছাং করোতি।"

মূর্খ বাঙ্গারাম, এমন স্থলে তোমার জমার আশা কোথা? তুমি খরচের খরচে পরিণত! তবে যে পরের সহবাসে ভালর দিকে কিছু কিছু নিজের অবস্থার রূপান্তর দেখিতে পাইয়া থাক, তাহা ভাক্ত; তাহা সে পরের নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা গুণ হইতে তত নহে, যতটা সহবাস গুণ হইতে, এবং কিয়দংশে পরের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরেও বটে। এমন অনেক স্বার্থ আছে যে তাহা যাহার খরচে সংসাধিত হইবে, তাহাকে কিছু অবস্থান্তরযুক্ত না করিয়া লইলে চলে না; কিন্তু যে মূর্খবর্গ তাহাতে প্রতারিত হইয়া এবং ভ্রান্তি মরীচিকায় তাহাতে কেবল নিঃস্বার্থ উপ-চিকীর্ষা বুদ্ধি অবলোকন করিয়া, স্বার্থসাধকের হস্তে অবশিষ্ট আত্মসমর্পণ করে এবং স্বীয় দুঃখমোচন ও উন্নতির নিমিত্ত ক্ষণে-অক্ষণে প্রিয়বচন দ্বারা তাহার মুখাপেক্ষী হয়, তাহাদের তুল্য সারশূন্য হতভাগ্য অধঃপাতিত জীব আর দ্বিতীয় কেহ হইতে পারে না। ইহারও উদাহরণের জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না; বিধাতার লিপিবশে সমগ্র ভারতবাসী, সমগ্র ভারত স্বয়ং, আজি ইহার জীবন্ত উদাহরণরূপে দর্শিতব্য। আবার যে দিন দেখিবে, ভারতসন্তানগণ পরের তুড়িতে উন্মাদিত, পরের বাঁকামুখে সংশয়িত, পরের তোষার্থে প্রিয়রচিতে বা পরের

দোলায় দুলিত হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে; সে দিন হইতে পুনর্ব্বার ভারতের ভাগ্য ফিরিয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহ আশ্বাসিত হওয়ায় ক্ষতি নাই। এরূপ পরের প্রতি অনাস্থাভাব কেবল দুই অবস্থায় সম্ভব হইয়া থাকে, এক অজ্ঞ অবস্থায়; অপর যখন শয়তান ও শয়তানীর বিরুদ্ধে, অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ কালাগ্নিশিখা আগ্নেয়গিরিহৃদয়বৎ বা প্রলয়-বাত্যামথিতের ন্যায় ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে হৃদয়কে বিলোড়ন করিয়া ফিরিতে থাকে।

প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উদ্ধারপন্থা যাহা, তাহা সর্ব্বদাই ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না। যে কোন পৌরুষ আত্মশক্তি হইতে সম্পাদিত হয়, পরশক্তি দ্বারা হয় না। মোহভ্রান্ত ভারত-সন্তান, যদি নিজের উন্নতি, নিজের অভ্যুত্থান চাও, তবে নিজ অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত কর; পরমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি হইবে? বিধাতা তোমাকে পরপঞ্জর হইতে পরভাগ্যোপজীবী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, বিধাতা তোমাকে স্বয়ংক্ষম স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের অভ্যন্তরে যে সুপ্ত সিংহ শায়িত রহিয়াছে, কপালগুণে যাহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তুমি অনভিজ্ঞ বা বিশ্বাসবিহীন, তাহাকে বারেক জাগরিত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সে সুপ্ত সিংহ একবার জাগরিত হইলে, কি যে করিতে পারে বা না পারে, বাক্যের দ্বারা তাহার অবধি হইতে পারে না। সামর্থ্য যে তাহার কি দুর্দ্দমনীয় এবং তড়িদ্বেগ যে সে সামর্থ্যে কি খরতর, তাহার গণনীয় উদাহরণ কিছু দেখিতে চাও যদি, তবে বারেক জ্ঞানিপ্রবর কার্লাইলের চক্ষে ফরাসিবিপ্লবের শক্তি-লীলায় চিত্ত সমাহিত কর। নিঃস্বার্থ পরহিতকর পরও এক বা বহুল না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহাতে প্রথম মুস্কিল,—কে তেমন নিঃস্বার্থ পরহিতব্যবসায়ী তাহা চিনিয়া উঠা দায়; দ্বিতীয়তঃ পাইলাম যেন তেমন ব্যক্তি, কিন্তু ফল? কতই প্রত্যাশা করিতে পার,—ফল অধিকাংশই ইচ্ছা বা বচনে পরিসমাপ্ত। মহারত্ন হেতু যেখানে সমুদ্রসিঞ্চনের প্রয়োজন, তথায় কেহ উপযাচক হইয়া একটা ঝিনুক দিলে, তাহাতে

কি তোমার সমুদ্রসিঞ্চনের প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে? তবে কিনা তেমন লোক দেখিতে ভাল, শুনিতেও ভাল।

পরশক্তি সর্ব্বদাই সন্দেহসঙ্কুল, নৈরাশ্যাতঙ্কের কালিমারেখায় পরিলিখিত; কিন্তু আত্মশক্তি তেমনি আবার সর্ব্বদাই তদুভয়ের নিরসক। সকল সম্পৎ, সকল সৌভাগ্য, সকল উন্নতি, সকল অভ্যুত্থান, একমাত্র আত্মশক্তি চালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; পরশক্তি হইতে হয় না। এই আত্মশক্তি চালনার জন্যই তুমি এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ। এখন অপরে যদি কেহ তোমার খরচে আত্মস্বার্থ সাধন করে, দোষ আমি স্বার্থসাধককে দিই না; দোষ দিই আমি তোমাকে যে, তুমি কেন তোমার নিজ স্বার্থে অনভিজ্ঞ—তুমিও কেন জমা না হইয়া খরচ হইতে যাও। সে তাহার আপন কার্য্য সাধিতেছে; তুমি তাহা পারিতেছ না; দোষ তোমার, তাহার দোষ কিসে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—সর্ব্বপ্রকারেই! অধমের বলি উচ্চের ভোগে, ইহাই সংসারের নিত্য নীতি। স্বীয় পৌরুষে যে হীনপ্রজ্ঞ, তাহাপেক্ষা অধম আর কে আছে?—কেন তবে তাহাকে গালি দেও? সে পৌরুষবান্, স্বার্থপথে তোমার উপর সে সহস্র কঠোরতা অবলম্বন করিলেও, তাহাকে আমি দোষ দিই না। তুমিও বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থ প্রেরিত, তুমিও মানব হইয়া প্রেরিত, জুজু হইয়া প্রেরিত হও নাই; তোমাতেও স্বার্থের কিছু অভাব নাই। আবার পাছে তুমি বিশ্বকার্য্য হইতে বিমনাঃ হও, এজন্য ঈশ্বর বিশ্বকার্য্য সহ তোমার স্বার্থও এরূপ সংমিলিত করিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তোমার ন্যায়ানুগত সৌভাগ্য এবং সম্পৎ, বস্তুপক্ষে বিশ্বকার্য্য সহ একতায় আসিয়া সম্মিলিত হওয়াতে, তাহারই অংশকলাস্বরূপে অবলোকিত হইয়া থাকে। এই সৌভাগ্য এবং সম্পৎ, স্বীয় স্বীয় জ্ঞানযোগ ও ধারণার উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনুসারে, কেহবা মতিচ্ছন্ন হেতু অনুচিত অর্থে আরোপ করিয়া থাকে; আবার কেহবা ঈশ্বরের প্রীতিলাভস্বরূপ যে স্বার্থ তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া জগদ্ধিতে জীবন বলিদান দিয়াও, তৃপ্তির সীমায় উপনীত

হইতে পারে না। যে জগতে নর-কলঙ্ক ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম; নর-দেবতা পল, শঙ্করাচার্য্যও সেই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে বলে, মহাপুরুষেরাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না; সে কথা সত্য বটে, আবার সত্যও নহে। তাঁহারাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না সত্য; কিন্তু তাঁহাদের সে স্বার্থ দিব্য স্বার্থ; পার্থিব স্বার্থ লইয়া যথায় কথা, তথায় অবশ্যই বলিতে হইবে যে এ মহাপুরুষদিগের যে স্বার্থ তাহা 'নিঃস্বার্থ' পদবাচ্য হয়। মানবীয় কার্য্য যতদূর দিব্য স্বার্থের দিকে লীন, তাহা জগতে সেই পরিমাণে মহত্ত্বের আকর ও কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। সে যাহাহউক, কি স্বার্থশূন্যে কি স্বার্থযুক্তে, সম্পদ ও সৌভাগ্য,তাহা কি দিব্য, কি পার্থিব, কি শয়তানী, যেরূপই হউক, ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে তাহার যে কোনটীই যথাপরিমাণে উপার্জ্জন করিতে হইলে, যথাসম্ভব আত্মশক্তির চালনা আবশ্যক হয়। আত্মশক্তিহীন অকর্ম্মাকে শয়তান যে সেও উপেক্ষা এবং অস্বীকার করিয়া থাকে। দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা সে সমান পরিত্যক্ত ও বিড়ম্বিত হয়! কিন্তু হায়! আমি দেখিতেছি, ভারতসন্তান অকর্ম্মশীলতায় এখন এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন দিকেই ইহার জীবনী শক্তির কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি বা পরিচয় পাওয়া যায় না; সকল দিকেই নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, জড়, পরমুখাপেক্ষী অসার রাশিরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। যে স্বার্থের জন্য জগৎ ক্ষিপ্ত, যে স্বার্থ সমস্ত চরাচরকে উন্মাদিত করিয়া ফিরিতেছে; ভারতসন্তান সে স্বার্থের মোহ উপলক্ষ করিয়াও কার্য্যপ্রবৃত্ত হয় না,—কর্ত্তব্যবুদ্ধির কথাত অনেক দূরে! স্বার্থ এখন ইহাদের কুক্কুরবৃত্তিতে। ইহাদের কপালগুণে, স্বার্থও ইহাদের প্রতি কৃপা বিতরণে দারুণ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতসন্তান এখন কেবল বিশ্বঘাতী নহে, আত্মঘাতীও!

বাঞ্ছারাম, তুমি ভাবিতেছ, প্রকৃতি যখন উত্তরোত্তর উন্নতগামিনী, তখন আমাদের আর বৃথা শ্রম করিয়া ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন কি? পরিণামে উন্নতি ত আছেই আছে। সত্য কথা, প্রকৃতি উত্তরগামিনী

এবং পদার্থ তাবৎও যাহা দেখিতেছি সকলেই উত্তর গমন করিবে; কিন্তু উত্তরগমনও যে অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা জান কি? পদার্থ কথন স্বয়ং পুনর্নির্ম্মিত অথবা পুনঃসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, নবজীবন প্রাপ্তে, স্বয়ং উত্তর গমন করিয়া থাকে; কথন বা অপরের নির্ম্মাণে উপকরণ স্বরূপে বিলীন হইয়া, উত্তর গমন করে। ফল, একে আত্মদীপ্তি, অপরে আত্মলোপ। প্রথম গমন আত্মবানের কার্য্য, দ্বিতীয় গমন অনাত্মবানের কার্য্য। তুমি অনাত্মবান্ ঢিল পাটিকেল নহ। তুমি আত্মবান্ হইয়া প্রকৃতির উপর দ্বিতীয় প্রকৃতি স্বরূপে এবং দ্বিতীয় সৃষ্টিক্ষম-শক্তিসমন্বিত হইয়া যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তাহার সফলতা সাধন পক্ষে কি করিবে? প্রকৃতি হইতে তোমার সেই আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কি করিতেছ? তবে তোমার আত্মলোপই কি পরম পুরুষার্থ? আত্মলোপ যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তাহাহইলে অবশ্য তুমি যে প্রকৃতির উপর নিশ্চেষ্ট আত্মনির্ভর করিয়া রহিতেছ, তাহা ঠিক কাজই করিতেছ। কিন্তু তাহা নহে। তুমি কার্য্যরত হও বা না হও, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য যাহা এবং যাহা সম্পাদন করিতে তুমি প্রেরিত, নিশ্চয় জানিও, তাহা তোমার জন্য আটক হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, কিন্তু তোমার পুরস্কার—তোমার পরিণাম—তোমার শক্তি-ব্যত্যয়ের ফল? অদৃষ্টবাদের উপরে ইহাকে ওঁছাটে অদৃষ্টবাদ, এবং এরূপ আত্মহীনতায় যে শুভাশুভ তাহাকে অক্ষম শুভাশুভ বলা যায়।

মানব যদি আত্মবান্ হয় ও তাহার আত্মস্থান যখন শূন্যের অনু-পাতে না নামে, তখন তাহার যাহা কিছু সক্ষম শুভাশুভ (বলা বাহুল্য যে সক্ষম শুভাশুভই এ জগতে একমাত্র কার্য্যকর এবং উপার্জ্জনীয়) তাহা একমাত্র আত্মশক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তিচালনা হইতে কর্ম্মক্ষমতার উৎপত্তি হয়। কর্ম্মক্ষমতার অস্তিত্ব যথায়, তথায়ই কেবল মানবজীবনকে মানবজীবন বলা যায়; তদন্যতরে ঢিল পাটিকেল। অতএব মানবজীবন সার্থক ভাবে অতিবাহন করিতে হইলে, আমাদের প্রথম প্রয়োজন আত্মশক্তিচালনা।

আত্মশক্তিচালনা সুপথ বা বিপথ গমন, অথবা শুভ বা অশুভের উৎপাদন; এ উভয় কার্য্যেই পটু। কখন কখন বা দুরদৃষ্টক্রমে তাহা সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া, গোষ্পদ ছেঁচিয়াই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া থাকে; অথবা এই দৃশ্যই এ জগতে প্রবল। আত্মশক্তিচালনা স্বয়ং অন্ধ। এ হেতু, ইহাকে সুপথে ও যথাযোগ্য ভাবে চালিত করিতে হইলে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বলিতে গেলে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি উহার উত্তেজক এবং পরিচালক উভয়ই। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব হইলে, আত্মশক্তিচালনা সম্যক উত্তেজিত হয় না; অথবা হউক বা না হউক, উভয়তঃ বা সর্ব্বথা তাহা বিপথ গমন করিয়া থাকে; অথবা ক্ষিপ্তবৎ সুপথ ও বিপথে বিঘূর্ণিত হয়। পুনশ্চ কর্ত্তব্যবুদ্ধির উচ্চেতরাদি ভাব হইতে, উন্নত বা সামান্য ব্যাপারে এবং সৎ বা অসৎ পথে, উহার নিয়োজনাদির পরিমাণ পরিমিত হয়। ঈশ্বরের নিকট আপনার যে কর্ম্মকারকত্ব বোধ, এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে আমি কর্ম্ম করিতে বাধ্য এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থ। ধর্ম্মই আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উৎপাদক, পরিপোষক এবং অবলম্বন, সকলই। ভারতসন্তান, ধর্ম্মেই ভারতের জীবন; এ জগতের আদি হইতে ভারত পুণ্যভূমি, কেবল ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ভারত উঠিয়াছে, জগৎ উজ্জ্বলিত করিয়াছে; আবার ধর্ম্মেরই প্রকারান্তর ব্যবহারে এ জগতে তাহার যাহা কিছু অধঃপতন, তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভারতের প্রাণবায়ু এবং নীতি তাহার চৈতন্য। সেই ধর্ম্ম ও সেই নীতিতে যদি প্রবুদ্ধ না হও, এবং তাহা হইতে ভারতকে যদি চ্যুত কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, অভ্যুত্থান দূরে যাউক, ভারত এক দণ্ডও প্রাণে বাঁচিবে না। দেখ, জগতের যাবতীয় প্রাচীন জাতি একে একে কোন্ কালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারত এখনও, নানা উৎপীড়ন ও নানা বিপৎপাত সত্ত্বেও, আজি পর্য্যন্ত সমান প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছে; তাহার কারণ, ভারতের জীবন যাহা, তাহা একমাত্র নিত্য পদার্থ ধর্ম্মমূলের উপরে

স্থাপিত। ভারতের যখন সকল গিয়াছে, ভারতের যখন পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই, তখনও একমাত্র ধর্ম্মের তর্ক ও তাহার রূপ রূপান্তর আদি উপলক্ষ্য করিয়া, মনের সুখে দিবস অতিবাহিত করিয়াছে। সেই ভারতকে আবার সজীব, আবার অভ্যুত্থান করাইতে হইলে, কেবল একমাত্র নিত্য ও সত্য ধর্ম্ম অবলম্বনীয়; ধর্ম্মকে অবলম্বন ব্যতীত কখন তাহা সংসাধিত হইবে না; মৃতদেহ লইয়া কবে কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে ?

কিন্তু এক কথা, ধর্ম্ম বলিলেই ভাবিও না যে কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, মাথাকুটা ইত্যাদি স্তব স্তুতি; মিথ্যা কহিব না, চুরি করিব না, জিতেন্দ্রিয় হইব ইত্যাদি আত্মসংস্কার; অথবা যেমন আজি কালি যোগের খেয়াল উঠায়, যোগবাতিক ও সর্ব্বত্যাগিতার অনুকরণ; অথবা সর্ব্বত্যাগিতার ভণ্ড ভেকধারী সন্ন্যাস; এই সকল করিলে ধর্ম্মকার্য্য সমাধা হইল, এবং ধর্ম্মের ফল যাহা তাহা মোক্ষলাভ। প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি, তোষামোদ, এ সকলে নির্ব্বোধ মোটা মানুষের কাছে কাজ হইতে পারে, ঈশ্বরের কাছে নহে; আরও আমি তোমাকে সত্য সত্য বলিতেছি, আত্মসংস্কারে কিছু বাহাদুরী নাই; বিধবার একাদশীবৎ— করিলে ফল নাই, না করিলে পাপ আছে; প্রত্যুত তুমি যে আত্ম-সংস্কারের কারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ইহাই বরং আশ্চর্য্যের বিষয়। আত্মসংস্কারে তুমি যাহা হইবে, এবং হইয়া ভাবিতেছ যাহাতে চূড়ান্ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে ও যাহাতে তোমার মোক্ষ হইবে, তাহাইত তোমার স্বাভাবিকী মূর্ত্তি। তবে যে এতদিন তুমি সে মূর্ত্তিতে ছিলে না, তাহা কেবল স্বভাব হইতে এতদিন বিচ্যুত হইয়াছিলে এই মাত্র। এখন যে তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মসংস্কারের দ্বারা সেই আত্ম-স্বাভাবিকী মূর্ত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছ, তাহাতে ত তুমি কেবল তোমার নিজ কার্য্য করিতেছ মাত্র। কিন্তু যিনি তোমাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাকে এই প্রভূত কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি তোমাকে তোমার সেই শক্তি সহ পোষণ করিতেছেন, তাঁহার

জন্য, তাঁহার প্রীত্যর্থে, কি করিয়াছ? তোমার মোক্ষপ্রাপ্তি, তোমার পারলৌকিক শুভ, ইত্যাদির জন্য সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, যে উপায় সকলের অনুসরণ করিতেছ, তুমি জানিতেছ না যে তাহাই তোমাকে তোমার মোক্ষ বা পারলৌকিক শুভ হইতে অনেক দূরে লইয়া ফেলিতেছে! ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি।

আর এক কথা। ধর্ম্মের নামে ও আত্মসংস্কারের দোহাই দিয়া আমাদের এ দুর্ভাগ্যবান্ দেশে আজি কালি, যোগবাতিক ও সর্ব্বত্যাগিতা বা বৈরাগ্যবুদ্ধি, অন্ততঃ সে সকলের বাহ্যাড়ম্বর, হিন্দুসন্তানগণের মধ্যে যেন কিছু বেশী বেশী রকম হইয়া পড়িয়াছে; এবং তদর্থে গীতাশাস্ত্রেরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা কদর্থ বাহির হইতে ত্রুটি হইতেছে না। যে সকল লোক অবস্থান্তরে ও বিষয়ান্তরে হয় ত সম্ভাষণেরও অযোগ্য, তাহারাই যোগের ভেক হেতু দেবতাধিক সম্মানগ্রাহী গুরুপদে বরিত হইতেছে এবং যে হয় ত অন্যত্র বিশেষ সৎকার্য্যেও এক পয়সা ব্যয়ে কাতর, সে গুরুপ্রীতিতে অজস্র অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত হইতেছে না। প্রত্যক্ষ হস্তিমূর্খ স্বরূপ দৃষ্ট হইলেও, যোগের গুরু পরম জ্ঞানী, সিদ্ধ ও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, সত্ত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, এবং মুক্ত পুরুষ, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসিত হইয়া থাকে! যাহারা বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসমন্বিত, যাহারা হয় ত ওকালতি, হাকিমী বা তথাবিধ বিদ্যাবুদ্ধি খরচের কার্য্য সকলে ব্রতী, তাহারা পর্য্যন্ত এরূপ ভ্রমে ভ্রান্ত, এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্! ইহার কারণ কি? উহা একদেশদর্শী বিদ্যা ও একদেশদর্শী চিন্তাচালনার ফল। জানি না, তবে যেন বোধ হয়, এরূপ যোগাদি অপেক্ষা ভক্তিমার্গই প্রকৃষ্ট প্রস্থা; যেহেতু কেবল তাহারই দ্বারা ইহলোক পরলোক উভয়ই সম্যক রক্ষা হইবার পক্ষে সম্ভবতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী দেখিলাম, কিন্তু প্রকৃত কৃতার্থ কাহাকেওত দেখিতে পাইলাম না, সকলেই স্বার্থপূর্ণ ও অল্পবিস্তর ভণ্ড; তবে উহারই মধ্যে কেহ দুই চারি দিন চরিত্রগোপনে সক্ষম হয়, কাহারও

এক দিনেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাঞ্ছারাম, এই সুখদুঃখময় মানুষই সর্ব্বত্র,কোথাও তাহাতে ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে,তথাপি তোমার বিদ্বন্মণ্ডলী এরূপ মজিয়া থাকেন কেন! ইহার আর কোন কারণ দেখিতে পাই না, কেবল একমাত্র নৈরাশ্য, নৈরাশ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে! নৈরাশ্য কিরূপ, তাহা বলিতেছি।

যোগবাতিকের দ্বারা একটা পরিচয় এই যে, হিন্দুসন্তানের চেষ্টা-বৃত্তি ও উদ্যম কিয়ৎ পরিমাণে জাগরিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচয় এই যে, দেশ ও কাল এবং আপনাদের পোড়া অদৃষ্টগুণে সে চেষ্টা ও উদ্যম চালাইবার সহজপথ আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই; হিন্দুসন্তান যে দিকে যাইতে চাহেন, সেই দিকেই রুদ্ধপথ; যে দিকে তাকাইতে চাহেন সেই দিকেই কাঠের জুতা লট্‌কান। কাজেই পথ ও উপায় না পাইয়া, আকুলতায় ও নৈরাশ্যে হিন্দুসন্তান ভাবিলেন যে, ইহ জীবন ত বৃথাই যায়, দেখি যদি অবশেষটায় পরলোকের জন্য কিছু উচ্চ উপায় সংগ্রহ করিতে পারি; বিশেষ শুনিয়াছি, যোগে অলৌকিক ও অপার সামর্থ্য হয় অথচ সে পথে মানবীয় প্রতিবন্ধক কিছু নাই,সুতরাং চেষ্টায় চেষ্টান্বিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। ফলতঃ যোগবাতিকে একটা সুখের পরিচয় এই যে, হিন্দুসন্তানের হৃদয়ে এতকাল পরে উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যাহা তাহা জাগরিত হইয়াছে; তবে কি না তাহা ইহলোকে রুদ্ধপথ দেখিয়া পরলোকের পথে ধাবিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। হিন্দুসন্তান,জাগরিত হইতেছ যদি, তবে বাধা বিপত্তি দেখিয়া নিরাশ হইও না; বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অপরিমিত চেষ্টা ও শ্রম পূর্ব্বক পথ বাঁধিতে না পারিলে পথ কখনও সুগম হয়? আর এটাও নিশ্চয় জানিও, ইহলোককে ভিত্তি করিয়াই পরলোক, ভিত্তিশূন্যে গঠন কখন দাঁড়ায় কি? মিছা ভ্রমে ভুলিও না, জনশ্রুতি ধরিয়া মজিও না, এবং কল্পিত আনন্দের আশায় আত্মবলি হইও না। দেখ, পৃথিবীর এত উন্নতি, এত উপকার, সমস্তই মানুষের ইহলোকবদ্ধ শক্তির দ্বারা সংসাধিত; তোমার যোগশক্তির দ্বারা আজিও পৃথিবীর

এককড়ার উন্নতি বা উপকার হইতে দেখা যায় নাই। আর যদি ঈশ্বরের প্রীতিপ্রাপ্তিই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন ইহলোক ধ্বংসে ও আত্মধ্বংসে এরূপ কঠোরতা? যিনি কীট কীটানুটিকে পর্য্যন্ত ভুলেন না, তোমাকেও তিনি ভুলিবেন না,—মাত্র সৎপথাবলম্বী যদি হও ও মিথ্যাদ্বারা আত্মজীবনের ব্যত্যয় সাধন না কর।

অথবা 'মোক্ষ' 'পরলোক,' এ সকল লইয়াই বা এত ব্যস্ত কি জন্য? কেন মিছা ভাবিয়া আত্মনষ্ট, সকল নষ্ট করিতেছ? তুমি যখন এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে,তখন ডাক বা টেলিগ্রাফের খবর অথবা গোমস্তা বা পাইক পাঠাইয়া বড়ীভাড়া, আসবার ভাড়া, আত্মীয় স্বজন ভাড়া, জনক জননী ভাড়া, আতুঁড় ভাড়া, কাঁথা ভাড়া, মায়ের স্তন্য-দুগ্ধ ভাড়া, এ সকলের বন্দোবস্ত আগে ঠিক করিয়া, তবে কি তোমার এই পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল? কোন অনুষ্ঠানইত হয় নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ত তুমিও কাহাকে চিনিতে না এবং তোমাকেও কেহ চিনিত না; অথচ তুমি যখন নিঃসহায়, নিরুপায়, শক্তিসঞ্চালনমূঢ়, এই জগৎক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলে,তখন কথিত সকল আত্মীয় ও সকল দ্রব্যই মজুত এবং হাতে হাতে সমস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তুমি একটু টুঁ করিলে শত লোক দৌড়িত; আবার শত লোক তোমার উপর এমনই মমতাযুক্ত কেনা গোলামবৎ যে, কোটীশ্বর কোটি মুদ্রা খরচ করিয়াও তেমন একটি পাইয়া উঠে না। মূঢ়! যে ঈশ্বর এখানে তোমার আসিবার কালীন তোমার জন্য এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরলোকের ভারও কেন সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপন যথাদিষ্ট কার্য্যে রত না হও? ইহলোকও যে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব, পরলোকও সেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, নতুবা ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় যাহা তাহা পরিত্যাগ করিয়া, অনিশ্চিতের জন্য এবং ভয়ে এরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিবে কেন? পরলোক পরের কথা; ইহলোক, যাহার সহিত আপাততঃ তোমার সম্বন্ধ, যে তোমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত

বড়টি করিয়াছে, যে তোমার নানা সুখসচ্ছন্দতা সাধন করিতেছে, তাহার জন্য কি করিয়াছ? যে ইহলোকের প্রতি এরূপ অকৃতজ্ঞ, পরলোকে তাহার প্রতি বিশ্বাস? ইহলোক অধিকারে যে এমন অকৃতকর্ম্মা, পরলোক অধিকারে তাহাকে কে বিশ্বাস করিবে? ইহলোক ভিত্তি স্বরূপ, পরলোক তদুপরি স্থাপিত; সেই ভিত্তির দৃঢ়তা এবং পূর্ণতা সাধন পক্ষে কি করিয়াছ? তোমার স্রষ্টা তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমার নিকট তদতিরিক্ত কোন কার্য্যের প্রত্যাশা রাখেন না; তাহার পর, তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতেছি যে তাহা সমস্তই ইহলৌকিক কার্য্যক্ষম শক্তি, ইহলোকের অতীত কার্য্যক্ষমতা তাহার একবিন্দুও নাই; এমন স্থলে, ইহা কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, কেবল ইহ লোক, কেবল ইহ সংসারই, তোমার একমাত্র কর্ম্মভূমি এবং কর্ম্মার্থ অবলম্বন?

আবর্জ্জনাশূন্য নির্ম্মল কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা, তাহার উৎপত্তি এবং শিক্ষা এরূপে,—ঈশ্বর কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন না; সুতরাং তিনি আমাদিগকে যে সমস্ত শক্তি,কি শারীরিক কি মানসিক,যাহা দিয়াছেন, তৎসমস্তের নিশ্চিত উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা আছে। আমরা সেই সকল শক্তির চালক; অতএব আমরা যদি সেই সকল শক্তির সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কখনই বলিতে পারি না যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নষ্ট করিলাম না। তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণ করিলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পুণ্য; তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যথা করিলে অবশ্যই তাঁহার অপ্রিয় সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পাপ। আমরা পাপ পুণ্যের ফলভাগী জীব। এজন্য পাপ পরিহারে যাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শক্তিসমূহের সেইরূপ সদ্ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। আমরা, কি ইহলোক কি পরলোক, উভয় লোকের শুভপ্রার্থী হইলে, উহাই তাহার একমাত্র পন্থা; তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অন্য পন্থা আর আছে

বলিয়া যাহারা বলে তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় নির্ব্বোধ, নয় ক্ষিপ্ত, নয় জুয়াচোর, ইহার একতর। বাঞ্ছারাম, দেখিতে পাইবে, এ কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূলেও কতটা স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু স্বার্থ যখন এই অবস্থায়, এরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহ জড়িত থাকে, তাহাকে দিব্য স্বার্থ বলে; তদন্যতরে স্বার্থ পার্থিব। পার্থিব অবস্থায় যে স্বার্থ সকল অনর্থের মূল; দিব্যাবস্থায় সেই স্বার্থই আবার সকল অর্থের মূল হইয়া থাকে। এই দিব্য স্বার্থকেই চলিত কথায় স্বার্থশূন্যতা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রে প্রায়শ এই একমাত্র দিব্য স্বার্থে স্বার্থবান হইয়া থাকেন।

দিব্য স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরপ্রীতিলাভ। দিব্যস্বার্থবান্ ব্যক্তি মানবীয় সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রত্যাশা রাখে না, যেহেতু সে মানবীয় নিয়োজনে কর্ম্মরত হয় নাই। মানব তাহাকে শত ধিক্কার দিলেও, এবং বস্তুতঃ দিয়াই থাকে, তথাপি সে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে। এ পথে এ লোকে ‘যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’ প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে; তথাপি সময় ও সমাজ সপক্ষ বা বিপক্ষ যাহাই হউক, তাহার পক্ষে দুই সমান, তাহাতে তাহার চেষ্টার রোধকারী কেহ এবং কিছু মাত্র হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবী তাহার মস্তকের উপর চাপিয়া পড়িলেও, সে তাহাতে ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহে। যেহেতু সময়, সমাজ, পৃথিবী, তাহাদের রোষ ও তোষ, সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, এ সকলই ক্ষণিক, এই থাকিবে, এই থাকিবে না; কিন্তু সে যাহার প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতেছে, এবং যাহার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রীত্যাদি অনন্তস্থায়ী এবং অনন্তব্যাপী; সুতরাং সে কি কখনও অনন্তকে রুষ্ট করিয়া অন্তকে তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইতে পারে? যে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেষ্টাবান্, স্বয়ং ঈশ্বর করুণারসে তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন, নতুবা সে সমাজ হইতে বহু ক্লেশ, বহু দুঃখ, বহু উপহাস, কঠোর মৃত্যুযন্ত্রণাকে পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া তুচ্ছে নিক্ষেপ করিতে

সমর্থ হয়? যে একবার মাত্র কখনও এরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহার প্রভাবে স্বীয় অন্তরস্থ শক্তি কিরূপ অলোকসামান্য বিকশিত এবং দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে; বহু ক্লেশ-রাশির মধ্যেও কেমন একটি দিব্য সান্ত্বনা পদার্থ পরিদীপ্তিমান্ হয়, এবং কেমন ত হা অঘোর প্রতিকূল অন্ধকার মধ্যেও তাহাকে স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করিয়া লইয়া যায়। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতাবর্দ্ধক যে সমস্ত মহানুভবের নাম শুনিতে পাইয়া থাক, তাহাদের জীবন একে একে আলোচনা করিয়া দেখিও, দেখিতে পাইবে যে তাহা আমূলত ইহারই জীবন্ত অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যদি ইচ্ছা হয়, ইহাও দেখিতে পাইবে যে সাময়িক সমাজের নিকট তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কতই ক্লেশ ও অপমান প্রভৃতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি হইয়াছিল? প্রতিকূলতা এখন লুপ্ত। তৎস্থলে তাহাদের কৃত কার্য্য যাহা তাহা দিগন্ত-ব্যাপ্ত, এবং অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহে মহাধারা-রূপে তাহা এখন অনন্ত গৃহে গৃহীত। ফলতঃ মূল যখন "মূলং কৃষ্ণব্রহ্মচ ব্রাহ্মণশ্চ", তখন অনুষ্ঠানে বনবাস, বহুক্লেশ, বহুসংগ্রাম থাকিলেও, অন্তে সপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা বসুমতীর আধিপত্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্তব্য ফল। বাঞ্ছারাম, তথাপি এ পথে অগ্রসর হইতে যাহারা ভয় পায়, তাহাদের ভয় ঠিক যে ব্যক্তি অমর, তাহার জুজুবিছা দেখিয়া জীবন-ভীতি উপস্থিত হইবার ন্যায়। হিন্দুসন্তান, তুমি বসিয়া রহিয়াছ কি জন্য? তুমিও কেন এই মূল ধরিয়া কার্য্যারম্ভ না কর? যদিও তোমার শক্তি ক্ষুদ্র হয়, বসুমতীর আধিপত্যের পরিবর্ত্তে না হয় একখানা গ্রামও ত অবশ্য লাভ করিতে পারিবে। যেখানে সকলই ওঠবন্দি হিসাবে ভুক্ত, সেখানে এ ক্ষণস্থায়ী ওঠবন্দি ঠাকুরালীর পরিবর্ত্তে যদি কিছু স্থায়ী সম্পত্তি করিতে পার, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? মনুপুত্রের তাহাই করা কর্ত্তব্য; নতুবা পিতৃনাম, পিতৃপুরুষের অপমান করা হয়।

পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য আপাত-লভ্য সৌভাগ্য, সম্পৎ বা স্বচ্ছন্দাদি লাভ। ইহাতে আপাততঃ ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত হইয়া, সুখ বৃদ্ধি করিল বটে ; কিন্তু অন্তে কেবল অধিকার-চ্যুতি মাত্র নহে, সবংশ সহ সমস্ত লোপ। আমাদের সমাজ আপাততঃ যেরূপ সংগঠিত, তাহাতে সত্য মিথ্যা উভয়েরই যুগপৎ একত্র সমাবেশ, অধিকন্তু মিথ্যার প্রাধান্য অধিক। এখানে নির্ব্বোধ মানব স্রোততরঙ্গে পড়িয়া সকল বিষয়েই আশু ফল, আশু প্রতিকারের অনুসন্ধান করিয়া থাকে ; যথা-নিয়ম ও যথাকালের বড় একটা অপেক্ষা রাখে না বা বুঝে না। সুতরাং ফল এখানে যুগান্তস্থায়ী হয় না ; নিরন্তর এক ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে। মিথ্যাই এখানে আসীমত প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বেসর্ব্বা মূলস্বরূপ হইয়া আছে,—'মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী'। মিথ্যা ভ্রমের আধার, ভ্রম দৃষ্টিরোধক ; দৃষ্টির যেখানে রোধ, মানব সেখানে ভবিষ্যৎ পথে অন্ধ ; অন্ধ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাহী ফলের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে ? আপাত-লভ্য ফল এবং তৎসাধনার উদ্দেশ্য এই যে, আগত সময়কে কোন রূপে থাবাথুবি দিয়া সন্তুষ্ট রাখা ; সুতরাং সে সকল নিঃসন্দেহ কেবল উপস্থিত সময়ের জন্য। অতএব, অবিরত-গতিশীল সময়, যেমন ত্বরিতগতিতে কালপথে অদৃশ্য হয় ; তাহার প্রীতিজন্য অর্জ্জিত কথিত ফলাদিও, আত্মস্থানশূন্য করিয়া, সেইরূপ ত্বরিতগতিতে, তপনতাপতপ্ত জলবিন্দুর ন্যায়, অবিলম্বে অনন্ত গৃহে হিসাবশূন্য হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে একরূপ গোঁজা মিলানে ফাঁকি বুঝান বলে। তুমি যেখানকার সেইখানেই থাকিলে, অথচ ফাঁকি দিয়া বুঝাইলে যে তুমিও চলিতেছ। আরও আশ্চর্য্য, তুমি ভাবিলে কাল তোমার ফাঁকিতে ভুলিয়া, পিছু দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল ! ভ্রান্ত, কালকে ফাঁকি দেয় কাহার সাধ্য। কাল না দেখিয়া যায় নাই, তোমার ফাঁকিও তাহার অবিদিত নাই, তবে যে হাতে হাতে তোমার ফাঁকির প্রতিবাদ করিল না, তাহা কেবল তোমার নষ্টামির শাস্তি দারুণতর করিয়া তুলিবার জন্য। কিন্তু যখন ধরা

পড়িবে, তখন দেখিতে পাইবে যে তোমাকে কি ভীষণ বেগেই নাকে দড়ি দিয়া কাল আপন সমসূত্রে টানিয়া লইতেছে; তখন বুঝিতে পারিবে যে ফাঁকি দেওয়ার কি দুর্দ্দমনীয় প্রায়শ্চিত্ত। এ সংসারে মিথ্যা বা কুকর্ম্মের দ্বারাও লোকে উচ্চ সম্পদ পায়; কেন?—এটাও জান কি, উপর হইতে পড়িয়া শরীর-ভঙ্গে যে মরিবার উপযুক্ত, তাহাকে একতালা অপেক্ষা দোতালা বা তেতালায় উঠাইলেই নিশ্চিত ও বিশেষরূপে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়?

সে যাহা হউক, আমাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সূত্র অনেক দূরে, আধা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের মানবীয় সংসারে যতগুলি সুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বা যাহা কিছু মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া পরিচিত,সে সকলকে সংগ্রহপূর্ব্বক একতার সূত্রে সংযোজন, তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন, এবং তত্তাবতের সংসাধন, এ সমস্তই কর্ত্তব্যবুদ্ধির কার্য্য। সুকার্য্য এবং মহত্ত্ব সমুদায়,নানা রত্ন ও মাণিক্য স্বরূপ; কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামকরূপে তাহাদিগের উদ্ধার, সংগ্রহ ও সংস্কার করিয়া, একতার সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ পূর্ব্বক, ভুবনানন্দদায়িকা মালিকার আকারে সজ্জিত করিয়া থাকে; তখন যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই দিগঙ্গনাগণ মধুর হাসি হাসিয়া, প্রসন্নমুখে তৎপ্রতি স্বীয় প্রসন্নতা ভাব জ্ঞাপন করে। কিন্তু যথায় সেরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব,বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যথায় বক্কুর বা ছন্ন, তথাকার দৃশ্য কি স্বতন্ত্র এবং শোচনীয়! তথায় মনিরত্ন নানাদিকে নানা কারণে যদিও ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু কখনও তাহারা স্থায়ী হইয়া বা গোটা বাঁধিয়া, একতায় আগতিপূর্ব্বক অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করে না। তাহা-দিগকে সজ্জিত করিয়া ব্যবহারভুক্ত করা দূরে যাউক, তাহাদিগকে কেবল ধরিয়া রাখার জন্যও, যত ইচ্ছা চেষ্টা করা যাউক না কেন, ফণীর মণিবৎ কোথায় দিয়া যে তাহারা তিল তিল করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায় না। এ দৃশ্য, এ ক্ষোভোদ্দীপক প্রহসনের অভিনয় দেখিবার জন্য, আমাদিগকে কোন

দূর স্থানে যাইতে হইবে না ; এ দৃশ্য আমাদের ঘরে, ভারতগৃহে, নিত্য নিত্য অভিনীত হইতেছে। যাবতীয় উৎসাহ, যাবতীয় উদ্যম, জাতীয় একতা, স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় অভ্যুত্থান, নানা অনুষ্ঠান, নানা সংস্করণ, এ সকলের শব্দ এবং আড়ম্বরে ভারত নিত্য টলটলায়মান ; কিন্তু কখন দেখিয়াছ কি তাহার কোনটা গোটা বাঁধিয়া বা গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া, কোন প্রকারের সুফল প্রসব করিতে পারিয়াছে? কুফলের অভাব নাই ; অনুষ্ঠান সুফলপ্রসবিরূপে সম্পূর্ণ না হইলে, কুফল তাহা হইতে স্বতঃ-উৎপন্ন হওয়াই নিয়ম। তোমার সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত সংস্করণ, সমস্ত কথা, সকলেই জলবুদ্বুদবৎ উঠিতেছে পড়িতেছে ; মুহূর্ত্তে উদয়, মুহূর্ত্তে বিলয় ; কেবলমাত্র বচনেই সকল অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। কথা যতক্ষণ সভাস্থলে, সভার বাহিরে আর তাহার এক বর্ণও কাহার মনে তিষ্ঠে না। ইহার অর্থ এই, সকলের মূলদেশে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব ; এ সকলের মূল কেবল মাত্র সাময়িক হুজুগ। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহা প্রলয় ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে নিয়ম স্বরূপ ! কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে বিষয় তাহার ধর্ম্ম ওরূপ নহে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যথায় মূল, তথায় যাবতীয় অসংলগ্ন সংলগ্নে আসিয়া পরিণত হয় ; যাবতীয় অস্থায়ী বিষয় ক্ষণিকতা পরিত্যাগে স্থায়িত্ব পায় ; তথায় অনুষ্ঠিত বিষয় কেবল সভাস্থলীয় বাক্যে পর্য্যবসিত হয় না, যতক্ষণ তাহা সংসাধিত না হয়, ততক্ষণ তাহা জীবনের ব্রত স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, মানুষ তাহার জন্য পাগল হয়, তখন শয়নে স্বপনে কেবল এই একমাত্র ভাবনা,—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন।' কি অপূর্ব্ব মহামন্ত্র !

শক্তিসঞ্চালনে উদ্যম এবং কার্য্যপক্ষে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কেবল এই দুইটী থাকিলেই, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারা যায় ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাতেও সাধনাসিদ্ধি সম্যক্‌রূপে হয় না। সাধনাসিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সূক্ষ্ম এবং সুদক্ষ করিবার জন্য, আরও কতকগুলি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন ; তন্মধ্যে আত্মসংস্কার এবং শিক্ষা এই দুইটী প্রধান।

আত্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বথা গুরুতর; কারণ যথায় যেমন উৎস, তাহার নিঃসৃত দ্রব্য যে তেমনি স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা জানি, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সুফল লাভ করিবার পক্ষে আমাদের কোন সাধ্য নাই। আমরা যেমন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ প্রকৃতি এবং যেমন বা যে পরিমাণে পবিত্র বা অপবিত্র হইব, আমাদের কৃত কর্ম্মও সেইরূপ আকার ধারণ করিবে। অতএব যাহাতে কোনরূপে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক কলুষ না স্পর্শে, তৎ-পক্ষে আমাদিগের ত্বরান্বিত ও চেষ্টাবান্ হওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যদিও এ পৃথিবীতে অসৎ হইতে একেবারে পরিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তৎপক্ষে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা চালনায় কোনরূপ ত্রুটি না হয়। চেষ্টা করিলেও যখন এমন, তখন চেষ্টা না করিলে কত অধিক অসৎ স্পর্শের সম্ভাবনা। অতএব একমাত্র চেষ্টার সীমা পর্য্যন্ত আমাদিগের আত্মসংস্কারের পরিমাণ হওয়া উচিত। আমাদের সাধ্য যতদূর তাহা আমরা নিবিষ্টমনে করিব, তদতিরিক্ত যাহা, তাহা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জ্ঞানকৃত পাপ পরিহার আমাদিগের সাধ্যের মধ্যে।

শারীরিক ও মানসিক কলুষ, এ দুয়ের মধ্যে মানসিক কলুষই গুরুতর; অথবা মানসিক কলুষই সর্ব্বস্ব, শারীরিক কলুষ কেবল তাহার ফলস্বরূপ বলিলে বলা যায়; কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি, মন সর্ব্বদা শরীরের বশ নহে, শরীরই সর্ব্বদা মনের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকে। এ জগতে যত প্রকার অনর্থোৎপত্তি হয়, তাহা প্রধানতঃ এই মানসিক কলুষ হইতে। মানসিক কলুষসমূহের মধ্যে প্রধানতম কলুষ পার্থিব স্বার্থ; উহা রাজা স্বরূপ এবং নীচতা উহার মন্ত্রী উহারা এক-যোগ হইয়া আর তাবৎকে পরিচালন করিয়া থাকে। অতএব যে মানসিক কলুষ সর্ব্ব অনর্থের মূল, তাহা কি লোকতঃ কি ধর্ম্মতঃ, সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য পরিহার্য্য। মানসিক অসৎবৃত্তি বা অসৎবুদ্ধি সকল সতত সত্যকার্য্যের বিরোধী; যে পরিমাণে তাহারা মানসক্ষেত্র

অধিকার করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে কৃত কার্য্য সকল ছন্ন বা অসৎ-সম্পাদিত ও অসৎপরিণামযুক্ত হয়। শক্তিসঞ্চালনে সহস্র উদ্যম এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, যদি মানসিক কলুষ অপ-সারিত করিয়া মানসিক পবিত্রতা সংসাধন করা না যায়, তাহা হইলে সে শক্তিসঞ্চালন ও সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি কার্য্যকরী হইয়া কোন সুফল প্রসব করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহারা মানসিক কলুষের দাসরূপে পরিণত হইবায়, তাহাদের যে প্রভূত কার্য্যক্ষমতা তাহা বিকৃত দিকে চালিত হয় ও সম্ভব অপেক্ষা অপার গুণে বিকৃতির উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব আবার বলা বাহুল্য ও পুনরুক্তি স্বরূপ হইতেছে যে, আত্মপবিত্রতা ব্যতীত, শক্তিসঞ্চালন এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। এজন্য আত্মসংস্কারের দ্বারা পবিত্রতা সাধন, কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদি ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। নতুবা, ঈশ্বরের প্রীতিপ্রাপ্তি যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই প্রীতি তোমার কৃত যে সকল কার্য্যের দ্বারা আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কার্য্য কখনও তোমার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারিবে না।

এই আত্মসংস্কার এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে, একমাত্র বা প্রধানতঃ স্বর্গের সোপান এবং ধর্ম্মের পথ বা স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাসিত, এবং ভ্রমান্ধতায় তাহা কতই আড়ম্বর ও অতিনীতি যোগে পালিত হইয়া আসিয়াছে। উপায় যাহা, তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, ভারতীয়েরা অতিবুদ্ধিশালী প্রায় তাঁহাদের অনুষ্ঠিত তাবৎ বিষয়ে; এখানেও, সেই অতিবুদ্ধিবশে, তাঁহাদের আত্ম-সংস্কারপ্রণালীকে উহার সীমা ছাড়াইয়া এতই বাহুল্যতায় লইয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, অন্যান্য সাধনার কথা দূরে যাউক, কেবল তাহার সাধনেই, সমস্ত জীবন অতিবাহিত বা সমস্ত জীবন নিপাত করিলেও, অবসর বা অবধি পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে?—খাও জল এবং ঘাসের পাতা, যাহাতে শরীর শোষিত হইয়া, কেবল একটা ইন্দ্রিয় কেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একেবারে এবং

চিরকালের মত দমন হয়। নিঃস্বার্থ হইতে হইবে?—ছাড় সংসার, ধর সন্ন্যাসমূর্ত্তি; মাঘের হিমে, আষাঢ়ের জলে, বৈশাখের অগ্নিতে ক্ষিপ্ত বা জড়প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিতে শিখ! ইত্যাদি। সাধারণ আচার বিষয়েও খুঁটিনুটী এত যে, চারিচালের বাহির হইলেই কোন না কোন প্রকারে পাপস্পর্শ না হইয়া যায় না। হিন্দুঠাকুরদের পুনঃ ঐ ঐ অতি-আচারের কার্য্যকারিতায় এত দূরই বিশ্বাস যে, যদি সে সকল যথোচিতরূপে পালিত হওয়ার পক্ষে কাহারও কোন ক্রটি দৃষ্ট হয়, তবে তাহার যে পরকালে হানি না হইয়া থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণায় একেবারেই আইসে না। বুদ্ধিবৃত্তি হিন্দুরা অতিশয় প্রশস্ত এবং আড়ম্বর-আয়ত্তক পাইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধির মোহে, ইহাদের যে কোন গুণ বা আচার বা যাবতীয় সাধ্য বিষয়গুলিকে এমনই বহ্বায়তন ও আড়ম্বরযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, উপায়ের সন্নিকটে উদ্দেশ্য যাহা তাহা ঢাকা পড়িয়া, উপায়ই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়; এবং তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, হিন্দুর উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও অনুষ্ঠান, সর্ব্বত্রই রুদ্ধগতি ও ভগ্নপদ। হিন্দু দূরদেশে যাইবেন, আচারের খাতিরে দাঁতে দাঁত দিয়া ও প্রাণে মরিয়া; মৃত সৎকার করিতে যাইবেন, মরার সঙ্গে নিজে মরা হইয়া; ঘরের বাহির হইলেই পাপস্পর্শের আতঙ্ক বা জাতি যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়ের প্রাবল্য যে কত বেশী হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি হিন্দুর বিদ্যাশিক্ষা পর্ব্বেও তাহার উদাহরণ সুবিরল নহে;—এই দেখ একটা ব্যাকরণ শাস্ত্র; উহা কেবল ভাষাশিক্ষার উপায়স্বরূপ, কিন্তু এখানে একবার ব্যাকরণ পর্ব্বের ঘটা দেখ, সহকারী না হইয়া স্বয়ং একটী বিজ্ঞান এবং কেবল তাহা নহে, দুঃসাধ্য মুখ্য বিজ্ঞানের পদবীতে উঠিয়া গিয়াছে। গিয়াছিলাম বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে, কিন্তু ব্যাকরণের খুটিনুটীতেই বয়স কাটিয়া গেল! এরূপ বহ্বাড়ম্বরযুক্ত উপায়ঘটা সর্ব্বদাই পরিহার্য্য। সাধারণতঃ উপায়, সুতরাং এখানে আত্মসংস্কার এবং তৎসূত্রে আচার প্রভৃতি, যতই স্বল্প,

সংক্ষিপ্ত-আয়তন, সুখগ্রাহ্য এবং সরল হয়, ততই ভাল; ততই তাহারা কার্য্যসাধক হইবে; কিন্তু হায়! হিন্দুর কপালগুণে সর্ব্বত্র এবং সকলই তাহার বিপরীত। এ কথা হিন্দুর যে কেবল সংস্কারপর্ব্বেই খাটে, এমন নহে, হিন্দুর যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধেই এ কথা বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গারাম, তোমাকে সেরূপ আত্মসংস্কার করিতে বলিতেছি না; যাহা রয় সয় তাহাই ভাল। অথবা বিজাতীয়গণের ন্যায় আত্মসংস্কার করিতেও তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না; এক সময়ে তাহাদের আত্মসংস্কার মন্দ ছিল না, কিন্তু তাহা এখন সাধারণতঃ অথবা সর্ব্বদা ঝোপ বুঝিয়া কোপ। অতঃপর তবে আত্মসংস্কারসাধক এবং সেই সূত্রে আচারাদির নিয়ামক কোন্ নীতির বিষয় আমি তোমাকে পরিচয় দিয়া বুঝাইব? যে পদার্থ সত্যপ্রসূত, সুতরাং নিত্য এবং সর্ব্বসুন্দর, তাহার পরিচয়ের আবশ্যক রাখে না; তবে কোথায় বা কাহার দ্বারা তাহাতে আবর্জ্জনা স্পর্শ করিয়াছে বা করিতে পারে, তাহারই পরিচয় দিবার আবশ্যক হয়। আমারও চেষ্টা সেই পর্য্যন্ত। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলি, সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিবে, যথাসাধ্য সদ্বুদ্ধিশালী হইবে, কদর্য্য স্বার্থপূর্ণ এবং ভীরু ও নীচ অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইও না; ইহার মধ্যেই আর সমস্ত আত্মসংস্কার নিহিত করা রহিল। শারীরিক কলুষ পরিহারের আবশ্যকতা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আর অধিক কি বলিব,—সেই শরীরই সার্থকজন্মা, সেই শরীরেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণাম, যাহা সুকার্য্যসাধনার্থে মায়াত্যাগে প্রদত্ত হয়; কে জানে লোকের হস্তে, কে জানে কালের হস্তে। ভারতে কি আবার তেমন দিন আসিবে?

কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে পবিত্রভাবে চালনা করিবার নিমিত্ত যেমন আত্মসংস্কারের প্রয়োজন, তেমনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশস্ততা সাধন জন্য, শিক্ষার প্রয়োজন তদধিক। শিক্ষার উদ্দেশ্যটী শুনিতে এক কথা,—প্রশস্ততা সাধন করে; কিন্তু প্রশস্ততা পদার্থটী কি বিপুল ও অপূর্ব্ব! উহা এমনই অপারগুণময়ী যে, একা উহার আলোকেই আর তাবৎ আলোকিত হইয়া

থাকে ; এবং উহার আলোকে তাবৎ বিষয় এতই সুভাবে রূপান্তরিত হয় যে, শেষে যেন সেই প্রশস্ততা, সুতরাং তদুৎপাদক শিক্ষাই, সমস্তের একমাত্র উদ্ভাবক ও নিয়ামক স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। আর্য্যঠাকুরদের মধ্যে প্রশস্ততার অভাব হেতু, তাঁহাদের তাবৎ কর্ম্মকাণ্ড প্রায় অনর্থক হোমযজ্ঞাদিতে সমাহিত হইয়া আসিয়াছিল। যথায় নধর ফলের সম্ভব, তথায় প্রশস্ততার অভাবে, ফল কীটভুক্ত হ্যুব্জ কুব্জ ও করাটীয়া আকার ধারণ করে এবং দেবভোগ্য না হইয়া কুকুরভোগ্য হয়। শিক্ষা তাঁহাদের, বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবের অভাবে, এক বাঁধা পথে গিয়া সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

জাতিমধ্যে সর্ব্বসাধারণেই শিক্ষার আবশ্যকতা যে কতদূর, তাহা পূর্ব্বেও ভারতীয়দিগের বড় একটা ধারণা ছিল না ; এবং এখনও যে বড় একটা ধারণা গঠিত বা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা হয় নাই। পূর্ব্বকালের বিশ্বাস,—শিক্ষা যাহা তাহা কেবল অধ্যাপক ও পাটোয়ারী, এই দুই জনের আবশ্যক হয় ; এ শিক্ষায় আবার ব্যবসায়ভেদে তারতম্য আছে; যথা, অধ্যাপকের শিক্ষিতব্য পুঁজীপাটা স্মৃতি সাহিত্য বা শ্রাদ্ধসভাজয়ের জন্য দুইটা ন্যায়ের তর্ক ; পাটোয়ারীর পুঁজীপাটা শুভঙ্কর। এ কালের বিশ্বাস,—শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরী করিবার জন্য এবং আজি কালি মামলা মোকদ্দমা চালান ও বক্তৃতা করিবার জন্যও বটে। ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া ইংরাজী লিখিতে বা কহিতে জানা ; তদর্থে কেহ বা সংবাদপত্র লইয়া থাকেন, কেহবা নভেল পড়েন ; এবং অনেকে পুনঃ ইহার যে কোনটী হইতে সময় কালে ব্যবহার ও (আস্তাকুঁড়ে ছিন্ন গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ানর ন্যায়) প্রয়োগের জন্য, বাক্যাবলী ও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার পক্ষে ত্রুটি করেন না। ইহাদের বিশ্বাস,—বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয় না, মাতৃগর্ভ হইতেই তাহা সঙ্গে আসিয়া থাকে ; সুতরাং এখন যাহা কিছু উপার্জ্জন বা শিক্ষার আবশ্যক,তাহা কেবল ইংরাজী অভিধান ও ব্যাকরণের ;— যদ্দ্বারা গর্ব্বোপার্জ্জিত পাণ্ডিত্য ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরাজীতে প্রকাশ

করিতে পারা যায়। পাণ্ডিত্য বলিয়া যে একটী পদার্থ আছে, তাহাও ইহারা কখন কখন অনুভব করিয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহাও অনুভাবিত যে, সে পাণ্ডিত্য অন্য কিছু নহে, তাহা কেবল ইংরাজী শব্দ ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাদে, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি আর যে সকল অনাবশ্যকীয় বিষয় অর্থাৎ যাহা চাকুরীতে লাগে না, অথচ যাহা অধিকন্তুরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ও স্থানবিশেষে উদ্গিরণ করা। ইহারা গ্রন্থাদি প্রণয়নও করিয়া থাকে অপর্য্যাপ্ত; প্রতি চটী চাপাটী—অপাঠ্য চটী চাপাটী হাতে ধরিয়া, এবং আজি কালি সংবাদপত্র লিখিয়াও, কেহ "মহাকবি" কেহ "প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার" এই সকল হইয়া থাকে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল দেশের লোক কার্লাইল, গেটে, রিজ্‌টার প্রভৃতি লেখককে লেখক বলিয়া থাকে; তাহারা আমাদের এ ছুঁচোর কীর্ত্তন দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, আমাদিগকে না জানি কি অসার বলিয়াই মনে করিত! সে যাহা হউক, সে কালে অধ্যাপক ও পাটোয়ারী এবং একালে চাকুরে, সাধারণতঃ ইহারা ভিন্ন, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক বা অপরাপর ব্যক্তিদিগের শিক্ষার যে কিছু আবশ্যকতা আছে তাহা, এই দুই কালের এককালেও ধারণা ছিল না এবং নাই। এখানে মেয়ে লেখা পড়া শিখে না, চাকুরী করিতে পাইবে না বলিয়া; অপরাপর জাতিতে শিখে না, তদ্দারা পিতৃব্যবসায়ে অপারগ হইবে বলিয়া। এ সকলের কথাত দূরের কথা; শিক্ষিতের পক্ষেও অনেক সময়ে অনেকের মুখে শুনিতে পাই,—'কেবল একরাশি কেতাব পড়িয়া কেতাবকীট হইলে কি হইবে? কাজের মানুষ হও কাজে আসিবে।' কাজ?—যে কোন উপায়ে স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি! কবিরও অনেক পড়িতে শুনিতে নাই, যেহেতু তাহাতে কবিত্বশক্তি বান্‌চাল হইয়া যায়! এখানে কতকগুলা বহি পড়াও উপহাসের বিষয়।

কিন্তু এ জগতে এমন এমন দেশ অনেক আছে, যথায় চাকরের চাকরগিরি করিতেও, লেখা পড়া প্রভৃতি নানা শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

তথায় উন্নতশ্রেণীর শিক্ষার ত কথাই নাই; সমস্ত সম্ভবপর উন্নত ও সৎ শিক্ষা করতলস্থ করিয়া তবু তাহাদের তৃপ্তি নাই; তবু শিক্ষার আবশ্যকতায় বিরাম নাই। এরূপ জাতি সকলের মধ্যে যে শিক্ষা, তাহার সহ আমাদের জাতীয় শিক্ষা তুলনা করিলে, কতই অন্তরতা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে চাকুরী চালানর অতিরিক্ত শিক্ষা, আসবাব বা উপহাসের বিষয়; অন্যত্র তাহা প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যকস্থলীয়। এ হেতু, ফলেরও তারতম্য তথাবিধ। সেই সেই জাতিরা জগতের তাবৎ সম্পদ ও সৌভাগ্যকে করতলস্থ করিয়া, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অপার কর্ম্মরাশির সম্পাদন শেষ করিয়া, তথাপি তৃপ্তিবোধে ক্ষান্ত হইতেছে না; আর আমরা? ক্লেদনিহিত কীটরাশির ন্যায় ক্লেদেই জড়িত থাকিয়া তাহা হইতে বদন ফিরাইতে মমতা বোধ করিতেছি; এবং শুধু মমতা বোধ করিতেছি না, কখন কখন বা পাছে কেহ মুখ ফিরাইয়া দেয় এ আশঙ্কায় মুহ্যমান হইতেছি। অভ্যাসবশে নারকীর নরকেও মমতা জন্মিয়া থাকে। কি দুরন্ত বৈষম্য!

শিক্ষায় মনুষ্যের এই কয়টী বিষয় সংসাধন করিয়া থাকে;—

১ম। কালের কোন্ বিশেষ বিভাগে এবং কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ বিশেষ দেশে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে প্রবুদ্ধ করিয়া দেয়।

২য়। আমার কর্ম্মস্থলীর আয়তন কতদূর, আরব্ধ কর্ম্ম আমার পূর্ব্বে কতদূর সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, এবং আমার স্বসময়ে আমার শক্তিসাধ্য সম্পাদ্য অংশ কি পরিমাণে উপস্থিত থাকিয়া আমার হস্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং তাহার আশু ও দূর পরিণাম কোথায়, তাহা যথাসম্ভব বা যথাআবশ্যক দেখাইয়া দেয়।

৩য়। কর্ম্মস্থলে আমার সহকারী বা পরিচালকবর্গ কে কেমন; কাহার উপরে কতদূর নির্ভর করিতে পারি বা না পারি; কর্ম্মস্থলের প্রতিকূল বা অনুকূল বিষয় কি কি; এবং তাহাদের কাহাকে কি পরিমাণে পরিহার বা বিদূরণ বা কি পরিমাণে অবলম্বন করিতে পারিব, তাহার পরিচয় দিয়া দেয়। এতদতিরিক্তে আমূলতঃ নিত্য

সহচরীরূপে সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব বিষয়েতে পথ-প্রদর্শন ও সহায়তা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা দেখিবে সে সকল কিছুই করে না, অথচ শিক্ষানবিশ শিক্ষার জন্য আজীবন অভ্যাস ও অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত করিয়াছে; তথায় নিশ্চয় জানিবে যে, সে শিক্ষা শিক্ষা নহে,—তাহা ভাক্তশিক্ষা; সে শিক্ষানবিশ শিক্ষিত হয় নাই, সে জীবন্ত পুস্তকাধার হইয়াছে মাত্র!

যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ফল এমন, এবং মানবমানবীমাত্রেই যখন এ জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত,তখন বাঞ্ছারাম, কেমন করিয়া বলা যায় যে, শিক্ষা সকল প্রাণীর জন্যই সমান প্রয়োজনীয় নহে? এমন স্থলে, তবে তুমি কেনই বা ছোট লোক মাথায় উঠিল বলিয়া সাধারণ শিক্ষার প্রতি আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠ; এবং কেনই বা স্ত্রীগণ চাকুরী করিতে যাইতে পারিবে না বলিয়া, তাহাদের শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকতা দেখিতে পাও না; এবং নিজেই বা কেন উপন্যাস ও সংবাদপত্র পাঠের অতিরিক্তে যাইতে চাহ না? ছি, তুমি বড় ভ্রান্ত! তবে যদি শিক্ষা কেবল অনর্থক জ্যেষ্ঠতাতত্ব, তবে যদি শিক্ষা কেবল বঙ্গীয় কাব্য নাটক উপন্যাসাদির পাঠ ও কার্পেট বুনানিতে পরিসমাপ্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্য শিক্ষা যতদূর অন্তরে থাকে তাহাই শ্রেয়ঃ। শিক্ষা তাহাকেই বলি যাহা, সদ্‌গুণ জ্ঞান ও কর্ম্মে নূতন মানুষে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। সে যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলিতেছি, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইতর হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই পক্ষে সমান। তবে প্রভেদ এই, যাহার যেমন কর্ম্মস্থলী, যাহার যেমন কর্ত্তব্য নিরূপিত, তাহার শিক্ষা তদনুসারিণী হওয়া উচিত।

শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ, রুচি, ও মতি গতি অনুসারে, শিক্ষার শ্রেণী, পর্য্যায়, লঘুত্ব বা গুরুত্ব আদি ভেদ হইয়া থাকে। যে মানবের শিক্ষাশক্তি যতদূর, যদি তাহার শিক্ষা ততদূর না হয়; তবে যে পরিমাণে শিক্ষার ত্রুটি, সেই পরিমাণে তাহার কর্ম্মস্থলীতে কর্ম্মসম্ভবতায় সংকীর্ণতা এবং আনুষঙ্গিক আরও নানা দোষ ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম ও

সেই পরিমাণে বঙ্কুর ও অফলদায়ক হয়। সত্য বটে যে, শিক্ষা কেবল এক কেতাব পাঠে সমাহিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহাও সত্য যে, কাল ও পৃথিবীর সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, ততই তাহা উত্তরোত্তর বহ্বাড়ম্বরসাধ্য হইয়া আসিতেছে; সুতরাং আনুষঙ্গিক শিক্ষাও তৎসঙ্গে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে থাকায়, এক কেতাবই সে সকলকে বহুলাংশে সংগ্রহপূর্ব্বক দেখাইতে সমর্থ; সুতরাং কেতাবই প্রধানতঃ শিক্ষার উপাদান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেতাব ব্যতীত আর যে সকল উপায়ে শিক্ষা হইতে পারে, তাহার মধ্যে এই কয়টি প্রধান :—শ্রেষ্ঠ জনের উপদেশ, সৎসঙ্গ এবং বহু দর্শন ও ভূয়োদর্শন। যে যে কার্য্যেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাহার পূর্ণতা ও সুসম্পাদনের জন্য, অনুরূপ সৎশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইয়ুরোপখণ্ডে দেখ, তথায় কূটরাজনৈতিক হইতে লাঙ্গলধারী কৃষক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই সুশিক্ষার বিকাশ কতদূর। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপের সৌভাগ্যের প্রতিও বারেক তাকাইয়া দেখিও।

যেমন মানসিক শিক্ষা, তেমনি শারীরিক শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক-বল-শিক্ষা একান্ত আবশ্যক; কারণ মানসিক শিক্ষাজনিত উচ্চ আশা ভরসা ও উদ্যমের উহা পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক, অবলম্বনদণ্ড এবং ঠেকাস্বরূপ। কিন্তু এ কথা কোন ভারতসন্তান বুঝেন না। স্কুলের অতিরিক্ত,ঘরে পড়াইবার জন্য বহুব্যয়ে কেতাবী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দশমাংশ ব্যয়ে একজন বল-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে জানেন না, অথবা ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির ভিতরেই প্রবেশ করে না; কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালক যত ভূত, জুজু বা কাপড়েমুতো হয়, ততই সে তাহাদের মতে ভাল ছেলে! মানব অধঃপাতে গমন করিলে কত রকমেই তাহার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়া থাকে। বালকের বল-শিক্ষায় আর কিছু না হউক,অন্ততঃ আত্মরক্ষাটীও ত করিতে পারিবে, এবং অন্ধকার রাত্রে গৃহিণীর অঞ্চল অবলম্বন ভিন্ন বাহির হইতেও ত সক্ষম হইবে। ইহাও নিতান্ত সামান্য লাভ নহে! বল-শিক্ষার

ব্যয়ও কিছু অধিক নহে, কেতাবী শিক্ষার দশাংশের একাংশ মাত্র। একজন মাত্র বল-শিক্ষক পলোয়ানের কাছে, হয়ত একখান গ্রামের সমস্ত বালক অনায়াসে দেহচালনা ও অস্ত্রাদিচালনা শিক্ষা করিতে পারে, অথচ তাহার ব্যয় সাত কি আট টাকার অধিক নহে; তবেই দেখ—প্রতি বালকের শিক্ষাব্যয় মাসে দুই আনা কি চারি আনার অধিক পড়ে না। কিন্তু হইলে কি হইবে, ভারতসন্তানের ভাগ্যে এ যোগাযোগও ঘটিয়া উঠে না! শিক্ষায় বলের বৃদ্ধি হয়; কোট হ্যাট বা মদ অথবা মাংস আহারে হয় না। বলশিক্ষায় শরীর নীরোগ হয়।

বাঞ্ছারাম, এখানে সেখানে সকল জায়গাতেই যখন চৌদ্দপোয়া মানুষ, তখন সত্য সত্যই যে বলে কেহ সিংহ কেহ মূষিক এতটা প্রভেদ হইতে পারে না। অল্প ইতর বিশেষ অবশ্য নানা কারণ হেতু ঘটে বটে, কিন্তু মোটের উপর সকলেরই বল সমশ্রেণীর। সাধারণতঃ সকল মানবীয় শরীরই সমশ্রেণীর বল ধারণে সক্ষম। কিন্তু বলিতে পার, তথাপি আমরা কেন সে বলের কোথাও অপরিমিত বিকাশ, কোথাও বা একেবারে ন্যূনতা দেখিতে পাই? আর আর বিষয়ের ন্যায় বলও তাহার স্ফূর্ত্তিবিষয়ে মনের শাসনাধীন। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ বোধ হয় যে, যে ব্যক্তি সহজ অবস্থায় বল বিষয়ে অতি হেয়, উন্মাদ অবস্থায় তাহারই শরীরে আবার দশ মত্ত হস্তীর বল আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; কোন দৃষ্ট-সিংহ তখন এ দৃষ্ট-মূষিককে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কোন ভীতিস্থলে, কোন বিপৎস্থলে, অথবা তথাবিধ কোন বিশেষ স্থলে, যথায় মানব মরিয়া হইয়া উঠে, তথায়ও ঐরূপ উন্মাদবৎ বলের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সে বল কোথা হইতে আইসে?—শিরাধমনী বা ধাতু যাহারই হউক তাহার বিকার বা অবস্থা পরিবর্ত্তনে। কিন্তু সে অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ?—উন্মাদ বা ভীতি বা বিপদ ইত্যাদির অবস্থায়, মানবের চিত্তবিক্ষেপ অর্থাৎ অন্যবিষয়ক জ্ঞানজনিত যে প্রতিবন্ধকতা তাহার লোপ হয়, অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা

উপস্থিত হয় ; সুতরাং তখন চিত্ত যে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, তাহাই পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া থাকে। এই পূর্ণ মাত্রায় চিত্ত-নিবেশন বলচালনার প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, তখন সেই পূর্ণ নিবেশনের ধর্ম্ম হইতে শরীরনিহিত তাবৎ-বল সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া ক্রিয়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে থাকে ; উহা ভিন্ন বল যে সে সময়ে সহসা তৈয়ার হয় বা আর কোথা হইতে আইসে, তাহা নহে। সহজ অবস্থায় কিন্তু এরূপ ঘটনা হয় না ; তাহার কারণ, সে সময়ে তদ্রূপ চিত্ত-নিবেশনের কারণ অভাব, এবং তখন মানসক্ষেত্রে অপরাপর প্রতিকূল কুচিন্তা সকল জাগ্রত থাকায়, সে পক্ষে প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। সহজ অবস্থায়, এই প্রতিকূল কুচিন্তার ভাগ অকর্ম্মা, মূর্খ, ও আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিতে স্বভাবতঃ কিছু অধিক ; এ কারণে এ জগতে ইহারাই প্রধান ভীরু হয়। সুচিন্তা বলের উত্তেজক ; যথায় যে প্রকারের সুচিন্তা, তথায় সেই প্রকারের বলের উদ্রেক করিয়া থাকে। সু এবং সহজ অবস্থায়, কেবল এক সুচিন্তাই সাহসের সোপান ; এবং সাহসে বলের বিকাশ হয়। দৈহিক বল এরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও, তাহার যথোপযুক্ত চালনার নিমিত্ত উক্তমত শিক্ষার আবশ্যক হয়। দেখ এখন, দৈহিক বলবিকাশও কতটা মানসিক অবস্থা ও সৎশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, এখন দেখ, আমাদের যে বল নাহি এ কথা সত্য নহে, সত্য এই কথা যে আমাদের বল-উদ্দীপক চিত্ত নাহি। চিত্তের উন্নতি বা অবনতি, স্বাধীন বা পরাধীন বুদ্ধি, ইত্যাদির ন্যূনাতিরেক অনুসারে বলেরও তারতম্য ঘটনা হয়। অতএব ইহা জানিয়া রাখিবে যে, শিক্ষা ও মতিগতি পরিবর্ত্তনের দ্বারা আমাদের ন্যায় ভীরু ও সাহসহীন জাতিতেও, প্রভূত সাহস ও বলের উৎপাদন করিতে পারা যায় এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ও অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। অতঃপর শিক্ষার কথা যাহা বলিতেছিলাম :—

এমনও শুভজন্মা লোক এ জগতে অনেক আছে; যাহারা কোন কেতাবের উপায়ে বা যে কোন উপায়ে, অপর কর্ত্তৃক কোন শিক্ষা-

বিশেষ ধারাবাহিকরূপে প্রাপ্ত না হইলেও, শিক্ষার সাধারণ ফল যাহা, এবং তদতিরিক্তে আরও সহস্রগুণ ফল, স্বভাবতঃ তাহাদের হৃদ্গত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তেমন শুভজন্মা লোক কয় জন? কতক শিক্ষা আছে উড়োভাবে, দেখিয়া বা শুনিয়া, যেমন আমাদের জাতির অধিকাংশ;—এরূপ শিক্ষায় বড় একটা ফল ফলে না। দেশীয় সাধারণ লোক সকলের শিক্ষার আর একটি প্রধান উপাদান, শিক্ষিত উন্নত শ্রেণীর সংস্রব। যে কোন দেশের বা যে কোন কালের সমাজদৃশ্য বিলোড়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্ন শ্রেণীরা সর্ব্বদাই উন্নত শ্রেণীর অনুকারী; এবং উন্নত শ্রেণীর যখন যে রকম রুচি, মতি, গতি ও নীতি, ইহারাও তাহার অনুকরণ করিয়া সেইরূপ মতি, গতি ও রুচি আপনার করিয়া লয়; এবং যথায় যথায় তাহাদের উন্নতবর্গের সহ সংস্রবে আসিতে হইবে, তথায় তথায় উন্নতের রুচি সহ সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত, অনুরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকে। উন্নত শ্রেণী যখন সুরুচির, নিম্নশ্রেণীও তখন সুরুচির; উন্নত শ্রেণী যখন উদারচেতা ও তেজস্বী, নিম্ন শ্রেণীও তখন উদারচেতা ও তেজস্বী; উন্নত শ্রেণী যথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত, নিম্ন শ্রেণীও তথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত; আবার উন্নত শ্রেণী যখন জুজু, নিম্ন শ্রেণীও তখন জুজু; উন্নত শ্রেণী যখন অকর্ম্মা, নিম্নশ্রেণীও তখন অকর্ম্মা; মুনিবকে ঠকাইতে পারিলে আর ছাড়ে না। ইহারও প্রথমগুলির দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকায়, দ্বিতীয়গুলির দৃষ্টান্ত অধঃপাতিত ভারতে জাজ্বল্যমান। ইহার পরেও বাঞ্ছারাম বাবু আক্ষেপ করিয়া থাকেন, 'ছোট লোকটা কাজ করে না, কেবল ফাঁকি দেয়।' আরে বাপু, তুমি যে নিজে কিছু কর না ও নিজেকে যে নিজে ফাঁকি দাও, যাহা দেখিয়া ঐ ছোট লোকও কাজ না করিতে ও তোমাকে ফাঁকি দিতে শিখিয়াছে, তাহা একটীবারও মনে ভাব না! এখন দেখ, শিক্ষাবিষয়ে, উন্নত শ্রেণীর জবাবদিহি কি গুরুতর ও দুনা! তাহার শিক্ষার উপর কেবল তাহার নিজের সদসৎ নহে, সাধারণ জনবর্গেরও সদসৎ অপরিসীম ভাবে নির্ভর করিতেছে।

ভারতসন্তান, এ জবাবদিহিতে একবার প্রবুদ্ধ হও; ইহা তোমার অৰ্দ্ধেক মঙ্গলের সোপান।

শিক্ষাজনিত চিত্তপ্রশস্ততা ও প্রসারিত দৃষ্টি হইতে, নিজ এবং বহু 'নিজ' সংঘটিত জাতীয়, উভয়বিধ অভাব যাহা যাহা, তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই জন্য সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে যে, শিক্ষার সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি হয়। অভাবের বৃদ্ধিই উন্নতির নিমিত্ত স্বরূপ। যে অভাব ব্যক্তিগত, তাহা ব্যক্তিগত শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হয়। পুনশ্চ যে অভাব জাতিগত, তাহা কেবল এক জাতীয় শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে। এক সাধারণ প্রকৃতির বহু মানব লইয়া এক এক জাতি; সুতরাং আর আর বিষয়ের সহ, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষাজনিত অভাবও, তদ্রূপ এক ও জাতীয় আকারযুক্ত হইবার কথা। এইরূপে বহু অভাব বা অভাববিশেষ, যথন জাতিমধ্যে সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া, জাতীয় আকার ধারণপূর্ব্বক সকলকে সমান উত্তেজিত করিতে থাকে; তথনই, সেই অভাবসমূহ বা অভাববিশেষ পরিপূরণার্থে সর্ব্বত্র সমধর্ম্মী যে শক্তিসঞ্চালন, তাহা হইতে উৎপন্ন সহানুভূতি এবং যৌগিকাকর্ষণের ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে জাতীয় একতার উৎপত্তি হয়; এবং একবার এ জাতীয় একতা উৎপাদিত হইলে, জগতে মনুষ্যশক্তিসাধ্য এমন কোন্ কার্য্য, অথবা কোন্ জাতীয় শ্রী আছে, যাহা সুসাধিত না হইতে পারে? বাঞ্ছারাম, এইরূপেই জাতীয় একতার উৎপত্তি হয় এবং ইহাই জাতীয় একতা। এ একতা দ্বারা প্রতি জাতীয়স্থ ব্যক্তি ভ্রাতৃবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে; এবং এখন তুমি যে বিশ্বাসের অভাবে কোন প্রকার সমবেতসাধ্য কার্য্যে পারগ হইতে পারিতেছ না, তথন দেখিবে সেই বিশ্বাস আপনা আপনি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমবেত সাধন তখন অনায়াসসাধ্য মধ্যে গণিত হয়। এ জাতীয় একতা, কেবল বিশ্বাসশূন্য মৌখিক চীৎকার, সভাসমিতি বা বচনবাগীশীতে সম্পন্ন হয় না। সেরূপে একতা সাধন করিতে যাওয়া কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র; সে শ্রমে অন্য

অনেক সৎকার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারিত। একতা সাধন করিতে চাও? তবে আবার বলি, শূন্যহৃদয়, শূন্যমন, কেবল বচনবাগীশী বা বিলাপ পরিতাপ করিলে কিছুই হইবে না। বিলাপ, পরিতাপে কখনই কিছু হয় না; কেবল আহা উহু করিলে, কেবল কাঁদিলে, কেবল পরের মুখ দেখিয়া করুণা করিলে, কাজ হয় না। মানুষ হইয়া শিশুর আচরণ করিলে, কে কবে তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করে? যদি করে, তবে সে কেবল দূর দূর, ছেঁই ছেঁই! বাপু লীডিংম্যান, তুমি উন্নত, একতা সাধন জন্য তুমি কিছু অধিক ব্যস্ত, এবং বলিতে কি তাহার চেষ্টা তোমার কর্ত্তব্যও হইতেছে; কিন্তু এরূপ মিছা চীৎকারে কি হইবে, ক্ষণেক ক্ষান্ত হও, চুপ কর, কথা শুন, অভাব অনুভব কর, হৃদয় পূর্ণ কর, তদনন্তর যাও, দেশে দেশে যাও, দুয়ারে দুয়ারে যাও, যাহাতে একতা সাধন হইতে পারে তাহার মূলমন্ত্র যাহা তাহা জাগ্রত করিতে শিখগে, শিখাওগে। দেখ, ইউরোপীয় রাজনৈতিকেরা কেবল আপন আপন দলমাত্রের উদরপোষণ হেতু কেমন অক্লিষ্টমনে দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতেছে; আর তুমি তোমার দেবারাধ্যা জন্মভূমির শ্রী-পোষণ হেতু দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতে পার না? কিসের আশঙ্কা তোমার? জান না কি, আশঙ্কা অনভ্যাসে জন্মিয়া থাকে; অভ্যাসে জীবন বলিদানও আমোদের মধ্যে পড়িয়া যায়? মরণের ভয় বা যে কোন ভয় বা যে কোন বিষয়, অভ্যাস এবং প্রথায় হয়; অভ্যাস এবং প্রথায় যায়। দেখ, অভ্যাসগুণে যে পঞ্জাবী কিছুদিন পূর্ব্বে সকল শাসনের বাহির যে কাবুলী, তাহাকেও শাসন করিয়াছে; আজিকে আবার সেই পঞ্জাবী চুনোগলির চড় খাইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে! যে রাজপুতক্ষেত্রে ইংরাজ টড্ প্রতিপদক্ষেপে থার্ম্মপিলি ও মারাথন-ক্ষেত্র দেখিতে পাইত, সেই রাজপুতবংশ অভ্যাসদোষে এখন লম্বোদর, আফিংভোজী, কাপুরুষ, আচারে এবং আকারে বাইজীর ভেড়ুয়া বা তবলাদার! দেখ, অভ্যাস-অনভ্যাসের এমনই গুণ। এ গূঢ় রহস্য দেখিয়াও প্রবুদ্ধ হইবে নাকি? বুদ্ধিমানের প্রবুদ্ধ হইতে কয়

দিন লাগে। বুদ্ধিমান যদি তুমি, যাও তবে, এ মহাব্রত অবলম্বন কর গিয়া; দীক্ষিত কর, দীক্ষিত হও; একতার মূল ও মহামন্ত্র ঘরে ঘরে শিখাও। ইহাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, দেশাধিপতি সন্তুষ্ট হইবে; প্রজার উন্নতিতে রাজ্যেশ্বরের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই! আবার জিজ্ঞাসা করি, বুঝিয়াছ কি যে একতা শিখাইতে 'একতা' শব্দের আবশ্যক হয় না? পুনশ্চ নিম্নশ্রেণীকে আহার ব্যবহারে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, যদ্দ্বারা সে তোমার অভাবের অংশভাগী হইতে পারে: উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কর, যদ্দ্বারা তোমার অভাবজনিত একতায় সে যোগদান করিতে আগ্রহযুক্ত হয়, এবং যদ্দ্বারা সে আপন কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হইতে সক্ষম হয়। তাহাদের ফেলিয়া তুমি অগ্রসর হইলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না; তুমি চিত্তস্বরূপ, তাহারা হস্ত; চিত্তে সহস্র ইচ্ছা ও সহস্র অনুরাগ থাকিলেও, হস্ত যদি বেবশ হয়, তবে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তাহার পর তুমি নিজে উন্নত হও, তাহা হইলে যাহারা তোমার অধস্তনবর্গ তাহারাও তোমার সহবাসরক্ষার্থে দেখা দেখি আপনিই উন্নত হইয়া উঠিবে। চেষ্টা কর, চেষ্টা কেবল চেষ্টা, চেষ্টায় কি না হয়, যত্নে কি না ফলে?—"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

অতঃপর বাঙ্গারাম, সুশিক্ষা দ্বারা চিত্তপ্রশস্ততা লভিয়া, আত্ম-সংস্কারের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধিয়া, এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, কিঁ শারীরিক, কি মানসিক, তোমাতে নিহিত তাবৎ শক্তির যে সমগ্র সঞ্চালন, তাহারই নাম সাধনা বা কার্য্য; এবং এরূপ শক্তিসঞ্চালন হইতে যে পদার্থ রূপ গ্রহণ করে বা নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম সাধনফল বা কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিবার জন্যই, আমাদিগের এ জগতে আগতি; এবং ইহার প্রতি ঔদাস্য করিলেই আমাদিগের অধোগতি ও অগতি। যতক্ষণ দেখিবে, যে মানব বা যে জাতি কর্ম্মপরায়ণ; ততক্ষণ নিশ্চয় জানিবে, সে মানব বা সে জাতির দুর্ভাগ্য বা অধঃপাতের সম্ভাবনা নাই। সহস্র বিপৎপাত হইলেও, সে তাহা হইতে উদ্ধার হইয়া উঠিতে

পারিবে ; সত্যের আশ্রয়ে থাকিলে, বিপদ ঊৰ্দ্ধসংখ্যায় ক্ষণেক কালমাত্র মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তদতিরিক্তে আর কিছু করিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখিবে কর্ম্ম ঘুচিয়া তাহার স্থলে অকর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, সে মানব বা সে জাতির অধঃ-পাতে যাইবার দিন সেই পরিমাণে নিকট হইয়া আসিতেছে। এখন এই হিসাবে, আমাদের সমাজের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ, তথায় কি হইতেছে। তথায় কি শিক্ষা, কি আত্মসংস্কার, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস, কি শক্তিসঞ্চালন, ইহার কিছুরই গূঢ় এবং সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়ার যো নাই। শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরীর উপযুক্ত লিখন পঠন শিখিতে ; আত্মসংস্কার যাহা তাহা লোক ভুলাইতে ; কর্ত্তৃব্যবুদ্ধি যাহা তাহা উদরপূর্ত্তি করিতে এবং শক্তি-সঞ্চালন যাহা তাহা চাকুরী রাখিতে! যে কয়েকটী পদার্থে মনুষ্যকে দৃঢ় এবং প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তাহার সকলগুলিরই যেখানে অভাব, সেখানে আর কি বলিবার আবশ্যক হয় যে, কি জন্য তোমার ভারতীয় সমাজ প্রলয়বাত্যাবিতাড়িত ঘোর প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে ওতপ্লুত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে ; কেনই বা এখানে নানা বিষয় মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত হয় অথচ একটিও তাহার গোটা বাঁধে না ; কেনই বা এখানে তাবৎ বিষয় মৌখিক, আভ্যন্তরীণ জীবনব্রত একটীও হয় না এবং কেনই বা এখানে সমবেত সাধন কথা মাত্র, সমবেতসাধ্য কার্য্য একটীও কখন সম্পন্ন হয় না? যেখানে সকলেই নিয়মশূন্য প্রলয়প্রতিরূপ, সেখানে কে কাহার উপর স্থির বিশ্বাস করিতে বা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে!

কর্ম্ম শ্রমসাধ্য ; কিন্তু তুমি আয়েসবিলাসী। তুমি ভাবিতেছ, কর্ম্মের জন্য ভোগফল যাহা তাহা বহুদূরে; আপাততঃ কেবল খাটুনি সারমাত্র, কেবল আমার আয়েস আরামের ব্যাঘাত, অতএব রেখে দাও তোমার কার্য্য কর্ম্ম! নির্ব্বোধ, তাহা নহে। 'আপাততঃ' ধরিলেও, বৃথা খাটুনী নহে। গৌণ ভোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কর্ম্মের নিকট-ভোগ বিস্তর,

ইহার মধ্যে আরও একটী শ্রেষ্ঠ বিষয় এই, তোমার অকর্ম্মা আয়েস আরামের পরিণাম যাহা তাহা শোচনীয়, কিন্তু এ নিকট-ভোগের পরিণাম যাহা তাহা উত্তরোত্তর সুখকর। এ জগতে যাবতীয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী আনুষঙ্গিক সুখও ঈশ্বর নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার নৈমিত্তিক কার্য্যের কথা ছাড়িয়া দাও, নিত্য কার্য্যের মধ্যেই দেখ,—তোমার শরীররক্ষার্থে আহারগ্রহণ, বংশরক্ষার্থে সন্তানোৎপাদন, লোকযাত্রাবশে সংসারী হওন, ইত্যাদি তোমার নিত্য কার্য্য; কিন্তু দেখ ইহার প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে কতটা আশু সুখ, আশু তৃপ্তি নিহিত করা রহিয়াছে; এত পরিমাণে নিহিত আছে ও তাহা এত চিত্তাকর্ষক যে কখন কখন তুমি সেইগুলিকেই সুখের চরম ভাবিয়া, তাহার অতিরিক্ত উপার্জ্জনের আশায় ধাবিত হওতঃ আত্মধ্বংসে অগ্রসর হইয়া থাক। যেমন আশু সুখ দেখিতেছ আহার বিহার সংসারাদিতে; এ জগতের তাবৎ কার্য্যেই কার্য্যের পরিমাণ অনুরূপ, সেইরূপ আশু সুখ নিহিত করা রহিয়াছে। তাহাও আবার এক প্রকারে নহে, নানা প্রকারে; তোমার সুকার্য্যে সুখ্যাতি, মহৎকার্য্যে মহত্ত্ব, পরোপকারে যশ, এ সকল আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশু সুখের উপর অধিকন্তু ভোগ্য পদার্থ। ইহার পর আরও কি বলিবে, কর্ম্মারব্ধ বৃথা খাটুনী? বাঞ্ছারাম, যদি সুখ ও তৃপ্তি প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার প্রাপ্তি কঠিন নহে, কিন্তু কঠিন মনের ধাঁধাঁ ঘুচাইয়া তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া; পুনশ্চ ইহাও বলি, সকল ধাঁধাঁ নিরসনের উপায় আবার একমাত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি। তুমি যাহাকে আয়েস আরাম বল, তাহা যথার্থ আয়েস আরাম নহে; উহা কোন এক বা তদধিক ভোগ্য বিষয়ের অতিরেক বা বিভৎস ভাবে গমন ও তদ্দ্বারা আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কারকরণ মাত্র।

তাহার পর, এ সকল কার্য্য এবং তাহার আশু সুখ ও আয়েস আরাম এ সকলের অতীতে, আরও কতকগুলি অতিমহৎ কর্ম্ম আছে, যাহার আনুষঙ্গিক অপর কোন আশু সুখ নাই; যাহা আছে তাহা কেবল একমাত্র চিত্তপ্রসাদ। এ কথা কেবল অতিমহৎ কর্ম্মসমূহের

পক্ষেই খাটে; এবং সেরূপ কর্ম্মের সাধক যাহারা তাহারা ক্ষণজন্মা। ঈশ্বর যে এ সকল কর্ম্মের সঙ্গে অন্য কোন আশু সুখ নিহিত করেন নাই, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি জানেন যে, এ সকল মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা তেমন স্বল্পপ্রাণ ও ক্ষুদ্রমনা নহে যে তাহাদিগকে খাড়া রাখিবার জন্য, বালকবৎ আনুষঙ্গিক সুখামোদ ও তৃপ্তির প্রয়োজন হয়। এরূপ মহামনারাই সাধারণতঃ জগদ্‌গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। মহচ্চিত্তগণ ফলের প্রত্যাশা রাখেন না।

এক্ষণে কর্ম্মসংসারের মধ্যে কোন্ কর্ম্মে তুমি পারগ, কোন্ কর্ম্ম তুমি করিবে, কোন কর্ম্ম তুমি করিবে না বা কোন কর্ম্ম তোমার করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন বা নিরূপণ পক্ষে আমি কি বলিব? দেশ কাল ও পাত্র এবং শিক্ষাশক্তি ও যোগ্যতা, এতদনুসারে যে কর্ম্মে তুমি পারগ, যাহা তুমি চেষ্টা করিলে হস্তায়ত্তে আনিতে পার, তাহাই প্রাণপণে সাধিবে; অপর যাহা যাহা তাহার প্রতিকূলতা করে, তাহার পরিহার বা তাহাকে বিদূরিত করিবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। মনুষ্যশক্তি সর্ব্বদাই অসীম এবং অনন্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট; তাহাকে আপাদমস্তক অনুজ্ঞা বা নিয়মগণ্ডি দ্বারা আবদ্ধ করিতে যাওয়া মহাভ্রমের কার্য্য। শক্তিপরিচালনের সূত্র প্রদর্শন ও পরিচালনের ধারা বাঁধিয়া দেওন, এবং তাহা হইতে যাহাতে চ্যুত না হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিচালকের নিকট পরিচালিতেরও অধীনতা সেই পর্য্যন্ত। তদতিরিক্তে কি ধর্ম্ম কি আইন, যাহা দ্বারাই দৃঢ় বাঁধিতে যাইবে, তাহাতেই কেবল অনর্থের উৎপত্তি হইতে থাকিবে। মানব সর্ব্বতঃ অধীন হইয়া সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তাহাকে সর্ব্বতঃ অধীন করিতে গেলে, প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত ফলের উৎপাদন হইয়া থাকে। নিয়ম এবং স্বাধীনতা, এ দুয়ের সামঞ্জস্য হওয়া উচিত। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, যেখানে ধর্ম্মবন্ধনের গোঁড়ামি অধিক, সেই খানেই অধিক অনর্থোৎপত্তি; যেখানে আইনের কঠোরতা অধিক, সেই খানেই অপরাধের সংখ্যা বেশি এবং অপরাধের আকারও

গুরুতর; যেথানেই দপ্তর-নিয়মের চাপাচাপি,সেই থানেই গোঁজামিলান পাটোয়ারীপণার বাহুল্য। দেখ, ইংরাজী ছাদুনী বাঁধুনী আইনের ফল, দেশশুদ্ধ মিথ্যাপ্রাণ মামলাবাজী; ইংরাজী দপ্তর-নিয়মের ছাঁদুনী বাঁধুনীর ফল, কেবল রিপোর্টপ্রাণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট; ধর্ম্মবন্ধনের গোঁড়ামীর ফল, ভারতের আধুনিক অধঃপতন; আর ভারতীয় রাজ-শাসনের ফল, মহৎপ্রাণের দূরভাব! অতএব মনুষ্যশক্তিকে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ করা সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। কেবল কর্ম্মোপযোগী করিয়া দিবার নিমিত্ত ছন্দোবন্ধের প্রয়োজন; কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাচন ও সাধনস্থলে, পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে।

কিন্তু এই সুযোগে এথানে এই একটী কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটী কার্য্য আপাততঃ সুকার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, সহসা তাহার মোহে মোহিত হইও না। যে কার্য্য কেবল তোমার সুখ বা শুভ উৎপাদন করে, কিন্তু সমাজ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সুকার্য্য-রূপে দৃষ্ট হইলেও সু নহে। দেখ, দাতৃত্ব সুপ্রবৃত্তি এবং দান করা সুকার্য্য; কিন্তু যদি অপাত্রে দান কর, তবে আর তাহা সুকার্য্য রহিল না। হইতে পারে সেরূপ দান করায় তোমার মনে কিঞ্চিৎ সুখোৎ-পত্তি হয়, কিন্তু সমাজ তাহাতে সমূহরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, সেরূপ দানে আলস্যের প্রতি উৎসাহ হওয়ায় অলসতার বৃদ্ধি হেতু যতগুলি লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, সমাজ এক দিকে ততগুলি লোকের শ্রম এবং শ্রমোৎপন্ন ফলে বঞ্চিত, অন্য দিকে ততগুলি লোকের ভারে ভারগ্রস্ত হয়। ঐরূপ ক্ষমা করা একটী সৎকার্য্য; কিন্তু অননুতপ্ত দুষ্টকে ক্ষমা করিলে আগে সে সঙ্কুচিত থাকায় যেথানে একটা দুষ্টামী করিত, এখন সে অসঙ্কুচিত হওয়ায় একটার স্থানে পাঁচটা দুষ্টামী করিবে; অতএব দেখ ইহাতে সমাজের লোকসানের ভাগ কত অধিক। এইরূপ দৃষ্টি তাবৎ কার্য্যে রাখা উচিত। যে কার্য্য নিজ এবং সমাজ উভয়ের সুখ বা শুভোৎপাদক, তাহা উত্তম; যাহা কেবল নিজের সুখোৎপাদক কিন্তু যাহাতে সমাজের শুভ বা

অশুভ কিছুই ঘটে না, তাহা মধ্যম; যাহাতে কেবল নিজের সুখ কিন্তু জনসমাজের যাহাতে অসুখ তাহা অধম;—এখানে নিজের সুখের প্রতি ত্যাগস্বীকার আবশ্যক; আর যে কার্য্যে নিজেরও অসুখ সমাজেরও অসুখ, তাহা অধমাধম। সমাজ যদিও উচ্ছৃঙ্খলতা ও মতিচ্ছন্নতা হেতু সকল সময়ে এ সকল কু ও সু কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারুক, তথাপি তুমি, তোমার আত্মকর্ত্তব্যবোধ অনুসারে যাহা সুকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত, তাহা করিয়া যাইবে; সমাজ এখন তাহা বুঝিতে না পারিলেও, যখন তাহার মতিচ্ছন্ন ভাব বিগত হইবে, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে। সমাজের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে সহজ কথায় তোমাকে এই একটী সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি যে, পরিবারস্থ থাকিয়া পিতামাতার সুখাসুখের প্রতি দৃষ্টি রক্ষাপূর্ব্বক যেরূপ আত্ম-চালনা ও ত্যাগস্বীকারাদি করিতে হয়, সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিবে, সমাজও তোমার পিতৃমাতৃস্থলীয়, এবং ভারত-সন্তানের পক্ষে সুধু আবার পিতৃমাতৃস্থলীয় নহে, বৃদ্ধ বায়ান্তরে প্রাপ্ত অবুঝ পিতৃমাতৃস্থলীয়; কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে, পিতা যাহাই হউন তথাপি তিনি—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ"; আলেক্‌-জাণ্ডারের এক ফোঁটা মাতৃ-অশ্রুতে আন্তিপেতরের শত শত পত্র বানের মুখে ভাসিয়া গিয়াছিল! বিশেষতঃ সমাজের লোকসানে তোমার লোকসানও ত কম নহে; বরং অন্যবিধ লোকসানের অপেক্ষা অপার গুণে অধিক। ভারতসন্তান, আরও একটী কথা স্মরণ রাখিও, সত্ত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণসমাবেশে জগৎসৃষ্টি, এই ত্রিগুণসমাবেশে তোমার সৃষ্টি; অতএব তোমার কর্ম্মস্থলীতে এই তিন গুণেরই সার্থকতা হওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমার কর্ম্মজীবন বিফল হইয়া যাইবে; কেবল সত্ত্বগুণের মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহাভিভূত হইও না।

এখানে আরও একটী কথার অবতারণা করা আবশ্যক। আমাদের সাধনাস্থলে আর কতকগুলি এমন বিঘ্ন আছে, যাহা আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র অনবধান বা বিবেচনার দোষে উপস্থিত হইয়া, প্রায়

সমস্ত নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। উহা, বলিতে গেলে, বস্তুতঃ সাধনার জন্য অবলম্বিত উপায়ের মধ্যে কোন এক ত্রুটি বিশেষের ফল মাত্র। কি শারীরিক, কি মানসিক, যন্ত্রগুলি যখন সামঞ্জস্য সংমিলনে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তখন তাহা স্বাস্থ্যের চিহ্ন; সুতরাং পরিণামফলও সুন্দর হইয়া থাকে; তদন্যতরে রোগ, পরিণামফলও তদ্রূপ হয়। কথিত বিঘ্নগুলি, সামঞ্জস্যচ্যুত চিত্তবৃত্তি বিশেষের অযথা অনুসরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অতি-কল্পনা এবং অতি-আশা এই দুইটী প্রধান অনিষ্টকারী। অতি-কল্পনার মোহ অতি দুরন্ত; ইহার মূর্ত্তি আশু-মনোহারিণী, সুতরাং সহসা আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মানব ইহার মোহে পড়িয়া অকর্ম্মণ্য খেয়ালী হইয়া যায় এবং সেরূপ মানবের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' অভিনীত হয়। এমনও দুর্ভাগ্যবান্ কল্পনাপ্রিয় অনেক দেখা গিয়াছে, যে, যাহারা কেবল উপন্যাস পড়িয়া, উপন্যাস সংসারে বিচরণ করতঃ, সত্য সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়; বিপুলা অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও, একটা সামান্য কল্পিত সৃষ্টির মোহে মোহিত হওতঃ, একবারে অকর্ম্মণ্যতায় আসিয়া উপনীত হয়। অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে! সত্য বটে কল্পনা সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান এবং বিষয়ানুভূতির প্রসূতি স্বরূপ, কিন্তু তাহাও, জানিবে, কল্পনা ততক্ষণ ভাল, যতক্ষণ লাগামসংযুক্ত; যতক্ষণ তাহা কর্ম্মভূমির সীমা ত্যাগান্তে শূন্যপথে প্রধাবিত না হয়; যতক্ষণ অপরাপর মানসিক বৃত্তি সহ সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া না যায়।

অতি-আশার পরিণাম নিরাশা; নিরাশার পরিণাম অকর্ম্মণ্যতা এবং জগতের প্রতি বিদ্বেষভাব। আশা অনন্ত হইলেও, দেশ কাল ও যোগ্যতা অনুসারে তাহার পরিমাণ করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। ভারতসন্তান আশার পরিমাণ করিতে না জানিয়া, এক্ষণে নিরাশায় মগ্ন হইয়া আছে; কোন দিকেই সম্ভবতা বা কোন দিকেই সফলতা দেখিতে পাইতেছে না। বাঞ্ছারাম,

ইহাই না এখন তুমি সর্ব্বদা ভাবিয়া থাক ;—যথায় কোটি কোটি মানব সমবেত, এবং যথায় জাতীয় কার্য্য কোটি কোটি মানবের সমবেতসাধ্য, তথায় আমি একা ক্ষুদ্র মানব যত্ন ও শ্রম করিলে কি গণনায় আইসে বা কি করিয়া তুলিতে পারি ? বাপু! আশার আয়তন দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছিলে, এখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তে জড়িত হইয়া এ নিরাশামগ্ন হইতেছ কেন ?—কোটি মানবের ভার একা লইতে তোমাকে কেহ বলে নাই। সে ভার যাহারা লইতে পারে, তাহারা লউক; কিন্তু তুমি আপন ভারে কতদূর ভারযুক্ত হইয়াছ বলিতে পার ?—তাহাতে তোমার কাজ, সে ভার ত অন্যে লইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ভারে ভারযুক্ত জ্ঞান ও আপন ভারে যথাবিধি সাত্বিক ভাবে ভারমুক্ত হইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল ; কাজ কি তোমার অন্যের খোঁজ লইয়া। তুমি আপন খোঁজ পূর্ণভাবে লইতে শিখ, আপন শক্তি যথা-পরিমাণে যত দিকে তুমি চালাইতে সক্ষম তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তবে জাতীয় কার্য্য ? বিদ্যুৎবজ্রঘোষী ধারাবর্ষী মেঘ একেবারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় না। এক একটি নগণিত বাষ্প সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন ভাবে, নানা দিগ্‌দিগন্তে নানাস্থানে নানা দেশে উত্থিত হইয়া, শেষে প্রবাহ বায়ুযোগে একত্রীকৃতে, অনন্তকোটি নিঃসম্বন্ধ বাষ্প সংযোজিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইবায়, আজিকে মেঘমূর্ত্তিতে তোমার ঘর ও দেশ ভাসাইবার জন্য, আকাশমণ্ডলে সমাগত হইয়াছে। তোমারও কর্ম্মসকল যদিও এখন নিঃসম্বন্ধ, নির্জ্জন, নগণিত বাষ্পবৎ ; কিন্তু সর্ব্বদা তাহারা সেরূপ নিঃসম্বন্ধ থাকিবে না। নৈসর্গিক নিয়ম সেরূপ নহে। জানিবে, সত্বরেই একজাতীয় প্রকৃতি হেতু, প্রতি ব্যক্তির অভাব জাতীয় অভাবে পরিণত হওয়ায়, তদুৎপন্ন একতারূপী প্রবাহবায়ু উপস্থিত হইয়া প্রতিব্যক্তিগত কর্ম্ম, যাহা এখন নগণিত বাষ্পবৎ, তাহাদের একত্রীকরণে, মহামেঘমূর্ত্তি রচনা করিয়া কালে ধারা বর্ষণ করিতে থাকিবে ; এবং যে পাহাড় পর্ব্বত এখন দুর্ভেদ্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালে তাহাও সে তরঙ্গাভিঘাতে ভিন্ন এবং ভগ্ন হইয়া যাইবে।

এখন তোমার পক্ষে মোটের উপর কথা এই, তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও; পরের কাজ পরে দেখিবে; তোমার স্বনিহিত শক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ তোমার পাপ পুণ্যের অপরে যখন কেহ ভাগী হইবে না, এবং স্রষ্টার নিকট প্রাপ্য যাহা, তাহা সমস্তই যখন তোমার নিজের, তখন অন্যের দিকে তাকান বা অন্যের দিকে তাকাইয়া নিরাশ হওয়ার আবশ্যক? তুমি আপন মনে আপনি কার্য্য করিয়া যাও, অপর কোন সৎকর্ম্মশীল তোমার নিকটস্থ হইলে, সমধর্ম্মী যৌগিকাকর্ষণের ফলে, দেখিবে, সে আপনা হইতে আসিয়া অতর্কিতভাবে তোমাতে সম্মিলিত হইবে, ও তুমিও অতর্কিত-ভাবে আগু হইয়া সম্মিলিত হইয়া যাইবে। অতএব নিরাশায় মাতিয়া সকল পণ্ড করিও না; অথবা অপরিমিত আশাতে মজিয়াও সকল নষ্ট করিও না। পুনশ্চ মহৎ কর্ম্মপক্ষে ইহা জানিবে যে, মহত্ত্ব সহসা পরিচিত হয় না, মহৎ কর্ম্মমাত্রে সহসা ফলযুক্ত হয় না। মহত্ত্ব পরি-চিত হইতে, বা মহৎ কার্য্য ফলযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে যে বর্ষ, বহুবর্ষ, শতাব্দী, বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। কথায় বলে এ পৃথিবীতে শয়তানেরও প্রতাপ অর্দ্ধেক; যদিও মহত্ত্ব অবিনাশী, তথাপি তাহার প্রচার হইবামাত্র, তাহাকে বিলোপ করিবার জন্য চার দিক হইতে শয়তানী ফৌজ আসিয়া ঘিরিয়া বইসে। প্রথমে সাময়িক তাচ্ছল্য, উপহাস বা অশ্রদ্ধা আসিয়া আক্রমণ করে। কালে তাহারা হটিলে, তখন ভক্তির ভেক ধরিয়া পেশাদারী টীকা, টিপ্পনি, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আসিয়া নানা আড়ম্বরে মহত্ত্বের অর্থ বিরূপ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। তার পর তাহারাও যখন দূর হয়, তখন মহত্ত্বের অর্থ কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম ও ফলপ্রসূ হইতে থাকে। দেখ, এই সকল পুনকে শত্রু দূর করিতেই কতদিন যায়; তাহার পর অন্য কথা। কিন্তু হইলই বা বাঙ্গারাম, ক্ষতি কি তাহাতে? কারণ, কর্ম্ম যাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে, সংসার তাঁহার অনন্ত; সুতরাং যোগ বিয়োগ জের চলিয়া যথাকালে ফলবান হইতে দেশ এবং কাল কিছুরই

অকুলান পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত থাকিও, সৎকর্ম্ম যতটুকু হউক, একবার কৃত হইলে আর তাহার লোপ নাহি। তাহা আবশ্যক কালের জন্য অনন্ত গৃহে জমা হইতে থাকিবে; যথা-নিয়ম তথায় তাহা অঙ্কুরিত,বর্দ্ধিত, অনন্ত ফলে ফলযুক্ত ও প্রতিপ্রসবে অনন্ত বিস্তারে বিস্তারপ্রাপ্ত হইতে চলিবে। তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে সুবীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক; তাহার পর তাহা অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত ও ফলবিশিষ্ট হইতে দেখা যাঁহার কার্য্য তিনি দেখিবেন। তজ্জন্য অনুরোধ, অননুরোধ উভয়ই সমান। অতএব আবার বলি, আশু ফলের দেখা না পাইয়া নিরাশামগ্ন হইও না। তোমার অস্তিত্বের যে সার্থকতা তাহা প্রধানতঃ কর্ম্মসংগ্রামে রতি বা বিরতির পরিমাণে।

অতঃপর ভারতসন্তান,আর কি সাধনার কথা বলিব? বলিবার অনেক ছিল; যদি দ্বৈপায়নের ন্যায় তত্ত্বদর্শী এবং গেটের ন্যায় বাক্যবিশারদ হইতাম, তাহা হইলে কতক বলিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি বিদ্যাশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানশূন্য, সর্ব্বশূন্য, আমার সে সামর্থ্য কোথায়? তবে সহজ কথায় সত্যবিশ্বাসে যাহা যাহা মনে আসিল তাহা তোমাকে বলিলাম; তুমিও সত্যমনে সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে শুনিও। এখন আবার একবার অনুরোধ করি, নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমার আবশ্যক কতদূর। সিদ্ধি ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না,—'কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।'

যে পাষণ্ডতার স্রোতোবেগ দেশ আকুলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে সকলই খণ্ড খণ্ড,কেবল উঠিতেছে পড়িতেছে এবং গঠনের কোথাও চিহ্ন বা আশা মাত্র নাই; কতদিনে যে তাহার বেগ ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে? ভারতসন্তান, আর ঘুমে মত্ত হইও না, আর নাস্তিকতার মিছা ঘোরে ঘুরিও না। নাস্তিকতা ভ্রম। ঈশ্বর এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় সিংহা-সনে সমাসীন থাকিয়া রাজত্ব করিতেছেন;এখনও তিনি বিশ্বসহ তুমি আমি পিপীলিকা পরমাণুটীকে পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছেন। কুতর্কে ভুলিও না। কখন কখন কুতর্কে ভুলিয়া যে প্রকৃতিতে সমস্ত আরোপ করিতেছ,

যাহাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মানিতেছ, তাহারই শিক্ষা অবলম্বন কর; সেই তোমাকে তোমারই কৃত কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা দিবে যে, কর্ত্তা ব্যতীত,চিত্ত ব্যতীত, কর্ম্ম সম্ভবে না;—তোমারও তদুভয় ব্যতীত সম্ভব হয় নাই; এবং ইহাও শিখাইবে যে, এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র পরিমাণ ও উদ্দেশ্য। ন্যায় বিজ্ঞানাদির কুজ্‌ঝটিকাতে অন্ধ হইয়া ভাবিও না যে, তাহার পশ্চাতে নিত্যসিদ্ধ সূর্য্য এখন অস্তিত্বশূন্য; সেই বিজ্ঞানাদিই তোমাকে শিক্ষা দিবে যে, সূর্য্যতেজে কুজ্‌ঝটিকার উৎপত্তি, সূর্য্যতেজে তাহার স্থিতি, এবং সূর্য্যতেজেই তাহার কর্ম্মকারিত্ব। তোমার বিজ্ঞানও, সেই বিশ্বনিয়ন্তৃ-প্রভব-শূন্য হইলে, অকার্য্যকর হইয়া থাকে। মিথ্যা সামাজিকতা পরিত্যাগ কর, আত্মপ্রকৃতিতে প্রকৃতিবান্ হও, আত্মাবলম্বন কর। এক একজন লইয়া পাঁচ জন; তবে কেন তুমি সেই পঞ্চকৃত মুখসে আত্মগোপন করিয়া আত্মপ্রকাশে লজ্জিতবোধ করিয়া থাক। যে প্রকৃতি পাঁচজনে লইতে বলে তাহা লইও না, যাহা ঈশ্বর লইতে বলেন তাহাই অবলম্বন করিও। পাঁচ জন হইতে ঈশ্বর বড়। পাঁচ জনের সুখ্যাতি-অখ্যাতি-নির্ম্মিত পন্থাকে পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও না; তোমার স্রষ্টৃ-নিয়োজিত কর্ত্তব্যবোধের উপর কর্ম্মমূল স্থাপিত করিয়া চলিও, এবং তাহাই পন্থা বলিয়া জানিও। এরূপ কর্ম্মমূল, অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া, যে ভিত্তির উপর স্বয়ং কালসমুদ্র স্থাপিত, সেই ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ মূলোৎপন্ন কর্ম্ম এবং তাহার যে সার্থকতা, তাহা কালের অপেক্ষা রাখে না।

যে কোন কার্য্য করিবে, চীৎকার করিও না; এত চীৎকারে, এত চীৎকারের গরমে, যে কোন পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। নির্ব্বাক হইতে শিখ, শৈত্যে যৌগিকাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়, দূরপ্রসারিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পদার্থ রচনা করিয়া থাকে। নিত্য সংস্করণ, নিত্য সভা, নিত্য বক্তৃতায় তুমি ব্যাপৃত; তাহাতে তোমার আদর ভিন্ন অবমাননা করি না; কিন্তু এই বলি, যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া করিও; তাহার

কর্ত্তব্যভাব এবং আবশ্যকতা অবধারণ করিও। নতুবা অপরে শ্রান্ত হইয়া পিপাসার তাড়নে জলপান করিয়া সুখলাভ করিল, আমিও তাহা দেখিয়া ঘট ঘট জল পান করিতে বসিলাম; কিন্তু শ্রান্তি যে তাহার জলপানে সুখের একমাত্র নিদানভূত কারণ তাহার প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলাম না; সুতরাং আমার লব্ধফল উদর ফাটিয়া যাওয়া! আর এক কথা, যাহা করিবে তাহা ভারতীয় হইয়া কর, ফিরিঙ্গী হইয়া করিও না; তাহা হইলে প্রকৃতিনিয়োজিত কর্ম্মস্থলীর বাহিরে গিয়া পড়িবে। যে সকল লোক ভারতীয় ঘুচিয়া ফিরিঙ্গী হইতে চাহে; তাহাদের পরিধেয় সহস্রমুদ্রাক্রীত এবং আহারীয় লক্ষমুদ্রাক্রীত হইলেও, তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই পৃথিবীতে মহত্ত্বের মূল আহার বিহারের অতীতে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ ছিন্ন বস্ত্র এবং ছিন্ন আহারীয় সত্ত্বেও তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা অতুলনীয় মহৎ। তাহারা ভীরু, তুমি তাহাদিগের তুলনে বীরপুরুষস্থলীয়। তাহারা স্বজাতীয় গন্তব্য পথের দুঃখক্লেশে ভীত হইয়া,বিধর্ম্মী বিজাতীয় পথের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু তুমি বীরভাবে সেই দুঃখক্লেশে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া, স্বজাতীয় গন্তব্যপথেই গতিশীল হইয়াছ। তাহারা উপহাসের স্থল, তুমি সকরুণ অশ্রু আকর্ষণের স্থল। কুকুরের কণ্ঠে সোণার কণ্ঠী হইলেও, সে কখন দারিদ্র্যপতিত দুঃখকর্ষিত মানবের সঙ্গে সমতায় আসিতে পারে না। যে জাতীয়ত্ব হেতু স্পার্টান জননী অকাতরে স্বীয় সন্তানকে সমক্ষে বলিপ্রদত্ত হইতে দেখিয়াছে; যে জাতীয়ত্ব হেতু অপূর্ব্ব তীর্থ-স্থলী থার্ম্মপিলি ক্ষেত্রের উৎপত্তি; যাহার প্রভাবে রামায়ণের রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যাহার প্রভাবে উইলেম টেল এবং ওয়ালেসের অদ্ভুত কীর্ত্তি; যাহার প্রভাবে অসভ্য বর্ব্বর মেক্‌সিকো ও পেরুভীয়গণও অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিয়াছে; এবং যাহার প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় ভিন্ন আর যে কোন জাতি অকাতরে রক্ত দান করিয়াছে ও করিতে প্রস্তুত; সেই জাতীয়ত্ব যে যে জন যৎসামান্য আপাততঃ সুবিধার খাতিরে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়;

মাতৃভাষা পর্য্যন্ত যাহাদিগের নিকট "অভ্" বলিয়া ত্যাজ্য হয়, এই জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সে সকল লোকের মূল্যই বা কি, তাহাদের পদার্থই বা কোথায়? তাহারা প্রকৃতির গর্ভস্রাব!

সেই সকল অঘোর স্বপ্নে উন্মত্ত হইও না; আশু চাকচিক্য দৃষ্টে ভুলিও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস কর. তোমার কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাস কর, এবং কি জন্য সে ক্ষমতা তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রবুদ্ধ হও। ঈশ্বর-প্রীতিকর তোমার কর্ত্তব্য কি তাহার অবধারণ কর;—সুকার্য্য মাত্রই ঈশ্বর-নিয়োজিত। দেখ, তোমার সুশিক্ষিত আত্মবুদ্ধিতে এ সংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য সৎ এবং মঙ্গল-দায়ক, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অসৎ এবং অমঙ্গলদায়ক। যাহা সৎ তাহা বাছিয়া লও। তাহার মধ্যে আবার দেখ, কোন্ কোন্ গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত এবং তোমার মতি গতি ও রুচির পরিপোষক। যে গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বুঝিবে, এবং যাহাতে তোমার রুচি হইবে, সেই গুলিই তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণিবে। তাহার পর বহুকার্য্য অথবা একটীমাত্র কার্য্যও, আমূলত হয়ত একই সময়ে, একই উপায়ে, একই প্রকরণে, সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল তাহাই হউক। তবে এখন দেখ যে গুলি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত, তাহার মধ্যে কোন্টী বা কোন্টীর কোন্ অংশ, তোমার বর্ত্তমান শক্তি, সময় ও উপায়ে সুসাধ্য হইতে পারে। এরূপ বিচারণায় যে অংশ তোমার আপাততঃ সুসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহাই প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হও। দেখিতে পাইবে, উহা সুসম্পাদিত হইতে না হইতেই, তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা যাহা এবং তাহার উপায় আদিও যাহা, তাহারা আপনা হইতে তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণে যত্ন করিও, হেলা করিও না; যেহেতু কে কতখানি কার্য্য করিল তাহা লইয়া পরিমাণ নহে, পরিমাণ কে কতখানি আত্ম-শক্তির প্রয়োগ করিল। এরূপে কর্ম্মনিরত হও; সমাজও, আজি হউক, কালি হউক, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন তোমারই অনুরূপ

সাত্ত্বিক প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তখন দেখিবে, সামাজিকতাকে তুমি উপেক্ষা করিলেও, সে তোমাকে উপেক্ষা করিবে না; উল্‌টিয়া তোমার সম্মান করিবে, এবং এমন কি তোমার পূজা পর্য্যন্তও করিবে।— এইরূপ স্থানেই সামাজিক নিয়োজন এবং ঈশ্বরকৃত নিয়োজন একতায় আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে, এবং এইখানেই একতার তার আসিয়া সমাজের মধ্যে আমূলতঃ পরিচালিত হয়। অতএব আবার বলি এরূপে কার্য্যনিরত হও, তোমার উন্নতি হইবে, তোমার জাতীয় উন্নতি হইবে, এবং জগতেরও উন্নতি হইবে। তখনই, আর পাঁচ কার্য্যের মধ্যে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, এই গ্রীকদিগের ভগ্নাবশেষ ও উত্তর ফল হইতে কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, কোন্ কোন্ বস্তু করিবে না; এবং আত্মজাতীয় কোন্ কোন্ অকার্য্যকর বস্তু ফেলিবে, এবং কোন বস্তু বা ফেলিবে না; এবং তখনই কেবল, বিবিধ উপকরণ, স্বভাবে পরস্পর বিধর্ম্মী হইলেও, কেমন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয় তাহা জানিতে এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব সৃষ্টিরচনে সমর্থ হইতে পারিবে। উক্ত জাতীয় ভগ্নাবশেষাদি হইতে কি গ্রহণ করিবে, কি গ্রহণ করিবে না, আমি তাহা নির্ব্বাচন করিলে যদি হইত, তাহা করিতাম। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেক রুচি ও শক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেক নির্ব্বাচনও বিভিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য; বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়া এই বিশ্ব, বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়াই পূর্ণতা, এখানেও সেই বহু প্রত্যেক রাশিতে সমষ্টি সাধিত হইয়া পূর্ণতা সাধন করুক। আমার নির্ব্বাচন করা পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত যে আর বাতুলের স্বপ্ন দেখিও না; ইহাতে কোন কার্য্যই হইবে না; কেবল বাতুলতা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। প্রস্তুত হইতে এবং অধিকারী হইতে পারিলে, স্বকার্য্য আপনা হইতে হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভারতসন্তান, তবে আর স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। এই কর্ম্মক্ষেত্রে বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছ; আর কত

কাল নিদ্রা যাইবে; কত বিশ্রাম করিবে? উঠ, উঠ, সুষুপ্তিরও সীমা আছে, সুষুপ্তিত্যাগে জাগরিত হও, চক্ষু উন্মীলিত কর; একবার দেখ দেখি; তাকাইয়া দেখ, মাতৃভূমির কি দুরবস্থাই না করিয়াছ; সুষুপ্তি তোমার কি সর্ব্বনাশই না সাধিয়াছে; সেই সোণার মাতৃভূমি ছারখার, তুমি নিজে ছারখার, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে তোমার সেই জীবনান্তে অবলম্বনস্থল পিতৃস্থানও কিরূপ ছারখার হইয়া আসিয়াছে। এখনও জাগরিত হও, ভারতসন্তান! এখনও জাগরিত হও, হইয়া এখনও সময় থাকিতে স্বকার্য্য বুঝিয়া লও। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-যুক্ত, স্বাত্মাবলম্বী কর্ম্মবান্ হইতে শিখ; ইহ পর লোক উভয়েতেই আবার তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। জয় জগদীশ হরে।

ইতি উপসংহার।

প্রথম পরিশিষ্ট।

-:+:-

১৩৮ পৃষ্ঠা।

গ্রীক পুরাণ।

১। দেববংশ।

এই প্রবন্ধের পাঠকেরা স্বদেশীয় পৌরাণিক বৃত্তান্ত অল্প বিস্তর সকলেই কিছু না কিছু জানেন, অন্ততঃ তাঁহাদের জানা উচিত। কিন্তু গ্রীক পুরাণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সে কথা প্রযুক্ত হয় না, অনেকে তাহা না জানিলে না জানিতে পারেন। অতএব এই প্রবন্ধমধ্যে বর্ণিত গ্রীক পৌরাণিক বিষয় সকলের সম্যক্ পরিবোধার্থে, এক্ষণে গ্রীক পুরাণ অতি সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন করিব। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ বোধ করি এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় পাঠ করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। যখন আমাদের জ্ঞানসংসার ও কর্ম্মসংসার উভয়ই ক্রমে অতি-বিস্তৃত ও বহ্বায়তন হইয়া পড়িতেছে, এবং যখন বহুতর জাতীয় সংঘর্ষে লিপ্ত অথচ আত্ম বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, তখন কেবল স্বীয়, স্বদেশীয়, স্বজাতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে কি ফল হইবে? সে জ্ঞানকে এক-দেশদর্শী জ্ঞান বলে এবং তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। এখানে গ্রীক পুরাণের কথা পড়িয়াছে, তাই গ্রীক পুরাণ উপলক্ষ করিয়া ও কথা বলিতেছি; নতুবা বিজাতীয় যে কোন বিষয় সম্বন্ধেই ওকথা প্রযুক্ত, এবং তত্তাবতে যথাসাধ্য জ্ঞান ও দর্শনলাভের একান্ত আব-শ্যকতা। অতঃপর আর ভূমিকার আবশ্যক নাই। বাঙ্গারাম, এখন স্থিরভাবে শুন; ছাই পাঁশ যাহাই হউক, শুনায় ফল আছে।

গ্রীক পুরাণের কীর্ত্তনকর্ত্তা যিনি যিনি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

হোমার, হেসিওদ্ এবং অর্ফিউস্ সর্ব্বাগ্রগণ্য; ইহাঁরা প্রাচীনতত্ত্বজিজ্ঞাসু-বর্গের আদরের পাত্র। ইহাঁদের প্রাদুর্ভাবকাল কোন্ সময়ে, তাহা লইয়া প্রাচীনতত্ত্বজিজ্ঞাসুবর্গ, যেমন তাঁহাদের দস্তুর আছে, নানা জনে নানা মত প্রকটিত করিয়াছেন। আমাদের সে বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখি না। গ্রীক ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ইতিহাসবিৎ ইংরেজ গ্রোট সেই বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়া যে সময় নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহাই এ স্থলে গ্রহণ করিলাম। হোমারের বিষয় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু গ্রোট ও অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক আদৌ তাহার অস্তিত্বেই সন্দেহ করিয়া থাকে। আর যাহারা বা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারাও নানা জনে হোমারের নানারূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তবে এটা ঠিক বটে যে, যে সকল পৌরাণিক বিবরণ হোমারের নামে চলিত, সে সকল আর সমস্ত গ্রীক পৌরাণিক বিবরণ হইতে পুরাতন। অতএব এখানে হোমারের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য সম্বন্ধে বলি। অন্যান্য সম্বন্ধে গ্রোটের উক্তিমতে, হেসিওদের প্রাদুর্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ৭৫০ হইতে ৭০০ শতাব্দীর মধ্যে; এবং অর্ফিউস্ খ্রীঃ পূঃ ৭০০ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[১] অতএব গ্রীক পুরাণও সামান্য পুরাতন নহে। আমাদিগের দেশে ভূর্জ্জপত্র-নিঃশেষা অষ্টাদশ পুরাণের উপস্থিতির পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ সাধারণতঃ পুরাণ নামে আখ্যাত ও গৃহীত হইত; ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল শ্রুতিমধ্যে গণনিত হইলেও, উহাই ফলতঃ হিন্দুদিগের মূল পুরাণ। ইউরোপীয় পণ্ডিত মক্ষমূলর ঐ আদি পুরাণ সকলের প্রাদুর্ভাবকাল খ্রী পূঃ ৮০০ শতাব্দী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে। তাহার গবেষণাবিদ্যার আরও শ্রীবৃদ্ধি

১। অর্ফিউসের অস্তিত্ব আদৌ অনেকে অস্বীকার করিয়া থাকে। যাহা হউক, এখানে অর্ফিউস বলিলে, অর্ফিকপুরাণের গ্রন্থকার যে, তাহাকে বুঝাইলেই যথেষ্ট হইল। কেহ কেহ গীতিকাদেবী কালিওপির পুত্র বীণাবাদক অর্ফিউস্‌কে প্রোক্ত অর্ফিউস্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

হইতে থাকুক। এখন মক্ষমূলরের গণনা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুপুরাণ এবং গ্রীকপুরাণ একরূপ সমসাময়িক হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ মক্ষমূলরের গণনা হইতে হিন্দুপুরাণ অনেক পুরাতন। কিন্তু সে যাহা হউক, কালে সমসাময়িক না হইলেও, এতদুভয় পুরাণের মধ্যে পৌরাণিক জীবনের সমভাবত্ব সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যে পর্য্যায়ের পৌরাণিক জ্ঞানজীবন উদ্ভিন্ন হওয়ায়, হিন্দুপুরাণের উৎপত্তি; প্রায় সেই পর্য্যায়ে গ্রীকগণ সমাগত হইলে, তাহাদিগের ঐ কথিত পুরাণগুলির উৎপত্তি সাধন হইয়াছে। অতএব কৌতূহলাক্রান্ত বাঙ্গারাম, এ স্থলে স্বচ্ছন্দে এতদুভয় মধ্যে তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে উচ্চেতর ভাব নিরূপণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে।

তাহার পর, হিন্দুপুরাণকে অতিক্রম করিলে, যেমন মানবীয় কাল-প্রভাতের সহ সমুৎপন্ন প্রাচীনতম বেদের দেখা পাওয়া যায়; হেসিওদ্ ও অর্ফিউস্ প্রভৃতির কীর্ত্তিত পুরাণ সকল সেইরূপ অতিক্রম করিলে, কেবল হোমারিক স্তোত্রকলাপ পাওয়া যায়; তদূর্দ্ধে আর কিছুই পাওয়া যায় না। হোমারিক স্তোত্রসমূহের প্রাদুর্ভাবকাল ঊর্দ্ধ সংখ্যা খৃঃ পূঃ ১০০০—৮০০ শতাব্দীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হোমারিক স্তোত্র বলিলে যে সমস্তই হোমার বা ইলিয়দ্-কর্ত্তার রচিত, তাহা নহে। ইলিয়দের উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপন্ন যে কিছু স্তোত্র ও গাথাসমূহ কাল ভেদ করিয়া সমাগত হইয়াছে, তাহারা সকলেই "হোমারিক" এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

হেসিওদের পুরাণ অর্ফিউসের পুরাণ অপেক্ষা বিস্তৃত এবং অধিক পরিষ্কার ও পরিস্ফুট। এজন্য মূল প্রস্তাবে হেসিওদ্-কৃত পুরাণই অনুসৃত হইবে, এবং তাহার পার্শ্বদৃষ্টি স্বরূপ অপরাপর পুরাণাদির কথাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেখাইয়া দেওয়া যাইবে।

অনেক ইতিহাসবিৎ বিবেচনা করে এবং অনেকে বিশ্বাসও করিয়া থাকে যে, গ্রীকপুরাণস্থ দেবদেবীগণ, আমূলতঃ রূপকপূর্ণ; এবং তাহা প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়াবিশেষে, জ্ঞান ও বুদ্ধিপূর্ব্বক রূপককল্পনা

মাত্র। ইহা অংশতঃ কোথাও কোথাও খাটাইয়া লইলে খাটিতে পারে, কিন্তু আমূলতঃ কখনই নহে। এতৎ সম্বন্ধে গ্রীক ইতিহাসবেত্তা গ্রোট কহে,—'সেই সময় এবং সমাজ, এতদুভয়ের অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে; তখন যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের রূপক কল্পনা পূর্ব্বক এরূপ সুসজ্জিত দেববংশ ও দেবসংসার নির্ম্মিত হইতে পারে, এ কথা কখন সঙ্গত এবং সম্ভবপর হইতে পারে না।' ফলতঃ, মানবীয় জ্ঞান-প্রভাতের সহ, সুপ্তোত্থিত আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মবুদ্ধির উত্তেজনায়, অচেষ্টিত, অতর্কিত ও অপরিজ্ঞাত ভাবে, প্রাকৃতিক মূর্ত্তিতে দেবতত্ত্বাদি আপনাপনিই রূপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে জ্ঞানতঃ বুদ্ধিকৌশলের কোন সংস্রব নাই। উহারা ভক্ত এবং ভাবুকের চিত্ত এবং হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়।

হেসিওদের পুরাণ অনুসারে, সৃষ্টি এবং দেববংশ এরূপে কীর্ত্তিত হয়।

সর্ব্বাগ্রে মহাপ্রলয়ের (Chaos) উৎপত্তি হইল; সুতরাং উঁহাই প্রথম, এবং তাবৎ সৃষ্টির আদি। তৎপরে সর্ব্বংসহা গেয়া অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্ভব। ইহার পৃষ্ঠস্থলে দেবমানবের বাসস্থান; এবং নিম্নস্থলে গুহার আকারে তার্ত্তারোস্ বা নরকস্থান। তৎপরে ইরোস্ বা কামের উৎপত্তি; ইনি দেব মানব ও চরাচরে সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন, এবং ইহার মোহে মানব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়।

এ স্থানে অর্ফিউসের পুরাণ সহ এরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ঐ পুরাণ অনুসারে সর্ব্বাগ্রে ক্রোণোস্ বা কালের উৎপত্তি। তৎপরে ইথার এবং মহাপ্রলয় (Chaos)। মহাপ্রলয় হইতে ক্রোণোস্ একটী বৃহৎ অণ্ডের উৎপত্তি করিলেন। ঐ অণ্ড উদ্ভিন্ন করিয়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপ গুণবিশিষ্ট এবং উভয় ধর্ম্মযুক্ত একটী দেবতার উৎপত্তি হইল। ইহাকে ফানিস্, মিতাস্, ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়া থাকে। ফানিস্ কস্‌মোস্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি প্রসব করিল। এই ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তির মধ্যে দেব মানুষাদি যাবতীয় সৃষ্টির প্রাথমিক বীজ সকল নিহিত

ছিল। ফানিস্ হইতে পরে নিক্ষ্ অর্থাৎ নিশার জন্ম হইল। তৎপরে ফানিস্ আবার নিশার সহবাসে উরেণস্ ও গেয়া, এবং হেলিওস্ ও সেলিনী, ইহাদের উৎপাদন করিলেন।২ এই অণ্ড-উৎপত্তির সহ মনু (১।৬—৯।) এবং অপরাপর হিন্দুশাস্ত্র মিলাইয়া দেখ। তথায় লিখিত আছে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে যে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করেন, তাহাতে একটি অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ডে বিধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, এই স্থান দেখিয়া কেহ যেন মনে না ভাবেন যে, এইরূপ হিন্দু-শাস্ত্র সহ কোন না কোন রূপ সাদৃশ্য সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর হেসিওদের পুরাণ অনুসারে, মহাপ্রলয় হইতে ইরিবোস্ অর্থাৎ অন্ধতমস্ এবং নক্ষ বা নিশার উৎপত্তি হইল। ইরিবোস আত্ম-ভগিনী নিশাকে বিবাহ করে। ইরিবোসকে নানা জনে নানা স্থানে নানা অর্থে বর্ণনা করিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ সাধারণতঃ ইরিবোস্কে নরকের প্রতিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোথাও কোথাও বা ইরিবোস্ অর্থ তিমিরান্ধকারও সূচিত হইয়াছে। এই সকল দেবতারা বেদোক্ত নিশা, ঊষা, অরণ্যানী আদির সঙ্গে সমজাতীয়; এবং বহুস্থলে প্রাকৃতিক শক্তি বা ক্রিয়াবিশেষ দর্শনে প্রবুদ্ধ ও নামিত।

ইরিবোস সহ সংমিলনে নিশার গর্ভে ইথার্ এবং দিবামানের জন্ম। ইথার অর্থ এখানে অনেকে উজ্জ্বল আলোক বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ ইথার বাঙ্গারামের বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তারি ইথার নহে।

পৃথিবী তারকামণ্ডল-সমন্বিত আত্ম-অনুরূপ আকাশদেশকে প্রসব করিল। আকাশের গ্রীক নাম উরেণস্। মক্ষমূলরের নির্দ্দেশ মত গ্রীক উরেণস্ এবং বৈদিক বরুণ একই দেবতা। ঐ আকাশ বহি-র্দ্দৌরাত্ম্যনিরসক আবরণরূপে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিল। অনন্তর পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, কানন, এবং পর্ব্বতবাসিনী দেবী (নুম্ফা) সমুদয়কে প্রসব করিল।

২। যথাক্রমে আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্র।

তৎপরে পৃথিবী, আকাশের প্রণয়ে মিলিত হইবার, আকাশের ঔরসে ওকেয়ান্ অর্থাৎ তরঙ্গশালি মহাসমুদ্র, কেওস্ বা আলোক-শিখা (ইগিয়া প্রদেশে প্রধানতঃ উপাসিত হইত), ক্রিওস্ অর্থাৎ বলদৃপ্ততা, হীপেরিওন (ইলিয়দ্ অনুসারে সূর্য্য, ওডিসী অনুসারে সূর্য্যের পিতা এবং কৈলো ও তেরার পুত্র) এবং ইয়াপিতোস্ এই কয় পুত্র; এবং থিয়া (সাগরবাসিনী), হ্বয়া (আথেন্স নগরে উপাসিত), থেমিস্ (ডেলফি নগরে উপাসিত), ম্নিনিমোসিনি (এক মতে গীতিকা দেবীবর্গের জননী, অন্য মতে আস্তিরা ও হিকাতের জননী), ফিবি এবং থিতিস (সর্ব্বজীবধাত্রী), এই কয় কন্যা প্রসব করিল। ইহারা তিতান্ নামে খ্যাত। অর্ফিক পুরাণ অনুসারে তিতান্ ১৪ জন; ৭ জন পুরুষ এবং ৭জন স্ত্রী। অর্ফিউস ক্রোণোস্‌কেও তিতান্‌মধ্যে ধরিয়াছেন। এই তিতান্‌বর্গের গ্রীকভূমে প্রদেশ-ভেদে প্রত্যেকের পূজার মন্দির ছিল; তাহার মধ্যে যাহারা অপেক্ষা-কৃত বিখ্যাত, তাহারা উপরে বন্ধনীর মধ্যে উক্ত হইয়াছে। হীপেরিওন্ সম্বন্ধে আরও কথিত হয় যে, ইনি আত্মভগিনী হ্বয়ার গর্ব্ভে সূর্য্য, চন্দ্র এবং প্রভাত এই সন্তানত্রয় উৎপাদন করেন। থেমিস ধর্ম্মাধিকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইহাঁর এক হস্তে খড়্গ, অপর হস্তে তুলাদণ্ড। থিতিসের অনুগ্রহে পৃথিবী সজল ও সরস হইয়া নানাবিধ পদার্থের উৎপাদন করিয়া থাকেন।

ইহার পরে আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ব্ভে দুর্ব্বিনীত এবং কপটচারী ক্রোণোসের জন্ম হইল। পরে ব্রন্তেস্, স্তিরোপিস এবং আর্গেস নামে কিক্লোপিস নামধারী অসুরবর্গ জন্মিল। এই কিক্লোপিস্-বর্গের আকার প্রকার দেবতাদিগের ন্যায়; কেবল প্রভেদ এই যে, ইহারা একচক্ষু, এবং এই চক্ষু গোলাকার ও ললাটদেশে সংস্থাপিত। ইহারা বলবান্, বীর্য্যবান্ এবং কর্ম্মচতুর। ইহাদের নির্ম্মিত গৃহ বাটিকাদি অতি বিশাল। ইহাদের মধ্যে আর্গেসনামক কিক্লোপিস্ দ্বারা জিউস্‌দেবের বিদ্যুৎ ও বজ্র নির্ম্মিত হয়। ইহারা দেবতাদিগের ন্যায় অমর নহে।

হেসিওদের বর্ণনা অনুসারে কিক্লোপিস্ তিন জন। পুনশ্চ লাতিন কবি বর্জিলের বর্ণনা অনুসারে চারি জন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই চতুর্থের নাম পিরাকমোন্। এইরূপ ইহাদের সংখ্যা লইয়া পুরাণ-বেত্তাদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। ইহাদের সিসিলীদ্বীপে এট্না আগ্নেয়গিরির নিকট বসতি এবং দেবমণ্ডলের বল্কান্ নামক যে বিশ্বকর্ম্মা তাহার কারখানায় কার্য্য করিত। এই কারখানাতেই আর্গেস কর্তৃক জিউসের বজ্র নির্ম্মিত হয়। আমাদিগের হিন্দু বজ্রও এইরূপ বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় বটে, দধীচি মুনির অস্থিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিক্লোপিস্গণ আপলোদেবের সন্তানকে হত্যা করায় আপলো কর্তৃক নির্ম্মূলিত হয়।

পৃথিবীর আরও তিন সন্তান হইয়াছিল। ইহাদের নাম কোত্তুস, ব্রীয়ারোস্ এবং গিয়াস্। ইহারা প্রত্যেকেই প্রভূতবলসম্পন্ন, অপরিমিতদেহ, এবং প্রতেকের দেহে পঞ্চাশটি করিয়া মস্তক এবং এক শত হস্ত। ইহারা হিকাতন্সিওর নামে খ্যাত ছিল।

আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমুদয় পুত্রই দুর্বিনীত, অপারবলশালী ও পীড়াদায়ক হইবে জানিয়া, আকাশ তাহাদের বিক্রম কল্পনা করিয়া ভয়ার্ত্ত হয়। সেজন্য তাহাদের জন্মমাত্র, আকাশ সশঙ্কচিত্তে তাহাদিগকে তাহাদের মাতার নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া, নিপাত করিবার অভিপ্রায়ে গভীর এক গুহাপ্রদেশে তাহাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া রাখে।

গুহালুক্কায়িত এই সন্তানবর্গের ভারে পৃথিবী অসহ্য ভারবোধ করিয়া, তাহার উপায় করিবার জন্য লৌহ উৎপাদনপূর্ব্বক, তাহাতে অস্ত্র প্রস্তুত করিল। পৃথিবী, আপন ভার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ও সন্তানদিগকেও উদ্ধার করিবার জন্য, ঐ অস্ত্রে স্বীয় পিতাকে নিপাত করিতে গুহালুক্কায়িত সন্তানবর্গকে উত্তেজিত করে। অপর কোন পুত্র ইহাতে সাহস পাইল না; কেবল ক্রোণোস্ ইহাতে সাহসী হইয়া অগ্রসর হইল।

ক্রোণোস্ অস্ত্রহস্তে পিতার আগমন প্রতীক্ষায় গুপ্তভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। যথাসময়ে আকাশ নিশাকে সঙ্গে করিয়া সমাগত হইল এবং যেমন প্রেমোন্মত্ত হইয়া আলিঙ্গনে' পৃথিবীকে আবরিত করিতে যাইবে, অমনি ক্রোণোস্ অস্ত্র দ্বারা তাহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া ঐ লিঙ্গ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ আকাশ খোজা হইয়া পড়িলেন!

লিঙ্গের কর্ত্তনস্থল হইতে যে অজস্র রক্তবিন্দু পৃথিবীতে পড়িল, পৃথিবী তাহাতে গর্ভবতী হইয়া ক্রমান্বয়ে, ভীষণাত্রয় (Furies), নানা জাতীয় দানব, এবং অসংখ্য দানবীগণ প্রসব করিল। ইহারা সমগ্র দেশ ব্যাপন করিয়া যথাসুখে বিচরণ করিতে লাগিল।

. অনন্তর আকাশের ছিন্ন লিঙ্গ সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে চলিল এবং উহার চতুর্দ্দিক ধবল ফেনপুঞ্জে আবরিত হইল। ঐ ফেনপুঞ্জের ভিতরে থাকিয়া লিঙ্গটী এক্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত ও ক্রমে ক্রমে তাহা একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফেনপুঞ্জ ক্রমে কুথিরা দেশের সান্নিধ্য দিয়া কুপ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কথিত কামিনী অপাররূপশালিনী মোহিনী মূর্ত্তিতে ফেনপুঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করিল। পদস্পর্শে পৃথিবী পুলকিত ও বাসন্ত শোভায় সুশোভিত হইল; কুসুম ফুটিল, বৃক্ষলতা মুকুলিত হইল, বিহঙ্গমগণ আনন্দপূর্ণ কলগানে তাহার আগমন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহার নাম আফ্রোদিতি বা রতিদেবী। ইরোস্ অর্থাৎ কামদেব এবং প্রবৃত্তি সখী ইহার অনুগমন করিল। কামদেবের উৎপত্তি-বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে। কামের উৎপত্তি ও পিতামাতা সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে; আর্ফিক পুরাণের মতে, কামদেব ক্রোণোসের পুত্র বলিয়াও কথিত। অনন্তর রতিদেবী কাম ও প্রবৃত্তিকে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় উপস্থিত হইল। দেবগণ ইহার রূপ যৌবন ও মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, ইহার বহু প্রশংসাবাদপূর্ব্বক,

ইহাকে দাম্পত্য ও কামিনীপ্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে স্থাপন করিলেন।[২]

অতঃপর পিতা উরেণস্ বা আকাশ, পুত্রবর্গের চক্রান্তে এবং তাহাদের কর্ত্তৃক এরূপ হত-পুরুষার্থ হইবায়, নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রবর্গকে অনেক ভর্ৎসনা করিল, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

এক্ষণে ক্রোণোস্ এবং তিতান্‌গণ প্রবল হইয়া উঠিল; এবং পিতা উরেণস্‌কে দেবরাজ্যের অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া ক্রোণোস্‌কে সেই সিংহাসনে বসাইল। কিক্লোপিস্‌গণ[৩] এই দুর্ব্বিনীত কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া, উরেণস্ কর্ত্তৃক তাহারা নরকে নিক্ষিপ্ত হইল।

অনন্তর নিশাদেবী বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণ করিয়া, ক্রমান্বয়ে অদৃষ্ট, ভাগ্য, মৃত্যু, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি বিবিধ দেবীকে প্রসব করিল। ইহারা যে যে কার্য্যে নিযুক্ত এবং পারক, তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরে নিশার গর্ভ হইতে আরও কতকগুলি সন্তানের উৎপত্তি হইল, যথা মানবের সন্তাপদায়ক নেমিসীস্ (মতান্তরে বিভাগকর্ত্রী, অথবা

২। হিন্দুপুরাণের ন্যায়, গ্রীকপুরাণমতে রতিদেবী কামের পত্নী নহেন; বরং কোন মতে আরিসের ঔরসে ও রতিদেবীর গর্ভে কামের জন্ম। অতএব কাম রতিদেবীর পুত্র। গ্রীকমতে ইরোস বা কামের পত্নী প্সুখে (ইংরেজী সাইকি) অর্থাৎ চিত্ত। প্রাচীন গ্রীকমতে রতিদেবী কেবল সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌন্দর্য্যের সন্তান কাম বা প্রণয় ও কামের পত্নী চিত্ত, ইহা অতি সুসঙ্গত কল্পনা, সন্দেহ নাই। ইরোসের মূর্ত্তি,—গোলাপ ফুলের ন্যায় বর্ণ, প্রফুল্লিত গণ্ডস্থল, কুঞ্চিত কেশরাজি স্কন্ধে দোলায়মান, বালকমূর্ত্তি, উলঙ্গ, উড়িয়া যাইবার নিমিত্ত যুগলপক্ষযুক্ত এবং হস্তে ধনুঃশর। মূর্ত্তিটীও কামের উপযুক্ত বটে। কোন কোন মতে কাম অন্ধ; ইহাও সঙ্গত কল্পনা; কাম অন্ধ না হইলে, উহাকে লইয়া পৃথিবীতে এত অনর্থ ঘটিত না। আফ্রোদিতি ও ইরোসের লাতিন বা ইংরেজী নাম ভিনস ও কিউপিড্। হিন্দুপুরাণেও রতিকে এক সময়ে কামের মাতৃত্ব করিতে হইয়াছিল।

৩। বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝড়, ঘূর্ণাবায়ু, বরফ প্রভৃতি হইতে কিক্লোপিস্‌গণের কল্পনা; এবং পৃথিবীর বিবিধ উৎপাদিকা শক্তির রূপকে তিতান্‌দের কল্পনা।

কোন কোন মতে দাম্ভিক ও দুর্ব্বিনীত স্বভাবের দমনকর্ত্রী), চাতুরী, বৃদ্ধবয়ঃ, বিবাদ, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, যেমন মিশা, সন্তানগুলিও তাহার উপযুক্ত রূপেই কল্পিত হইয়াছে।

বিবাদের গর্ভে ক্রমান্বয়ে, ক্লেশ, বিস্মৃতি, দুর্ভিক্ষ, মিথ্যাপ্রেম, মহাতাপ, মিথ্যা, অরাজকতা, কলহ, হত্যা, ধ্বংস, ইত্যাদি নামধেয় তত্তৎ বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের উৎপত্তি হইল। ইহার পরে বিবাদের গর্ভে শপথের উদ্ভব হইল। যে কেহ এই দেবীর অবমাননা করিলে, দেবগণ তাহার প্রতি বিশেষ রূপে শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।

অনন্তর ক্রমান্বয়ে সমুদ্রপুত্র নিরিওস্ ও থাওমাস্[৪] প্রভৃতির জন্ম হইল। নিরিওস্ ধীর, শান্ত, এবং সুশীল; বর্জিল প্রভৃতি কবিগণ ইহাকে সমুদ্রের অংশ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। নিরীওসের ঔরসে ও সমুদ্রকন্যা দোরিসের গর্ভে থিতিস প্রভৃতি পঞ্চাশৎ দেবী জন্মিল; ইহারা সকলেই সমুদ্রের বিবিধ স্বভাব, শোভা, সম্পত্তি ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ তত্তৎ বিষয়ের রূপক কল্পনা স্বরূপ। সমুদ্রপুত্র থাওমাস্‌কে, প্রাকৃতিক শোভার প্রতিরূপ কল্পনা বলিয়া অনেকে ধরিয়া থাকে। কোন কোন মতে থাওমাস্ স্ত্রী; কিন্তু হেসিওদের মতে পুরুষ। থাওমাস্ সমুদ্রপুত্রী ইলেক্ত্রার গর্ভে ইরীস্ অর্থাৎ ইন্দ্রধনু, এবং হার্পী অর্থাৎ ঝটিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদ্বয়ের উৎপাদন করিয়াছিল।

সমুদ্রকন্যা কালির্হির গর্ভে ত্রিশিরা গীরিওন্ নামক দৈত্য, এবং একিদ্‌নানাম্নী দানবীর জন্ম। এই অশুভকারিণী এবং ধ্বংসাভিলাষিণী

৪। নিরিওস অর্থাৎ সত্যশীলতা, অথবা সমুদ্রপক্ষে সমুদ্রের শক্তিবিশেষ। ইংরেজিতে Sea-Elder বলিয়া অনুবাদিত,—সংস্কৃতে ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে একটি বেদমন্ত্র আছে যথা "সমুদ্রজ্যেষ্ঠা সলিলস্য মধ্যাৎ প্রাণানাযন্ত্যন্য বিষমানাঃ।" অতএব Sea-Elder ও সমুদ্রজ্যেষ্ঠে একতা দৃষ্ট হইতেছে। থাওমাস অর্থে সমুদ্রের আশ্চর্য্য ভাবগুলি।

একিদ্‌না, শরীরের উর্দ্ধভাগে পরমাসুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি, নিম্নভাগে বিকৃত সর্পাকার। একিদ্‌নার গর্ভে এবং তাইফাওনের অর্থাৎ তুফান বায়ুর ঔরসে পঞ্চাশৎ-মস্তক-বিশিষ্ট কের্ব্বিরোস্ নামক কুকুরের উদ্ভব। এই কুকুর আমাদিগের পৌরাণিক শ্যামা ও সবলা নাম্নী চতুশ্চক্ষুবিশিষ্টা যমের কুক্কুরীদ্বয়ের ন্যায় পরলোকে নরকদেশের দ্বাররক্ষক। একিদ্‌নার অপর পুত্র সহস্রশিরস্ক সর্পবিশেষ,ইহাকে লিরনীয় হাইদ্রা বলিয়া থাকে। হিরাক্লিসের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশে জুনো দেবী কর্ত্তৃক এই অদ্ভুত জন্তু প্রতিপালিত হয়; অন্তে ইহা হিরাক্লিসের দ্বারা বিনিপাতিত হইয়াছিল। হাইদ্রার কন্যা স্ফিনিক্স নাম্নী অদ্ভুত দানবী। এই দানবী, যে কোন পথিককে দেখিতে পাইলে, তাহার প্রতি প্রহেলিকা প্রয়োগ করিত; এবং পথিক যদি তাহা পূরণ করিতে না পারিত, তবে তাহাকে ধরিয়া গ্রাস করিত। মাতৃগামী ইদিপোস ইহার প্রহেলিকা পূরণান্তে ইহাকে নিপাত করিয়াছিল।

সমুদ্রপুত্রী কেতোর গর্ভে একটী সর্পের উৎপত্তি হয়; সে পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্বর্ণকোষ সকল অর্থাৎ রত্নস্থানসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে। অনন্তর তিথীর গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে বহুতর নদীরূপা কন্যা সকলের জন্ম হয়।

ক্রিওসের পুত্র আস্ত্রিয়স্, পালাস এবং পার্সেস। আস্ত্রিয়সের পুত্র জিফিরোস্ এবং বোরিয়াস্,—ইহারা বিভিন্ন বিভিন্ন বায়ুবিশেষের অধিপতি।

ইয়াপিতুসের ঔরসে এবং সমুদ্রকন্যা ক্লীমিনীর গর্ভে প্রমিথিওসের জন্ম হয়। এই প্রমিথিওস্ দেবগণকে ঠকাইয়া দেবসকাশ হইতে জীবনাগ্নি হরণ করিয়া আনিয়া, মনুষ্যপ্রাণের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু তজ্জন্য ইহাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; একটা পর্ব্বতে বাঁধা থাকিত ও একটা শকুনী সর্ব্বদা উহার যকৃৎ ঠোকরাইত। দ্বিতীয় পুত্র আৎলাস্,—হিন্দু বাসুকী স্থানীয়; ইহারই মস্তকোপরি পৃথিবীর ভার স্থাপিত।

অতঃপর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব দানবের বংশকীর্ত্তন বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে অনাবশ্যক এবং তাহা কেবল বিরক্তিকর হইবে মাত্র। যাহা যাহা কীর্ত্তন করা গেল, তাহাই হয়ত বহুলাংশে বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ঐতিহাসিক সময়ে গ্রীকদিগের ভাগ্যবিধায়ক যে যে দেবতা শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই দেববর্গের বংশাবলি বর্ণন করা যাউক।

ক্রোণোস্ আপন ভগিনী হ্রয়াকে বিবাহ করে। এই বিবাহে হাদিস্, পোসিদন্, এবং জিউস্ নামক পুত্রত্রয়; এবং হেস্তিয়া, দেমিতুর,, এবং হিরি নামক কন্যাত্রয়ের উৎপত্তি হয়।

পিতৃলিঙ্গচ্ছেদকালীন ক্রোণোসের প্রতি যে পিতৃ-অভিশাপ হইয়াছিল ক্রোণোস্ তাহা স্মরণ করিয়া, স্বীয় সন্তানগণ হইতে বিপৎ আশঙ্কায়, পুত্র কি কন্যা জন্মিবামাত্র, তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিত। পুত্রশোকসন্তপ্তা হ্রয়া, জীউসের জন্মকালীন ক্রোণোস্ কর্ত্তৃক পুত্রনাশের আশঙ্কায়, জিউস্ প্রসবিত হইলে, স্বীয় পিতৃমাতৃ-উপদেশক্রমে তাহাকে ক্রিটদ্বীপস্থ ঐদানামক পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত করিয়া রাখে। ক্রোণোস্ প্রসূত পুত্রকে পূর্ব্বকথিতরূপ উদরসাৎ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, হ্রয়া একটী প্রস্তর খণ্ড, উহাই সেবারে প্রসূত বলিয়া, তাহাকে অর্পণ করে। ক্রোণোস্ তাহাও উদরসাৎ করে। পরে কোন কৌশলক্রমে ক্রোণোস্‌কে বমন করাইয়া, তাহার উদরসাৎকৃত সমস্ত পুত্রকন্যারই পুনরুদ্ধার সাধন করা হয়।

জিউস্ গুপ্তভাবে প্রতিপালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জননী হ্রয়া তাহাকে তাহার পিতৃব্যবহারের কথা আমূলতঃ বিজ্ঞাপন করিল। জিউস্ তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিশোধ লওনার্থে, স্বদলবল সহ একত্র হইয়া, পিতা ক্রোণোস্ এবং তাহার অনুচর তিতানবর্গের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর বজ্রনির্ঘাতে পিতা এবং পিতৃপক্ষকে পরাজয় করিয়া, তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিল এবং তথায় তাহাদের চিরনিবাস নিরূপণ করিয়া দিল। সেই হইতে দেবরাজ্যে জিউসের একাধিপত্য স্থাপিত হইল।

জিউস্ সর্ব্বপ্রথমে মিতীস্‌কে পত্নীত্বে বরণ করে। মিতীস্ দেব মানব উভয় লোকেই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্বিতীয় জ্ঞানশালিনী। ইহার গর্ভাবস্থা উপস্থিত হইলে, বংশমধ্যে পুরুষানুক্রমে পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, জিউস্ আত্মসন্ততি হইতে তাহারই আশঙ্কা করিয়া, কিসে মিতীসের সন্তান প্রসব নিবারণ করিবে তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিল। মিতীস্ কামরূপা ছিল, ইচ্ছামত নানা রূপ গ্রহণ করিতে পারিত। জিউস্ তাহাকে ছলে কৌশলে ক্ষুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া, সেই সুযোগে গর্ভিণী মিতীসকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিয়া রাখিল; এবং মিতীসও সেই হইতে জিউসের উদরমধ্যে সৎ-অসৎ বুদ্ধির পরিচালিকা স্বরূপ অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু সন্তান প্রসব বন্ধ রহিল না, গর্ভস্থ সন্তান পিতার ললাট ভেদ করিয়া বাহির হইল। এই সন্তান স্ত্রীবেশিনী, নাম আথিনি, হিন্দুশাস্ত্রীয় সরস্বতী দেবীর প্রতিরূপা। ইনি বিদ্যাজ্ঞানাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আথেন্স নগর ইহার আশ্রয়ে রক্ষিত ও তথায় ইহার উপাসনা হইত। কি বিদ্যার্থী, কি শিল্পী, কি কোন কর্ম্মকার, সকলেই আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহাকে স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ইহার এক হস্তে বল্লম, অপর হস্তে ঢাল, মস্তকে মুকুট; ইনি চির-কৌমার-ব্রতাবলম্বিনী।

জিউসের দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী থেমিস্। ইহার গর্ভে দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি কাল-অংশ, এবং শান্তিদেবী, ও অপরাপর দেবীবর্গের উৎপত্তি হয়।

তৃতীয় স্ত্রী সমুদ্রকন্যা ইউরীণোমি। ইহার গর্ভে সুভাগিনীগণ (Graces) এবং পেলিয়া ও অন্যান্য দেবীর উৎপত্তি।

চতুর্থ স্ত্রী দেমিতুরের গর্ভে প্রোসার্‌পিনি দেবীর জন্ম। ইনি যমরাজ হাদিসের পত্নী। দেমিতুর যমকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইলে, যমরাজ জিউসের সম্মতিক্রমে এই কন্যাকে হরণ করিয়া আপন পত্নীত্বে স্থাপিত করে।

পঞ্চমা স্ত্রী ম্নিমোসিনির গর্ভে কাব্য গীতাদির অধিষ্ঠাত্রী নয়টী দেবীর উৎপত্তি হয়। ইহারা গ্রীকদিগের নিকট পরমপূজনীয়া। ইহাদের নাম, ক্লিও, মেল্পোমিনি, থেলিয়া, তার্পিসিকোরি, ইরাতো, ইউতার্পি, কালিওপি, ইউরানি, ও পলিহিম্নিয়া। ইহাদিগের বাসস্থান পার্নাস্সস্ নামক পর্ব্বতের উপর, এবং এই নিমিত্তই পাশ্চাত্য কবি-মণ্ডলে এই পর্ব্বত এতাদৃশ বিখ্যাত, এবং ভক্তি সহকারে উল্লিখিত।

বজ্রপাণি জিউসের ঔরসে এবং ফিবির কন্যা লেটোনা দেবীর গর্ভে আপলো দেব এবং আর্তিমিস্ দেবীর জন্ম।

সপ্তমা এবং শেষ স্ত্রী হিরি দেবীর গর্ভে আরিস্ দেব এবং হিবি নামে দেবীর জন্ম। হিরি অতঃপর স্বামী সহ বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণ করিয়া হিপিস্তোস্ অর্থাৎ বল্কান নামক দেবতাকে প্রসব করেন। ইনি দেবমণ্ডলে দেবশিল্পী, হিন্দুশাস্ত্রীয় বিশ্বকর্ম্মার প্রতিরূপ। এই দেব অতি বঙ্কুর ও কদাকার।

অনন্তর জিউসের সহবাসে আৎলাস্‌দুহিতা মিয়ার গর্ভে দেবদূত হার্মিস্ বা মঙ্গলদেব; কাদমোসদুহিতা সিমিলির গর্ভে দিওনিসিও বা বাখোস্ অর্থাৎ সোমদেব—মদিরা ও মাদকতার অধিপতি দেবতা; এবং আল্কমিনার গর্ভে হিরাক্লিস্ অর্থাৎ বলাধিপতি বলদেবের জন্ম হয়।

অধিক বংশবাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া, কেবল যে সকল দেবদল প্রধান বলিয়া পরিগণিত, এবং গ্রীক গ্রন্থবর্গে সর্ব্বদাই যাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদেরই বংশাবলী এস্থানে সংক্ষেপতঃ কথিত হইল। অতঃপর ইহাদের মধ্যে যে সকল দেব দেবী প্রধানতঃ গ্রীকভাগ্য বিধানিত করিতেন, এবং প্রধানতঃ যাহারা গ্রীকদিগের দ্বারা পূজিত হইতেন, তাঁহাদের স্থূল স্থূল বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

২। দেববৃত্তি।

দেবরাজ্য বা দেবনগর অলিম্পিয়া পর্ব্বতের উপরে। কার্য্য-ব্যপদেশে স্থানান্তরে নিয়োগ ভিন্ন, প্রায় সমস্তই ও সমস্ত দেবদলই এই অলিম্পিয়া পর্ব্বতের উপর বাস করিতেন। এই দেবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর জিউস্।

দেববর্গ।

১। **জিউস্।** ইহাঁকে লাতিন জাতিরা জোব বা জুপিতুর আখ্যায় অভিহিত করিত। ইনি স্বর্গ, পৃথিবী, এবং নিম্নদেশ, এই ত্রিভুবনের রাজা। বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য ইহাঁর মন্ত্রণা এবং নিয়োগ অনুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আর সমস্ত দেববর্গ ইহাঁর আজ্ঞাবহ অনুচর স্বরূপ। ইনি বজ্রধারী এবং ওলিম্পিয়া পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে ইহাঁর অবস্থান। ইনি প্রমিথিওস্ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলে, মনুষ্যকে নিরন্তর দুঃখসঙ্গী করিবার নিমিত্ত, দুঃখরাশির বিতরণকারিণী পান্দুরা-নামক দেবীকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দেবীর হাতে একটী ঝাঁপি ছিল; ঐ ঝাঁপিতে পাপতাপদুঃখক্লেশাদি ভরা ছিল। ঝাঁপিটী পৃথিবীতে উদ্ঘাটিত হইবামাত্র, সেই সকল দুঃখক্লেশপাপাদি মনুষ্যমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। জিউস দেব অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ; অযথা ভাবে কামিনীসঙ্গ অভিলাষ হেতু ইহাঁর অদ্ভুত কীর্ত্তিসমূহ, নানা-স্থানে নানারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গাণিমীড় বলিয়া একটী সুশ্রী বালক ইহাঁর বড় ভালবাসার পাত্র ছিল। এই দেবতা হিন্দুশাস্ত্রীয় ইন্দ্রদেবের প্রতিরূপ। মক্ষমূলরের বিদ্যা অনুসারে জিউসের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দ্যৌস্ বলিয়া নিরূপিত হয়। যাহা হউক এ অতি কদাচারী দেবরাজ, এমন ঝুঁকি ও খামখেয়ালি কদাচারী আর নাই।

২। **পোসিদন্ বা নেপচুন্।** ইনি জিউসের ভ্রাতা, এবং ক্ষমতায় জিউস্ হইতে দ্বিতীয় পদে অবস্থান করেন। ইনি

পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া থাকেন, এবং জগতস্থ যাবতীয় জলরাশির উপর ইহাঁর আধিপত্য। ইনি কার্য্যে হিন্দুশাস্ত্রীয় বরুণের প্রতিরূপ। ইনি এবং আপলো দেব, এই দুই জন এক সময়ে জিউসের কোপে পতিত হইবায়, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, ইহাঁদিগকে বহুকাল ত্রয়-নগরাধিপতি লাওমিদোনের নিকট দাসত্ব করিতে হইয়াছিল।

৩। আপলো। পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি আর কাহারও নাই। ইহাঁর গর্ভবাসকালীন ইহাঁর জননী, হিরি দেবীর হিংসা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, নানা স্থানে নিরাশ্রয়ভাবে ভ্রমণানন্তর, শেষে দেলোস্ নামক এক পরিত্যক্ত দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তথায়ই আপলো দেবের জন্ম হয়। জিউসের চিত্তস্থিত গূঢ় মন্ত্রণা আপলোই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। আপলো আপন বাসস্থান মনোনীত এবং নিরূপিত করিবার নিমিত্ত নির্গত হইয়া, পার্ণাস্সুস্ পর্ব্বতপদে একটি নির্ঝরতটস্থান মনোনীত করেন। ঐ স্থান পীথোন নামক একটি সর্প দ্বারা রক্ষিত ছিল। তিনি ঐ সর্পকে নিপাত করিয়া, তথায় আপন আবাস স্থাপনা করেন। অনন্তর উপাসক সংগ্রহের নিমিত্ত, নিজে মকরের বেশ ধারণ করিয়া করিস্থসাগরস্থ একটী জাহাজকে বিপদে নিক্ষেপ করেন; এবং তদনন্তর জাহাজস্থ লোকদিগকে হাত করিয়া, আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আপন উপাসনায় নিযুক্ত করেন। কালে এই স্থানে দেলফি নামক নগর স্থাপিত হয়। ঐ নগরে আপলো দেবের মন্দিরে ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপিত হইত। এই দেবের মন্দিরে একটী সুড়ঙ্গ ছিল, তথায় ত্রিপদ চৌকির উপর একজন কুমারী পূজক উপবেশন করিলেই সে হতজ্ঞান হইয়া যাইত ও আপলো দেবের কৃপায় ভবিষ্যৎ কথা সকল জ্ঞাপন করিতে পারিত। ইহাঁর পূজক চিরকৌমার্য্য-ব্রত-অবলম্বিনী স্ত্রীলোক। ইনি ধনুর্দ্ধর এবং একজন দেবযোদ্ধা।

৪। আরিস্ বা মার্স। দেশীয় ভাষায় মার্সের প্রতিনাম মঙ্গল। এই দেব অস্ত্রশস্ত্রধারী দেবসেনানী। যুদ্ধাদি কার্য্যের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি রুদ্র-অবতার বিশেষ; কিন্তু এক সময়ে আত-ইদবর্গের দ্বারা পরাজিত হইবায়, ইহাকে দুই বৎসর কাল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

৫। হর্মিস্ বা মার্কুরী। দেশীয় ভাষায় মার্কুরীর প্রতি-নাম বুধ। ইনি দেবদূত। জন্মমাত্রেই পূর্ণাকার প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শঠতা, কাপটা, বাচালতা এবং চৌর্য্যবৃত্তির গুরুমহাশয় এবং তত্তৎ বিষয়ের পূর্ণাধার স্বরূপ। আপলোর ঐশ্বর্য্যদৃষ্টে হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ও ক্ষোভে পড়িয়া, ইনি আপলোর সমস্ত পশুপাল চুরি করিয়া আনেন। আপলো এই দৌরাত্ম্যে অনন্যোপায় হইয়া, শেষে তাঁহাকে ধন দিয়া এবং কি গ্রাম্য কি অরণ্যচর উভয়বিধ পশুসাধারণের উপর তাঁহাকে আধিপত্য প্রদান করিয়া, আপন পশুপাল উদ্ধার করিয়া আনেন; এবং তদবধি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। হার্মিস দেব গ্রীকদিগের দেব ও নরমণ্ডলে বীণা এবং সপ্ততার নামক বাদ্য-যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

৬। দিওনিস্যুস্ বা বাখোস্। হিন্দুশাস্ত্রীয় সোমরসের অধিষ্ঠাতা সোম দেবের প্রতিরূপ। মিসরীয় অসিরিস্ এবং এই দিওনিস্যুস্ এক দেবতা, কেবল স্থানভেদে বিভিন্ন নাম। দেববর্গের মধ্যে মদের ভাঁটি সমস্তই ইহার জিম্মা; অথবা দেবনরে ইনিই মদের ভাঁটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি পুরুষ বটেন, কিন্তু স্ত্রীবেশধারিণী। কতকগুলি পানরসে বিষম উন্মত্তা স্ত্রীলোক সহযোগে ইহাঁর পর্ব্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

৭। হিপিস্তোস্ বা বল্কান্। ইনি হিন্দুশাস্ত্রীয় বিশ্ব-কর্ম্মার প্রতিরূপ। জিউসের সঙ্গে শক্তিপ্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইবার আশায় হিরি দেবী, স্বামী সহ বিনা সহবাসে ইহাঁকে প্রসব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি নিতান্ত কুরূপবান হওয়ায় জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। ইনি দেবশিল্পী এবং অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। জিউস যে সময়ে ইহাঁর জননী হিরিকে শাস্তি দিয়া তাঁহার নানারূপ

দুর্দ্দশা করেন, সেই সময়ে মাতার সহায়তা করিতে যাওয়া পিতা জিউস্ কর্ত্তৃক ইনি স্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।

৮। **হিরাক্লিস বা হার্কিউলিস।** ইনি অত্যন্ত বলবান্ এবং বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মনুষ্যকন্যার সন্ততি হইয়াও জিউসের প্রিয়পুত্র মধ্যে গণ্য হইবাতে, হিরি দেবীর কোপে পতিত এবং ওম্ফলিতে দাসরূপে বিক্রীত হয়েন। তথা হইতে মুক্ত হইলে, প্রকারান্তরে ইহাঁর অমঙ্গল সাধনের উদ্দেশে, উক্ত দেবী কর্ত্তৃক ইহাঁর প্রতি প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শ্রমসাধ্য কার্য্য নিয়োজিত হয়। গ্রীকভূমির অনেক রাজগণ এই হিরাক্লিস্ হইতে স্বীয় স্বীয় বংশের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতেন।

৯। **হাদিস বা প্লুতো।** হিন্দুশাস্ত্রীয় যমদেবের প্রতিরূপ। ইনি পরলোকের অধিপতি। জিউস্ এবং দেমিতুরের কন্যা প্রোসার্পিনি ইহাঁর গৃহিণী। ইহাঁর পুরস্থান হেসিওদ কর্ত্তৃক এরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"এই ভীষণতম পুরী চিরতিমিরময়ী নিশা এবং তৎসন্ততি নিদ্রা এবং মৃত্যু প্রভৃতির নিত্য বাসস্থলী। সূর্য্যদেব কি উদয় কি অস্তমুখে, কখনই ইহার আকাশতলে উদিত হইয়া ইহাকে আলোকদানে আলোকিত করেন না। তাঁহার যে কারুণ্যপূর্ণ উজ্জ্বল মুখ, যাহা কি দেব কি নরলোক সকলেই সন্দর্শনে আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে; এ লোকসমক্ষে তাহা সর্ব্বদা বিরূপ; এ লোকের প্রতি তিনি একেবারে বিমুখ,নির্দ্দয়,এবং তাঁহার হৃদয় লৌহ হইতেও কঠিনতাযুক্ত। এই ভীষণতম পুরীর পুরোভাগে পুরপতির নিয়তকোলাহলপূর্ণ আবাসস্থল; শক্তিধর বিরাটমূর্ত্তি কৃতান্ত দেব এবং তৎপত্নী ভীমা প্রোসার্পিনি তথায় নিরন্তর বাস এবং মৃত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দণ্ডচালনা করিয়া থাকেন। দুরন্ত উগ্রমূর্ত্তি একটী কুক্কুর সেই পুরীর দ্বার রক্ষা করিয়া থাকে। এই কুক্কুর, পুরদ্বারে যে কেহ সমাগত হইলে, তাহাকে নানা কৌশলে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকে; তাহার পর এ পুরে একবার প্রবিষ্ট হইলে, আর কখনই তথা হইতে নির্গমণের সম্ভাবনা নাই।

১০। পান। হার্মিসের পুত্র। অতি কদাকার। উর্দ্ধ-ভাগ মানবের আকার কিন্তু মাথায় দুইটী শিং, নিম্নভাগ ছাগলের অবয়ব। ইনি ফ্লুট নামক বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি করেন; এবং ঐ বাদ্যরবে নানা দেবীকে ঠকাইয়া নিকটে আনিতেন, যদিও আসিবার পর তাহার চেহারা দৃষ্টে তাহার অধিক নিকটে তাহাদের কেহই ঘেঁষিত না। ইনি পশুপালকগণের রক্ষক দেবতা। আর্কেডিয়ায় ইহাঁর বিশেষ উপাসনার ঘটা হইত।

১১। এস্কুলাপিওস। আপলোদেবের পুত্র। ইনি চিকিৎসক। ঔষধ দিয়া মৃত ব্যক্তিগণকে বাঁচাইতেন বলিয়া, যমরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে জিউসের নিকট নালিশ করেন; তাহাতে জিউস্ রাগান্বিত হইয়া বজ্রাঘাতে এস্কুলাপিওস্‌কে নিহত করেন। তদবধি তিনি ভিষক্‌বর্গের উপাস্য দেবতা। গ্রীসের প্রায় সকল স্থানেই ইহাঁর উপাসনা হইত। ইহাঁর কন্যা হীগিয়া স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

দেবীবর্গ।

১। হিরি। লাতিন জাতিরা ইহাঁকে জুনো নামে আখ্যাত করিত। ইনি জিউসের সর্ব্বকনিষ্ঠা পত্নী, কিন্তু প্রভুত্বে পাটরাণী ও সর্ব্বোপরি। হিরি জিউসের সহোদরা; কিন্তু জিউস ইহার নিরুপম সৌন্দর্য্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, ভগিনীকে বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু দাম্পত্যপ্রণয়ে বড়একটা সুখ ছিল না, কারণ স্বামী ইন্দ্রিয়পরতায় প্রায়ই অপরাপর স্ত্রীতে উপরত হইতেন। শেষে হিরির ঝগড়ায় অস্থির হইয়া,জিউস তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া মধ্য আকাশে একটী শিকল দিয়া ঝুলাইয়া রাখেন। যাহা হউক হিরি তথাপি স্বর্গরাজ্যের রাণী, এবং দেবমানবে তিনি অসাধারণ প্রভুত্ব

চালনা করিতেন। ইনি উদ্ধতা, অভিমানিনী, গর্ব্বিতা এবং কোপনার একশেষ। দেবরাজ জিউস পর্য্যন্ত ইহাঁর ভয়ে এবং জ্বালায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও ব্যাকুল থাকিতেন। গর্ভিণী লেটোনার প্রতি ইহাঁর হিংসা, দ্বেষ, ক্রূরতা ও অত্যাচার যাহা যাহা কৃত, তাহার আর তুলনা নাই,—অতি নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর। ইহাঁরই অভিমানের দুরন্ত ফল স্বরূপ ত্রয়নগরের ধ্বংস। হিরির উপাসনা প্রায় সর্ব্বত্রই অতিশয় প্রবল ছিল। রোমনগরে ইহাঁর আদর ও উপাসনা অত্যন্ত অধিক।

২। দেমিতুর। মিসরীয় ঈসিস্ এবং দেমিতুর একই দেবতা। ইনি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হাদিস্ কর্তৃক তাঁহার কন্যা প্রোসার্পিণি হৃত হইলে, তিনি মনঃক্লেশে দেবদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইলিউসিস্ নগরে ক্লিওস্ রাজার গৃহে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র দিমোফাওনকে লালনপালন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর পুত্রের মাতা রাজরাণীর অযথা কৌতূহল পূরণের চেষ্টাবিশেষে দেবী রাগান্ধ হইয়া, আপন মূর্ত্তি প্রকাশ করেন; এবং ইলিউসিস্ নগরে তাঁহার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ ও পর্ব্বাহের বিধান করিতে বলিয়া অন্তর্দ্ধান হয়েন। এই পর্ব্বাহের নাম ইলিউসিনীয় গুপ্তোৎসব (Eleusinian mystery)।

৩। আর্তিমিস্। অন্য নাম দীয়ানা। ইনি মানবীকুলের সতীত্ব রক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিন্তু নিজে অসতীর অগ্রগণ্যা। ইহাঁর বেশভূষা পুরুষের ন্যায় এবং ইনি ধনুর্ব্বাণধারিণী। মৃগয়ার্থে নিরন্তর বনে বনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ও কুকুর সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গ, পৃথিবী ও যমপুর এই তিন দেশে ত্রিমূর্ত্তিধারিণী। পৃথিবীতে দীয়ানা, সতীত্বের দেবী; স্বর্গে ফিবি, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এবং যমপুরে হিকাতে, গতাসু আত্মার সাজা শাস্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অবিবাহিতা, কিন্তু ইহাঁর প্রেমের পাত্র অনেক। ইফিসুস্ নগরে ইহাঁর পূজার বড় ঘটা হইত; তথাকার দীয়ানার মন্দির, প্রাচীন জগতের সপ্তাশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে, একতর

আশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইরোস্ত্রাত নামে একজন সামান্য লোক বিখ্যাত হইবার আশায় এই মন্দির পোড়াইয়া দেয়। ইরোস্ত্রাতের এই অসৎ আশা নির্ম্মূলিত করিবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞা প্রচার হয় যে, কেহ যেন উহার নাম না লয়, এবং নাম লইলে বিশেষ শাস্তি হইবে। কিন্তু কালের হাতে সে রাজাজ্ঞা খাটিল না, লোকটা ভালয় হউক মন্দয় হউক, বাস্তবিকই চিরস্মরণীয় হইয়া গেল। অনেকে গ্রীক দীয়ানা এবং মিসরদেশীয় ঈসিস্‌কে এক দেবতা বলিয়া থাকে।

৪। হেস্তিয়া। ইহারই অনুগ্রহফলে গৃহে গৃহে পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং সংমিলন রক্ষা হইয়া থাকে। ইনি অতি শান্তপ্রকৃতি।

৫।৬। আফ্রোদিতি এবং আথিনি। ইহাঁদের বিষয় পূর্ব্বেই যথাযথ কথিত হইয়াছে। আফ্রোদিতি কামিনীপ্রণয়, এবং আথিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ইহা ভিন্ন গ্রীক দেবসংসারে আরও যে সকল বহুতর দেবী আছেন ও তাহাদের প্রতি নিয়োজিত কার্য্য যাহা যাহা, তাহা দেববংশকীর্ত্তনে যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আর স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখের আবশ্যক নাই।

৩। যুগনির্ণয়।

হিন্দুদিগের চারি যুগের ন্যায়, পৃথিবীর বয়ঃক্রমকাল গ্রীকদিগের মধ্যে পঞ্চ যুগে বিভক্ত; কিন্তু হিন্দুযুগের ন্যায় তাহাদের বর্ষসংখ্যার বড় একটা স্থিরতা নাই।

১। স্বর্ণযুগ। ইহা পৃথিবীর আদিম কাল। এ যুগে মানবগণ সৎ, নিষ্পাপ, এবং সর্ব্বসুখপূর্ণ। ইহারা পৃথিবী হইতে যথেচ্ছা

ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। জরা বা রোগাদির নাম মাত্র ছিল না; ইহাদিগের নিকট মৃত্যু সুখ-নিদ্রার ন্যায় ধীরে ধীরে সমাগত হইত। এ সময়ের মানবগণ মৃত্যুর পরে উপদেবতারূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া, মানবীয় সৎ ও অসৎ কার্য্যের হিসাব লইত এবং মনুষ্যবর্গে সৌভাগ্য বিতরণ করিত। যে সময়ে স্বর্গে ক্রোণোসের রাজত্ব, সেই সময়ে এই মানবগণ উদ্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর জিউস্ প্রবল হইয়া ইহাদিগকে নিপাত করেন। এ যুগে সমস্তই স্বর্ণনির্ম্মিত।

২। রৌপ্যযুগ। রৌপ্যযুগের মানবগণ পূর্ব্বযুগের অপেক্ষা অনেক হীন; কি আকারে কি বুদ্ধিতে ইহারা তাহাদের সমকক্ষ নহে। ইহারা জন্ম হইতে শত বৎসর কাল বালকের ন্যায় মাতৃসকাশে পালিত হইত। তদনন্তর যেমন সাবালক হওয়া, অমনি পাপে রত হইয়া জীবনকাল সংক্ষেপ করিয়া আনিত। ইহারা পরস্পর কলহরত এবং দেবতার প্রতি ভক্তিশূন্য হওয়ায়, জিউসের আক্রোশে নিপাত হইয়াছিল। এ যুগে সমস্তই রৌপ্যনির্ম্মিত।

৩। পিত্তলযুগ। এই যুগের মানবগণ নিষ্ঠুর এবং ইহাদের অন্তঃকরণ ও চিত্ত পাষাণবৎ কঠিন। ইহারা অপারবলশালী, সংগ্রামপ্রিয়, দুর্বৃত্ত এবং ইহাদের জীবন আহারীয় পদার্থ-সাপেক্ষ ছিল না। এ যুগের সমস্ত বিষয় পিত্তলনির্ম্মিত; এখনও লৌহের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই যুগের মনুষ্যগণের পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইলে, জিউসের অভিপ্রায়ক্রমে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া জলমগ্ন হয়; কেবল প্রমিথিওসের পুত্র ডুকালিওন্ পিতার সাবধানতা ও উপদেশক্রমে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তদারোহণে রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। এই জলপ্লাবন হিন্দুদিগের প্রলয়কালীন জলপ্লাবনের স্থলীয়।

৪। বীরযুগ। এই যুগের মনুষ্য সৎ এবং সুবুদ্ধিযুক্ত; ইহারা দেবতা ও মানবের মধ্যস্থলীয় জীব, সুতরাং মনুষ্য হইতে উন্নত। দেববংশ হইতে মানববংশ উদ্ভবের ইহারা সংযোগস্থল।

৫। **লৌহযুগ।** পাপতাপে জর্জ্জরিত বর্ত্তমান সময়। ইহা হিন্দুদিগের কলিযুগ। গ্রীক পৌরাণিকেরা ইহাকে অবিকল কলি-যুগের ন্যায় ভীষণ চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে।

৪। পর্ব্বাহ এবং উৎসব।

বহু পর্ব্বাহ এবং উৎসবাদির মধ্যে এই কয়টী প্রধান।

পর্ব্বাহ। (১) পান্‌থিনীয়, (২) সোমোৎসব বা বাথোস্‌ দেবের পর্ব্বাহ, (৩) ইলিউসিনীয়।

উৎসব। (১) অলিম্পিয়, (২) পীথিয়, (৩) নিমীয়, (৪) ইস্থ-মীয়।

পান্‌থিনীয়। আথেন্স নগরে আথিনি দেবীর উদ্দেশে পালিত হইত। এই পর্ব্বাহ দ্বিবিধ ছিল,—এক বাৎসরিক ও অপর চাতুর্ব্বাৎ-সরিক; ঘটা প্রায় উভয়েতেই সমান হইত। একটী রঙ্গস্থল ছিল; তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত আথিনীয়বর্গ নিয়ম অনুসারে সারি দিয়া উপস্থিত হইত। তদনন্তর দেবীর উপাসনার পর, ক্রমান্বয়ে মল্লক্রীড়া, বলপরীক্ষা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি হইত। যে সকল কবি এবং গ্রন্থকার কোন নূতন গ্রন্থ লিখিতেন, এই স্থানে তাহার দোষ গুণ বিচার হইত; এবং তৎসমস্ত ও মল্লক্রীড়া প্রভৃতির পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই পর্ব্বাহ দশজন মনোনীত কমিসনরের দ্বারা সম্পাদিত হইত, এবং ইহা অনেক দিন ধরিয়া চলিত।

সোমোৎসব বা বাথোস্‌ দেবের পর্ব্বাহ। এই পর্ব্বাহ দুই প্রকার ছিল;—এক ক্ষুদ্র, অপর বৃহৎ। ক্ষুদ্রটী শরৎকালে এবং বৃহৎটী বসন্তকালে নির্ব্বাহিত হইত। স্ত্রী এবং পুরুষ নানারূপ সং সাজিয়া ও মদে উন্মত্ত হইয়া এই পর্ব্বাহে মাতিত। ইহারা নানারূপ রঙ্গভঙ্গী ও উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিত; এবং স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধীয় ও অন্য অন্য প্রকারে যতদূর বীভৎস আচরণ সম্ভব হয়, তাহার আচরণে

কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না। ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যরবে, কথিত বীভৎস আচরণে, এবং চীৎকার প্রভৃতিতে এই পর্ব্বাহ এক 'কিম্ভূত কিমাকার' আকার ধারণ করিত। জ্ঞানী অজ্ঞানী, ভদ্র ও অভদ্র, তাবৎ লোক ইহাতে যোগ দান করিত। দেবতার পূজা প্রকরণ নানাবিধ ছিল; এবং এখানেও মল্লক্রীড়া প্রভৃতি ও সৎ গ্রন্থাদির পুরস্কার বিতরণ করা হইত।

ইলিউসিনীয়। পর্ব্বাহের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে কয়দিন এই পর্ব্বাহ চলিত, সে কয়দিন কোন ব্যক্তিকে কেহ গ্রেপ্তার করিতে, জেলে দিতে, বা কেহ কাহারও নামে বিচারকের নিকট নালিস করিতে, পারিত না। এই পর্ব্বাহ নয় দিন ধরিয়া চলিত, এবং প্রতি পঞ্চম বৎসরে নির্ব্বাহিত হইত। ইহাও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ছিল। আগষ্ট মাসে ক্ষুদ্র পর্ব্বাহ হইয়া, নবেম্বর মাসে বৃহৎ পর্ব্বাহ হইত। ইহা দেমিতুর দেবীর উদ্দেশে পালিত। কোন ব্যক্তিকে এই পর্ব্বাহে দীক্ষিত হইতে হইলে, বহুদিন ধরিয়া তাহাকে শুদ্ধাচারে ও কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হইত। দীক্ষা এবং পর্ব্বাহের পূজা প্রভৃতি গভীর রাত্রিতে সম্পাদিত হইত, এবং সেই সময়ে আরও নানাবিধ গোপনীয় কাণ্ড সকল সম্পাদিত হইত; সে গোপনীয় কাণ্ডের মধ্যে কুকাণ্ড সকলেরও অভাব ছিল না। এই গোপনীয় কাণ্ড হইতে ইহার নাম গুপ্তোৎসব। এই গোপনীয় ব্যাপার যে কোন দীক্ষিত প্রকাশ করিলে, তাহাকে আইনের বহির্ভূত করা হইত এবং সুযোগ হইলে তাহার প্রাণহরণের পক্ষেও ত্রুটি হইত না। এই পর্ব্বাহে প্রতি দিন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম পূজা প্রকরণ, নাচ তামাসা, মল্লক্রীড়া, গীতবাদ্য, কবির লড়াই আদি চলিত, এবং সে সকলের পুরস্কারও দেওয়া হইত। আথেন্সের রাজ-সরকার হইতে এক জন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইয়া এই পর্ব্বাহের কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিত। আথিনীয়দিগের বিশ্বাস যে, যে ব্যক্তি এই পর্ব্বাহে দীক্ষিত হয় নাই, সে পরকালে ভাল লোকে গমন করিতে পারিবে না।

অলিম্পিয়। এই উৎসব তাবৎ উৎসবের শ্রেষ্ঠ। প্রতি চারি বৎসর অন্তরে উপস্থিত হইত। জিউস্ দেবের উদ্দেশে হিরাক্লিস্ দেবতা কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত। এই উৎসবে মল্লক্রীড়া, বলপরীক্ষা, ঘোড়দৌড়, গাড়িদৌড় ইত্যাদি এবং কবির লড়াই, নূতন গ্রন্থাদি পাঠ ও তাহার দোষ গুণ বিচার, এই সকল সম্পাদিত হইত। গ্রীকদিগের প্রায় যাবতীয় প্রধান গ্রন্থকার ও কবি এই উৎসবক্ষেত্র হইতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ উৎসবক্ষেত্রে, যে বিষয়েই হউক না কেন, যে জয়ী হইত, তাহার সম্মান এত অধিক যে, রাজরাজেশ্বরের সম্মানও তাহার নিকট মলিন হইয়া যাইত; এবং কবিগণ তাহার যশ কীর্ত্তন করিত। এ উৎসবের মল্লক্রীড়া প্রভৃতি সমস্তই উলঙ্গ অবস্থায় সম্পন্ন হইত এবং সেই জন্য হউক বা আর যে কারণে হউক, কোন স্ত্রীলোক এ উৎসবে উপস্থিত হইতে পারিত না; হইলে তাহার বধদণ্ড হইত। যে কয়দিন এই পর্ব্বাহ চলিত, সে কয়দিন গ্রীসে শত্রুতা থাকিত না। শত্রু এবং বিপক্ষ একমিল হইত, যাবতীয় কলহ ও যুদ্ধসজ্জা প্রভৃতি স্থগিত থাকিত; এবং সমস্ত প্রদেশের গ্রীকেরা শত্রুতাত্যাগে একত্র হইত। দক্ষিণ গ্রীসে পীসা নগরের নিকট ওলিম্পিয়া-ক্ষেত্রে এই উৎসব সমাধা হইত।

পীথিয়। ইহা আপলো দেবের উদ্দেশে চারি বৎসর অন্তরে ডেল্‌ফীক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইত।

নিমীয়। দক্ষিণ গ্রীসে নিমীয়া নগরের নিকট হিরাক্লিস্ দেবের উদ্দেশে দুই বৎসর অন্তরে অনুষ্ঠিত হইত।

ইস্থমীয়। করিন্থের নিকট নেপচুন্ দেবের উদ্দেশে চারি বৎসর অন্তরে অনুষ্ঠিত হইত।

এই উৎসব সকল অল্প ইতরবিশেষে অলিম্পিয় উৎসবের অনুকরণ মাত্র; অতএব তাহাদের বিষয় বিশেষ করিয়া আর কিছু লেখা গেল না।

এই অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত দেববংশ ও দৈবপ্রকৃতি, যাহার মধ্যে

হাসিবার বিষয় পদে পদে, উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানের যথায় সর্ব্বত্র যেন প্রতিজ্ঞাতঃ অভাব, এবং অসৎ বুদ্ধি ও অসৎ প্রবৃত্তি যাহার সর্ব্বত্র পরিচালিত; ইউরোপীয়েরা তাহাই লইয়া, দিনান্তে পাঁচ বার হিন্দুশাস্ত্রীয় দেবদেবী-গণের সঙ্গে তুলনাপূর্ব্বক, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি উপহাস বর্ষণ, এবং গ্রীক দেবদেবীকে উর্দ্ধে উত্থান করাইয়া থাকে। কিছুই আশ্চর্য্য নহে। প্রথমতঃ, যে যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ হইয়া থাকে, তাহাকে আকাশে তোলা ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ঘটনায় কালিকে এমন ঘটে যে ভুটিয়ারা ইউরোপীয়দিগের প্রভু হইয়াছে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে বিশুখ্রীষ্ট কেমন এক নিশ্বাসে অধোগমন করেন, এবং তাহার স্থানে 'ফরাতারা' কেমন উর্দ্ধে উঠিয়া হাততালি দিয়া হাসিতে থাকেন। অতএব ইউরোপীয়দিগের তদ্রূপ করণে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। কিন্তু কথা এখন এই, আমরা কেন, যেমন বুঝাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে না বুঝিবার কারণ দেখিতে পাই না? উহাও আমাদের স্বভাব। মুসলমানদের সময়ে মুসলমান হইয়াছিলাম, ফিরিঙ্গীর সময়ে ফিরিঙ্গী হইতেছি; তোতাকহনির বয়েদ্‌কে আগে শ্রুতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিতাম, মিল ডারউইনের তরঙ্গে এখন চলাচল করিয়া তুলিতেছি! মুসলমান-আমলে হিন্দুর ছেলে পীর নবিকে আশ্রয় করিয়া হিন্দু-দিগকে 'দোজকে' পচাইতে কুণ্ঠিত হইত না; এখন সেই হিন্দুর ছেলে আবার বিশুর আশ্রয়ে হিন্দুদিগকে 'হেলে' পোড়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না! মুসলমান-রাজত্বে বাইজীর ন্যায় ঘাগরা চাপকানকে কতই বা না বাহবা দিয়াছি, এখন আবার কোট হ্যাটের মোহিনী শক্তিতে কতই বা না মোহিত হইয়া পড়িয়াছি! বাঙ্গারাম, যে ঘাগরা চাপকান নবাব সুবোর নিকট তোমার ইজ্জতের আধার ছিল, এখন তাহারা কোথায়? তাহাদের স্থানে কোট প্যাণ্টলুন এখন এমন অধিকার বিস্তার করিয়াছে যে, কি ঘরে, কি বাহিরে, দেশী পোষাকে তোমার লজ্জায় ও ইজ্জতের কমিতে মাথা কাটা যায়। অথচ তোমার বুদ্ধি

এবং হেক্মৎ অপরিসীম! বুদ্ধি এবং হেক্মৎ চিরকালই অপরিসীম আছে; এবং নিজে যে তাহার কিছু কম্ জম্ প্রাপ্ত হইয়াছে, এ কথা এ পর্য্যন্ত এ সংসারে কেহ কখন ব্যক্ত করিয়া বলিল না! তবে বাঞ্ছারাম, অভাব কিসের?—অভাব যে কিছু তাহা কেবল আপনাতে আপনির!

দ্বিতয়ী পরিশিষ্ট।

প্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম্ম।

১৯২ পৃষ্ঠা। ৬৬ সংখ্যক টীকা।

-:০:-----

মিগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে তৎকালে, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে, দুই প্রকারের ধর্ম্মচর্য্যা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক উপনিষদ অনুসারে জ্ঞানমার্গ, অপর বেদপুরাণাদি অনুসারে কর্ম্মমার্গ। জ্ঞানমার্গস্থগণ কিরূপ ছিল, তাহা আলেক্জাণ্ডারের প্রতি দণ্ডাচার্য্যের বাক্যে অনেকটা প্রকাশ পাইবে। কর্ম্মমার্গে যে তৎকালেও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষ প্রবলতা ছিল, তাহা মিগাস্থিনিস্ বিশেষরূপে উল্লেখ না করিলেওআমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। সে যাহা হউক, এখন এইটিই মিগাস্থিনিস হইতে বিশেষ লক্ষিতব্য যে, যে পৌরাণিক ধর্ম্মকে এখনকার অনেকে আধুনিক বলিয়া থাকে ও যাহাকে হাজার বৎসর বা তাহার কিঞ্চিদধিকের অপেক্ষা অধিক পুরাতন বলিয়া স্বীকার করে না, সেই পৌরাণিক ধর্ম্ম তখনও বিশেষরূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহাই প্রধানতঃ দেখাইবার জন্য এই পরিশিষ্টের অবতারণা।

মিগাস্থিনিস একস্থানে "শিবাই" (Sebae) নামক এক শ্রেণীস্থ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া তাহাদের এরূপ বর্ণনা দিয়াছে।[১] ইহদের পরিধেয় চর্ম্ম, হস্তে ত্রিশূল (Club) এবং তাহারা বলদ ও অশ্বতর-দিগকে ত্রিশূলের চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া থাকে। মূলে ঠিক ত্রিশূল শব্দ নাই, ইংরেজীতে "ক্লব" শব্দ আছে। ক্লব অর্থে সাধারণতঃ লগুড়,

---

১। McCrindles Megasthenes pp. 111,

কিন্তু স্থান অনুসারে মিগাস্থিনিসের দ্বারা ত্রিশূল অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। সে যাহা হউক, এখন এই বর্ণনাটি দেখিলে ঐ শ্রেণীকে শৈব সন্ন্যাসী বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে কোনই প্রতিবন্ধক দেখা যায় না; অথবা শৈব বলিয়া ধরিয়া না লইলে অপর কোন অর্থও হয় না। পুনশ্চ, ইহাও দ্রষ্টব্য যে, মিগাস্থিনিস কর্ত্তৃক উক্ত শিবাই শব্দও তৎপক্ষে স্পষ্টরূপে সহায়তা করিতেছে। বর্ত্তমানকালীয় শৈবগণের বর্ণনাও যে উক্ত বর্ণনা হইতে কিছু অধিক রূপান্তরিত তাহা নহে। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, তখনও শৈবধর্ম্ম ও শৈবগণ প্রচলিত ও বর্ত্তমান ছিল।

ইহার পর আরিয়ান-কৃত বর্ণনায়[২] আছে যে, সৌরসেন দেশে দুইটী বড় নগর আছে, তাহার একটীর নাম মিথোরা ও অপরটীর নাম ক্লিয়াইসোবোরা এবং ঐ দেশের মধ্য দিয়া যোমানি নদী প্রবাহিত। এই দেশের মধ্যে হিরাক্লিস্ দেবতা বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে নামগুলির গ্রীক আবরণ ঘুচাইয়া দিলে, দেখা যায় সুরসেন রাজ্যে মথুরা ও কালিয়াবর্ত্ত[৩] নামে দুই অতি বড় প্রধান নগর এবং সুরসেনের মধ্য দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত ছিল। হিরাক্লিস্ দেবতা অর্থে হরি বা বলদেব। গ্রীকদিগের দস্তুর এই ছিল যে, তাহাদের নিজ দেবদেবীর সঙ্গে এ দেশীয় কোন দেবদেবীর কি আকারগত, কি চরিত-

---

২। Mc.Crindles Megas. pp. 139 & 210.

৩। কালিয়াবর্ত্ত অর্থাৎ বৃন্দাবন, কালিনাগের আবর্ত্ত হইতে কালিয়াবর্ত্ত নাম এবং দেখা যাইতেছে যে মিগাস্থিনিসের সময়ে ঐ নামেই ইহা বিখ্যাত ছিল। পুনশ্চ, ইহাও জানা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে উহা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। কিন্তু আবার দেখা যাইতেছে, কালক্রমে ঐ নগর ধ্বংস ও স্থানটি জঙ্গলময় হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন আবির্ভূত হয়েন, অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, বৃন্দাবন নির্জ্জন অরণ্যময় ছিল। চৈন্যদেবের আজ্ঞাক্রমে শ্রীরূপ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে নিযুক্ত হয়েন এবং উক্ত গোস্বামীদ্বয়ের সময় হইতেই বর্ত্তমান বৃন্দাবন নগরীর স্থাপনা আরম্ভ হয়।

[illegible] একটু সাদৃশ্য মিলিলেই, এ দেশীয় নাম গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নিজ দেবদেবীর নাম তাহার উপর অর্পণ করিত। সেই সূত্রেই গ্রীকদিগের নিকট শিবের নাম বাখোস্ এবং হরি বা বলদেবের নাম হিরাক্লিস্। পুনশ্চ, মিগাস্থিনিস্ বলিতেছে যে, ভারতীয় হিরাক্লিসের অসংখ্য স্ত্রী ও অসংখ্য পুত্র ছিল।

মিগাস্থিনিস্ আরও বলিয়াছে যে, হিরাক্লিসের একটী কন্যা ছিল, তাহার নাম পাণ্ডেয়া, এবং হিরাক্লিস্ শত্রু সকল বিনাশ করিয়া এক বিশাল রাজ্য তাহাকে অর্পণ করেন। ইহার দ্বারা আমার বিবেচনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় ও পাণ্ডুবংশকে রাজ্যপ্রদানের কথা সূচিত হয়। তবে যে পাণ্ডব কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল মিগাস্থিনিসের বৈদেশিকত্বজনিত ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অথবা হইতে পারে যে, মহাভারত অতি বিশাল গ্রন্থ হেতু তাহার বহুল প্রচার না থাকায়; যে জনশ্রুতি শুনিয়া মিগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, তাহাই ঐরূপ ভ্রমসংস্কুল ছিল।

অতএব এতদ্দ্বারা এই জানা যাইতেছে যে, যেরূপ শৈব, সেইরূপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও তখন প্রচলিত, এবং মহাভারতের ঘটনাবিষয়ক আখ্যায়িকাও দেশমধ্যে অল্প বিস্তর প্রচারিত ছিল।

মিগাস্থিনিসেরও প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রাদির ব্যবহার দেখা যায়। কারণ ক্তিসিয়াস্[৪] একস্থানে বলিতেছে যে, একটি কুণ্ড ছিল, তাহাতে ভারতীয়েরা পবিত্র হইবার জন্য অবগাহন করিত। পুনশ্চ, নিত্য প্রজ্বলিত অগ্নিবিশিষ্ট একটি পর্ব্বতেরও উল্লেখ আছে। শেষোক্তটি জ্বালামুখী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রথমোক্তটি কোন কুণ্ড, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না।

জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে অধিক কিছু আর না বলিয়া, অল্প কিঞ্চিৎ অনুবাদ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[৫] —ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর এক

৪। Kt. Frag. 1 & XII.

৫। Megas. Frag. LIV.

সম্প্রদায় আছে, তাহারা জ্ঞানবাদী এবং তাহারা যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা কি আমিষ, কি অগ্নিপক্ক খাদ্য, এ সকলের কিছুই গ্রহণ করে না; ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু সে ফলও তাহারা গাছ হইতে পাড়ে না, যাহা আপনা হইতে তলায় পড়ে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা বলে ঈশ্বর এই শরীরকে আত্মার কোশস্বরূপ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু সূর্য্য, অগ্নি বা যেরূপ জ্যোতি আমরা চক্ষে দেখিতে পাইয়া থাকি, সেরূপ জ্যোতি নহে। তাহাদের মতে পরমেশ্বর শব্দস্বরূপ (শব্দ ব্রহ্ম), কিন্তু শব্দ বলিতে সাধারণ কথাবার্ত্তা নহে; যাহার দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ ও গূঢ়তত্ত্বের উদ্ভেদ হয়, তাহাই শব্দ। ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ, যাহাকে তাহারা শব্দ বলিয়াও বলে, তাহারা বলিয়া থাকে যে তাহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে, যেহেতু তাহারাই কেবল অহঙ্কারপরিত্যাগে সমর্থ এবং এই অহঙ্কারই আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা বহিঃস্থিত কোষ। মৃত্যুকে তাহারা নিতান্তই তুচ্ছ করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বদাই অতি ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ ও স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে। তাহারা বিবাহ বা সন্তান উৎপাদন করে না। যে কেহ ইহাদের শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা চিরদিনের মত ঘর বাড়ী ছাড়িয়া নদীপারে আসিয়া দলস্থ হয়; এবং আর কখনও গৃহে প্রতিগমন করে না।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

—০:০—

১২৮ পৃষ্ঠা।

হিন্দুর ব্রহ্মবিদ্যায় জ্ঞানকাণ্ড।

(মৎপ্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

আর্য্যগণের মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্ম্ম। শ্রুতি দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শেষভাগে ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই উপনিষদ্ বা বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত বলে। হিন্দুদিগের জ্ঞানকাণ্ড সেই উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। উহা যোগধর্ম্মের উৎস। যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের দুহিতা-স্বরূপ; বিরুদ্ধ মত অশ্রদ্ধেয়। এই নিমিত্ত, জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন মতের গৌরব রক্ষার্থে উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন। এমন কি, নিরীশ্বর সাঙ্খ্যও, যদি বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য গ্রাহ্য হয়, উপনিষদের দোহাই দিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথায় অনিষ্ট ঘটিতেও ত্রুটি হয় নাই। দুষ্ট বিদ্যাভিমানিগণের আপন আপন মত প্রতিপোষকতার নিমিত্ত অনেক জাল উপনিষদ্‌ও সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদ্‌ও নির্ব্বিবাদে নাই। যাহা হউক, বাল্মীকির সময়ে যোগধর্ম্ম কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বাল্মীকির দ্বারা উল্লিখিত বেদশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং আর যাহা যাহা তাঁহার পূর্ব্বের, সেই সকল হইতে যোগধর্ম্মের সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে তত্তৎ ভাব কতদূর অনুসৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে এবং মূল বিষয়ের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ধারণ করে, তাহা প্রায় টীকাকারে অন্যান্য বিষয়ের সহ পার্শ্ববর্ত্তিভাবে প্রদর্শিত হইবে।

উপনিষদ্‌সমূহের উদ্দেশ্য যদিও এক, কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে সেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সে সকলের সহিত্ত এখানে সংস্রব রাখা অনাবশ্যক এবং তদুপযুক্ত স্থানও নাই। উদ্দেশ্য মাত্র নিম্নমত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যোগধর্ম্ম আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তাব্যক্ততা, জীবাত্মার সহ পরমাত্মার সম্বন্ধ, জীবাত্মার অবস্থান, মুক্ত্যুপায় এবং যোগসাধনোপায়।

বৈদান্তিক ধর্ম্মের মূল প্রস্থান

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব"

এবং লব্ধ ফল

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

নিত্য স্বয়ম্ভু এবং যাঁহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাঁহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া থাকে, ও "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবোপ্যয়ৌ হি ভূতানাং" এরূপ একমাত্র পরমাত্মা আদিতে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম বা নিষ্কাম কোন পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশী জ্ঞানময় আত্মা বহুধা হইতে কামনাযুক্ত হইলেন। তজ্জন্য তপঃ সাধন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি সাম্যাবস্থা-চ্যুত গুণক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে প্রথমে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হইল, অনন্তর ক্রমান্বয়ে আকাশ হইতে স্পর্শগুণ মরুৎ, মরুৎ হইতে রূপগুণ তেজঃ, তেজঃ হইতে রসগুণ অপ্, অপ্ হইতে গন্ধগুণ ক্ষিতির উদয় হইল। আকাশাদির গুণ, পর পর পরে সন্নিবিষ্ট আছে; অর্থাৎ বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং ক্ষিতিতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। তাহার পর ক্ষিতি হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ

হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল। ১ সৃষ্টির বিকাশক ও পরিরক্ষকগণ সৃষ্টির মানসে, কারণজলমধ্যে সৃষ্ট সৃষ্টির আদি বীজ ও মায়াশক্তির প্রথম পরিপাকস্বরূপ যে অণ্ড, তাহার উদ্ভেদে একটী নরাকার পুরুষকে গ্রহণ করিলেন; ইনিই হিরণ্ময়গর্ভ। সেই পুরুষের শরীর উদ্ভিন্ন করিয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দিক্, উদ্ভিদ্, চন্দ্র, মৃত্যু এবং জল এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতানিচয়ের উদ্ভব হইল। ২ ইহাঁরা মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়, শ্বাসেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, কেশাবলী, মন, প্রাণবায়ু এবং উৎপাদিকা শক্তি এই সকলের অধিষ্ঠাতা ও পরিরক্ষক-ভাবে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পরমাত্মা সৃষ্ট সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব, তাহা ব্যক্ত করিলেন; এ নিমিত্ত সাকার নিরাকার, সৎ অসৎ, বিদ্যা অবিদ্যা, উভয়বিধ ভাবই তাঁহাতে আশ্রয় করিল। ৩ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে শত শত স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়,

---

১। ছান্দোগ্যে (৬। ২-৩) ঈশ্বর বহুধা হইতে বাঞ্ছা করিলে প্রথমে তেজ সৃষ্টি হইল, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে স্বেদজ, অণ্ডজ, ও উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হইল। মাণ্ডূক্যে (১। ১। ৮) অন্ন হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন সত্যলোক কর্ম্ম এবং অমৃতত্ব উৎপাদিত হইল। এতৎ প্রাচীন উপনিষদ্দ্বয়ে উল্লিখিত মত-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

(২) রামায়ণে ২।১১০।৩

"সর্ব্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা।
ততঃ সমভবদ্‌ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ॥"

পুনশ্চ মনুতে (১।৬-৯) অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা সৃষ্টিকরণেচ্ছু হইয়া পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করায়, একটী অণ্ডের উৎপত্তি হইল। ঐ অণ্ডে বিধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্ম গ্রহণ করিলেন।

(৩) বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যমতে ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা-প্রপঞ্চ। অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি, এতদুভয় শক্তিবশে জীবাত্মা অবিদ্যায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। অবিদ্যা কর্ম্মফলাশ্রয়ী, তন্নিমিত্ত ক্ষণে উন্নত ক্ষণে অবনত হওয়ায় তদাশ্রিত জীবও পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও স্বর্গ-নরকাদির অধীন হইয়া থাকে। জীবাত্মা যখন এই অবিদ্যা-বন্ধন ছেদ করিয়া

এবং সেই স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি যেমন এক পদার্থ, অথবা আকাশ যেমন ঘটে আবদ্ধ হইলেও তাহা মহা আকাশ সহ একই পদার্থ; তদ্বৎ জীবাত্মা সেই পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া,সৃষ্ট বস্তুমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিদ্যা-বদ্ধ[৪] হওত বস্তু সকলের ব্যক্ততার কারণ হইলেও, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে এক।[৫]

জীব ও পরমাত্মা কিরূপে এক এবং জীবের মধ্যে পরমাত্মা কিরূপে সন্নিবিষ্ট, তাহা সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে ;—জীবে যে চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, তিনিই পরমাত্মা। জীবের দেহ যাহা, তাহা মায়িক ও জড় ; জীবের কামকর্ম্ম পরিপাকে মায়াবশে উদ্ভূত। এখন এই জড়দেহ

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে, তখনই জীবাত্মার কামকর্ম্মাদির হেতুরাহিত্যে মোক্ষসাধন হয়। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ," এবং "স্বমায়া-রচিতং বিশ্বং" ইত্যাদি। অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারে কি না তাহা সাংখ্য-সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে। "নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মে এই বিশ্ব যেরূপে নির্ভর করিয়া আছে, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমে নদী ও চক্রের রূপকে অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একরূপ অর্থে ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য শ্রুতিবিশেষের একার্থক বিভিন্ন শব্দসমূহের পরিবর্ত্তে, স্থলে স্থলে অর্থের সামঞ্জস্য এবং একতা রক্ষার্থে বেদান্তসূত্রে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব। অবিদ্যাও সেইরূপ একটি শব্দ।

(৫) এতদ্ভাবের বিস্তার ভগবদ্গীতায় ১৫।১৫ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি, পুনশ্চ ৬।১৯-৩১ "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" ইত্যাদি। যোগ-বাশিষ্ঠে ৩।৫৬ "জগদ্ভ্রমোঽয়ং" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তর গীতায় "অহ-মেকমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি। পুনশ্চ ভগবদ্গীতায় "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ" ইত্যাদি। সাকার উপাসনা মার্গেও,

"মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।"
ইত্যাদি, ইতি ভগবতীগীতা।

রামায়ণে ৪র্থ কাণ্ডে ১৮ সর্গে "হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভং"।

চৈতন্যের যে আভাসে আভাসিত হইলে,তাহাকে সচেতন ও সজ্ঞানের ন্যায় ক্রিয়াশীল বলিয়া দেখা যায়; চৈতন্যের সেই আভাসকেই চিৎ-শক্তি, চিদাভাস প্রভৃতি নামে নামিত করা হয়। এই চিদাভাসকে পুনঃ পরা প্রকৃতিও বলে; ইনি পরা প্রকৃতি ও বিদ্যা, আর জড়সৃষ্টি-কারিণী মায়া অপরা প্রকৃতি বা অবিদ্যা। রূপকে বল আর যাই বল, গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণই সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা এবং রাধিকা সেই পরা প্রকৃতি। আর অপরা প্রকৃতি যিনি, তিনিই অষ্টমূর্ত্তিতে রাধিকার অষ্ট সখী,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ,
অহঙ্কারঃ———।"

অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পৌরাণিক মতে অপরা রূপকে পরিণত হইয়া বিরজা নামে খ্যাত। বিরজা গোলোকধামবেষ্টনে নদীরূপে বিরাজিত। বিরজার পারে আর মায়ার অধিকার নাই। এই বিরজার জলেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া থাকে, এবং যতক্ষণ ভাসে ততক্ষণ তাহারা অব্যক্তে অবস্থিত। নিত্য বালিকারূপিণী কাল, বিরজার ধারে বসিয়া, বালস্বভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডরাশির মধ্যে যখন যতটা উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় খেলা করিতে থাকে, তখন তাহাদের ততটাই ব্যক্তে আইসে; আবার খেলিতে খেলিতে বালিকার হাত ফসকাইয়া তাহার কোনটা পড়িয়া গেলেই, মহা-প্রলয়ের উপস্থিতিতে তাহা ভাঙ্গিয়া বা ধ্বংস হইয়া যায় ও অব্যক্তে বিলীন হয়। বালিকাটী রাধিকারই দুহিতা, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, রাধিকা সর্ব্বদাই সকৌতুকে বালিকাটীর ক্রীড়া দর্শন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবে কৃষ্ণ-রাধিকা, শাক্তে শিবদুর্গা, এইরূপ যাহার যেমন সম্প্রদায়, সে সেইরূপেই এই পুরুষ ও পরা প্রকৃতিকে ডাকিয়া থাকে।

রাধিকার প্রোক্ত দৃষ্টি বা চিদাভাসেই জড়জগৎ বা জড়ব্রহ্মাণ্ড, সুতরাং প্রত্যেক খণ্ড জড়দেহও,সচেতনের ন্যায় ও জ্ঞানবানের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সমষ্টি চিদাভাসের দ্বারা সমষ্টি জড় সচেতন হইলে,তাহাই সর্ব্বমূর্ত্তি-

সমষ্টি জীব ঈশ্বরের বিরাট দেহরূপে প্রকাশ পায়; এখানে এই সমষ্টি দেহ বিরাট দেহ এবং তন্নিহিত ও তদ্দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট সমষ্টি চিদাভাসই ঈশ্বর। সমষ্টির ন্যায় আবার ব্যষ্টিদেহ বা দেহবিশেষে যে চিদংশ পতিত হয় এবং যদ্দ্বারা দেহবিশেষ সচেতন হইয়া থাকে, সেই চিদংশই সেই দেহ দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হইয়া জীব বা জীবাত্মা আখ্যা ধারণ করে এবং তাহার সেই ব্যষ্টিদেহকে জীব-দেহ বলা যায়। চিদংশ যেমন দেহ দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হয়েন, তেমনি দেহজাত মায়িক কামকর্ম্মও তাঁহাতে আরোপিত হওয়ায় তিনি তদ্দ্বারা কামকর্ম্মবিশিষ্ট এবং তজ্জাত কলঙ্কে সুতরাং কলঙ্কিত হইয়া থাকেন। দেহ দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলদেহ জীবের জন্মমৃত্যু সহ হইতেছে ও যাইতেছে; কিন্তু সূক্ষ্মদেহ সেরূপ সহজে যায় না। যতক্ষণ কামকর্ম্মের একেবারে ক্ষয় সহ চিদংশে আরোপিত কলঙ্কের অপনয়ন না হয়, ততক্ষণ সূক্ষ্মদেহ ঘুচে না। সূক্ষ্মদেহ ঘুচিলেই উপাধিনষ্টে মোক্ষ হয়। কামকর্ম্মক্ষয়ে সূক্ষ্মদেহ ঘুচানর জন্যই তাহার প্রক্রিয়ামার্গে উপাসনা, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আরও একটা কথা বলি, যেমন দেহবিশেষ অর্থাৎ ব্যষ্টিদেহ জাত মায়িক কামকর্ম্ম জীবোপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মায় আরোপিত হইয়া জীবের কামকর্ম্মস্বরূপে গণিত হয়; সেইরূপ সমষ্টিদেহ জাত মায়িক কামকর্ম্ম যাহা, তাহা সমষ্টিদেহী পরমেশ্বরে আরোপিত হয় এবং তাহাই বৈদান্তিকতত্ত্বে ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখন বুঝিলে বোধ হয় যে, তোমাতে যে চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; তোমার শরীর যাহা তাহা মায়া; এবং সেই শরীর চৈতন্যের যে আভাসে আভাসিত হইয়া সচেতন হইতেছে, তাহাই জীবাত্মা বা তুমি। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরক্ষয়ে তোমার তুমিত্ব ঘুচিয়া গেলেই, সমুদ্রের জল সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়ায় মোক্ষ।

অতঃপর মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

যেমন সূর্য্য যে সকল বস্তুর উপর কর প্রসারিত করেন, সেই সেই

বস্তুর গুণানুসারে এবং স্থলান্তরে দর্শকের নেত্রদোষানুসারে তিনিও তদ্বৎ গুণপ্রাপ্ত বলিয়া ভান হয়; জীবাত্মাও অবিদ্যা-প্রভাবে কাম-কর্ম্ম ও শুভাশুভ প্রভৃতিতে তদ্বৎ পরিচালিত ও মোহযুক্ত এরূপ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ সূর্য্যকর যেমন সেই সেই গুণ হইতে নির্লিপ্ত, জীবাত্মাও তদ্রূপ মায়াজনিত মোহ এবং সুখে ও দুঃখে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন।[৬] পরমাত্মার জীবশরীরস্থ ভাবকে জীবাত্মা এবং স্বভাবস্থ ভাবকে পরমাত্মা পদে অভিহিত করা যাইবে। জীবাত্মা কর্ম্মাশ্রয়ী মায়াবন্ধনযুক্ত হওয়ায় যদিও গমন-বিমুখ, তথাপি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী; নৈকট্য এবং দূরত্ব তাঁহার নিকট উভয়ই সমান, তিনি অন্তর-আকাশে থাকিয়াও অন্তর বাহির উভয় স্থানে বাস করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, প্রভান্বিত, অশরীরী, শিরা-মস্তিষ্ক-বিহীন, নির্ম্মল ও পাপরহিত।[৭] নিত্য, সূক্ষ্ম, অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়ম্ভু, হন্তাও নহেন, হন্তব্যও নহেন। বাক্য নেত্র শ্রোত্র শ্বাস প্রভৃতির যিনি অতীত এবং যাহা হইতে ঐ সকল ব্যক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে, যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।"

জীবাত্মা অবিদ্যাবন্ধনযুক্ত হইলে অন্তর, মন, অহঙ্কার, অজ্ঞান,

---

(৬) আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত তাহা অল্প সাম্যের ছায়া আশ্রয় করিয়া ভগবদ্গীতায় ১৩।২৯-৩৪ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

"অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।"

(৭) ভগবদ্গীতায় ২।১৭-২০ "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদি। আবার ১৩।১৩-১৫

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।" ইত্যাদি।

বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, ক্রতু, অসু, ইচ্ছা ইত্যাদি তাহার পরিচায়ক হয়। পরমাত্মা এ সকল পরিচায়কতাবিহীন নিরাকার। আত্মা জীবস্থ হইলে, জৈব ব্যাপার সম্বন্ধে আত্মা রথী, শরীর রথ, সত্ত্ব সারথি, মন বল্গা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং উদ্দেশ্য পথ। জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায়, ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সত্ত্ব মহৎ, সত্ত্ব হইতে ব্যক্ত জীবাত্মা, তদুচ্চে পরমাত্মা, উহাই সীমা। [৮]

জীবশরীরে অন্নময়-কোষাবলম্বনে মনোময় কোষ, তদবলম্বনে বিজ্ঞান-ময়; অনন্তর যথাক্রমে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের অবস্থান। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সূত্রাত্মা জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষাবলম্বনে অবস্থিতি করেন। ইহাঁর অবস্থা চারি প্রকার। প্রথমে বৈশ্বানর, ইনি স্থূলশরীরস্থ হইয়া তাঁহাকে পরিচালনা করেন। ইহা জীবের জাগ্রদবস্থা। এই সময়ে জীবাত্মা ঊনবিংশ ইন্দ্রিয় [৯] বিশিষ্ট হইয়া স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় তৈজস্, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, এই সময়ে উক্তরূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরে থাকিয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রাজ্ঞ, ইহা সুষুপ্তাবস্থা, ঐরূপ সূক্ষ্ম পুরে আবদ্ধ থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। চতুর্থ সর্ব্ববন্ধন-বিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই চতুর্ব্বিধ ভাব যথাক্রমে 'অ,' 'উ,' 'ম,' এবং 'ওম্' দ্বারা সাধিত হয়। বৈশ্বানর ভাবে জীবাত্মার অবস্থান দক্ষিণনেত্রে, তৈজস্ভাবে মনোমধ্যে, প্রাজ্ঞভাবে অন্তর-

---

(৮) এরূপ উৎকর্ষতার পর্য্যায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সহ ছান্দোগ্যে ৭।২-১৫ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা বাক্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সংকল্প, সংকল্প হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে আশা, আশা হইতে প্রাণ। এই প্রাণকে যে সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে সেই অতিবাদী। এতদ্রূপ ভগবদ্গীতায় (৩।৪২) শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মা।

(৯) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

আকাশে।—অন্তর হইতে একশত এক নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধা বিভক্ত, সেই প্রত্যেকের আবার ৭২০০০ উপশাখা আছে। ১০ সুতরাং সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২০০০০০। উহাদের মধ্যে পরিচালিত যে বায়ুপ্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নামিত। এই পঞ্চ বায়ু অবলম্বন করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান; যথা গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্যাগ্নি ও আবসত্যাগ্নি। নাড়ী সকলের মধ্যে নাড়ী-প্রধানা সুষুম্না অন্তরের ঊর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হইয়া, তালুস্থ নাড়ীদ্বয় এবং মাংসখণ্ডের মধ্য দিয়া, করোটি নামক মস্তকাস্থির ভিতর দিয়া কেশমূল সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, জ্ঞান ও আনন্দময়-স্বর্ণপ্রভ আত্মা অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন; ভূর্ভূব অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সকলেই তথায় বর্ত্তমান আছে।"১১

---

(১০) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও "দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি" ইত্যাদি।

(১১) পরবর্ত্তী গ্রন্থকলাপে ইহা কত দূর স্পষ্টীকৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। দত্তাত্রেয় ষট্‌চক্রভেদে

"মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে,
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।
ধুস্তূরস্মেরপুষ্পগ্রথিততমবপুস্কন্দমধ্যাচ্ছিরস্থা
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমস্যা জ্বলন্তী॥

পুনশ্চ "তন্মধ্যে পরমক্ষরক্ষ মধুরং" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধ্নিপর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং।

* * * *

তস্যা মধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রসমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ॥

জীবাত্মা মায়াপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ কামকর্ম্মানুসারী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।১২ মায়াবন্ধন ছিন্ন করিলেই আত্মার মুক্তি সাধন হয়। এই মুক্তিসাধন সমানবায়ু অবলম্বী সপ্তশিখাময়১৩ অগ্নিতে আহুতি-দান বা শ্রুতি-বিধানোক্ত অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।১৪ ছান্দোগ্য ৭। ১। ১-৩—নারদ সনৎকুমারের নিকট আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন যে, চতুর্ব্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ

দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকুলাক্ষরাঃ।
স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ॥
বীজজীবাত্মকাস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

(১২) ভগবদ্‌গীতা অনুসারে জীবের পাপ পুণ্য কর্ম্ম সুখদুঃখাদি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। উহা স্বভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। যথা পঞ্চম অধ্যায়ে

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" ১৫

(১৩) এতদ্বিষয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

"ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।" ইত্যাদি।

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে

"সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং,
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মাণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ
জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্॥"

ভগবদ্গীতায় ২।২৫

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

এই গীতায় কথিত হইয়াছে যে, মোহাবৃত জড়বুদ্ধিদিগের উপকারার্থে গুণাত্মক কর্ম্মাদির সৃষ্টি।

(১৪) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, বিশ্বরূপা, স্ফুলিঙ্গিনী,—অগ্নির এই সপ্তশিখা।

কর্ম্মকাণ্ড, মন্ত্রভাগ, রাশি ১৫, দৈব, নিধি, বাকোবাক্যম্ ও একায়নম্, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষেত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, দেবযানবিদ্যা প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও তিনি ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে খেদযুক্ত হইতেছেন। ফলতঃ মুক্তিপথে জ্ঞান এবং অজ্ঞান এতদুভয়ের ফল ভিন্নরূপ; অজ্ঞান ক্রিয়াকাণ্ড আশ্রয় করিয়া থাকে, জ্ঞান ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহাতে কোন মতে মুক্তি হয় না; কর্ম্মফলের তারতম্যতা অনুসারে কেবল ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ লোক সকল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এ পুণ্য ও তাহার যে ফল তাহা পরিমাণবিশিষ্ট, এ নিমিত্ত পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পুণ্যসঞ্চিত লোক কতদূর অস্থায়ী, তাহা এবম্প্রকার রূপক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় পিতৃলোকে বাস। জলে প্রতিবিম্বের ন্যায় গন্ধর্ব্বাদি লোকে। আর সূর্য্যাতপ-প্রতিভাসিত চিত্রফলকস্থ মূর্ত্তির ন্যায় স্থায়িভাবে ব্রহ্মলোকে ১৬।

---

(১৫) রাশি হইতে যথাক্রমে Arithmetic and Algebra, Physics, Chronology; Logic and Polity; Technology; Articulation, Ceremonials and Prosody; Science of spirits; Archery; Astronomy; Science of antidotes; Fine arts. গৃহীত ইংরেজী নামগুলি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা অনুবাদিত।

(১৬) পুনর্জ্জন্ম কিরূপ প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে তাহা ছান্দোগ্যে (৫।১০) প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক বা পিতৃলোক বা নিকৃষ্ট লোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, ভোগশেষ হইলে, যদ্রূপ পর্য্যাক্রমে সেই সেই লোকে গমন করিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনে তদ্রূপ পর্য্যায়ের বিপরীত ভাবে নীত হইয়া আকাশে পতিত হয়। তথায় বায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া ধূমত্ব প্রাপ্ত হওনান্তর ছিন্ন মেঘের সহ মিশ্রিত হয়। তদুত্তরে ঘন মেঘের সহ লিপ্ত হইয়া জলধারাক্রমে চাউল বা অপর যে কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অনন্তর পূর্ব্বকর্ম্মসূত্রানুসারে যেরূপ উচ্চ বা অধম পর্য্যায়ে জন্মগ্রহণ হইবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিকৃষ্ট জাতি বা অধম জন্তু দ্বারা আহারিত হইয়া রেতোরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর স্ত্রী পুরুষ উভয় সংযোগে রতঃ গর্ভস্থ হইলে, জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। ভগবতীগীতাতেও উমা হিমালয়ের

কিন্তু ইহা বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে[১৭], এবং সাধারণে পরিত্যাগ করিতে পারেও না কেহ। কর্ম্ম-পরিত্যাগে জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করা, লক্ষের মধ্যেও দুই একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। ফলতঃ রাগের শমতা ভিন্ন জ্ঞানাশ্রয় হয় না, কিন্তু রাগের শমতা হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। শাস্ত্রেও, ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন ও গ্রহণের পূর্ব্বে, বেদাধ্যয়ন ও গৃহকর্ম্ম করণের উপদেশ ভূয়োভূয়ঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে কর্ম্মের দ্বারা প্রবৃত্তির শমতাসাধন পূর্ব্বক অসৎ-পথ পরিত্যাগ করিয়া ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তাহার পর বুদ্ধি বশীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে হয়। অনন্তর প্রাপ্তজ্ঞান ব্রহ্মবিৎ কামনা-রহিত হইলে, তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক-ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন, যেহেতু তখন অন্য বস্তুতে আর প্রয়োজন থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহস্থ আশ্রমেও থাকিতে পারেন, এবং নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কার্য্যের ফল-হেতুক শুভাশুভ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া এবং সফল-নিষ্ফলতায় সমান-চিত্ত-প্রসাদযুক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করিতে পারেন[১৮]।

নিকট এতন্মর্ম্মে মানবজন্ম-তত্ত্ব কহিয়াছেন। পুনশ্চ যোগবাশিষ্ঠে ১৩৯ "ক্ষীণে পুণ্যে" ইত্যাদি, পুণ্যক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(১৭) মনুর বিধিমত ৬। ৩৬-৩৭ "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্" ইত্যাদি, আগে গৃহধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ড সমাধা করিয়া তবে মোক্ষচেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হয়। অনন্তর ৬। ৩৯-৪৮ "যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ" ইত্যাদি, মোক্ষার্থী ব্যক্তির যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তৎপক্ষে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে ১১ সর্গে ৩১, ৩২, কর্ম্ম কাণ্ড শেষ করিলে কাকতালীয়বৎ জীবের পরমাত্মতত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে ও তাহাতে পটুতা হয়। ভগবদ্গীতায় (৩। ৪) কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া তবে মোক্ষ চেষ্টা করিবে।

(১৮) ভগবদ্গীতায় (৫। ৩) সন্ন্যাসীর স্বভাব এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

ইহা ২।১৭-১৯ শ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধী, তথাপি তৎপরে ও পূর্ব্বে জ্ঞানলাভ

নানা-নাম-বিশিষ্ট নদীসমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, সমুদ্রে পতিত হইলে পর আর যেমন তাহাদের পৃথক্ত্ব থাকে না, মায়াপাশচ্ছিন্ন জীবাত্মাও পরমাত্মায় তদ্রূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৯ কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, উহা কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা সাধিত হয় না। পরমাত্মা যখন বাক্য মন নেত্র, কর্ণাদির অগোচর, তখন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান, যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, কেবল তাহার দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়। যখন জীবাত্মা নিষ্কাম হইয়া কেবল পরমাত্মায় ঐকান্তিক অভিনিবেশ বশতঃ আমিই অন্ন, আমি অন্নের ভোক্তা, আমি তাহার একীভূত করণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দেবতা-দিগের পূর্ব্ব হইতেও আমি অমৃতত্ব ভোগ করিতেছি, আমি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী,—এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ও জগৎ সমস্ত আত্মময় জ্ঞান করিয়া,পরমাত্মা সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিয়া থাকে, তখনই সেই ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দধাম অধিকার করিতে পারে। তীর্থাদি সমস্ত তখন তাহার স্বীয় শরীরস্থ ২০, তখন তাহার পক্ষে পিতাও নাই, মাতাও নাই, পৃথিবী দেবতা বেদ কেহই ভিন্ন ভাব ধরে না ; চোর চোর নহে, ব্রহ্মহা ব্রহ্মহা নহে, চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, পাপ পুণ্য হইতে তিনি পৃথক্, যেহেতু তিনি তখন এই সকলের অতীত

সত্ত্বেও কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। ৩।২৫ অজ্ঞান ব্যক্তি যদ্রূপ কর্ম্মে রত থাকে, জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ লোকহিতার্থে, লোকসংগ্রহার্থে এবং অজ্ঞান ব্যক্তি-দিগকে প্রবৃত্তিপ্রদানার্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

(১৯) মায়াতে আবদ্ধ আত্মা ও পরমাত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা অতি সুন্দরভাবে. একবৃক্ষারূঢ় পক্ষিদ্বয়ের রূপকে, ঋগ্বেদের অস্যবামীয় সূক্ত ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখান হইয়াছে, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি।

(২০) যতীন্দ্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বোধ হয় এই ভাব গ্রহণ করিয়াই যতিপঞ্চকে কহিয়াছেন—

"কাশীক্ষেত্রং শরীরং, ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং, নিজগুরুচরণধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষীভূতান্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥"

হয়েন। ২১ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তখন এক। এই নিমিত্তই ছান্দোগ্যে পিতা পুত্রকে যোগসাধনের ফল জ্ঞাপনার্থে কহিতেছেন,

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

ব্রহ্মলোকের ভাব ও উচ্চতা বৃহদারণ্যকে ৩।৬।১ গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গার্গী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা অন্তরীক্ষ, গন্ধর্ব্ব, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেব, প্রজাপতি, এই সকল লোকের ক্রমান্বয়ে অবলম্বন ও অবস্থান কথিত হইলে, গার্গী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ব্রহ্মলোকের অবলম্বন ও অবস্থান কিরূপ। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন যে, এরূপ অবথা ধৃষ্ট প্রশ্ন করা বিধিবহির্ভূত, যেহেতু এরূপ প্রশ্নে, প্রশ্নকারীর মুণ্ডনিপাত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ছান্দোগ্যে (৮।৪।১০২) ব্রহ্মলোকের ভাব অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽপহতা নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মা হ্যেষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি। বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি। উপতাপী সন্ননুতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ।" ৮।৪।১-২———"এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিদিবা প্রবর্ত্তকনিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত বা দুষ্কৃত ইহার কিছুই নাই। এখানে সকলে আগত হইলে পাপ হইতে প্রতিনির্বৃত্ত হয়। অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে ক্লেশাদিতে বিদ্ধ, সে অবিদ্ধ হয়। এখানে রাত্রি দিবা

(২১) যতীন্দ্র শঙ্কর এই ভাব গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণষট্‌কে কহিয়াছেন—

"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভায় দিবসের ন্যায় সমতাযুক্ত। ইহাই নিত্যজ্যোতির্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।"—

ব্রহ্মানন্দের উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনার্থে কথিত হইয়াছে যে, ধনশালী অপেক্ষা শিক্ষিতের আনন্দ শতগুণ; শিক্ষিত অপেক্ষা গন্ধর্ব্বভাবপ্রাপ্ত মনুষ্যের আনন্দ শতগুণ; এইরূপ গন্ধর্ব্বোত্তরে পিতৃলোকের, তদুত্তরতরে দেবলোকের, ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতি ও প্রজাপতির যথাক্রমে শতগুণ অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকৃষ্টতা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ এ সকলের অতীত ও পরিমাণ-বিহীন। ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

যোগসাধনের প্রণালী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—যে গুহায় বায়ু, বৃক্ষ-পল্লব ও জলের মনোহর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে কোন কুদৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, তথায় সমভূমি স্থানে, শিলাখণ্ড প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া, যোগী অবস্থান করিবে; এবং বক্ষ, গ্রীবা ও শরীরের অপর ঊর্দ্ধাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, নাসিকাগ্রে প্রাণবায়ুর প্রতি দৃষ্টিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হওনান্তর, 'ওম্' শব্দ দ্বারা যোগসাধন করিবে; এবং যোগে যখন পরমাত্মার দর্শন পাইবে, যোগী তখন সাংসারিক সুখ দুঃখ পরাজয় করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে সমর্থ হইতে পারিবে। ২২

ইতি পরিশিষ্ট।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

(২২) ব্রহ্মধ্যান-সম্বন্ধে কি কি উপায় ও সেই সেই উপায়ের কি কি বিঘ্ন ও তাহার নিরাকরণ-প্রণালী কি, তাহা বেদান্তসারের শেষভাগে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।